মুখবন্ধ

১৯২৩ সালের ৪ঠা মে তারিখের প্রস্তাবমূলে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি সিণ্ডিকেটের প্রেসকমিটি বাণী-মন্দিরের মুদ্রণ-ব্যাপার গ্রহণ করেন। আজ গ্রন্থখানির প্রকাশের দিনে বাঙ্গালার পুরুষসিংহ স্বনামধন্য স্যার আশুতোষের স্মৃতি আমাদের মনে উদিত হইতেছে। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির ইতিহাসেও আশুতোষ একজন চিরজীবী ব্যক্তি; তাঁহার গুণকাহিনীর স্থান ইহা নহে। সাহিত্যসেবী হইলেও কর্ম্মজীবনের বিভিন্ন বিভাগে, বিপরীতধর্ম্মী ব্যবসায়ে পড়িয়া গ্রন্থকার নানারূপে জীর্ণ হইতে-লেন; আশুতোষই নিজের মহানুভবতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় ভাষার অধ্যয়ন-বিভাগে তাঁহাকে আহ্বান করেন। স্যার আশুতোষের নিকট হইতে উৎসাহ এবং সাধুবাদ না পাইলে বাণী-মন্দির মুদ্রিত হওয়া দূরের কথা, পরিকল্পিত অথবা রচিত হইত কিনা সন্দেহ। অতএব গ্রন্থখানির মধ্যে কুত্রাপি প্রশংসার যোগ্য কিছু আবিষ্কৃত হইলে, তাহা স্যার আশুতোষেরই প্রাপ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস-চেন্সেলার শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহোদয়ের নিকটেও গ্রন্থকারের কৃতজ্ঞতা-ঋণ যৎসামান্য নহে। ইউনিভার্সিটি প্রেসে বঙ্গভাষার এত বড় একখানি কি গ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে, তাহা জানিবার একটা কৌতূহল অথবা ন্যূনাধিক বিরূপ একটা জিজ্ঞাসার সর্ব্বপ্রথম তাঁহার পক্ষে সঙ্গত হয়; কিন্তু তিনি গ্রন্থখানির মুদ্রিতাংশ দেখিয়া গ্রন্থকারকে যেরূপ সদয়ভাবে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন, তাহা চিরদিন মনে জাগরূক থাকিবে।

গ্রন্থকারের প্রিয় ছাত্র শ্রীমান্ কুমুদকান্ত বিশ্বাস, এম. এ., বি. এল., শ্রমস্বীকারপূর্ব্বক নির্ঘণ্টটী সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। নির্ঘণ্টমধ্যে আলোচিত গ্রন্থসমূহের নাম উল্লেখ করা হয় নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে কোন কবি বা তাঁহার কোন গ্রন্থের সম্পূর্ণ সমালোচনা বাণী-মন্দিরের উদ্দেশ্য নহে; প্রতিপাদ্য বিষয়ের সম্পর্কিত ভাবটুকুর বিচারপথে যাঁহাদের কথা প্রসঙ্গক্রমে আসিয়া পড়িয়াছে, কেবল তৎসম্পর্কেই আলোচনা হইয়াছে। সমালোচিত কাব্য-কবিতার নাম নির্দ্দেশ করিলে নির্ঘণ্টের আয়তন দ্বিগুণ হইয়া পড়িত; তাই কেবল কবিগণের নাম ও বলবান্ ভাবগুলি উল্লেখ করা হইয়াছে। ফলতঃ, সূচী ও নির্ঘণ্টকে পরস্পরসাপেক্ষ করার চেষ্টা হইয়াছে। আবার, সমগ্র গ্রন্থখানির মধ্যেই ভারতীয় কর্ষণার আদর্শকে, মানবজগতের ধর্ম্ম, সমাজ, পরিবার, রাষ্ট্র ও সাহিত্যের তুলনায় স্থাপন করাই লক্ষ্য থাকায় উহাকে নির্ঘণ্টে কিংবা সূচীমধ্যে প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই।

প্রুফ-পরীক্ষা বিষয়ে লেখকের অযোগ্যতা-হেতু গ্রন্থখানির প্রথমাংশে সাধারণ ও অসাধারণ অনেক ভ্রম ঘটিয়া গিয়াছে। এই দুর্ঘটনার ফলে প্রেসকমিটি কর্ত্তৃক স্বতন্ত্র প্রুফরিডার নিযুক্ত হওয়ায় গ্রন্থখানির শেষার্দ্ধ মুদ্রাকর-প্রমাদ হইতে হয়ত অনেকটা রক্ষা পাইয়াছে।

"বাঙ্গালা-সাহিত্য-ক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিক্ হইতে আমরা কি করিতে পারি?"—সাক্ষাৎপরিচয়ের প্রথম দিনেই ৺স্যার আশুতোষ গ্রন্থকারকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালীর চিত্ত-বিকাশের সাহায্যার্থে সমাজ, সভ্যতা ও সাহিত্য-বিষয়ে "তুলনা-মূলক" প্রণালীকে

অন্ততঃ তিনখানি গ্রন্থ রচিত হওয়াই আসন্ন প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। মানবের সমাজ বা সভ্যতার বিকাশ-বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য আদর্শে রচিত গ্রন্থের হয়ত ইদানীং অভাব নাই; কিন্তু সাহিত্যের আদর্শ-বিষয়ে আধুনিক ইয়োরোপেও কেবল খণ্ড খণ্ড ও একদেশদর্শী প্রচেষ্টা মাত্র দেখা যাইতেছে। অন্ততঃ সাহিত্য-ক্ষেত্রে, ভারতীয় আদর্শের দিক্ হইতে এমন অনেক কিছু বলিবার আছে, যে-সমস্তকে বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে এতদ্দেশের একটা বিশেষবাণী ও গৌরবময় গভীর দৃষ্টির সমাপ্তিরূপে উপস্থিত করা যাইতে পারে এবং যাহা সমুন্নত ইয়োরোপের নিকটেও উপেক্ষার বস্তু হইবে না।” ৺সার আশুতোষের উৎসাহ পাইয়া গ্রন্থকার “বিশ্ব-বাণী” (অনাড়ম্বর কথায় “ভারতবাণী”) নামে একখানি বিস্তারিত গ্রন্থের বস্তু-সংক্ষেপ ও প্রথম কয়েক অধ্যায়ের পাণ্ডুলিপি তাঁহার নিকট উপস্থাপিত করেন; কিন্তু তৎপূর্ব্বে সাহিত্যের প্রাথমিক মর্ম্মদর্শন-স্বরূপে (First principles) বর্ত্তমান গ্রন্থপ্রকাশই আশু কর্ত্তব্যরূপে বিবেচিত হয়। তাহার ফলেই “বাণী-মন্দির” গ্রন্থের সৃষ্টি। এখন, ইহা প্রকাশের পর, গ্রন্থকার “ভারতবাণী”-সম্পর্কে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি বিষয়ে ৺সার আশুতোষের পরলোকগত অমর আত্মার নিকট পরিহার ও মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছেন। ঐরূপ একখানি গ্রন্থ সম্পূর্ণ করার উপযোগী সৌকর্য্য, সুবিধা ও সাংসারিক বিষয়ে নিরুদ্বেগ অবস্থা তাঁহার নহে।

এই গ্রন্থ দেখিয়া লেখকের কয়েকজন সাহিত্যানুরাগী বন্ধু বলিয়া উঠিয়াছিলেন—“এ কি করিয়াছ! বঙ্গভাষায় লিখিয়াছ! তোমার এ বই কেহ পড়িবে না, বুঝিতেও চাহিবে না।” এইরূপ অনুযোগের মধ্যে যে অনেকটা সারবত্তা আছে তাহা

বুঝিয়াও বঙ্গভাষাতেই ইহা রচিত হইয়াছে। মাতৃভাষার প্রতি অতুলনীয় প্রীতিমান্ ৺আশুতোষ বলিয়াছিলেন, "ইতিহাস কিংবা বিজ্ঞানের গ্রন্থ হইলে সে অন্য কথা, কিন্তু তোমরা যদি সাহিত্যের গ্রন্থও ইংরেজীতে লিখিতে যাও, তবে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি কি প্রকারে স[illegible]র হইতে পারে?" বাঙ্গালায় "বাণী-মন্দির" দেখিয়া আ[illegible]ই যে সমধিক প্রীতিলাভ করিতেন তাহা বলা বাহুল্য। ইদানীং ইহা নিশ্চিত যে, দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তির হৃদয় আশৈশব শিক্ষা-দীক্ষার ফলে মাতৃভাষার শব্দশক্তি ও প্রতিভা-তত্ত্ব বিষয়ে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা অনুভব করে না; বাঙ্গালায় প্রকাশিত কোন "বিদ্যা" যেন বিদ্যাই নয়; আমাদের অনেকের অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে যে এইরূপ একটা পরাধীনতা ও দৈন্যবুদ্ধি সমাপন্ন হইয়া অন্তরকে ক্ষুদ্র করিতেছে, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় রচিত হইলে, আজ সমগ্র পৃথিবীর অধিকাংশ সাহিত্য-পণ্ডিতের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া উহার দোষগুণ ও যোগ্যতা বিষয়ে হয়ত সুবিচার লাভের প্রত্যাশা করা যাইতে পারিত। এ দিকে যে একটা নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতে লেখক কিছুমাত্র কুণ্ঠা অনুভব করিতেছেন না। তবে, এতদ্দেশেও বহুব্যক্তি আছেন, যাঁহারা বঙ্গভাষাতেই এই গ্রন্থের বক্তব্য তাঁহা অপেক্ষা সমধিক মনোজ্ঞ ভাবে পরিকল্পনা ও রচনা করিতে পারিতেন এবং বর্ত্তমান গ্রন্থেরও সুবিচার করিতে পারেন—যদি তাঁহাদের সদয় দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট হয়। আমরা বঙ্গসাহিত্যের সেবক; শৈশব হইতেই পতিতা এবং নিজের সুপুত্রগণের হস্তে লাঞ্ছিতা এই বাণী-জননীর সেবা করার নির্ব্বুদ্ধিতা আমাদের অনেককে পাইয়া বসিয়াছে।

একান্তভাবে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের সেবা করিব এই দুরাকাঙ্ক্ষা-বশেই আমরা দীর্ঘ জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র পরিহার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলাম। আশৈশব শিক্ষা ও চর্চ্চার ফলে ইংরেজী ভাষায় ভাবপ্রকাশ আমাদের পক্ষে হয়ত সমধিক সৌকর্য্য-সিদ্ধ ও মুখস্থ বুলির সহায়তা-বশেই সুগম বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। ইংরেজী ভাষায় ভাবপ্রকাশ-পন্থা অগণিত পূর্ব্বসূরীর সাধনায় সুস্পষ্ট পদ্ধতিবহুল হইয়া এবং অসংখ্য মহাজনের চরণাঘাতে নিষ্কণ্টক ও সুগম হইয়া পড়িয়াছে। বঙ্গভাষার মধ্যে সেই সমাযোগ ত নাই-ই, বরঞ্চ প্রতিপদক্ষেপে প্রচলিত শব্দ ও পদ-পদ্ধতির অনভিজ্ঞাত পথেই পাদচারণা ব্যতীত আধুনিক লেখকগণের অন্য উপায় নাই। অতএব, এই ভাষারীতির সূত্রেও স্বদেশেই অনেকের নিকট বিসদৃশ প্রতিপন্ন ও বিমতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। তথাপি, কোনও উপার্জ্জিত ভাষাতে স্বাধীন, মৌলিক বা প্রাণবান্ সাহিত্য জন্মলাভ করিতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই।

আবার সাহিত্য-তত্ত্ববিষয়ে এইরূপ গ্রন্থ রচনায় বিপত্তিও কম নহে। উচ্চতম সাহিত্য-আদর্শের দিকে মুখ্যভাবে পাঠকের রসবোধিকে সচেতন করার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ পরিকল্পিত—অথচ বঙ্গসাহিত্যে উচ্চতম আদর্শ-দর্শনের প্রত্যক্ষ সুযোগ অধিক নাই। এক একটী সাহিত্যে উচ্চশ্রেণীর কবি কিংবা লেখক কয়টীই বা থাকে? বিজাতীয় ক্ষেত্র পরিক্রমণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। আবার, জাতীয় সাহিত্যেও, যাঁহারা কৃতিত্ব গভিকে হয়ত সমগ্র জাতির প্রিয়, যাঁহারা আমাদের অশেষ প্রেম ও শ্রদ্ধার পাত্র, দোষগুণ উভয়ের দর্শনস্থলে তাঁহাদিগকেই বিচারের কাঠগড়ায় তুলিতে হয়। কেন না, সাহিত্যে অমর-

যোনিরই বিচার। যে সকল কবি 'অমর' নহেন, যাঁহাদের কৃতিত্ব কোন দিকে অমরত্ব-টীকা পাইয়াছে বলিয়া সমালোচক মনে করিতে পারেন না, তাঁহাদের কোন গুণ, বিশেষতঃ কোন দোষ দর্শন করিতে যাওয়া সাহিত্যক্ষেত্রে অশিষ্টাচার ব্যতীত অপর কিছুই নহে।

সাহিত্যে কোন্ লক্ষণটী সাময়িক, কোন্‌টী বা চিরন্তন, কোন্‌টা কেবল "প্রাকৃত," কোন্‌টা মহৎ বা "মহতো মহীয়ান্," উহার খোঁজ করিতেই এ কালের সাহিত্য-রসিকমাত্রের অনেক সময় ব্যয় হয়। আবার, নিজের কর্ম্মকৃতির রসাস্বাদ-গ্রহণে সামাজিকের রসনা পরিষ্কার করিতেই অনেকের 'বহুসময়' অপব্যয়িত হইয়া যায়! অতএব, এই 'রুচি-গঠন' সাহিত্যক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা অপরিহার্য্য ও বৃহৎফল বস্তু এবং সাহিত্য-প্রবেশকের পক্ষেও উহা সর্ব্বাপেক্ষা দারুণ 'সমস্যা' রূপে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সাহিত্যের উচ্চতম আদর্শ-বিষয়ে আত্মপ্রত্যয় অবারিত করাই সাহিত্যসেবীর প্রধান দায়িত্ব; অথচ উচ্চতম রসার্থসিদ্ধ কাব্য সাহিত্যজগতেই নিতান্ত পরিমিত বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। নিতান্ত নিম্নকোটির সত্য ও প্রাকৃত ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া, মানুষের যাহা শাশ্বত ও ঘনিষ্ঠ তত্ত্ব, মানবত্বের যাহা নিগূঢ় এবং 'গুহাহিত' স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম, নরের যাহা গহনতম ক্ষুধার অন্ন ও তৃষ্ণার জল, যাহা মানবের ব্যক্তি-সমাজ ও ধর্ম্ম-তন্ত্রের পরম সমস্যারূপে নরজাতির হৃদয়কে আলোড়িত করিতেছে, তৎসমস্তও সাহিত্যের "বিষয়"। উচ্চ আদর্শ-বিষয়ে সহৃদয়তা-সিদ্ধ পাঠক বা প্রকৃত শক্তিসামর্থ্য-সিদ্ধ শিল্পীর চৈতন্যে জাগরূক লেখকের সংখ্যাই সাহিত্য-সংসারে অধিক নহে। যাহা হউক, সত্যোত্তম পথে পাঠককে সচেতন করিবার চেষ্টা করিতে

পারিয়াছেন ভাবিয়াই গ্রন্থকারের পরিতৃপ্তি। সকল কাব্যের পরম 'আত্মা' যাহা, সকল কবিচেষ্টার পরমার্থ যাহা, সহযোগী পাঠককে তাহার প্রপত্তি এবং প্রত্যক্ষ অনুভূতির পথে কিঞ্চিন্মাত্রও অগ্রসর করিতে পারিলে এই চেষ্টা সার্থক হইবে।

কলিকাতা,
৫ই জানুয়ারী, ১৯২৮

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

প্রসঙ্গ-সূচী

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

সাহিত্যে আকৃতি (২)

ক

খ

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক

সাহিত্যের প্রকৃতি

ক

খ

গ

বিষয় | পৃষ্ঠাঙ্ক

বিষয় | পৃষ্ঠাঙ্ক

ঘ

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক

সাহিত্যের সাধনা

বিষয়

ভূমিকা

সাহিত্যের আদর্শ কি? ইহা সাহিত্যক্ষেত্রে সচেতন পাঠক বা লেখকের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্নিবার প্রশ্ন ও দুরন্ত সমস্যা। কবি হয়ত নিজের প্রাণের দুর্দ্দম প্রেরণা-বশেই কাব্য রচনা করেন, আপনার মনকে যেন খালাস করিয়াই তৃপ্তি লাভ করেন। তাঁহার ওই 'প্রেরণাকে' ব্রাউণীংয়ের কথামতে, একটা দিব্য বা 'দেবদত্ত' (Divine) ব্যাপার বলিয়া মানিয়া লইতে অনেকেরই আপত্তি থাকিতে পারে। শুক্তিগর্ভে মুক্তার জন্ম এবং জমাট বাঁধা ব্যাপারটী বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে যেমন একটা রোগ, তেমনি কাব্য-ভাবুকতাও হয়ত কবিচিত্তের একটা নিদারুণ 'রোগ'—যাহাতে কবিহৃদয়ের অন্তর্ব্বেদনাকে দিব্যদীপ্তিতে ঘনায়িত করিয়া মহাকালের কণ্ঠযোগ্য মণিখণ্ড রূপে পরিব্যক্ত করে। তেমনি, Genius ও হয়ত কেবল একটা Insanity—যাহার বশে পড়িয়া কবিগণ প্রাণ গেলেও কদাপি হাত গুটাইয়া থাকিতে পারেন না। তবে সংসার এই প্রতিভা'রোগ' হইতেই ত ক্রমোন্নতি ক্ষেত্রে নব নব উপার্জ্জন করিয়া বসে! এ'দিকে বৈজ্ঞানিক স্যর হেনরি মায়ার যে প্রতিভাকে মানবতার ক্ষেত্রে একটা আলৌকিক সমাপত্তি ও দিব্য ভাব বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন তাহাই হয়ত আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। (ক) কিন্তু কবির ভাবুকতা অন্ততঃ একদিকে যে একটা যাতনা, আত্মপ্রকাশের জন্য নিজের অভ্যন্তর হইতে একটা অরুন্তুদ প্রেরণা, দুনিয়ার ক্ষেত্রেও উহা যে কবির অদৃষ্টে নানাদিকে একটা যমযন্ত্রণা—যাহার গতিকে আত্মপ্রকাশ না করিয়াই তাঁহাদের সোয়াস্তি নাই—এ'কথা অস্বীকার করা চলে না।

(ক) মায়ারের Human Personality and its Survival of Bodily Death গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় Genius দ্রষ্টব্য।

পুনশ্চ, প্রকাশ করিতে গেলেই ত সংসার ও সমাজ কবির কাব্যকে একটা আদর্শের দিক্ হইতে বিচার করে! সুতরাং অন্ততঃ এদিক্ হইতে দেখিলে, সাহিত্যের আদর্শপরিজ্ঞান কবির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ ও অপরিহার্য্য। আবার, সাহিত্যের সেবক হইব, অথচ সাহিত্যক্ষেত্রে ধন্য ও বরেণ্য পদার্থ কি, যশস্য ও প্রশস্ত বস্তু কি তদ্বিষয়ে দৃষ্টি নির্ম্মল না করিয়া কেবল নির্ব্বিচার সহজবুদ্ধির উপরে নির্ভর করিয়াই ঋদ্ধি লাভ করিব, কবি কিংবা পাঠকের পক্ষেও এমন ব্যাপার অন্ততঃ একালে সম্ভবপর নহে।

অন্যদিকে, সাহিত্যের এই আদর্শজ্ঞান জীবনের আদর্শবিজ্ঞানের মতই ত সামাজিক মনুষ্যমাত্রের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া আছে! একটা কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সকল সভ্য দেশে সাহিত্যই মানুষের শিক্ষার প্রধান বাহন; সাহিত্যপ্রধান শিক্ষা লইয়াই মনুষ্যকে জীবনে প্রবেশ করিতে হয়। আবার, যে সাহিত্য লইয়া মানবশিশুর জীবন আরম্ভ হয়, আমরণ সে সাহিত্যই তাহার হৃদয়মনের পরম আনন্দস্থান ও বিশ্রামরূপে চলিতে থাকে।

মানুষের শিক্ষার আদর্শ কি হইবে? উহা তাহার ভাববৃত্তির উপর না জ্ঞানবৃত্তির উপর মুখ্যভাবে জোর দিবে? শিশুকে Literary Education না Scientific Education দেওয়া হইবে? এ বিষয়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া সভ্যজগৎ মাথা ঘামাইতেছে। এ সম্পর্কে ইংলণ্ডে যেই কমিশন বসে, সমসংখ্যক বালক লইয়া বিজ্ঞানপ্রধান ও সাহিত্যপ্রধান শিক্ষার ফলবিষয়ে যে পরীক্ষা হয়, তাহাতে কমিশনের সিদ্ধান্ত এই যে, সাহিত্যপ্রধান শিক্ষা হইতেই জীবের সমস্ত মনোবৃত্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটিতে পারে। (১) সুতরাং সভ্যজগতে মানবশিশুর সাহিত্যমুখ্য শিক্ষার আদর্শ কমিশনের এই নির্দ্ধারণ হইতে বস্তুগত্যা একটা উপরি সমর্থনাই লাভ করিল। কমিশন বলিতে চাহেন যে, জীবের ভাববৃত্তিই তাহার সর্ব্বশক্তির, সকলপ্রকার জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তির প্রধান সহায়স্থান; উহা জৈব ক্ষেত্রে অনন্তশক্তির সম্ভাবনাময়ী

(১) এই গ্রন্থের ৬৯৯ পৃষ্ঠার পাদটীকা।

একটা বৃত্তি এবং উহার প্রসার কতদূর তাহার পরিমাপ এখনো মানুষ করিয়া উঠিতে পারে নাই। জীবের জ্ঞান ও কর্ম্মবৃত্তি তাহার ভাববৃত্তিরই যমজ সহোদরা এবং সহচরী; জ্ঞান ও কর্ম্মক্ষেত্রে মানুষের যাবতীয় উন্নতি তাহার ভাববৃত্তির অনুপ্রাণনা এবং নন্দিনী শক্তিতেই ঘটিয়া আসিতেছে। সাহিত্য মুখ্যভাবে মনুষ্যের ভাববৃত্তির সৃষ্টি ও উক্ত বৃত্তির পরিপোষণ করিয়াই ঋদ্ধিলাভ করে বলিয়া শিক্ষার ক্ষেত্রেও উহা জীবের পরম প্রাণদাতা ও আনন্দবন্ধু। অতএব ব্যাপার এই দাঁড়াইল যে, সাহিত্য জীবের কর্ম্ম বা জ্ঞানবৃত্তিকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে লক্ষ্য না করিয়াও, বরঞ্চ সাক্ষাৎভাবে জীবের ভাবজীবনের প্রসার বৰ্দ্ধিত করিয়াও দৃষ্টতঃ উক্ত দুইটী মনোবৃত্তিকে সর্ব্বাপেক্ষা সার্থকভাবেই পরিপুষ্ট করে, সে পথেই জীবের জ্ঞানকর্ম্মক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হইয়া অতুলনীয় ভাবেই জীবত্বের পরিপুষ্টি সমাধা করে। সাহিত্য অনেক সময় হয়ত কেবল একটা ideal বস্তু, একটা কাল্পনিক পদার্থ; বাস্তবের 'মাপ কাঠি'তে উহার কিছুমাত্র মূল্য হয়ত দাঁড়ায় না; অথচ উহাই ফলে বাস্তবতন্ত্রী জীবের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, সহায় ও সুখবন্ধু। জীবের অধ্যাত্মক্ষেত্রে এই অবাস্তব ও কাল্পনিক পদার্থেরই ফলতঃ সর্ব্বাধিক বাস্তবশক্তি। জীবত্বের ক্ষেত্রে এই বিপরীত ব্যাপার, এই দারুণ অসম্বদ্ধ, 'অযৌক্তিক' এবং বিচিকিৎস সত্যব্যাপারটুকুই সর্ব্বপ্রথম চিত্তাকর্ষণ করে। কবিগণ সাহিত্যপথে মানুষের ভাবগত আনন্দভাণ্ডার পরিপুষ্ট করিতেছেন বলিয়াই তাঁহাদের পূজাপদবী। এদিকেও, যে কবি যত গভীর ও স্থায়ী ভাবের কল্পনানন্দে জীবকে তর্পিত করিতে পারেন, একেবারে অবাস্তব ও কাল্পনিক উপায়ে, "Fine Frenzy" বা "Divine Fury"র পথেই মনুষ্যকে বিস্ময়াবিষ্ট বা অদ্ভুতাপন্ন করিয়া তাহার চিত্তকে বিস্ফারিত করিতে পারেন, মানুষ দৃষ্টতঃ তাঁহাকেই ত মাথায় তুলিতেছে!

দুনিয়াজীবী মনুষ্য হয়ত তাঁহার জ্ঞান ও কর্ম্মের বোঝা হইতে অনেক 'বড়' অপর একটা বস্তু বলিয়া (হয়ত একটা 'অধ্যাত্ম' বস্তু বলিয়াই) এ ব্যাপার সম্ভবপর হইতেছে। যে দিক্ হইতেই হউক, যেমন লেখক তেমন পাঠকের পক্ষেও সাহিত্যের আদর্শ জিজ্ঞাসাটুকু সর্ব্বাপেক্ষা আসন্ন

বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারি। সাহিত্যকে কোন না কোন আকারে একটা সর্ব্বমানবসাধারণ বস্তুরূপেই নির্দ্দেশ করা যায়। সুতরাং ধর্ম্ম, নীতি, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতির ন্যায়, কিংবা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র প্রভৃতি মানবসাধারণ প্রতিষ্ঠানের ন্যায় সাহিত্যকেও একটা সামান্যধর্ম্মী বস্তুরূপে ধরিয়া উহার আদর্শ জিজ্ঞাসা চলিবে না কেন? মনুষ্যের মনই যখন সাহিত্যের কর্ত্তা এবং ভোক্তা তখন মনস্তত্ত্বের অধিকারেই যে উক্ত আলোচনাটুকু দাঁড়াইতে পারে তাহাও প্রথম দৃষ্টিতেই দেখা যায়।

অতএব সাধারণ মানবের ভাবগ্রাহ্য করিয়া এবং সর্ব্বমানবের অনুভূতিভূমির উপরেই ন্যূনাধিক নির্ভর করিয়া সাহিত্যের একটা আদর্শদর্শন দেশে দেশে দাঁড়াইয়াছিল। উহাই Poetics—এতদ্দেশে যাহার নাম অলঙ্কারশাস্ত্র।

কিন্তু যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা প্রাধান্যতঃ কেবল সাহিত্যের Form বা বহিরাকৃতি লইয়া। প্রাচীনকালে যে সমস্ত সারস্বত ও সভ্য জাতির মধ্যে সমুন্নত মনোজীবনের প্রভাবে ভাষা ও সাহিত্য পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারিয়াছিল তাহাদের মধ্যেই সুতরাং একটা সাহিত্যশাস্ত্র বা Poetics কিছু-না-কিছু বিকাশ লাভ করিয়াছে। সচেতন এবং সবিচার ভাবে সাহিত্যচেষ্টা পরিচালিত করিতে গেলে অথবা সাহিত্যফল ভোগ করিতে গেলেও একটা Poetics কোন-না-কোন আকারে গড়িয়া উঠে। বেদচর্চ্চা ও বেদনিষ্ঠার গতিকে প্রাচীন ভারতের দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে ভাষাতত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট হয়। আলোচনা এমন ঘনিষ্ঠভাবে চলিয়াছিল যে, উহাতেই ভারতীয় আর্য্যজাতিকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ ও অতুলনীয় শব্দবৈজ্ঞানিকরূপে তুলিয়া ধরিয়াছে। সেরূপ, বেদার্থচিন্তার সূত্রেই যে ভারতে অলঙ্কারশাস্ত্রের জন্ম তাহার প্রমাণ আছে। প্রাচীন গ্রীকগণও ছিলেন অপরূপ সাহিত্যশিল্পসেবী ও নাট্যপ্রিয় জাতি; তাঁহাদের মধ্যেও Poetics এর সবিশেষ বিকাশের প্রমাণ পাইতেছি। এরূপে দেশে দেশে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে, জাতীয় ভাষার বাক্যশরীর অবলম্বনে, বাক্যকে একটা ব্যক্তি

(unit) রূপে ধরিয়া, বাক্যের শব্দ ও অর্থের শক্তি নিরূপণ করিয়া এবং বাক্যের দোষ, গুণ, অলঙ্কার ও রীতি বিচার করিয়াই Poetics ব্যাপৃত ছিল।

কিন্তু প্রাচীন Poetics বা অলঙ্কারশাস্ত্র আমাদের জিজ্ঞাসার সম্যক্ জবাব দিতে পারে নাই—হয়ত প্রশ্নের প্রধান মর্ম্মটুকুই হৃদয়ঙ্গম করে নাই।

সাহিত্যের আদর্শ কি, এই প্রশ্নের পশ্চাতে বক্ষ্যমাণরূপ দুরন্ত জিজ্ঞাসাই ঢাকা আছে—সাহিত্যের আত্মা কি? কোন্ সাহিত্য পাঠ করিব? প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রের দ্বারা কাব্যশরীরের বিচার কোন কোন দিকে অতুলনীয় ভাবেই হইয়াছে; ভারতেই সাহিত্যিক বাক্যের শব্দশক্তি বা দোষ, গুণ ও অলঙ্কারক্ষেত্রে এমন নিকর্ষণ ঘটিয়াছে যে, একালে সেই বিচার কিংবা আলোচনার তরফে সবিশেষ নূতন কিছু যোগ করাও হয়ত আমাদের ক্ষমতায়ত্ত নহে। তবে 'সাহিত্যের আত্মা' দর্শনপূর্ব্বক উক্তরূপ দর্শনের সম্প্রাপ্তিকে আধুনিকসম্মত প্রণালীতে উহার যাবতীয় কলাফলে যথাযথভাবে নিরূপণের কোন প্রচেষ্টা কোন দেশের প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্র বা Poeticsএর মধ্যে হয় নাই। Poeticsএর পরম প্রশংসাসম্মত এবং গুণালঙ্কারের দীপ্তিময় বাক্যশক্তিতেই সাধুবাদযোগ্য অনেক গ্রন্থ যে 'সম্পূর্ণ অপাঠ্য' হইতে পারে, আধুনিক মানবের সমক্ষে সেই সত্য ও সমস্যাটাই সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্র সে সমস্যা ভঞ্জন করিতে পারিতেছে না।

আধুনিক মানবের নিগূঢ় মর্ম্মগুহা হইতে এই প্রশ্ন গভীর সমস্যাকারে উত্থিত হইয়াছে এবং উহার জবাবও মানুষের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের তত্ত্ববিচার ব্যতীত দেওয়া যাইতে পারে না। মানবের জীবন ও মানবের ইন্দ্রিয়সমক্ষে প্রকটিত এই জগৎ লইয়া এবং এতদুভয়ের ইতরেতর সম্বন্ধজনিত ব্যাপার লইয়াই সাহিত্য; অতএব উহাদের মূলবিচার ব্যতীত উক্ত প্রশ্নের সম্যক্ প্রত্যুত্তর দাঁড়াইতেই পারিতেছে না।

আবার, কোন সাহিত্যসেবী যখন আপন জীবনের কর্ম্মাধিকারে প্রথম চেতনা লাভ করেন, তাঁহার সমক্ষেও প্রধান সমস্যা—'কি পড়িব ?' 'কি করিব ?' সম্মুখে আপাতদৃষ্টিতে সীমাহীন ভূমি ও অগণ্য প্রয়াণের পন্থা—আধুনিক মানবের সমক্ষে বিরাট্ সাহিত্যের বিপুলবিস্তৃত মহারণ্য! আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাচীন লাইব্রেরী যিনিই ধ্বংস করুন, অন্ততঃ একদিকে তিনি পাঠকজাতিকে আত্মশক্তির নিদারুণ পঙ্গুতা ও ক্ষুদ্রতাবোধ হইতে এবং অশক্ত হতাশ্বাসের দুরন্ত জ্বালা হইতে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। আজ যদি ঐ লক্ষ লক্ষ পুঁথির জগদ্দলভার সারস্বত রসলিপ্সুর বুকে চাপিয়া থাকিত! প্রত্নরসিক পণ্ডিতগণেরই বা কোন্ দশা হইত! উহা সত্ত্বেও আবার বর্ত্তমান যুগের সমুচ্চয়িত এবং উপচীয়মান এই গ্রন্থপর্ব্বত! বিগত শতাব্দী মনুষ্যের সাহিত্যকুঞ্জবনের অদৃষ্টে অপেক্ষাকৃত শান্তিময় ভাবেই কাটিয়াছে। যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিয়া থাকিলেও পূর্ব্বকালের বাণীবিধ্বংসী বর্ব্বরতা ঘটিতে পারে নাই; মুদ্রাযন্ত্রের অনুগ্রহে সরস্বতীর আশ্রয় দুর্গ এক একটা দেশ ও জাতিশরীরের সমব্যাপী হইয়াই দাঁড়াইয়াছে। গ্রীস, রোম ও ভারতের প্রাচীন বাণীবিত্তভাণ্ডার যেভাবে উড়িয়া গিয়াছে, একালে হয়ত তাহার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ওই ঊনবিংশ শতাব্দীর উদ্বর্ত্তমান গ্রন্থসম্ভারই ধারণা করুন, কোন বৃহৎ সহরের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার নিরীক্ষণ করুন—যদিও উহাতে মনুষ্যজাতির গ্রন্থসম্পত্তির সহস্রতম ভগ্নাংশও হয়ত স্থান পায় নাই। একমাত্র ইংরেজী ভাষার গ্রন্থবিত্তই উচ্চাভিলাষী পাঠার্থীর মূর্চ্ছাসাধনে যথেষ্ট গণ্য হইতে পারে। ভালমন্দ ও মাঝারী গ্রন্থের এই মহারণ্য! এ অরণ্যের সমস্তই কি সাহিত্য? সমস্তই কি পাঠ্য? এই অরণ্যে আমার জীবনযোগ ও কর্ম্মযোগ কোথায়?

পুনশ্চ, ফলিত জ্যোতিষের পরিভাষায় বলিতে পারা যায়, অনন্তের বক্ষে প্রত্যেক জীবই এই সৌরজগতের দেশকালপরিবেষে 'লগ্ন' আছে। সে আদর্শে অনন্তবক্ষঃস্থিত এক একটী ক্ষুদ্র জীবের অদৃষ্টগগনকে আমাদের সূর্য্যশাসিত দ্বাদশ রাশিচক্রে বিভক্ত করিয়া তাহার 'লগ্ন' স্থান

নিরূপণ করিতে হয়। জীবের কর্ম্মাদৃষ্টের গগনে কিংবা তাহার ত্রিপথগা মনোবৃত্তির ক্রিয়াব্যাপারে তাহার সাহিত্যকর্ম্মের 'লগ্ন'টুকু কোথায়? মানবজগতে সাহিত্যের উৎপত্তি কিংবা স্থিতির ভাব ও দশাস্থান কি? উহার মৃত্যুস্থানই বা কোথায়? সাহিত্যের তুঙ্গভূমি বা ধর্ম্মস্থানই বা কি? এ সকল জিজ্ঞাসাও ইদানীং সচেতন সাহিত্যসেবক মাত্রকে ভাবিত না করিয়া পারিতেছে না।

অথচ ঐ সমস্ত বিষয়ে সাহিত্যের প্রকৃত তত্ত্বচিন্তা নিবিষ্টভাবে ও ধারাবাহিক ভাবে একাল যাবৎ হয় নাই বলিলেই চলে। সাহিত্য কেবল একটা 'আর্ট', ব্যক্তিগত রুচির খামখেয়ালী রীতি ও যদৃচ্ছাচারিণী কল্পনাদেবীর লীলাবিলাসই উহাতে আপাতদৃষ্টিতে প্রবল, এরূপ একটা ধারণার প্রভাবগতিকেই হয়ত বৈজ্ঞানিকরীতির কোন জিজ্ঞাসাবাদ সাহিত্যক্ষেত্রে দাঁড়ায় নাই। জীবের মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে (Psychology) এই জিজ্ঞাসা মনোবিজ্ঞানের জন্মদান করিয়াছে; ধর্ম্ম বা নীতির (Ethics) ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানশ্রী পরিস্ফুট হইয়াছে। সাহিত্যকে কেবল জীবের অন্তঃপুরচারিণী কবিকল্পনার স্বেচ্ছাচারক্ষেত্র ভাবিয়াই যেন তত্ত্বচিন্তকগণ এতকাল উহা হইতে দূরে দূরে থাকিয়া আসিয়াছেন। অথচ, সাহিত্যবাণীর সত্তা, উহার উৎপত্তি ও স্থিতি সর্ব্বমানবসাধারণ 'ভাব'বৃত্তির ভূমিতেই ত দাঁড়াইয়াছে! তাহার সেই জন্মলগ্ন ও জীবনকোষ্ঠীর ধর্ম্মবিচারে যথোচিত নিকর্ষণা ঘটে নাই। বিগত শতাব্দী হইতে 'সৌন্দর্য্যতত্ত্ব' (Aesthetics) নামে একটী স্বতন্ত্র শাস্ত্র ইয়োরোপের মনীষাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চাহিতেছে। উহাতে মানবের চিত্র সঙ্গীত স্থাপত্য ভাস্কর্য্য প্রভৃতি ললিতকলার মূলতত্ত্ব দর্শন করিবার জন্য একটা প্রচেষ্টা আছে। সাহিত্যকে কেবল পাঁচমিশালী-ভাবে, পাঁচের মধ্যস্থ একটা বৈশিষ্টহীন পদার্থরূপে, এমন কি উহাকে সঙ্গীত চিত্রাদির যেন কেবল সহচরী ও পরিচারিকার ভাবে দৃষ্টি করিয়াই Aesthetics একটা আলোচনা করিতেছে। সাহিত্যের বিশিষ্টশ্রী, উহার স্বতন্ত্র রীতি ও ধাতু এবং স্বতন্ত্র আসনপদবীর দিকে কিছুমাত্র

বিশেষদৃষ্টির কোন প্রমাণ এ সমস্ত Aesthetics গ্রন্থের মর্ম্মমধ্যে প্রকটিত হইতে পারে নাই।

সাহিত্যের স্রষ্টা হইতেছেন কবিগণ। সকল শ্রেষ্ঠ কবির অন্তরেই 'সাহিত্যের আত্মা' বিষয়ে ন্যূনাধিক সচেতন একটা আদর্শবুদ্ধি পর্য্যাপ্ত থাকিয়াই প্রজ্ঞাদৃষ্টির উদয়নে, অনুভাব-বিভাবের গ্রহণবর্জ্জনে এবং কাব্য-মর্ম্মের সমাধানে তাঁহাদিগকে পরিচালিত করে। কবিগণের অন্তঃপ্রসুপ্ত আদর্শ ও মানসী ক্রিয়ারীতির উপর আলোকপাত করিতে পারিলেই সাহিত্যের প্রকৃত আদর্শদর্শন দাঁড়াইতে পারে। এদিক্ দিয়া দৃষ্টি করিতে গেলেই মনে হইবে.শেক্‌সপীয়রই ছিলেন প্রকৃতপ্রস্তাবে নাট্যতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক—শেক্‌সপীয়রের গ্রহণবর্জ্জন এবং সমাধানে অন্তর্দৃষ্টি দান করিলে, তাঁহার Mind and Art বুঝিতে গেলেও এ কথাই দাঁড়াইয়া যায়। অথচ শেক্‌সপীয়র কেন, জগতের প্রায় সকল বড় কবিই আপনাদের কাব্যকারখানা এবং 'ঘরের কথা'র বিষয়ে একেবারে নীরব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইয়োরোপে রিনে'শাসের ফলে, বিশেষতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে 'রোমাণ্টিক' আদর্শের অভ্যুদয়ের সমসূত্রে আপনাদের 'আর্ট্' বিষয়ে কবিগণের মুখ ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে সময় হইতে সাহিত্যে Subjectivity ও Self-introspection এবং Personal elementএর দাবীও বৃদ্ধি পাইয়াছে; কবিগণও আপনাদের নিজত্ব ও বিশেষত্বের দিক্ হইতেই বিচারিত হইবার দাবী আনিয়াছেন। কোলরীজ্-ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের Lyrical Ballads কাব্যটীর ভূমিকাকে এ ব্যাপারের প্রধান সীমান্তস্তম্ভরূপেই নির্দ্দেশ করিতে পারি। এ সমস্ত সত্ত্বেও, কবিকর্ম্মের রহস্যবিষয়ে আপনাদের 'মনের কথা' খুলিয়া বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন এমনতর কবির সংখ্যা নিরতিশয় স্বল্প বলিলেই প্রকৃত কথা বলা হয়। গ্যেঠে, শিলার, কোলরীজ, ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থ, শেলী ও ম্যাথু আর্ণল্ডের নাম করিতেই সংখ্যা প্রায় ফুরাইয়া আসে।

সাহিত্যজগতের উচ্চশ্রেণীর কবিগণের অন্তরে যে একটা অলিখিত শাস্ত্র আছে, যাহার (হয়ত অতর্কিত) পরিচালনপথেই তাঁহাদের অমর

কৃতিসমূহ পরিকল্পিত, পরিবর্দ্ধিত এবং প্রাণিত হইয়া বাহির হইয়া আসে, অন্যকথায় তাঁহাদের মগ্নচৈতন্যে শিল্পসৃষ্টির যে একটা তত্ত্ববোধি ও আদর্শবোধি আছে উহাকে সচেতনভাবে মনস্তত্ত্বের কোটায় আনিয়া ধারণা করিতে ও বাক্যমুষ্টিতে নিবদ্ধ করিতে পারিলেই প্রকৃত সাহিত্যশাস্ত্র ধরা পড়িতে পারে। উহাকে যে পরিমাণে সাধারণের ধৃতিগম্য করিতে ও হেতুবাদের ক্রমান্বিত এবং সূত্রানুবন্ধিনী ধারণার মধ্যে আনিতে পারা যাইবে, সে পরিমাণেই একটা সাহিত্যশাস্ত্র বা Systematic Philosophy of Literary Art সম্ভবপর হইবে। তবে এরূপ প্রণালীতে বিপত্তির সম্ভাবনাও কম নহে। প্রত্যেক কবির একটা না একটা সীমাবদ্ধা নিজত্ব বা Idiosyncracy আছে; ভ্রমক্রমে তাদৃশ কোন একটা বে আড়া বিশেষধর্ম্মকে সর্ব্বসাধারণ তত্ত্ব বলিয়া মনে স্থান দিতে গেলেই সমস্ত ব্যাপার পণ্ড হইয়া যাইতে পারে। যেমন, কবি Swinburneএর সমালোচনা মধ্যে তাঁহার প্রাণের এমন একটা প্রবল প্রচণ্ডতা ও গোঁ আছে যে তাঁহাকে শিল্প-সমালোচনার ক্ষেত্রে একজন Fanatic বলিয়াই চিহ্নিত করা যায়; সাহিত্যদার্শনিক অতর্কিতেই উহা দ্বারা আবিষ্ট হইয়া একদেশদর্শী রূপে দাঁড়াইতে পারেন। সমালোচনা-ক্ষেত্রে ম্যাথু আর্ণল্ড্‌কে একজন পরম স্থিতধীঃ বিচারক বলিয়া ধারণা জন্মিলেও, শেলীকীট্‌সের রোমাণ্টিক চারিত্র ও ধর্ম্মধারণার ক্ষেত্রে তাঁহার মধ্যেও এমন একটা পরিস্ফুট চিত্তশৈত্য অপিচ কার্পণ্য অনুভব করিতে থাকি যে সে দিকে তাঁহার উপর নির্ভর করাই অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। সমালোচনা-ক্ষেত্রে অপক্ষপাতে স্থিতবুদ্ধি থাকাকে একটা অসাধারণ গুণরূপেই নির্দ্দেশ করিব।

কথা উঠিতে পারে, প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রে ঐকরূপ অতুলনীয়ভাবে যেই শব্দার্থ-শক্তি এবং বাক্যের দোষ-গুণ-অলঙ্কার-রীতির বিচার সমাপ্ত আছে তাহার বাহিরে সাহিত্যের আত্মার বিষয়ে আর সবিশেষ বক্তব্য কি থাকে? আর কি এবং কতটুকু বলিবার ও বুঝিবার আছে যে তাহার উপর দাঁড়াইয়া একটা স্বাধীন সাহিত্যশাস্ত্রের গোড়াপত্তন সম্ভবপর

হইতে পারে? এস্থলে একটি মাত্র কথায় সদুত্তর দিতে পারা যায় যে 'ফলেন পরিচীয়তে'। সাহিত্যের তত্ত্ব-চিন্তার ক্ষেত্রেই, কেবল কবিগণের 'আত্মখ্যাপনা' এবং পণ্ডিতগণের সমালোচনার মধ্যে নহে, নিখুঁত A priori বা স্বতঃসম্ভবী পদ্ধতিক্রমেই এত সমস্ত সামান্যধর্ম্ম ও বিশেষ-ধর্ম্মের বিজ্ঞপ্তি এবং অনুচিন্তন ঘটিয়া গিয়াছে যে এবং এ বিষয়ে আরও এত কথা ধারাক্রমিক ভাবে উপস্থিত করিতে পারা যায় যে সাহিত্য-বিদ্যাকে আর Aestheticsএর পরিচারিকাস্বরূপে, অথবা অপরের "বেশভূষা স্ববশা শিল্পকারিকা"রূপে না চলিলেও ক্ষতি নাই। সাধারণ সৌন্দর্য্যবিদ্যার আনুগত্য হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই সাহিত্যতত্ত্ব আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়া একটা স্বতন্ত্র প্রজ্ঞাময় কলাশাস্ত্ররূপে দাঁড়াইতে পারে।

বর্ত্তমানে সাহিত্যের আত্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে ইয়োরোপীয় শিল্প-সমালোচনার ক্ষেত্রে দৃষ্টি পরিচালিত করিতে গেলেই ন্যূনাধিক হতাশ হইতে হয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যের অধীতীকেই রাস্কিনের Seven Lamps of Architecture পড়িয়া সাহিত্যসম্বন্ধীয় বিশেষতত্ত্ব নির্মন্থিত করিয়া তুলিতে হয়—তাহাও প্রকৃত প্রস্তাবে কেবল সাহিত্যের প্রকাশপদ্ধতি বা আকৃতিবিষয়ক তত্ত্বানুধাবন ব্যতীত অপর কিছুই নহে। Simplicity, Sincerity, Truth প্রভৃতি সপ্ততত্ত্ব সর্ব্বশিল্পের সাধনপদ্ধতিরূপেই উক্ত গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। রাস্কিনের Modern Painters গ্রন্থও এদিকে সবিশেষ অগ্রসর নহে। ভিকতর কুঁজ্যার Lectures on the True, Beautiful and the Good গ্রন্থও কেবল অবান্তরভাবেই সাহিত্যের তত্ত্বপ্রকোষ্ঠে আলোকপাত করিতে গিয়াছে। টলষ্টয়ের What is Artও 'সাহিত্যের আকৃতি' বিশেষতঃ সাহিত্যে সহৃদয়তার ধর্ম্মনিরূপণেই চেষ্টা করিয়াছে। পস্‌নেটের Comparative Literature ও Lylyর Comparative Literature প্রভৃতি গ্রন্থও নিদানতঃ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিস্থান হইতেই সাহিত্যের কেবল আকৃতিগত অভিব্যক্তি দর্শন করিতেই লক্ষ্য রাখিয়াছে। নেলসন্ ও মৌল্টন কি ব্রুণেটিকর প্রভৃতি সাহিত্যদার্শনিকও আকৃতি-

বিচারের বাহিরে সবিশেষ অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া মনে করিতে পারি না। এতদ্ভিন্ন এড্‌মণ্ডগস্‌ ও সাইমন্‌স প্রভৃতি সাহিত্যের সমালোচকগণ বা ডাওডেন ও ষ্টপ্‌-ফোর্ড্‌ ব্রুক প্রভৃতি কবিজীবনীর অনুচিন্তকগণও কেবল উপস্থিত মতে কবিগণের মনস্তত্ত্বে ও তাঁহাদের কাব্যের সমাধান-তত্ত্বে দৃষ্টিপাত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। কেহই একটা স্বাত্মনিষ্ঠ সাহিত্যদর্শন খাড়া করিতে প্রচেষ্টা করেন নাই।

'সাহিত্যের আত্মা কি'—এই জিজ্ঞাসা সচেতনভাবে পরিচালিত করিলে, জীবমনের জ্ঞান-ভাব-ক্রিয়াতত্ত্বের চরমস্থানে গিয়া এই জিজ্ঞাসাকে দাঁড় করাইলে, উহা হইতে যেই সিদ্ধান্ত নির্গলিত হইবে তাহা হইতে স্বতঃসিদ্ধভাবে অনুভাবনার পথে চলিয়া আসিলেই যে সাহিত্যের একটা স্বতন্ত্র কলাশাস্ত্র আত্মপ্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক দাঁড়াইতে পারে ইহা প্রথম দৃষ্টিতেই অনুমান করা যায়। কেননা দর্শনক্ষেত্রের সকল বিদ্যা বা System এর সকল 'প্রতিপত্তি' প্রকৃত প্রস্তাবে এ পথেই দাঁড়াইয়াছে বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয়। পরন্তু, চরমদৃষ্টিবিজ্ঞান ব্যতীত মানুষের কোন আদর্শের 'তত্ত্ব'ই পরিস্ফুট হইবে না ; সমাজ, ধর্ম্ম, সাহিত্য প্রভৃতি কোন বস্তুব্যাপারের আত্মা বা লক্ষ্য নিরূপণ করা যাইবে না ; কোন Faith বাদ, Commandment বাদ, Inspiration, Scripture বা বহিরাগত কোন Authorityর শক্তিই এ ক্ষেত্রে পর্য্যাপ্ত নহে। বিজ্ঞানস্থান ব্যতীত এবং উহা হইতে দৃষ্টিপাত ব্যতীত এ সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তমাত্রই কেবল Formal, Jejune, বক্তার 'আপ্‌খেয়ালী' এবং A posteriori হইতে বাধ্য।

আবার 'সাহিত্যের আত্মা কি' এই জিজ্ঞাসা অন্ততঃ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে উঠিলেই ভারতীয় মনীষা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সর্ব্বাগ্রে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিবে "এই বিশ্বসৃষ্টির আত্মা কি ?" যে জীবের মননভূমিতে, ইচ্ছা-জ্ঞান-ভাববৃত্তির ভূমিতে সাহিত্যবস্তু দাঁড়াইয়াছে সেই জীবের আত্মা কি ? উহার পরেই ত 'সাহিত্যের আত্মা' নিরূপিত হইতে পারে! জীবনের চরম লক্ষ্য কি ? তোমার এই শাস্ত্রেরও চরম অর্থযোগ্যতা

আছে কি? এরূপ প্রশ্নের মীমাংসা ব্যতীত, শাস্ত্রের চরম-প্রয়োজন-বিজ্ঞপ্তি ব্যতীত ভারতের ক্ষেত্রে কোন শাস্ত্রই দাঁড়াইতে পারে না। এক কথায় Metaphysics ক্ষেত্রের 'চরম জিজ্ঞাসা' ব্যতীত ভারতীয় দৃষ্টিতে ধর্ম্ম, সমাজ, পরিবার কিংবা সাহিত্যক্ষেত্রেও কোন তত্ত্বনিরূপণই দাঁড়ায় না।

এদিকে মানবজগতের ধর্ম্ম, সমাজ বা সাহিত্যের তত্ত্বদর্শনক্ষেত্রে, মানবজাতির পরিবারতন্ত্র ও ব্যক্তিগত জীবনযাপনের আদর্শদৃষ্টির তরফে অদ্বৈতবাদী বৈদিকঋষির যে দর্শনস্থান ও সিদ্ধান্ত আছে, তাহা পৃথিবীতে সর্ব্বতোভাবে অনুপম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। আর্য্য ঋষি 'এক' তত্ত্ব হইতেই এই বিশ্বসংসারকে, বিশ্বের জীব ও জগৎকে দর্শন করিয়াছেন এবং সেই 'তৎ'বস্তুর ও 'তৎ'লক্ষ্যের সাধনস্বরূপে উপন্যস্ত করিয়াই উক্ত সকল ক্ষেত্রে মানবতার আদর্শ নিরূপণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষেই সৃষ্টির এককারণ, ব্রহ্ম বা ধর্ম্মবিষয়ে, ফলতঃ সকল মানবিক প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের আত্মা এবং মূল লক্ষ্য বিষয়ে একটা 'জিজ্ঞাসা'বাদ আছে; এ সমস্ত বিষয়ে মনুষ্যমনের সর্ব্বাগ্রসচেতন জিজ্ঞাসা ও সিদ্ধান্তদর্শন ভারতবর্ষেই ঘটিয়াছিল। আর্য্যমন বিনা জিজ্ঞাসায় কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিতে চায় নাই; স্মরণাতীত কাল হইতে আর্য্যমতিগতির উহাই প্রধান লক্ষণ। শ্রুতির 'এক কারণ' বাদ বা ব্রহ্মবাদকে মানুষের তর্ক-যুক্তিবিচার পথে বুঝিবার জন্য 'নাছোড়বান্দাভাবে' 'জিজ্ঞাসা' করিয়াই বেদান্তদর্শনের উৎপত্তি। কোন প্রকার Authority বা Commandment বাদ, অপৌরুষেয়তার প্রপত্তি কিংবা নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের নির্ভরে আর্য্যমতি কিছুমাত্র গ্রহণ করে নাই। এ কথা না বুঝিলে 'ভারতের আত্মা' বা Indian Culture বলিয়া কথাটার মূল লক্ষণটাই দৃষ্টিচ্যুত হইবে। বিশ্বমানবের সমক্ষে ভারতের প্রকৃত Message এ স্থলে! ভারত 'এক'তত্ত্ব হইতে সমাগত ভাবে দেখিয়া এবং সেই দৃষ্টিস্থানে দাঁড়াইয়াই জাগতিক সমস্ত প্রশ্নজিজ্ঞাসার মীমাংসা করিতে চায়। 'তৎ'জিজ্ঞাসা এবং অদ্বৈতসিদ্ধান্তই সমস্তের মূল। জগতের কোন

প্রাচীন জাতিই এ দৃষ্টিস্থান যে পায় নাই তাহা আর চিন্তাশীল ব্যক্তিকে দেখাইয়া দিতে হয় না। শ্রৌত ঋষিগণের অদ্বৈতসিদ্ধান্ত পরবর্ত্তী দর্শন-সূত্র ও ভাষ্যাদিতে এমন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নির্ম্মথিত ও ব্যাখাত হইয়াছে যে অদ্বৈতানুজীবী কোন সিদ্ধান্তের মোটামোটি নির্দ্দেশ মাত্র করিয়া আমরা নিবিষ্টতর জিজ্ঞাসুব্যক্তিকে (তাঁহার কোন সংশয় স্থলে) সেদিক্ দেখাইয়াই নিবৃত্ত হইতে পারি। ফলতঃ, অদ্বৈতদর্শন শাস্ত্রের উপর বরাত দিয়া আমরা সাহিত্যাত্মা বিচারের ক্ষেত্রেও ন্যূনাধিক নিশ্চিন্ত হইতে পারি। আদৌ অদ্বৈতের বিজ্ঞান ও উহাকে জীবস্থান হইতে এবং ব্যবহারিক বুদ্ধিতে সৎ-চিৎ-আনন্দরূপে এবং ঈশ্বররূপে দর্শন; তাহার পর জীবের ধর্ম্মনিরূপণ অর্থাৎ জীবমাত্রের পক্ষে তাহার 'সনাতন ধর্ম্ম'নির্ণয়, পরে দেশকালে নামিয়া পুনর্ব্বার মানুষের সমাজ, ধর্ম্ম, পরিবার ও ব্যক্তিগত ধর্ম্ম ও পরিবর্ত্তনশীল 'ধর্ম্মাচার'-আদর্শের নিরূপণ; উহার পর আবার, ওই ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাচারবার্ত্তা হইতে যাহাতে "স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ" তদনুরূপ করিয়া অদ্বৈতসাধন পদ্ধতিকে 'ধর্ম্মশাস্ত্র'রূপে প্রবর্ত্তন। এ সমস্তে যথাযথ দৃষ্টি এবং বিচারই ভারতীয় মনীষা ও জিজ্ঞাসার গতি এবং ভারতীয় কর্ষণার স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারে।

চরম সচ্চিদানন্দের সেই আনন্দধর্ম্ম হইতে সমাগত জীবের Emotionই যে কাব্যের প্রাণ, মানুষের 'জ্ঞান' কিংবা 'ইচ্ছা'বৃত্তির ধর্ম্ম কাব্যাদর্শে যে মুখ্য নহে প্রাচীন ঋষি মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিস্থান হইতে সর্ব্বাগ্রে উহা দর্শন এবং নিরূপণ করেন। কাব্যতত্ত্ববিষয়ে ভারতীয়ের সেই আদিম সিদ্ধান্ত দীর্ঘকাল অলিখিত অবস্থাতেই যে চলিয়া আসিতেছিল, তাহাই যে পরে পরে ভরত মুনির নামে প্রচলিত কাব্য (নাট্য) শাস্ত্রে কাব্যের 'আত্মা'রূপে নিরূপিত হইয়াছে, এদিকের প্রত্ন-গবেষক পণ্ডিতগণ তাহাই নির্দ্ধারণ করিতেছেন। অগ্নিপুরাণে এবং বাল্মীকি-রামায়ণের ভূমিকাংশেও উহারই সমর্থনা আছে। তদনুসারে, জীবের ভাববৃত্তিকে মুখ্য করিয়া, 'রস'কেই কাব্যের জীবিত (অগ্নিপুরাণ) রূপে এবং 'রসনিষ্পত্তি'কেই (ভরত) কাব্যের প্রধান লক্ষ্যরূপে উপন্যস্ত

করা হইয়াছে; তদনুসারে 'আদিকবি'ও তাঁহার 'মহাকাব্য'কে শৃঙ্গার বীরকরুণাদি সর্ব্বরসের প্রয়োগ-সংসিদ্ধ কাব্য'কৃতি'রূপেই সহৃদয়গণের সংবেদনসমক্ষে উপস্থিত করিতেছেন।

এখন, প্রাচীন ভারতে কাব্যের আত্মভূত এই 'রস'আদর্শ শ্রুতির অদ্বৈতবাদী বা 'এক'তত্ত্বদর্শী ঋষির শিষ্যতাপথেই যে অনুদৃষ্ট হইয়াছিল তাহাই বুঝিতে হয় এবং সৌভাগ্যক্রমে এ বিষয়ে সাহিত্যে 'রস'বাদের প্রত্নানুসন্ধানী প্রাচীন বা আধুনিক সর্ব্বপণ্ডিত সে সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিতেছেন। শ্রুতিতে তত্ত্বজিজ্ঞাসু ঋষি যে চরমতত্ত্বকে এক এবং অখণ্ড 'আনন্দ'রূপে দেখিয়াছিলেন; ভৃগুবারুণীসংবাদে "আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ' রূপে যেই চরম সিদ্ধান্ত আমাদের হাতে আসিতেছে এবং অপরাপর শ্রুতির "আনন্দাদেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং ব্রজন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ব্রহ্ম, 'কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ', 'রসোবৈ সঃ' প্রভৃতি বার্ত্তা জগতের চরমতত্ত্বজিজ্ঞাসুগণের সম্প্রাপ্ত সিদ্ধান্তকেই বাক্যের মুষ্টিনিবদ্ধ করিতেছে। তারপর, উহার সঙ্গে সঙ্গে বা মনস্তত্ত্বের বিভিন্নদিক্ হইতে ঋষিগণ যে সেই এক বস্তুকে কেহ 'সৎ' রূপে (আরুণি), কেহ বা 'প্রজ্ঞান'রূপে (বহ্বৃচঃ) কেহ বা 'আনন্দ'রূপে (সনৎকুমার) জোর দিয়া উহার বিভক্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এরূপে ঋষিগণের সেই অদ্বৈতবস্তুই যে দ্বৈবস্থানে আসিয়া 'সৎ-চিৎ-আনন্দ'রূপে দাঁড়াইয়াছে; 'ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং সচ্চিদানন্দরূপম্' প্রভৃতি কথা আমাদের সমক্ষে ঋষি-সিদ্ধান্তকে 'হস্তামলক' রূপেই যে উপস্থিত করিতেছে; ঋষি বাদরায়ণ যে শ্রুতির সেই আর্ষসিদ্ধান্তকে প্রতিপাদন করিয়া তাহার 'বেদান্ত-সূত্র' সংগ্রথিত করিয়াছেন; শঙ্কর প্রভৃতি মনীষিগণ নানাভাষ্যে, টীকাটীপ্পনীতে এবং কুশাগ্রীয় বুদ্ধির তর্কযুক্তিতে উহারই যে সমর্থন করিতেছেন, উহা যে ভারতীয় আর্য্যের তত্ত্বজিজ্ঞাসার চরম কথা, সমগ্র আর্য্যভারতের কর্ম্মজীবন ও অধ্যাত্মজীবন যে উহার দ্বারাই ধর্ম্মিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা গবেষক ব্যক্তিমাত্রেরই স্বীকার্য্য কথারূপে নির্দ্দেশ করা যায়।

জীবনের ও জগতের আনন্দাত্মকতা এবং কাব্যের রসাত্মকতারূপী সিদ্ধান্ত ভারতের ক্ষেত্রে অন্ততঃ 'তিন সহস্র বৎসরের প্রাচীন' বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতে পারি। এতদ্দেশের তত্ত্ববিদ্‌গণ দেখিয়াছেন, সাহিত্য আত্মার আনন্দব্যাপার। সেই 'আনন্দ'তত্ত্ব হইতে বিপুল বিশ্বসৃষ্টি অনন্ত দেশে ও কালে লীলায়িত হইয়া চলিয়াছে সেই 'আনন্দ'বস্তুর প্রত্যাবেশ হইতেই সাহিত্যের উদ্ভব। অতএব জীবাত্মার নিত্যধর্ম্ম হইতেই একটা নিত্যপ্রেরণা জীবলোকে সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছে; দেশ, কাল, জাতি বা পাত্রের কোন সীমাসঙ্কীর্ণতা এজন্য সাহিত্যপ্রেরণাকে ক্ষুণ্ণ করিতেছে না। প্রাগৈতিহাসিক যুগে হিমক্লিষ্ট ইয়োরোপের গিরিকন্দরবাসী আদিম মানব যেই প্রাথমিক আনন্দপ্রেরণা বা শিল্প-প্রেরণাবশে গুহার পাষাণপ্রাচীরে (ইয়োরোপে বহুকাল-বিলুপ্ত) অতিকায় হস্তীর ছবি অঙ্কিত করিয়া রাখে, সে প্রেরণাবশেই প্রিয়তমার উদ্দেশে প্রেমবিজ্ঞাপনপূর্ব্বক হৃদয়কে ভাবপথে ও ভাষামুখে অবারিত করিতেও চেষ্টা করিয়াছে। সাহিত্যের আদিম রচনাচেষ্টা সেই সঙ্গেসঙ্গে সে কালেও যে চলিয়াছিল তাহা ত আমরা নির্ভয়েই ধরিয়া লইতে পারি যেই স্থানে মানব, সে স্থানেই মানবহৃদয় ও হৃদয়ের ভাবাকুলতা ও 'প্রকাশ বেদনা', সে স্থানেই ভাষাপথে হৃদয়ের শোকদুঃখ ও আনন্দকে পরিব্যক্তি-দানের প্রচেষ্টা, সে স্থানেই আদিম সাহিত্য। জ্ঞানকর্ম্ম ও ভাবের ক্ষেত্রে মানুষের শিল্পবুদ্ধির ক্রমবিকাশ তাহার ভাবানন্দের প্রকাশতন্ত্রকে ক্রমোন্নীত করিয়েছে ব্যতীত আর কিছুই নহে। জীবাত্মা আত্মপ্রকাশ করিয়া এবং সে পথে আনন্দ দান করিয়াই আনন্দকে লাভ করিতে চায়—উহা হইতেই সাহিত্যশিল্পের ও মানবক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রকার ললিতকলার সৃষ্টি এবং পরিণতি। আত্মপ্রকাশের ও ন্যূনাধিক নিঃস্বার্থ ভাবুকতার একটা দানানন্দ! এ স্থলেই সাহিত্যিক 'রস' এবং সাহিত্যিক রসানন্দ ও সাহিত্যসৃষ্টির মূল।

সুতরাং এক্ষেত্রে অদ্বৈতদর্শনের ও সাহিত্যদর্শনের মধ্যে যাহা সাধারণ সিদ্ধান্ত-বিষয় তাহাকে বক্ষ্যমাণরূপে নির্দ্দেশ করিব। (১)

সর্ব্বপ্রথম 'ওঁ তৎ'—উহাই জগতের আদি কারণ ও চরম লক্ষ্য; (২) জীবস্থান হইতে উহাই ব্রহ্মের বিবর্ত্তভূত ও মায়াধিষ্ঠিত 'সচ্চিদানন্দ শিব'; (৩) উহাকে প্রাপ্তির বা জীবের জীবনসাধনার একমাত্র পথ 'ধর্ম্ম' এবং এই ধর্ম্মের মূলপ্রকৃতি 'সংযম'; (৪) ধর্ম্মপ্রণালীতে জীবের প্রকৃতিগত 'অধিকার' ভেদ।

এই চতুষ্টয় প্রতিপত্তিকে যেমন ভারতীয় বেদান্ত দর্শনের, তেমন তদনুগত ধর্ম্ম, সমাজ, পরিবার, রাষ্ট্র বা সাহিত্যের এবঞ্চ জীবের জ্ঞানভাবকর্ম্মগত যাবতীয় 'সম্পত্তি'র প্রধান অধিপতি লক্ষণরূপে এবং ভারতীয় Culture নামক ব্যাপারের চরম সংপ্রাপ্তিরূপেই নির্দ্দেশ করিব। সর্ব্বত্র ন্যূনাধিক তদনুগতভাবেই কাব্যের আত্মভূত 'রস'নিরূপণ—রসের ধ্বনি, গুণ, রীতি ও অলঙ্কার-নিরূপণ; তদনুগত ভাবেই রস-পরিব্যক্তির স্বধর্ম্মনিরূপণ; রসানুভাবক 'অধিকারী' বা 'সহৃদয়'নিরূপণ। প্রাচীন সাহিত্যদার্শনিক অভিনবগুপ্ত ও বামন প্রভৃতি তদনুসারে 'অধিকার নিরূপণে' বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

তবে সাহিত্যের এই 'রস'আদর্শ যে বেদপন্থী ঋষিসিদ্ধান্তের অনুবর্ত্তী এদেশের প্রাচীন সাহিত্যদার্শনিকগণের মধ্যে তাহার নির্দ্দেশমাত্র অনুভব করা যায়; পরন্তু এবিষয়ে তাঁহারা উক্ত সিদ্ধান্তকে এবং উহার স্বতঃসম্ভবী অভিব্যক্তিকে অনুসরণ করিয়া সবিশেষ বিস্তারিত কোন আলোচনা করেন নাই। বেদপন্থীর দেশে তৎকালে উহা একটা সাধারণ প্রতিপত্তিরূপে দাঁড়াইয়াছিল বলিয়াই হয়ত সে আলোচনা করেন নাই। কিন্তু একালে আমরা বহুমতবাদের সঙ্করতায় বিমিশ্র এবং জটিলতায় সমাকীর্ণ একটা অবস্থাতেই দাঁড়াইয়াছি। 'সচ্চিদানন্দ'বাদ অনেকের—অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিরও—সচেতন ধারণাস্থান হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে। অতএব একালে, অন্ততঃ সাহিত্যের ক্ষেত্রে, ভারতীয় আর্য্যের সেই পরম সিদ্ধান্ত-প্রাপ্তিকে একালের অনুগতভাবেই আবার 'ঢালিয়া বুঝিতে' হইতেছে; একারণে, সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রেও, অদ্বৈতপ্রতিপত্তিকে সাধারণভাবে অন্ততঃ পাঁচটা প্রসঙ্গে চিন্তা করা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইবে।

বিশেষতঃ একালে সাহিত্যক্ষেত্রে Mysticism বলিয়া একটা 'সাহিত্য-রীতি' পরম মুখরতা লাভ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। উহাকে যথাযথভাবে বুঝিতে গেলেই দেখা যাইবে যে, অধ্যাত্মবাদীর অদ্বৈতসিদ্ধান্তই প্রকৃত প্রস্তাবে সর্ব্বসাহিত্যের সকল Mysticismএর মূল ভিত্তি। এদিকে কেবল Intellectual Mysticism বা Mystification নামক একটি বিভ্রান্ত প্রকারভেদই যে নানারূপ ভ্রমবাহুল্যের প্রধান কারণ তাহা বুঝিতে গেলেও অদ্বৈততত্ত্বসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত আলোচনা অপরিহার্য্য হইবে।

ফলতঃ সর্ব্বসাহিত্যের 'আত্মা'স্বরূপ এই সচ্চিদানন্দ 'রস'তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার অর্থই একদিকে যেমন সাহিত্যক্ষেত্রের 'প্রেম' 'রূপ' 'আনন্দ' প্রভৃতি কথার যোগার্থদর্শন, তেমন উহার মধ্যেই সকল সাহিত্যসেবীর চরম আদর্শসমস্যার সমাধান—তাঁহাদের পক্ষে একেবারে 'বাঁচন মরণের সমস্যা'টুকুরই সমাধান। অন্যদিকে, উক্ত সমাধানপথে যে কেবল একটা Philosophy of Literary Art দাঁড়াইতে পারে তাহা নহে, সেই সঙ্গে এতদ্দেশের বা সকল দেশের জীবনসাধকের চরম লক্ষ্যসমস্যার সমাধানেও আলোকপাত ঘটিতে পারে।

জগতের আদিকারণ ও জীবনের চরম লক্ষ্যকে 'সচ্চিদানন্দ'রূপে নিরূপণ – বা "অস্তি ভাতি প্রিয়ং ব্রহ্ম, নামরূপমিদং জগৎ" রূপে নির্দ্ধারণ! ইহা আপাততঃ একটা ক্ষুদ্র কথা। কিন্তু যাঁহারা জগতের ও জীবনের প্রকৃত সমস্যাচিন্তক ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু দার্শনিক, তাঁহারা দেখিবেন, উক্ত নির্ণীতার্থের উপরে ভিত্তি করিয়া যেই Metaphysics, যেই Psychology, যেই Ethics বা যে Aesthetics দাঁড়াইয়াছে তাহার ফল, বল বা মূল্য কি? এক্ষেত্রে জগতের অপর তাবৎ 'একতত্ত্ব'বাদী কিংবা Idealist দার্শনিকগণের সঙ্গে, স্পীনোজা, কাণ্ট্, ফিক্‌টে, শেলীং, সোপেনহর্ বা হেগেলের সঙ্গে বা আধুনিক কালের ক্রশে প্রভৃতির সঙ্গে আর্য্য-দৃষ্টিস্থানের পার্থক্য কোথায়? সে বিষয়ে মুখ্যভাবে চিন্তা করা 'সাহিত্যদর্শন' গ্রন্থের আমল নহে। কেবল এই 'অদ্বৈত'-আদর্শের

ছায়াজীবী ভারতীয় সাহিত্যিক কর্ষণার স্বরূপ বুঝিতে গিয়া এতদ্দেশের সমাজতন্ত্রে ও ধর্ম্মতন্ত্রে এই 'সচ্চিদানন্দ তৎ' বাদের ফল স্থানে স্থানে ন্যূনাধিক অবান্তরভাবে চিন্তা করাই অপরিহার্য্য হইবে।

তবে, রসের স্বরূপবিষয়ে এস্থানে সবিশেষে বুঝিতে হইবে, সংস্কৃতে 'কাব্য' ও 'সাহিত্য' সংজ্ঞা অভিন্নার্থে ব্যবহৃত; সম্পূর্ণ বেদান্তানুগত-ভাবে ও জগতের চরমতত্ত্বদর্শী এবং 'পরমাত্ম'বাদী ঋষির শিষ্যতানুক্রমেই এতদ্দেশের সাহিত্যদার্শনিকগণ কাব্যের এই 'রসাত্মা' তত্ত্ব দর্শন করেন। স্থতরাং কাব্যের 'রস'বস্তুও প্রকৃত প্রস্তাবে 'অনির্ব্বচনীয়'; উহা চরমের "রসো বৈ সঃ" বস্তুর বা শাশ্বত রসস্বরূপের ছায়াবহ বলিয়াই অনির্ব্বাচ্য পদার্থ। দীর্ঘকাল অনুশীলনাভ্যাসে এবং প্রাণের অগ্রবুদ্ধির ধৃতিযোগেই উহাকে স্বরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। 'রস' যখন কাব্যের 'আত্মা', তখন নিখিলের 'আত্মা'বস্তুর মতই ত উহা অনির্ব্বাচ্য হইবে! দেহালম্বনে যেমন আত্মার অভিব্যক্তি, তেমনি কাব্যের বাক্য এবং বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবাদির 'আকৃতি' পথেই রসের অভিব্যক্তি বা রসধ্বনি। যেমন, ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের Solitary Reaper কবিতার 'আত্মা'। উক্ত কাব্যের পাঠফলে করুণাত্মক শান্তরসের একটা 'আস্বাদ' সকল সহৃদয়ের হৃদয়ে স্থায়ী ভাবে দাঁড়াইয়া যায়। Solitary Reaper উচ্চারণমাত্র এই যে 'আস্বাদ' মনে জাগে, তখন ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের কোন 'বাক্য' মনে নাই, সেই 'একাকিনী'র ক্রিয়াকর্ম্মের কোন ধারণাও নাই, কেবল ওই 'আস্বাদরূপী' 'আনন্দ'টাই জাগিতেছে। রসদার্শনিক বলিবেন, ঐ আনন্দ স্থতরাং লৌকিক বস্তুর সম্পর্কবিরহিত, অতএব 'অলৌকিক'। কাব্যটির বিভাব-অনুভাব আদির দ্বারা অভিব্যঞ্জিত হইলেও আমার প্রাণস্থানে উহা কেবল নিরাবিল ও অন্তসম্পর্কবিরহিত রসানন্দটুকুই রাখিয়া গিয়াছে, স্থতরাং ঐ আনন্দ 'বিগলিত বেদ্যান্তর' বা 'বেদান্তরস্পর্শশূন্য', অতএব 'অখণ্ড'। উহা 'সৎ' ও 'সত্ত্বময়'; উহা অজড় চিৎমাত্রে পর্য্যবসিত, স্থতরাং 'চিন্ময়' আনন্দ। এরূপেই উহা অজড় 'সচ্চিদানন্দ' তত্ত্বের ছায়ারূহ, অতএব 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর'

এই অতিসূক্ষ্ম 'রসানন্দ'টুকুই সুতরাং Solitary Reaper কবিতার 'আত্মা'। জ্ঞানভাব-ইচ্ছাময় জীবের Emotion তত্ত্বের মধ্যেই কাব্যের আত্মাকে মুখ্যভাবে খুঁজিতে হয়—যে অবস্থায় কাব্যের বিভাব অনুভাব বা কাব্যের নামরূপ বিলীন হইয়া যায়, কেবল সচ্চিদানন্দের 'আস্বাদ সহোদর' রসবোধটুকুই হৃদয়ে জাগরূক থাকে।

সেইরূপ শেলীর Skylark কাব্যের মধ্যেও চিত্তের উৎপ্রাবকর একটা উল্লাস—আলঙ্কারিকের ভাষায় যাহা চিত্তচমৎকারকারী 'অদ্ভুত' রসের 'আস্বাদ'। রোমান্টিক সাহিত্যদার্শনিকগণ যাহাকে Adding strangeness to Beauty বলিয়াছেন, ওয়াট্‌স্ দান্তন যাহাকে Renaisance of Wonder রূপে দেখিয়াছেন, আলঙ্কারিক নারায়ণ যাহাকে সর্ব্বরসের সারভূত 'অদ্ভুত'রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বৈষ্ণব রসিকগণ যাহাকে চিত্তবিস্ফারকারী 'বিস্ময়'রূপে লক্ষ্য করিয়াছেন, শেলীর Skylarkএর চমৎকারিতার মধ্যে সেই 'অদ্ভুত' আস্বাদেরই স্বরূপ। এইরূপে Ode to West Wind, ওথেলো শকুন্তলা প্রভৃতি বড় বড় কাব্যের সর্ব্বভাব ও বিভাবাদির প্রাণঘন অপিচ কেন্দ্রীভূত একটা 'আস্বাদ' রূপী 'রসাত্মা' আছে, যাহা কাব্যের সমস্ত আকৃতি-প্রকৃতির দ্বারা ধ্বনিত স্থায়ী ভাবরূপে দাঁড়াইয়া যায়, অথচ অনন্তসুলভ ও অনন্তসম্ভব। এখানে দাঁড়াইয়া বলিতে পারা যায়, এই রসাত্মা টুকুই কবিপ্রাণে মহাভাবরূপে ও আদিম তত্ত্বরূপে ছিল; প্রকটভাবে উহা হয়ত Emotionalised thought বা Intellectualised emotion. ওয়ার্ডসোয়ার্থের কথায় উহাকে feeling recollected in tranquillity বলিলে বা কবি পো'র কথায় An elevating excitement of the soul বলিলে হয়ত কাছাকাছি আসে। আরও প্রকটীভাবে আসিয়া উহাই হয়ত কাব্যবস্তু ও বাক্যার্থের সংঘাতমধ্যে Concretized হইয়া যায়; কিন্তু রস মূলতঃ অবর্ণনীয় এবং কেবল "সহৃদয় হৃদয় সংবেদ্য" বলিলেই যথার্থ হয়।

ভারতের বৈয়াকরণগণ শব্দের আত্মা বিচার করিতে করিতে যেমন পরিশেষে 'স্ফোট' তত্ত্বে উপনীত হন, সাহিত্য-দার্শনিকগণও 'কাব্যের আত্মা' বিচার পথে 'রস'তত্ত্বে উপস্থিত হইয়াছেন। শব্দের বিলয়স্থানে যে তত্ত্বের আভাস পাইতেছি, কাব্যের শব্দার্থজনিত 'ভাললাগা'র মূলেও সে তত্ত্বই দাঁড়াইয়া আছে; চাপিয়া ধরিতে জানিলে জগতের প্রত্যেক বস্তু সে তত্ত্বেই লইয়া যাইতে পারে। ইহা জগতের দ্বারে অদ্বৈতবাদীর পরম বার্ত্তা।

কবিপ্রতিভা রসের সত্যকে দর্শন করে, সত্যকে কাব্যক্ষেত্রের নামরূপ বা বিভাবানুভাবাদির সাহায্যে প্রমূর্ত্ত করিয়া (Concretization) উপস্থাপন পথেই রসের অভিব্যক্তি বা রসধ্বনি সমাধা করে। রসের এই প্রমূর্ত্তি মধ্যে জীবমনের ত্রিমুখী বৃত্তির ক্রিয়াভিত্তি আছে, অথচ 'রস' অমূর্ত্ত পদার্থ। ঈদৃশ রসই কাব্যের 'আত্মা'। এ কথাটির অর্থ এত সূক্ষ্ম যে উহাতেই সাধারণের ধৃতিমুষ্টি এড়াইয়া যায়। বহুর অন্তঃস্থ একতত্ত্ব—ইহাই রসবোধির প্রাণ, যেমন এক 'আত্মা'ই বিশ্ব-সংসারের সকল নামরূপপ্রকাশের 'প্রাণ'। কাব্যের আকৃতিকে যেমন বহুবিমিশ্র হইয়াও ভাবতন্ত্রে এককেন্দ্র হইতে হয়, তেমন কাব্যের বিভিন্ন ভাবগুলিও একমাত্র স্থায়ী ভাবাত্মক রসধ্বনিতে আপনাদিগকে কেন্দ্রীভূত করে। এরূপে, মহাভারতের বহু ঘটনা ও অবস্থা এবং পাত্রগণের বহুভাব চরমের বোধিতে এককেন্দ্র হইয়াই পরম 'শান্ত' রূপে দাঁড়াইয়া যাইতেছে। গ্রীকদার্শনিক অরিষ্টোটল্ সে কালেই কাব্যের (বিশেষতঃ গ্রীক নাটকের) ক্ষেত্রে এই বহুমুখ একতত্ত্ব দর্শন করিয়া শ্রেষ্ঠ নাটকের আকৃতিসমাধানের মূলসূত্র Unities রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। নিখুঁত আদর্শের কাব্য বা নাটকের মাহাত্ম্য চিন্তা করিতে গেলেই এই Unity আদর্শের মূল্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। কাব্যের বহুমুখ বিভাব ও অনুভাবাদি একমুখ ও এককেন্দ্র হইয়া এই 'রসধ্বনি' সংসিদ্ধ করিতেছে—চরমে গিয়া এবং বিভক্ত করিয়া দেখিতে গেলেই যাহা 'সচ্চিদানন্দ' বা চিন্ময় আনন্দসত্তা। এই

রসবোধি জৈব প্রকৃতির স্বত্বেই বা অনাদিসিদ্ধ 'বাসনা'বশেই প্রত্যেক জীবের স্বতঃসিদ্ধ। উহা প্রত্যেক জীবের মধ্যেই ন্যূনাধিক সুষুপ্ত। কবিপ্রতিভা এই মহাবোধির উদ্বোধ পথেই সুতরাং জীবের মহাধর্ম্ম সমাধা করে। এরূপে, কেবল মানবিক কাব্যের নহে, বিশ্বকাব্যের রসবোধ এবং বিশ্বকবির সঙ্গে সমতা, আত্মীয়তা এবং আত্মতাসিদ্ধি— উহাই সাহিত্যরসিকগণের চরম প্রাপ্তি।

সাহিত্যের এই রস আদর্শের মধ্যে ক্লাসিক বা রোমান্টিকের গোঁড়ামী নাই; অথচ কাব্যের সর্ব্ব লক্ষণের জন্যই অবকাশ আছে। রসের অভিব্যক্তির জন্য একটা আকৃতির প্রয়োজন মাত্র; কোন বিশেষরূপ বা Form অপরিহার্য্য নহে। সম্পূর্ণ রোমান্টিক ভাবের কাব্য, অথচ ক্লাসিক আদর্শের আকৃতি—এরূপ সংযোগও ঘটিতে পারে। উহাই হয়ত বরণীয় হইয়া দাঁড়ায়। রসের ব্যঞ্জনা বা ধ্বনিতত্ত্ব কাব্যের সমস্ত Thought centre ও Emotionএর centre রূপে সমস্ত রোমান্টিক প্রাণবত্তাকে ধারণা করিয়া Wordsworthএর ভাষায় Spontaneous overflow of powerful feelings রূপে দাঁড়াইতে পারে।

পূর্ব্বে আভাস দিয়াছি যে, রসই যে সাহিত্যের আত্মা, এই তত্ত্বের দর্শন ও নির্দ্দেশের পর অপর কোন Theory বা কোন বিমতি ভারতীয় সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। কালে কালে অনেক মত উপন্যস্ত হইয়াছিল। কেহ 'রীতি' (বামন, ভামহ, দণ্ডী), কেহ 'বক্রোক্তি' (কুন্তল, উদ্ভট, মহিমভট্ট) কেহ 'অলঙ্কার'কেই (রুদ্রত, ভামহ) কাব্যের 'আত্মা'রূপে সমর্থন করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁহাদের কোন চেষ্টাই টিকে নাই। ভরত মুনি ও অগ্নিপুরাণাদি কর্তৃক 'সনাতন তত্ত্ব'রূপে উপন্যস্ত 'রস'কেই আনন্দবর্দ্ধন ও অভিনব গুপ্ত প্রভৃতি শক্তিশালী দার্শনিকগণ সমর্থনপূর্ব্বক বিস্তারিত গ্রন্থ রচনা করেন। অভিনব গুপ্তের 'ধ্বন্যালোক লোচন' গ্রন্থের প্রধান প্রতিপত্তি জীবের সকল কাব্যচেষ্টার আত্মাকে দর্শন। তদনুরূপে তিনি

দেখিয়াছেন "রসেনৈব সর্ব্বং জীবতি কার্য্যম্", "নিহ তচ্ছূন্যং কাব্যং কিঞ্চিদস্তি"। অতএব তিনি অলঙ্কার, রীতি ও বক্রোক্তি প্রভৃতি আদর্শকে নিরস্ত করিয়া 'রসধ্বনি'কেই সকল কাব্যচেষ্টার প্রধান উদ্দিষ্টরূপে সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। পরিশেষে মম্মট ভট্ট, বিশেষতঃ, বিশ্বনাথ পূর্ব্বগণের সমস্ত সিদ্ধান্তকে একরূপ চূড়ান্ত ভাবেই নিষ্কর্ষণ পূর্ব্বক উপন্যস্ত করিয়া গিয়াছিলেন—বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্ (১)।

কিন্তু কাব্যের এই 'রসাত্মকতা', বেদান্তানুগত ভাবে পরিদৃষ্ট হইলে এবং কাব্যের রসবস্তু যে 'সচ্চিদানন্দ' রস, অপিচ উহা যে 'সচ্চিদানন্দ-শিবসংজ্ঞিত তত্ত্ব' উহার সেই 'অর্থ' হইলে জীবের জীবনে ও জগত্তন্ত্রে যে সমস্ত উচ্চতর প্রশ্ন সমস্যা উদ্বুদ্ধ হইয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে সমাধানের অপেক্ষা করে, এ দেশের সাহিত্যে সে সমস্ত জাগ্রদ্‌ভাবে অনুচিন্তিত হয় নাই—অন্ততঃ ব্যাপক ভাবে অনুসৃত হয় নাই, তাহা স্বীকার করিতে হয়। আবার, ব্যাসবাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিকবির এবং তাঁহাদের শিষ্য কালিদাসভবভূতি আদির বাহিরে রসের এই শিবমর্ম্ম, ও তদনুবর্ত্তী জৈবধর্ম্ম যেন কবিগণের জাগ্রদ্‌বুদ্ধির সীমা হইতে নিম্নতলে পড়িয়া গিয়াছিল। বিশেষতঃ, শৃঙ্গারকেই রসের প্রধান 'প্রকাশ' রূপে ধরিয়া এক শ্রেণীর কবি ও সাহিত্যদার্শনিক যে একদিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাও অস্বীকার করার যো নাই। তদনুসারে রুদ্র ভট্টের 'শৃঙ্গার তিলক', ভোজরাজের 'শৃঙ্গার প্রকাশ', সারদা তনয়ের 'ভাবপ্রকাশ', সিংহ ভূপালের 'রসার্ণব', ভানুদত্তের 'রসমঞ্জরী' ও 'রস তরঙ্গিণী' প্রভৃতির মধ্য দিয়া erotic কবিতার, এমন কি নিছক জড়রসিক শৃঙ্গার কবিতার একটা বলবতী ধারা সংস্কৃত সাহিত্যের একাংশ পূর্ণ করিয়াছে। তাহাতে যে জীবনতন্ত্রে শৃঙ্গারের অর্থও সম্যক্ অনুচিন্তিত হয় নাই, রসের চিন্ময় আদর্শ

(১) ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের এই ইতিহাস, শ্রীযুক্ত কাণের সাহিত্যদর্পণ ভূমিকায়, বিশেষতঃ, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে রচিত Poetics (১৯২৫ সালে প্রকাশিত) গ্রন্থে সুচিন্তিত হইয়াছে।

যে অনেক স্থলে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, পরন্তু (বর্ত্তমান যুগের ন্যায়) কেবল স্বেচ্ছাচারপূর্ণ ও কামবিলাসিতার লক্ষণাক্রান্ত খণ্ডকবিতার বাড়াবাড়ি ঘটিয়া গিয়াছে তাহাও অস্বীকার করার যো নাই।

কেবল উহাই নহে, বৈদান্তিক ঋষির প্রতিপাদ্য ঐ সচ্চিদানন্দ সিদ্ধান্তের উপরে নির্ভর করিয়া, উহাকে একরূপ নির্ব্বিচারে পদভিত্তি রূপে রাখিয়া এতদ্দেশের ধর্ম্মতরফেও একটা সাংপ্রদায়িক অভিমত দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। এক শ্রেণীর কবি বা কল্পনাসর্ব্বস্ব দার্শনিক কেবল কল্পনাশক্তিকে দৌড়াইয়া 'সচ্চিদানন্দ'কে একটা 'বিগ্রহ' দান পূর্ব্বক এবং 'অখিল রসামৃত'কে, একটা ভারতীয় মনুষ্য মূর্ত্তি' দানপূর্ব্বক উহাকে বেদান্তের 'ব্রহ্মের' মাথার উপরেই স্থাপন করিয়াছেন; প্রকৃতপ্রস্তাবে একটা "মহাব্রহ্ম" বাদই প্রবল করিয়াছেন। ফলে অদ্বৈত প্রতিপত্তির উপরে একটা Deismই প্রবল করিয়াছেন। এই মূর্ত্তির দিয়াছেন তাঁহারা "কৃষ্ণ"—'উজ্জ্বল নীলমণি' বা শৃঙ্গাররসময় কৃষ্ণ। উহার মুখ্য বা গৌণ ফলে বৈদান্তিক অথচ ভক্তিপথিক প্রাচীন বৈষ্ণব ঋষিগণের 'সচ্চিদানন্দ' সাধনা কেবল যে 'উজ্জ্বল' ভাবের উপাসনা রূপে সম্প্রদায়বিশেষের Intellectual অথবা Spiritual ক্ষেত্র দাঁড়াইয়াছে এমন নহে, জীবনতন্ত্রে এবং সাহিত্যতন্ত্রেও এই 'শৃঙ্গার' রসকে নির্ব্বিশেষে জড়তার পথেই বহুদূরে গড়াইয়া নিয়াছে। স্থূলভাবে নির্দ্দেশ ব্যতীত তদ্বিষয়ে কোন বাহুল্য করা আমাদের আমল নহে।

এখন, সাহিত্যের আকৃতিপ্রকৃতির তরফে এই 'সচ্চিদানন্দ' দর্শন ও অধ্যাত্মবাদের ফল কি? উহাতে দাঁড়াইলেই জগতের সকল সমস্যা চিন্তকগণের মধ্যে একটা অপরূপ সামঞ্জস্য অপিচ একটা প্রধান ভেদও পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি দেখিবেন যে সাহিত্যের আত্মচিন্তার ক্ষেত্রে অপরিহার্য্য ভাবে দুইটি বিপরীত দিক্ হইতে মীমাংসা চেষ্টা হইয়াছে—অধ্যাত্মবাদের দিক্ হইতে ও জড়বাদের দিক্ হইতে। জগতের রহস্য বিষয়ে সচেতন সিদ্ধান্ত মাত্রকেই এ দুইটি ভাগে মোটামুটি স্থাপন করা যায়; উহার পর হয়ত

মধ্যপথিক আছেন, যাঁহারা কেবল বিচিকিৎস বা সংশয়ী। কিন্তু যেমন তত্ত্বদর্শনের ক্ষেত্রে, তেমন সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ফলতঃ প্রকাশরীতি বা আকৃতিপ্রকৃতির উক্ত দুইটি বই যে 'দিক্' নাই, সাহিত্যের 'আত্মা' চিন্তায় অবহিত হইলে তাহাই পরিস্ফুট হইবে। বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে প্রকাশরীতির ক্ষেত্রেও Realism, Naturalism, Art for Art's sake, Futurism, Vorticism, Cubism প্রভৃতিও নিদানতঃ জড়বাদী আদর্শ; যেমন সমাজ ক্ষেত্রেও Equality এবং Liberty প্রভৃতিও অনেকস্থলে জড়সর্ব্বস্ব বাহ্যদৃষ্টির ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। Romanticism কে 'উভয়চর' বলিতে পারা যায়। উহা যেমন অধ্যাত্মবাদী, তেমন অধ্যাত্মতায় সংশয়ী বা জড়বাদীও হইতে পারে। রোমান্টিক শিল্পীর মর্ম্মপ্রকৃতি চিনিয়া লওয়াই ফলতঃ সাহিত্যবিচারকের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। রোমান্টিক লেখক 'আত্মা' স্বীকার না করিতেও পারেন, কেবল 'ভাবুকতা' বা Sentiment ও Sentimentalismকেও সর্ব্বস্ব ধরিয়াই চলিতে পারেন বলিয়াই উহা কঠিন। অথচ জর্ম্মণীর আদিরোমান্টিকগণ অনেকেই যে পরকালে Spiritualist হইয়া আত্মপ্রকৃতির বশে একেবারে Catholic ধর্ম্মই গ্রহণ করিয়াছিলেন সে ব্যাপারও এ সূত্রেই বুঝিতে হয়। Personal Godএর ভক্তগণকেও 'অধ্যাত্মবাদী' বলিয়াই ধরিতে হয়—যদিও এই God হয়ত ভক্তের উপাসনারীতির ফলে, কেবল একটা জড়তত্ত্ব পুতুল বা symbol ব্যতীত অপর কোন মাহাত্ম্যেই ভক্তের অধ্যাত্মচরিত্রে দাঁড়াইতে পারে না। এসমস্ত 'ভাল' কিংবা 'মন্দ', সেরূপ কোন বিচার সাহিত্যিকের কর্ত্তব্যমধ্যে নহে; কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে কোনও শিল্পী পূরাপূরি Romantic, Beauty বাদী, বিচিত্র Colou তন্ত্রের অনুসারী অথবা Mystification রীতির সমর্থনকারী হইয়াও যে অধ্যাত্মতঃ কেবল জড়বাদী এবং আসুরিক সাহিত্যের স্রষ্টা হওয়া সম্ভবপর, তাহাও এ সূত্রে বুঝিতে হয়।

ফলে, পূর্ব্বকালে যেমন বহিস্তন্ত্র দৃষ্টিতে রীতি, বক্রোক্তি ও অলঙ্কার প্রভৃতি 'সাহিত্যের আত্মা' রূপে ভ্রম জন্মাইতে পারিয়াছিল, একালেও অনভিজ্ঞের নিকটে বিভিন্ন আকারে তাহাই ঘটিতেছে। এমন লেখকের অভাব নাই, যাঁহারা মনে করেন যে শিল্পাত্মার রসভাবগত মাহাত্ম্যের কিছুমাত্র দরকার নাই; কেবল সালঙ্কার পদবিন্যাস অপিচ বক্রোক্তিই সাহিত্যসৌন্দর্য্যের নিদান। তদনুসারে তাঁহারা প্রাণপণে, প্রতিপদে পাকচক্রী কথার আড়ম্বর করিয়াই অগ্রসর হন; স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল তন্ন তন্ন করিয়া কেবল উপমা, তুলনা ও অনুপ্রাসের আশাতেই ঘুরিতেছেন; ঐ সমস্তকে স্থানে অস্থানে, প্রাণপণে রচনার মধ্যে চালাইয়া দিতেছেন! ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থ Lyrical Ballads এর ভূমিকায় একদিকে এরূপ "Poetic Diction"-আদর্শের বিরুদ্ধেই লেখনী ধারণ করেন। এলিজাবেথ-যুগে Lily এরূপে তাঁহার Euphues গ্রন্থে দৃষ্টান্ত ও উপমানুপ্রাসবিলাসী একটা অপরূপ রচনারীতির সূত্রপাত করেন। উহাতে রচনার অর্থ বা ভাবমর্ম্মকে গৌণ করিয়া কেবল ভূষণবঙ্গিণী Euphuism নামক একটা 'রীতি' নামজাদা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাচীনকালে গৌড়দেশীয়গণের মধ্যে এজাতীয় একটা রীতি এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে উহা 'গৌড়ীয় রীতি' বা 'অক্ষর ডম্বর' নামে বিখ্যাতি লাভ করে। এ কালেও সেই প্রাচীন রোগধর্ম্ম যে পুরুষানুক্রমে আধুনিক বাঙ্গালীকে সময় সময় পাইয়া বসিতেছে তাহা অস্বীকার করার যো নাই। অনর্থক অলঙ্কার, যাহা অর্থকে ধ্বনিশক্তিকে কোন দিকে অগ্রসর করে না তেমন অলঙ্কার, অথবা কেবল 'অলঙ্কারের জন্য অলঙ্কার' ও রচনার Fantastic রীতি (প্রাচীন সমালোচক কুন্তলের কথায়) কেবল 'বৈদগ্ধ্য ভঙ্গী ভণিতি' অথবা হৃদয়মর্ম্মহীন বা রসভাববিহীন Sentimentalism—এ সমস্ত এখনও বাঙ্গালী লেখকের প্রধান রোগ-স্থান রূপেই নির্দ্দেশ করিতে পারি। ফলতঃ, যাহাতে 'রস' মূলীভূত নহে, কেবল গুণীভূত তাহা কদাপি উচ্চশ্রেণীর কাব্য নহে। অন্ততপক্ষে বুঝিতে হয়, যাহা কেবল বাস্তববর্ণনা, স্বভাবোক্তি অথবা বাক্যপারিপাট্যে

'ভাল লাগে,' তন্মধ্যেও একটা 'রসাভাস' কোন-না-কোন মতে আছে। রসাভাসের কাব্য কদাপি স্থায়ী ভাব সাধক কাব্যের সমাস্থতা অথবা সমকক্ষতায় উপনীত হইয়া জীবের 'হৃদয়'কে আকর্ষণ করিতে পারে না। এ যুগের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ রচনা কেবল Realism ও Naturalism প্রভৃতি 'রীতি'পথে বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কারধ্বনির রচনা—তৃতীয়চতুর্থ শ্রেণীর শিল্পসিদ্ধি। জীবহৃদয়ের স্থায়ী ভাব অবলম্বন করিয়' অথবা সমুচ্চ ভাবভূমিতে দাঁড়াইয়া Intellectualised Emotion সিদ্ধি ব্যতীত কদাপি সর্ব্বমানবিক সহানুভূতি লাভ করা বা সাহিত্যে Immortalityর ক্ষেত্রে উপনীত হওয়া যায় না। দৃষ্টতঃ এ আদর্শে বিচার করিয়াই, সে দিন সাময়িক পত্রে (Forward) কোন ইংরেজ সমালোচক বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, ইংলণ্ডের বর্ত্তমান সাহিত্যসেবিগণের মধ্যে দ্বাদশটী 'কাব্য'পদার্থ মিলিবে না, যাহা 'অমরতা'লাভের যোগ্য বিবেচিত হইতে পারে। আবার, সাহিত্যের এই 'সিদ্ধি'ক্ষেত্রেও প্রসিদ্ধ লেখক লাণ্ডরের একটা কথাই মনে রাখিতে হয়। তিনি Pentameron গ্রন্থে বলিতেছেন—"We may write little things well, but never will any be justly called a great Poet, unless he has treated a great subject worthily. * * All great Poetry must be substantial in subject."

কোন্ শিল্পগ্রন্থ নিত্যকালের, কোন্টা কেবল সাময়িক, কোন্টা কেবল দেশের আধুনিক রুচির খেয়াল-বশে বিরচিত, কোন্ কবি জীবজীবন ও জগতের নিত্যতত্ত্বে ও জীবের চরম পিপাসাতত্ত্বে সচেতন, কেই বা কেবল চঞ্চল 'চোরা বালি'র উপরে শিল্প-এমারত খাড়া করিয়াছেন, এ সমস্তের সুস্পষ্ট পরিজ্ঞানের উপরে যেমন সাহিত্যের সৃষ্টি ও উন্নতিতত্ত্ব নির্ভর করে, তেমন পাঠকের উপভোগরহস্য এবং বিচারবুদ্ধিও তদ্দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। অতএব সাহিত্যক্ষেত্রে, আদর্শপরিজ্ঞানের মত এমন

বৃহৎফল পদার্থ আর হইতে পারে না। বৈদেশিক সমালোচকগণের উক্ত সমস্ত বিচারসিদ্ধান্ত যে (হয়ত অতর্কিতে) 'রস'আদর্শকে মর্ম্মদেশে রাখিয়াই প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাই বুঝিতে হয়। রসের মধ্যেই জীবের ত্রিবিধ ও সৃষ্টিক্ষেত্রে ত্রিমুখে প্রকটিত মনোবৃত্তির সাম্য এবং সামঞ্জস্য আছে। জীবচিত্তের ওই ত্রিপথবাহিনী একতত্ত্ব-ধারার বার্ত্তা মনে জাগরূক রাখিয়াই অদ্বৈতবাদীর যাবতীয় জগৎবিচারপ্রণালী অগ্রসর হইয়াছে। জীবের 'চিৎ'বৃত্তি যে ত্রিমুখে মাত্র প্রকটিত হইয়া জগৎবোধের সৃষ্টি করিতেছে, আধুনিক মনোবিজ্ঞানের এই আবিষ্কৃতি সাহিত্যক্ষেত্রে গভীরসূচী ও অচিন্ত্য কল্যাণজনক হইবে। উহাকে সকল দিক্ হইতে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে, মনুষ্যের ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য কিংবা শিল্পের আদর্শবিচারের ক্ষেত্রে অনেক প্রাচীন ও আধুনিক কুসংস্কার, গোঁড়ামি এবং ভ্রান্তি নিরস্ত হইয়া যাইবে। আত্মার স্বরূপ কি, তাহা আমরা হয়ত এই জীবনে এবং এই মন লইয়া কদাপি প্রত্যক্ষ ভাবে ধারণা করিতে পারিব না। কিন্তু জীবাত্মা যেই মনোবৃত্তি পথে জৈবক্ষেত্রে কার্য্য করে তাহা বুঝিতে পারিলে (ভারতীয় সাহিত্যদার্শনিক বলিবেন) যেমন জীবের ধর্ম্মক্ষেত্রের যাবতীয় জিজ্ঞাসা ও দর্শনচেষ্টার, সকল ক্রিয়াপ্রণালীর ও সাধনপ্রণালীর 'সাধ্যতা'র সীমা স্থির হইয়া যাইবে, তেমন, সমস্ত ব্যাবহারিক ক্ষেত্রের বৃহৎবন্ধনী ও ব্যাবহারিক জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যস্থান, উহার গতি এবং সম্ভবপর প্রাপ্তিও সীমাসিদ্ধ হইয়া দাঁড়াইবে; উহাতে যেমন জীবের সমাজাদর্শের লক্ষ্য, গতি ও প্রাপ্তির প্রকৃতি নির্দ্ধারিত করিবে, তেমন তাহার মনোজীবনের সাধ্যতার সীমা, তাহার শিল্প ও সাহিত্যের লক্ষ্য, গতি বা আদর্শও উহাতেই নির্নীত হইয়া যাইবে; এবং সেই সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যের হৃদয়গত আদর্শও স্থিরীকৃত হইবে। যাহা এতকাল একরূপ অসম্ভব ছিল, যাহা লইয়া দেশে দেশে শিল্পী এবং সাহিত্যদার্শনিকগণের মধ্যেই এত বিরোধ, বিসংবাদ এবং কথার লড়াই, কর্ম্মিগণের মধ্যেই

এত ক্ষিপ্ততা, বিক্ষিপ্ততা এবং দিক্‌বিদিক্‌বিমুগ্ধ গোঁড়ামি ও ভ্রান্তি, যাহাতে সাহিত্যের আদর্শ কেবল Authority এবং জ্যেষ্ঠশ্রেষ্ঠের প্রভুত্বের উপরে নির্ভর করিতেই এত কাল বাধ্য ছিল, মনোবিজ্ঞানের এই সম্প্রাপ্তিকে অদ্বৈতবাদীর দৃষ্টিতে দেখিতে পারিলে, সে সমস্তই সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের মত অতর্কিতে অপসৃত হইয়া যাইবে। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রাচীন ও আধুনিক গোঁড়ামির এ সমস্ত মতবাদ যথা—'সত্যই সাহিত্য', 'শিবই সাহিত্য', 'সৌন্দর্য্যই সাহিত্য', 'যেই সত্য, সেই সুন্দর', 'যেই সত্য, সেই শিব', 'যেই শিব সেই 'সুন্দর', 'যেই সত্য, সেই শিব, সেই সুন্দর' প্রত্যেকটিই একদেশদর্শী বলিয়া আত্মপ্রমাণ করিবে। পরন্তু Realism ও Naturalism ইত্যাদি রীতি, 'আত্মনিষ্ঠ শিল্পকলা' (Art for Art's sake) 'সাহিত্যে স্বাস্থ্য বাদ', 'সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক আদর্শ' প্রভৃতিও নির্ব্বিশেষ গোঁয়ার্ত্তমী এবং সত্যান্ধ ও অহামিকামুখর বাহ্বাস্ফোট বলিয়াই স্বপ্রকাশ হইবে।

আবার, উহা হইতেই হৃদয়ঙ্গম হইবে, কেন বক্তৃতাশক্তি কবিত্ব নহে এবং আনাতোল ফ্রান্স্ কেন স্বজাতির অধিকাংশ কাব্যকবিতাকে নিছক গদ্যতন্ত্রের প্রবল বক্তৃতাদোষ-দুষ্ট বলিয়াই নিন্দা করিয়াছেন; যে বাণীপন্থীর 'শিবসুন্দর সত্য' প্রাণতা নাই, অন্ততঃ 'রসায়নী সত্যদৃষ্টি' নাই, রসযোগী ভাবুকতা এবং ভাবাবর্ত্তশালী মহাপ্রাণতা নাই তিনি কেন 'কবি' নহেন। যে কবির ভাষাচিত্তে ভাবযোগী চিত্রণীশক্তি লাভ করে নাই, অথবা সঙ্গীততন্ত্রের ভাবসংযোগী শব্দশক্তি আয়ত্ত করে নাই, হাজার বক্তৃতাচণ্ডী হইলেও তাহাকে 'কবির ভাষা' বলা চলে না। কোনও রচনা অসীম অর্থসামর্থ্য, অর্থগৌরব, বর্ণনাশক্তি অথবা দার্শনিকতা সিদ্ধি করিলেও কাব্য না হইতে পারে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি Poetics বা অলঙ্কারশাস্ত্র যাহা লইয়া বিশেষভাবে ব্যাপৃত ছিল তাহা সাহিত্যের কেবল 'আকৃতি' ব্যতীত আর কিছুই নহে। বাক্যের নানাবিধ প্রবৃত্তি-মুখে সাহিত্যের যেই আকৃতি (form) ও ক্রিয়াপদ্ধতি উপজাত হইতে পারে, সাহিত্যের 'আত্মা'দর্শনে তাহা

মুখ্য নহে। সেদিকে বাহুল্য করিতে গেলে এই গ্রন্থের আকৃতিও দ্বিগুণিত হইয়া পড়িত। আবার, কাব্যের Epic, Lyric, অথবা Dramatic আকৃতি (বলিতে গেলে বহিরঙ্গ আকৃতি) বিষয়ে সাহিত্যজগতে অনেক আলোচনা হইয়াছে; এতদ্ভিন্ন কাব্যের খণ্ড বাক্যবিশেষের দোষ-গুণ-অলঙ্কার-বিষয়ে বা শব্দের অবিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা প্রভৃতি বৃত্তির বিষয়ে যে সমস্ত ঘনিষ্ঠ আলোচনার গ্রন্থ এতদ্দেশে জীবিত আছে, তদনুরূপ কোন পদার্থ ইয়োরোপেও নাই বলিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিব না। কিন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থ সেদিকে পদার্পণ করে নাই। সাহিত্যের অধ্যাত্ম প্রকৃতি বা 'আত্মা' (উহার রসাত্মা) এবং উক্ত আত্মার মূলতত্ত্ব ও প্রকাশের পরিপোষক 'ধর্ম্ম' লইয়াই এ গ্রন্থে আলোচনা হইয়াছে। সাহিত্যের আত্মা-বিষয়ে যাহাই নিত্যকালের প্রশ্নসমস্যা, বিশেষতঃ একালে যুগধর্ম্মগতিকে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা আসন্ন সমস্যা, সচেতন কবি বা পাঠকমাত্রের হৃদয়ে যাহা নিত্যকাল জাগিয়া আছে এবং বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা জলন্ত হইয়াছে, জীবের আত্মাদর্শের সামঞ্জস্যে তাহারই যৎকিঞ্চিৎ সমাধানচেষ্টা এ গ্রন্থে করিয়াছি। সাহিত্যশিল্পের আত্মা ও উহার স্বতন্ত্র স্বধর্ম্ম নিরূপিত হইলেই উহা হইতে শিল্পের প্রকৃতি বিষয়ে যাবতীয় আধুনিক সমস্যা-স্থানে আলোকপাত হইতে পারে। ফলতঃ, উহার পরেই সাহিত্যের আকৃতিতন্ত্র-বিষয়ে যাবতীয় তত্ত্ব স্বতঃসম্ভবী ভাবে সমাগত হইবে।

ইয়োরোপের দর্শন ও সাহিত্যশিল্পের আদর্শের উপরে রিনেশাঁসের পর হইতে গ্রীকপ্রতিভার প্রভাবটুকুই প্রথম-দর্শনে পরিস্ফুট হয়। ইয়োরোপের দর্শনে যেমন প্লাতোর প্রভাব, তেমন সাহিত্য বা শিল্পের আদর্শেও আরিষ্টোটলের প্রভাব। আরিষ্টোটল সেকালেই গ্রীক সাহিত্যের দৃষ্টান্ত সম্মুখে রাখিয়া Epic, Lyric ও Dramatic সাহিত্যের যে আকৃতিতত্ত্ব দর্শন করিয়াছিলেন, উহাই রিনেশাঁস যুগে, ষোড়শ শতাব্দী হইতে ইয়োরোপকে প্রভাবিত করিতে থাকে। নব্য ইটালীয় পিত্রার্ক, দাঁতে ও টাসো প্রভৃতি কবির মধ্যে

এবং Vida হইতে আরম্ভ করিয়া Scaliger, Minturno ও Castel Vetro প্রভৃতি সাহিত্যদার্শনিকের মধ্যে গ্রীক আরিষ্টোটলের প্রভাবই পরিস্ফুট। পরন্তু, শেষোক্ত সমালোচকদ্বয়ের মধ্যে নাটক বিষয়ে আরিষ্টোটলের আদর্শ যে আরও অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, তাঁহারাই যে Unity of Time ও Unity of Place প্রভৃতি 'নব ক্লাসিক' আদর্শের প্রকৃত জন্মদাতা এবং তাঁহাদের আদর্শবিধিই যে পরেপরে সমগ্র ইয়োরোপের সভ্যসাহিত্যসমূহে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রভাব দেখাইয়াছে তাহা ঐতিহাসিকগণ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইটালীয় এই Renaissance Aristotalianismই ফরাসীক্ষেত্রে আসিয়া Pseudo Classicismএর জন্মদান করে এবং পরেপরে ইংলণ্ড, স্পেন, জর্ম্মনী, পর্টুগাল, হলণ্ড প্রভৃতি দেশের সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করে।

উহার পর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রবেশ হইতেই ইয়োরোপে রোমান্টিক আদর্শের অভ্যুদয়। ক্লাসিক আদর্শের মূলমন্ত্র যেমন ছিল Reason, রোমান্টিকেরও মূলমন্ত্র হইল Imagination. জর্ম্মনীতে দার্শনিক শেলীংএর শিষ্যতাপথে শ্লেগেল ও নোভালিস প্রভৃতির কাব্যে উহার আরম্ভ। উহা হইতে কোল্‌রীজ-ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের মুখে ইংলণ্ডে প্রবেশ করে (১৭৯৮); তথা হইতে আবার ফরাসী সাহিত্যের হুগো প্রভৃতির মধ্যে আসিয়া (১৮২০—৪০) তাহার চূড়ান্ত বিজয়িনী ঋদ্ধি লাভ করে। এরূপে, উভয় আদর্শের দীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষ অপিচ সংসর্গের ফলেই ইয়োরোপীয় সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত পরিস্কৃত হইয়া একটা সমন্বয়স্থান লাভ করিয়াছে এবং Imaginative Reasonই সাহিত্যের মূলপ্রকৃতিরূপে সমুদিত ও সমুজ্জ্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের বক্তব্য এই যে, Imaginative Reason সাহিত্যসৃষ্টির মর্ম্মগত ক্রিয়াপ্রণালীর উপরেই জোর দিতেছে মাত্র। অতএব উহাও সাহিত্যশিল্পের 'আত্মনিরূপণে' পর্য্যাপ্ত নহে। বলিতে পারি—

"এহো বাহ্য" এবং বস্তুতঃ একটা বহিস্তত্ত্ব-নির্দ্দেশ। এতদ্দেশের ভরতমুনি স্মরণাতীত কালেই সকল সাহিত্যশিল্পের আত্মাকে 'রস'রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে অগ্নিপুরাণধৃত এই ঋষিবাক্যটাই উহার সকল অন্ধিসন্ধি এবং সার্থকতার বিচারপূর্ব্বক বুঝিতে হয়—

"বাক্‌বৈদগ্ধী প্রধানেঽপি রস এবাত্র জীবিতম্।"

উহা অদ্বৈতবাদী ভারতীয় ঋষির বাণী। বলিতে পারি, তিন হাজার বৎসর ধরিয়া এই 'রস'বস্তু শিল্পসাহিত্যের আত্মারূপে এতদ্দেশের সচেতন কবি বা শিল্পীর সমক্ষে লক্ষ্যরূপে দাঁড়াইয়া আছে। এই ক্ষুদ্র কথাটার বাচিকার্থ ও ব্যঞ্জিতার্থ লইয়া সর্ব্ব সাহিত্যের, অপিচ সর্ব্বপ্রকার শিল্পের 'আত্মা' নিরূপণে চেষ্টা করিয়া, অধিকন্তু সেই 'আত্মবান্' সাহিত্যের আকৃতি ও প্রকৃতিতত্ত্ব এবং উহার সাধনাকে দৃষ্টিভূত করিতে চেষ্টা করিয়াই প্রকৃত Philosophy of Literary Art দাঁড়াইতে পারে। বলা বাহুল্য যে, সর্ব্ব বস্তুকে চরমের সেই 'তৎ'বস্তুর ও 'তৎ'বিজ্ঞানের সমন্বয়ে আনিয়া দৃষ্টি করাই অদ্বৈতবাদী ভারতীয় ঋষির পরম বিশেষত্ব; অতএব সাহিত্যের সর্ব্ব ব্যাপারকে, সঙ্গে সঙ্গে জীবনের ও জগতের সর্ব্বব্যাপারকেও, তৎবিজ্ঞানের সামঞ্জস্যে দৃষ্টিপূর্ব্বক জীবের সাহিত্যচেষ্টাকে চরমতত্ত্বের সহিত সমঞ্জসিতভাবে দেখিতে না পারিলে, এবং সাহিত্যরসকেও অখণ্ড 'রস'পদার্থের সহিত সঙ্গত ভাবে ধারণা করিতে না পারিলে, কোন সচেতন জীব উহাকে প্রকৃতপ্রস্তাবে বুঝিলাম বলিয়া কদাপি মনে করিতে পারে না। কেবল সাহিত্যের কেন, মানবজীবনের সকল সমস্যা-উত্তরণের সমক্ষেও এ প্রণালী অপরিহার্য্য। চরম বস্তুর ধারণার পরিমাপেই জীবনের সকল আদর্শবস্তুর ওজন। উহাকে কেবল Religion নামে একটা মনগড়া কোঠায় তালাচাবী-বন্ধ করিয়া রাখাই যে আধুনিক দৃষ্টির ভুল এবং সেটা কত বড় ভুল, তাহা এ গ্রন্থে প্রতিপন্ন হইয়াছে। আনাতোল ফ্রান্স্ হয়ত সত্যই বলিয়াছেন যে, (আমরা বলিব, খণ্ডদৃষ্টির গতিকেই) ইয়োরোপে প্রকৃতপ্রস্তাবে কোন Ethics দাঁড়াইতে পারে

নাই, প্রকৃতপ্রস্তাবে Aest hetics বা Literary Aestheticsও' পদভিত্তি লাভ করে নাই। ভারতীয় অদ্বৈতবুদ্ধি বিশ্বের সমস্তকে একতত্ত্ব হইতেই 'সমাগত'রূপে দর্শন করে এবং সেই একতত্ত্বে প্রয়াণকেই জগদ্বিবর্ত্তের চরম লক্ষ্যরূপে নিরূপণ করে। চরমতত্ত্ব (Substance) বিচার না করিয়া আধুনিকের Science বা Philologyটুকু পর্য্যন্ত হয়ত চলিতে পারে; মানবাত্মার আসন্ন ধর্ম্মসম্পর্কজাত Ethics বা Aesthetics বলিয়া কোন পদার্থ যে দাঁড়াইতে পারে না, তাহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। এজন্য এতদ্দেশের সকল শাস্ত্রচর্চ্চার প্রবেশপথেই শাস্ত্রের একটা প্রয়োজন-জিজ্ঞাসা আছে। জগতের গতি ও চরম লক্ষ্যের সঙ্গে, জ্ঞানকর্ম্ম ভাবের পথে শিল্পির জীবন ও কর্ম্মচেষ্টার যোগধারণাই শিল্পশাস্ত্রের প্রধান 'প্রয়োজন'; উহার পরেই শিল্পের আকৃতিপ্রকৃতির কথা, দাঁড়াইতে পারে। এরূপে শিল্পসাহিত্যের আদর্শ দর্শন করিতে গিয়া দর্শনক্ষেত্রে (অবান্তর ভাবে হইলেও) জীবন ও জগতের চরম লক্ষ্য ও গতি নির্দ্দেশ করা, অপিচ অদ্বৈতবুদ্ধির সঙ্গতভাবে একটা Higher Synthesis of Life উদ্দেশ্য করাও এ গ্রন্থে অপরিহার্য্য হইয়াছে।

গ্রন্থমধ্যে আধুনিক ইয়োরোপের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পদার্শনিক, ইটালীয় পণ্ডিত বেনেদেত্তো ক্রসের (Benedetto Croce) 'অভিমত'-টুকুর বিচার কোথাও সাক্ষাৎভাবে লক্ষ্য করা হয় নাই। কিন্তু আমাদের 'রস'তত্ত্ব প্রকৃত প্রস্তাবে হৃদয়ঙ্গম হইলে ক্রসে কেন, সকল বিরুদ্ধ মতবাদীর সিদ্ধান্তই স্বতঃখণ্ডিত হইয়া দাঁড়াইবে। যেমন, ক্রসে অল্প কথায় Artএর সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—Art is Intuition বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, এ সংজ্ঞাও কেবল সাহিত্য-সৃষ্টির প্রণালীটাই মুখ্যভাবে দৃষ্টিবদ্ধ করিতেছে; অতএব উহাও একটা বহিস্তন্ত্র উক্তি। দেখিতে হয়, Intuition বা অন্তঃপ্রজ্ঞা মনের একটা বৃত্তিমাত্র; উহা প্রকৃতপ্রস্তাবে জীবের 'জ্ঞান'বৃত্তিরই একটা ক্রিয়া। মনোবৃত্তি কবির মনেই ত থাকিয়া যাইবে; মধ্যমাধম

পুরুষের সঙ্গে, সংসার ও সমাজের সঙ্গে উহার কোন 'জ্ঞাতৃজ্ঞেয়' সম্বন্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা কোথায়? Intuitionএর অর্থ Intuitive expression (ক্রসে Expressionএর উপরেই জোর দেন) রূপে ধরিলেও দেখিতে হয় যে, উহার মধ্যে জীবের ভাববৃত্তির সম্পর্ক কোন দিকে মুখ্য নহে। অথচ সাহিত্য বা ললিতশিল্প মাত্রেই প্রাধান্যতঃ জীবের ভাববৃত্তির সৃষ্টি; ভাববৃত্তিই উহার একদিকে কর্ত্তা, অন্যদিক্ হইতে ভোক্তা।

ফলতঃ, আধুনিক ইয়োরোপের শিল্পদার্শনিকগণের মধ্যে ক্রসের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহার দৃষ্টি অবাস্তর বিষয় বাদ দিয়া শিল্পের আত্মতত্ত্ব ধরিবার চেষ্টা করিয়াছে; মূলতত্ত্বে পৌঁছিতে চাহিয়াছে। এ কথা ক্রসের অনুবাদক ডগলাস্ আইন্‌স্লি ভূমিকায় একস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। ক্রসের 'শিল্পতত্ত্ব' (Aesthetic) তাঁহার Complete system of Philosophy of the Spiritএর অন্তর্গত।

কিন্তু এই Spirit কি? উহার নিরূপণ অতুলনীয়ভাবে বৈদিক ঋষির পুঁজিতেই আছে। উহাই যে বিশ্বসৃষ্টির Substance এবং উহাকে যে জীবস্থান হইতে 'সচ্চিদানন্দ' ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না (শঙ্করাচার্য্যের মতে তাহাও কেবল approximation মাত্র) তাহাই বৈদিক দর্শনের বা অদ্বৈতদর্শনের সিদ্ধান্ত। সচ্চিদানন্দের পরিণাম সম্বন্ধেই যে বিশ্বের যাবতীয় 'প্রকাশ'কে, জীবের Ethics বা ধর্ম্মশাস্ত্র বা সৌন্দর্য্য শাস্ত্রের বস্তুবিষয়কে গ্রহণ করিতে হয়, তাহাও ভারতীয় ঋষির সিদ্ধান্ত। অতএব 'সচ্চিদানন্দ রস' তত্ত্বকেই সাহিত্যের 'আত্মা'রূপে এতদ্দেশের সাহিত্যদার্শনিকগণ দেখিয়া আসিয়াছেন। 'রস'কেই উহার সমস্ত অন্ধিসন্ধি এবং প্রকটমূর্ত্তিতে সর্ব্বমানবের গ্রহণীয় এবং সর্ব্বসাহিত্যের প্রাণীভূত একমাত্র তত্ত্বরূপে এ গ্রন্থে উপস্থাপিত করা যাইতেছে।

অদ্বৈতবাদ বা Monismএর দৃষ্টিস্থান হইতেই জীবের ধর্ম্ম, পরিবার, রাষ্ট্র ও সাহিত্য প্রভৃতির একবৃত্তি, একার্থতা, একধর্ম্মতা

ও একরসতা দৃষ্ট হইতে পারে। মানবজগতের দ্রষ্টা ও সচেতন পুরুষগণ, সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের শ্রেষ্ঠ কবি ও সাধুসন্তগণ হয়ত অতর্কিতে, জীবতত্ত্বের সহজসিদ্ধ সত্যবোধির পথেই উহার অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। পরন্তু 'বিশ্ব সাহিত্য' বলিয়া কোন বস্তু যদি সম্ভবপর হয়, তবে উহাকে কেবল 'রসাত্মতা'র গুণধর্ম্ম নির্ভরে দাঁড়াইয়াই যে স্বপ্রতিষ্ঠা সিদ্ধি করিতে হইবে, তাহাও সাহিত্যক্ষেত্রে অদ্বৈতবাদীর একটি প্রধান বক্তব্যরূপে উপন্যস্ত হইতে পারে।

বুঝিতে হইবে, সাহিত্যদর্শন একটা স্বতন্ত্র কলাদর্শন। চরমে বেদান্তের সঙ্গে একসত্যাত্মক হইলেও সেই 'এক সত্য' হইতেই ধারাক্রমিক ভাবে এবং Apriori ভাবে তাহার সকল সিদ্ধান্তের অবতারণা। আরিষ্টোটল হইতে আরম্ভ করিয়া একাল যাবৎ সাহিত্যক্ষেত্রের যে সকল তত্ত্বসিদ্ধান্ত ইয়োরোপে সমাদৃত হইয়াছে, তাহার প্রায় সমস্তই Empirical বা Aposteriori ভাবে অথবা কোন Authorityর উপর নির্ভর করিয়াই পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। এতদ্দেশে সেরূপ সিদ্ধান্তবাদের সবিশেষ কদর নাই। 'একতত্ত্ব' হইতে সমাগতভাবে ব্যক্তজগতের কোন সত্যকে দেখিতে না পারিলেই তাহা সন্তোষকর হয় না। সেজন্য ভারতীয় ঋষি আদৌ 'তৎ'নিরূপণ করিয়া, পরে জগতের যাবতীয় বিষয়ের 'তৎত্ব' নিরূপণ করেন। তদনুগত ভাবেই সৃষ্টির 'ধর্ম্ম'তত্ত্ব নিরূপণ; আবার সৃষ্টির ধর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াই 'মানবধর্ম্ম'—মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রধর্ম্ম এবং গুণকর্ম্ম বিভাগাশ্রিত 'বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম' নির্দ্ধারণ; এমন কি, জীবের শরীরস্থানের রোগ কিংবা অনাময় ধর্ম্মের নিরূপণ; জীবকে অনন্তপদে একটা 'লগ্ন'রূপে ধরিয়া জ্যোতিষেরও ধর্ম্মনির্দ্দেশ; এই 'ধর্ম্ম'কে Botany, Physiology প্রভৃতি প্রাকৃতিক ভূমিতে পর্য্যন্ত অনুসরণ। অদ্বৈতাশ্রয়ী এই 'ধর্ম্ম'নিরূপণা এমন ভাবে চলিয়াছে যে, মূলতত্ত্বদর্শনে ভুল না থাকিলে, এ সমস্ত ধর্ম্মনিরূপণে কুত্রাপি ভ্রম আসিতে পারে বলিলে হিন্দুমনীষা তাহা সহজে বিশ্বাস করিবে না।

মানবের দর্শনবিজ্ঞানের বা সাংসারিক প্রতিষ্ঠানের তরফে বেদপন্থীর এই 'সচ্চিদানন্দ আত্ম'বাদের ফল কি? যিনি বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত প্রকৃতপ্রস্তাবে বুঝিবেন, তিনি সর্ব্বপ্রথম দেখিবেন যে তাঁহার হস্তে ভারতবর্ষকে চিনিবার, বেদশিষ্য ভারতের হৃদয়টুকু বুঝিবার, প্রকৃত ভারতীয় কর্ষণা ও ভারতীয় সভ্যতার অন্তস্তম প্রকোষ্ঠে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিবার 'চাবি কাঠি' আসিয়া গিয়াছে! ভারতের ব্যক্তি, পরিবার সমাজ, ধর্ম্ম তথা সাহিত্যের আদর্শগত Soulটুকু ঐ একটি মাত্র মন্ত্র-বাক্যের মধ্যে অতুলনীয় ভাবে সংক্ষিপ্ত আছে! ভারতের আত্মা বেদ, বেদের আত্মা বেদান্ত, এবং বেদান্তের আত্মা অদ্বৈতবাদ। উহা এমন বিশ্বোদার ও বিশ্বোদর পদার্থ যে উহাই একটা স্বতন্ত্র Complete Philosophy of Life. হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া উহা ভারতের কোটি কোটি নরনারীর সর্ব্বপ্রকার হৃদয়স্পন্দনকে নিজের হৃদয়ে অনায়াসে ধারণ করিয়া আসিতেছে; সমগ্র পৃথিবীর অগণিত জীবাত্মার আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং ভাবুকতার 'আদর্শ স্বপ্ন'ও অনায়াসে ধারণ করিতে পারে। অদ্বৈতবাদকে যুগযোগ্য ভাবে বুঝিয়া ও গ্রহণ করিয়াই ভারতীয় সভ্যতা চলিয়া আসিয়াছে। কালে কালে মনস্বিগণ, মহাপুরুষগণ বা 'অবতার পুরুষ'গণও এই বৈদান্তিক অদ্বৈত বাদকেই 'In its new relation to the age' বুঝিয়া এবং বুঝাইয়া আসিয়াছেন। উহার 'ব্রহ্মবাদ' 'ব্রহ্ম'বস্তুর মতই বিশ্বমুখ ও বিশ্বাতিগ পদার্থ! যত বড় শক্তিশালী 'পক্ষী'ই হউক, উড়িতে গেলেই জীবাত্মা বুঝিবে কোন দিকেই অদ্বৈতাকাশের কোন সীমা পাইতেছে না।

বেদান্ত বিশ্বমানবের নিকটে ভারতবর্ষের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ ও বরিষ্ঠ সমাচার! উহা অপেক্ষা বড় কথা ভারতবর্ষ কহিতে পারে নাই, কোন জাতি বা ব্যক্তি পারে নাই; কেহ পারিয়াছে, কিংবা পারিবে বলিলেও সুতরাং এদেশের বুদ্ধি তাহা বিশ্বাস করিতে চাহে না। অদ্বৈতবাদ এতদ্দেশের তত্ত্বদর্শিগণের নিকটে এজন্য একটা 'অপৌরুষেয়'

প্রতিপত্তি। জীবের সংসার ও অধ্যাত্মক্ষেত্রে উহার ফল বিষয়ে ইয়োরোপের একজন শ্রেষ্ঠ বেদান্তপণ্ডিত ডয়সনের উক্তিই উদ্ধৃত করিব—"Vedanta in its unfalsified from, is the strongest support of pure morality, is the greatest consolation in the sufferings of life and death. Indians keep to it." (Elements of Metaphysics, p. 337.)

এই অদ্বৈতবাদ ভারতের soul; উহার বিষয়ে কোনরূপ স্রষ্টার বা দ্রষ্টার গৌরবের দাবী, অথবা কোনরূপ মৌলিকতার দাবীও ভারতের কোন ঋষি, কোন ব্যক্তি বা জাতি করিতে পারে না। ঋক্‌বেদের ঋতসূক্ত, পুরুষসূক্ত, হিরণ্যগর্ভসূক্ত বা প্রজাপতিসূক্তে স্মরণাতীত কালে যাহা 'মন্ত্র'রূপে সন্দৃষ্ট বা সম্প্রাপ্ত হইয়াছিল, আরণ্যক বা উপনিষৎ-সমূহ তাহাকে কেবল 'ব্যাখ্যা' করিয়া বুঝিতে চাহিয়াছে—এই মাত্র। এ ক্ষেত্রে উপনিষৎ-সমূহের কিংবা তদনুবর্ত্তী বাদরায়ণ ঋষির ব্রহ্মসূত্রের কিছুমাত্র মৌলিকতা নাই। যুগে যুগে ব্রাহ্মণ ও উপনিষদাদির মধ্য দিয়া, ইতিহাস কাব্য ও পুরাণতন্ত্রাদির মধ্য দিয়া, কাব্য নাটক ও খণ্ডকবিতারূপী রসচেষ্টার মধ্য দিয়া ভারতীয় মানবাত্মা ঐ অদ্বৈতবাদকেই কেবল 'ঢালিয়া বুঝিতে' চেষ্টা করিয়াছে। অদ্বৈতবাদের প্রভুতা কেহ এড়াইতে পারেন নাই; এ দেশের সংশয়ী ও বিচিকিৎসগণ পর্য্যন্ত অনিচ্ছুক বৈদান্তিক—প্রচ্ছন্নবৈদান্তিক।

এই অদ্বৈততন্ত্রী ভারতীয় সভ্যতা যুগে যুগে, তাহার অধিকারবাদের সাহায্যে ও বর্ণাশ্রম আদর্শপথে যুগধর্ম্মের 'চাহিদা'র সমতালে চলিয়া আসিতে পারিয়াছে; যেমন পঞ্চাগ্নি-বিদ্যায়, যেমন সম্বর্গবিদ্যায়, তেমন চতুর্ব্বর্গ বিদ্যার আদর্শে জীবের হৃদয়ের সকল আকুতি, আকাঙ্ক্ষা এবং আদর্শকে চূড়ান্তের সেই 'অদ্বৈত' গতিলক্ষ্যের সহিত সমঞ্জসিত করিতে চাহিয়াছে। উহাতেই, খ্রীষ্টজন্মের অন্ততঃ তিনশত বৎসর পূর্ব্বে বেদ-পন্থীর যেমন 'ধর্ম্ম' ও 'মোক্ষ'শাস্ত্র বিধিবদ্ধ হওয়ার প্রমাণ আছে, কৌটিল্য যেমন তাঁহার 'অর্থশাস্ত্র' নিরূপণ করিতে পারিয়াছেন, তেমন

'অর্থকামেভ্যো নমঃ' উচ্চারণ করিয়া বাৎসায়ণ তাঁহার 'কামশাস্ত্র'ও (পূর্ব্বানুমতে) দর্শন করিতে পারিয়াছেন।

এখন আবার এই বিংশ শতাব্দীতে, বিশ্বদরবারে, বিশ্বসাহিত্যের আদর্শনিরূপণের ক্ষেত্রে, অদ্বৈতবাদী ভারতের সেই সনাতন 'সচ্চিদানন্দ শিব' রসতত্ত্বকেই যুগোচিত ভাবে বুঝিবার ও সকল সাহিত্যসমস্যার সমাধানরূপে তাহাকে বিশ্বপরিদৃশ্যভাবে তুলিয়া ধরিবার ডাক পড়িয়াছে।

কাব্য বা শিল্পচেষ্টামাত্রেই 'সচ্চিদানন্দ' বস্তুর 'আনন্দ'জনিত সৃষ্টি এবং 'আনন্দোদ্দিষ্ট' সৃষ্টি। চূড়ান্তে জগৎ ও জীবনের চরম আনন্দ-তত্ত্বে প্রয়াণই কাব্যের গৌণ বা মুখ্য নিয়তি। সত্যশিবসুন্দরই কাব্যের চরম লক্ষ্য; ওই লক্ষ্যে, রসের চিন্ময় ধর্ম্মে হৃদয়কে লইয়া যাওয়াই 'কাব্যের স্বধর্ম্ম'। জীবের ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতির বাধ্যতা গতিকেই কাব্যের যে এই ধর্ম্ম বর্ত্তিয়াছে বা বাহির হইতে আগন্তুক হইয়াছে তাহা নহে; কাব্যের আত্মপ্রকৃতিতে যেই আনন্দ বা রস, উহার আনুগত্যেই আত্মতন্ত্র ভাবে তাহার এই 'স্বধর্ম্ম' আসিয়াছে। বলিতে পারি, কাব্য মনুষ্যের সমাজ বা ধর্ম্মনীতির কোনমতে অনুগত নহে, কিন্তু ঐ সমস্তের লক্ষ্যও 'সত্যশিব সুন্দর' বলিয়াই উহাদের ধর্ম্ম সাহিত্যের স্বধর্ম্ম-সঙ্গে অভিন্ন ভাবে দাঁড়াইয়াছে বা অভিন্ন বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে। চরম সচ্চিদানন্দের যে সমস্ত 'ভাব' ভগবদ্ভাব রূপে ভবসৃষ্টি বা ভূতসৃষ্টির মধ্যে সমাগত, যাহারা 'ধর্ম্ম ভাব' বা 'দৈবী সম্পৎ' রূপে জীবের ধর্ম্মজীবন ও সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, কাব্যের স্বরাজ্যে, তাহার ভাব ও রসের রাজ্যে তাহারাই শ্রেষ্ঠ ভাবুকতা ও রসিকতার স্বভাব রূপে দাঁড়াইতেছে; অতএব এই সমধর্ম্মতা বা সমান্তরালধর্ম্মতার গতিকেই সাহিত্যের স্বধর্ম্ম জীবের সমাজ ও ধর্ম্ম-জীবনের আদর্শের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া প্রতীতি জন্মাইতেছে। ইচ্ছা-জ্ঞান-ভাবশালী মানুষ স্বয়ং ধর্ম্মাধিকৃত জীব বলিয়া, 'Humanity is a moral thing' বলিয়াই সাহিত্যশিল্পের স্বাধীন রসতত্ত্ব যেন

Ethicsএর অনুগত বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছে। পরন্তু সাহিত্য স্বধর্ম্মেরই—আত্মানুগত্যে সচ্চিদানন্দ ধর্ম্মেরই—অনুগত।

অন্য কথায় সাহিত্যের এই স্বধর্ম্ম স্বাধীনভাবে সাহিত্যের 'আত্মা' হইতেই দাঁড়াইতেছে। সাহিত্যকে 'রসাত্মক বাক্যচেষ্টা' স্বরূপে, মানবাত্মার একটা স্বাধীন ও স্বতঃসম্ভবী ক্রিয়ারূপেই নির্দ্দেশ করা যায়। সাহিত্যের বাণী সাম্প্রদায়িক কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের কিংবা নীতিশাস্ত্রের সেবিকা অথবা ক্রীতদাসী নহেন। ফলতঃ, সাহিত্যের 'স্বধর্ম্ম' উহার আত্মতত্ত্বের বাধ্যতাগতিকেই যে উপজাত হইয়াছে, একথাটা দৃঢ়ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। সাহিত্যের সচ্চিদানন্দ রসাদর্শ উহার আত্মধর্ম্ম হইতে প্রসূত হইয়া, সর্ব্বপ্রকার সামাজিক ও নৈতিক Convention ডিঙ্গাইয়াই দাঁড়াইয়া আছে। এরূপে, আত্মধর্ম্মেই সাহিত্য নিয়ন্ত্রিত। মনুষ্য সামাজিক জীব এবং মনোজীবী জীব বলিয়া, সাহিত্যও সমাজবদ্ধ মনুষ্যের মানসী সৃষ্টি বলিয়াই মানবের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক স্বধর্ম্ম সঙ্গে সাহিত্যের স্বধর্ম্ম অনেক স্থলে coincide করিতেছে; উভয়েই হয়ত সমসূত্রে চলিয়াছে; উহাতেই মানুষ দৃষ্টিভ্রম বশতঃ সাহিত্যকে ধর্ম্মের ও সামাজিক নীতির বাধ্য বলিয়া ধারণা করিতেছে। সৃষ্টজগতের সচ্চিদানন্দ 'কারণ'তার গতিকে যেমন Humanity is a moral thing, তেমন সাহিত্যশিল্পও একটা Moral thing। মনুষ্যের 'প্রেম', 'আনন্দ', ও 'সৌন্দর্য্য'বুদ্ধি পর্য্যন্ত এরূপে সচ্চিদানন্দ কারণাত্মক Moral thingরূপে প্রতীয়মান ও সপ্রকাশ না হইয়া যে পারিতেছে না, তাহাই সত্য।

জীবমাত্রেই খণ্ডভাবে এবং খণ্ডদৃষ্টিতে (Relative) 'বিশ্বাত্মা' সাগরের তরঙ্গ। বিশ্বাত্মা 'তৎ'পদার্থ তাঁহার পূর্ণজ্ঞানে (Absolute) এবং সৃষ্টিগত ও সৃষ্টিক্ষেত্রীয় 'সত্যজ্ঞান আনন্দ' তত্ত্বের ধাম হইতে, অপিচ দেশকালাতীত ভূমি হইতে, এককালীন প্রত্যেক জীবকে প্রত্যেক পদার্থকেই ত 'আমি' বলিয়া জানিতেছেন—সত্তামাত্রও ত প্রত্যেকে সেই! দ্বিতীয় পদার্থ জগতে আছে কি? অপর কোন সত্তা সে অখণ্ডকে খণ্ড করিতেছে কি? অথচ

আমিত্বশালী প্রত্যেকেই ত তাহার 'আমিত্বের' রীতিতে, যেমন 'তৎ' হইতে তেমন পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র ও সুখদুঃখসমন্বিত বলিয়া জানিতেছে! এই জৈবজ্ঞানই মায়া এবং অবিদ্যাজনিত। বিশ্বাত্মা হইতে আমিত্বের ভেদজ্ঞান মূলেই জীবের অবিদ্যাময় সুখদুঃখের উৎপত্তি। এ স্থানেই কোটিকল্পান্তস্থায়িনী সংসারগতি বা জীবনগতি এবং এ স্থানেই 'অহংগ্রহী' দৃষ্টির দিক্ হইতে বিশ্বসৃষ্টির চরম রহস্য। জৈবক্ষেত্রে, সৃষ্টিসোপানে এবং প্রত্যেক জীবের স্বানুভবের ক্ষেত্রে (Planes) জগতের নামরূপের আপেক্ষিক ও ব্যাবহারিক সত্যতা স্বীকার করিয়াই চরম অদ্বৈতবিজ্ঞান দাঁড়াইতেছে।

জীবের আত্মা যে বিশ্বাত্মা হইতে অভিন্ন, উহাই যে বিশ্বেশ্বর—যদিও জীব জাগ্রদ্ভাবে এ জ্ঞান রাখে না—দ্রষ্টারা তাহাকে সে সংবাদ দিয়াছেন। জীব বিশ্বকে স্বকীয় আত্মার জাগ্রদধিকারে আনিতে চায়। স্বয়ং বিরাটের 'সন্ততি' বলিয়াই তাহার মধ্যে এই অতর্কিত জ্ঞানস্পৃহা অপিচ ঐশ্বর্য্যস্পৃহা, আনন্দস্পৃহা, রূপস্পৃহা, প্রেমস্পৃহা এবং যাবতীয় তথাকথিত 'কামনা' ও 'বাসনা'। উহারাই জীবকে নিজের নিত্যসত্য (অথচ 'অজ্ঞাত এবং অতর্কিত') সেই ঈশ্বরতার অভিমুখে টানিতেছে। এই ঈশ্বরত্বে গতির সম্মুখে বাধা পড়িলেই তরঙ্গ উঠে। জীবমাত্রে নিজের অবিতর্কিতেই ঈশ্বর ও অসীম হইতে চাহিতেছে। এই অতর্কিত 'বোধি' হইতেই 'কবিত্ব'; উহার প্রতিপক্ষে বাধা হইতেও আবার ভাবের উচ্ছ্বাস ও হতাশ্বাস—তাহা হইতেও কবিত্ব। সকল কাব্যপ্রেরণার মুখ্য হেতুই অনন্তের জন্য জীবাত্মার আকুতি। ভাব এবং অভাব উভয় দিকে, জীবাত্মার সেই অপ্রাপ্ত অনন্ততা এবং অমৃতপুত্রতার 'বোধি' হইতেই জীবের সর্ব্বপ্রকার ভাবুকতা ও কবিত্ব। অতএব, কবিসম্পত্তি সংসারে একটা 'অমৃত' এবং দৈবী সম্পত্তি। এ সম্পত্তিকে যে কবি জাগ্রদ্ভাবে চিনিয়াছেন, তিনি তাঁহার জীবনকে এবং সকল কবিত্বব্যাপারকে চূড়ান্ত অমৃতের লক্ষ্যেই পরিচালিত করিতেছেন; কায়মনোবাক্যে তিনি সেই চরম অমৃতসিন্ধু এবং নিজের অন্তর্গুপ্ত,

সচ্চিদানন্দ শিবাত্মার বিরাট্‌তত্ত্ব অভিমুখেই সকল কাব্যচেষ্টার ও শিল্পসাধনার তরণীকে পরিবাহিত করিতেছেন।

বলিতে পারি, মানবজগতের শ্রেষ্ঠ কবি এবং শিল্পী মাত্রেই সজ্ঞানে বা অতর্কিতে তাঁহাদের সকল কাব্য এবং শিল্পচেষ্টার রসমার্গে এই 'সচ্চিদানন্দ রস' পদার্থকেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। ইদানীং বিরাট্ সাহিত্যক্ষেত্রে (১) উহাকে জাগ্রভ্ভাবে উপলব্ধি করায় সময়-যোগ উপস্থিত হইয়াছে।

কেবল শিল্পসাহিত্যের আত্মা বলিয়া নহে, সর্ব্বান্তর্গত ও সর্ব্বাতীত এই সচ্চিদানন্দ তত্ত্বেই Highest Synthesis of life; উহা বিশ্বসংসারের সর্ব্বসমস্যাবিগলনী Aqua Regia. এই তত্ত্ব অনুভবগত করিতে পারিলে জীবজীবনের ধর্ম্ম, সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তির সকল সমস্যা বিরোধ এবং বিসম্বাদ স্বতোমীমাংসিত হইয়া যায়! বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, আধুনিকের ওই যে একটা মস্ত বড় দম্ভের কথা—Fatherhood of God and brotherhood of man—উহা কেবল অর্দ্ধদৃষ্টির এবং অন্ধ দৃষ্টির প্রমাণ। সমগ্র জীবজগতের Brotherhood কোথায় গেল? আবার, জীবজগৎ কেন, চরম দৃষ্টিতে (বশিষ্ঠের ভাষায়) 'আমিই ত সর্ব্ব'! সর্ব্বজগৎ আমারই ত 'আত্মীয়'! বিশ্বজগৎ লইয়াই ত আমার Selfhood! কোন স্থিতিতে, কোন বিজ্ঞানস্থানে দাঁড়াইলে বুঝিব, বিশ্বসৃষ্টি একমাত্র 'ব্যক্তি' রূপে সচ্চিদানন্দকামিনী—সেই সচ্চিদানন্দের রসিকা এবং আরাধিকা? আবার বুঝিব, আমিই ত সেই আরাধিকা! তারপর? চূড়ান্তে অগ্রসর হইতে কি বুঝিব? বুঝিব—'আমিই ত সেই'!

এই বোধের পথে জগতের বুদ্ধি চলিতেছে না বলিয়াই সংসারের যত পাপতাপ, বিরোধ এবং বিসম্বাদ। মানুষে মানুষে, গ্রামে গ্রামে, দেশে

(১) ভারতীয় দর্শনে, 'বিশ্ব' অর্থ প্রকৃত প্রস্তাবে 'ব্যষ্টি জীব'—Individual বা Microcosm. 'বিশ্বসাহিত্য' অপেক্ষা 'বিরাট্ সাহিত্য'ই সুসঙ্গত আখ্যা—যদিও 'বিশ্বসাহিত্য'ই ব্যবহারমূলে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দেশে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মারামারি, কাটাকাটি! সচ্চিদানন্দ আত্মবাদী ঋষি তারস্বরে বলিতেছেন—

যস্ত সর্ব্বানি ভূতানি আত্মৈবাভূৎ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্ব মনুপশ্যতঃ॥

জীবমাত্রের কর্ণে অদ্বৈতবাদী ভারতীয় ঋষির পরম সমাচার—জীব মাত্রেই ঈশ্বরাবস্থা হইতে স্বাধীনতায় স্খলিত হইয়া আসিয়াছে; এখন, কোটীকল্পান্ত দূরবর্ত্তী হইলেও, ব্রহ্মচক্রে ও ব্রহ্মধর্ম্মে পুনর্ব্বার ঈশ্বরপ্রাপ্তিই তাহার ললাটে শাশ্বত সত্যের পরম আশীর্ব্বাণী রূপে দিব্যজ্যোতি অক্ষরে মুদ্রিত আছে! উহাতেই সৃষ্টিবিবর্ত্তের সমাপ্তি এবং জীবত্বের মুক্তি—জীবাত্মার চরম স্বাধীনতা ও স্বরাজ এবং পরম আত্মপ্রাপ্তি!

বাণী-মন্দির

বা

সাহিত্যের আদর্শ

বাণী-মন্দির

বা

সাহিত্যের আদর্শ।

সাহিত্যে আকৃতি।

(১)

বস্তুসংক্ষেপ।

সাহিত্য মনুষ্যের মানসী সৃষ্টি—মনুষ্যজাতির মধ্যে ভাবগত সাধর্ম্ম্য হইতেই বিশ্বসাহিত্যের ও বিশ্ব-সম্মেলনের আদর্শ—ইয়োরোপীয় সাহিত্যই 'বিশ্বসাহিত্য' নহে—প্রাচীনতন্ত্রের নরসমাজে আধুনিক ইয়োরোপের পার্থক্য ও বিশেষত্ব—ইয়োরোপের আধুনিক সাহিত্যের বিশেষত্ব—উহা তাহার সমাজসভ্যতার ফল—উহার সাধারণ্যবাদ, প্রাকৃতবাদ এবং সত্যবাদ—সাহিত্যের অধঃপাত ঘটিয়াছে বলিয়া অভিযোগ ও উহা উত্তীর্ণ হইবার প্রয়াস—জগতে 'স্থায়ী' মনুষ্য ও তাহার 'স্থায়ীভাব' সমূহ—স্থায়ীভাবগুলি অবলম্বন করিয়াই 'স্থায়ী সাহিত্য'—সাহিত্যের 'রস-আদর্শ'—চরমবিচারে 'সত্যশিবসুন্দর' আদর্শ—উক্ত আদর্শে 'সাহিত্য-বিবেক'—সাহিত্যে 'আকৃতি' ও উহার শক্তি—সাহিত্যে অতিশয়োক্তি—সার্ব্বজনীন সাহিত্য-বিবেকের অর্থ—রামায়ণ প্রভৃতির 'আকৃতি' আদর্শ—বাল্মীকির 'আকৃতি'-নির্ব্বাচন—সাহিত্যে আকৃতি বিহীন ভাবুকতা প্রভৃতি—কালিদাস কর্ত্তৃক 'বিরহ' তত্ত্বের পারবর্ণনা চেষ্টায় মেঘদূতের 'আকৃতি' নির্ব্বাচন—আকৃতি-নির্ব্বাচন বিষয়ে আধুনিক সাহিত্যের কার্পণ্য ও অস্বস্তি—স্থায়ী সাহিত্যের অপরিহার্য্য 'আকৃতি'-লক্ষণ—আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্যের সাধারণ কার্পণ্য—'নবেল' সাহিত্য ও উহার অস্থায়িত্বের লক্ষণ—আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্যের 'বাজারী' হাওয়া—উহাতে 'আকৃতি' আদর্শের ব্যভিচার—শ্রেষ্ঠ শিল্পের মধ্যে আকৃতি এবং প্রকৃতির সামঞ্জস্যমূলক 'ব্যক্তিত্ব'—শিল্পতাসিদ্ধি কুত্রাপি ভূয়োদর্শন অথবা পুঞ্জীকরণের কার্য্য নহে—শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর সাহিত্যরূপী 'ব্যক্তি'।

১। সাহিত্য মনুষ্যের মানসী সৃষ্টি।

সাহিত্য মনুষ্যের মানসী সৃষ্টি; এবং মনুষ্যও আবার স্মরণাতীত কালের সামাজিকতা এবং জীবন-নিয়তির উদ্বর্ত্তমান সৃষ্টি। 'মনুষ্যত্ব' বলিতে আদর্শহিসাবে যেই ধারণা জন্মে, তাহা সমাজনিষ্ঠ মানব জাতির সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতাজনিত সংস্কাররূপেই আমাদের চিত্তে উদ্বর্ত্তিত হইয়া

দাঁড়াইতেছে। অতএব সমাজধর্ম্মের সংস্রব এবং প্রভুতা হইতে ব্যবচ্ছিন্ন করিয়া সাহিত্যের কোন ধারণা যেমন অসম্ভব, তেমন উহার সুবিচার করাও অসম্ভব। সামাজিকতার দৃষ্টিস্থান হইতেই সাহিত্যের বিচার করা ব্যতীত মনুষ্যের পক্ষে উপায়ান্তর নাই।

আবার, মানুষের 'সমাজ' পদার্থের মূলেও যে কতকগুলি সর্ব্বমনুষ্য-সাধারণ মনোধর্ম্মই প্রবল হইয়া আছে এবং উহার দরুণ, নানাদিকে দেশকালের ব্যবধান এবং অসম্পর্ক সত্ত্বেও, মানবজাতির বিভিন্ন সমাজ বা সম্প্রদায়-সংঘের মধ্যে যে একটা আশ্চর্য্যকর সমতা লক্ষণই পরিস্ফুট হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা সমাজ-দার্শনিক মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। ঐ সমস্ত লক্ষণ বা ধর্ম্মই 'মনুষ্যত্ব' আদর্শের মূল ভিত্তি। তথাপি কার্য্যতঃ স্থান-কালের আগন্তুক বিশেষধর্ম্ম এবং সঙ্কীর্ণতার ছায়াই যে 'সার্ব্বজনীন মনুষ্যত্ব' আদর্শকে অনেক সময় বিগঠিত এবং খণ্ডিত করিতেছে, তাহাও অস্বীকার করার উপায় নাই। এইরূপে, দেশবিশেষে 'মনুষ্যত্ব' আদর্শের স্থানিক পার্থক্য অথবা সঙ্কীর্ণ বিধারণা হইতে সাহিত্যের আদর্শেও কিছু না কিছু স্থানিক পার্থক্য ঘটিয়াছে। বলা বাহুল্য, এ স্থানেই সাহিত্যের আদর্শ-পার্থক্যের সূত্রপাত এবং বিচারের প্রয়োজন ও উপস্থিত। কেননা, তত্ত্বের দিক হইতে পার্থক্য অধিক না হইলেও, দেশকালের ছায়ায় পড়িয়া উহা প্রকটমূর্ত্তিতে নিদারুণ বিরূপ ও বৈষম্যময় বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে; এবং উহাতে জন সাধারণের রুচি এবং সাহিত্যের বিচার ও নিয়ন্ত্রিত করিতে থাকে; অনেকসময়ে অকিঞ্চিৎবিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ রুচিপার্থক্যই সমগ্রদেশের সাহিত্যকে প্রবল ভাবে অনুশাসিত করিতেও দেখা যাইবে। এমন কি, অনেক সময় অতি নগণ্য সাময়িক রুচি এবং কেবল স্থানিক রীতি-নীতিব্যাপার মনুষ্যের বিজ্ঞান-দৃষ্টিতেই ধূলিমুষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক উহাকে একেবারে অন্ধ করিয়া রাখিতেছে! সুতরাং সাহিত্যের আদর্শবিচারের উপযোগিতা আছে; কেবল উপযোগিতা কেন, এই বিচার বর্ত্তমান কালে

১। মনুষ্যজাতির মধ্যে ভাবগত সাধর্ম্ম্যের ভিত্তির উপরেই বিশ্বসাহিত্য ও বিশ্বসম্মেলনের আদর্শ।

মনুষ্যমনের স্বাস্থ্য রক্ষায় একেবারে অপরিহার্য্য। বর্ত্তমান কালধর্ম্মে মনুষ্য-জাতির মধ্যে 'উলনমিলনের' প্রসার এবং ব্যবসায়বাণিজ্যের আদানপ্রদান হইতে যেমন সম্মেলন ঘনিষ্ঠ হইয়া গিয়াছে; তেমন ভাবগত পরিচয়, এবং আদানপ্রদান ও বাড়িয়া যাওয়ায়, প্রসারিত অভিজ্ঞতা হইতে মনুষ্য তাহার ভাববৃত্তিকেই তন্মাত্রভাবে সার্ব্বজনীন সমতা-ক্ষেত্র বলিয়া চিনিয়া ফেলিয়াছে! এই আবিষ্কারটি আপাততঃ একটা অত্যন্ত সহজ, স্বল্পমূল্য এবং সুলভ প্রাপ্তি বলিয়াই প্রতীয়মান। আবিষ্কার এই যে, পৃথিবীবাসী মনুষ্যমাত্রের মধ্যে একটা সর্ব্বসাধারণ সামঞ্জস্যের এবং সাম্যের মিলন ক্ষেত্র আছে, উহা মনুষ্যের ভাববৃত্তি। মানুষের সমাজবুদ্ধি এবং সমাজ সৃষ্টির মূলেও এইরূপ সমতাজ্ঞান! কেবল দেহের গঠন বা আকৃতির সমতা নহে, আকৃতির অভ্যন্তরে মনোবৃত্তির সমতার অতর্কিত 'বোধি'ই মনুষ্যের সমাজগঠনের আদিম অবলম্বন ও আদ্যাশক্তি। তন্মধ্যে আবার স্নেহ প্রেম সখ্য করুণা প্রভৃতি ভাবক্ষেত্রীয় বিষয়েই মানুষে মানুষে প্রধান সমতা। অতএব, মুখ্যভাবে মনুষ্যের ভাববৃত্তি হইতেই সাহিত্য; ভাববৃত্তির 'ক্ষুধার অন্ন ও তৃষ্ণার জল' স্বরূপেই সাহিত্য নামক পদার্থের সৃষ্টি রক্ষা এবং পরিপুষ্টি। সুতবাং, এই যে 'সাহিত্য জগৎ', 'সার্ব্বজনীন সাহিত্য', 'বিশ্বসাহিত্য' প্রভৃতি সংজ্ঞাশব্দ আধুনিক কালে অসঙ্কোচে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, মনুষ্যরুচির স্থান-কালের সমস্ত পার্থক্যকে উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক, মনুষ্যত্বের অন্তঃস্থ এবং ভাববৃত্তিগত সমত্বের অনুভূতি বুদ্ধিই উহাতে আত্ম প্রকাশ করিতেছে।

অতএব সাহিত্য যেমন সমাজধর্ম্মী মনুষ্য-চিত্তের সৃষ্টি তেমন প্রধানতঃ উহার ভাববৃত্তির সৃষ্টি; এবং এই বৃত্তিকে সর্ব্বমানবের মধ্যে সাধারণ বলিয়া মনুষ্যহৃদয়ের সহজাত বিশ্বাস হইতেই আজ সাহিত্য পৃথিবীবাসী মনুষ্যের সর্ব্বপ্রধান সম্মেলন ভূমি। মনুষ্যের জ্ঞান কিংবা কর্ম্মের ক্ষেত্রে যেই সম্মেলন ও সাম্যের অনুসাধনা সম্ভবপর হয় নাই, তাহার সাহিত্যক্ষেত্রে তাহাই সমাহিত ইহতেছে! সুতরাং, এই মিলন ভূমিকে এখন মনুষ্যরুচির দেশকালগত ও ব্যক্তিগত যাবতীয় বিভিন্নতা এবং সঙ্কীর্ণতার 'আগাছা'

হইতে যথাসম্ভব পরিমুক্ত ও পরিষ্কৃত করিয়া তোলাই সকলদেশের সাহিত্য সেবকের একটা প্রধান কর্ত্তব্যরূপে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ইহা ব্যতীত বিশ্বজনীনতা অথবা সাম্য সাধনার অপর কোন ক্ষেত্র নাই। মনুষ্যের চিত্ত এখনও হয়ত পূর্ণ সহানুভূতি এবং সমত্ববোধ সিদ্ধি করিয়া উঠিতে পারিবে না; স্থানকালের ধর্ম্মসমাজ ও রাষ্ট্রগত রুচির অপচ্ছায়া হইতে প্রমুক্ত হইয়া আপনার শুদ্ধ সত্ত্বা এবং ভাবাত্মায় স্থির হইতে মনুষ্যের পক্ষে এখনও হয়ত অনেক বিলম্ব আছে। 'বিশ্বসাহিত্য' প্রভৃতি কথা হয়ত মনুষ্যচিত্তের একটা দূরগত এবং স্বপ্নপ্রাপ্ত আদর্শ! উহা মনুষ্যের মানসলোকের সৃষ্টি-প্রকরণ এবং বিভাবনা ব্যাপারের একটা অনধিগত লক্ষ্য ব্যতীত হয়ত আর কিছুই নহে; হয়ত নিত্যকাল অনধিগত থাকিবে! কিন্তু ওই অপ্রাপ্তির মধ্যেই মনুষ্যের সমাজও সাহিত্যের প্রাণ এবং মাহাত্ম্য! সাহিত্যের অমৃত আত্মা, উহার নিত্যজীবন এবং অনন্তমুখিতার ধর্ম্মও উহাতে প্রবল না থাকিয়া পারিবে না।

৩। ইয়োরোপীয় সাহিত্যই বিশ্বসাহিত্য নহে।

ইয়োরোপীয় সাহিত্যই 'বিশ্বসাহিত্য' বলিয়া একটা ভ্রান্ত ধারণা আমাদের দেশে বর্ত্তমানকালে ব্যক্তি বিশেষে প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। ভারতীয় সাহিত্যের মর্ম্মে যাঁহাদের অন্তর্যোগ বা সহানুভূতি নাই তাঁহাদের কথাতেই উক্ত ধারণা প্রকটিত হইতেছে। পৃথিবীর এই জীব-রঙ্গভূমে ইয়োরোপ এখন জড়তার শক্তিতে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া, এবং তাহার ওই প্রাবল্যের দ্বারা অভিভূত হইয়াই যদি আমাদিগকে সংজ্ঞা-প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা হইলে আপত্তি নাই। কিন্তু ইয়োরোপীয় সাহিত্য যে স্বয়ং সার্ব্বজনীন সাহিত্য হইতে অনেক দূরে আছে, তাহাই আমাদিগকে আত্মবোধ কল্পে বুঝিয়া লইতে হইতেছে। ইয়োরোপের সাহিত্যও ইয়োরোপীয় মনুষ্যসমাজের এবং স্থান কালের প্রবল ধর্ম্ম হইতে কোন দিকে প্রমুক্ত নহে। তবে, জগতের বহুজাতির সাহিত্যপরিচয় হইতে ইয়োরোপীয়গণ আপনাদের সাহিত্যের স্থানিক এবং সাময়িক সঙ্কীর্ণতার বিষয় সর্ব্বাগ্রে টের পাইয়াছেন; এবং তাঁহাদের মধ্যে কোনকোন

সাহিত্যসেবী সচেতনভাবে সাম্যকেই লক্ষ্য করিতেছেন। গ্রন্থের উদ্দেশ্য এবং রসাপত্তির মধ্যে জাতীয় অথবা সাংপ্রদায়িক গোড়ামী পরিহার পূর্ব্বক ভাববৃত্তিগত সমতা ধর্ম্মকে সুদূর আদর্শরূপে লক্ষ্য করিতেছেন বলিয়াই তাঁহাদের মধ্যে বিশ্বজনীন লক্ষণ কোন কোন দিকে পরিস্ফুট হইতেছে।

৪। প্রাচীন তন্ত্রের নরসমাজে আধুনিক ইয়োরোপের পার্থক্য ও বিশেষত্ব।

ইয়োরোপীয় সভ্যতা যে আপনাকে দিগ্‌বিজয়ী বলিয়াই অনুভব করিতেছে, উহা যে প্রাচীন নরসভ্যতার আদর্শকে নানাদিকে অতিক্রম করিয়া আপন হৃদয়গতির অনুসরণেই অগ্রসর হইতেছে, ইতিহাসজিজ্ঞাসু ভারতীয় মনুষ্যের চিত্তকে আধুনিক ইয়োরোপের এই অভিনবতা এবং অভিমানের লক্ষণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলভাবেই আঘাত করে। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে এই লক্ষণ উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া সমগ্র ইয়োরোপের খ্রীষ্টান জাতিসমূহের মধ্যে পরিব্যাপ্তি লাভপূর্ব্বক বিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করিয়াছে; ক্রমে, ঐ বিস্তৃত ভূখণ্ডের মনুষ্যগণকে এসিয়ার বা পৃথিবীর প্রাচীন নরসংঘ হইতে নানাদিকে বিভিন্ন-ধর্ম্মা করিয়া তুলিয়াছে। এই পার্থক্য কি, উহাকে ভারতীয় নেত্রে পরিদর্শন-পূর্ব্বক সম্যক্‌জ্ঞান লাভ করা সাহিত্যচিন্তকমাত্রেরই আদিম কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে উহার সকল দিকে সবিশেষ দৃষ্টি করার অবসর নাই। মোটামোটি বলিতে পারা যায় যে, বর্ত্তমান ইয়োরোপ প্রাচীন গ্রীস, রোম অথবা মধ্যযুগীয় ইয়োরোপের সমাজ রাষ্ট্র এবং ধর্ম্মের লক্ষণকে—এক কথায় প্রাচীন মনুষ্যসংঘমাত্রের আদর্শকেই—অনেক দিকে পরিত্যাগ করিয়া অভিনব সমাজতন্ত্র, রাষ্ট্রতন্ত্র এবং ধর্ম্মতন্ত্র খ্যাপন পূর্ব্বক ন্যূনাধিক আত্যন্তিক-ভাবেই অগ্রসর। ধর্ম্মতন্ত্রের ক্ষেত্রে উহা প্রাচীন আদর্শের 'পৌরোহিত্য-নিয়ন্ত্রণা'কে নানাদিকে নিগৃহীত করিয়া, ব্যক্তিস্বত্বকে প্রসারিত করিয়া, ধর্ম্ম-সংঘেরঅন্তর্গত প্রত্যেক মনুষ্যের কথায়, কার্য্যে এবং চিন্তায় ন্যূনাধিক স্বাধীনতা প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। সমাজ ও রাষ্ট্রতন্ত্রেও সেইরূপ জন্মগত জাতিভেদ, জাতিস্বার্থ এবং জন্মস্বত্বকে নানাদিকে বিপ্রতিষ্ঠ করিয়া মানুষে মানুষে "সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতা"র আদর্শ খ্যাপন করিয়াছে; যেমন,

রাজা-প্রজার, তেমন প্রজা-প্রজার সম্বন্ধকেও প্রাচীন আদর্শ হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছে। উহা হইতেই এখন ইয়োরোপের সর্ব্বত্র সাধারণতন্ত্রের অভ্যুদয়। আবার, উহা হইতেই যেমন পুরুষে পুরুষে, তেমনি পুরুষ এবং নারীর সম্বন্ধেও অভিনব সাম্য মৈত্রী এবং স্বাধীনতাবাদ অবতীর্ণ হইয়া মনুষ্যের চিরাগত স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধীয় আদর্শকেও বিলকুল উলট-পালট করিয়া দিয়াছে। ধর্ম্মরাষ্ট্র এবং সমাজে এই অভিনব নীতির ভাল-মন্দ উভয় ফলই আধুনিক ইয়োরোপের অদৃষ্ট অধিকার করিয়া থাকিতেছে। বর্ত্তমান ইয়োরোপের সংসারবিজয়ী প্রভাব যেমন উহার জীবন-পরিচালক মূল-মন্ত্রটির উপরেই নির্ভর করে, ধর্ম্মসমাজ রাষ্ট্রে ব্যক্তি-স্বত্ব এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার ও নানাদিকে প্রতিযোগিতার পরিপোষণের উপরেই নির্ভর করে, তেমনি জীবনপথে উহার যাবতীয় সাধ্য কিংবা অসাধ্য সমস্যা এবং উহার যাবতীয় ভাল-মন্দ এবং সুবিধা-কুবিধাও উক্ত মূলমন্ত্র হইতে বহমান হইয়াই মাথা তুলিয়াছে।

৫। ইয়োরোপের আধুনিক সাহিত্য তন্ত্রের বিশেষত্ব।

এই দৃষ্টিস্থান হইতে ইয়োরোপের আধুনিক সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি করিলে, সমাজ-ধর্ম্ম রাষ্ট্রে উপরি উক্ত আদর্শের অনুসরণ-ফলটি যে তাহার সাহিত্যের মধ্যেও উপাবৃত্ত হইয়াই থাকিতেছে, তাহাই জিজ্ঞাসু-মাত্রের হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকে। গণতন্ত্রের প্রভাবগতিকেই উহাতে প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সাহিত্যের—সকল দেশের প্রাচীন সাহিত্যের—'সমুৎকর্ষ' আদর্শ নিগৃহীত হইয়া, নিরবচ্ছিন্ন 'প্রাকৃতবাদ' এবং 'সাধারণ বিষয়' বাদের প্রাদুর্ভাব ঘটাইয়াছে! সাধারণ্যের রুচিচর্য্যা করিয়া, সাধারণের মধ্য হইতেই অগণ্যসংখ্যক মসীজীবীর হস্তে বিপুল-বিস্তারিত বাক্যচেষ্টা জন্মলাভ পূর্ব্বক 'সাহিত্য' নামে প্রচলিত। নিবিষ্টভাবে দৃষ্টি করিলেই দেখিব, যেমন ইয়োরোপের 'সাময়িক' সাহিত্যে, তেমন উহার লোক-বিস্তৃত 'নাটক নভেল গল্প' সাহিত্যের মধ্যেও এই অধ্যাত্ম-লক্ষণ নানাদিকে, সকল আকার-প্রকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াই চলিয়াছে।

পৃথিবীতে এ যাবৎ যত রকমের জাতিসভ্যতার অভ্যুদয় ও বিলয় ঘটিয়াছে, তাহাদের অন্তস্তত্ত্বে দৃষ্টি করিলেই দেখা যাইবে যে, জাতিসভ্যতা মাত্রেই যেমন একদিকে জাতীয় জীবনের বাহ্যিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধিকেই লক্ষ্য করে, তেমনি অন্যদিকে কতকগুলি সবিশেষ ভাব-আদর্শের প্রচার, প্রসার এবং জীবনক্ষেত্রে উহাদের বিস্তারিত সাধনাই লক্ষ্য করিয়া থাকে! এই 'ভাব'-সাধনাই জাতিবিশেষের বাহ্যিক কিংবা আন্তরিক জীবনে সতর্ক অথবা অ-সতর্কভাবে কার্য্যকরী হইয়া জাতিবিশেষকে এক একটি সবিশেষ ভাবধর্ম্মে অনুপ্রাণিত এবং কর্ম্মবর্ণে পরিবর্ণিত করিয়া যায়। এইরূপ দৃষ্টি লইয়া বিচার করিতে বসিলেই দেখিব যে, আধুনিক ইয়োরোপীয় সভ্যতা যেমন একদিকে বহিঃপ্রকৃতির অভ্যন্তরে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দৃষ্টিপ্রয়োগপূর্ব্বক প্রকৃতির শক্তিপুঞ্জকে অভূতপূর্ব্ব উপায়ে আয়ত্ত করিয়া মনুষ্যের সুখচর্য্যায় নিযুক্ত আছে, পার্থিব জীবন-সংগ্রামে অমেয় শক্তির পরিচয় দিতেছে, তেমনি অন্য-দিকে, সমাজমধ্যেও ব্যক্তিধর্ম্মের প্রসার সমাধা করিয়া, পূর্ব্বোক্ত 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা'-বাদকেই মন্ত্ররূপে অনুসরণ বা বিঘোষণ পূর্ব্বক প্রত্যেক ব্যক্তিকে সাংসারিকভাবে আত্মবিকাশে সহায়তা করিতেছে; এবং ঐ সমস্তের গতিকেই ইয়োরোপ সমষ্টিগত বা জাতিগতভাবে ধরাবক্ষে বিজয়ী হইয়া উঠিয়াছে! অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে উহার এই অন্তঃকরণতত্ত্ব চিন্তাশীল মনুষ্যমাত্রের সমক্ষেই সুপ্রকট হইয়া তাহার জীবনতন্ত্রের পরিচালকরূপে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। উহার প্রভাবে সাহিত্যের মধ্যেও ধীরে ধীরে আবহাওয়া পরিবর্ত্তিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ক্রমে সাহিত্য-ফশলের বর্ণধর্ম্ম পর্য্যন্ত, যেমন নিজের প্রাচীন বনিয়াদ হইতে, তেমন মানব জগতের অন্য প্রাচীন সাহিত্যের প্রকৃতি হইতেও তফাৎ করিয়া গিয়াছে।

৬। আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্য, তাহার সমাজসভ্যতার সৃষ্টি।

ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্য প্রধানতঃ সাধারণ্যবাদের আদর্শেই পরিপুষ্ট। প্রাচীন সাহিত্যের সমুৎকর্ষ (classic) আদর্শ বলিতে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব, কৌলিন্য এবং উহার সঙ্গে

৭। উহার সাধারণ্যবাদ, প্রাকৃতবাদ এবং সত্যবাদ।

সঙ্গে ভাবের সমঞ্জসিত অভ্যুন্নতিই বুঝায়; উহাকে নানাদিকে 'কোণায় ঠেলিয়া' এই 'আধুনিকত্ব' প্রবল হইয়াছে; এবং মুদ্রাযন্ত্র, রেলওয়ে প্রভৃতি বহিঃপ্রকৃতির নবাবিষ্কৃত শক্তির সহায়তায় উহা আপনাকে দিগ-দিগন্তে দেশদেশান্তে বিলি করিয়া চলিয়াছে। আধুনিক সভ্যতার প্রবলতম শক্তি সাধারণ শিক্ষা। সুতরাং, সাহিত্যের এই সাধারণ্যবাদ যে লোকবিস্তৃত সহানুভূতি লাভ করিবে, তাহা বিচিত্র কি? ইয়োরোপের সমাজতন্ত্রে renaissance বা নবজীবনের আরম্ভ হইতে যেমন এই 'আধুনিকতার' সূত্রপাত, তেমন সাহিত্যতন্ত্রেও নবপ্রবুদ্ধ ইতালীর দান্তে, পিত্রার্ক হইতে আরম্ভ করিয়া ইংলণ্ডের সেক্সপীয়র প্রভৃতির মধ্যে পর্য্যন্ত উহার সতর্ক বা অতর্কিত প্রভাব! পরেপরে, অষ্টাদশ শতাব্দীর 'ফরাসীবিপ্লব' নামক বিস্তারিত গণচেষ্টা এবং গণশক্তির বাহ্বাস্ফোটময় অভ্যুত্থান হইতে উহার সচেতন কর্ম্মপ্রবণতার আরম্ভ! এক শতাব্দীর মধ্যেই উহা আত্মজ্ঞানে এবং আত্মম্ভরতায় সম্যক্ সুপ্রকট হইয়া একেবারে আত্যন্তিকভাবেই আত্মানুসরণ করিয়া চলিতেছে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই নবপ্রথার লক্ষণ এই যে, যাহা কিছু প্রকৃত বা যাহা কিছু প্রাকৃত, উহা তাহাকেই একান্তভাবে অবলম্বন করিতেছে বলিয়া প্রকাশ করে; আপনাকে 'সত্যবাদী' বলিয়া ঘোষণা করে! আধুনিক-সাহিত্যে এই 'সত্য'বাদের প্রধান লক্ষণ উহার 'মাটীঘেঁসা' ভাব! মানুষ মাটীর পুত্র এবং তাহার আভ্যন্তমধ্য, ভিতর বাহির কেবল মাটীময়! মনুষ্যদেহের পার্থিব ধর্ম্মের দিকে অতিরিক্ত মাত্রায় জোর দিয়া, তাহার অন্তরাত্মা এবং আত্মিক জীবনকে একেবারে অস্বীকার বা 'না-বহাল' করিয়াই আধুনিক সাহিত্যের এই 'সত্যবাদ' উল্বণ হইয়া উঠিয়াছে! যে স্থলে এই 'সত্যবাদ' আপাততঃ সামাজিক মনুষ্যের আন্তরিক প্রকৃতির সমস্যা নিরূপণ অথবা তাহার চরিত্র-বিশ্লেষণাও লক্ষ্য করে, এবং ঐ প্রণালীতে অধ্যাত্মভাবে সমধিক সমুচ্চ বলিয়াও প্রতীয়মান হইতে থাকে, সে স্থলেও অবলম্বিত 'বিষয় বস্তু'র প্রাকৃত ধর্ম্ম, ভাবুকতার মৃদ্‌বৃত্তি এবং মৃন্মুখী প্রবৃত্তিই সমগ্র শিল্পটীর আবহাওয়া এবং অন্তরাত্মাকে অধিকারপূর্ব্বক শাসিত করিতে থাকে।

ইহার সাপক্ষে এই অজুহাত দেওয়া হয় যে, প্রাকৃত ব্যক্তিগণই যখন অধিকাংশ পাঠক, প্রাকৃত বা ঘরোয়া ভাব লইয়াই যখন অষ্টপ্রহর চলিতে হয়, তখন প্রাকৃত সত্য এবং প্রাকৃত জীবন ছাড়িয়া সাহিত্য বিমানচারী হইতে যাইবে কেন? সাহিত্য-অধিকারের সত্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা হইতেই আধুনিক সাহিত্য বিস্তারিতভাবে মাটীঘেঁসা হইয়া গিয়াছে। উহার দরুণ এবং সাধারণের সহানুভূতির উপর জীবিকার জন্য নির্ভর করে বলিয়াই, বর্ত্তমান কালের সাহিত্য-জগতে উপন্যাস বা 'নবেল' নামক অতিপ্রবল সাহিত্যচেষ্টা বাজার দখল করিয়াছে। ইয়োরোপীয় সমাজ স্বকীয় প্রকৃতিবশেই স্বামি-স্ত্রী-নির্ব্বাচনকে মনুষ্যজীবনের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা রূপে গ্রহণ করে বলিয়া, এই নবেল স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর নির্ব্বাচন এবং যৌন সম্মেলন ব্যাপারকেই সর্ব্বত্র মুখ্যভাবে অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। সাহিত্যকে সাধারণের হৃদয় এবং জীবনের সন্নিকটে আনিতে গিয়া ইয়োরোপের নাট্য-সাহিত্যের মধ্যেও আদর্শ-বিপ্লব ঘটিয়াছে। ঈবসেন জর্নসন প্রভৃতি এই 'প্রকৃতবাদের' ধুয়া ধরিয়াই নাটকে গদ্যরীতির আশ্রয় লইয়াছেন। নাটককে সাধারণ রুচির সমতলে আনিতে যাওয়ায় উহার 'কাব্যতা' লক্ষণ, মহতী পরিকল্পনা অথবা অসামান্য এবং সমুৎকর্ষময় বস্তু ও ভাববত্তার লক্ষণ একেবারে খোয়াইয়া গিয়াছে!

৮। আধুনিক সাহিত্যের অধঃপাত ঘটিয়াছে বলিয়া অভিযোগ ও উহা উত্তীর্ণ হইবার প্রয়াস।

এ সমস্ত ব্যাপার ইয়োরোপীয় সাহিত্যের অভিনিবিষ্ট পাঠকমাত্রের জানা কথা। সুতরাং সে বিষয়ে বর্ত্তমান প্রসঙ্গে অধিক বাক্যব্যয় করার আবশ্যকতা নাই। এখন কথা হইতেছে, ইতোমধ্যেই ইয়োরোপীয় সাহিত্যদার্শনিকগণ এই লক্ষণকে সাহিত্য-আদর্শের 'অধঃপতন' বলিয়া মনে করিতেছেন। The decadence of modern literature সাহিত্য-সমালোচকগণের মধ্যে একটা সুপ্রচলিত স্বীকার্য্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। 'আধুনিক সাহিত্যের অধঃপাত ঘটিয়াছে,' উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যগ্রন্থ এখন ইয়োরোপে 'কচিৎ জন্মাইতেছে' প্রভৃতি বিচারবাক্য আমরা সে দেশের সমালোচকগণ হইতেই শুনিয়া আসিতেছি।

বর্ত্তমান সাহিত্য লোকপ্রিয়, লোকবিস্তৃত বা সাধারণ্যের দ্বারা অভ্যর্থিত হয় হউক, যে আদর্শে যুগযুগান্ত হইতে উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য নির্ব্বাচিত এবং রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, অথবা টিকিয়া আসিয়াছে, আধুনিক সাহিত্যে প্রধানতঃ উহারই ব্যভিচার। আধুনিক সাহিত্যের বর্ত্তমান-পূজ্য বহুগ্রন্থ যে ভবিষ্যতে টিকিবে না, তাহার অধিকাংশ উপার্জ্জন যে সাহিত্য-ইতিহাসের প্রকোষ্ঠে নগণ্য বলিয়া আবর্জ্জনাগত এবং পরিত্যক্ত হইবে সে আশঙ্কা অমূলক নহে। এরূপ আত্মবোধ হইতে ইয়োরোপ এখন উচ্চাঙ্গের 'ভাবগত' সাহিত্যের জন্য—Idealism এর জন্যে লালায়িত। সুইজরলণ্ডের 'নোবল কমিটির উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করুন! তাঁহারা বর্ত্তমান ইয়োরোপের তথাকথিত প্রাকৃতবাদী, বস্তুবাদী বা সত্যবাদী সাহিত্যের স্রোতকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া ভাবোত্তম রীতির কৃতিত্বশালী শিল্পিগণকেই উৎসাহিত করিতেছেন।

৯। জগতের গতিমধ্যে 'স্থায়ী' মনুষ্য ও তাহার 'স্থায়ীভাব' সমূহ।

গত চারি সহস্র বৎসরের সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম এবং রাষ্ট্র প্রভৃতি যাবতীয় মনুষ্য-প্রতিষ্ঠানের ইতিবৃত্ত চিন্তা আমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছে যে, পৃথিবীতে 'মনুষ্যত্ব' নামে সংকেতিত জিনিষটি 'স্থায়ী' পদার্থ। মানুষ দেশকালের যেমন অবস্থাতেই জন্মগ্রহণ বা শিক্ষালাভ করুক্ না কেন, সকল মনুষ্যের হৃদয়বৃত্তিগুলির মধ্যে একটি সর্ব্বসাধারণ সাধর্ম্ম্য আছে। চিত্তবৃত্তির কার্য্য এবং নৈতিক আদর্শের মধ্যেও এমন কতকগুলি সর্ব্বসামান্য ধর্ম্ম আছে, মনুষ্যের ক্রিয়া কর্ম্ম এবং চিন্তাচেষ্টা কোন না কোন প্রকারে যাহাদের অনুপ্রকাশ না হইয়া পারে না। বলা বাহুল্য, এই সামান্যধর্ম্মতার আবিষ্ক্রিয়া হইতেই মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ধর্ম্মবিজ্ঞান, গণিতবিজ্ঞান প্রভৃতি মনুষ্যত্ব ক্ষেত্রের 'সামান্য লক্ষণ'-বিজ্ঞাপক 'বিজ্ঞান' শাস্ত্রসমূহের আবিষ্কার এবং প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে।

১০। 'স্থায়ী-ভাব'গুলিকে অবলম্বন করিয়াই স্থায়ী সাহিত্য।

এই 'স্থায়ী' মনুষ্যের 'স্থায়ী' হৃদয়ভাবসমূহকে অবলম্বন করিয়া এবং উহাদের পোষণ এবং পরিতৃপ্তিসাধন উদ্দেশ্য করিয়াই সাহিত্য-নামক নরচেষ্টা নরসমাজে দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং আমাদের দেশের সকল

সাহিত্যদর্শনের গ্রন্থেই প্রথমতঃ মনুষ্যের প্রবল 'স্থায়ীভাব'গুলির নিরূপণচেষ্টা দেখা যায়। এই সমস্ত 'স্থায়ীভাব' সাহিত্যের ক্ষেত্রে আসিয়া বাক্যমুখে প্রকটিত হইলেই উহাদের নাম হয়—'রস'। সুতরাং রসকেই প্রধান লক্ষ্য বলিয়া সাহিত্যশাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

এখন, মনোবিজ্ঞান বলিতেছে, মনুষ্য বিমিশ্র মনোবৃত্তির জীব। উহার চিত্ত মধ্যে যেমন ভাববৃত্তির, তেমন জ্ঞান এবং ইচ্ছাবৃত্তির কার্য্যও ওতপ্রোতভাবেই ঘটিয়া থাকে বলিয়া মনের এই 'ত্রিতয়' বৃত্তিকে মনুষ্যের মনঃস্রোতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌কৃত বা বিভক্ত করিতে পারা যায় না। অতএব, মনুষ্যের মনোবিজ্ঞান আদিবন্ধে নিজের অক্ষমতা জানাইয়াই এই জ্ঞান-ভাব ইচ্ছাবৃত্তির বিশিষ্ট ধর্ম্মনিরূপণ করিতে অগ্রসর হয়। এই কারণে বলিতে হয় যে, সাহিত্যের ঐ 'রস'-আদর্শের মধ্যে মনুষ্যের ভাববৃত্তিটুকু প্রবল এবং মুখ্য বটে, কিন্তু মনুষ্যের জ্ঞান এবং ইচ্ছার ধর্ম্ম এবং প্রভাব হইতে উহা কুত্রাপি সর্ব্বতোভাবে বিশ্লিষ্ট নহে।

১১। স্থায়ী সাহিত্যের 'রস'-আদর্শ।

অতএব জ্ঞানভাব এবং ইচ্ছার ক্ষেত্রে সুপরিব্যক্ত এবং স্থায়ী রসের সমাধান করিয়াই সাহিত্যের ভিত্তি দাঁড়াইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই হিসাবে মানুষের 'রসাত্মক' বাক্যচেষ্টামাত্রকেই ব্যাপকভাবে সাহিত্য বা কাব্য বলিয়া সাহিত্যদর্শন সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

১২। চরমবিচারের 'সত্যশিবসুন্দর' আদর্শ।

কিন্তু 'সাহিত্য' হইলেই ত চূড়ান্ত হইল না; উহার মধ্যে ভালমন্দ বা উচ্চনীচ ভেদ আছে। এই ভেদনির্দ্দেশ এবং সাহিত্যের উচ্চতম আদর্শ নিরূপণ করিতে গিয়াই সাহিত্যদর্শন মনুষ্যমনের উক্ত ত্রিতয় বৃত্তির দিকে নীতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্র হইতে আবার ফিরিয়া দৃষ্টিপাত করিতে বাধ্য হইয়াছে। সমাজবদ্ধ মনুষ্যের 'ভালমন্দ' বা 'উচ্চনীচ' আদর্শের সংস্কারমূলক নির্দ্ধারণার নামই নীতি। সাহিত্য এইরূপে উচ্চ অঙ্গের জ্ঞানবৃত্তির পরিপোষক আদর্শ দর্শন করিতে গিয়া দেখিয়াছে—সত্য! উচ্চ অঙ্গের ইচ্ছাবৃত্তির বা জগতের মঙ্গলসাধনী

বৃত্তির পরিপোষক আদর্শ দর্শন করিতে গিয়া দেখিয়াছে—শিব! উচ্চ অঙ্গের ভাববৃত্তির পরিপোষক আদর্শ দর্শন করিতে গিয়া দেখিয়াছে—সুন্দর! এইরূপে মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত ধর্ম্ম বা মনুষ্যের সকল জ্ঞানকর্ম্মভাবের চূড়ান্ত আদর্শকেই যেমন দেখিয়াছে—সত্য-শিব-সুন্দর, তেমনি সমস্ত চেষ্টার চরমগতি এবং ঔচিত্য নিরূপণ করিতে গিয়াও বলিয়াছে—সত্যং, শিবং, সুন্দরম্। এইরূপে মনুষ্যের সকল বাক্যচেষ্টার এবং সাহিত্য-সফলতার চূড়ান্ত বিচারের আদর্শকেও নিরূপণ করিয়াছে—"সত্যং, শিবং, সুন্দরম্!"

এ স্থানে দাঁড়াইয়া বলিতে পারি, ইহারই নাম মনুষ্যের অমৃত পিপাসা! উহার বশেই মানুষ অনাদিকাল হইতে নিজকে স্বর্গভ্রষ্ট এবং অমৃত-পুত্র বলিয়া ধারণা পূর্ব্বক ইহজীবন পরিচালনা করিতে চাহিতেছে! সকল অবস্থায় ঐ অপ্রাপ্ত সুখের এবং অজানা অমৃতের হৃত স্বর্গকে পুনঃপ্রাপ্ত হইবার তৃষ্ণাতেই লোলুপ থাকিয়া জীবনপথে চলিয়াছে! প্রাপ্তের বিষয়ে বিরতি, সন্নিহিতে অতৃপ্তি, সুদূর এবং অপ্রাপ্তের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস! ইহা সকল মনুষ্যের সাধারণ হৃদয়ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। ঐ অপ্রাপ্তের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা ধরিতে না পারাটাই মনুষ্যের সংসার-জীবনের যাবতীয় জ্ঞানকর্ম্ম এবং ভাবচেষ্টার মূল! উহা নিত্যকাল অনির্ব্বচনীয়। কিন্তু পায় নাই বলিয়া উহার বিষয়ে যে মানুষ একেবারে অন্ধকারে আছে, তাহা ত নহে! উহাকে 'জানে' যেমন বলিতে পারে না, তেমনি 'জানে না' বলিতেও পারে না। পথিকমাত্রেই 'উচ্চ' কিংবা 'নীচ' চিনিতে পারে! উহা হইতে দূরে কিংবা নিকটে চলিয়াছে, বুঝিতে পারে! উহার 'পথে' চলিয়াছে, কি অপথে চলিয়াছে, তাহাও সে বুঝিতে পারে। মনুষ্যের বুকের মধ্যেই এমন এক অনির্ব্বচনীয় পদার্থ আছে, যাহা তৎক্ষণাৎ 'ভাল বা মন্দ' ডাকিয়া উঠে! এই পদার্থটা কি, মনুষ্যের ঐ অতর্কিত উচ্চনীচবোধ এবং সুধাশ্রদ্ধার কারণ কি, উহার স্বরূপনির্ণয়ের নিষ্ফল চেষ্টায় মনুষ্যজাতির মধ্যে 'নীতিবিজ্ঞান' বলিয়া একটা বৃহৎ শাস্ত্রের জন্ম হইয়াছে।

যাহাই হউক, আমাদের মনে রাখা আবশ্যক যে, এই সত্য-শিব সুন্দর বা অতর্কিত উচ্চনীচ বুদ্ধির দ্বারাই চিরকাল সাহিত্য-ক্ষেত্রেও চূড়ান্তের বাছাই কার্য্য ঘটিয়া আসিতেছে। উচ্চ আদর্শের বিষয়ে উদাসীন সাহিত্যের প্রতি মনুষ্যের হৃদয় যেমন অতর্কিতে ঔদাসীন্য দেখাইয়াছে, তেমনি নীচতাজীবী বা নিম্নগামী প্রকৃতির সাহায্যকারী সাহিত্যকে অতর্কিতেই তুচ্ছ করিয়াছে।

১৩। উক্ত আদর্শে সাহিত্যবিবেক।

এই সমস্ত হইল মনুষ্যের মনস্তত্ত্বের গোড়ার কথা; মনুষ্যত্ববিষয়ক সকল সত্যের চূড়ান্ত সত্যকথা! কর্ম্মক্ষেত্রে কোনরূপ জোরজবরদস্তি করিয়া যেমন বিবেকের হাত এড়াইতে পারা যায় না, তেমন, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই বিবেকের হাত উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভবপর নহে; সুতরাং বলিতে হয় যে, স্থায়িভাবের ক্ষেত্রে আসিয়া এই সাহিত্য-বিবেকটিই 'স্থায়ী সাহিত্যের আদর্শ' রূপে আত্মপরিচয় করিতেছে। অতএব এই আদর্শটিকে তাহার আকৃতি এবং প্রকৃতির উভয় প্রকোষ্ঠে বিশ্লেষিত করিয়া দৃষ্টিপাত করাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হইবে।

প্রথমতঃ, স্থায়ী সাহিত্যের আকৃতি বা শিল্পের কাঠাম বিষয়ে, (Architechnic) মোট কথায় বলিতে পারা যায় যে, সাহিত্য যখন স্থায়িভাব লইয়াই ব্যাপৃত, তখন প্রখ্যাতবংশীয় এবং ধীরোদাত্ত দুষ্মন্ত-শকুন্তলার মধ্যে মনুষ্যহৃদয়ের যেই খেলা, রাম-শ্যাম-যদু এবং "তিনী-বিনী-কাশীর" মধ্যেও হয় ত অভিন্নভাবে সে খেলাই বিভিন্ন আকারে অভিনীত হইতেছে; এবং উহাকে অবলম্বন-পূর্ব্বক অবিকলভাবে উহার নক্সা আঁকিতে পারিলে কিংবা ফটোগ্রাফ তুলিতে পারিলেও হয় ত উহা সাহিত্যসংজ্ঞা-বহির্ভূত কিংবা অনাদৃত হইবে না। কিন্তু প্রধান কথা এই যে, অনাদৃত না হইলেই সাহিত্যের মাহাত্ম্য বা স্থায়ি-সাহিত্যের আদর্শ সুসিদ্ধ হইল না। মনুষ্যের সকল মনোবৃত্তির যেমন এক একটা আকার আছে,—অবশ্য, প্রাকৃত আকার নহে—তেমন মন মাত্রেই আকারজীবী এবং আকারবাদী।

১৪। সাহিত্যে 'আকৃতি' ও উহার শক্তি।

সাহিত্য মনোগতি-সম্মত আকার দান করিয়াই পদার্থকে মনুষ্যমনে স্থায়িভাবে মুদ্রিত করিতে পারে। সুতরাং সারস্বতক্ষেত্রে জ্ঞানভাব-ইচ্ছার বিষয়গুলি মনুষ্যমনে স্থায়িভাবে মুদ্রণ শক্তি লাভ করিতে হইলে ঐসমস্তকে মনুষ্যের মনস্তত্ত্ব সঙ্গতেই সত্য, শিব এবং সুন্দর হওয়া এবং সর্বশেষ প্রবল, উজ্জ্বল এবং মহৎ হওয়া চাই! এই কারণে অতিশয়োক্তি, সারস্বতক্ষেত্রের একটা স্বীকার্য্য এবং অপরিহার্য্য রীতি। সকল সাহিত্য-শাস্ত্রের অলঙ্কার অধ্যায়ে নিবিষ্টভাবে দৃষ্টি চালিত করিলেই দেখিব, সাহিত্যে বর্ণনাবিষয়ে প্রকৃতপ্রস্তাবে কেবল দুইটি মাত্র অলঙ্কার;—স্বভাবোক্তি এবং অতিশয়োক্তি। স্বভাবোক্তিও বাস্তবিক অতিশয়োক্তি। 'অবিকল স্বভাবোক্তি' বলিয়া কোন কথা সাহিত্য-শাস্ত্রে নাই—মনুষ্য-মনের গঠন, প্রকৃতি এবং আকারবাদিতার দরুণ অবিকল স্বভাববর্ণন দুর্ব্বল এবং নগণ্য না হইয়া পারে না। নিজের অন্তরের কথা বাহিরে আনিয়া পরকে শুনাইতে হইলে, যেমন কেবল মনে মনে উচ্চারণ করিয়া গেলেই চলিবে না; কথার পক্ষে, মনুষ্যের কর্ণপটহে আঘাত করিয়া, মনুষ্যমনের প্রবৃত্তি এবং প্রচলিত ভাষাসঙ্কেত সম্মতে যেমন মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত তাহার আঘাতটিকে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য শক্তিশালী হওয়া আবশ্যক, তেমন সাহিত্য-শিল্পকেও, মনুষ্যের চিত্তপটে স্থায়িভাবে মুদ্রিত হইতে হইলে, মনুষ্য-মনের প্রবৃত্তি অনুসরণেই উহার আকৃতি প্রকৃতিকে যথোচিত প্রাবল্যদান পূর্ব্বক উপস্থিত করিতে হইবে। মনুষ্যের মনোযোগ আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহার হৃদয়কে "বচনরচনৈঃ ক্রীত" করিয়া রাখিবার জন্য সাহিত্যকে যেমন মানব অন্তঃকরণের আকার-বাদিতার খোরাক জোগাইতে হইবে, তেমনি মানবের জ্ঞানভাবসৌন্দর্য্য-পিপাসী অন্তরাত্মার উপযোগী 'পিপাসার জল' যোগাইয়াই হৃদয়গ্রাহী হইতে হইবে। স্বীকার করিতে হয়, এ স্থলেই আমরা একটি প্রবল বিবাদক্ষেত্রের সম্মুখীন হইয়াছি! সাহিত্যের কোন্ আকৃতি সার্ব্বজনীন মনোযোগমুদ্রা লাভ করিতে পারে? শিক্ষা-দীক্ষার বিভিন্নতাগতিকে মনুষ্যমনের গ্রাহিকা শক্তির যেমন তারতম্য ঘটে, তেমন মনের পরিতৃপ্তির আদর্শেও মানুষে মানুষে অনন্ত ভেদ উপজাত হইতে পারে। বলা বাহুল্য, এই

কারণে সাহিত্যের আকৃতি বিষয়ে মনোবিজ্ঞান কোন বিশ্বজনীন আদর্শ বস্তু নিরূপণ করিতে অপারগ হইতেছে। তবে, আমরা দেখিব যে, মানবসভ্যতার বর্ত্তমান অবস্থায় এ ক্ষেত্রে বাক্যচেষ্টা একেবারে অনর্থক নহে। এই যুগে সকল দেশের সাধারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে মানবের সারস্বত সম্পদ বিষয়ে এমন অনেক সাধারণ চিত্তধর্ম্ম আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহাকে জোরের সহিত মননশীল মনু-সন্তানমাত্রের সাহিত্যবিবেক বলিয়া উপস্থাপিত করিতে পারা যায়।

১৫। রামায়ণ প্রভৃতির 'আকৃতি' আদর্শ।

স্থায়ী সাহিত্যমাত্রকেই মনুষ্যের চিত্তসমক্ষে স্থায়ী রেখাপাতে শক্তিশালী 'আকৃতি' সাধন করিতে হয়; তার পর ঐ আকৃতিকে মনুষ্যের গণনীয় এবং মহনীয় করিয়া উপস্থিত করিতে হয়। ঈলিয়ড কি অডিসী, রামায়ণ মহাভারত কিম্বা ডিভাইন কমিডী প্রভৃতির অন্তরে, এক একটি মহাজাতি-সংঘের প্রাচীনাগত বাক্যশিল্পগুলির অভ্যন্তরে, দৃষ্টি করিলেই দেখিব যে, উহারা সর্ব্বপ্রথম সামাজিকগণের হৃদয় আকর্ষণে শক্তিশালী বিষয়বস্তুর আকৃতিগত মাহাত্ম্য সিদ্ধ করিয়াই যুগযুগান্তরজীবী হইয়া আসিয়াছে। উহারা ঐ গুণে দেশের এবং কালের বিভিন্নতাধর্ম্মী সকল রুচিগত পার্থক্য এবং বিবর্ত্ত উত্তীর্ণ হইয়াই আধুনিক কালে আমাদের দৃষ্টিসমক্ষে উপস্থিত হইয়া দণ্ডায়মান আছে। উহাদের মধ্যে হয় ত অনেক স্থলেই আধুনিকের রুচিসঙ্গত মাহাত্ম্য বা সরসতা নাই। কিন্তু আকৃতি! অবলম্বিত বিষয় বস্তুর প্রবল, অমোঘ এবং অজেয় আকৃতিধর্ম্মে পরিস্ফুট এবং তেজস্বী হইয়াই উহারা অতুলনীয় বাণীশিল্পরূপে মনুষ্যমনে গৌরবের আসন রক্ষা করিতেছে! মনুষ্যের চিত্তক্ষেত্রে এই আকৃতির বিশেষত্ব এবং শক্তিমত্তা এত যে, উহারা অনেক সময় যেন তত্তদ্দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রকেও 'না-বহাল' করিয়াই সমাজের হৃদয়জয় পূর্ব্বক 'অনভিষিক্ত সম্রাট' হইয়া আছে। এই আকৃতি কি, এবং প্রাচীন সাহিত্যিকমাত্রই উহাকে কাব্যের মাহাত্ম্য বিষয়ে কত অপরিহার্য্য মনে করিতেন, তাহার দৃষ্টান্ত সৌভাগ্যক্রমে বাল্মীকি রামায়ণের প্রথমেই পাওয়া যায়। সৌভাগ্য বলিব কেননা, সকল

প্রাচীন সাহিত্য ঘাঁটিয়া আসিলে উহার জুড়ি মিলিবে না; উহার মধ্যে একেবারে কাব্যশিল্পীর ঘরের কথাটাই ফাঁস হইয়া গিয়াছে।

১৬। বাল্মীকি কর্ত্তৃক কাব্যচেষ্টার জন্য 'আকৃতি'-নির্ব্বাচন।

বাল্মীকি রামায়ণ-রচনার গোড়ার কথা। রত্নাকর দস্যু—তাহার হৃদয় শুষ্ক। জীবন কিংবা জগতের দিকে কোন মহৎ ভাব, পরিব্যাপ্ত দৃষ্টি কিংবা গভীর প্রেমে তাহার হৃদয় উদ্‌বুদ্ধ নহে, বরঞ্চ উহার বিপরীত। এই অবস্থায় অকস্মাৎ মহাজনসঙ্গমে বর্ব্বরজীবনে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিল! হৃদয়ের আজন্মবদ্ধ উৎসমুখ খুলিয়া গেল, যেন আজন্ম অবিজ্ঞাত ভাবপ্রবাহের প্রেরণা মহাবন্যায় পরিণত হইয়া পৃথিবী পরিপ্লাবিত করিতে উদ্যত হইল। এই অশিক্ষিত, অকুশলী মনুষ্য আত্মহৃদয়ে দীপ্তজাগ্রত সারস্বতশক্তির উদ্বেগে আপনারই নাভিগন্ধমত্ত মৃগের ন্যায় দিশাহারা হইয়া ঘুরিতে লাগিল। কিছুই খুঁজিয়া পায় না! জীবন অভাবনীয় স্থলকম্পে উলটপালট হইয়া গিয়াছে, অতীতের ভিত্তি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধ্বসিয়া গিয়াছে; উলঙ্গ, উন্মত্ত, অজ্ঞাত-সমুত্থ মনুষ্যহৃদয় কি অবলম্বন করিবে? নিজের প্রাণ কি চায়, তাহাও কি সে বুঝিতে পারিয়াছে? দেখিতে গেলে, এই নাভিগন্ধী আকুলতাই প্রতিভাতত্ত্বের গোড়ার কথা। আপন অন্তরাত্মার অজ্ঞাত ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য অথবা আপনাকে বাহির করিয়া বিলাইয়া দিবার জন্য, এই যে অচিন্ত্যপূর্ব্ব আকস্মিক উচ্ছ্বাস, ইহা যেমন সারস্বতী প্রতিভার, তেমন মনুষ্যের জ্ঞান-কর্ম্মক্ষেত্রের সকল মহাপ্রাণতার আদিম তন্মাত্রা। এই উন্মত্ত ঘোরাঘুরির পরেই প্রতিভা আপনার সুমেরুশিখরে আত্মজাগরণ লাভ করে। নিজের অন্তর্দ্দাহী ক্ষুধার আকাঙ্ক্ষাও বুঝিয়া উঠিতে পারে। বাল্মীকিও বুঝিলেন। দস্যুর অন্তরাত্মা প্রেমাকুল হইয়াছে! বিশ্বসংসারে নিজের মহাপ্রাণকে মহনীয়ভাবে বিলাইয়া দিবার জন্য আকুল—নব-প্রবুদ্ধ মনুষ্য-প্রেমে আকুল! প্রয়োগ-প্রকরণ জানা নাই, প্রকাশের অবলম্বন-উদ্দীপন বস্তু বিষয়ে কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান নাই, কি করিয়া নিজকে প্রকাশ করিবেন! বাল্মীকি ভবঘুরে হইয়া বাতুলের ন্যায় হাসিয়া-কাঁদিয়া ঘুরিতেছেন। প্রকাশের মূল

তত্ত্বে এই হাসি-কান্নার শক্তি! এই মহত্তত্ব হইতে প্রবর্ত্ত প্রাপ্ত করিয়াই কাব্য স্থষ্টির নিদানভূত নবরসের উদ্ভব। রত্নাকরবৃত্তান্ত এতদ্দেশের পাঠকমাত্রের জানা কথা। যাহা রামায়ণে দু'টি কথায় সঙ্কেতিত হইয়াছে, আমাদের দেশের একজন কবি উহাকেই ভাবানন্দময় কাব্যবিগ্রহে ধারণা করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন। বিহারীলালের সারদামঙ্গল এ'রূপ অবলম্বনহীন, ভবঘুরে প্রতিভা-বস্তুর ধারণায় স্বয়ং একটি ভাবোন্মাদ-ময় এবং দিশাহারা উল্লাস! অনেক স্থলে অর্থহারা উচ্ছ্বাস! সারদামঙ্গলের আদ্যন্তমধ্য কবিত্বশক্তির প্রকাশ-প্রেরণাময় মহত্তত্ত্বেই ওতপ্রোত! বিহারীলাল বাল্মীকিকে চিত্তবিকাশের যে স্থানে রাখিয়া যান, শিষ্য রবীন্দ্রনাথ তথা হইতেই তাঁহাকে লইয়া পরিনতি শিখরে তুলিয়া ধরিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের "ভাষা ও ছন্দ" নবজাগরণ-প্রাপ্ত, অবিনশ্বর সঙ্গীতোন্মুখ এবং স্থষ্টিসম্মুখ বাল্মীকিচরিত্রের প্রাণতত্ত্ব ধারণায় অনুপমভাবে উজ্জ্বল। আদিকবি নিজের মহাপ্রাণে অর্দ্ধজাগরিত হইয়া আত্মপ্রকাশের অনুরূপ আলম্বনবস্তু অন্বেষণে ঘুরিতেছেন! হৃদয়ের অনির্ব্বাচ্য, অবিতর্কিত আকুলতাকে বিষয়বতী এবং মনের স্থিতিবন্ধনী ও মূর্ত্তিমতী করিবার জন্য 'খুটি' খুঁজিতেছেন! আবার মহাজনসঙ্গ। "নিবাও—আমার প্রাণের আগুণ নিবাও! বলিতে পার, কি করিয়া, কি ধরিয়া আমার এই প্রানমনঃপ্রমাথী মহাক্ষুধার খাদ্য লাভ করিব? আমার সমস্ত হৃদয়ের পরিপূর্ণ মধুমত্ততা মনুষ্যের মনন-সই করিয়া উপস্থিত করিব? জগতে এমন কি কোন পদার্থ আছে, ইতিহাসে বা পুরাণে, মনুষ্যলোকে বা দেবলোকে, উচ্চতায় এবং গভীরতায় মহাপ্রাণ চরিত্রঘটনা এবং ভাবুকতার এমন কি কোন সম্মিলন আছে, যাহাকে অবলম্বন করিয়া আমি আকুল প্রাণকে পূর্ণপ্রকাশ দান করিতে পারি?" উহার পর নারদ বাল্মীকির নিকট যেই 'নর-চন্দ্রমা'র উদ্দেশ করেন, এবং বাল্মীকিও অন্তঃসিদ্ধ সহানুভূতির বশেই যাঁহার বৃত্তকথা পরমাগ্রহে গ্রহণ করেন, তাহার ফলে কি দাঁড়াইয়াছে, সে বিষয় অন্ততঃ ভারতবর্ষে বিশদ করিতে হইবে না। বাল্মীকিরামায়ণ প্রাচীন আর্য্য-ভারতের সমগ্র হৃদয়টির প্রতিনিধি! ঐ দস্যু ভারতবর্ষের অনভিষিক্ত

সম্রাট্ বলিলেও অত্যুক্তি হয় কি ? এই মহাদেশের সম্পূর্ণ হৃদয়, উহার পরিবার, সমাজ এবং ধর্ম্মতন্ত্রের অন্তরঙ্গ সুর, উহার নিত্য আত্মার আশা এবং আদর্শের স্বপ্ন, উহার পিতৃতন্ত্র, সৌভ্রাত্রতন্ত্র এবং দাম্পত্যতন্ত্রের আকৃতি-প্রকৃতি রামায়ণে যেই অনুপম প্রমূর্ত্তিলাভ করিয়া হাজার হাজার বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের হৃদয় অধিকারপূর্ব্বক ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহার তুলনা নাই।

এখন, বুঝিতে হয়, সাহিত্যে এই আকৃতি-প্রকৃতির নির্ব্বাচন! বাল্মীকি আপনার মহাপ্রাণ হৃদয় এবং অন্তর্জীবনের পরম-সংবুদ্ধ সহানুভূতির সাহায্যে যে বিষয়টি গ্রহণ করিয়া উহার মধ্যে নিজের এবং দেশের অন্তরাত্মার পরিপূর্ণ প্রকাশ সিদ্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, উহা সাহিত্যক্ষেত্রে পরমতম সৌভাগ্যের দৃষ্টান্ত। বলিতে হইবে, এইরূপ সৌভাগ্যযোগ না ঘটিতে পারিলে, কিম্বা বাল্মীকি কেবল আধুনিক কালের 'গীতিকবি' মাত্র হইলে, কবিত্বের ওই বিষয়-বোধ-কলুষ ভাবাকুলতা কেবল খণ্ড খণ্ড সঙ্গীত, গীতি-কবিতা বা সনেটজাতীয় কবিতাতেই পরিসমাপ্ত হইত। রামচন্দ্রের মাহাত্ম্যদীপ্ত হইয়া এরূপ শত শত কবি বাল্মীকির পূর্ব্ব হইতেই সম্ভবতঃ খণ্ড খণ্ড কাহিনী এবং সঙ্গীতচেষ্টায় ভারতবর্ষ মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। বাল্মীকি তাঁহাদের সকলকেই গিলিয়া এবং পরিপাক করিয়া, এ'দেশের সাহিত্য-ইতিহাস হইতে তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত মুছিয়া দিয়াছেন! লুপ্ত কবিগণের অনেকের ভাবুকতা হয়ত বাল্মীকি হইতেও ন্যূন ছিল না; কিন্তু, কবি-গুরুর এই আকৃতি-দৃষ্টি এবং গঠনশক্তি যে ছিল না এবং উহার অভাবেই যে তাঁহারা তলাইয়া গিয়াছেন, তাহা বিনা বিচারে স্বীকার করা যায়। বিশেষতঃ, বাল্মীকির সৃষ্ট অথবা অবলম্বিত বিষয়বস্তুর রমনীয় এবং সৌন্দর্য্য-মহনীয় আকৃতির গতিকেই রামায়ণ উদ্বর্ত্তিত হইয়া, দেশকালসংক্রান্ত মানবরুচির বিবর্ত্তজয়ী এবং কালজয়ী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বর্ত্তমান কালের কাছাকাছি আসিয়া বিপরীত দিক হইতে বলিতে পারি যে, কেবল ভাবুকতা, ভাবাকুলতা, জীবনের সত্যদর্শন বা

মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ বিষয়ে গভীরতা, অণুপরমাণুদর্শিণী সূক্ষ্মতা প্রভৃতি যতই মনোরম এবং লোভনীয় হউক না কেন, স্থায়িসাহিত্যের ক্ষেত্রে এবং মনুষ্য-মনে স্থিতি-নিষ্ঠার পক্ষে ঐ সমস্তের নিদারুণ অস্বস্তি আছে। মনুষ্যের মনমাত্রেই মূর্ত্তিবাদী; সুতরাং শিল্পমাত্রেই মনুষ্যের মননসহই এবং স্ফুটাবয়ব হইয়া প্রমূর্ত্ত হইতে না পারিলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেও পারে না। সাহিত্যতন্ত্রে ভাবের উচ্চতা কিম্বা সূক্ষ্মতাকেও সমুচিত আকার সংগ্রহ পূর্ব্বক পাঠকের ধারণাক্ষেত্রে যথেষ্টমতে প্রবল হইয়াই তাহার মনোমন্দিরে স্থিতি এবং প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে হয়। উহা না পারিয়াই এ কালের অনেক উৎকৃষ্ট 'ভাবগত' শিল্প, প্রাচীন 'ক্লাসিক'-আদর্শ সাধক-গণের বৃহৎপ্রমূর্ত্তি এবং উচ্চমহৎ বস্তুস্ফুর্ত্তির সমক্ষে অপ্রতিভ হইতেছে। সূক্ষ্মের মধ্যে যে বৃহত্ব বা অসীমত্ব আছে, তাহা মনুষ্যের বুদ্ধিগম্য; ক্লাসিক শিল্পের স্ফুট রসবত্তা ও বস্তুগত ব্যঞ্জনা এবং প্রাবল্য ন্যূনাধিক হৃদয়গম্য। আবার, কাসিক শিল্পের সূক্ষ্মতাও রূপক-জীবী এবং আকার-বাদী বলিয়াই প্রবল এবং সোজাসুজি ভাবে আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে; মনেও স্থিতিশীল এবং স্থিরব্রত হইয়াই মুদ্রিত হইতে পারে।

১৭। সাহিত্যে আকৃতিহীন ভাবুকতাপ্রভৃতি।

মনে করুন, প্রাচীন আদর্শের কাব্য মেঘদূত যক্ষের প্রেমাবেশ এবং আসঙ্গক্ষুধা এবং যক্ষপ্রিয়ার অলকাবাসিণী সৌন্দর্য্যসুধার উপস্থাপনপূর্ব্বক উভয়ের মধ্যে রামগিরি হইতে সুদূর অলকার মধ্যপথে ভারতভূমির দুর্গম্য নদনদীজনপদ এবং পর্ব্বত-কান্তারের ব্যবধান রচনা করিয়া হৃদয়-গ্রাহী বিরহের দীর্ঘনিশ্বাসময় যাত্রাকাহিণী রচনা করিয়াছে। আমাদের বঙ্গসাহিত্য এই প্রকার প্রেম এবং বিরহ-বেদনার খণ্ড কবিতায়, আসঙ্গলিপ্সার সনেট, গীতিকবিতায় এবং সঙ্গীত-কবিতায় ভরপূর! অনেকের মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতম ভাবোচ্ছ্বাসের দৃষ্টান্তও মিলিবে। তবু উহাদের কোনটাই মেঘদূত কাব্য অপেক্ষা উচ্চতর হইতে কিংবা উহার সমান প্রতিষ্ঠাও লাভ করিতে পারিতেছে না! যক্ষের

১৮। কালিদাস কর্ত্তৃক বিরহ-কাব্য-চেষ্টায় মেঘ-দূতের আকৃতি নির্ব্বাচন।

মন্দাক্রান্তা-তরঙ্গভঙ্গী, স্ফুটমূর্ত্ত, মহাপ্রাণ উচ্ছ্বাসের সমক্ষে আমাদের অধিকাংশ প্রেমকাব্য বা বিরহকাব্য তাই যেন নিতান্ত tame, মনমরা এবং কাহিল, ঢিমা-তেতালার সঙ্কোচগ্রস্ত এবং অজীর্ণতার বাতিকগ্রস্ত বলিয়াই প্রতীয়মান হইতে থাকে! কালিদাসের ন্যায় যক্ষসদৃশ উচ্চবৃহৎ পাত্রবস্তু এবং স্বর্গমর্ত্ত্যবিহারী উদার-উজ্জ্বল ভাবুকতার সহিত সমুদ্রকল্লোলশীল ছন্দ-উচ্ছ্বাসের সম্মিলন-ঘটনার সৌভাগ্যলাভ করিতে পারে নাই বলিয়াই আমাদের এত সমস্ত প্রেম এবং বিরহের কবিতা—হয়ত অনন্যসাধারণ সূক্ষ্মতা দেখাইয়াও—সমুচিত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিল না। ইহার মূল কারণটির বিষয়ে প্রত্যেক শিল্পীকেই জাগরিত হওয়া উচিত। শিল্পের ঘটনাভূমি, Architechnique বা গঠনের কাঠাম এবং নির্ম্মিতি-পদ্ধতির উপরেই প্রকারান্তরে রস-সিদ্ধির সর্ব্বস্ব নির্ভর করে।

আরও দেখুন, যক্ষের স্থলে একটি চাষাকেই নায়করূপে বসাইয়া আরম্ভ করিলে, মেঘের স্থলে একজন 'ডাকের হরকরা' অথবা যেমন-তেমন বার্ত্তাবাহক অবলম্বন করিলে, সমস্ত কাব্যটির রসক্ষেত্র এবং ভাব ও সত্য-সাধনার আবহাওয়া বিলকুল উলটপালট হইয়া যাইত। অতিমানুষ যক্ষের পক্ষে অসামান্য আবেগের বশবর্ত্তী হইয়া আকাশবিহারী মেঘ-পুরুষকে 'সখা' সম্বোধন পূর্ব্বক দৌত্যকর্ম্মে নিযুক্ত করা আমাদের কল্পনাক্ষেত্রে কিছুমাত্র বাধে নাই! মেঘদূতের প্রথম কয়টি শ্লোকেই কবি মনুষ্যের চিত্তকে অবলীলাক্রমে বৃহৎ এবং সমুচ্চ কল্পনা-ভূমিতে উত্তোলন পূর্ব্বক উহাকে অভাবনীয় ভাব-তরঙ্গের গ্রাহক হইবার জন্য প্রস্তুত করিয়া লইলেন! সাধারণ্যের দুরারোহ, সমুচ্চ শিখরমঞ্চে স্বয়ং ভাবোদ্দীপ্ত হইয়া এবং অসামান্য বাক্‌প্রয়াসে সমুত্থিত হইয়া দাঁড়াইলেন! যক্ষ ব্যতীত অপর কোন পাত্রের দ্বারাই মেঘদূতের ভূমিকা-গ্রহণ সমীচীন হইত না। যক্ষ নামের সংস্কার-সাহায্যে অমানুষিক ভাবুকতার উচ্ছ্বাসভূমি এবং জীবনভূমির ভিত্তি-পাত করিতে না পারিলে, আকাশের উপর দিয়া প্রেমদীপ্ত এবং বিরহক্ষিপ্ত হৃদয়কে অভিসারে প্রেরণ করিতে না পারিলে, উর্দ্ধ হইতে সমস্ত ভারতবর্ষের সৌন্দর্য্যনিমন্ত্রণ-মুখর হৃদয়কে এইভাবে প্রতিপদে

আলিঙ্গন পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে পারা যাইত না। মেঘদূতের প্রধান Deus ex Machina বা প্রয়োগযন্ত্র—যক্ষের সৌন্দর্য্যপিপাসী এবং সকল প্রকার সৌন্দর্য্যের মধ্যেই প্রিয়তমার প্রেমস্পর্শবিলাসী অন্তরাত্মা! এ'রূপ যক্ষাত্মার অনাকুল স্বচ্ছন্দগতির জন্য সমুচিত রঙ্গভূমির সংস্থান করিতে না পারিলে, এই দৌত্য-ব্যাপার একেবারে মাটী-ঘেঁসা হইয়া পড়িত। মেঘদূতের সৃজনীপ্রতিভা এইরূপে সমুন্নতপাত্রপাত্রী, সমুচ্চ জীবনভূমি, স্বচ্ছন্দ লীলাক্ষেত্র এবং মনুষ্যহৃদয়ের আসঙ্গ লিপ্সারূপী নিত্যবলীয়ান্ স্থায়ীভাব অবলম্বন পূর্ব্বক একটী নিত্যজীবী কাব্যের সৃষ্টি করিয়াছে; মনুষ্যের অনুভব-ক্ষেত্রে নিত্যপ্রবল ভাব ও আকৃতির শক্তিমুদ্রা-শালী কাব্যগাথার সৃষ্টি করিয়াছে! অন্যথা, উহা একটা কৃষাণদূত অথবা পদাঙ্ক-দূত হইয়া পড়িত! পদাঙ্কদূতের নিন্দা করিতেছি না। কিন্তু, বিষয় ভূমির অবস্থা, উহার আবহাওয়া এবং পরিবেশের অনুরোধেই যে উহাতে মেঘদূতের বৃহদানন্দশীল এবং গগনবিহারী অন্তরাত্মার সচ্ছন্দলীলা ঘটাইতে পারা যায় না, এবং পারা যায় না বলিয়াই যে উহা মনুষ্যের বৃহত্ত্ববিলাসী এবং বৃহদানন্দপিপাসী নিত্য আত্মার সমক্ষে মাহাত্ম্যলাভ করিতে কিংবা চিত্তপটেও স্থায়ীভাবে মুদ্রিত হইতে পারে না! কোন সূক্ষ্মতানন্দী সনেট বা নিরাকার-ভাবানন্দী গীতি-কবিতাও যে মেঘদূতের বাস্তবী শক্তি এবং বিমানবিহারী, ঘনাবর্ত্ত উচ্ছ্বাস উপার্জ্জন করিতে পারে না!

১৯। আকৃতি-নির্ব্বাচন বিষয়ে আধুনিক সাহিত্যের অভাব ও অস্বস্তি।

আকৃতির প্রসঙ্গেই প্রাকৃতবাদকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারা যায় যে, "প্রখ্যাত বংশো রাজর্ষি ধীরোদাত্ত প্রতাপবান্" ইত্যাদি প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের শাস্ত্রবিধি একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। এইরূপ শাস্ত্রবাক্যের আভ্যন্তরীণ মর্ম্মটির দিকেই দৃষ্টি করিতে হয়। উহাকে কেবল একটা বহিরঙ্গীয় বৃহত্ত্বের বিধি মনে করিয়া 'শিকায়' তুলিলে আমরা হয় ত শিল্পতন্ত্রের মূল শক্তি বিষয়েই প্রবঞ্চিত হইব। স্পষ্টভাবে বলিয়া ফেলিতে হইলে, শিল্পের আন্তরিক বৃহত্ত্ব বা অসীমত্ব প্রতিষ্ঠার পক্ষে, বৃহত্ত্বের উদ্দীপক বাহ্যিক কাঠাম অনেকস্থলেই অপরিহার্য্য।

যে কবি উহা ঘটনা করিতে পারিলেন না, তাঁহাকে উক্ত অক্ষমতাগতিকেই মনুষ্যের মননক্ষেত্রে নিয়ত অস্বস্তি ভোগ করিতে হইবে। চরম বিচারের সময় উহাই হয় ত দুর্নিবার হইয়া দাঁড়াইবে। ইহা সনাতন মনুষ্য-হৃদয়ের সনাতন অনুভব-তত্ত্বের কথা! তেমন, সূক্ষ্মত্ব বা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ বিষয়েও বলিতে পারা যায় যে, সমনুরূপ আকৃতি এবং সমুন্নত ঘটনা-বস্তুর আলম্বন এবং উদ্দীপন ব্যতীত শিল্পের ক্ষেত্রে ঐ সমস্তও সবিশেষ মূল্যবান্ হইতে পারে না। প্রেমিক-প্রেমিকার সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভ-মূলক বিলাসলীলার কত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবৃতিবাহুল্যে আধুনিক সাহিত্যজগৎ—উপন্যাস-জগৎ একেবারে ভরপূর হইয়া উঠিয়াছে! কিন্তু সেক্সপীয়র এণ্টনী ও ক্লীওপেট্রার প্রেমবিলাস অবলম্বনে, ২০০ পৃষ্ঠার মধ্যে, যে চিত্রপট অঙ্কিত করিয়াছেন, উহার মধ্যে যে সূক্ষ্মদর্শিতা দেখাইয়াছেন, দুইজন স্ত্রীপুরুষের বিলাস-ব্যভিচারের সহিত সমস্ত পৃথিবীর স্থিতিগতির সমযোগিসম্বন্ধ প্রদর্শন পূর্ব্বক যেই পরিণাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ঐ ক্ষুদ্র গ্রন্থের শিল্পসমাধান এবং উচ্চবিপুল, বৃংহিতিময় পরিকল্পনার সমক্ষে আধুনিক 'প্রাকৃতবাদের' বা বিশ্লেষণীরীতির পঙ্কবলুম-কল্পিত কাহিনী ও জীবনচিত্র একেবারে নর্দ্দামার ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়! 'এণ্টনী এবং ক্লীওপেট্রা' মনুষ্যের চিত্তপটে যে অনপনেয় মূর্ত্তি অঙ্কিত করে, উহার কারণ চিন্তা করিতে গেলেই আধুনিকের দুর্ব্বলতা পদে পদে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে।

সুতরাং, যেমন অ-বস্তুনির্ভর ভাবুকতা, তেমনি সর্ব্বপ্রকার বিবরণবহুল অথবা বিশ্লেষণবহুল সূক্ষ্মতার বিষয়েও বলিতে পারা যায় যে, সমুচিত আকৃতি ব্যতিরেকে শিল্পসিদ্ধির ক্ষেত্রে কাহারও প্রকৃত মাহাত্ম্য নাই। উচ্চ সাহিত্য-সৃষ্টির মূল শক্তিটীর নাম 'সংশ্লেষণী'—'বিশ্লেষণী' নহে! স্থায়ীসাহিত্য রচনা করিতে হইলে, আদৌ বিষয়টিকে দৃঢ়সমুন্নত আতিশয্যের ভূমিতে স্থির করিতে হয়। স্থায়ীভাবের উদ্দীপনার সৌকর্য্যার্থে, উহাকে একদিকে যেমন পাঠকহৃদয়ের সান্নিধ্যে আনিয়া উহার সোজাবুদ্ধির অনুভূতি-গম্য করিতে হয়, তেমনি অন্যদিকে, উহাকে একেবারে কোলঘেঁষা বা

মাটিঘেঁষা না করিয়া কিয়ৎপরিমাণে দূরত্বাবচ্ছিন্ন করিতে হয়। 'চিরকালের শিল্প' মাত্রকেই পাঠকের অনুভবসম্পর্কে যুগপৎ নিকটে-এবং-দূরে অবস্থিত হওয়া চাই। উহার মধ্যে, একদিকে যেমন সাধারণের ভাববুদ্ধির সহজগম্য স্পষ্টতা এবং উজ্জ্বলতা থাকা আবশ্যক, অন্যদিকে, অসাধারণ ভাববুদ্ধির পক্ষেও দুরধিগম্য কিঞ্চিৎ রসাত্মতা, সত্যে অভিনিবেশ এবং সূক্ষ্মতা থাকাও চাই। আধুনিক কালের অনেক প্রসিদ্ধ শিল্পের মধ্যে, অনেক তথাকথিত 'বাস্তববাদী' শিল্পীর সাহিত্যনির্ম্মানের মধ্যে যে এই মুখ্য গুণ নাই, এবং সে জন্যই যে উহাদের অধিকাংশ স্থায়ী-সাহিত্যের আমল হইতে আদৌ ভ্রষ্ট হইতেছে, তাহাতেও সন্দেহ হয় না। কেবল বঙ্গসাহিত্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া এই কথা বলিতেছি না; সমগ্র সাহিত্য-জগতের আধুনিক সাহিত্যার্জ্জনকে লক্ষ্য করিতেছি। অনেক গ্রন্থে হয় ত চূড়ান্তরূপে নানা প্রকার দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক সত্যসিদ্ধি আছে। স্বভাববর্ণন, স্বাভাবিক চরিত্র-চিত্রন, সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব-ময় চরিত্রবিশ্লেষণ, সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম 'ভাব' দর্শন, পরিপাটিরূপে পারিবারিক সামাজিক বা নৈতিক সমস্যা-বিশেষের ধারণা, এতসমস্ত গুণে উহাবা পাঠকালে হয় ত চিত্তকেও সবিশেষ আবিষ্ট করে। কিন্তু এ সমস্ত সত্ত্বেও যে গ্রন্থ উৎকৃষ্ট সাহিত্যশিল্প হয় না, তাহা, পাঠ শেষ পূর্ব্বক দুই তিন দিবস পরে, গ্রন্থটির শক্তি অনুধ্যান করিতে বসিলেই অনুভূত হইবে। যাহা প্রতিপত্রে এত 'ভাল লাগিয়াছিল', মনের মধ্যে তাহা কোন দিকে কিছুমাত্র প্রভাব মুদ্রিত করিতে পারে নাই! অথবা যাহা পারিয়াছে, কোন দিকে তাহা প্রচুর কিংবা যথেষ্ট নহে! গ্রন্থশক্তি যেমন আমাদের বাস্তব বুদ্ধির ক্ষেত্রে কোন মহার্ঘ সংস্কার সৃষ্টি করিতে পারে নাই, তেমনি অন্তরের কোন আধ্যাত্মতন্ত্রী পরিস্পর্শ করিয়া উহাকে কোনরূপ উচ্চমহৎ কিংবা প্রবল ভাবুকতায় ঝঙ্কারিত করিয়াও তুলে নাই! অর্থাৎ, উহা অন্তরাত্মাকে কোন স্থায়ী ভাবে অধিকার করে নাই। সুতরাং, এমনস্থলে জিজ্ঞাসুমাত্রের সমক্ষে কতকগুলি প্রশ্নের সমাধান অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। কোন্ দোষে এই দুর্ঘটনা ঘটিতেছে? যিনি এত ভাল লাগিয়াছিলেন, হয় ত প্রতিপত্রে চিত্তকে চেতাইয়া, আবিষ্ট

করিয়া, অনির্ব্বচনীয় মাধুরী এবং অসীমের ভাবাভাস দিয়াই চলিতেছিলেন, তিনি কোন্ দোষে আমার চিত্তপট এবং ভাবজীবন ও অধ্যাত্মজীবন হইতে একেবারে মুছিয়া গেলেন? দোষ আমার, না শিল্পীর? ওই গ্রন্থের "ভাললাগা" নামক ব্যাপারটি স্থায়ী ভাবের আনন্দ, না কেবল বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক বৃত্তির কৌতুকতৃপ্তি? অন্তরাত্মার নিত্য-রসাল খাদ্য, না কেবল নৈমিত্তিক উত্তেজনার নেশা? প্রকৃত সৌন্দর্য্য-উপার্জ্জন, না কেবল প্রবৃত্তির ব্যায়াম চর্চ্চা এবং অনাহারী নেশার খাটুনি? যে কোন আধুনিক শিল্প লইয়া উহার শক্তিতত্ত্বে জিজ্ঞাসা পরিচালিত করিলে, প্রত্যেকেই সদুত্তর লাভ করিতে পারেন।

২০। আধুনিক ইয়োরোপের নবেল-সাহিত্য, উহার অস্থায়ী সাময়িক লক্ষণ।

'নবেল' সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। নবেল আধুনিক সাহিত্যের প্রবলতম লক্ষণ। সাহিত্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেই দেখিব যে, জাতিবিশেষের অন্তর্জ্জগতে এক-এক সময় এক-একটি প্রবল অভিসন্ধির প্রবাহ এবং উদ্দীপনার যুগ উপস্থিত হয়। শত শত লেখক অনন্যমনা হইয়া প্রাণপণে উক্তরূপ উদ্দীপনার খোরাক যোগাইতে থাকে। ইয়োরোপের 'মধ্যযুগে' যেমন খ্রীষ্টানী 'পৌরোহিত্যের' উদ্দেশ্যবশে নাটকের ক্ষেত্রে এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে, তেমন পরে পরে 'শিভাল্‌রী' আদর্শের ছায়ায় উপন্যাসের ক্ষেত্রেও প্রবলভাবে ওইরূপ একটি ঝোঁক আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যযুগেও, একদিকে বৌদ্ধগণকে অন্যদিকে অনার্য্যসাধারণকে 'হিন্দু' আদর্শের গণ্ডীগত করিবার উদ্দেশ্যে, 'পুরাণ' আকারে এইরূপ একটা মহাব্যাপার ভারতবর্ষে ঘটিয়া গিয়াছে। পুরাণ, উপপুরাণ, মহাপুরাণ ও তন্ত্রাদি! ব্রাহ্মণ্যের প্রতিপত্তি-ছায়ায় 'ধর্ম্মবন্ধন' সম্পাদনে দেশেদেশে 'হিন্দুতা' বা বর্ণাশ্রম নামে একটা অভিনব 'জাতীয়তার' প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হইয়া, এই যুগে ভারতবর্ষময় যে সারস্বত চেষ্টা ঘটিয়াছিল, কতশত সহস্র লেখনী একরূপ অতর্কিতে অথচ 'সম্ভূয় ভাবে' কত প্রকারে যে উক্ত মহাসমস্যার সমাধানে খোরাক যোগাইয়াছিল—তাহার তুলনা এদেশের সাহিত্য-ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি নাই। শত শত লেখক

নিজের কর্ত্তৃত্ব এবং কবিত্বের অহঙ্কার এবং সারস্বত যশোলিপ্সা পর্য্যন্ত একেবারে বিস্মৃত হইয়া, কেবল 'বেদব্যাসে'র নাম দিয়াই, দীর্ঘজীবনের সমস্ত কর্ম্মচেষ্টাকে কেবল 'পুরাণ'-রচনার পথে নিযুক্ত করিয়াছিলেন—কি অভাবনীয় ব্যাপার যে সমাধা করিয়াছিলেন, তাহা 'স্কন্দপুরাণ' প্রভৃতির পাঠক না হইলে বুঝিতে পারা যাইবে না। সে'রূপ এই বঙ্গদেশে, চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ইংরেজের আবির্ভাব পর্য্যন্ত, বঙ্গের সাহিত্য ক্ষেত্রে একটি প্রবল 'পৌরাণিকতা'র যুগই চলিয়া গিয়াছে; দেবপূজা-প্রচার এবং পৌরোহিত্যের যুগই চলিয়া গিয়াছে। শত শত কবি কেবল রামায়ণ-মহাভারতের 'আর্য্যতা' এবং পুরাণাদির দেব-বাদ এবং অবতারবাদ প্রচার করিয়াই বঙ্গদেশ মুখরিত করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এ সমস্তের মধ্যে অধিকাংশ গ্রন্থেই প্রকৃত 'সাহিত্য-আদর্শ' ছিল না, অতএব সমস্তই কালবশে, নীরবে, আধুনিক সাহিত্যের ভিত্তিনিম্নে তলাইয়া গিয়াছে—কেবল ইতিবৃত্ত-তান্ত্রিকের গবেষণার ক্ষেত্র হইয়া আছে। সাহিত্যের 'স্থায়ী' আদর্শ দেশকালের বা ধর্ম্ম-সমাজ-রাষ্ট্রের সাময়িক উত্তেজনা এবং সকল আগন্তুক সঙ্কীর্ণতার বহির্দ্দেশেই দাঁড়াইয়া আছে। উহা মনুষ্যচিত্তের সনাতন ভাব-বৃত্তিগুলিকে মুখ্যভাবে অবলম্বন করিয়াই দাঁড়াইয়া আছে! যে সারস্বত উহাকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক কিঞ্চিন্মাত্রও বিপথগামী হইবেন, তিনি কালে স্বয়ং অবজ্ঞাত অথবা জীবন্মৃত হইবার ছিদ্রপথ সেদিকেই প্রস্তুত করিবেন। এমন যে মহাকবি দান্তে, যিনি সাহিত্য-জগতের প্রথম দশসংখ্যক শ্রেষ্ঠ কবির মধ্যে একতম বলিয়া অনেক পণ্ডিতেই একমত হইয়াছেন, যিনি ইয়োরোপীয় সাহিত্যে 'আধুনিক নবজীবনের' জন্মদাতা, যিনি প্রেমকে জন্মমৃত্যু ব্যাপারের অতিজীবী-রূপে দেখাইয়াছেন, প্রেমকে মৃত্যুপারে পুনর্জীবিত করিয়া উহাকে স্বর্গ-নরকের তত্ত্বতন্ত্রে অভিজ্ঞতা দানপূর্ব্বক অমৃত পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন, তিনিও "ডিভাইন কমেডী" কাব্যকে সমসাময়িক 'পোলিটিকেল উত্তেজনায় কলঙ্কিত করা অপরাধে কবি খ্রীষ্ট্‌বার্গের বিরক্তিভাজন হইয়াছেন।

২১। আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্যের বাজারী হাওয়া।

এতদনুসারে চিন্তা করিতে বসিলেই দেখিব, আধুনিক সাহিত্যের অধিকাংশই সাময়িক উত্তেজনায় কত দূর দিক্-ভ্রান্ত, কলুষিত এবং সঙ্কীর্ণ! ঐ সমস্ত কত দিকে স্থায়ী সাহিত্যের মাহাত্ম্য-কোটি হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে! সাধারণ শিক্ষার প্রসার যেমন পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া সাহিত্যকে 'কলম পেশায়' পরিণত করিয়াছে, তেমন উহা হইতে সাহিত্যের মহৎ আদর্শ এবং মহাত্ম ধর্ম্মও খর্ব্ব হইয়াছে। মৃগয়া, ঘোড়দৌড়, বাইস এবং রঙ্গক্রীড়া প্রভৃতির ন্যায় গ্রন্থপাঠও একটা আমোদ বিলাসের কার্য্য হইয়াই দাঁড়াইয়াছে! আমোদজনক গ্রন্থরচনাও একটা বাণিজ্যব্যাপারে পরিণত! উহার দরুণ আদর্শের উচ্চতা, ভাবের মাহাত্ম্য, সমুচ্চ বিভাবনা ও উদ্ভাবনা, রচনারীতির ঘনতা এবং মিতাচার প্রভৃতি উচ্চাঙ্গীয় সাহিত্যের ধর্ম্ম একেবারে খোয়াইয়া গিয়াছে! স্বাধীনতা আদর্শের বাড়াবাড়ি বৃদ্ধি ও জড়বাদ হইতে মানুষ সাহিত্যের হস্তেই সর্ব্বপ্রকার কামনা বাসনার এবং প্রবৃত্তির বিলাসিতার খোরাক দাবী করিতেছে। পাঠক-সাধারণের সদসদ্ বুদ্ধি পর্য্যন্ত তিরোহিত! বাণিজ্যজনিত ধনসঞ্চয়, নগরের শ্রীবৃদ্ধি এবং নাগরিক জীবনের মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত হইয়া মনুষ্যের বাহ্যিক সুখসুবিধা অনেক দিকে বৃদ্ধি করিয়াছে সত্য; উহার গতিকে মনুষ্যের মিউনিসিপ্যাল বা পোলিটিকেল স্বত্বাস্বত্ব, এবং প্রত্যেকের সামাজিক এবং পারিবারিক স্বত্ব-স্বামীত্ব স্থিরীকৃত করিবার দিকে মনুষ্যের দৃষ্টি গিয়াছে। সর্ব্বগ্রাসী জড়বাদের প্রাবল্যে এক দিকে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ, পরিবার এবং রাষ্ট্রের, অন্য দিকে স্ত্রীর সঙ্গে পুরুষের পরস্পর স্বার্থদাবীও স্বত্ববিসংবাদ লইয়া আধুনিক সভ্যমনুষ্যের মাথা নিদারুণভাবেই ঘামিতে আরম্ভ করিয়াছে! উহার দরুণ, মনুষ্যের মননভূমি নানাদিকে প্রসার লাভ করিয়া সাহিত্যের মনোভূমি এবং সম্ভব-ভূমিও নানাদিকে বর্দ্ধিত করিয়াছে সত্য; কিন্তু আধুনিক মনুষ্যের এই সমস্ত দাবী-সমস্যা ও স্বত্ববাদের কোলাহল যে সাময়িক, প্রায় সমস্তই যে মনুষ্যত্বের কেবল বহিশ্চর্ম্ম রোগ এবং উপরিচর ধর্ম্ম তাহাতে সন্দেহ কি? সমস্তের মূলেই অ-প্রেম। প্রেমের

বা জীবনে অধ্যাত্ম আদর্শের উদয়ে এ সমস্ত অন্ধকারের মতই অপসৃত হইয়া যায়। সমাজ ন্যূনাধিক শত বৎসরের মধ্যেই এ সকল সমস্যা উত্তরণ পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া যাইবে অথবা লক্ষ্যান্তরে ব্যাপৃত হইবে। কিন্তু মনুষ্য-হৃদয়ের মূল ভাববৃত্তিগুলি চিরকাল স্থির—জীবদেহে রক্তের মতই মনুষ্যত্বের স্থির সঙ্গী! যুগে যুগে সংসারে মনুষ্যের বিভিন্ন অবস্থাক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া উহারা বিভিন্ন ভূমিকাগ্রহণে প্রাণবত্তার অভিনয় করিতেছে বই নহে! ভাবই সাহিত্য-ব্যক্তির প্রাণ; সাহিত্যের সৃষ্টিতে মুখ্যভাবে উহাই নিমিত্ত। ভাবাত্মক পদার্থ বা ভাব-সুন্দর সত্যই উহার উপাদান। ভাবাত্মক না হইলে, রসধর্ম্মে উজ্জ্বল 'শৃঙ্গারবেশে' সজ্জিত না হইলে, সাহিত্যে ধর্ম্ম-সমাজ-রাষ্ট্রের কিংবা দর্শন বিজ্ঞানের কোন সত্য বা তথ্যই পূজা লাভ করেনা। ভাবই সাহিত্যের Compass; সাহিত্যে নাবিক-মাত্রকে চিরকাল এই কম্পাসের নির্দ্দেশ অনুসারেই লক্ষ্য স্থির রাখিতে হইবে। তাহা না করিয়া, আধুনিক সাহিত্য কেবল দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক 'সমস্যা' আদর্শের তত্ত্ববাদিতা এবং বুদ্ধি-বিচক্ষণ সত্যতথ্য লক্ষ্য করিয়াই অত্যাচারী হইতেছে! কোন লেখক কেবল চরিত্রতত্ত্বে দৃষ্টি, অথবা মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণকেই লক্ষ্য করিতেছেন; কেহবা কেবল উপর্য্যুপরি ঘটনার জটিলতা এবং সংঘাত স্তূপিত করিয়াই চমৎকারী হইতে চাহিতেছেন; কেহবা কেবল জীবতত্ত্ব, Heredity বা বংশক্রমান্বয়ী দোষগুণের তত্ত্ব, সোসিয়া-লিজমের ধন বিভাগ, জমিদার-প্রজার স্বত্ববিভাগ, বা স্ত্রীপুরুষের স্বার্থবিবাদ লইয়াই মুখ্যভাবে ব্যাপৃত! এক একটি নায়কনায়িকার দীর্ঘবিস্তারিত জীবনক্ষেত্র এবং অবধিবিহীন, 'ভবঘুরে' প্রকৃতির কর্ম্মক্ষেত্র অবলম্বনে অনেকে কেবল অশেষ তথ্য-বার্ত্তা বুনিয়া যাইতেছেন! Construction বলিয়া, অঙ্গাঙ্গীসম্বন্ধের গঠন রীতি বলিয়া, বুনানীর টানা-পড়িয়ানের মধ্যে প্রাণগত বা ভাবগত যোগসম্বন্ধ বলিয়া কোন পদার্থ আদবেই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না! ইহাই আকৃতি আদর্শের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ইয়োরোপীয় সাহিত্যের 'আধুনিকতা'! এবং উহার প্রধানতম লক্ষণ এবং ধর্ম্ম পূর্ব্বকথিত Realism বা Naturalism; এবং এই রীতি নবেলের

ক্ষেত্রেই সবিশেষ উজ্জ্বল। ইংলণ্ডের ফিল্ডীং স্মোলেট এবং রিচার্ডসন হইতে আরম্ভ করিয়া, জেন অস্‌টেন, থ্যাকারে, ডিকেন্স, আণ্টনী ট্রলোপ, কিঙ্গ্‌স্লী, রীড্‌, হার্ডী, মেরিডিথ, কিপ্‌লিং প্রভৃতির ন্যুনাধিক এই রীতি। ফরাসী, জর্ম্মণ, ইটালীয়, স্পেনীয় বা রুশীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একই কথা। আল্‌ফন্স্‌ দোদে, বালজাক, জোলা, আনাতোল ফ্রান্স্‌, গোতিয়ে, পোল বুর্ঝে, ইবানেথ্‌, জ্যুড্‌রমান্‌, তুর্গেনিয়েভ, টলষ্টয়, দস্তোয়েফ্‌স্কি—সাহিত্যের এই 'আধুনিক' বাজারী হাওয়া সকলকেই ন্যূনাধিক স্পর্শ করিয়াছে। উচ্চসাহিত্যের 'আকৃতি' আদর্শে প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থ, প্রকৃত 'টেকসহি' গ্রন্থ—সর্ব্ববাদী সম্মত master piece ইহাঁদের অনেকে হয়ত একটিও রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

২২। আকৃতি আদর্শের ব্যভিচার ও শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর সাহিত্য ব্যক্তি।

এই বিচার আপাত-দৃষ্টিতে নিদারুণ 'একহারা' এবং সর্ব্বসংহারী বলিয়া অনেকের ধারণা হইতে পারে; কিন্তু শিল্পসাহিত্যের প্রকৃত স্বরূপ এবং বিশেষত্ব এবং উহার আকৃতি প্রকৃতির উৎকর্ষ লক্ষণ বুঝিয়া লইবার জন্য ইদানীং সময় আসিয়াছে। সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচকগণ এ সমস্ত সাহিত্য-চেষ্টাকে কখনও উচ্চ আসন দেন না। জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে ক্ষুদ্র একটি অধ্যায় মাত্র এ সকল কথা-লেখকের জন্য নির্দ্ধারিত থাকে। পুঁথিপত্রের সংখ্যা এবং কাগজের 'মনকড়া' ওজন বিচার করিলে যাহারা এক একটি বিপুল সাহিত্যেরই স্রষ্টা বলিতে পারা যায়, তাঁহাদের বিষয়ে সাহিত্য-ইতিহাস এইরূপ অবিচার কেন করিতেছে, তাহাও চিন্তারস্থল। পরম অল্পায়ু কীট্‌স এবং শেলী কবির নগণ্য-সংখ্যক কবিতাপত্র বুঝিতে এবং বুঝাইতে যাইয়া, ইংলণ্ডের সাহিত্য রসিক, সাহিত্যের ইতিবৃত্ত চিন্তক এবং বিত্ত-বিচারক মহলে যেই পরিমাণ কালি কাগজের ব্যয় ঘটিয়াছে কোন কথা-লেখকের জন্য উহার সহস্রতম অংশও হয় নাই—কেন হয় নাই, তাহাই চিন্তার বিষয়। হয় ত কথা-সাহিত্যের আদর্শটুকুই অনেক দিকে উচ্চ সাহিত্য-সৃষ্টির বিরোধী। সাধারণ সামাজিকের দীর্ঘকালব্যাপী আমোদ বিধান করাই মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া শিল্প আদর্শের এই অবহেলা ঘটিতেছে।

এক কথায় বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করিতে গেলে বলিতে হয় যে, এই সমস্ত গল্পমাত্র—কাব্য নহে। কাব্যের মধ্যে একটা গঠন-সামঞ্জস্য এবং আত্মা থাকে—কাব্য একটা স্বতন্ত্র প্রাণী! অনির্ব্বচনীয় দীপনী এবং রসনী শক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক কাব্য যেই আত্মার গুণে মনুষ্য-হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া যায়, অসামান্য বিভাবনা এবং পরিকল্পনার প্রয়োগ দ্বারা অনন্যসুলভ আকৃতি এবং প্রকৃতির পরিচয় পথে যেই অনির্ব্বচনীয় ব্যক্তিত্ব লাভ করে, গল্পকথার রীতি মধ্যে তাহা প্রবল হইতে পারে না; অতুলনীয় পর্য্যবেক্ষণ, সত্যবাদ, চরিত্রদৃষ্টি এবং চরিত্রাঙ্কন উপস্থিত করিয়াও পারে না। প্রকৃত কাব্যের 'আকৃতি'টাও প্রাণের মতই একটা আকস্মিক এবং অচিন্ত্য সৃষ্টি! জননীর গর্ভে ভ্রূণের ন্যায় কবিচিত্তের কারখানায় কাব্যের আকৃতি-প্রকৃতির একটি ক্রমবিকাশ আছে আছে সত্য; কিন্তু, উহা একটা বীজ-পদার্থেরই ক্রমবিকাশ—যে বীজ ব্যতীত অভিব্যক্তির সমস্ত উপায় এবং প্রণালী নিষ্ফল। শক্তিশালী শিল্পিহস্তের অনেক নবেলের মধ্যে এরূপ বীজের আভাস পাওয়া যায়; কিন্তু, লেখকের আলম্বন এবং উদ্দীপন প্রণালী হইতে, তাঁহার অবলম্বিত ঘটনা, চরিত্রসৃষ্টি এবং বাক্যরীতি হইতেই উক্ত বীজ-পদার্থকে যেন পদে পদে খণ্ড-বিখণ্ড হইতেও দেখা যায়। পুঞ্জ পুঞ্জ সত্যসৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার হইয়াও গ্রন্থটী যেন কোন মতে লেখকের মর্ম্মবীজের অভিব্যক্তি এবং প্রমূর্ত্তি হইয়া পাঠকের হৃদয়ে শিকড় গাড়িতে পারে না! এই সমস্ত দেখিয়াই বলিতে হয় যে, প্রকৃত কাব্য কিংবা সাহিত্যশিল্প কুত্রাপি পর্য্যবেক্ষণ অথবা পুঞ্জীকরণের কার্য্য নহে। ঐ সমস্ত কবির অভ্যাস সিদ্ধ হইয়া তাঁহার আত্মগত হইলে, কবির রক্তগত হইয়া অন্তরঙ্গে অবিতর্কিত অবস্থা লাভ করিলেই কবির সৃষ্টি-কার্য্যে কিঞ্চিৎ সহায় হইতে পারে। অন্যথা পদে পদে, যেমন কাব্যের আকৃতির, তেমনি উহার এক-মর্ম্মতার প্রতিপক্ষ এবং শত্রু হইয়া পড়ে। কবিকে নিজের হৃদয় দান করিয়াই অন্য হৃদয়ের সহানুভূতি সিদ্ধি করিতে হয়; কাব্যের মধ্যে নিজের বুকের রক্ত ও প্রাণ অচিন্ত্য পথে পরিবাহিত করিয়াই উহার জীবন-স্পন্দন জাগাইতে ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে

হয় ; শ্রেষ্ঠশিল্পে সৃষ্টি এবং দৃষ্টি, জ্ঞান এবং কর্ম্মনীতি, গঠন কলা এবং মনস্তত্ত্ব অবিভক্ত ভাবে এবং ওতপ্রোত ভাবে প্রেরিত হইয়াই প্রাণ-সঞ্চার করে। এই প্রাণ টুকুই কাব্যশিল্পের মূল বীজ পদার্থ ; এবং উহা বরং একটা অচিন্ত্য অভিনিবেশের আকস্মিক আবিষ্কার। অন্যথা, কবি কেবল জীবনচিত্র প্রদর্শন করিবার জন্য অথবা দর্শন শক্তির পরিচয় দিবার জন্য, সমাজের সংস্কার বা উহার কোন রোগ চিকিৎসার জন্য লেখনী গ্রহণ করিয়াছেন, ইত্যাদি সংস্কার পাঠক-চিত্তে কোন মতে মুখ্য হইলে উহাই তাবৎ শিল্প-মাহাত্ম্যের সংহারক হইয়া উঠে।

আকৃতি, অচিন্ত্য রসাত্মা এবং প্রাণগত ব্যক্তিত্বে প্রকৃত শিল্পমাত্রেই এক একটি ব্যক্তি! এইরূপে কাব্যের বিভিন্ন বিভাগের ইলীয়ড কি রামায়ণ মহাভারত, শকুন্তলা কি কপালকুণ্ডলা, লাওডামিয়া কি পতিতা প্রত্যেকেই এক একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি! জর্জ্জ এলিয়টের "সাইলাস মারনার" অথবা হথর্ণের "স্কারলেট্ লেটার" বা টলষ্টয়ের "আনা কারেনীন", প্রভৃতি নবেল সাহিত্যের আত্মবত্তা এবং সত্য-শিব-সুন্দর আদর্শের অখণ্ডিত সমুন্নতি রক্ষা করিতে পারিয়াছে। ওয়াল্টার স্কট এবং হুগো প্রকৃত কবি-হৃদয় লইয়া নবেলের ক্ষেত্রে সময় সময় প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়াই আধুনিক 'গল্পের' সমস্ত ইতরতা, অধম ধর্ম্ম এবং প্রাকৃত হাওয়ার মধ্যে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। শেক্সপীয়রের মধ্যে এই আকৃতি এবং প্রকৃতি, Plot এবং Interest, বুদ্ধিমত্তা এবং ভাবুকতা, Psychology এবং Construction কদাচিৎ অত্যাচারী হইয়াছে বলিয়াই তিনি আধুনিক সাহিত্যের শতশহস্রমুখী প্রসারিতা সত্ত্বেও এখন যাবৎ শ্রেষ্ট কবি; বিশ্বসাহিত্যে পূর্ণগঠিত শিল্পি-হৃদয়ের দৃষ্টান্ত। বিচারকমাত্রকেই, সাহিত্যের কর্ম্মিমাত্রকেই শেক্সপীয়রের এ মাহাত্ম্য অবনতশিরে স্বীকার করিয়া লইতে হয়। অনেকে হয় ত তাঁহা হইতে একদেশী উচ্চতা অথবা একাংশীয় গরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন—কিন্তু পূর্ণতার বিচারস্থলে তাঁহার দিকেই দৃষ্টি করিতে হয়। শেক্সপীয়রের হ্যামলেট কি ম্যাক্‌বেথ, লীয়র, ওথেলো কি রোমিও-জুলিয়েট, Midsmummer Night's Dream, As

you like it কি টেম্পেস্ট্‌ মন দিয়া চিনিতে গেলেই ধারণা হইতে থাকে যে, প্রত্যেকটি যেন কবির হৃদয়ে, তাঁহার প্রাণের কুক্ষিতে সমস্ত দার্শনিক বিতর্ক, গবেষণা এবং ভূয়োদর্শনের অতর্কিতে আকস্মিক ভাব-জন্ম লাভ করিয়া ধীরে ধীরে অনুরূপ আকৃতি সংগ্রহ পূর্ব্বক ভূমিষ্ঠ হইয়াছে ! এই অনুরূপত্ব, এই সামঞ্জস্য, আত্মা এবং আকৃতির অনির্ব্বচনীয় যোগসম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ যে উহাদের মধ্যে কে কাহার অগ্রজ হইয়াছিল, কে কাহার অনুবর্ত্তন করিয়াছে, তাহার বিনির্ণয় করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। কবির এ সমস্ত মানসপুত্র নিজের রসাত্মা এবং আকৃতিগত ব্যক্তিত্বে মনুষ্যের দৃষ্টি সমক্ষে কালস্রোতের ঘাতসহ, অভঙ্গুর এবং অলোপ্য মূর্ত্তিতে অমর হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সাহিত্যে আকৃতি।

(২)

বস্তু-সংক্ষেপ।

(ক)

ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্রে বিভাব ও অনুভাব কর্ত্তৃক পরিব্যক্ত 'রস' আদর্শ— এরূপ রসই সাহিত্যের আত্মা।—ওই কথার ব্যাপক অর্থ—সাহিত্যের আকৃতি-সংজ্ঞার নানাদিক্ গামী অর্থ—যথা, বাক্যের রীতিগত আকৃতি— ছন্দোগত আকৃতি—গদ্যে—এবং পদ্যের ক্ষেত্রে ছন্দোগত আকৃতি— কাব্য নাটক এবং গীতিকবিতা প্রভৃতি নামে উদ্দিষ্ট গঠনগত আকৃতি —কিন্তু এ প্রসঙ্গে 'অর্থগত' আকৃতিই উদ্দিষ্ট—সাহিত্যশাস্ত্রে উহার নাম বস্তু—সাহিত্যে অর্থাকৃতি-সিদ্ধ রসবস্তু—আধুনিক গীতিকবিতাদির মধ্যে 'আকৃতি' আদর্শের আপাতদৃষ্ট ব্যভিচার—ইয়োরোপের প্রাচীন ও আধুনিক কবিতার প্রধান পার্থক্য, পরিমূর্ত্তণী ও রেখা-চিত্রণী রীতি—আধুনিক 'গীতিকবিতা' ও 'সাঙ্কেতিক' কবিতা—রবীন্দ্রনাথের মধ্যে শেলীর অব্যক্ত-প্রিয়তা ও মেতরলিঙ্কের সঙ্কেতনী রীতির অতুলনীয় সম্মিলনের দৃষ্টান্ত— রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্টতা—শেলীর অব্যক্ত বাদ রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও শেলীসহোদর অব্যক্ত ও স্পষ্টতর অপ্রীতি—রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের গীতিকবিতায় 'আকৃতি' তন্ত্রের বিরোধাভাস—কবির উদ্দিষ্ট পদার্থ বা বিভাব-অনুভাব-রস সমস্তই অজ্ঞাত অব্যক্ত এবং অস্পষ্ট বলিয়া আকৃতির অস্পষ্টতা ও উহার ফল—'সঙ্গীত-কবির এই অস্পষ্টপ্রিয়তার কারণ ও স্বরূপ।

(খ)

সঙ্গীত অপেক্ষা ও নাট্যগাথার ক্ষেত্রেই অস্পষ্টতা রীতির বিপত্তি —রবীন্দ্রনাথে সিম্বোলিক নাট্য-আদর্শ—ইয়োরোপে মেতরলিঙ্ক প্রভৃতির সাঙ্কেতিক নাট্যে 'আকৃতি' (আদর্শের ব্যভিচার); ভারতীয় দৃষ্টিতে সিম্বোলিক আদর্শের দোষগুণ—রবীন্দ্রনাথের রাজা, ডাকঘর ও ফাল্গুনি প্রভৃতির সাঙ্কেতিক আদর্শ—উহাদের intellectuality, বোধায়নী সিদ্ধি ও রসাভাস ভারতীয় সাঙ্কেতিক আদর্শের কবিতা, বৈষ্ণব কবিগণের বৃন্দাবন 'রাজা' ও 'রাণী'—তুলনা স্থলে সাহিত্যহিসাবে বৈষ্ণবকবির গভীরতর ও স্ফুটতর রসসিদ্ধি অথচ 'প্রতীক' ভাবে পরম দার্শনিকতা—রবীন্দ্রের রাজার 'প্রতীক' ও বৈষ্ণব প্রতীকের মধ্যে পার্থক্য—বৈষ্ণবের মিষ্টিসিজম ও সিম্বোলিজম—সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নিরাকারবাদী দার্শনিকতার স্বরূপ ও ফলবত্তা—ভারতীয় 'প্রতীক' হইতে উহার পার্থক্য সাহিত্যে প্রতীক বা রূপক বাদ কি পরিমাণে সহ্য হইতে এবং সফল বলিয়া গণ্য হইতে পারে—'সোণার তরী' কবিতায় বিভাব অনুভাব ও রসের দুর্ব্বলতা ও অস্ফুটতাজনিত ফল—সাহিত্য তন্ত্রে অর্থ বা আকৃতি আদর্শের ব্যাপ্তি।

(গ)

প্রদূষক ও বৈহাসিক নাটকের ক্ষেত্রেও সিম্বোলিষ্ট রীতির অপরিস্ফুট বিভাব ও অনুভাবের দুর্ব্বলতা—কবির পক্ষে কর্ম্ম ও অকর্ম্ম—অস্ফুট-বস্তুতার দরুণ 'অচলায়তন' নাটকের শিল্পতা ও রস নিষ্পত্তি—প্রদূষক হিসাবে ইবসেনের Ghost নাটক—মহাত্মা 'গন্ধীর' 'সত্যাগ্রহ'-তুলনায় রবীন্দ্রনাথের 'সত্যের আহ্বান' এর বস্তুবিষয়িণী অস্পষ্টতা—সিম্বোলিষ্ট আদর্শে ইবসেনের Enemy of the People ও রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা'—প্রকৃত প্রস্তাবে সাহিত্যের 'আকৃতি' আদর্শের ব্যভিচার করিয়া কাব্য কুত্রাপি স্পষ্টতার বিষয়ে বলশালী হইতে পারে না।

(ঘ)

পঞ্চবিধ শিল্পতন্ত্রে সাহিত্যের স্থিতি ও স্বরূপ; ইয়োরোপের আধুনিক গীতিকবিতা ও মীষ্টিক কবিতা তন্ত্রে সাহিত্যের 'অর্থ' বা আকৃতি আদর্শের ন্যূনাধিক ব্যভিচার-জনিত অস্বস্তি—মীষ্টিক ও সাঙ্কেতিক কাব্যের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র ও পরিধি—সঙ্গীত হইতে সাহিত্যের বিভিন্ন পরিণাম ও লক্ষ্য বিষয়ে ভ্রান্ত দুইজন বিলাতী সাহিত্য দার্শনিক—সঙ্গীতের অব্যক্ত ও অস্ফুট বস্তু হইতে সাহিত্যের উদ্গতি এবং উহার 'আকৃতি' ও 'রস' তত্ত্বের উদ্বর্ত্তন—সাহিত্যের স্বরূপ প্রতিষ্ঠা।

সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্র প্রকৃত অন্তর্দার্শনিকের মতই সাহিত্যের মূল তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছে। সাহিত্যের মূল উপজীব্য ও উহার প্রাণের অবলম্বনটি হইতেছে 'ভাব'। ভাবের মধ্যে যেমন emotion এর উপাদান আছে, তেমন জ্ঞানের বা সত্যের উপাদানও আছে। মনস্তত্ত্বের নিদানের দিক্ হইতে না বুঝিলে কখনও 'ভাব'কে বুঝা যাইবে না। বিভাব ও অনুভাবের সাহায্যেই ভাব সঞ্চারিত হয় বলিয়া কাব্যতন্ত্রে ভাবের মধ্যে কবির আত্মবহির্ভূত একটা লক্ষ্যও যেন প্রচ্ছন্ন আছে—পাঠকের চিত্ত। যেমন শকুন্তলা কাব্যে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা প্রভৃতি বিভাব; দুষ্যন্তের সৌন্দর্য্যানুভাবক এবং 'সুন্দর সত্য'-অনুভাবক চিন্তা চেষ্টা বাক্য, বৃক্ষান্তরালে দর্শক হইয়া অবস্থান, শকুন্তলা প্রভৃতির আলবালে জল সেচন ইত্যাদি সৌন্দর্য্যময় এবং উজ্জ্বল বাক্যব্যাপার ও চেষ্টাভঙ্গী-ইঙ্গিত অনুভাব। বিভাব ও অনুভাবের ঐক্য-প্রয়োগে পাঠকের চিত্তে

১। ভারতীয় সাহিত্য শাস্ত্রে বিভাব ও অনুভাব কর্তৃক পরিব্যক্ত 'রস' আদর্শ।

'রতি' নামক স্থায়ী ভাব সঞ্চারিত করিতেছে। অতএব বিভাব ও অনুভাব ভাবের দেহ—তাহার আকৃতি। আকৃতির দুর্লভতা ও চমৎ-কারিতার উপরেই স্থায়ী ভাবটির শক্তি-সিদ্ধি, উহার দুর্লভতা, চমৎকারিতা, অনপনেয়তা এবং স্থায়িত্ব। সুতরাং, কাব্যের প্রকাশতন্ত্রে প্রধান শক্তিই প্রকৃত প্রস্তাবে বিভাব ও অনুভাবের! উহাদের সংঘটনাতেই কবির কৃতিত্ব এবং ব্যক্তিত্ব। যিনি যতই সত্যসুন্দর বিভাব ও অনুভাবের সংঘটন পূর্ব্বক মনুষ্যমনে ভাব উদ্রিক্ত করিতে ও ভাবকে অন্তরঙ্গ এবং ঘনিষ্ঠরূপে স্থায়ী করিতে পারিবেন, তিনি ততই বড় কবি। ভাবটি যেন সকল মনুষ্যের অন্তরাত্মার আধারে, উহার প্রকৃতি এবং ধৃতি-সম্ভাব্যতার জঠরে নিরাকারে সুপ্ত আছে; যিনি যত আকৃতিদানে, যত সত্যসুন্দর প্রমূর্ত্তি বা আলম্বন-উদ্দীপনরূপী Mythopoeaর প্রতিষ্ঠাদানে ভাবকে অনুভব-ক্ষেত্রে সমুদিত এবং স্থায়ী করিতে পারিবেন, তিনি ততটাই "স্থায়ীভাব" সুসিদ্ধ করিবেন। ভাবকে মনোগম্য আকৃতি বা পরিব্যক্তি দান করাতেই কারিগরী, কবিত্ব ও শিল্পিত্ব। ভাবটি মনুষ্যসাধারণ পদার্থ। প্রধান মাহাত্ম্যই সুতরাং আকৃতির! এই আকৃতি-সংঘটনার মূলে কবি-আত্মার যেই শক্তি কার্য্য করে উহাই স্বরূপতঃ কবিত্বশক্তি; এবং সাহিত্যশাস্ত্রে উহার নাম পরিকল্পনা বা পরিমূর্ত্তনার শক্তি (imaginaiton)। এখন দেখুন, বিভাব ও অনুভাবের সাহায্যে ভাবটি যখন মনুষ্য চিত্তে স্থায়ীরূপে—উদয়-সমুজ্জ্বল নামরূপে পরিব্যক্তি লাভ করিল, তখনি একটি দুঃসাধ্য সাধিত হইল! স্রষ্টা এবং বিধাতার অনুরূপ একটি সৃষ্টি কার্য্যই সমাহিত হইল! নরত্বের ক্ষেত্রে কবিত্বরূপী একটা দুর্লভ ব্যাপার, একটা নূতন সৃষ্টি-ব্যাপারই প্রমাণিত হইল! স্রষ্টারই দয়া-দান এবং আশিষের প্রমাণস্বরূপে, তাঁহারই সমজাতীয়, সমানোদর, সমানার্থ এবং মহাসত্ব ব্যাপার! জগতে এইরূপে ভাবকে আকৃতিদানের শক্তিশালী, দুর্লভসুন্দর অথবা 'সত্যশিব সুন্দর' আকৃতি ঘটনায় উহাকে মনোলোকে শরীরী এবং অনুভূতিক্ষেত্রে স্থায়ী করিবার ক্ষমতাশালী মনুষ্য অধিক জন্মে না—এ'কারণেই কবিত্ব দুর্লভ।

এই রূপে বিভাব ও অনুভাবের দ্বারা পরিব্যক্ত যে স্থায়ীভাব, সাহিত্য-শিল্পের ক্ষেত্রে উহার একটা স্বতন্ত্র নাম আছে; উহারই নাম 'রস'। অতএব 'রস' বিভাবাদির দ্বারা আকারিত এবং মনুষ্যের চিত্তলোকের অনুভূতিগম্য পদার্থ; সুতরাং চিন্ময় পদার্থ। উহা (মনুষ্যের মনস্তত্ত্বের তিন উপাদানের দিক্ হইতে) সুতরাং অনির্ব্বচনীয়রূপে বিমিশ্র একটা সৎ-চিৎ-আনন্দময় পদার্থ। উহাই সাহিত্যের লক্ষ্য—উহাই সাহিত্যের আত্মা। ইংরাজী মনোবিজ্ঞানের দিক্ হইতে সুতরাং বলিতে পারি,

২। রসই সাহিত্যের আত্মা।

রস কেবল একটা মানসিক ভাববৃত্তি বা emotion নহে। উহা সাহিত্যের ক্ষেত্রে emotionalised thought অথবা intellectualised emotion. এস্থলে আভাস দিয়া যাইতে পারি যে, সমগ্র পাশ্চাত্ত্যজগতের সাহিত্য-দার্শনিক, এমন কি, কবিগণও কাব্যের 'আত্মা' নিরূপণ করিতে গিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। মনোবিজ্ঞানের কিংবা কাব্যোৎপত্তির দিক্ হইতে না দেখিয়া, কেহ বা মূলতত্ত্বে খণ্ডদৃষ্টি করিয়া, কেহ বা কেবল সাহিত্যের বহির্দ্দেহ ও ক্রিয়া-প্রণালীর দিকে একান্ত দৃষ্টি করিয়াই, এ ভ্রম করিয়াছেন। কেবল, কবি পো (Poe) প্রকৃত অন্তর্দ্দর্শন এবং অভিসম্বেশের বশেই দেখিয়াছিলেন যে উহা ecstasy—an elevating excitement of the Soul! ভারতীয় সাহিত্য-দর্শন বলিবে, কবির এই ecstasy শব্দ-লক্ষিত পদার্থের নামই তাহার 'রস'; এবং উহাই সাহিত্যের আত্মা। কবির পরিকল্পনাশক্তি কর্ত্তৃক বিভাব ও অনুভাবের সাহায্যে অভিব্যক্ত রসের সত্য যতই সংবিৎ-ময়, যত চিন্ময়, যত হ্লাদিনীময়, যত স্থিরানন্দময় এবং শিবানন্দময় হইবে, ততই রসের মাহাত্ম্য; এবং রসের মাহাত্ম্যেই কাব্যের মাহাত্ম্য। এইরূপে রস প্রত্যেক কাব্যের কবি কর্ত্তৃক উপন্যস্ত বিভাবাদির আকৃতি ভেদে, প্রত্যেক কাব্যের স্বতন্ত্র সিদ্ধি; আবার, প্রত্যেক কবির ব্যক্তিগত সিদ্ধি। ফলতঃ 'রস' সাহিত্যের আত্মা বলিয়া উহা, মানবাত্মার ন্যায় স্বরূপে এক হইয়াও বিভিন্ন দেহি-ধর্ম্মে আপাততঃ বিভিন্ন বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে!

সাহিত্যজগৎরূপ চিন্ময়পুরীর অনন্তমুখী সৃষ্টি ব্যাপারের লীলা-জনক হইতেছে!

এখন, এই স্থানে আসিয়া এক কথায় বলিলেই চলিবে—এইরূপ রসাত্মক বাক্য-সৃষ্টি হইতেই সাহিত্য। বাঙ্গালী সাহিত্যপণ্ডিত বিশ্বনাথ ভারতের 'অদ্বৈত' দৃষ্টিতে তিনশত বৎসর পূর্ব্বে উহাই ত দেখিয়া গিয়াছেন! যে দৃষ্টি প্রাচীন উপনিষদে জগতের নিদানকে দেখিয়াছে "রসো বৈ সঃ", দেখিয়াছে "সো মধুরূপ", যে দৃষ্টি পৌরাণিক যুগে তাঁহাকে 'অখিলরসানন্দ মূর্ত্তি'রূপে উদ্দেশ করিয়াছ, সে দৃষ্টিই কাব্যের আত্মা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া দেখিয়াছে উহার নাম 'রস'—এবং ওই রস "ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরঃ"। ভারতবর্ষের পরমমৌলিক ও অতুলনীয় এই কাব্যতত্ত্ব! উহা স্বতন্ত্রভাবেই আলোচনা-যোগ্য। বিশ্বনাথ কাব্যের সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, আধুনিক কালেও সাহিত্য-দার্শনিকগণ সাহিত্যের সংজ্ঞা ধারণা করিতে গিয়া, প্রকারান্তরে তাহাই বলিবেন। ঘনিষ্ঠভাবে অনুসন্ধান করিতে গেলেই দেখিব, সাহিত্যের এত বহুমুখ এবং বহুরূপ বিকাশ আধুনিক কালে পরিদৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও, আমাদের অন্তরাত্মায় 'রসাত্মকতা'ই উহার প্রধান 'মাপকাঠি'। রসাত্মক না হইলে, কেবল সত্য-বিজ্ঞান, ধর্ম্মদর্শন অথবা নীতিশাস্ত্র-আত্মক কোন রচনাই সাহিত্য বলিয়া আদৃত হইতেছে না।

৩। ঐ কথার ব্যাপক অর্থ।

এ স্থলে, বিপরীত দিক্ হইতে, রসতত্ত্ব বিষয়ে সাহিত্য-দর্শনের একটা বড় কথাই সিদ্ধান্ত রূপে উপন্যস্ত হইতে পারে। তাহা এই যে, সাহিত্যে যাহা কোন রূপে ভাল লাগে, 'ভাল লাগা' মাত্রই অমনি ধরিয়া লইতে পারি যে, উহা আমাদের অন্তরাত্মার ভাবতত্ত্বকে emotionকে উদ্রিক্ত করে বলিয়াই ভাল লাগে; উহার মধ্যে মনোমদ বিভাব ও অনুভাবের আলম্বন ও উদ্দীপন আছে বলিয়াই ভাল লাগে। যেমন বিস্তারিত কাব্যের অন্তর্বর্ত্তী স্থায়ী ভাবটির বিষয়ে এ কথা খাটে, তেমন ক্ষুদ্র গীতিকবিতার অথবা ক্ষুদ্রতম সুন্দর বাক্যের রসাত্মকতা বিষয়েও উহা সুপ্রযুক্ত হইতে পারে। বিভাব ও অনুভাব ব্যতীত ভাব জাগিতে পারে না। স্ফুট স্ফুটতর বিভাব

অনুভাবরূপ দেহ-বস্তু ব্যতীত স্ফুট স্ফুটতর ভাব দাঁড়াইতে পারে না; ভাবের পরিস্ফোটন ব্যতীত সাহিত্যক্ষেত্রে রসও জমিতে পারে না। যে স্থানে ভাবরস অস্পষ্ট বা দুর্ব্বল বলিয়া প্রতীত হইতেছে, সে স্থলে উহা বিভাব অনুভাবের দুর্ব্বলতা ও অস্পষ্টতা হইতেই ঘটিতেছে বলিয়া সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়। আবার, যে স্থানে 'ডাহা' দার্শনিক তত্ত্বকথাই কবির প্রয়োগবশে 'ভাললাগা' প্রতীয়মান, সে স্থলেও সুগুপ্ত অনুভাব বিভাবগুলি পরখ করিয়া ধরিতে পারিলেই, ভাললাগার কারণ ভাসিয়া উঠিবে—উহার মধ্যে নিশ্চিত ভাবানন্দকর বিভাব-অনুভাব গুপ্ত আছে! রস-ক্ষেত্রে কোন কাব্যের অস্পষ্টতার কিংবা উহার ভাল-না-লাগার হেতুটীও সুতরাং উহার অস্পষ্ট বিভাব-অনুভাব বলিয়াই ধরিয়া লইতে পারি। ভ্রমের সম্ভাবনা নাই।

৪। সাহিত্যে আকৃতি শব্দের নানা দিগগামী অর্থ।

রসদর্শনের কয়েকটি 'গোড়ার কথা' এইরূপে বলিয়া, আমরা সাহিত্যের আকৃতি সংজ্ঞা বিষয়ে কয়েকটি সাধারণ ভ্রম-স্থান ও জঞ্জাল-স্থান চিন্তা করিতে অবহিত হইব। 'সাহিত্যের আকৃতি' বলিতে এ পর্য্যন্ত বিশেষ ভাবে আমরা কেবল সাহিত্যের মূল আলম্বন ও উদ্দীপন বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত মননগম্য আকৃতিকে—উহার বিভাব ও অনুভাবের দ্বারা পাঠক চিত্তে প্রকটিত প্রমূর্ত্তিকেই লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। এই প্রমূর্ত্তির উপর এবং কবির পরিমূর্ত্তনাশক্তির উপর কিরূপে প্রকারান্তরে সাহিত্যের জীবন নির্ভর করিতেছে তাহাও দেখিয়াছি। কিন্তু সাহিত্যে আকৃতি বলিতে সাধারণতঃ একটা নানাদিক্‌ব্যাপক অর্থই সূচিত হইয়া থাকে। অতএব, এ স্থলে উক্ত সংজ্ঞা-শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপ্তি গুলিকে একটু বিশেষিত করিয়াই বুঝিতে হইতেছে।

৫। যথা, কাব্যের রীতিগত আকৃতি।

বাক্য লইয়াই সাহিত্য বলিয়া, সাহিত্যের আকৃতি বলিতে প্রথমকল্পে বাক্যের প্রকাশ-রীতি-গত যাবতীয় প্রণালী ঐ বাক্যের ছন্দ এবং বাক্যের ছন্দ-উদ্দিষ্ট অর্থবস্তুর (বা পদার্থের) পরিব্যক্তিও বুঝাইতে পারে। বাক্য, বাক্যরীতি ও বাক্যচ্ছন্দের দ্বারা সমুদ্দিষ্ট অর্থের

পরিব্যক্তির উৎক্রান্ত ফলস্বরূপেই সাহিত্যের 'আকৃতি' প্রকৃত প্রস্তাবে দাঁড়াইয়া থাকে। কোন শব্দের অর্থ বলিতে যাহা বুঝায় (অনুভবিতার স্থান হইতে) উহার নামই ত পদার্থ; আবার অনুভূতের স্থান হইতে উহার নামই ত বস্তু! এইরূপে, কেবল সাহিত্য-জগতে নহে—সর্ব্বত্র, বস্তু ও পদার্থ ফলতঃ একবাচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

৬। ছন্দগত আকৃতি।

বাক্যের রীতি-তরফে সাহিত্যের যে আকৃতি দাঁড়ায় তাহারই নাম বলিতে পারা যায়—ছন্দ। ছন্দ বাক্যকে এবং উহার অর্থকে একটা আকৃতি দেয়। বলা বাহুল্য যে, এ ক্ষেত্রে প্রথম কল্পে বাক্যের ছন্দ দুই প্রকার। উহা হইতেই গদ্য ও পদ্য নামে সাহিত্যের একটা ব্যাপকতম এবং প্রধান আকৃতি ভেদ উপজাত হইতেছে।

৭। গদ্যে এবং

আবার, গদ্যের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন লেখকের চিত্তবৃত্তি এবং চিন্তা ও ভাবপ্রবণতার [illegible] অনন্ত ভেদ উপজাত হইতে দেখা যাইবে; কিন্তু [illegible] প্রমাণ এবং প্রবৃত্তি এত অ-বিশিষ্ট যে অনেক সময়েই উহার কোন আকৃতি স্থূলভাবে নির্ব্বচনীয় নহে—সুতরাং উহার প্রবৃত্তিকে Rhythm, বা বাক্যের ধ্বনিচ্ছন্দ বলিয়াই লক্ষ্য করা হয়। এবং ঐ ছন্দের প্রধান নিয়ম গুলিকে উচ্চারণ-ধ্বনির Antithesis বা প্রতিপূর্ত্তি, Compensation বা পরিপূর্ত্তি এবং Balance সমাপূর্ত্তি বা সমীকরণ ইত্যাদি নামে কেবল দৃষ্টান্ত-গম্য রূপেই নির্দ্দেশ করা যায়।

৮। পদ্যের ক্ষেত্রে ছন্দোগত আকৃতি।

পদ্যের ক্ষেত্রে আসিয়াই এই ছন্দ ভাষার প্রকৃতিভেদে এবং কবির আবিষ্কার ও প্রকাশের শক্তিভেদে অনন্ত স্থূলমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতেছে এবং কাব্যকে বিভিন্ন কাঠামে আকারিত করিতেছে। এস্থলে আরও বুঝিতে হয় যে, মনুষ্যের মধ্যে ভাবের (emotion) প্রবৃত্তিভেদে ছন্দের অন্তরঙ্গে যেমন ভেদ আসিতে পারে, তেমন জাতিবিশেষের ভাষার প্রকৃতি, জাতীয় মনুষ্যের চিত্তরুচির ঝোঁক, এবং কণ্ঠ-প্রবৃত্তি প্রভৃতি হইতেও

সুরের বাহ্যিক ভেদ অনুসারে ছন্দের ভেদ জন্মিতে পারে। সুতরাং এ দিকেও সাহিত্যের আকৃতি-ভেদ অগণিত হইতে পারে।

৯। কাব্য নাটক গীতি কবিতা প্রভৃতির আকৃতি।

আবার, সাহিত্যক্ষেত্রে শিল্পের কাঠাম-গত আকৃতি এবং প্রকৃতির দিক্ হইতে অপর একটা প্রবল ভেদ প্রাচীনতম কাল হইতেই সকল সাহিত্যে পরিদৃষ্ট ও নির্দ্দেশিত হইয়া আসিতেছে। মহাকাব্য, গীতি কবিতা ও নাটক (Epic, Lyric, Dramatic) বলিতে সাহিত্যের গঠনের দিক হইতে নির্ম্মিতির এরূপ একটা বাহ্যিক আকৃতি-ভেদই বিশেষভাবে বুঝায়। আকৃতি শব্দের এ'সকল উদ্দেশ নিবারিত করিয়াই বলিতে হয় যে, 'অর্থগত' আকৃতিই এ প্রসঙ্গে আমাদের সবিশেষ উদ্দেশ্য। কোন বাক্য উচ্চারিত হওয়া মাত্র মনে যেমন উহার একটা অর্থগত ছবি অঙ্কিত বা জাগরিত হয়, তেমন কাব্যপাঠেও সমস্ত কাব্যটির পাঠফল-রূপে, উহার বিভাব-অনুভাব এবং রসের সমঞ্জসীভূত একটা ধৃতি-চ্ছবি সমগ্রভাবে, সমর্থ পাঠকমাত্রের মনে উদ্ভাবিত হয়। উহাকে বলিতে পারি, কাব্যের পাঠোত্তর-ফলা, চিদ্‌ঘনরূপা আকৃতি বা প্রমূর্ত্তি।

১০। কিন্তু এই প্রসঙ্গে অর্থগত আকৃতিই উদ্দিষ্ট।

উহা পাঠকের চিত্তমুকুরে কাব্যটির ব্যক্তিত্ব এবং উহার আত্মার পরিচয়ভূত একটা ছবি—কবির প্রয়োগব্যাপারই উক্ত ছবি অঙ্কিত করে। ছবি! মনুষ্যের চিত্তে ব্যক্তিবিশেষের পরিচয়-ধারণামূলক ছবির ন্যায়, উক্ত ছবি পাঠকের চিত্তে পঠিত কাব্যরূপী ব্যক্তিটীর আকৃতি এবং প্রকৃতি উভয়কে অবলম্বন করিয়াই অঙ্কিত হইয়া থাকে। কাব্যের এই ব্যক্তিত্ব-ছবি চিত্তে যতই পরিস্ফুট এবং অবদাত ভাবে ও স্থায়ী ভাবে অঙ্কিত হইতে পারে, ততই কবির কবিত্ব, শিল্পিত্ব এবং কৃতিত্ব। উক্ত ছবির উন্নতধর্ম্মতা, উহার মাহাত্ম্য এবং স্থায়িত্বের হিসাবেই কাব্যের চূড়ান্ত ফল, বল ও মূল্য নির্দ্ধারিত হইতে থাকে।

সুতরাং কাব্যের আকৃতি বলিতে প্রথমকল্পে উহার প্রণালীর যে আকৃতি বুঝায়, উহার বাক্যবন্ধের, ছন্দোবন্ধের বা সর্গ-বন্ধের আকৃতিগত যে

কাঠাম বা গঠন বুঝায়, কেবল তাহাই বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমাদের লক্ষ্য নহে। আমরা সাহিত্যের আকৃতি বলিতে উহার বাক্য-পরিস্ফুট বিভাবের, অনুভাবের এবং ভাবের সংমিশ্রণজাত মননগম্য মূর্ত্তিটাই লক্ষ করিতেছি। সাহিত্যশাস্ত্রে উহার পারিভাষিক নাম 'বস্তু'; উক্ত 'বস্তু' বাক্যের অর্থসিদ্ধ এবং অর্থ সাঙ্কেতিত পদার্থ। অনুভূতির ক্ষেত্রে সুতরাং সাহিত্যের তিনটি 'বস্তু' বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব। বাক্যের বিষয়ে যেমন অর্থই উহার 'বস্তু', তেমন কাব্য বা সাহিত্যের বিষয়ে উহার বিভাব, অনুভাব ও ভাবের মনোগম্য আকৃতিই 'বস্তু'। উক্ত ত্রিবস্তু যতই পরিস্ফুট হইবে ততই বাক্য মননসই এবং মনন ক্ষেত্রে শক্তিশালী ও স্থিরার্থশালী হইবে। এই 'বস্তু' যতই অস্ফুট হইবে, ততই সঞ্চারী ভাব দুর্ব্বল হইবে, সুতরাং, কাব্যও দুর্ব্বল, ধারণার ক্ষেত্রে শক্তিহীন, নিহতার্থ ও বৈয়র্থ্যময় হইবে; ততই উহার শক্তি-সঞ্চার বিকল, বিঘ্নিত এবং কাহিল হইবে; ততই কাব্য 'প্রাণহীন' হইবে। সুতরাং সাহিত্যকে প্রবল এবং স্থায়ী হইতে হইলে, মনন ক্ষেত্রে প্রবল বিভাব এবং অনুভাবের সাহায্যে স্থায়ীভাব সিদ্ধি করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। বলা বাহুল্য, কাব্যের এইরূপ বৈশিষ্ট্যময় ব্যক্তিত্ব চিত্তে স্থায়ীরূপে অঙ্কিত হইতে যেমন কবির আত্মসিদ্ধ ও বিশিষ্টধর্ম্মী বাক্য-পদ্ধতি উহার সাহায্য করে, তেমন বিশেষত্বশীল ভাব ও বিভাব-বস্তু এবং বিশেষত্বযুক্ত আলম্বন ও উদ্দীপনবস্তুও সাহায্য করে। পরন্তু, বিভাবাদির বিশিষ্ট-ধর্ম্মতা, মহত্ত্ব ও শক্তির উপরেই কাব্যের 'ব্যক্তিত্ব' নির্ভর করে। বিশেষের সাহায্যেই সামান্যের উপস্থাপন! শিল্প-সাহিত্যের প্রমূর্ত্তি এবং রসসাধনার শ্রেষ্ঠ সফলতার ক্ষেত্রে ইহাই সাধারণ নিয়ম। উহা চিত্তে ভাব ও বিভাবের সাহায্যে, বাক্যের পূর্ব্বোল্লিখিত ছন্দাদি সাহায্যে অঙ্কিত, পরিস্ফুট ধারণাময়, সাকার ছবি। কাব্যের ভাব, ভাষা, অর্থ ও অর্থের যাবতীয় চরিত্র ও আচরণ, বাক্যের ছন্দ ও কাব্যের বাহ্যিক কাঠাম ও রীতি

১১। সাহিত্যে শাস্ত্রে উহার নাম 'বস্তু'।

১২। সাহিত্যে আকৃতি-সিদ্ধ রস বস্তু।

প্রভৃতির সর্ব্বথা সমঞ্জসিত ও সর্ব্বঘনীভূত এবং অনির্ব্বচনীয় উদ্বর্ত্ত-ফলরূপে এই ব্যক্তিত্ব দাঁড়াইয়া যায়; কবিত্বের প্রধান পরিচয় এইরূপ ব্যক্তিত্বের মধ্যে। এ'জন্য উহাকে কাব্যের শ্রুতিফল বা পাঠফল রূপে ও নির্দ্দেশ করিতে পারি। উহা শিল্পীর চূড়ান্ত সিদ্ধি এবং পাঠকেরও চূড়ান্ত প্রাপ্তি।

অতএব, সাহিত্য আকৃতিবাদী বলিলেই বুঝিতে হয় যে, মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ, তাত্ত্বিকতা, মানসিকতা অথবা দার্শনিকতা কখনও একান্তভাবে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের আদর্শ নহে। সাহিত্য সত্য চাহে—কিন্তু ভাবের অগ্নিসন্দীপ্ত সত্যমূর্ত্তিই চাহে; সত্যের প্রমূর্ত্তি চাহে। পরিকল্পনাহীন ভাবোন্মত্ততা কিংবা প্রকাশ-কলুষ ব্যাকুলতা, উহা সাহিত্যে দুর্ব্বলতা ও বাতুলতার নামান্তর।

মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণী রীতিও প্রকৃত প্রস্তাবে দার্শনিক রীতি; সেইরূপ, ইতিহাসের কিংবা সমাজের সত্যদর্পণী অথবা উহার সমস্যাদর্শনী রীতি ও বৈজ্ঞানিক রীতি মাত্র। এইরূপে ব্যাখ্যাপনী ও সৃষ্টি নহে। বুঝিতে হইবে, ভাবের পরিমূর্ত্তনীই হইতেছে সাহিত্যরীতি।

১৩। গীতি কবিতাদিতে আকৃতি আদর্শের আপাত-দৃষ্ট ব্যতিক্রম—নিরাকার কবিতা।

এই সিদ্ধান্ত চিন্তা করা মাত্র, আমাদের চিত্তে উহার ব্যতিক্রম গুলির দৃষ্টান্ত সমুদিত হইবে। কি প্রাচীন কি আধুনিক সকল সাহিত্যেই গীতিকবিতা বা সঙ্গীতকবিতা নামক একটা মনোহর সাহিত্য ব্যাপার আছে! এই বঙ্গসাহিত্যেই 'গীতি-কবিতা' নামে একটা, আপাতদৃষ্টিতে যেন অনুভাব-বিভাব-বিহীন, বিস্তারিত সাহিত্য আছে, তাহাও প্রতীয়মান হইবে। উহাকে সাধারণতঃ 'ভাবগত' কবিতা নাম দেওয়া হয়। আমরা দেখিব বিরোধ প্রকৃত বিরোধ নহে—কেবল বিরোধ বলিয়া প্রতীয়মান; এবং ভাবগত কবিতাও প্রকৃত প্রস্তাবে একটা অপনাম। কবিতা মাত্রেই ভাবগত—ভাবোদ্রেকই প্রকৃত কাব্যমাত্রের উদ্দেশ্য। আরও বুঝিতে হয় যে, শ্রেষ্টতার স্থলে আধুনিক গীতিকবিতার মধ্যেও বিভাব এবং অনুভাবের বস্তুগত আলম্বন উদ্দীপন

একেবারে নাই তাহা নহে—ঐ সকল ব্যতীত রসাত্মক বাক্য দাঁড়াইতেই পারে না। কেবল উহারা অস্পষ্ট, পটান্তরিত, ছায়ান্তরিত। বলিতে পারি যে, বহুস্থলে নামহীন গীতিকবিতার মূল বিভাব—কবির 'আমি'; কোন বিশেষ অবস্থা ও ঘটনার দ্বারা বিশেষিত স্বয়ং কবিই অনেক গীতি-কবিতার আলম্বন। কবির আমিত্বের বিভিন্ন অবস্থাগত ভিন্ন ভিন্ন মর্জ্জি লইয়াই উহার অনুভাব। আরও বলিতে পারি যে, বিভাব অনুভাব ও ভাবের পরিস্ফুটতার উপরেই প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রেষ্ট গীতি-কবিতার শ্রেষ্টতান্বিতা প্রাণশক্তি নির্ভর করিয়া থাকে। মনুষ্যচিত্তের রস-ধর্ম্মের কুত্রাপি ব্যভিচার নাই। কবির আমিত্ব-সম্পর্কিত অনুভাবাদির সাহায্যে গীতিকবিতায় ভাব কিম্বা তত্ত্ববিশেষকে সাধারণভাবে এবং একটা সামান্যকথনের রূপেই impassioned expression দেওয়া হয় বলিয়াই, উহার প্রধান রসাত্মিকা শক্তি। উহার 'ভাল লাগা'র প্রধান হেতু। শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতায় emotionalised thought রূপী ফলের মধ্যেই উহার রসাত্মা—উহার মুখ্য শক্তি। এইরূপে অনামিকা গীতি কবিতায় 'আমি' 'তুমি' অথবা 'তিনি'! এক্ষেত্রে অনামিকার অর্থই সর্ব্বনামিকা!

১৪। প্রাচীন ও আধুনিক কবিতার পরিমূর্ত্তনী বনাম চিত্রণী ও গায়নী রীতি।

এস্থলে আধুনিক সাহিত্যের ওই আপাতদৃষ্ট নিরাকার কবিতা, উহার 'ভাবগত' কবিতা বা সঙ্গীতকবিতা এবং চিত্র-কবিতার পরস্পরবিশেষী তত্ত্বকে বিস্তারিতভাবে বুঝিবার অবকাশ নাই। তবে, ভাবুকতার রীতি বিষয়ে প্রাচীন ও আধুনিক কবিতার একটি প্রধান পার্থক্যকে অল্প কথায় বুঝিতে হইলে বলিব যে, প্রাচীন কাব্য-শিল্প ছিল 'বস্তু'র সুপরিস্ফুট প্রমূর্ত্তিবাদী, আর আধুনিক শিল্প হইয়াছে বিশেষভাবে 'বস্তুর' সঙ্কেতবাদী। একটি Plastic, হইলে, Statuesque হইলে অপরটি হইল picturesque বা musical। শেষোক্ত উভয়-রীতিই আধুনিকতা কিংবা রোমাণ্টিকতার দুইটী ধারা! ইয়োরোপ খণ্ডে প্রসিদ্ধ রেনেসাঁসের কারণে কাব্যসাহিত্য দুই-দুইবার স্বতন্ত্র কলা-রাজ্য

হইতে, তাহার সহোদর 'চিত্র' ও সঙ্গীতের রাজ্য হইতে, আক্রান্ত হইয়াছে। চিত্র ও সঙ্গীতের বিভিন্নক্ষেত্রবিহারী আদর্শের আক্রমণে, সাহিত্যের আদর্শ কোন কোন দিকে যেমন পরিপুষ্ট, তেমন বিধ্বস্ত হইয়াছে! অনেকস্থলেই কেবল অতিরিক্ততা এবং বিবেকবিধুর চরমপন্থিতা! বলিতে কি, আধুনিকতা বলিতে অনেকস্থলে কেবল একদেশী এবং প্রচণ্ড অতিরিক্ততাই বুঝাইতেছে। চিত্রসিদ্ধ ইটালীর রাফেল-টিশীয়ান্ প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত চিত্রশিল্পিগণের আদর্শ-প্রভুতায় সাহিত্যক্ষেত্রে চৈত্র অস্পষ্টতা ও রহস্যবাদের অতর্কিত অবতারণা ও প্রাদুর্ভাব! তেমন. সঙ্গীত-সিদ্ধ জর্ম্মণীর ভাগ্নের প্রভৃতির আদর্শচ্ছায়ায় সাহিত্যে গায়নী অনর্থতা এবং কেবল স্নায়ু-সুখ-লক্ষী বোলচালের সচেতন বাড়াবাড়ি! উভয়তঃ সাহিত্য উৎকর্ষ-স্থলে সামর্থ্য ও শক্তিপ্রসার লাভ করিয়াছে সত্য; কিন্তু, অধিকস্থলেই কেবল অর্থ-বিধুর এবং দিশাহারা প্রলাপে অথবা অনর্থদম্ভী বিদ্রোহের বাহ্বাস্ফোটেই পর্য্যাকুল হইতেছে। চিত্রের 'ছায়া-ছায়া' অথবা 'ধোঁয়া-ধোঁয়া' বর্ণনা-রীতি, তাহার রেখা ও আভাস রীতি, সঙ্গীতের অর্থহীন সুর-তাল এবং বোলচালের সঙ্কেত রীতি সাহিত্যের অর্থ-প্রতিপত্তির রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করিয়া সর্ব্বসংহারী ভাবোন্মত্ততা এবং বাতুলতার সৃষ্টি করিতেছে! প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সাহিত্য (যেমন হোমরের ইলীয়ড, এস্‌কাইলসের প্রমীথেউস, সফোক্লিসের আন্তিগোনী, বর্জ্জিলের ঈনিড.) অথবা ভারতীয় সাহিত্য (যেমন ব্যাসবাল্মিকীর রামায়ণ, মহাভারত) মনুষ্যের অন্তরিন্দ্রিয়-সমক্ষে ভাবের ঘনপরিস্ফুট এবং সীমা-সুস্থির রূপক প্রমূর্ত্তি উপস্থিত করিতেই আদর্শ রাখিত। বলিতে পারা যায়, উহাদের ছিল, ভাস্করের আদর্শ। এ আদর্শেই জগতের জ্ঞানভাবের ভাণ্ডার প্রকৃত প্রস্তাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে; এই আদর্শে কবিপ্রতিভা অনেক অপূর্ব্ব-সম্ভব, দুঃসাধ্য এবং অনির্ব্বচনীয় ভাবচিন্তাকে মননীয় মূর্ত্তিতে আকারিত করিয়া মনুষ্যচিত্তের প্রভুত্ব-বৈজয়ন্তী এবং অধিকার-পতাকা অগম্য লোকেও অগ্রসর করিয়া গিয়াছে। মনুষ্যের 'অবাঙ্মনসগোচর' যে রাজ্য তাহার সাহিত্যশক্তির অতীতভাবে, মনঃ-সমক্ষে নিত্যকাল আভাসিত আছে, এই আদর্শ উহার

যেইটুকু বাক্যার্থের মুষ্টিগত করিতে পারিয়াছে তাহাই ত প্রকৃত উপার্জ্জন! কিন্তু, উহার পরে অনন্ত, অজ্ঞাত, অব্যাকৃত এবং অনধিকৃত মহাসিন্ধুর দিকে কেবল সঙ্কেতাঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াই প্রাচীন সাহিত্য অনেক স্থলে বিরত হইয়াছিল। ভাষার অর্থশক্তিতে যতদূর পরিমূর্ত্ত করিতে পারা যায়, অনেক সময় ততদূর গিয়াই যে প্রাচীন সাহিত্য নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবেনা।

রোমান্টিকতার সঙ্কেতবাদী আদর্শ বলিতে আমাদের পরিচিত স্থলে, সিম্বোলিষ্ট নাটকের ক্ষেত্রে মেতর্‌লিংক ও গীতিকবিতার ক্ষেত্রে শেলী, ভেয়ার্‌লেন, নোফালিস্ ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির রীতিকেই দৃষ্টান্তরূপে নির্দ্দেশ করিব। বুঝিতে হইবে, উহা বিশেষ ভাবে কেবল প্রকাশের রীতিগত আদর্শ। ইঁহারা যেন মনুষ্যের বাক্যশক্তির অর্থ-অধিকারের সীমা ছাড়াইয়া অব্যাকৃত, অধৃত, অজ্ঞেয়, এমন কি অতিপ্রাকৃত জগতেই বাক্য-সরস্বতীকে পরিচালিত করিবার আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। বলিতে কি, কেহ কেহ একেবারে চরমপন্থী হইয়া, কেবল অনর্থতা, কেবল ছন্দতা বা অস্পষ্টতাকেই কবিতার আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন! এই পথে ইয়োরোপীয়গণ যে অনেকদিকে অপূর্ব্ব-নূতনের উপার্জ্জনেই অগ্রসর হইয়াছেন, বাক্যের সাক্ষাৎ অর্থ-শক্তির এবং ধ্বনির সীমা ছাড়াইয়াও যে অধৃতের রাজ্যে অনেক সঙ্কেতপাত করিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু, স্বীকার করিতেই হইবে, আপনাদের লক্ষ্যের, বিশেষতঃ প্রকাশ-রীতির প্রকৃতিহেতু তাঁহাদের অনেক উপার্জ্জনই মনুষ্যের গ্রাহিকাবুদ্ধির ঘাতসহ অথবা প্রমাণসহ নহে। অতএব, অনেক উপার্জ্জনের-মাহাত্ম্য চিরকাল বিবাদস্থলী হইয়া আছে এবং থাকিবে। অধিকন্তু, তাঁহারা যে অনেক সময় indefinite পদার্থকেই Infinite বলিয়া দেখাইতে চাহেন, ইচ্ছাকৃত এবং কেবল বাক্যের কায়দা-জনিত অস্পষ্টকেই অসীম বলিয়া সঙ্কেত করিতে চাহেন, তাহাও নিদারুণ সত্য! সে'স্থলে, তাঁহাদের অবলম্বিত সাঙ্কেতিক রীতি গতিকে, অনেক

১৫। রোমান্টিক গীতি-কবিতা ও সাঙ্কেতিক নাট্য।

সময় নিজের অক্ষমতাই যে শক্তি বলিয়া ভ্রম জন্মায়,ভাব-বোধে এবং ভাবের প্রকাশে কৃপণতাই যে অলৌকিক বিজ্ঞতা বলিয়া নিজকে উপস্থাপিত করে, অস্পষ্ট পদার্থকেই 'চরম বস্তু' রূপে দাবী করে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। বুঝিতে হইবে, ইহাই রক্ষণশীল আদর্শবাদিগণের দ্বারা বহুনিন্দিত আধুনিক সাহিত্যের রোমাণ্টিক রীতি—এবং ইহার সাহসিকতাই বিশেষভাবে আধুনিক। এই আদর্শে প্রৌঢ়বয়সের রবীন্দ্রনাথের শতকরা ৮০টী কবিতা কেবল সঙ্গীত এবং চিত্ররীতির সংমিশ্রণা-জনিত ভিন্ন ভিন্ন মর্জ্জির কবিতা। উহাদের কোন সুপরিস্ফুট আলম্বন বস্তু নাই—'যাইথোপীয়া' নাই—ভাবের কোন বিস্পষ্ট পরিমূর্ত্তনা নাই; কোন দেশ-কাল-চিহ্ন নাই; কেবল কবিচিত্তের বিভিন্ন অবস্থানিষ্ঠ ভাবুকতা এবং চিন্তার প্রকাশ! প্রায়স্থলে বিভাব, কর্ত্তা বা নায়ক—কবি স্বয়ং। কবির আত্মভাবগত (subjective) একএকটি কবিতা অনায়াসে, নিশ্চিন্ত ভাবে, অপর কোন পাত্র-বস্তুর নির্ব্বাচন কিংবা সৃজন-সংঘটন বিনা, কেবল নিজকে প্রকাশ করিতেছে! সৃষ্টিচেষ্টার কোন রূপ "তপঃখেদ" ব্যতীত কেবল স্রোতের মুখে নিজের ভাবুকতাই ঢালিয়া চলিয়াছে। উহাদের নাম দিতে পারি, "সঙ্গীত কবিতা"। তবে, উহাদের মধ্যেই রবিকবির চরম মাহাত্ম্য এবং সাহিত্যজগতে অনন্যসুলভ বিশেষত্বটুকু নিহিত আছে।

বলিয়া আসিয়াছি, ইয়োরোপ খণ্ডে রেনেসাঁসের প্রাদুর্ভাব হইতেই রোমোণ্টিকতা নিজকে একটা স্বতন্ত্র এবং যুদ্ধশীল সাহিত্যপদ্ধতিরূপে আত্মখ্যাপন করিয়াছে; অতিরিক্ততা অবলম্বনে 'ক্লাসিকের বিরুদ্ধে বিবাদ ঘোষণা করিয়াছে। নচেৎ, ক্লাসিক ও রোমাণ্টিক—উভয় আখ্যাই উৎকৃষ্ট সাহিত্যের বাচক ছিল এবং বিবাদক্ষেত্রের বাহিরে এখনও আছে। উভয়েই উৎকর্ষপক্ষে, বস্তু ও ভাবের, বাক্য ও অর্থের, চৈত্র অথবা গায়নী রীতির সামঞ্জস্য সিদ্ধিই বুঝায়। হোমরের ইলীয়ড ক্লাসিক হইলে, তাঁহার ওডীসীকে রোমাণ্টিক বলিতে পারি। বাল্মীকি স্বীকারতঃ রামায়ণকে "তন্ত্রীলয়সমন্বিত" করিয়া রচনা করিয়াছেন। রামায়ণের

সুন্দর কাণ্ড ও মহাভারতের বিরাট্‌পর্ব্ব বিস্ময়াদ্ভুত-ভয়ানক সৌন্দর্য্য-ময় প্রমূর্ত্তির ক্ষেত্রে এবং ক্লাসিক ও রোমাণ্টিকের সামঞ্জস্যক্ষেত্রেও অতুলনীয়। ইটালীর নবজীবনের শ্রেষ্ঠকবি দান্তে ভাবুকতার প্রমূর্ত্তন শক্তিকে তাঁহার Divine Comedy ও New Life কাব্যে যে অনেক অগ্রসর করিয়া গিয়াছেন, এ ক্ষেত্রে হোমর-বর্জ্জিল হইতেও যে কোন কোনদিকে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি মানব-প্রেমকে ইহপরকাল-জীবী ও স্বর্গমর্ত্ত্যজয়ী যেই মহাতত্ত্বরূপে উপস্থিত করিয়াছেন, ইয়োরোপের প্রাচীন গ্রীক্‌-লাটিন্ সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। এ ক্ষেত্রে দান্তের মাহাত্ম্য সর্ব্ববাদি-সম্মত বলা যাইতে পারে। ইংলণ্ডে রেনেসাঁসের শেষ কবি মিণ্টনও যে Paradise Lost প্রভৃতি কাব্যে মনুষ্যের অব্যক্তানুভূতিকে অতুলনীয় এবং মনোরম প্রমূর্ত্তি দান করিয়া গিয়াছেন, অতুলনীয় অর্থে ও সঙ্কেতে মনুষ্যের মনকে অমূর্ত্ত ও অদ্ভুত ভাব এবং আনন্দের রাজ্যে নানামতে অগ্রসর করিয়া গিয়াছেন তাহাতেও সন্দেহ নাই। স্পেন্সর এবং শেক্‌সপীয়রের কাব্য-নাটক-সঙ্গীত-সনেটের মধ্যেও আধুনিকের ভাবোত্তমা রীতিই প্রবল হইয়া অতুলনীয় জীবনদর্শনে উল্লসিত হইয়াছে; শতসহস্রশির জীবনচিত্রে আপনাকে পরিমূর্ত্ত করিয়া এবং গভীর-গভীরতর ভাব এবং তত্ত্বের অনির্ব্বচনীয় বস্তুকেই সঙ্কেতিত করিয়া আসিয়াছে। ওয়ার্ডসোয়ার্থের মধ্যে এই আধুনিক রীতিই নিসর্গ প্রকৃতির শান্তনিস্তব্ধ অন্তরাত্মায় প্রবেশ লাভ করিয়া আপনার রসানন্দকে শতশত অমর গীতিকবিতায় পরিমূর্ত্ত করিয়াছে। ব্রাউনিং-টেনীসনের মধ্যে এই রোমাণ্টিকা বুদ্ধিই সচেতন শিল্পক্ষমতা লাভে নব নব পরিকল্পনা এবং সৃজন ব্যাপারে বিলসিত। উহা প্রমূর্ত্তনের বস্তূত্তমা রীতি কুত্রাপি বিদ্রোহিভাবে পরিহার করে নাই। ব্রাউনিং পরিপূর্ণভাবে দার্শনিক কবি। তিনিও দার্শনিক তত্ত্বকে পরিস্ফুট মাইথোপীয়া এবং প্রমূর্ত্তির আদর্শেই জীবনের বাস্তব রূপ এবং শারীর আকৃতি দান করিতে চায়িয়াছেন! ইয়োরোপখণ্ডে রোমাণ্টিকতার এই গীতি এবং চিত্র রীতির, সাঙ্কেতিক এবং অস্পষ্টতা রীতির সচেতন আত্মঘোষণা ও দারুণ

চরমপন্থিতার সূত্রপাত বলিয়া ধরিতে হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর জর্ম্মনীতে। ফ্রেড্রিক ও ভিল্হেল্ম্ শ্লেগেল, টীক, নোফালিস, বিশেষতঃ নোফালিসের মধ্যেই রোমাণ্টিক আদর্শ একটা স্বয়ং-প্রজ্ঞ, স্বয়ং-শ্রেষ্ঠ, স্বতন্ত্র এবং যুযুৎসু সাহিত্যরীতিরূপে দাঁড়াইয়া যায়; দার্শনিক তত্ত্ব-বিচারে, পরাক্রমী সমালোচনায় এবং প্রত্যক্ষ কর্ম্ম-দৃষ্টান্তের আদর্শে দাঁড়াইয়া যায়। তদনুসারে রোমাণ্টিক সাহিত্য-সৃষ্টির প্রক্রিয়াও বিপুলভাবে চলিতে থাকে। সাহিত্যের সৃষ্টিব্যাপার সমালোচনা হইতেই যে একটা পরম ধর্ম্মচোদনা এবং কর্ম্ম-প্রেরণা লাভ করিতে পারে, তাহা প্রমাণ করিয়াছে ঐ যুগের জর্ম্মনী!

জর্ম্মনীর দেখাদেখি ইয়োরোপময় উহা সংক্রামিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে! বুঝিতে হইবে, উহা একটা একদেশী গোঁড়ামী ও অত্যন্ততা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই রোমাণ্টিকা রীতির বিভিন্ন ধারাই প্রকৃত প্রস্তাবে নেচরেলিজম, সিম্বোলিজম, মীষ্টিসিজম ও ডিকেডেণ্ট্ প্রভৃতি নামে প্রচলিত। নোফালিসকে Premier Romantic Poet রূপে নির্দ্দেশ করা হয়। ইংরেজী সাহিত্যে কেবল শেলীই নোফালিসের ভাবুকাত্মা লাভ করিয়াছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যে শেলীর মধ্যেই সর্ব্বপ্রথম 'সঙ্কেতবাদ', সুদূর এবং অপ্রাপ্তের প্রীতি ও 'অস্পষ্টতা' রীতি সাহিত্যের একটা স্বতন্ত্র প্রকাশ-আদর্শরূপে জন্মলাভ করে। তবে শেলী তাঁহার সঙ্গীত এবং গীতিকবিতার মধ্যেও কদাচিৎ 'বস্তুত্তমা'রীতি পরিহার করিয়াছেন। মেতরলিঙ্কের "নীলপাখী"ও "দৃষ্টিহারা" প্রভৃতি সাঙ্কেতিক নাট্যগুলির মধ্যে আসিয়া নাটক-ক্ষেত্রেই 'শুদ্ধ সঙ্কেতবাদ', হিজিবিজি বিভাব-অনুভাব ও হিজিবিজি ভাব-বাদ একটা স্বাধীন এবং মৌলিক সাহিত্য-রীতিরূপে আত্মম্ভরতা এবং আত্মবিঘোষণার ঔদ্ধত্যে মাথা তুলিয়াছে। মৈতরলিঙ্কের কবিত্ব শক্তি, ভাবকে রসানন্দী ভাষার ছন্দে ধারণা করার শক্তি কম নহে—অনন্যসাধারণ। কিন্তু, তিনি একেবারে নাটকীয় গদ্যের ক্ষেত্রেই সঙ্গীততন্ত্রের সঙ্কেতবাদকে অবতারিত করিয়াছেন! অ-বস্তুনির্ভর, বিরুদ্ধবস্তু-নির্ভর, এমন কি, অনেক সময় প্রলাপ-নির্ভর সঙ্কেত! এক

কথা বলিতে গিয়া অকস্মাৎ অর্থান্তরন্যাস এবং অন্যদিকে ইঙ্গিত! অনেক সময় অপ্রস্তুতবস্তুর অসংশ্লিষ্ট রূপকথা, অসম্ভব, অলীক কথা তুলিয়াই তত্ত্ব-সঙ্কেত! ভাবুকতার মাতলামী করিয়াই একটা ভাবসঙ্কেত! মেতরলিঙ্কের অনেক সিম্বোলিক নাট্যকথা কেবল তত্ত্বসন্দর্ভ রূপে, কেবল রেখাচিত্রের ও সঙ্গীতের ইঙ্গিতরীতি সম্মুখে রাখিয়াই বোনা হইয়াছে। ঐ সমস্তের মধ্যে একদিকে যেমন বিষয়বস্তুকে 'ছায়া-ছায়া', 'ঘোরাল' এবং অস্পষ্ট করিয়া একটা রহস্যের সঙ্কেত; তেমন ভাব কে—emotionকে—সম্পূর্ণ কাহিল এবং 'না-বহাল' করিয়া কেবল একটা intellectual বা দার্শনিক তত্ত্বের ইঙ্গিত! 'একটা' ইঙ্গিত বলাও ঠিক নহে; পদে পদে বাক্যের নানা-বিষয়িণী গতি ও মতি হইতে ফলতঃ নানা অস্থির ইঙ্গিত! সুতরাং মেতরলিঙ্কের মধ্যে ভাব এবং আলম্বন-উদ্দীপন সমস্তই অস্পষ্ট ও চঞ্চল হইয়া রসকে অস্পষ্টতর ও অস্থির করিয়া গিয়াছে! রবীন্দ্রনাথের প্রৌঢ় বয়সের 'রাজা', 'ডাকঘর', 'ফাল্গুনি' প্রভৃতি মেতরলিঙ্কের সিম্বোলিক নাট্য-রীতিতেই রচিত। উহাদের প্রধান প্রাপ্তিও যেমন intellectual, তেমনই অস্পষ্ট। অন্ততঃ কেবল একটা বোধায়নী প্রাপ্তি! সিম্বোলিক নাটকের সিদ্ধি যেন বুদ্ধিগত না হইয়াই পারে না। তবে রবীন্দ্রনাথ এ সমস্ত নাটকে প্রধানতঃ একটা 'রূপক' বস্তু উপস্থিত করিতে চাহেন—একটা আকৃতির সাহায্যেই ভাবকে উপস্থিত করেন; এবং মেতরলিঙ্ক অপেক্ষা স্ফুটতর বস্তুমুখে দার্শনিক তত্ত্ব উপস্থিত করিতে চাহেন। স্পেন্সার বা পোপ্-ড্রাইডেন্ প্রভৃতির 'রূপক' হইতে তাঁহাদের একটু পার্থক্য এই যে উহারা রূপক-বস্তুর সমগ্রতায় এবং অংশে একটা সঙ্গতি রক্ষা করিতে চাহিতেন। তাঁহারা সে সঙ্গতি আদবেই রক্ষা করেন না; কেবল মোটামোটি সঙ্গতি রাখিয়া, অপ্রস্তুত এবং সুদূর ভাব কিংবা তত্ত্বের সঙ্কেতে মনুষ্যের চিন্তাশক্তিকে উত্তেজিত করিতে পারিলে যেন কৃতার্থ হন; সঙ্কেতিত দার্শনিক চিন্তাকে spiritual বা অধ্যাত্মতত্ত্ব ও পরমতত্ত্ব বলিয়া পাঠকের কবোষ্ণ ধারণা ও উদ্বেগ জন্মাইতে পারিলেই যেন সুখী হন। তাঁহাদের মতে অস্পষ্টতা বা

অর্থগুপ্তি বা অনর্থতাই যেন একটা স্বতন্ত্র রস—সাহিত্যে লোভনীয় এবং সাধনীয় বস্তু।

আমাদিগকে দেখিতে হইবে, আধুনিকের এই রোমান্টিক ও সিম্বোলিক কাব্য বলিতে একটা আত্যন্তিকতা এবং প্রকাশের রীতি বিষয়েই কেবল একটা চরমপন্থিতার আদর্শ মাত্র বুঝাইতেছে। কেবল একটা নিরাকারবাদ! প্রকৃত প্রস্তাবে অর্থযুক্ত বাক্যমাত্রেরই আকার না থাকিয়া পারে না। অনর্থক বাক্যবিন্যাসে মনশ্চক্ষে যেই আকার আসে—তাহা হিজিবিজি আকার! অনর্থক বাক্য বা অস্পষ্টার্থক কবিতাকেই ব্যবহারতঃ 'নিরাকার কবিতা' বলা যাইতে পারে। রোমান্টিকতার এই রহস্যবাদ ও সাঙ্কেতিক পদ্ধতি ও উহার বহুমুখী প্রবৃত্তি বিস্তারিতভাবে এবং স্বতন্ত্রভাবে অনুধাবন যোগ্য! (১) উহা বিসদৃশ বিপত্তি-সঙ্কুল; অথচ, উহার মধ্যে সত্যের অভাব নাই, মনুষ্যচিত্তে উহার আকর্ষণী ও মোহিনী ক্ষমতার অভাব নাই বলিয়াই পাঠক ও শিল্পীর পক্ষে সতর্কভাবে অনুধাবন। উহা হইতে এককালে একটা স্বতন্ত্র সাহিত্যরীতি বহুসম্মত ভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া যাইতে পারে বলিয়াই সাহিত্যসেবিগণ উহাকে তাচ্ছিল্য করিতে পারেন না। এ'স্থলে বলিয়া যাইতে পারি যে, পদবাক্যের অর্থসঙ্কেত-বাদ এ'দেশে নূতন নহে। ভারতীয় সকল প্রাচীন কবির মধ্যে উহার দৃষ্টান্ত আছে; ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্রে পদবাক্যের সাক্ষাৎ-সঙ্কেতিত ধ্বনি হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূর অর্থধ্বনি, ব্যঞ্জনা এবং অনুরণন পর্য্যন্ত স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু, অনর্থদম্ভী হিজিবিজি রীতি কদাপি নহে

এখন, আধুনিক গীতিকবিতার ক্ষেত্রে 'শৈলী-রীতি' ও সিম্বোলিক নাট্যক্ষেত্রে 'মেতরলিঙ্ক রীতি'—উভয়ের মধ্যেই যে শিল্পতরফে 'আকৃতি'-আদর্শের ন্যূনাধিক ব্যভিচার আছে, স্থানে স্থানে আপাতদৃষ্ট ব্যভিচার-রূপে হইলেও আছে, তাহা সাহিত্যসেবক মাত্রেরই প্রত্যক্ষ। উহাকে সুসঙ্গত ভাবে না বুঝিলে আমাদের শিল্পতত্ত্ব-জ্ঞান কোনমতে

(১) বাণীমন্দিরের দ্বিতীয় খণ্ডে 'রোমান্টিকতা' নামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এ বিষয় বিস্তারিতভাবে বিবেচিত হইবে।

সামঞ্জস্য লাভ করিতে পারিবে না। উভয় কবিই বিদেশী; কিন্তু উক্ত পদ্ধতিকে দৃষ্টান্ত পথে বুঝিবার জন্য বঙ্গ-সাহিত্যেই আশাতীত সুবিধা ঘটিয়াছে। বাঙ্গালী কবি রবীন্দ্রনাথ উভয় রীতির মিলন ঘটাইয়াছেন। তিনি অন্তরাত্মার স্বধর্মে কৈশোর হইতেই শেলীর idealist রীতি ও প্রৌঢ়বয়সে মেতর্‌লিঙ্কের symbolic রীতির অনুগামী; অধুনা ওতপ্রোতভাবে উভয়ের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত ও মিলনস্থলী।

১৬। অব্যক্তবাদী গীতিকবিতা ও সঙ্কেত-কবিতার অতুলনীয় মিলনস্থলী—রবীন্দ্রনাথ।

কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বহুস্থলে এমন একটা সমুচ্চ দার্শনিকতা ও সঙ্গীত-ধর্ম্মের সমাবেশ আছে, যাহাতে তাঁহাকে সাহিত্য-জগতের একজন অনুপম কবি-ব্যক্তি রূপে নির্দ্দেশ করা যায়। তাঁহার কবিত্ব-প্রতিভার মূলতত্ত্বেও অনুদিন এমন একটা নব-নব ভূমিতে চলতার স্পৃহা এবং ভ্রমণের প্রবৃত্তি আছে, তাঁহার বাক্যরীতির মধ্যেও এমন একটা ভাবাকুলতা এবং লীলাচলতা আছে, যে দিক হইতে তাহাকে সাহিত্যে একজন অতুলনীয় ব্যক্তি-চরিত্র রূপেও নির্দ্দেশ করিতে পারি। তিনি স্বধর্ম্মেই গীতিকবি সুতরাং স্বল্প-নিশ্বাসী গীতি কবিতা এবং খণ্ডকবিতার ক্ষেত্রেই তাঁহার অন্তরাত্মার এই স্বধর্ম্ম—তাঁহার মেজাজের এবং প্রকাশ-রীতির একটা বিশিষ্টতা। তাঁহার মেজাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য-লক্ষণও তাঁহার গীতি-কবিতার মধ্যেই প্রকটিত। অধিকাংশস্থলে একটা অধৃত এবং অব্যক্ত ও নিরাকার পদার্থের উপস্থাপন বা সঙ্কেতের দ্বারা ভাবোদ্রেকের চেষ্টা! তাঁহার হৃদয় ভারতীয় বেদান্তের স্বীকারী মন্ত্রশিষ্য না হইলেও উহার ছায়াপুষ্ট প্রতিবেশী। অতর্কিত এবং অস্বীকারিত ভাবেই এতদ্দেশের "অদ্বৈত" ব্রহ্মবাদের ছায়া তাঁহাতে পড়িয়াছে। গীতিকবিতার ক্ষেত্রে দীর্ঘজীবী নিরাকারতন্ত্র ও সঙ্গীততন্ত্রতার ফলস্বরূপে, আধুনিক ইয়োরোপের সিম্বোলিক ও রোমান্টিক কবিনিবহের সহিত অত্যন্তসংসর্গের ফলস্বরূপে, ন্যূনাধিক নিরাকার এবং অস্পষ্টাকার ভাবুকতা তাহার সুসিদ্ধ হইয়াছে। মূর্ত্ত আকৃতি-বিদ্বেষী ব্রহ্মপন্থিতার ও ব্রহ্মসঙ্গীত-রচনার পথে চলিয়া আসিয়া,

১৭। গীতি কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব।

—বিশেষতঃ নৈবেদ্য ও কণিকার পর হইতেই এইরূপ ভাবুকতার সাধনা করিয়া—তিনি দীর্ঘকালে নিজের এই স্বাতন্ত্র্য ও রীতি বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বাপর সূত্রে বুঝিতে হইলে, উহা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেই Romantic ধর্ম্ম! উহার গতিকে কবি যেমন কোন অবস্থাতেই দশটি দিনের জন্য একাধিক্রমে ধ্যানস্থ হইতে পারেন না, যেমন নিত্য নব নব মানসিক উত্তেজনায় ও ক্ষুধায় তাঁহাকে ঘুরিতে হয়, তেমন উহা তাঁহাকে নিজের কোন বিশিষ্টতাতেই সুস্থির, ধ্যানপরায়ণ অথবা ঐকান্তিক হইতে দেয় না। উহাই কাব্যের ক্ষেত্রে তাঁহাকে কোন বিস্তৃতব্যাপারে আসক্ত হইতে কিংবা বৃহৎ ভাবকে বিস্তারিত আকার দান করিতে দেয় নাই; বৃহৎ কাব্য-বস্তুর দিকে দৃষ্টি করিতে অথবা বৃহৎ-কর্ম্মী masterpiece সৃষ্টিতে তৎপর হইতেও দেয় নাই। ক্ষুদ্র কবিতা, ছোট গল্প অথবা ক্ষুদ্র সন্দর্ভ! কবির বিস্তারিত নভেলগুলিও তত্ততঃ তাঁহার অনুপম ছোট গল্পেরই সন্নিবেশ সমষ্টি। এ'ক্ষেত্রে রোমান্টিকের অন্তর্মুখী দৃষ্টি, গীতি-রতি এবং আত্মদর্শনী নিয়তবুদ্ধিই যেন বিস্তারিত শিল্পসিদ্ধির বিরোধী পক্ষ।

কিন্তু, ওই রোমান্টিক চিত্তধর্ম্মই অপরদিকে কবিকে খণ্ড-কবিতার ক্ষেত্রে এমন একটা চিত্তব্যাপ্তি, বিস্তারিত ভাবানুভূতি, আত্ম-প্রসার এবং ক্রিয়াপরতার অধিকারী করিয়াছে যে, গত পঞ্চাশৎ বৎসরে ইয়োরোপীয় সাহিত্যে ভাবুকতার রীতি কিংবা রোমান্টিকতার যত প্রকার আবর্ত্ত চলিয়া গিয়াছে, তিনি এই বঙ্গদেশে থাকিয়া, সমস্ততেই আপনাকে ঢালিয়া দিয়া, উহাদের চূড়ায়-চূড়ায় 'চলন্ত' হইয়া আসিয়াছেন! প্রত্যেক আবর্ত্তের তরফেই উচ্চশ্রেণীর গীতিকবিতা উপার্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন! সমস্তে মিলিয়া কবির গীতিকাব্য-উপার্জ্জনকে সংখ্যায় এবং গুণে এমন ঘনবিপুল, উচ্চবরিষ্ঠ এবং পরিনাহী করিয়া তুলিয়াছে যে, এ'ক্ষেত্রে আধুনিক কোন একজন কবির পক্ষে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হওয়া অসম্ভব বলিয়াই ধারণা হইবে। এই চলিষ্ণুতা, এই প্রসারণী শক্তি, এবং আপনার পরিধির মধ্যে এই বহুমুখতা ও ঘনতা—এস্থলেই তাঁহার পরম বিশেষত্ব। এই কারণ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, কীট্‌স, ব্রাউনীং, গ্যাঠেলীলাব

হুগো বা মেতরলিঙ্ক প্রভৃতির স্বাধীনতা ও আপনাদের ব্যক্তিত্ব-তন্ত্রীয় ন্যূনাধিক স্থির-ধর্ম্মতা তাঁহার নহে; কিন্তু ইঁহাদের প্রত্যেকের স্বক্ষত্রে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রত্যেকের গীতিকবিতার সবিশেষ ভাবসিদ্ধি, গুণ-প্রকৃতি, এবং ব্যক্তিত্বকে ন্যূনাধিক আয়ত্ত করিয়া নিজের সুপুষ্কলা সৃষ্টিই তাঁহাকে স্বকীয় অসামান্যতা প্রদান করিতেছে! তাঁহারা কোন কোন দিকে হয়ত রীতি এবং ভাববিশেষের শিক্ষা ও দীক্ষা গুরু—এবং তিনি গুরুমার্গের বরিষ্ঠ উত্তর সাধক! কিন্তু সিদ্ধিকে ধরিয়াছেন।

শেলী আত্মপ্রকৃতির পথে চলিতে চলিতে বিশ্বজগতের অন্তস্থলে একটি 'সৌন্দর্য্য দেবতা' দর্শন করিলেন। উহাকেই শেলী Spirit of Beauty বলিয়া, Shadow of his own soul বলিয়া, Secret Strength of things বলিয়া, the viewless and invisible Consequence ইত্যাদি বলিয়া চিরজীবন লক্ষ্য করিয়াছেন। Alaster, Epipsychidion, Witch of Atlas প্রভৃতি কাব্যে এবং বহুতর গীতিকবিতায় উহার সঙ্কেত করিতে চাহিয়াছেন। পরিস্ফুট অর্থহীন এই পদার্থটি যে কি, তাহা কেহ বলিতে পারে না; শেলীও পারেন নাই। শেলী উহাকে তদপেক্ষা প্রমূর্ত্ত বা পরিস্ফুট করিতে চাহেনও নাই। এ'স্থলেই শেলী-চিত্তের এবং উহার ভাবুকতা রীতির প্রধান বিশেষত্ব। পরিস্ফুট ভাবে নির্দ্দেশ করিতে গেলেই কবি শেলীর সমক্ষে উক্ত পদার্থটার আকর্ষণী কিংবা মাহাত্ম্য যেন সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া যাইত! শেলী এ'বিষয়ে চিরকাল 'ঘুমঘোরের রাজ্যে' এবং অস্পষ্টতার আবছায়া-রাজ্যে থাকিতেই চাহিয়াছেন। শেলীর এইরূপ ভাবুকতাকে Supersubtile ethereality বলিয়া, etherialised dilwater বলিয়া কেহকেহ কটাক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু, এস্থলেই ত ভাবুকতার রোমাণ্টিকরীতি! অবশ্য, জীবনক্ষেত্রে, এমন কি নিজের গদ্যরচনার ক্ষেত্রেও কবি শেলীর Sincerity অমায়িকতা ও বস্তু-নিষ্ঠ ঋজুতা এবং মনে-মুখে অভেদ রীতির কোন ব্যতিক্রম নাই। বস্তুতঃ, কাব্যের ক্ষেত্রে এই অমূর্ত্ততত্ত্ব এবং অব্যক্তবাদ বিষয়ে, প্রতিপদে উহার ইঙ্গিত করিয়া

১৮। শেলীর গীতিকবিতার অব্যক্তবাদ।

চলার বিষয়ে, উক্তরূপ attitude ও Sensibilityর সাধনা এবং গীতিকবিতার প্রণালীতে উহার সঙ্গেত এবং আভাস দিয়া চলার বিষয়ে, শেলী ইয়োয়োপীয় রোমান্টিক সাহিত্যে অতুলনীয়। এ'ক্ষেত্রে অবশ্য, জর্ম্মণসাহিত্যের নোফালিসের সঙ্গে এবং অদ্বৈততন্ত্রী ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রকৃতি-দৃষ্টি ও দার্শনিকতার সঙ্গে কোন কোন দিকে শেলীর সাজাত্য এবং সোদরত্ব আছে। কিন্তু কাব্যে ওই নিখুঁত 'গায়নী'রীতির সঙ্কেত-পদ্ধতি ও অস্পষ্টতা! উহা শেলীর সম্পূর্ণ নিজস্ব। এখন, জীবন পথে এ'জগতের অজ্ঞেয়-দুর্ব্বহ রহস্যভার আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ই কিছু-না-কিছু হয়ত অনুভব করে; এবং রহস্যের এ'প্রকার সঙ্কেতরীতিও আমাদের প্রত্যেকের চিত্তই হয়ত কিছু-না-কিছু ভালবাসে; অথবা 'ভালবাসে' বলিয়াই আমরা মনে করি। কিছু-ন'-কিছু হেঁয়ালিও আমাদের বুদ্ধি, হয়ত অতর্কিত শিশুতায়, ভালবাসে। কিন্তু, কেন? জগতের অনেক পদার্থই মনুষ্যের সমক্ষে এইরূপে অস্পষ্ট এবং অধৃত অবস্থাতেই আছে। মনুষ্যের হৃদয় সমস্তকেই পূর্ণজ্ঞানের এবং পরিস্ফুট অনুভূতির মুষ্টিতলে ধরিতে চায়। পূর্ণজ্ঞান ভিন্ন যেন তাহার প্রকৃত আনন্দ নাই! নচেৎ, অস্পষ্টতারীতির প্রতি তাহার কিছু মাত্র টান নাই। উহা কেবল মনুষ্যের আত্মজীবনের এবং আত্মদৃষ্টির অপ্রাপ্ত তত্ত্ব ও অন্ধকার অদৃষ্টের ধৃতি জাগাইয়াই মনুষ্যহৃদয়ের সহানুভূতি লাভ করে। মানুষ যখন প্রকাশের জন্য যথাসাধ্য করিয়াও পরিশেষে ঐ অসাধ্য এবং অনির্ব্বচনীয়ের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া মুহ্যমান হয়, তখন, সেই রীতির সাধুতা ও Sincerity বুঝিতে পারিলে, মানুষ কবির প্রতি সহানুভূতি এবং সখ্য অনুভব না করিয়াও পারে না। যে স্থলে শেলীর প্রকাশ-রীতিতে কোন দৌর্ব্বল্য বা কৈতব নাই, কিন্তু বক্তব্যই অসাধ্য এবং অবচনীয়, সে স্থলে সহৃদয়মাত্রেই শেলীর 'দরদিয়া' না হইয়া পারিবেন না।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও শৈশব হইতে এইরূপ অমূর্ত্তের দিকে মনোগতি, মনুষ্যের অজ্ঞেয়তত্ত্বের দিকে চিত্ত-চালনা ও উহাকে সঙ্কেত করার একটা

'ঝোঁক' লক্ষিত হইবে। অপরিণত বয়সে ভাবগ্রাহিতা ও ভাষাশক্তির দৈন্য এবং প্রকাশ-রীতির কার্পণ্যের প্রতিকেই যে তাঁহার 'কৈশোরক' কবিতার ভাব 'ঘোরাল' হইয়া গিয়াছে তাহাও লক্ষ্য করিতে হয়। 'শৈশব সঙ্গীত' হইতে 'মায়ার খেলা' পর্য্যন্ত কবি-জীবনের এইযুগ। অপরিণত-মতি এবং দুর্ব্বল-মুষ্টি বালকের সমক্ষে বিশ্বজগতের তাবৎ পদার্থই অধৃত ও অস্পষ্ট! কিন্তু জন্মসিদ্ধ কবিত্বশক্তির আকুল প্রেরণাতেই তাঁহাকে নির্ব্বাক ও নিশ্চিন্ত হইতে অথবা সংযত হইতে দেয় নাই। এ অবস্থায় বিশ্বজগতের সকল পদার্থে তিনি নিজের অক্ষমতার প্রতিকেই যেন একটা viewless and invisible consequence দেখিতেছেন! শেলীর

১৯। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও শেলী-সহোদর অব্যক্ত-প্রীতি এবং অস্পষ্ট রীতি।

সাধর্ম্ম্য এবং সহমর্ম্মতা রবীন্দ্রনাথের ন্যূনাধিক সহজাত বলিয়াই ধারণা হইবে। আমরা অন্যত্র শেলীর ভাবুকতা বায়ুতত্ত্বীয় এবং রাবীন্দ্র ভাবুকতা জলতত্ত্বীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। এক্ষেত্রে তাঁহাদের পার্থক্য-বিষয়ে বাক্যব্যয় করিব না। দেখা যাইতেছে, রবীন্দ্রনাথ শেলী-ধর্ম্মের উৎসাহে, শেলীর Alasterএর পথে 'কবি' নামে একটা কাব্য প্রকাশ করেন। 'ভগ্ন হৃদয়' ও 'মায়ার খেলা' প্রভৃতিও শেলী-ধর্ম্মের প্রেরণাতেই রচিত। তাঁহার কৈশোর রচনার অধিকাংশই অধুনা প্রকাশিত গ্রন্থাবলী হইতে নিশ্চিহ্নভাবে মুছিয়া ফেলা হইয়াছে; কিন্তু শিল্পতত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠক এবং শিল্পীর পক্ষে ঐ সমস্ত অবশ্য-পাঠ্য হইয়া আছে। এই সমস্ত কাব্যগ্রন্থের স্থলবিশেষ রাবীন্দ্র বিশিষ্টতাতেই এত উজ্জ্বল যে এবং বিশিষ্ট কবিত্ব সম্পদেও এত শক্তিশালী যে, মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ ভাবোপার্জ্জনের ক্ষেত্রে উহাদিগকে পরিণত বয়সেও কুত্রাপি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। প্রত্যেক কবি স্বতন্ত্র-সিদ্ধ দোষে-গুণেই কবি। এমন কি, প্রকৃত শিল্পী এবং সমালোচকের নেত্রে, কবির দোষটিও অনেক সময় গুণের মতই সহানুভূতি এবং বহুমান লাভ করে। এ'দেশে এখনও প্রকৃত সাহিত্য-সমালোচনা প্রচলিত হয় নাই বলিয়াই হয়ত রবীন্দ্রনাথ লজ্জাভয়ে নিজে কিশোর বয়সের ভাবপুত্রগুলির উপর অস্ত্র চালনা করিতে এবং উহাদিগকে নির্ব্বাসন

দণ্ড দান করিতে বাধ্য হইয়াছেন! কিন্তু ভবিষ্যৎ বংশের নিকটে, সাহিত্যের তীর্থযাত্রী অথবা সাহিত্যের কর্ম্মীগণের নিকটে ঐ সমস্তের মাহাত্ম্য কুত্রাপি খর্ব্ব হইবার নহে। অব্যক্ত-প্রীতি এবং কৈশোরের অস্পষ্ট রীতি বিষয়ে যে রবীন্দ্রনাথ পুরাপুরি শেলীধর্ম্মী এবং (প্রথম বয়সের ব্রাউণীং এর মত) শেলীর ভাব-শিষ্য তাহাই আমাদিগকে বুঝিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ শৈশবে নর্দ্দামার জলে কাগজের নৌকা ভাসাইতেন; শেলী পরিণত বয়সেও ঐরূপ কাগজের নৌকা ভাসাইয়া অপরিসীম আনন্দ-ফূর্ত্তি এবং চিত্ত-দর্প অনুভব করিতেন। স্বচ্ছ সরোবরের জলরাশি নয়ন পথে 'থই থই' করিতেছে! উহাতে কাগজের নৌকা ভাসিলেই অদৃশ্য বায়ু-প্রেরণায় একদিকে ছুটিয়া চলে! আপাত দৃষ্টিতে নৌকার অকারণগতি ও চলাফেরা 'অসীম রহস্য' রূপে শেলীর চিত্তানন্দকর হইয়া উঠিত; আবিষ্টের মতই উহার পথে ছুটিতেন—অন্য পারে যাইয়া উহার প্রতীক্ষা করিতেন! তরীর এই 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'! উহা যেন সংসার-সমুদ্রে মানবাত্মার যাত্রা! শেলীর আলেষ্টার, রিভোল্ট অব্ ইস্‌লাম্, বীচ অব্ আট্‌লাস্ —প্রত্যেকটিতে এ'রূপ একটা 'ম্যাজিক' তরী, একটা 'নিরুদ্দেশযাত্রী তরী' আছে; তরীর একটা 'সুন্দরী' কাণ্ডারীও আছে! রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও 'সোনার তরী' ও 'খেয়া তরী'র কত উপন্যাস, কত সঙ্কেত, ইঙ্গিত, অলংকৃতি এবং তরী-কাণ্ডারিণীর প্রতি ভাবুকতার পরিব্যক্তি আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। রোমান্টিক আদর্শের 'সুদূর' লক্ষ্য ও অস্পষ্টলক্ষ্য এবং অদৃষ্টচালিত 'নিরুদ্দেশ-যাত্রা' বিষয়ে উভয় কবিই সমপ্রাণ এবং সমধর্ম্মা। আবার, শেলীর Hymn to intellectuel Beauty প্রভৃতির পথে রবীন্দ্রও তাঁহার 'মানসসুন্দরী' 'চিত্রা' ও 'অন্তর্য্যামী' প্রভৃতি যৌবনের কবিতায় নিজের ঐরূপ একটি অপরিজ্ঞাত এবং অব্যক্ত তত্ত্বকেই সঙ্কেতিত করিতেছেন এবং মনুষ্যের দৃষ্টিকে তন্মুখী করিতে চাহিয়াছেন; স্বয়ং ওই attitude এবং Sensibilityর সাধনা করিয়া আসিয়াছেন। নিসর্গদীক্ষার গুরু ওয়ার্ডসোয়ার্থের পথে শেলীর Ode to West

wind ও রবীন্দ্রের 'বৈশাখী ঝড়'! শেলীর এপিসাইকিডীয়নের ন্যায় রবীন্দ্রও যৌবনে একটি কবি-কল্পদ্বীপের স্বপ্ন-বিলাস দেখাইয়াছেন। আমাদের দৃষ্টিতে শেলী হয়ত একজন ভাবাকুল অদ্বৈতবাদী বা ideal Pantheist। কিন্তু এরূপ নামকরণ শোনামাত্র শেলীর নাম-তন্ত্র বিদ্বেষী অন্তরাত্মা হয়ত বিদেহ লোকেই ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবেন! এবং ইহলোকে রবীন্দ্র নাথের মধ্যেও আমরা কোনরূপ প্রাচীন কিংবা প্রচলিত অথবা পরিস্ফুট সংজ্ঞার বন্ধনে আবদ্ধ হইতে অসাধারণ আতঙ্কটুকুই প্রমাণিত দেখিয়াছি। উভয়ে নাম-তন্ত্রের প্রতি অপরূপ ভাবেই বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিতে ভালবাসেন! এমন কি, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনের অসংখ্য কবিতায় এবং সঙ্গীতে প্রকাশ্যে বা উহ্যভাবে একটা 'তুমি' অথবা একটা 'তিনি' আছেন। ঐ সমস্ত উহাদের 'স্থায়ী বিভাব', বলিতে পারি। ঐ সমস্তকে কেহ কেহ যে ব্রাহ্ম সমাজের 'ব্রহ্ম' বলিয়াই ধারণা করেন এবং তদনুসারে উহাদিগকে 'ব্রহ্ম সঙ্গীত'এর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, তাহাই দেখিতেছি। কিন্তু ওই 'তুমি' বা 'তিনি' ব্রহ্ম কিনা, কোন প্রচলিত নামরূপের আমলে উহাদিগকে আনা যায় কি না, আনা উচিত কি না, সে বিষয়ে তাঁহার অভিনিবিষ্ট পাঠকের চিরকালই একটা সন্দেহ থাকিয়া যাইবে। উহা বিশেষ ভাবেই শেলী-সহোদর, শেলীপন্থী বা শেলী-দীক্ষিত বাক্যরীতি! উহাও সেই viewless and invisible consequence—উহা এক শ্রেণীর রোমান্টিকতার দৃষ্টি। অবশ্য, এরূপ রোমান্টিকতার মধ্যে একটা 'অধ্যাত্ম ঝোঁক', ভাব অথবা ভাবাভাস আছে, বলিয়া আসিয়াছি। উক্তরূপ রোমান্টিকতার আদিজননী জর্ম্মনীর শ্লেগেল-টিয়েক ও নোফালিসের মধ্যে এ'প্রকার অধ্যাত্মঝোঁক বা তাত্ত্বিকতার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে এবং তথা হইতেই উহা ইংরেজী সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করে। সচরাচর ধার্ম্মিকের মনোদৃষ্টি অথবা ধর্ম্মমতি বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা এ'ক্ষেত্রে নাই। কোনরূপ উপাসনা-মূলা ভক্তি, পাপবোধ, লঘিমাবোধ, পাপানুশোচনা, অধ্যাত্ম-জীবনের পক্ষে অপরিহার্য্য নীতি-ধর্ম্মে স্পৃহা, পবিত্রতা-স্পৃহা বা মুক্তি-স্পৃহা

২০। রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের গীতিকবিতায় আকৃতিতন্ত্রের বিরোধাভাস।

ঐ সমস্তে নাই; অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব অথবা ক্ষান্তির নামগন্ধও নাই। মূলতঃ একটা রসাবেশ বা সৌন্দর্য্য-আবেশই উহাদের প্রবল লক্ষণ!

২১। কবির উদ্দিষ্ট পদার্থ বা বিভাব অনুভাব এবং রসটাই অস্পষ্ট ও অব্যক্ত বলিয়া আকৃতি এবং রীতির অস্পষ্টতার কথঞ্চিৎ সঙ্গতি।

অবশ্য, উপাসনা-সময়ে পরমভাবজীবী কেশব চন্দ্রের হস্তে এবং পরে পরে রবীন্দ্রনাথের শান্তি-নিকেতনের sermon ও 'অঞ্জলি'-জাতীয় কবিতায় ব্রহ্মোপাসনা অনেক স্থলে একটা বিশিষ্ট-শ্রেণীর সাহিত্যিকী ভাবুকতা অথবা রসাবেশ-রূপেই দাঁড়াইতেছে! ঈশ্বর বিষয়ে প্রতিজ্ঞারূঢ় প্রমূর্ত্তি-বিদ্বেষ, অব্যক্তি-বাদ বা 'নিরাকার'-বাদ রক্ষা করিতে যাওয়ায়, অথচ উপাসনার সময়ে তৎসঙ্গে একটা ভাব-সম্বন্ধ স্থাপনের জীব-স্বভাবিক স্পৃহার বাধ্য হওয়ায় এ লক্ষণটি উদ্বর্ত্তিত হইতেছে। সৃষ্টির সাকার পদার্থ গুলির মধ্যেই নিরাকার ব্রহ্মের একটা অস্তিত্ব ও দয়া-করুণার প্রমাণ-পিপাসায় ভক্তভাবে লালায়িত হওয়াতেই এ লক্ষণ অপরিহার্য্য হইতেছে! এইরূপ ভাবুকতাকে কেহ কেহ একটা spiritual culture বলিয়াও বিশেষিত করিতে চাহেন। আমাদিগকে বুঝিতে হয়, এই ভাবুকতা কোন কোন দিকে গৌড়ীয় 'বৈষ্ণব সাধনা' ও culture এর সমধর্ম্মী বলিয়া প্রতিয়মান হইলেও, উহা তত্ত্বতঃ ভারতের যাবতীয় spiritual culture হইতেই নানাদিকে পৃথক্ পদার্থ। বহির্ম্মুখ ও বাহ্যদৃষ্টিতন্ত্রী বলিয়াই পৃথক্ পদার্থ। উহা প্রকৃতির ভিতরে লুক্কায়িত অথচ উহা হইতে যেন পৃথক্ একটা অব্যক্ত অজ্ঞাত ও নিরাকার পদার্থের প্রমাণ-ভাবনা, ব্যক্তিত্বের বা অস্তিত্বের-ভাবনা এবং উহার দিকে একটা ভাবাবেশ-ধারণা। উহা হয় ত ধর্ম্মের ক্ষেত্রেই একপ্রকার রোমান্টিকতা। উহা হয় ত খ্রীষ্টান সম্প্রদায়বিশেষের সহমর্ম্মী এবং আধুনিক বিজ্ঞানের ও সংশয়বাদের শিষ্যতা-অনুযায়ী একটা কর্ষণা—ভাবকর্ষণা অথবা সৌন্দর্য্য-কর্ষণা! কোন পদার্থকে আদর্শরূপে অথবা প্রমূর্ত্তভাবে না ধরিয়াই একটা ভাবুকতার বা মনঃপ্রবৃত্তির কর্ষণা! সকল বিষয়েই অব্যক্ত এবং অ-ব্যক্তি ঘোষণা করিয়াই পুনর্ব্বার তৎসঙ্গে মনুষ্যব্যক্তির এবং মনুষ্য-বুদ্ধির একটা ভাবসম্বন্ধ উপস্থাপনার চেষ্টা!

এ'দেশের অনেকে উহাকে 'ধার্ম্মিকী মতি' না বলিয়া হয়ত কেবল ভাবকর্ষণা এবং 'সৌন্দর্য্য-উপভোগের রীতি' বলিয়াই নির্দ্দেশ করিবেন। যাহোক, এস্থলেই সাহিত্যক্ষেত্রে কবি রবীন্দ্রনাথের ভাবুকতারীতির বিশেষত্ব এবং এই বিশেষত্ব 'ব্রাহ্ম' আদর্শের কর্ষণা পথেই প্রৌঢ় এবং পরিপুষ্ট হইয়াছে। ধর্ম্মের ক্ষেত্রে বেদান্তের 'শুদ্ধনিরাকার ও নির্গুণ ব্রহ্ম'বাদ, খ্রীষ্টানের Personal God অথবা পুরাণের 'ঈশ্বরবাদ' ছাড়াইয়া, বৈষ্ণবীয় বা ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার 'সংযম পন্থা' একেবারে পরিহার করিয়া, কোনরূপ প্রমূর্ত্ত বা স্থিরলক্ষ্য আদর্শের নিকট হাতধরা না দিয়া, কোনরূপ বাহ্যিক অথবা আধ্যাত্মিক সংযম কিংবা তপঃখেদ স্বীকার না করিয়া কেবল একটা অজ্ঞাত, অব্যক্ত ও অপ্রাপ্তের অভিমুখে নিয়ত চিত্ত-গতি, প্রকৃতির অভিমুখে একটা বিশিষ্ট attitude ও Sensibilityর কর্ষণা; অথবা, একটা 'আসে-আসে-আসে' অনুভাবনা! একটা নিত্য চলতা, তরলতা ও চলিষ্ণুতা! উহাই সুতরাং রবিকবির সমক্ষে মানব-জীবনের চূড়ান্ত তত্ত্বরূপে যে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমরা তাঁহার প্রৌঢ় বয়সের কবিতায় ও সঙ্গীত গুলিতে আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখিতে পারি।

কেহ যদি মনুষ্যের 'নিত্যতা'-আদর্শের কোন সত্য অথবা শিব-নীতির কোন উচ্চতা বা বিশালতা, কোন নিত্যস্থির 'অচল' আদর্শের ধারণা, কোন মহতী বস্তুমূর্ত্তি অথবা ভাবুকতার কোন প্রমূর্ত্তসুন্দর স্ফূর্ত্তি লাভ করিবার আশায় রবীন্দ্র নাথের সম্মুখীন হ'ন, তাহা হইলে তিনি অনেকশঃ বঞ্চিত হইবেন। কোনরূপ বস্তুগত মহা বিকাশ, দান্তে মিল্টন প্রভৃতির ন্যায় কোন-রূপ বাহ্যতন্ত্রের মহাসুন্দর (Physical sublimity) অথবা ব্যাস-বাল্মীকির রাম যুধিষ্টিরের ন্যায় কোনরূপ নীতিধর্ম্ম-তন্ত্রীয় মহাসুন্দর (Moral Sublimity) তাঁহাতে নাই। কল্পনানুভূতির দিক হইতে পরমাণুর মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে এবং উহাকে অসীম ও অনন্ত বলিয়া উপন্যস্ত করিতে, পদে পদে ওই অনুভূতির সাধন করিয়া চলিতেই তিনি বদ্ধপরিকর।

২২। রবীন্দ্রের এই অব্যক্ত প্রিয়তার কারণ ও স্বরূপ।

এ'জন্য গীতি কবিতার মুহূর্ত্তজীবী উচ্ছ্বাসই তাঁহার অবলম্বন। কিন্তু,

এ মুহূর্ত্তমধ্যেই তিনি মনুষ্য-হৃদয়কে একটা সৌন্দর্য্যগত অথবা তত্ত্বগত বৃহৎ বিপুল এবং মহত্তের সম্মুখীন করিয়া মুগ্ধ-বিস্মিত এবং চিত্রার্পিত করিতে পারেন! তিনি জন্ম-দার্শনিক—আপাত-দৃষ্ট ক্ষুদ্রের মধ্যে একটা 'অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং তৎপদং' ব্যঞ্জিত করিতে পার. লইয়াই তাঁহার দার্শনিকতার প্রধান মাহাত্ম্য। এই 'তৎপদ' প্রধানতঃ মনুষ্যের বিচারগত বা intellectual দৃষ্টিগম্য 'তৎপদ'। এই রীতি একটা তাত্ত্বিকতা, মনস্বিতা, মানসিক sensibility বা অনুভূতি মার্গের বিকাশ ফল। তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-ভোগী কবি এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-স্পর্শের মধ্য দিয়াই তিনি এই 'তৎ'পদের স্পর্শ পাইতেছেন বলিয়া ধারণা করেন, ও তাহাকে অনুপম ভাষা ও সঙ্গীত-রীতিতে এবং আরতিতে প্রকাশ করেন। তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মধ্যেও আমরা এইরূপ 'প্রাকৃতিক' অনুভূতি-বৃত্তি দেখিতে পাই—এ'দেশের ব্রাহ্মগণের অনেকেও ঐরূপ অনুভূতি-সাধনায় বিশ্বাসি-ভাবে উপাসনা করেন। তিনি পৈতৃক মনঃপ্রবৃত্তি এবং শক্তির উত্তরাধিকারী হইয়া উহাকে সাহিত্যজগতের গীতিকবিতার ক্ষেত্রে সাধন পূর্ব্বক লোভনীয় কবিত্ব ও ব্যক্তিত্বের পদবীতে উপনীত করিয়াছেন। মনুষ্যের কর্ম্মপ্রবৃত্তি অথবা ভাববৃত্তির ধৃতি-গম্য না হইয়া, উহা বরং অধিক পরিমাণে তাহার জ্ঞানবৃত্তিরই অনুভবগম্য! কিন্তু, কবি রবীন্দ্র নাথ উহাকে বৈষ্ণবী ভাবুকতার আরতি ও কীর্ত্তন-ধর্ম্মে মধুর করিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। এই 'তৎপদ' চিন্তায় তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ভাবুকতা এবং 'কীর্ত্তনী' রীতি-টুকুমাত্র অবলম্বন করিয়াছেন; অথচ গৌড়ীয় অথবা ভারতীয় বৈষ্ণবগণের রূপ-বাদ, মূর্ত্তি-জীবিতা এবং 'শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য বা মধুর ভাব-সাধক মরমী পন্থা' তাঁহার নহে! তাই, তিনি তত্ত্বতঃ বৈষ্ণব নহেন—বরং বাউল। বিস্তারিত-বিস্ফারিত করিয়া, জ্ঞানদৃষ্টি সমক্ষে ক্ষুদ্রকে ও সামান্যকে তিনি "মহতো মহীয়ান্" ভাবে উদ্দেশিত করিতেছেন! বৃহৎ অথবা 'অলখ-নিরঞ্জন', অসীম অথবা সুদূর করিয়া দেখাইয়াই তিনি 'তত্ত্বপদ'কে উপস্থিত করিতেছেন! তিনি প্রায়ই উহাকে 'তুমি'-সম্বন্ধে সম্বোধন করেন। কোনরূপ অধ্যাত্মমার্গে, জ্ঞান-ভাব-কর্ম্মযোগের 'ধার্ম্মিকী' রীতি কিংবা

মরমীপথে, অথবা গায়ত্রী-উদ্দিষ্ট 'ধীঃ'র প্রচোদনা-পথে উহার দিকে অগ্রসর না হইয়া, বরঞ্চ বহিঃ-প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-উপভোগ পথেই উহার স্পর্শলাভে নিজের বুদ্ধিকে পরিচালিত করেন। সুতরাং তাঁহার এই 'তুমি'-লক্ষিত পদার্থ কোনরূপ ব্যক্ত বা মূর্ত্ত পদার্থ যেমন নহে, তেমন উহার প্রতি কোনরূপ আত্মলঘিমা বুদ্ধি বা 'অঘমর্ষণী' রীতি তাঁহার নাই; নীতি অথবা ধর্ম্ম-অধিকারের কোন প্রকার ভক্তিও তাঁহার নাই। কেবল সৌন্দর্য্যের সম্ভোগ-জনিত অথবা আনন্দের আবেশ-জনিত অনুরক্তি! উহাই বলবৎ লক্ষণ।

সাহিত্যসেবীকে দেখিতে হয় যে, মূলের সেই অব্যক্ত প্রীতি sensibility ও attitude সাধনা করিয়া এবং একান্তমনে, জীবনপথে, তাঁহার "একতারাতে তাঁহার ঐ একটী তান বাজাইয়া" রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য গীতিকবিতা ও সঙ্গীতধর্ম্মী কবিতা রচনা পূর্ব্বক বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছেন। বলাবাহুল্য, ঐ সমস্ত 'সঙ্গীত কবিতা'ই রবিরীতির চূড়ান্ত বিত্ত। উহারা নিজে অঞ্জলি-ধর্ম্মে, দার্শনিক দৃষ্টি এবং ভাব-রতির সঙ্গমধর্ম্মে সাহিত্যসেবীর পরম সাধুবাদ লাভ করিয়াছে। সঙ্গীততন্ত্রীয় অনুভূতি-সাধনার পথে রবীন্দ্রনাথের গভীর অভিনিবেশ এবং অসাধারণ প্রকাশ-শক্তি সুসিদ্ধ হইয়াছে। অধিকন্তু, রীতির ক্ষেত্রেও, আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, পূর্ব্বোক্ত মতে আধুনিক ইয়োরোপের রোমান্টিক আদর্শের অব্যক্ত-প্রীতি ও অস্পৃষ্টরীতির দীক্ষাচারিনী এবং উহার সঙ্গে সুসঙ্গতা, রাবীন্দ্র ভাবুকতার কীর্ত্তনী ও নাচারী পদ্ধতি! তাঁহার হৃদয়ের সঙ্গীতধর্ম্মী লীলাচাঞ্চল্য ও নৃত্য-ধর্ম্মের তুলনায় উহার স্থিরাভিনিবেশ প্রবল হইতে পারে নাই। রবি-রীতির এই নাচারীতত্ত্ব বুঝিতে গিয়া বলিতে হয় যে, তাঁহার ভাবুকতার তারল্য ও নর্ম্মধর্ম্ম (তাঁহার চিত্তের নিবিষ্টতা, স্থিরতা ও গভীর-গাহিতার তুলনায়) সর্ব্বতোভাবে প্রবল; অর্থের গাঢ়তা অপেক্ষা বরং ঈষারাই প্রবল। তাঁহার আত্মা অরূপের বা মহৎ ভাবের ঈষারা মাত্র লাভ করিয়া আনন্দতরল নৃত্যাবেশে তরঙ্গিত হইয়া উঠে; তাঁহার ভাষা ও ছন্দ ওই আনন্দকে আমাদের হৃদয়ে অপরূপ বাক্যালংকারে, সঙ্কেতে এবং ইঙ্গিতে সংক্রামিত করিয়া উহাকে আনন্দচঞ্চল ভাবেই নাচাইতে থাকে! এ'স্থলেই গীতিকবিতার

ক্ষেত্রে ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্য। উহা যেমন আকৃতি প্রেমিক নহে—নিরাকারতা ও অস্পষ্টতা উহার রীতি ; তেমন উহা পয়ারী ভাবুকতা অথবা ভাব-স্থিরতা নহে—নাচারী ভাবাকুলতা! উভয়েই প্রকৃতিপ্রেমিক ; কিন্তু ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের প্রকৃতিমুখী ধীঃ ও ধারণার মধ্যে, attitude ও sensibilibyর মধ্যে যে একটা নিবেশ-মতি ও চিরজীবনের একান্তলক্ষিত স্থিরতা ও ধর্ম্মতাসিদ্ধি আছে, প্রশান্ত অর্থ-ধৃতি ও ভাবে স্থানুধর্ম্ম আছে, রসতত্ত্বে নিরভিমান স্থিতি আছে, তাহা রবীন্দ্রনাথের নহে। এইরূপে অন্য কবির সঙ্গে অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী সম্বন্ধে বুঝিতে না পারিলে, কোন কবির বিশিষ্টতার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি হইবে না।

এই প্রসঙ্গসূত্রে, সাহিত্যের আকৃতিবাদের দিক হইতে বলিতে হইবে, রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতার গতি ও স্ফূর্ত্তি এবং ভাবের প্রমূর্ত্তি তাঁহার চিত্র-তন্ত্রতা বিশেষতঃ সঙ্গীততন্ত্রতার গতিকেই অভাবনীয়রূপে সরল, তরল, কোমল এবং লীলাচঞ্চল! উহার মধ্যে শেলীর ন্যায় বিমিশ্র-গহন ভাবুকতার পৌরুষ-শালী এবং ঘনপ্রাচুর্য্যময় পরিমূর্ত্তনা ও স্ফূর্ত্তি নাই; ওয়ার্ড্‌-সোয়ার্থের ন্যায় উহাতে স্থৈর্য্যতন্ত্রী অভিনিবেশ নাই। বাক্যার্থের সাহিত্যতন্ত্রীয় প্রমূর্ত্তি বিষয়ে শেলী এবং ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থ হয় ত রবীন্দ্র-নাথ হইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু, অব্যক্ত-প্রিয়তা, ছন্দ ও শব্দশক্তিমূলক ধ্বনি এবং সঙ্গীত-তন্ত্রীয় অনুরণন বিষয়ে, এবং রোমান্টিক ভাবুকতা-সম্পদের প্রকৃতি ও উপার্জ্জন-প্রাচুর্য্যের মূল্য বিচারে বাঙ্গালী রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্য-জগতের অতুলনীয় 'সঙ্গীতকবি' বলিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিব না।

(খ)

২৩। সঙ্গীত অপেক্ষাও নাট্যগাথারক্ষেত্রেই অস্পষ্টতা রীতির বিপত্তি।

রোমান্টিক গীতি-কবিতার এই অব্যক্ত-প্রীতি ও অস্পষ্টতারীতি ইয়োরোপক্ষেত্রে জর্ম্মনীর রোমান্টিক কবি ও সমালোচকগণের কার্য্য এবং দৃষ্টান্ত হইতে সুলভ-পরিচয় হইয়াছে—উহা হইতে পার্ণেশীয়ান, সিম্বোলিষ্ট প্রভৃতি বিভিন্ন নামমন্ত্রী সাহিত্যিক 'দল'ও সৃষ্টি লাভ

করিয়াছে। ইংরাজী সাহিত্যে শেলী প্রভৃতি কবির এবং এই বঙ্গদেশেও মহাকর্ম্মা রবীন্দ্রনাথের ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যগণের দৃষ্টান্তে অভিনিবেশী এবং জিজ্ঞাসুমাত্রের পক্ষেই উহার পরিচয় সুলভ হইয়াছে! শিল্পের আদর্শ হিসাবে এ দেশের আধুনিক গীতি-কবিমাত্রের মধ্যেই ইহার কিছু-না-কিছু দৃষ্টান্ত মিলিতেছে। উৎকর্ষস্থলে এই কবিতার মূলতত্ত্ব এই যে, উহার উদ্দেশ্যটাই অরূপ ও অব্যক্ত বলিয়া, উহার অব্যক্ততা বা অস্পষ্টতা সময়-সময় সুসঙ্গত হয়। কিন্তু, যেস্থলে উহা আমাদের অনুভব-ক্ষেত্রের বিস্পষ্টকেই অস্পষ্টরীতিতে উপস্থিত করে, সে স্থলেই শিল্পতার দিক্ হইতে আপত্তি। আধুনিক গীতিকবিতার এই সঙ্গীত ও চিত্র-জাতীয় রীতি, উহার গুণ বা দোষ পাঠক কিংবা সাহিত্যসেবক মাত্রকেই ঘনিষ্ঠভাবে বুঝিতে হয়। শ্রেষ্ঠতা পক্ষেও সাহিত্যশিল্পের দিক হইতে উহাদের প্রধান দোষ (বা গুণ) এই যে, সমুচিত আকৃতি-বিরহিত বলিয়া উহারা মনুষ্যমনে আসন গাড়িতে নিদারুণ ভাবেই পিচ্ছিল! বস্তুতঃ, বিস্তারিত শিল্পচেষ্টার, বিশেষতঃ নাট্যচেষ্টার ক্ষেত্রেই এ'রূপ অস্পষ্টতারীতির' প্রকৃত ফল ও বল মুষ্টিগত করিতে পারা যায়। সে ক্ষেত্রেই উহার প্রাপ্তি কিংবা বিফলতা সর্ব্বগম্য ও সুস্পষ্ট হইতে পাবে। সৌভাগ্য-ক্রমে কবি রবীন্দ্রনাথের শিল্প-উপার্জ্জনের মধ্যেই বাঙ্গালা পাঠকের অবশ্যচিন্তনীয় ওইরূপ দৃষ্টান্ত মিলিতেছে।

২৪। রবীন্দ্রনাথের সিম্বোলিক নাট্য আদর্শ।

কবি রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্বোক্তমতে গীতিকবিতার ক্ষেত্রেই নিজের অনুভব-রীতি ও প্রকাশের বিশিষ্টতা সিদ্ধি করিয়া 'সিম্বোলিক' নাট্যরচনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া-ছিলেন। তিনি সিম্বোলিক ক্ষেত্রেও তাঁহার গায়নী রীতিই সহজে লইয়া আসিয়াছেন এবং উহা সিম্বোলিক পদ্ধতির সঙ্গেও সময় সময় সমঞ্জসিত ভাবে মিলিয়াছে। বলিতে কি, সিম্বোলিক নাটকেও তাঁহার সঙ্গীতগুলিই, উহাদের তাত্ত্বিক ভাবধর্ম্মে মুখ্যতা ও প্রবলতা লাভ করিয়া তাঁহার অনুপম কবিত্বের দৃষ্টান্তরূপেই দাঁড়াইয়া আছে। ঐ সকল সঙ্গীত এবং সঙ্গীতধর্ম্মী উচ্ছ্বাস

নানাদিকে রবি-রীতির অতুলনীয় সিদ্ধি; বঙ্গসাহিত্যের গৌরবের সম্পত্তি।

বঙ্গসাহিত্যে এই সিম্বোলিকতন্ত্রের বিচার করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে উহার ইয়োরোপীয় গুরু এবং নেতা মেতর্‌লিঙ্কের রীতিই চিন্তা করিতে হয়। ইয়োরোপে তাঁহার পূর্ব্বাপর অনেক সিম্বোলিষ্ট আছেন; কিন্তু ইয়োরোপময় তাদৃশ আন্তর্জাতিক প্রতিপত্তি অপর কেহই লাভ করিতে পারেন নাই। ইয়োরোপে মেতর্‌লিঙ্ক 'উত্তরদেশীয়' শিল্পবৈশিষ্ট্যেই প্রসিদ্ধ। সমসাময়িক ইয়োরোপের মৌলিকতা-বরিষ্ঠ সাহিত্য প্রতিভা! ইয়োরোপের মানচিত্রে উত্তরদেশ, সুমেরু-সন্নিহিত দীর্ঘ দিবা ও দীর্ঘরাত্রির দেশ! ছায়ালোকের চিত্রবিচিত্র লীলাবিলাসিনী দীর্ঘকায়া উষা ও দীর্ঘতমাঃ সন্ধ্যার দেশ! উহাকে 'লোকালোক দেশ' বলিয়াই উদ্দেশ করিতে পারি। মেতর্‌লিঙ্কের শিল্পতন্ত্রকেও সরস্বতীর শুভ্রসমুজ্জ্বল দীপ্তি-রাজ্যে ওইরূপ একটি 'গোধুলি দেশ' বলিয়াই নির্দ্দেশ করিব। উহার প্রকৃত নাম weird। সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'লোকালোক' প্রকৃতির রীতি-প্রতিভা। এই আদর্শে মেতর্‌লিঙ্কের 'পেলেয়াস ও মেলিসান্দা', বিশেষতঃ তাঁহার "আগ্লেভেইন্ ও সিল্‌সেৎ" একটা master piece বলিয়াই উল্লেখ করা যায়। উত্তরদেশীয় সাহিত্য-শিল্পিগণ ইয়োরোপীয় সাহিত্যের 'প্রাকৃত তন্ত্রে,' বিশেষতঃ উহার রীতিক্ষেত্রে, একটা আদর্শসৃষ্টির নবতা, 'গোধুলির ছায়ালোকমিশ্র' ভাবুকতার স্পর্শ এবং কবোষ্ণমধুর রসাভাস দৃষ্টান্তিত করিতেছেন! তাঁহাদের মধ্যে আবার মেতর্‌লিঙ্ক রোমান্টিক রীতির ধ্বনি ও বাক্যের ব্যঞ্জনা এবং অনুরণনে পাঠকের যেন একটা নূতন করণ, নূতন ইন্দ্রিয়পথ (sense) ও অনুভূতি-পথ উন্মুক্ত করিতেছেন! সাহিত্যের ভাবুকতা-রাজ্যে, উহার গদ্যে এবং নাট্যক্ষেত্রেই সঙ্গীত ও চিত্রের একটা প্রয়োগরীতি! গদ্যের ভাষাকেই সঙ্গীতের এত নিকটবর্ত্তী করিরা ব্যবহার করিতে অন্য কোন কবি পারেন নাই! সঙ্গীতের 'পুনরুক্তি'র কত শক্তি, অল্পোক্তির কত শক্তি! মনুষ্যের ভাষার ক্ষেত্রেই একটা যাদুকরী এবং কিন্নরী রীতি যে কি, আগ্লাভেন্ ও সিল্‌সেৎ না

পড়িলে তাহা বুঝা যাইবে না। মেতর্‌লিঙ্কের নাটকে, সঙ্গীতের মতই, কোন ঘটনা নাই ; কোন কর্ম্মসংঘাত নাই। অথচ ঘটনাবিহীন অবস্থামাত্রকেই কত গভীরার্থে, কত সঙ্গীতার্থে, কত চিত্রার্থে ব্যবহার করা যায়! জীবনের বহিরঙ্গে মেতর্‌লিঙ্কের কিছুমাত্র চিত্ত-ব্যাপ্তি বা সহানুভূতি নাই। সুতরাং, তাঁহার নাটকগুলি জীবন-চিত্র ত নহেই ; প্রত্যুত কেবল জীবনার্থের শিল্প ; একটা তত্ত্বার্থের শিল্প। জীবনই মুখ্যভাবে লক্ষিত না হইয়া কেবল জীবনার্থ! কেবল কবির মর্জ্জিগত এবং মতলবমতে উদ্দিষ্ট একটি অর্থ! এ স্থলেই হয়'ত উহাদের intellectuality! জীবনাঙ্গেও কোনরূপ ভূয়োদর্শন বা সূক্ষ্মদর্শন তাঁহার নাই। কতকগুলি 'বাধাগৎ' গোছের দৃশ্য অথবা অবস্থাকে অবলম্বন পূর্ব্বক অর্থসংকেত করাই কবির লক্ষ্য। নাটকের অনেক দৃশ্যে স্থানকালের কিছুমাত্র পরিচিহ্ন নাই। একটা প্রাচীন ভগ্নদুর্গ, অভ্রচুম্বী মীনার, অন্ধকার বন, স্থির সরোবর, গুহাবক্ষে গদ্‌গদ নাদী নির্ঝর—মেতর্‌লিঙ্কের নাটকে, এ'রূপ দৃশ্যের পুনঃপৌনিক প্রয়োগ লক্ষ্য করিতে হয়। এ'সকল দৃশ্য অবলম্বনেই কবির মনোগত একটা অর্থের সঙ্কেত : নাটকের হিসাবে উহাদের অনেক দোষ আছে ; কিন্তু অসাধারণ গুণটিই লক্ষ্য করিতে হয়। মেতর্‌লিঙ্কের এইরূপ নাট্য-প্রয়োগে, তাঁহার ভাষার সঙ্কেত-তুলিকা অতুলনীয় ভাবে লঘু, প্রকাশক এবং চিত্তের উদ্যোতকর! মনুষ্যের চিত্তকে একটা অনির্ব্বচনীয়, অস্পষ্ট ও অব্যক্ত তত্ত্বের আভাসে উচ্চকিত করা, যবনিকার অন্তর্নিহিত অথবা সযত্নগুপ্ত একটা সত্যের ঈষারায় হেঁয়ালির রীতিতে আকুল করা! বলিতে পারি, উহা সাহিত্যক্ষেত্রে একটা ম্যাজিক—একটা যাদুকরী! বলিতে পারি, রোমান্টিক রীতির উহা একটি স্বতন্ত্র 'আর্ট' ; এবং মেতর্‌লিঙ্ক সাহিত্যতন্ত্রে শব্দধ্বনি এবং ব্যঞ্জনার যাদুকর ; ভাবতন্ত্রেও ছায়ালোকের বিচিত্র আভাসবাদী চিত্রকর!

তবে, বুঝিতে হইবে, উক্ত আদর্শে মেতর্‌লিঙ্কের আগ্নেভেন্‌ ও সিল্‌সেৎ, পেলেয়াস্‌ ও মেলিসান্দা জয়্‌জেল্‌, মনা ভনা—এ সমস্ত প্রকৃত প্রস্তাবে সিম্বোলিক নাটক নহে—রূপকও নহে ; লাচ্চা 'রোমান্টিক রীতি'র আধুনিক

নাটক। উহারা নাটকের প্রয়োগ-ক্ষেত্রেই চৈত্র ও গায়নী পদ্ধতি অবলম্বনে, গোধুলির 'ছায়ালোক' রীতিতে, গোধুলিতন্ত্রের অর্দ্ধব্যক্ত এবং অর্দ্ধছায়াবৃত প্রমূর্ত্তি পথে, একটা সত্যাভাস বা রসাভাস সিদ্ধি করিতে চাহিয়াছে। রসাভাস! প্রজাপতির পক্ষরেণুর ন্যায় সূক্ষ্ম অথচ অনুচ্চ, অনতিগভীর এবং অ-প্রবল রসের স্পর্শ! নিজেদের স্বীকারিত রীতি-পথে উহারা উদ্দিষ্ট 'গোধুলি রস' সিদ্ধি করিয়াছে বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে; এবং ওইরূপে সম্যক্ গ্রহণ করিতে পারিলেই উহাদের প্রতি সুবিচার হইবে। কিন্তু, মেতরলিঙ্কের "দৃষ্টিহারা" ও "নীলপাখী" প্রভৃতি নাটক সে প্রকৃতির নহে। উহাদিগকেই আধুনিক ইয়োরোপের 'সঙ্কেতক' নাটক বলা যায়। উহারা রোমাণ্টিক রীতিতেই হেঁয়ালীর ন্যায় অস্পষ্ট পাত্রবস্তু, অনুচ্চ অবস্থা ও ঘটনা এবং অব্যক্ত আলম্বন-উদ্দীপন দ্বারা একটা 'হেঁয়ালি-রস' লক্ষ করিতেছে; এবং উহাকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া উপস্থিত করিতেছে; 'জীবন রহস্যময়'—'দৃষ্টিহারা' এই তত্ত্বকে ভয়ানক বলিয়া, এবং 'নীলপাখী' উহাকে অদ্ভুত বলিয়া উপস্থিত করিতেছে; অথবা, প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই করিতেছে না—কিছুই 'হাতে ধরাইয়া' দিতেছে না! পরন্তু, এ প্রকার 'কিংজ্ঞাতব্য-বিমূঢ়তা' সাধনেই ইয়োরোপীয় কবির উদ্দেশ্য-সিদ্ধি ও পরিতৃপ্তি! এ স্থলেই আধুনিক 'সিম্বোলিক' নাটক।

এ'স্থানে, 'ভারতীয় দৃষ্টিতে' ইয়োরোপীয় সাহিত্যের এই রোমাণ্টিক এবং সিম্বোলিক মনোগতি লক্ষ্য করিতে হয়। ইয়োরোপের রোমাণ্টিক আদর্শ উহার অভ্যুদয়ের প্রথম অবস্থা হইতেই ছিল—Search after the ideal—সুদূর আদর্শের অন্বেষণ; বাঞ্ছিত ধনের কিংবা হারা ধনের অন্বেষণ। উহার স্বীকারিত রীতিটাও ছিল—adding strangeness to beauty; ওয়াট্‌স দান্তন্ যাহাকে Renaisance of wonder নামে লক্ষ্য করিয়াছেন। উহা, উৎকর্ষ স্থলে, ভারতীয় সাহিত্যদর্শনের সেই 'অদ্ভুত রস'।

২৫। রোমাণ্টিক রীতির পূর্ব্বাপর স্বরূপ।

উহা হইতেই সীতা-অন্বেষণ-ব্যস্ত বানরগণের অদ্ভুত-সুন্দর বীর্য্য-সাহসের

উগ্রদীপ্তিময় সুন্দরকাণ্ড। আদিকবির আত্মসমালোচনা সমক্ষেই যাহার নাম 'সুন্দর'! উহা হইতেই বিপুল সৈন্যসিন্ধু সমক্ষে একটী মাত্র রথে পরম সাহসিকতায় যুযুৎসু রূপে উপস্থিত দুইজন অপরিচিত যোদ্ধপুরুষের অপূর্ব্ব-চমৎকারময় বিচেষ্টিত এবং ব্যবহারদর্শনে কুরুসৈন্যমধ্যে অদ্ভুতভয়ানকের বিভীষিকাপূর্ণ তর্কবিতর্ক এবং একল পুরুষসিংহের বীর্য্যবিভূতিময় বিরাট-পর্ব্ব! উহা হইতেই সুদূর আদর্শপুরীর অদ্ভুতসুন্দরী বাসনারাণী এবং "বিধাতার আদ্যাসৃষ্টি"র উদ্দেশে বিরহ-ব্যাকুল কবি-হৃদয়ের মেঘদূত! ইয়োরোপখণ্ডে বৃদ্ধ হোমরকৃত 'ওডীসীয়সের ভ্রমণ কাহিনী' হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যাসনের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা', মধ্যযুগের Holy grail অন্বেষণ, এবং আধুনিক Earthly Paradise পর্য্যন্ত কেবল অবিজ্ঞাত অপ্রাপ্ত অদ্ভুত-সুন্দরের অন্বেষণ নহে কি? রুশোর এমিলী ও সেট্‌ব্রীয়ার 'রাণী'? গ্যাঠের 'ওয়ার্থারের দুঃখ' ও দ্বিতীয় ভাগ 'ফাউষ্ট' যেন ('রোমাণ্টিক' ও ক্লাসিক) দুইদিক হইতে 'আদর্শের' জন্যই দীর্ঘনিশ্বাস! তার পর, সচেতন 'রোমাণ্টিক'আদর্শের জাগ্রৎকর্ম্মী ও দার্শনিক জন্মনগণের—শ্লেগেল-টিয়েক-নোফালিসের ত কথাই নাই। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়র্থের Prelude ও Excursion এই 'আদর্শ'কে ঘনরূপে পাইবার জন্যই পরিক্রমণ! শেলীর Hymn to Intellectual Beauty, Alastor ও Epipsychidion এই অপ্রাপ্ত-সুদূর আদর্শরূপিনী মানসসুন্দরীর জন্যই তপ্তশ্বাস! শেলীর Alastor এর শিষ্যতাপথে কীট্‌সের Endymion ও আদর্শের আশমানী সুন্দরীর জন্য একটা 'চন্দ্র-ক্ষিপ্ত' মত্ততা ব্যতীত অপর কিছু কি? টেনীসনের Holy grail এবং Idyls of the King, ব্রাউনীং-এর 'পলাইন' ও 'প্যারেসেল্‌সস' এবং রবীন্দ্র নাথের অধুনা-লুপ্ত 'কবি' ও 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'! বহু আধুনিক কবির নবযৌবনোদ্দীপ্ত হৃদয় এই অদ্ভুতময়ী অপ্রাপ্তসুন্দরীর অস্পষ্ট পিপাসাতেই ক্ষিপ্ত এবং পরিচালিত হইয়া নিজেদের মহাপ্রাণতা ও অমৃতসন্ধতার প্রাথমিক প্রমাণ দিয়াছে। তবে, শেলী-কীট্‌শ-ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ-ব্রাউনীং যাহাকে পরিস্ফুট এবং ঘনগাঢ় প্রমূর্ত্তি রূপে ভাষার মুষ্টিবদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন, মেতর্লিঙ্ক তাহাকেই

'নীলপাখী'র হেঁয়ালী-রীতি ও 'দৃষ্টি হারা'র ভৌতিক আশঙ্কাময় অপচ্ছায়ায় এবং মৃত্যুবিভীষিকায় সঙ্কেতিত করিতে চাহিয়াছেন। কেবল অদ্ভুত-সুন্দরের অন্বেষণ! কেহ কেহ এখন আবার নূতন 'ধুয়া' ধরিতেছেন—"মিথ্যা কথা! the real is the ideal!" জুদারম্যানের Far off Princess প্রভৃতি এবং উহাদের পথে রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনি'! এ'দিক হইতে দেখিলেই মেতরলিঙ্কের 'দৃষ্টিহারা' ও 'নীলপাখীর' সাঙ্কেতিকতা, বস্তুবাষ্পময়ী ছায়ানিষ্ঠা ও রোমাণ্টিকী 'হেঁয়ালী-প্রীতি' পূর্ব্বাপরসূত্রে বোধগম্য হইবে।

মেতরলিঙ্ক ইয়োরোপে নাট্যক্ষেত্রেই সঙ্গীততন্ত্রের আক্রমণ-প্রবেশের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁহার পূর্ব্বোক্ত রোমাণ্টিক নাট্য রচনা গুলি যে নাটকের ক্ষেত্রে সঙ্গীতের রীতিতেই অস্পষ্ট রসের সাধনা করিয়া চমৎকারী হইতে চেষ্টা করিয়াছে, বিভাব অনুভাব এবং ভাব সমস্তকেই ন্যূনাধিক অমূর্ত্ত, তরল রেখাময় এবং ছায়াগুপ্ত করিয়া চিত্রতুলিকা অথবা বীণাতন্ত্রের মতই ভাষার সাক্ষাৎশক্তির বহির্ভূত একটা লক্ষ্যসাধন করিয়াছে তাহা সাহিত্যশিল্পীর নেত্রে সুস্পষ্ট। এই নব প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে মেতরলিঙ্ক মৌলিকতার পদবী লাভ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগকে দেখিতে হইবে তাহার 'সিম্বোলিক' নাটক গুলি—Sightless, Blue Bird প্রভৃতি। আমাদিগকে প্রকৃত অবস্থায় তাহার সিদ্ধির 'জাতি'টা বুঝিয়া লইতে হইবে—উহার মূল্য আমরা রুচিভেদে যাহাই ধারণা করি। তাঁহার শিল্পরীতির মুখ্য লক্ষণ, ঘটনা ও চরিত্রপ্রধান এবং ক্রিয়াপ্রধান নাটকের পরিমূর্ত্ত রসব্যক্ততার ক্ষেত্রেই চিত্রের অস্পষ্ট রেখাসঙ্কেত এবং সঙ্গীতের অব্যক্ত ধ্বনিরীতির 'অনধিকার প্রবেশ'; ভাবাভাসের অনধিকার প্রবেশ। এস্থলে বিভিন্ন শিল্পের অধিকার তত্ত্ব চিন্তা করিব না। এই প্রবেশের ফল অনেকের মতে 'ভাল'; কতদূর ভাল এবং উক্ত 'ভাল'র মূল্য কত, শিল্পরসিক তাহাই বিচার করিবেন। এ স্থলেই বিচারকের পক্ষে প্রকৃত সঙ্কট। তাঁহাকে দেখিতে হইবে যে, মেতরলিঙ্ক

১৬। মেতরলিঙ্কের সিম্বোলিক নাট্যে আকৃতি আদর্শের ইচ্ছাকৃত ব্যভিচার।

রূপক নাটকেই আলম্বন ও উদ্দীপন অস্পষ্ট এবং অস্থির করিয়াছেন— উহার গতিকে তাঁহার নাটকের ঘটনা ও অবস্থা, পাত্রগণের চারিত্র, ভাব এবং রসই অস্ফুট এবং অস্থায়ী হইয়াছে; নাটকের আত্মাটি পর্য্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছে। ভাবরসের অস্ফুটতা এবং গৌণতা ঘটিয়া উহার emotional element ক্ষীণ করিয়াছে। উহাতে দাঁড়াইয়াছে উহার intellectualityর বৃদ্ধি। নিরেট তাত্ত্বিকতা, দার্শনিকতা এবং বৈজ্ঞানিকতার বৃদ্ধি! বৃদ্ধি বলিতেছি, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে হয়ত কিছুরই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই! প্রধান কথা এই যে, সিম্বোলিকের 'তত্ত্ব'টি পূর্ব্ব হইতে পাঠকের জানা' থাকা চাই! সামাজিকের সুজ্ঞাত এবং সুপ্রচলিত তত্ত্ব না হইলে সিম্বোলিকের সমস্ত সঙ্কেত-শর যে নিদারুণ ভাবে বিফল হইয়া পড়ে, তাহা মনে রাখিতে হয়। তত্ত্বের কিছু মাত্র নূতনত্ব থাকিলে চলিবে না। পাঠক পূর্ব্ব-পরিচিতকেই যেন চলিতে চলিতে পথিমধ্যে হঠাৎ দেখিয়া খুসী হইবে—এ স্থলেই সিম্বোলিকের প্রয়োগ! পাঠকের পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা এবং কৌতূহলের উপরেই উহার বল;মনুষ্য-সাধারণ কোন ভাববৃত্তির মধ্যে উহার ভিত্তি নাই। এ'জন্য উহাতে কাহারও প্রীতি—কাহারও বিরক্তি। কেবল বুদ্ধি-অধিকারের সিদ্ধি বলিয়াই এই বিরক্তি সম্ভব হইয়াছে। বুদ্ধিমমতা-হীন কিংবা উদাসীন পাঠকের নেত্রে উহাদের রূপণা বা প্রমূর্ত্তি যেমন হিজিবিজি ও অস্পষ্ট, তেমন উদ্দেশ্য এবং মর্ম্মও অস্থির এবং বিগহন; একেবারে confusion worse confounded! হিজিবিজি হেঁয়ালীকেই একটা 'ফিলজাফী' মানিতে হইবে! তত্ত্ব-পিপাসিতের পক্ষেও ইহাপেক্ষা অধিক বিপত্তি আর কি হইতে পারে? সাহিত্য সকল 'অনধিকার প্রবেশ', অধর্ম্ম অথবা কুধর্ম্মের আচরণও সহ্য করিতে পারে, যদি কেবল উহাতে ভাব-রসের দ্যোতনার এবং উহার অপূর্ব্বতার সাহায্য হয়। তাহার স্থলে, রসকে ক্ষীণ করিয়া, কেবল intellectuality! বেমালুম তত্ত্ববাদিতা এবং দার্শনিকতার বাহ্বাস্ফোট! প্লেটো-প্লোটিনাস্-নিজ্জে-বার্গসোঁ অথবা ব্লেক-সুইডেন্‌বার্গের তত্ত্বডঙ্কা! সাহিত্যের প্রকৃত 'বোধি'শীল ব্যক্তির পক্ষে এ'রূপ সিদ্ধির মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না।

ইয়োরোপীয় সাহিত্যে যাহাকে 'ভাবোত্তমা রীতি' বলে, মেতরলিঙ্কের রোমান্টিক নাট্য মধ্যে উহারই একটা একদেশী লক্ষণ পরম অপূর্ব্বতায় প্রকটিত। বলিয়াছি, বিভাবনা ও দর্শনীরীতির মধ্যে না হউক, তাঁহার প্রয়োগের মধ্যে অসামান্যতা এবং বিচিত্র নূতনত্ব আছে। তাঁহার মেজাজ ও প্রকাশরীতির মধ্যে অপরূপ সারল্য ও লীলাতাবল্য এবং রসাভাস ও ভাবাভাসের সঙ্কেতক পদ্ধতি আছে, ইয়োরোপ যাহাকে বহুমানে প্রশংসা না করিয়া পারে নাই। ইয়োরোপ এখন ব্যাপক ভাবে জড়রসিক, সংশয়ী এবং কেবল প্রত্যক্ষ যুক্তি তাহার প্রিয়। জগৎ আত্মা হইতে আসিয়াছে এবং আত্মাতেই প্রত্যাবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছে; অধ্যাত্মতা লাভ করাই মনুষ্যজীবনের চূড়ান্ত গতি বা মনুষ্যত্ব-সাধনার চূড়ান্ত সিদ্ধি—ভারতীয় বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত 'ঈশ্বরের হুকুম'বাদী খ্রীষ্টান ইয়োরোপ অথবা জড়বাদী এবং সংশয়ী ইয়োরোপ বিশ্বাস করে না। অধ্যাত্ম 'সাধনা'রূপ কোন পদার্থে তাহার বিশ্বাস নাই—অথচ আত্মবঞ্চনায় খুশী হয়; ঠারে-ঈষারায় অধ্যাত্মতার আভাসে একটা আহ্লাদ পায়। যাদের অধ্যাত্মতত্ত্বে বিশ্বাস নাই, অথবা যাহারা জড়াতীত কিছুই বিশ্বাস করিতে পারে না, ঈশ্বর-পরকাল ও মৃত্যু-সমস্যার সমাধানকে যাহারা জীবনের সর্ব্বস্বপণে বরণ করে না, কেবল ঈষদ্ভঙ্গ এবং বাবুয়ানা-চালে দুইকুল রাখিয়াই চলিতে চায়, এই রীতি তাহাদের ও পসন্দসই হইবে বিচিত্র কি? উহা জড়তাব বিরুদ্ধে মনুষ্য-আত্মার অতর্কিত বিদ্রোহ ব্যতীত আর কিছুই নহে। মেতরলিঙ্ক সংশয়াত্মা ইয়োরোপের পক্ষে একটা Safety Valve! জড়তার প্রতি গুপ্ত বিদ্রোহ ও আত্ম-ছলনার বাধ্য হইয়াই ইয়োরোপ ভাবুকতার ক্ষেত্রে মেতরলিঙ্কের তাত্ত্বিক রসাভাস ও ভাবাভাসের সঙ্কেতক রচনা পসন্দ করে, রোমান্টিক ও সিম্বোলিক পদ্ধতির কাব্যশিল্পের প্রতিও আগ্রহ দেখায়। নতুবা মেতর-লিঙ্ক স্বয়ং একেবারে জড়বাদী না হইলেও, অধ্যাত্মবিষয়ে একজন 'অবিশ্বাসী'। কিছুকাল পূর্ব্বে Theosophist পত্রে সমালোচিত তাঁহার এক

২৭। সিম্বোলিক আদর্শের বল ও দুর্ব্বলতা।

আত্মঘোষণা উহা পাঠকসাধারণকে জানাইয়া গিয়াছে। তিনি কেবল কাব্যকলায় অদ্ভুতরসের প্রয়োগরূপেই নিজের কাব্যাদিতে তত্ত্ব-সঙ্কেতের উপস্থাপনা করিতেছেন। উহা হইতেই 'দৃষ্টিহারা' জীবনের ব্যাপারে ভয়বিস্ময়কর আধিদৈবিক প্রভাবের সঙ্কেত; 'নীলপাখী' অপ্রাপ্ত-সুদূর এবং একটা রহস্যময় সৌন্দর্য্যের সঙ্কেত! মানবজীবন যেন একটা নিরুদ্দেশ্য রহস্যসুন্দর অথবা রহস্য-ভয়ঙ্কর পদার্থ; এবং এই রহস্যও কেবল কবিগণের হাতসাফাই ও ম্যাজিক নৈপুণ্যের প্রদর্শনী করিয়া লীলাখেলায় 'সুখ্যাৎ' উপার্জ্জন করার জিনিষ! জগতের পশ্চাতে কোন নির্ভরযোগ্য তত্ব যে নাই, তিনি নিজে যে উহা থাকা বিশ্বাস করেন না, তাহাও প্রকাশ করিতে কসুর করেন নাই। ইহাকেই, বলিব, ভাবুকতার ক্ষেত্রে মস্কাবা রীতি! একটা ভুয়া বাজী!

ইয়োরোপ মেতরলিঙ্ককে যতই Light giver বলিয়া মনে করুক না কেন, ভারতবর্ষের দৃষ্টি তাঁহার এই প্রণালীকে সাহিত্যতন্ত্রেই একটা কাপট্যলীলা এবং imposition upon the Reader বলিয়া মনে করিবে। ৺অক্ষয় কুমার সরকার ৺সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত কৃত (Sightless এর অনুবাদ) 'দৃষ্টিহারা' পাঠ করিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"এ কেমন হইল! এ যে যথার্থই দৃষ্টিহারা হইলাম"! ভারতবর্ষের অধ্যাত্মবুদ্ধি এরূপ সঙ্কেতবাদ মোটেই পসন্দ করে না। সে বিশ্বাসী এবং অধ্যাত্মবাদী—অধ্যাত্মক্ষেত্রের সমস্ত বিশ্বস্ত তত্ত্বকেও সে রূপকের প্রণালীতে, পদার্থসঙ্কেতে এবং 'প্রতীকে' আকারিত করিয়াছে; তত্ত্ব-প্রতিরূপী 'প্রতিমা' সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং ভারতের 'সিম্বোলিক' কবিতা হইবে অধ্যাত্ম-প্রতিরূপা 'মানসী সৃষ্টি'; তাহার চিত্র, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য হইবে, "মানসী-প্রতিরূপা চাক্ষুসী" সৃষ্টি। ইহা তাহার উপনিষদের দীক্ষা। সে বলিবে, ধরিতে পার' ত চাপিয়া ধর'—হয়ত এদিক্, না হয় ওদিক! আমতা-আমতা গোছের সঙ্কেতরীতি—ভুয়াবাজী ও ভণ্ডতা! ভাবের ঘরেই কপটতা, ভাঁড়ামী ও চুরার রীতি! ইহা সে কাব্যের অনুরোধেও পসন্দ করে না। তুমি কবি! তুমি কোন্ সত্যটী

ধরিয়াছ? যাহা ধরিতে পারিয়াছ, তাহার জন্যই লেখনী ধারণ কর! সাহিত্যে 'ভাব'টীর জন্যই ভালমন্দ সর্ব্বপ্রকার কবিত্বাচার সহ্য হয়। ভাবের ঘরেই ভণ্ডতা, সত্য-গোপন বা আত্মবঞ্চনা করিয়া চিত্তের ব্যায়াম-আনন্দ এবং হেঁয়ালি-খেলার সুখ পাওয়ার জন্য এত অবসর মনুষ্যজীবনে থাকা উচিত নহে।

ইয়োরোপের, বিশেষতঃ ফ্রান্সের সিম্বোলিক কবিতার অভিনিবিষ্ট এবং ভক্ত সমালোচক Symons সিম্বোলিষ্টগণের অন্তর্ম্মর্ম্ম ও আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন। সাহিত্যে সিম্বোলিষ্ট্‌গণ কিছুই প্রমাণ করেন না—করিতে চাহেন না। তাঁহাদের কোন তত্ত্ব বিশ্বাস নাই; কোন মীমাংসা বা সিদ্ধান্ত নাই; তাঁহারা কেবল বাক্যরীতি-জাত রহস্যাভাস এবং ভাবাভাসকেই একটা স্বতন্ত্র 'সাহিত্যরস' রূপে উপস্থিত করিতে চাহেন। সাইমন্স্ বলেন—

"The doctrine of mysticism with which all the mystical literature has so much to do, of which it is all so much the expression, presents us, not with a guide for conduct, not with a plan for our happiness, not with an explanation of any mystery, but with a theory of life which makes us familiar with mystery, and which seems to harmonise those instincts which make for religion, passion and art, freeing us at once of a great bondage. The final uncertainty remains..........

অবিশ্বাসীগণের মনে ভয়ের বিস্ময়ের অথবা কোন সৌন্দর্য্যের আবছায়া ফেলিয়া হেঁয়ালিসুখের 'সুরসুড়ি' দেওয়াই হইল সিম্বোলিষ্ট্‌গণের প্রধান উদ্দেশ্য। কোনরূপ সত্যের-নির্দ্দেশ বা সমাধানও সিম্বোলিষ্ট্‌গণের লক্ষ্য এবং রীতির বহির্ভূত। সুতরাং, সোজাসুজি এবং শাদাকথায় বুঝিতে গেলে সিম্বোলিষ্ট্‌গণের আদর্শটুকু কোন্ আকারে দাঁড়াইয়া যায়? যেহেতু জগৎ রহস্যময়, যেহেতু এই রহস্যতা ও অজ্ঞেয়তা—the weight of this unintelligible world দুর্ব্বহ, অতএব সিম্বোলিষ্ট্‌গণ স্থির

করিলেন যে এই অজ্ঞেয়তাকে, এই আশ্চর্য্যত্ব বা ভয়ঙ্করতাকেই লক্ষ্য রসরূপে অবলম্বন করিয়া কাব্য-কবিতা-নাটক রচনা চলুক। রহস্যের কোন কুল-কিনারা করিবার জন্য নহে, আপাত-দৃষ্ট অকূলের কোন কুল পাইয়াছি বলিয়া তাহার 'সুসমাচার' জ্ঞাপন উদ্দেশ্যে নহে, কেবল কোন পদার্থ যে রহস্যময় বা ভয়ঙ্কর তাহারই একটা প্রতিরূপ দেখাইয়া! রহস্যময়কে দুর্জ্ঞেয় ও দুর্ব্বোধ্য এবং অনর্থক বাক্যে আকারিত করিয়া। দুর্জ্ঞেয়কে দুর্জ্ঞেয় কথার রীতি ও ভঙ্গীতেই দেখাইয়া! তাঁহাদের লক্ষ্য যেমন অস্পষ্ট ও রহস্যময়—বাক্যের রীতি, কাব্যের চালচলন সমস্তই সুতরাং অগম্য ও অনর্থময়। অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা হয়ত হাস্যবিদ্রূপে হাঁকিয়া উঠিবেন, "অর্থ কি জানি!"—"তুমি ব্যাকুব, তাই অর্থ বুঝিতে চাও"! ইহাই সিম্বোলিক সাহিত্য!

ম্যাথু আর্ণল্ডের কথায় বলিতে পারি, অধ্যাত্মবিষয়ে ভারতবর্ষের একটা High seriousness আছে। এই হেতু, সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রেও অধ্যাত্মবিষয় লইয়া কোনরূপ ছল-রীতি তাহার সহ্য হয় না। আবার, কোন্ তত্ত্বটি অধ্যাত্ম, কোনটি কেবল বুদ্ধিবৃত্তির ব্যায়াম বা হেঁয়ালি, কোনটি বা কেবল 'ভুয়া', উহা বুঝিতেও তাহার বিলম্ব হয় না। এই 'অধ্যাত্ম আদর্শ' ধরিয়াই ভারতে মনুষ্যজীবনের একটা সর্ব্বস্ব-পণ এবং 'চরমপন্থী' মীমাংসা। এখনো এতদ্দেশে, লক্ষ লক্ষ লোক কেবল অধ্যাত্মজীবন পরিবর্দ্ধনার উদ্দেশ্যেই সংসারের জড়তানিষ্ঠ সুখচর্য্যায় জলাঞ্জলি দিতেছে; কেবল আপনাদের 'ভাবুকতা' এবং বিশ্বাসের নির্ভরেই অশেষ দুঃখশীল জীবন বরণ করিয়া চলিয়াছে! প্রাচীন যুগে যাহারা অধ্যাত্মতার 'ভেক' ধরিয়া, ভণ্ড-রীতিতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া চলিত, সমাজ পরম ঘৃণায় তাহাদের ললাটে নামমুদ্রা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল—'আজীবক', 'মস্করী'! পুনর্ব্বার সাহিত্যের ক্ষেত্রেও মস্করা! এস্থলেই আধুনিক সাহিত্যে ইয়োরোপীয়তার শিষ্য রোমাণ্টিক ও মীষ্টিক 'কায়দা-বাগীশ' গণের সাধারণ ভ্রমস্থান। প্রকৃত অধ্যাত্মবাদ তাহাদের নহে; কেবল একটা বাক্যরীতির 'কেরদানী'! এ দেশের অধ্যাত্ম বুদ্ধি-ধাতুর সম্পূর্ণ

বিপরীতে তাঁহারা সাহিত্যের পাঠককে একটা অসম্ভব মস্কারার 'চালতা গেলাইতে' চাহিতেছেন; আর, বেচারা গিলিতে না পারিলেই অভিমান করিতেছেন! এ দেশে serious ভাবে যে তত্বই দেওয়া যাউক, তাহাই ("Temporary Suspension of Judgment" করিয়া) পাঠক গ্রহণ করিতে পারে। এমন বিগহন বা কঠিন অধ্যাত্ম তত্ব নাই, যাহাতে তাহার বুদ্ধি ভীত হইতে পারে; যাহার নামকরণ বা রূপীকরণ তাহার সহ্য হয় না। অবশ্য, পরিশেষে অবশ্যম্ভাবী প্রশ্নটীও উঠে—"কি এবং কেন?" উহা প্রকৃত অধ্যাত্মবার্ত্তা না কেবল Intellectual হেঁয়ালি?

এরূপে কেবল অনর্থতা, অজ্ঞেয়ার্থতা ও অস্পষ্ট বস্তুত্ব, কেবল সাহসপূর্ব্বক অর্থহীন বাক্যধ্বনি অথবা কেবল ছন্দ-ধ্বনি করিতে পারাই একটা স্বতন্ত্র 'আর্ট্‌' রূপে প্রচারিত! যেহেতু কেবল ব্যায়ামে বা 'লুকাচুরী' খেলার মধ্যে, হেঁয়ালি-চিন্তার মধ্যে একশ্রেণীর মনুষ্য বুদ্ধি সময় সময় আমোদ লাভ করে, অতএব লেখকের সতর্ক-গুপ্ত অর্থের আবিষ্কার চেষ্টাতেই একটা 'রস'! এক শ্রেণীর সিম্বোলিষ্ট্‌ অর্থগুপ্তিকেই একটা স্বতন্ত্র রস-সিদ্ধিরূপে কথায় এবং কার্য্যে দৃষ্টান্তিত করিতেছেন; অন্যশ্রেণী, জগতের তত্ব দুর্জ্ঞেয় বলিয়া, দুর্জ্ঞেয় মাত্রকেই চরমের তত্ব রূপে সঙ্কেত করিতেছেন! নিত্যনিয়ত মনে রাখিতে হইবে, প্রকৃত কোন অধ্যাত্মরহস্য তাঁহাদের নাই, রহস্যের কোন সমাধানও নাই। সাইমন্‌সের ভাষায়—"they have nothing to symbolise" অদ্ভুত বা ভয়ঙ্কর 'কিছু একটা' যে আছে, উহাই যেন একটা দুর্ল্লভ বার্ত্তা; ইহাই সিম্বোলিকা! অন্ধ জড়বাদ এবং ঘন সংশয়ের ঔরসজাতা এবং তাহার হৃদয়ঙ্গমা এই অন্ধকন্যা! অপর কোন উদ্দেশ্য-অভিসন্ধি বিনা কেবল ঐ বার্ত্তা দিয়াই মেতরলিঙ্ক 'দৃষ্টিহারা' রচনা করিয়াছেন। উহা জন্মান্ধ জীবের সমক্ষে অজ্ঞাত-ভয়ঙ্কর মৃত্যুর বার্ত্তা! পরিত্রাণের উপায়দৃষ্টি-বিহীন ভীষণের বার্ত্তা! এলিজাবেথযুগের 'ট্র্যাজিক' নাট্যকারগণের (ফোর্ড্‌, ওয়েব্‌ষ্টার, সিরীলটুর্ণার ও শেকস্‌পিয়রের Ghost Scene গুলির) প্রয়োগ পথে, বিশেষত রসেটির পথে মেতর্‌লিঙ্ক একটী কুকুরের 'ঘেউঘেউ শব্দ' হইতেই ভীতি-রোমাঞ্চকর

'ভয়ানক' কে উপস্থাপিত করিয়াছেন। আর, আদর্শের যেই 'অন্বেষণা' রোমাণ্টিকগণের সমক্ষে একটা নিয়ত তত্ত্ব ও অমূল্য প্রাপ্তি, (জর্ম্মণগণ যাহার নাম দিয়াছিলেন 'নীলফুলের অন্বেষণ') উহাকেই বিভিন্ন আকৃতিতে উপস্থাপিত করিয়া তিনি লিখিয়াছেন 'নীলপাখী'।

২৮। রবীন্দ্রনাথের রাজা, ও ডাকঘর ও ফাল্গুনির সঙ্কেতক আদর্শ।

মেতরলিঙ্কের Sightlessএর পথে রুশীয়ার আণ্ড্রিইয়ুপের Black maskers ও সুইডেনের ষ্ট্রীণ্ড্বর্গের Dance of Death 'ভয়ানক'এর সিম্বোলিক শিল্প। উহারা আকৃতি-আদর্শের ব্যভিচার করিয়াও সাহিত্যে যে ভয়ানকের একটা স্নায়ুগত, intellectual বা তত্ত্ব প্রধান ভাবাভাস সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন, অপিচ, অবোধ্যতা এবং রহস্যতাকেই একটা রসসিদ্ধি বলিয়া উপস্থিত করিতেছেন, তাহা প্রত্যক্ষ। ইহা ভয়ানকের একটা Art for Arts' Sake ! ফ্রান্স, ইটালী, স্পেন এবং পর্ত্তুগালেও ঈদৃশ সমস্যাশিল্প শতশঃ রচিত হইতেছে। এই মীমাংসাহীন বা সমাধানহীন রহস্যের উদ্দেশ্য কি, সে প্রশ্ন তুলিলে চলিবে না। রবীন্দ্রনাথের ফাল্গুনিও রোমাণ্টিকের 'অন্বেষণা'-তত্ত্বের শিল্প। এক শ্রেণীর রোমাণ্টিক এখন বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন (এবং তন্মধ্যে জুদরম্যান অন্যতম), "আইডিয়েল অন্যত্র নাই, উহা প্রকৃতের রূপেই আছে"। রবীন্দ্রনাথও ফাল্গুনিতে করিয়াছেন শীতের বস্ত্রহরণ! বলিতে চাহেন, 'শীতই বসন্ত', আপাতদৃষ্ট বার্দ্ধক্যই যৌবন, মৃত্যুই জীবন, The Real is the ideal. এই মতবস্তু একটা অধ্যাত্ম তত্ত্ব কিনা, জ্ঞানের বা কর্ম্মের ক্ষেত্রেও দুর্লভ প্রাপ্তি কি না, ফাল্গুনির নিবিষ্ট পাঠক দেখিতে পারেন। উক্ত তত্ত্বের কোন রস-প্রত্যয় ঘটিতেছে কি না, তাহাও বুঝিতে পারেন। তবে, বলিতে গেলে, ইয়োরোপের এই সিম্বোলিক ধাতুর শ্রেষ্ঠ শিল্পটি সাহিত্য জগৎকে বাঙ্গালীই যোগাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' রহস্যবাদী এবং সমস্যাজীবী, রোমাণ্টিকী ভাবুকতার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। পূর্ব্বে বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'রাজা' ও 'ডাকঘর' প্রভৃতির প্রকাশ পদ্ধতি এবং (technique) নির্ম্মিতির প্রণালী বিষয়ে মেতরলিঙ্কের শিষ্য এবং তাঁহার প্রদর্শিত পথে আত্মচালনা

করিয়া ঐ সমস্ত নাটক রচনা করিয়াছেন। উভয়েই দার্শনিক এবং ঈষারাবাদী। তবে উভয়ের প্রধান পার্থক্যও এই ছিল যে, মৈতরলিঙ্ক্ ডাহা 'বিজ্ঞান বুদ্ধি'গ্রস্ত এবং সংশয়ী, সুতরাং তিনি সিম্বোলিক আদর্শে কেবল 'একটা কিছু থাকা' গোছের রহস্য-তত্ত্বের ঈষারা দান পূর্ব্বক মানবাত্মাকে চেতাইতেই ভাল বাসিয়াছেন; মানববুদ্ধির সমক্ষে অস্পষ্ট চেতনা এবং ছায়াভাসের হাতসাফাই দেখাইয়াই 'অদ্ভুত' সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির জন্য 'বাহবা' পাইতে তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, ; অতএব বাক্যরীতিতে অস্ফুট অনুভাব-বিভাবের ঈষারা দিয়াই তাঁহার নাটকাদির মধ্যে রহস্যের একটা ছায়াবাজী সিদ্ধি করিয়াছেন। এই মেতরলিঙ্ক্ গদ্যের, বিশেষত নাটকীয় গদ্যের রীতি-ক্ষেত্রেই সঙ্গীতের ঈষারা-ও-আভাষ তন্ত্রের অবতারণায় ইয়োরোপীয় সাহিত্যে একটা অভিনব গদ্যরীতির জনক হইয়াছেন। কিন্তু, আজন্ম সঙ্গীত-সাধক ও নিরাকার রহস্যতা-প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ! বিশেষতঃ ভারতীয় বেদান্তের প্রতিবেশী ও স্বীকারতঃ 'ব্রহ্ম'-উপাসক এবং শান্তি-নিকেতনের 'প্রচারক' রবীন্দ্রনাথ মেতরলিঙ্কের ন্যায় সংশয়ী ত নহেনই—বিশ্বাসী। সুতরাং তিনি বিশ্বাসের সুস্থির খুঁটি ধরিয়া অথচ মেতরলিঙ্কের রীতি পথে, পদে পদে নাটকীয় অবস্থা ও ঘটনার নানা ছিদ্র অনুসরণে তত্ত্বের ঈষারা দান পূর্ব্বক স্থিরতর ও বলিষ্ঠতর সাহিত্যসিদ্ধি লাভ করিতে পারিয়াছেন। 'রাজা' ও 'ডাকঘর' একদিকে বিশ্বাসী, এবং বিশ্বাস করিবার জন্য পিপাসী কবির গ্রন্থ; অন্যদিকে, জীব ও ব্রহ্মসম্বন্ধের দ্বৈতবাদী মীমাংসায় সুচিন্তিত দার্শনিক প্রসঙ্গ। সুতরাং, উহারা বরং সাহিত্যের ক্ষেত্রকোটী মধ্যেই অপরূপ 'রস'-শিল্প হইতে পারিয়াছে; তত্ত্বজীবী ব্যক্তিগণেরও আদর লাভ করিতে পারিতেছে। রাজার অস্পষ্ট সঙ্কেতিত 'অর্থ'কেই সংসারের অন্ধতিমির-বাসী মনুষ্য জীবন ও জগতের শেষতত্ত্ব বলিয়া গ্রহণে আনন্দিত হইতে পারিতেছে। উহা কেবল ভুয়াবাজী নহে—অত্যন্ত Serious। তবে, এস্থলে ইহাও বুঝিয়া যাইতে হয় যে, রবীন্দ্রনাথের প্রকাশরীতি ইয়োরোপের মীষ্টিক বা সিম্বোলিষ্ট্‌গণের অনুগামী হইলেও, তাঁহার রাজা ও ডাকঘরের সাঙ্কেতিকতার মধ্যে যে মীমাংসা উদ্বর্ত্তিত

হইয়াছে, যেই তত্ত্ব-নির্দ্দেশ ও আধ্যাত্মিক মতবাদ আছে, উহা মূলতঃ ইয়োরোপীয় সিম্বোলিষ্ট্ গণের আদর্শ-বিরোধী নহে কি?

বলা বাহুল্য যে, 'রাজা' নাটকে যেই অস্পষ্ট রস আছে, উহা রূপকের পদ্ধতিতে এবং বিভাব-অনুভাবকে বা আলম্বন-উদ্দীপনকে অস্পষ্ট করিয়াই সমাহিত। রবীন্দ্রনাথ নিরাকার-উপাসক, এজন্য তিনি রাজার স্থায়ী ভাবটিকেও যথাসাধ্য নিরাকার বা অস্পষ্টাকার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু, বুঝিতে হইবে অস্পষ্টতাই উক্ত কাব্যের ভাললাগার বা রসবত্তার কারণ নহে—বরং উহাই সাহিত্যতন্ত্রে উহার দোষ। বর্ণতুলিকার সংকেত এবং বিভাবনায় রবীন্দ্রনাথের অসামান্য প্রয়োগ-ক্ষমতা সত্ত্বেও রসের দুর্ব্বলতা এবং অস্থায়িত্বরূপী দোষ। রবীন্দ্র ইচ্ছা করিয়াই অস্পষ্ট হইয়াছেন বলিয়া উহা জ্ঞানকৃত। তিনি তত্ত্ব-বস্তুর বিষয়ে কিছুই স্ফুটভাবে জানেন না, স্ফুটভাবে বলিতে পারেন না, বলিতে চাহেন না। কেবল এই বলা যায় যে, উহা নিরাকার অতএব উহা অব্যক্ত,; উহার উপায়, মর্ম্ম এবং আচরণ অস্পষ্টাকার। সুতরাং অস্ফুট অনুভাব ও উদ্দীপনাদির পথেই কবি 'রাজা'র অধ্যাত্ম তত্ত্বগুলি সঙ্কেতিত করিতে চাহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের জন্ম-সিদ্ধ প্রণালীও নিরাকার আদর্শের সঙ্গে 'রাজা' কাব্যের উদ্দিষ্ট রস-নিষ্পত্তি সুতরাং নানাদিকে সুসঙ্গত হইয়াছে বলিয়া, কবির শিল্প-দোষটিই কিরূপে উক্ত কাব্যের সমাধানে পরম 'গুণে' পরিণত হইয়াছে, তাহা না বুঝিলে সাহিত্যক্ষেত্রের এই একটা অতুলনীয় সিদ্ধির নিরিখ এবং ওজনও আমরা পাইব না।

পালী উপাখ্যানে আছে, কোন দেশের রাজা অত্যন্ত কালো ও কুৎসিত ছিলেন বলিয়া প্রজাগণের সমক্ষে বাহির হইতেন না, অন্তরাল হইতে রাজকার্য্য চালাইতেন। এই সামান্য বস্তু সংকেত হইতে রবীন্দ্রনাথ "অব্যক্ত বিশ্ব-রাজা ও সৃষ্টি-সংহার-কারণ" বিষয়ে এই অনুপম সিম্বোলিক-প্রসঙ্গ রচনা করিয়াছেন। 'রাজা'-কাব্যের রসনিষ্পত্তির নায়ক-নায়িকা অন্ধকারগৃহনিবাসী, অদর্শনীয়, 'কালো' রাজা ও তাঁহার 'রাণী' সুদর্শনা।

২৯। উহাদের বোধায়নী সিদ্ধি ও রসাভাস।

সুদর্শনা প্রকৃত প্রস্তাবে দার্শনিকা। সুদর্শনা প্রধানতঃ কেবল তত্ত্ববাদী জিজ্ঞাসা এবং বৈজ্ঞানিক কৌতূহল বলিয়া তাঁহার স্বামী 'রাজা'টীরই প্রমাণ চাহেন। প্রথমতঃ, রাজার দৃশ্যরূপ ও অস্তিত্বের প্রমাণ, তাঁহার শক্তির প্রমাণ, তাঁহার প্রেমের অস্তিত্বেরও প্রমাণ চাহেন। আবার, রাজার লুকাইয়া থাকার কারণ এবং চিরকাল "অন্ধকার পুরের স্বামী" থাকার তত্ত্ব ও সুদর্শনা খুঁজিতেছেন। সুতরাং এই দিকে, 'রাজা' কাব্যে, রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ ধর্ম্ম-দর্শনিক তত্ত্বজিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তর ও হেতুবাদ যোগাইতেই ব্যস্ত আছেন। মিল্‌টন Paradise Lost লিখিয়াছিলেন; তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল, খ্রীষ্টানী আদর্শে Justifying the ways of God to man। রবীন্দ্রনাথও সেইরূপ একটা বুদ্ধিজীবী জিজ্ঞাসার আদর্শই সাহিত্যক্ষেত্রে মুখ্য করিতে ব্রতী হইয়াছেন এবং সর্ব্বত্র ন্যূনাধিক 'ভক্ত'রীতির দার্শনিকতাই অবলম্বন করিয়াছেন। বলিতে পারি, স্বকীয় আদর্শের ক্ষেত্রেও ইহা একটি পরমা সিদ্ধি। মিল্‌টন, সেতুব্রায়াঁ ও বানিয়ানের পর ইয়োরোপীয় সাহিত্যে 'রাজা'র সজাতীয় দৃষ্টান্ত আমাদের চোখে ঠেকিতেছে না! সঙ্গীত ও চিত্রতন্ত্রীয় এবং রোমান্টিকতন্ত্রীয় সঙ্কেত-ইঙ্গিত এবং ঈষারা অবলম্বনে তিনি নিদানতঃ 'সিম্বোলিক' আদর্শের শিল্প নিষ্পত্তি করিতে চাহিয়াছেন। আধুনিক ইয়োরোপের সিম্বোলিক রীতি যে স্থানে কেবল তত্ত্বের অসংশ্লিষ্ট ও অস্থির সঙ্কেত করিয়াই তৃপ্ত এবং ক্ষান্ত হয়, বিশ্বাসী ও ব্রহ্মপন্থী রবীন্দ্রনাথ উক্ত রীতি অবলম্বনেই ধীরে-সুস্থিরে জীব ও ব্রহ্মসম্বন্ধের একটা দ্বৈতবাদী 'সিদ্ধান্ত দর্শন' খাড়া করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বলিতে পারা যায়, তাঁহার আদর্শে সাফল্য লাভ করিয়াছেন। কবি সুদর্শনাকে সংশয়, মান, অভিমান বিদ্রোহ এবং বিরহের পথে পরিচালিত করিয়া পরিশেষে 'রাজার' সঙ্গে একটা মিলনের আভাসেও উপস্থিত করিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে, এ সমস্ত বিষয়ে সর্ব্বত্র ইঙ্গিত এবং আভাসের প্রণালীই অনুসৃত এবং ওইরূপ অস্পষ্ট বার্ত্তার মধ্যেই গ্রন্থটির শিল্পত্ব। কাব্যের সর্ব্বপ্রকার আলম্বন ও উদ্দীপন, সমস্ত বিভাব ও অনুভাবকে কেবল 'ছায়া-ছায়া' ও 'ধোঁয়া-ধোঁয়া'

করিয়া কবি ওই ভাবাভাস ও রসাভাস সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাকে একটা লোভনীয় সাহিত্যসিদ্ধি-রূপে আমাদের সমক্ষে ধরিয়াছেন। তবে, অবলম্বিত সিম্বোলিক আদর্শ এবং রীতি গতিকে উহার ভাবসিদ্ধি ও তত্ত্বসিদ্ধি অস্পষ্ট হইলেও, মেতর্‌লিঙ্ক অপেক্ষা যে স্পষ্টতর, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। উহাকে একদিকে মেতর্‌লিঙ্কের সংশয়ী এবং বৈজ্ঞানিক রীতির বিপক্ষে 'বিদ্রোহ' রূপেও নির্দ্দেশ করা যায়। বলিয়াছি, সিম্বোলিষ্ট্‌গণ তত্ত্বের ক্ষেত্রেও চূড়ান্ত প্রাপ্তি, চূড়ান্ত তত্ত্ব বা স্থিরতত্ত্ব বলিয়া কোন পদার্থ ধরিতে চাহেন না; স্থায়ীভাব, উদ্বর্ত্তিত ভাব বা উদ্বর্ত্তিত তত্ত্ব বলিয়া কোন পদার্থ গ্রহণ করিতে, কিম্বা বা মানিতেও চাহেন না; বিশ্বাস ও চিত্তবিশ্রাম বলিয়া কোন খুঁটি ধরিতেই চাহেন না। 'দৃষ্টিহারা' বা 'নীলপাখী'র শিল্প-প্রণালী বুঝিতে গেলেই বলিতে হয়, কোনদিকে কোনরূপ স্থিরতা, স্থিরার্থতা, একার্থতা স্থায়ী লক্ষ্য বা স্থায়ী ভাব কিংবা রস এই সিম্বোলিক আদর্শের বিরোধী। অতএব, রবীন্দ্রনাথ যে সিম্বোলিক প্রণালী ধরিয়া একটা 'মোটামোটি' অর্থসিদ্ধি ও তত্ত্বসিদ্ধি এবং (অস্পষ্ট হইলেও) অপেক্ষাকৃত স্থায়ীভাবের দিকে রতি দেখাইয়াছেন, উহা গোঁড়া সিম্বোলিক শিল্পের বিরোধী। বিশুদ্ধ সিম্বোলিষ্টগণ এইরূপ বলিবেন। কিন্তু, সাহিত্যের তত্ত্বজীবী পাঠকবৃন্দ রবীন্দ্রনাথকে ওই 'অস্পষ্ট' প্রাপ্তির জন্যই সাধুবাদ প্রদান করিবে। উহাকে কবি-লেখনীর অতুলনীয় সিদ্ধি বলিয়া মনে করিবে। এই দিকে সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে, রাজা বহুলাংশে গদ্যে রচিত এবং প্রধানতঃ একটা দার্শনিক সিদ্ধি হইলেও উহা শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর কাব্য হইয়াছে। মেতর্‌লিঙ্ক এবং অস্কার ওয়াইল্‌ডের বাহিরে এ'রূপ কাব্যরসোজ্জ্বল গদ্য ও অন্যত্র দুর্লভ। আবার, দার্শনিক হইলেও 'রাজা' কেবল বিচারবুদ্ধির কক্ষেই রচিত নহে, কবির আনন্দাত্মার (Soul) মধ্যেই উহার জন্ম। 'রাজা'তেই পূর্ণ রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পাই। কবি রবীন্দ্রনাথ কত বড় মনস্বী ব্যক্তি ও কত বড় Soul, অপর তাবৎ রচনাপেক্ষা 'রাজা'র মধ্যেই উহার পূর্ণতম পরিচয়।

এখন, উভয়তঃ, আমাদের সমক্ষে কি দাঁড়াইতেছে? মেতর্‌লিঙ্ক বা রবীন্দ্রনাথ উভয়ের পক্ষেই তাঁহাদের শিল্প-সমাধানের উদ্বর্ত্তিত লক্ষণ কি?

উহার intelectuality! উহা সর্ব্বত্র আলম্বন-উদ্দীপনকে অস্পষ্ট করিয়া যাহা সিদ্ধ করিয়াছে, বলিয়া আসিয়াছি, তাহা কেবল একটা বোধায়নী প্রাপ্তি। একটা তাত্ত্বিকতা, শিল্পে ভাবরসকে গৌণ করিয়া মুখ্যভাবে একটা দার্শনিকতা! সাহিত্যের 'আকৃতি' আদর্শের দিক হইতে উহার নিরাকার ছায়াবাদিতা, মনের অধরণীয় প্রমূর্ত্তি ও আলম্বন-উদ্দীপনের দুর্ব্বলতা হইতেই উহার অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ভাব সিদ্ধি; উহার অস্পষ্ট ভাবে "ভাল-লাগার" সঙ্গে সঙ্গেই উহার "ভাল-না-লাগা"! সর্ব্বত্র মনে রাখিতে হইবে, ওই ভাল-লাগার অদৃষ্ট-সম্বন্ধ এবং নিত্যযুক্ত ভাল-না-লাগা।

৩০। ভারতীয় সঙ্কেতক কবিতা; বৈষ্ণবকবিগণের বৃন্দাবন-রাজা ও রাণী।

আমরা সাহিত্যক্ষেত্রে শিল্পরীতির স্বরূপ ও শক্তি চিন্তায় অবহিত হইয়াছি। অতএব, আদর্শটিকে অন্যদিক হইতে, আমাদের স্বদেশের একটি সর্ব্বজন-গম্য দৃষ্টান্ত সাহায্যেই বুঝিতে চেষ্টা করিব। সিম্বোলিষ্ট্‌গণ এই যে শিল্পরীতি ও আভাস সিদ্ধিকে একটা দুর্লভ এবং মৌলিক প্রাপ্তি বলিয়াই ঘোষণা করেন, তাঁহাদের এই সিদ্ধি অন্য উপায়ে সম্ভবপর কি? Emotionকে মুখ্য করিয়াই উহার সাহিত্যতা-সিদ্ধি সম্ভব কি? অনুভাব ও বিভাবকে, আলম্বন ও উদ্দীপনাকে স্ফুটতর করিয়া, সিম্বোলিক রস-সাধনার দৃষ্টান্ত সাহিত্যে আছে কি? উত্তর দিতে পারি, আছে; বঙ্গ সাহিত্যেই আছে। উহা প্রাচীন কবির সৃষ্টি বলিয়া হয়ত প্রাচীন-বিদ্বেষী আধুনিকের দৃষ্টি সমক্ষে উহার মধ্যে কিঞ্চিৎ 'সেকেলে গন্ধ' আছে; উহা আধুনিক জিজ্ঞাসাবাদের সহিত ঘেঁষাঘেঁষি করিতে পারে নাই বলিয়া হয়ত উহার তত্ত্বাংশের কোন কোন দিক্‌, 'রাজা' কাব্যের ন্যায় এতটা পরিস্ফুট নহে; হয়ত উহার Justification of the ways of God to man আধুনিক আদর্শে ততটা বিস্তারিত, বিমার্জ্জিত এবং ব্যাপক নহে, উহার মধ্যে প্রত্যক্ষবাদী দর্শনের বিচার-বিতর্ক-সংশয়ের ঘাত-সহিষ্ণুতাও ততটা মুখ্য নহে। কারণ, উহা সে দিকে মুখ্য দৃষ্টি করে নাই। কিন্তু, উহা সাহিত্যের ক্ষেত্রে জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধ বিষয়ে, রাজা ও

সুদর্শনার সম্বন্ধ বিষয়ে পূর্ণতর সিম্বোলিক শিল্প—উহা প্রমূর্ত্ততর এবং স্ফুটতর আলম্বন উদ্দীপন (পাত্রপাত্রী, চারিত্র, অবস্থা এবং ঘটনা) অবলম্বনে স্ফুটতর সাহিত্যরস নিস্পত্তি করিয়াছে অর্থাৎ তত্ত্বকে স্ফুটতর আকৃতি ও ব্যক্তিত্ব দান করিয়া প্রবলতর স্থায়ীভাব সাধন করিয়াছে ; ঘনিষ্ঠতর এবং গভীরতর রসের সাধন পূর্ব্বক এতদ্দেশের হৃদয়ে চিরকালের জন্য 'গাড়িয়া' বসিয়াছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তত্ত্বের এখন শক্তিশালী পরিমূর্ত্তনার দৃষ্টান্ত আর নাই। অভিনিবিষ্টের দৃষ্টিতে, তাহা দার্শনিক তত্ত্বই যেন মনুষ্য-ব্যক্তিত্বে আপনাকে প্রমূর্ত্ত করিয়া বাঙ্গালীর জীবনে মানুষী লীলা করিয়াই চলিয়াছে! বলিতে হইবে কি, যে উহা যে-কোন বৈষ্ণব কবির—যেমন গোবিন্দ দাসের—'বৃন্দাবন রাজা' নামে সুনির্দ্দেশ্য কাব্য ? শোনামাত্র আপাততঃ উভয়েই বিপরীত ও বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকিবে। কিন্তু, ঘনিষ্ঠ ভাবে দৃষ্টি করুন! এদিকে কবি রবীন্দ্রনাথের আদিম বৈষ্ণবশিষ্যতা ও এতদ্দেশের 'ব্রহ্মপন্থী' ধর্ম্মের বৈষ্ণবী রীতি সর্ব্বপ্রথম ধরিয়া লইতে হয় ; উহাদের যোগ ও প্রস্থান এবং মূল প্রকৃতি চিন্তা করিতে হয়। রবিকবি গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ভাব-পুত্র। পিতা-পুত্র সম্বন্ধ ছাড়িয়া স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধের রূপক গ্রহণ! জগতের অন্যধর্ম্মের কোন কবি কি করিতেন ? এ স্থানেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ; বৈষ্ণবের 'কালিয়া রাজা'ও কালো, অনুপম, অজ্ঞেয়তম কালো! তবে তিনি জীবের নিত্য অপ্রাপ্ত হৃদয় রাজা ; ভবপুরীর সকল পরিব্যক্তির মধ্যে নিত্য-অব্যক্ত আনন্দরাজা ; জগৎ-বৃন্দাপুরীর সর্ব্বতন্ত্রের উৎসব-রাজা ; ভব-প্রকৃতির নিত্য-যৌবনের বসন্ত রাজা ; প্রেমিকের ধ্যানধারণার নেত্রে 'অখিল রসামৃত মূর্ত্তি' ; 'সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ'! বিশ্বসৃষ্টিরূপিণী গোপিনীর অলভ্য-সুন্দর হৃদয়চিত্তমোহন নটবর! তবু তিনি নিত্যকাল সুদূর ; তাত্ত্বিকের ও প্রেমিকের পরিপূর্ণ মিলন-আলিঙ্গনের নিত্যবহির্দ্দেশা—অধৃত ও অধর! নিত্যকাল জীবাত্মার পূর্ণতৃপ্তি-গ্রাসের বাহিরে! প্রেম-সম্বন্ধের এত ঘনিষ্টতা সত্ত্বেও বৃন্দাবনের 'রাজা ও রাণী'র মধ্যে একটা অপগুনীয় নিত্য-বিরহের পর্দা। 'বৃন্দাবনের রাজা' অন্ধকার-ঘরের রাজা নহেন—শ্বেতদ্বীপের—

অলৌকিকী জ্যোতির্ম্ময়পুরীর রাজা। অথচ, তাঁহার সঙ্গে 'রাণী'টীর যেন নিত্যকালের দূরত্ব-সম্বন্ধ—সংসারে প্রত্যক্ষ বা 'স্বকীয়' না হইয়া যেন পরোক্ষ ও 'পরকীয়' সম্বন্ধ। বৃন্দাবনের রাণীটিও সুদর্শনা কিম্বা দার্শনিকা নহেন; তিনি প্রেমিকা—তিনি প্রেমতন্ত্রের রাধিকা! এ স্থলেই রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' কাব্যের একটা বৃহৎ প্রস্থান-ভূমি। দার্শনিকতা এবং তত্ত্ব-মিমাংসাই উহার প্রধান machinery। নিত্যকাল অদৃশ্য এবং অন্ধকারগৃহ-বাসী রাজার অস্তিত্বের প্রমাণ, শক্তির প্রমাণ, আঘাত-প্রতিঘাতের হেতু-প্রমাণ, আপাততঃ ঔদাসীন্য এবং কঠোরতা সত্বেও রাণীর প্রতি তাঁহার প্রেমের প্রমাণের দরকার। রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয় ভাবে তাহা দান করিয়াছেন; তর্কবাদী ও Positivist মনুষ্যের জন্য Theologyর আদর্শেই একটা সিদ্ধান্তবাদ খাড়া করিয়াছেন; তাহাকে আশ্বাস দিয়াছেন। বৈষ্ণব কবির কাব্যেও উহা যে নাই, তাহা নহে। কিন্তু, বৈষ্ণব কবি সে বিষয়টি বিশেষভাবে তাহার দার্শনিকগণের উপর 'বরাত' দিয়াই নিশ্চিন্ত। বেদান্তের দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ভাষ্য, পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের উপরে, রূপ-সনাতন, জীব এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও বলদেব-কৃষ্ণদাসের হস্তে বরাত দিয়াই নিশ্চিন্ত। কবিগণের এই অ-চিন্তার দরুণেই তাঁহাদের কাব্যের রস-শক্তি বরং যেন জমিতে পারিতেছে! বৃন্দাবন রাণী 'মুগ্ধা'—একমুগ্ধা! সুদর্শনার ন্যায় তাঁহাতেও সংশয় আছে, মান-অভিমান এবং বিদ্রোহও আছে; কিন্তু, সে সমস্তই প্রেমের ক্ষেত্রে; কেবল প্রেমকে এক-রুদ্ধ, একেমুগ্ধ এবং ঘনীভূত করিবার জন্য! সুদর্শনার ন্যায় এতবড় অহমিকা এবং ব্যভিচার না থাকিলেও—কোনরূপে অপরের প্রতি টান এবং অন্যমুখিতা না থাকিলেও, তিনি স্বকীয় অন্তরের এবং বহিঃসংসারের নানা বিদ্রোহযুদ্ধ ও জটিল-কুটিল অরিতা এবং গম্ভীরতম বিরহ-দুর্দ্দিনের মধ্য দিয়াই প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হইতেছেন! মূল কথা এই যে, বৈষ্ণব কবির সমস্ত দার্শনিকতা উপস্থাপিত বিভাব অনুভাবের

৩১। তুলনাস্থলে, সাহিত্যের হিসাবে বৈষ্ণবকবির গম্ভীরতর ও স্ফুটতর রসনিষ্পত্তি অথচ প্রতীকভাবে পরম দার্শনিকতা।

দেহাকৃতিমধ্যে এমন ঢাকা পড়িয়াছে যে, উহাকে কোথাও 'তত্ত্ব' বলিয়া সন্দেহ হয় না—বৃন্দাবনের 'রাজাও রাণী' পরিপূর্ণ শিল্পসাহিত্যিক 'ব্যক্তিত্ব' লাভ করিয়াছেন; আমাদের আনন্দমন্দিরে ঘন সুস্থির প্রমূর্ত্তিরূপে স্থায়ীভাবে দাঁড়াইয়া আছেন! তত্ত্বাংশকেও বৈষ্ণবগণ এতাধিক সুগম ও সরল করিয়া দিয়াছেন যে, সমস্ত বঙ্গদেশের উচ্চতম কবি-দার্শনিক হইতে নিম্নতম সাধারণ ব্যক্তির সমক্ষেই উহা পরিচ্ছিন্ন আকৃতি-প্রকৃতির প্রতীকে পরিমূর্ত্ত হইয়া সমগ্র জাতিটীর হৃদয়রাজ্য দখল করিতে পারিয়াছে! যে ধর্ম্মের বা যে সংপ্রদায়ের হউন না কেন, স্বয়ং শাক্ত-শৈব-খ্রীষ্টান বা ব্রহ্মপন্থী যাহাই হউন না কেন, বাঙ্গালীর মধ্যে এমন কবি বা দার্শনিক নাই, যিনি জীবনের কোন-না-কোন মুহূর্ত্তে এই 'বৃন্দাবন রাজা ও রাণী'র দিকে মুগ্ধ দৃষ্টি না দিয়া পারিয়াছেন। এ'কালে কেহকেহ বৈষ্ণব কবির রচনাকে উহার তত্ত্বাংশ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন ভাবে, কেবল মানুষ-মানুষীর 'পিরীতকথা'রূপেই বুঝিতে চাহিতেছেন। নব্যবঙ্গের খ্রীষ্টান কবি মধুসূদন সর্ব্বপ্রথম উহার পথপ্রদর্শক। এখন অশিক্ষার গতিকে, বিশেষতঃ বিরুদ্ধপন্থী শিক্ষাপদ্ধতি ও অপরিচয়ের গতিকে, বৃন্দাবন-রাজার তত্ত্ব এ'দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকটেই বরঞ্চ দূরগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু, রাজপথের প্রত্যেক "ঝুঁটি-বাঁধা" এবং "কাছা খোলা" ভিখারী বৈষ্ণব এখনও জিজ্ঞাসু ব্যক্তির কৌতুহল চরিতার্থ করিতে পারে। অবশ্য, এ'ক্ষেত্রে অন্য তুলনা হয় না। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে একটা জাতির ধর্ম্মাত্মা ও আনন্দাত্মায় জন্মলাভ করিয়া যেই মহাভাব, শত শত কবি, দার্শনিক ও ধর্ম্মসাধকের—ফলতঃ সমগ্র জাতির হৃদয়রসে ও প্রীতি-যুক্তির উপচারে তিলে তিলে উপচিত হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তৎসঙ্গে কোন-একজন কবির ব্যক্তিগত সিদ্ধির তুলনা করা অন্যায়। আমরাও সে তুলনা করিতেছি না; কেবল শিল্পাদর্শের বলাবল আলোচনায় একটা সমজাতীয় দৃষ্টান্তের সাহায্য মাত্র গ্রহণ করিতেছি। এস্থলে দেখিতে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ নিজের নিরাকার-তন্ত্রতার ও অস্পষ্টতা-প্রীতির গতিকে কেমন করিয়া, রাজা ও

সুদর্শনার মিলনটাও অস্পষ্ট এবং সন্দিগ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। "ওই সূর্য্য উঠল" এই বলিয়া অন্ধকারপুরীর লীলা সমাপ্তি পূর্ব্বক রাজার সঙ্গে সুদর্শনার মুখামুখি ঘটাইয়া 'রাজা' কাব্যের শেষ। এই সূর্য্য বা চরমের প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তির স্বরূপ কি, সে বিষয়েই আমাদের সন্দেহ রহিয়া গেল! উহাইত গ্রন্থের চূড়ান্ত তত্ত্ব নিষ্পত্তি! উহা নিত্যকালের জন্য সংশয়িত এবং আমাদের emotion ক্ষেত্রেরও অগম্য থাকিয়া গেল! রবীন্দ্রনাথের সুদর্শনা

৩২। রাজার প্রতীক ও বৈষ্ণব প্রতীকের মধ্যে পার্থক্য।

কেবল বিজ্ঞানমার্গী, বহির্ম্মুখী এবং বিচারপন্থী। কাব্যমধ্যে রাজার প্রতি তাঁহার একবিন্দু প্রেমের দৃষ্টান্ত নাই; প্রথম হইতেই তিনি বহির্দৃশ্য রূপ-লালসায় লোলুপ এবং প্রমাণবাদিনী। পরে পরে এই রূপ-লালসা ভস্মসাৎ হইয়াছে এবং সুদর্শনা নিঃসংশয় আলোকের পুরীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, কবি ইহা জানাইতে চাহেন। সমস্ত কাব্যের মূলরীতি persuasion প্রমাণবাদ, প্রেমের উপনয়নে বা প্রেমময়ের চরণে উন্নয়নে নহে। কবিও আমাদের অন্তরাত্মাকে সে সাহায্য করিতে চাহেন না; পারেনও না। সুদর্শনা কিরূপে আলোকপুরীর যোগ্যা হইলেন, অন্ধকার পুরীর লীলা শেষ করিলেন, সে প্রত্যয়, উহার রস-প্রত্যয় এবং রসের পন্থা-প্রত্যয় আমাদের ঘটিতে পারিতেছে না; অথচ উহা না ঘটিলে সমস্ত চর্চ্চাইত একরূপ নিষ্ফল! সুদর্শনা বলিতেছেন "তুমি সুন্দর ও নহ, কুৎসিত ও নহ, তুমি অনুপম"। এই অনুপমকে গ্রহণ কবিবার জন্য আমাদের কোন ভাববৃত্তি বা স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় নাই; কবিও আমাদের কোন রসেন্দ্রিয় খুলিতে চাহেন নাই। বরঞ্চ, আমাদের বিচারবুদ্ধিকেই যেন একটা হেঁয়ালির আঘাত করিয়া জাগাইতে চাহিয়াছেন! রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' সুতরাং জড়তামুখী বুদ্ধি এবং বৈজ্ঞানিক বিচার ও প্রমাণ-বাদের ক্ষেত্র হইতে একটা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা ও তাত্ত্বিক সঙ্কেতের সাহিত্য-শিল্প—একটা সিম্বোলিক শিল্প।

শিল্প-আদর্শের দিক হইতে দেখিকে গেলে, বৈষ্ণব কবির 'রাধাকৃষ্ণ' ও একটা সিম্বোলিক শিল্প; অবশ্য, ভারতীয় সিম্বোলিক শিল্প। হাজার হাজার বৎসর হইতে, ভারতে দ্বৈত-অদ্বৈতবাদী শ্রৌত উপনিষৎ প্রতিষ্ঠার পর

হইতে, 'পৌরাণিক' নাম লক্ষণে, পুরুষ প্রকৃতির নাম লক্ষণে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার নাম লক্ষণে, শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণববাদি আদর্শের নামরূপে যেই সিম্বোলিক পদ্ধতি ভারতের ধর্ম্মে-জীবনে-সাহিত্যে সাকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে উহা তাহারই একতম। উহা তত্ত্বকে অনুগত প্রমূর্ত্তি দান করিয়া, মনোরম্য ও মনন-গম্য কল্পমূর্ত্তিতে (Symbol) স্থির করিয়া ধ্যান-ধারণা ও সম্বন্ধ-সাধনা বা প্রেম-সাধনা করিতে চায়। তবে, এই সিম্বোলিজম্ সম্পূর্ণ মীষ্টিক্ বা অধ্যাত্মবাদী। মনুষ্যকে অধ্যাত্ম জীবনে অনুভূতি এবং প্রাপ্তির পথে কার্য্যকর ভাবে সমর্থ করিবার উদ্দেশ্যেই উহার পরিকল্পনা। সুতরাং উহার ভিতরে গভীর তত্ত্ব আছে; গভীর দার্শনিকতা ও মনস্বিতা আছে; কিন্তু, তত্ত্বাংশ দেহীর কঙ্কালের ন্যায় অবলম্বিত প্রতীকের ভাবরূপ এবং নামরূপের রক্তমাংস আবরণেই আবৃত! বৈষ্ণব কবি-গণ জীব-ব্রহ্ম সম্বন্ধের এই 'রাধাকৃষ্ণ' প্রতীক অবলম্বনে বঙ্গের সাহিত্য ক্ষেত্রে অপরূপ 'পদাবলী' ও সংগীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণবের

৩৩। বৈষ্ণবের মীষ্টিসিজম্ ও সিম্বোলিজম্।

পূর্ব্বরাগ, চিত্রদর্শন, দূতীপ্রেরণ, দান, মান, গোষ্ঠ, নৌকাবিহার, অভিসার, রাস, মাথুর ও মিলন প্রভৃতির অনুপম অধ্যাত্ম-সঙ্কেত-রীতি যাঁহারা কিঞ্চিন্মাত্রও দেখিয়াছেন, নিতান্ত সাধারণ এবং অশিক্ষিত গায়কের মুখেও যাহা প্রত্যক্ষ হয়, তাঁহারা দেখিবেন, উহা সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া এবং তত্ত্বকে গৌণ করিয়াই মুখ্যভাবে গভীর রস-সাধনী শিল্প-রীতি। একদিকে, উহা ধর্ম্ম-পন্থীর মীষ্টিক রীতি; অন্যদিকে, উহা সরল সাহিত্যরসের ধারণা পথেই অধ্যাত্মরস-সাধনা লক্ষ্য করিতেছে— 'অখিল রসানন্দ মূর্ত্তি'র সঙ্গে জীব-হৃদয়ের সহজ পথে, অথচ অন্তর্গুপ্ত ভাব-পথে মিলন, গোপিনীরীতি-নিষ্ট অমৃতমিলন লক্ষ্য করিতেছে! সাহিত্য-ক্ষেত্রের 'রস'-আদর্শ এবং 'ধর্ম্ম-ক্ষেত্রীয়' 'রস-সাধন' রীতির এমন সম্মিলন জগতে আর নাই। প্রেমই অমৃত, প্রেমই বিশ্বরাজার সঙ্গে জীবের 'অমৃতমিলন' সমাধা করিতে পারে; মহাভাবময় প্রেম আপনিই চরমের 'সাধ্য' পদার্থ, অমৃতত্ত্বদায়ী পরম পদার্থ—ইহা ভারতীয়, বিশেষতঃ

গৌড়ীয় মীষ্টিকগণের সিদ্ধান্ত। প্রেমের এই মীষ্টিক বা আধ্যাত্মিক ক্ষমতার উপর, উহার লোকালোক-বিজয়িনী, 'অতিবলা' শক্তির উপর জোর দেওয়াই হইতেছে প্রকৃত Mysticism। সুতরাং বৈষ্ণবের সমক্ষে কোন বৈজ্ঞানিক বা বৈচারিক প্রণালী কিংবা ইয়োরোপের সিম্বোলিক প্রণালী কেবল বুদ্ধিবৃত্তির ব্যায়াম-রীতি ব্যতীত আর কি হইতে পারে? বৈষ্ণব কবি এইরূপে সাহিত্যিক 'রস সাধনা'র পথেও জীব-জীবনের চরম 'রস প্রাপ্তি'ই লক্ষ্য করিতেছে—পাঠক তাহার কাব্যচর্চ্চাকে এ'কালে যে ভাবেই গ্রহণ করুক। যেরূপে হউক, যে রীতি বা যে প্রমূর্ত্তি অবলম্বনেই হউক, প্রেমলাভ! বৈষ্ণব বলিবে, প্রেমই জগতের নিদানদেশের চরম তত্ত্ব এবং জীব-হৃদয়েরও উহাই স্পর্শমণি। নিজের প্রেম-স্বরূপ বা ভাবদেহের পরিপূর্ত্তি এবং পরিপুষ্টির উদ্দেশ্যেই বৈষ্ণবের ভজন-পূজন, সাহিত্যসেবা ও সঙ্গীতচর্চ্চা এবং সংকীর্ত্তন। তাঁহারা চরম 'রসেন্দ্র-সুন্দরকে' লক্ষ্য করিয়াছিলেন, ফলে, তাঁহাদের হস্তে 'সাহিত্যের সুন্দর'ও সময় সময় ধরা পড়িয়াছেন! এস্থলেই সাহিত্য-সাধনা ও অধ্যাত্ম সাধনা ফলতঃ অভিন্ন হইয়া গিয়াছে। অধ্যাত্ম দর্শনের বিশেষতঃ সাহিত্য-ভাবুকতার ক্ষেত্রে বাঙ্গালী বৈষ্ণবের একটা বিশেষ বার্ত্তা ও বিশিষ্টতন্ত্রের মীষ্টিসিজম আছে, যাহা বুঝিবার জন্য বাঙ্গালী অন্য জাতিকে আহ্বান করিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' উহারই প্রতিবেশ-পুষ্ট ও তির্য্যক্-রূপ প্রকাশ। নিজের কথাটি বাঙ্গালী এখনও আধুনিক সাহিত্য-আদর্শে প্রমূর্ত্ত করিয়া দেখাইতে পারে নাই।

জগতের সকল মূর্ত্তি উপাসনা বা তথাকথিত Idolatryর সঙ্গে ভারতীয় প্রতীক-সাধকের বিরোধ বা প্রস্থান কোথায়? এস্থলে বৈষ্ণবতার দিক হইতে স্বল্পকথায় প্রধান পার্থক্যটির বার্ত্তাও দিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের সুদর্শনা রাজাকে 'রূপের মধ্যে' দেখিতে গিয়া ভুল করিয়াছিল, ইহা রাজা কাব্যের একটা সিদ্ধান্ত এবং আধুনিক 'নিরাকার ঈশ্বর' বাদের একটা Propaganda। কিন্তু, প্রথমতঃ, ভারতীয় প্রতীকবাদীগণ রাজাকে ত যে-সে রূপে দেখিতে চায় না; 'ইষ্ট'রূপে দেখিতে

চায়। উপাস্য ইষ্টরূপে সাড়া না দিলে সাধকের হৃদয় কখনও নিঃসংশয় হয় না; তাহার "হৃদয়গ্রন্থি" ছিন্ন হয় না। মনুষ্য-হৃদয় 'অরূপে' বা আভাসে-ইঙ্গিতে কিম্বা ভাবুকতার ব্যায়ামে পরমের বিষয়ে যাহাই পাউক বা 'পাইয়াছি' মনে করুক, কিছুতেই তাহার সংশয় নাশ করিতে পারে না। সমস্তই একদা 'কল্পনার খেলা' বলিয়াই সন্দেহ হইতে থাকে। তারপর, বৈষ্ণবগণ যে বলেন, তাঁহাদের উপাস্য 'ইষ্টরূপ'ও নহে, প্রকৃত 'স্বরূপ'—সে কথা নাই বা বলিলাম। প্রতীকবাদী বলিবে 'রূপ'বাদের বিরুদ্ধে কবির এই আক্রমণ (Polemic) সম্পূর্ণ অপ্রযুক্ত ও অন্ততঃ একদিকে অব্যাপ্ত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়-বিষয়তার নামই ত 'রূপ'। সুদর্শনার রাজাকে 'শব্দ'রূপে পাইয়াও তৃপ্তি হইল না! আবার, রাজার পক্ষেও, তাঁহার 'রাণী'র নিকট 'শব্দ'-রূপে আসিতে পারিলে, দৃশ্য-রূপে আসিতেই বা কোন আপত্তি ছিল? আপত্তি কাহার? 'রাজার' না সাম্প্রদায়িক মতানুরোধের? ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ববাদী অথচ আকৃতিবিদ্বেষী খ্রীস্টতন্ত্র ও উহার শিষ্য প্রশিষ্যের! বস্তুতঃ, সিম্বোলিকশিল্পের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে, ভারতীয় সিম্বোলিক রীতির সঙ্গে উহার মিল-পার্থক্য বা বিশেষত্ব বুঝিতে, উভয়ে বল ও দুর্ব্বলতার তারতম্য বুঝিতে চাহিলেও রবীন্দ্রনাথের সিম্বোলিক উপার্জ্জনগুলিকে ঘনিষ্ঠভাবে চিন্তা করিতে হয়। কোন কবির কবিত্ব-শক্তি ও উহার প্রকাশ-প্রণালীর অভ্যন্তরে যদি অভিসন্ধি (Motive) বলিয়া কোন পদার্থ-নির্দ্দেশ সম্ভবপর হয়, তবে, বলিতে পারি যে, আকৃতিকে এবং রস-ভাবকে অস্ফুট করাই রবিকবির উদ্দেশ্য ছিল। তিনি ধর্ম্ম ক্ষেত্রে ভগবানের 'অদৃশ্যত্ব' বাদী এবং শিল্পসাহিত্য ক্ষেত্রেও সাধ্যমতে 'অরূপ' রক্ষা করিতে চাহেন। মনুষ্যের মন-বুদ্ধি কিম্বা অপর ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্র বাদ দিয়া, বরং কেবল দর্শন-ইন্দ্রিয়ের পক্ষেই অদৃশ্যতা! এজন্য, কবি তাঁহার 'অঞ্জলি'জাতীয় কবিতায়, যাবতীয় গদ্য-পদ্য, 'সারমন' ও বক্তৃতার প্রকাশক্ষেত্রে প্রকৃতপ্রস্তাবে কোনপ্রকার দৃশ্যরূপপ্রিয়

৩৪। সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের 'নিরাকার' বাদী দার্শনিকতার ফল; ভারতীয় 'প্রতীক' তন্ত্রের সহিত উহার পার্থক্য।

বা মূর্ত্তিপ্রিয় নহেন। প্রতিজ্ঞাত নিরাকার পাছে 'সাকার' বলিয়া ধরা পড়ে, এই ভয়ে তিনি যেন শিল্পের ক্ষেত্রেও সর্ব্বপ্রকার নাম-রূপ, আকৃতি বা কল্পমূর্ত্তি (Symbol) মাত্রকেই যথাসাধ্য অস্ফুট করিয়া চলিতে থাকেন, অর্থাৎ বিভাব অনুভাবকে নিত্যকাল অস্ফুট ও অস্পষ্ট করিতে (হয়ত অতর্কিতেই) বাধ্য হন। উহাই তাঁহার 'অধ্যাত্মতা,' দার্শনিকতা বা ভাবুকতা। এ পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ 'ব্রহ্ম' ভগবান বিষয়ে যাহা কিছু রচনা করিয়াছেন তাঁহার অন্তস্তত্ব ও অন্তরুদ্দেশ্য বশেই এ'জন্য সমস্তের মধ্যে একটা অমূর্ত্ত-প্রীতি ও অস্পষ্ট রীতি! বৈষ্ণবের প্রেমিকরীতি বা প্রেম প্রাপ্তিকেও পরমার্থ বলিয়া উহা কুত্রাপি অবলম্বন করে নাই। সুদর্শনা কবিরই অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার এবং বুদ্ধির প্রতিমূর্ত্তি। অতএব, ভারতীয় দৃষ্টি দেখিবে, রবীন্দ্রনাথ একশ্রেণীর 'জ্ঞানমার্গী' বা 'বিচার পন্থী'। আবার, একশ্রেণীর বৈদান্তিক যেমন 'নেতি নেতি' প্রণালীতে ব্রহ্মতত্ত্বের সাধনা করেন, রবীন্দ্রনাথ তদ্বিপরীতে, বরং বিশ্বের দিকে চাহিয়া চাহিয়া 'ইহেতি ইহেতি' প্রণালীতেই তাঁহার অনুভূতি সাধনা করিয়া চলেন; অথচ, কিছুই চাপিয়া ধরিতে বা দেখাইতে চাহেন না। সুতরাং তাঁহার সাধনাকে বলিতে পারি, এবং বলিয়া আসিয়াছি, যে উহা একপ্রকার অনুভূতি সাধনা (A development of sensibility)। কবি মুখ্যভাবে প্রকৃতির ভিতর দিয়া এই অনুভব করেন বলিয়া উহা একটা সৌন্দর্য্য-দর্শনা বা সুদর্শনা পদ্ধতি; এক রকমের রোমান্টিক রীতির Aesthetic culture. বলিয়াছি, সমজাতীয় প্রতীত হইলেও রোমান্টিকের এই যে 'অমূর্ত্ত' উহা অধ্যাত্ম-অধিকারের 'অব্যক্ত' বা ধর্ম্ম-অধিকারের 'ব্রহ্ম' হইতে নিদানতঃ সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ। একটি কেবল বাক্য-রীতি বা চিন্তারীতির লক্ষ্য, অন্যটি জীবনের অধ্যাত্ম তন্ত্র এবং চারিত্র্য-তন্ত্রের 'পরমা গতি'। রোমান্টিকতা সাহিত্য-অধিকারের রীতি বলিয়া উহার মধ্যে যে ধর্ম্ম-অধিকারের চারিত্র-বিনীতি অথবা অধ্যাত্ম-'উপসম্পদা' এবং প্রশান্তি একোদ্দিষ্টভাবে উপলক্ষিত হয় না, প্রেম-দয়া বা নিরহঙ্কার মাধুর্য্যের ধার দিয়াও যে উহা চলেনা, তাহাই মনে রাখিতে

হয়। উহা বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের একটি উপভোগতন্ত্র; উহা নিত্য নব-নব অনুভূতি-প্রিয়; সুতরাং চরিত্রের একটী চলতাধর্ম্মী চর্য্যাতন্ত্র। অতএব, উহা ভারতীয় অধ্যাত্ম-ক্ষেত্রের 'পরাগতি'-পদ্ধতি বা সাকার ঈশ্বরবাদীর 'প্রেম-ভক্তি' সাধনা ও নহে। অন্যদিকে, 'রাজা' কাব্যের অহমিকাময়ী সুদর্শনা 'প্রেমিকা' নহেন; তিনি জীবনের সংগ্রাম পথে, বিরোধ-বিগ্রহ ও দশা-বিপর্য্যয়ের ভিতরদিয়া যে 'বিনয়'-অবস্থায় পৌঁছিয়াছেন, তাহা 'দাসীত্ব' সন্দেহ নাই; কিন্তু বৈষ্ণবের প্রেম-রীতির 'দাস্য' নহে। রবীন্দ্রনাথ এই দাস্যকে জ্ঞানের দিক ব্যতীত উহার ভাবের দিকে দেখাইতেও চেষ্টা করেন নাই। এ'জন্যই উহার চূড়ান্ত বিকাশ—জ্ঞানের সূর্য্যোদয়ে। অন্ধকারপুরীর লীলা ছাড়াইয়া সুদর্শনা 'রাজা'র সঙ্গে 'চোখাচোখি'র সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দাঁড়াইলেন, উহাই চূড়ান্ত সঙ্কেত। বুঝিতে হইবে, তিনি পরিশেষে একটা দর্শন-ভূমিতে দাঁড়াইলেন—কিন্তু, কি দেখিলেন? পূর্ব্বজীবনের পরিত্যক্ত, জঘন্য 'দৃশ্য রূপ'ই কি দেখিলেন? বলিয়া আসিয়াছি, উক্ত অবস্থার উপপত্তি কিম্বা সুদর্শনার শেষ প্রাপ্তির (Emotive) পন্থা ও রসানুভূতি আমাদের জন্মিতেছে না। তবে, রবীন্দ্রনাথ 'রাজা'র পরিশেষে যেন অকস্মাৎ ও অতর্কিতে একটা নিখুঁৎ বৈষ্ণবী বার্ত্তা দিয়াছেন। "সুদর্শনার প্রেমের মধ্যেই ভগবানের আপনরূপ।" অর্থাৎ তিনি ভক্তের প্রেম-স্বরূপ। কিন্তু, 'সুদর্শনা'র প্রেমরূপকে কোন দিকে আমাদের অনুভূতি গম্য করিতে কবির আদবেই লক্ষ্য নহে। রবীন্দ্রনাথ যেস্থানে শেষ করিয়াছেন, বৈষ্ণবের 'বৃন্দাবন রাজা' সেস্থান হইতেই আরম্ভ করে। এ'জন্যই, রবীন্দ্রের সাহিত্য-রীতি বিশেষিত করিতে গিয়া বলিতে পারি যে, কবি অরূপতন্ত্রী, 'নিরাকার' বাদী; তিনি "অরূপ রতন পাওয়ার আশায় রূপসাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন"; সুতরাং তিনি সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রেও স্ফুটরূপহীন বস্তু ও ভাব-রস সাধনা করিতে চাহেন; এবং ওই অদৃশ্যতাকেই যেন অধ্যাত্মতা বলিয়া উপস্থিত করেন! তিনি 'সুরদাসের প্রার্থনা' কাটিয়া 'আখির অপরাধ' করেন, এবং কবিতার তাবৎ নাম-রূপ ও ব্যক্তিত্ব-চিহ্ন মুছিয়া ফেলেন! এই দিক হইতে যেমন তাঁহার

সাহিত্যিক রীতি তেমন 'অধ্যাত্ম' রীতিও বিভাসিত হইতে পারে। এ'কারণ তাঁহার প্রয়োগ-রীতিও যেমন রূপবাদী শিল্পীমাত্রের যথানুরূপ হৃদ্য হয় না, তেমন তাঁহার অধ্যাত্ম সমাচারগুলিও ভারতীয় ধর্ম্মতন্ত্রের 'অদ্বৈতবাদীর' কিংবা শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব-সৌর-গাণপত্যের ঘনিষ্ট মর্ম্ম-সহানুভূতি ও সাধন-সখ্য লাভ করে না। জড়তাগ্রস্ত জীবের চিৎ-জীবন বর্দ্ধিতকরার উদ্দেশ্যে এবং তাহাকে চিন্ময় জগতের অচঞ্চল অধিবাসে অভ্যস্ত করার উদ্দেশ্যেই প্রতীকতন্ত্রের পৌরাণিক ভক্তিপদ্ধতি এবং ঈশ্বর-উপাসনা স্বীকৃত হইয়াছে। এজন্য, পৌরাণিক সাধনাতন্ত্রেও ঈশ্বরের জাগতিক ঐশ্বর্য্য চিন্তাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। হৃদয়ের ভাবস্থিতি অথবা চিত্তের কেন্দ্রস্থিতির প্রতিবন্ধক কোনপ্রকার দীর্ঘবাক্য অথবা বিস্তারিত চিন্তাপ্রণালী পসন্দ করে না বলিয়া এ'দেশের ঈশ্বর-উপাসকের মুখ্য অবলম্বন হইতেছে মন্ত্র। মনকে ধ্বনির ক্ষেত্রেও সূক্ষ্মতানিষ্ঠ ও প্রবিষ্ট করার সাহায্যেই মন্ত্র।

বুঝিতে হইবে, মনোবুদ্ধির চাঞ্চল্যকরী ও 'নাচারী' পদ্ধতি গতিকেই কবির 'অঞ্জলি'রীতির সঙ্গীত ও কবিতা চিত্তের রসাপ্লুত সৌখ্য-নর্ত্তনের বিশেষত্বে অতুলনীয় এবং মনোহারী হইলেও এ'দেশের অধ্যাত্ম-সাধক বা ভক্তের প্রকৃত 'সখ্য' লাভ করিতে পারিতেছে না। সাহিত্য-তন্ত্রের বাহিরে উহারা যে এ'দেশে অধ্যাত্ম শক্তি প্রকাশ করিতে পারে নাই তাহার হেতু নিরূপণ করিতে গিয়া বলিব, উহাদের প্রয়োগ রীতি, বহির্ম্মুখী পদ্ধতি, বহির্ম্মুখ রসাত্মা! উহাদের নিসর্গ-সৌন্দর্য্যমুখী এবং বহিরৈশ্বর্য্যমুখী ও ধৃতি-চঞ্চল ভজনরীতির সঙ্গেও যেন এ'দেশের স্থিরলক্ষ্য-নিষ্ঠ এবং চিণ্ময়রূপ-নিষ্ঠ ধ্যান পন্থার অন্তর্যোগ নাই। আবার, তিনি প্রকৃতির রূপের ভিতর দিয়াই 'অরূপকে' খোঁজেন বলিয়া উহা ভারতের "শুদ্ধ নিরাকারবাদী" বা "নির্গুণ ব্রহ্মসাধক" বৈদান্তিকগণের ও হৃদ্য হয় না। যাঁহারা প্রকৃতির নাম-রূপকে ডিঙ্গাইয়া জ্ঞানাতীত-ভাবাতীত ও অরূপধামে আত্মপ্রয়াণ সিদ্ধি করিতে চাহেন অথবা 'আত্মারাম' হইতে চাহেন, তাঁহাদের সঙ্গে ঐশ্বর্য্যচিন্তনী

ভজনরীতির প্রবল বিরোধ ও পরিপন্থিতা। সুতরাং, দেখা যাইবে, অধ্যাত্মক্ষেত্রেও জগতের জ্ঞানপথিক বা ভক্তিপথিক মীষ্টিক (ভারতের যোগবাশিষ্ট ও শ্রীমদ্‌ভাগবৎ যে দুইটী পথ অধিকার করে) কবি তাঁহাদের কেহ নহেন। সাহিত্যরসিকের পক্ষে কোন কবির ধর্ম্মধাতুর স্বরূপ বা উহার ইতরবিশেষ চিন্তা করার আবশ্যক হয় না। বুঝিতে হইবে, স্ব-ক্ষেত্রে কাব্যে-সঙ্গীতে ব্রহ্মপন্থী বা 'ব্রহ্ম'-ভাবুকতার সাধক রবীন্দ্রনাথ কবি; তিনি স্বতন্ত্র অনুভববাদী। বলিতে পারি, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-অনুভূতি পথে তিনি ভগবানের লীলারস-জীবী এবং মৌলিকতাবিশিষ্ট কবি। অবশ্য, তাঁহার স্বজাতি ও স্বধর্ম্মী সাহিত্যক্ষেত্রে অনেক আছেন। তিনি সৌন্দর্য্য-সুদর্শনা রীতির পথে বিশ্বের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আনন্দানুভূতির সাধক ও নিসর্গ-রমণ কবি। এই আনন্দের মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা ও ভগবত্তা-দর্শনী ভাবুকতাই কবির প্রধান বিশেষত্ব। ওয়ার্ডসোয়ার্থ ও শেলী প্রভৃতির 'ভাবুক' বা idealist দৃষ্টির ন্যায় রবীন্দ্র নাথও 'ভাবুকতা'র দৃষ্টিতে নিসর্গের 'দিব্যতা' এবং ঐ ক্ষেত্রে পাঠকের 'দিব্যানুভূতি' অনেক অগ্রসর করিয়া দিতেছেন। এদিকেই তিনি অনুপম।

প্রোক্তরূপে বুঝিতে চাহিলাম যে, মীষ্টিক বা সিম্বোলিক রীতি সাহিত্যে একটা 'প্রকাশের আদর্শ' ও বাক্যরীতি মাত্র; উক্ত রীতির নাম দিতে পারা যায় বরং Mystification; Mysticism নহে। অদ্বৈত-বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত, জগতের বহুত্বমধ্যে ঐক্য-দৃষ্টি ও একত্বের অনুভূতি ব্যতীতও প্রকৃত মীষ্টিসিজম হয় না। জড়বাদী, সংশয়ী কিংবা অবিশ্বাসীকে ভাবিত করিতে হইলে, তাহার মনে অধ্যাত্ম তত্ত্বের অস্পষ্ট ঈষারা ও ইঙ্গিতের 'আনছানি' হাওয়া পরিচালিত করিয়া সন্তর্পনে মনের জড়তাকে ন্যূনাধিক আঘাত পূর্ব্বক তত্ত্বজিজ্ঞাসার অভিমুখে তাহাকে জাগাইতে হইলে সিম্বোলিক ছল-রীতির হয়ত সাফল্য আছে। এইরূপে মেতরলিঙ্ক্ ইয়োরোপে জড়বাদীর সংশয়-দৃষ্টিতে 'একটা-কিছু-থাকা'র ঈষারা দিয়াই কবিযশঃ লাভ করিয়াছেন। যে সত্য প্রকাশ্যভাবে উপন্যস্ত হইলে তৎক্ষণেই অগ্রাহ্য

হইত—আস্তে আস্তে, 'ভোগা দিয়া', গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে যেন তাহারই উপন্যাস! এককথায়, ইয়োরোপের সিম্বোলিজম মাত্রেই সন্দেহবুদ্ধির সমক্ষে একটা সসঙ্কোচ ছলনা ও ব্যাজরীতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। অবিশ্বাসীর বিচারমার্গে বা তাত্ত্বিক অন্বেষণার ক্ষেত্রে হয়ত উহার যোগ্যতা আছে; কিন্তু, সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রে যে পরিমাণে উহা কেবল বৈচারিক ও বুদ্ধিপ্রধান না হইয়াই রসাত্মক হইতে পারে, সে পরিমাণেই উহার শক্তি। শিল্পের ক্ষেত্রে রস-রক্ত-মাংসহীন সিম্বোল মাত্রেই দুর্ব্বলতা; উহা হয় একটা কঙ্কাল, না হয় অশরীর অপচ্ছায়া। শিল্পের ক্ষেত্রে intellectuality বা অতিরিক্ত বোধায়ণী সিদ্ধি মাত্রেও দুর্ব্বলতা। যেমন, ইংরাজীসাহিত্যে পোপের কবিতা—শাণিত, বুদ্ধিদীপ্ত, বিচারমার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ! কেন—তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যাহা মুখ্যভাবে বিচার-বুদ্ধি সমক্ষেই উপস্থাপিত হইতেছে, পাঠকের বৈচারিকী বুদ্ধিই ত উহাকে ভালমন্দ বিচারপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে! তাহার হৃদয় কিংবা রসেন্দ্রিয় সে ব্যাপারে ন্যূনাধিক ঘুমাইয়া থাকিবে। কাব্যের মর্ম্মদেশে রস-জন্মা ও হৃদয়ঙ্গমা শক্তি না জাগাইয়া কেবল বৈয়াকরণী পরীক্ষা, বৈজ্ঞানিক কৌতুহল অথবা নৈয়ায়িক বাদার্থের দ্বারেই উহাকে গ্রহণ করার জন্য পাঠককে উত্তেজনা! উহার ফলে কাব্যের রস-লক্ষ্য এবং রসাত্মার ক্ষতি; অনেক সময় একেবারে ধ্বংস! কাব্যের পক্ষে যাহা একেবারে সাংঘাতিক, 'মহতীবিনষ্টি'! দুর্ব্বলতা বলিয়াই 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' দার্শনিক প্রসঙ্গ হিসাবে অনবদ্য হইয়াও সাহিত্যশিল্প হিসাবে এত প্রাণহীন! স্পেন্সার নাকি তাঁহার Fairy queenকে এলিজাবেথ-যুগের সমাজ ও রাষ্ট্রতন্ত্রের একটা Allegory বলিতে চাহিয়াছিলেন। সাহিত্য-জগৎ জোর করিয়া তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে, "কবি, ও কথা বলিওনা; তুমি যে রসানন্দ মূর্ত্তির সৃষ্টি করিয়াছ, আমরা তাহাই গ্রহণ করিতে এবং উপভোগ করিতে চাই!" সাহিত্যে তত্ত্ব থাকে, না থাকিয়া পারে না। কারণ, তত্ত্বের অপর নামই সত্য; এবং সত্য ব্যতিরিক্ত কোন ভাবস্ফূর্ত্তি,

৩৫। সাহিত্যে প্রতীকবাদ বা তত্ত্ববাদিতা কি পরিমাণে সফল ও সহ্য হইতে পারে।

কোন রস-মূর্ত্তি জন্মিতে এবং দাঁড়াইতে পারে না। কিন্তু, সাহিত্যে তত্ত্ব দেহাবৃত; সুতরাং গৌণ। গৌণকে মুখ্য করিয়া উপস্থাপিত করিতে যাওয়াই শিল্পক্ষেত্রে নিদারুণ ভ্রম ও ব্যভিচার। রূপক ও সিম্বোলিক রচনা উহাদের রীতিগতিকেই অনেক সময় এই দোষে না পড়িয়া পারে না। আত্মার দেহ-অবলম্বনটি হরণ করিলেই, উহার নাম হয় 'হত্যা'। বিভাবাদিকে অস্পষ্ট, বিকলাঙ্গ বা অল্লাঙ্গ করিলে কাব্যের রসাত্মারই ক্ষতি। কাব্যের বস্ত্রহরণ! প্রসিদ্ধ কথা-শিল্পী লীটন 'জেনোনী' রচনা করিয়া আমাদিগকে একটা প্রশংসনীয় রসমূর্ত্তির সঙ্গে পরিচিত করিয়াছেন। কিন্তু, পরিশিষ্টে উহার বস্ত্রহরণ করিতে চাহিয়াছেন—স্বয়ং কাব্যটিকে হত্যা করিয়াছেন! উহা যে একটা ঘনগভীর ও প্রচণ্ড তত্ত্বকথা, নিদারুণ নির্দ্দয়ভাবে তাহা আমাদের গলাধঃ করাইতে চেষ্টিত হইয়াছেন! বলা বাহুল্য, ওইরূপ তত্ত্ববার্ত্তা 'জেনোনী' নিজের শিল্পশরীরে সাধন করিতে পারে নাই; উহা তত্ত্বের পরিব্যক্ত 'শরীর' হইতে পারে নাই বলিয়াই লীটনের ব্যাখ্যা-চেষ্টাকে 'হত্যা' বলিতে বাধ্য হইতেছি। জরথস্ত্রের ভাষায়, "কাব্য হইবে Apparent Picture of unapparent realities।" রূপক কাব্যের অন্তরাত্মা যদি স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই সহৃদয়ের অনুভূতিগম্য না হয়, তখন বুঝিতে হইবে, উহা রূপক হিসাবে ব্যর্থ হইয়াছে; পুনর্ব্বার কাব্যহিসাবেও উহাকে ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করা, তত্ত্বস্বরূপ বলিয়া বুঝাইতে গিয়া উহার রসাত্মাকে খণ্ডিত করা, শিল্পীর পক্ষে নিদারুণ ভ্রম। সাধারণ ভাবে বলিতে পারা যায় যে, বিস্তারিত রূপক কিংবা সিম্বোলিক কাব্য সাহিত্য ক্ষেত্রে সর্ব্বত্র ন্যূনাধিক বিফল হইয়াছে। রূপকের শিল্পিগণ তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। অতএব, আধুনিক কালে, প্রাচীন 'রূপক'ই সিম্বোলিক-শিল্পের ক্ষুদ্র পরিসর এবং স্বল্পনিশ্বাসী রসাভাস ও ক্ষীণজীবী 'রূপ' উপস্থাপনে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চাহিতেছে। এ ক্ষেত্রে নির্ভয়ে বলিতে পারা যায় যে, এই শিল্প যে পর্য্যন্ত বস্তুধারণার ক্ষণিকা রীতি এবং কণিকা-প্রীতি আশ্রয়ে ভাবসিদ্ধি করিয়া চলিতে পারে, সে পর্য্যন্তই উহা সুস্থ হয়। মানুষের চিত্তকে বিস্তারিত ও দীর্ঘায়ত

ভাবে ছায়াগ্রাহী এবং রসবিদ্রোহী রূপকের দ্বারা তত্ত্বসমৃদ্ধ করিতে গেলেই উহা রসহত্যা করিয়া বিফল হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্র কবিতা ও গীতিকবিতাগুলি উহাদের মাহাত্ম্যস্থলে শিল্পক্ষেত্রের এ সত্যটাই প্রমাণিত করে। পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কোন সবিতর্ক সিম্বোলপ্রীতি ছিলনা; 'পাঞ্চভৌতিক ডায়ারী'তে 'বিদায়-অভিশাপ' কবিতার আলোচনায় উহারই আভাস পাই। 'ভানুসিংহের পদাবলী'তে তত্ত্ববাদী হইবার সুযোগ সত্ত্বেও তিনি সে'পথ অবলম্বন করেন নাই। 'সোনার তরী'র যুগ হইতেই তাঁহার মধ্যে ইয়োরোপীয় 'সিম্বোলিক' আদর্শের প্রভাব লক্ষিত হইবে। উহার প্রবেশিকা কবিতাটী পাঠ করিলেই বুঝিবেন, তাহার অনুভাব, বিভাব ও সঞ্চারী ভাব কত অস্ফুট, কত বিকলাঙ্গ; নানাদিকে অর্থের কত বিরোধ ও বিরোধাভাসে পূর্ণ! কবিতাটি 'সোনারতরী' কাব্যের মুখবন্ধ; সুতরাং 'সোনার ধান' যে কবিত্ব-কর্ষণার কাব্যফসল এবং কবি নিজে যে উহাকে তাঁহার "সোনার ধান" বা (তাঁহার মানসীর মুখবন্ধের ন্যায়) তৎকালের "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশ" বলিয়াই মনে করেন, সেকথা ইঙ্গিত করিতে অথচ (বিনয় পূর্ব্বক) চাপিতে-ঢাকিতেও চাহেন। ইহাই কবিতাটীর 'সঙ্কেতিত' অর্থ; সন্দেহ হয় না। কিন্তু কবি উহাকে এত 'চাপা-ঢাকা' দিতে চাহিয়াছেন যে, তাহা সাজ্ঘাতিক হইয়াছে। কবি তাঁহার 'সোনার ধান' কাহাকে দিতেছেন, কেন দিতেছেন, কেনই বা স্বয়ং পাসিন্দার হইতে চাহিলেন, কে কোথায় কোন উদ্দেশে উহা লইয়া চলিতেছে, সে সমস্ত বৃত্তান্ত প্রসঙ্গিত করিয়াই আবার, (দৃষ্টতঃ একটা Local colour বা 'স্থানীয় বর্ণিমা' দিতে গিয়া) ইচ্ছাপূর্ব্বক অস্ফুট রাখার দরুণ কবিতাটীর আসল অর্থ সন্দেহাচ্ছন্ন হইয়াছে; রসাত্মা জমিতে পারে নাই। উহা আমাদের কোন Emotion কে, হৃদয়ের কোন প্রকার মহার্ঘ-দুর্লভ ভাবকে জাগরিত কিংবা সঙ্কেতিত করিতেও পারিতেছে না বলিয়াই উহার 'রস' অস্ফুট, দুর্ব্বল। উহার প্রধান গুণ এই যে, উহা লাচারীমিশ্র

৩৬। 'সোনারতরী' কবিতায় বিভাব অনুভাব ও ভাবের দুর্ব্বলতা এবং অস্ফুটতা জনিত ফল।

ছন্দোবন্ধে আমাদের বাহিরের কাণের স্নায়ুতন্ত্রে একটা 'সঙ্গীত কোটার' মিষ্টমধুর কম্পন জাগাইয়া বিশেষভাবে স্নায়বিক সুখ সাধন করিতে চাহিয়াছে। কবি বলিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার 'যাহা-ছিল' লইয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবিতার ভরাতরী কালবক্ষে ভাসিয়া চলিল! কিন্তু, কবির প্রয়োগফলে, মুখ্য হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে, কেবল কাহাকেও একটা 'দেওয়া' ও স্বয়ং যাওয়ার একটা নিষ্ফল চেষ্টা। উক্ত দানের কোন মাহাত্ম্য-লক্ষণও আমাদের চিত্তে স্ফুট করার লক্ষ্য নাই। 'দেওয়া'টাই একটা কবিত্ব-সুন্দর, মহার্থ কর্ম্ম নহে। কোন্ আদর্শে, কোন্ উদ্দেশ্যে, কাহাকে দেওয়া হইতেছে তাহা অস্ফুট থাকায় উক্ত 'দানে'র কোন মাহাত্ম্য পরিস্ফুট হইতে পারিতেছে না।. উহা তত্ত্বজীবী ব্যক্তিকে যেমন কোন বৈশিষ্টময় দানের তত্ব উপস্থিত করিয়া সুখী করিতে পারিতেছে না, তেমন ভাবজীবী ব্যক্তিকেও কোন মহত্বময় বদান্যতার 'ভাবস্পর্শে' আনন্দিত করিতে পারিতেছে না! এরূপে, কবিতাটীর অন্তরাত্মায় কোন মহার্থ-গভীর তত্ত্ব কিংবা ভাব স্ফুট হইতে না পারায়, পাঠকের সমক্ষে, সুতরাং তাহার সকল শ্রুতিসুখ ও 'ভাল লাগার' সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুটতা ও অনর্থতার একটা 'ভাল-না-লাগা' নিত্যযুক্ত আছে। উহার মধ্যে কবির আত্মবিশেষণা ব্যতীত অন্য কোন 'পরমার্থ' নাই। অথচ, উক্ত সমস্ত অবান্তর কথা ও বৃত্তান্ত-সঙ্কেতের অসঙ্গত রেখাতেই উদ্ভ্রান্ত হইয়া কবিতাটীর বুকচেরা 'আধ্যাত্মিক অর্থ' আবিষ্কারের দুরাশায় কত কত মনস্বী ব্যক্তি হয়রাণ হইয়াছেন! এস্থলেই হইল নিখুঁত ইয়োরোপীয় রীতির সিম্বোলিকা; আগন্তুক ও অবান্তর রেখাপাতে আসল অর্থগুপ্তির কবিতা। উহার নাম দেওয়া যায় বরং 'গোপনিকা'। যাহোক, ইহাকেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে সঙ্গীত-তন্ত্রের 'স্নায়বিক' সৌখ্য-সাধন রীতির 'অনধিকার প্রবেশ' বলিয়া অঙ্গুলিপ্রদর্শনে নির্দ্দেশ করিতে পারি। কবিতাটির 'ভাললাগা' বিশেষ ভাবে কেবল শব্দ-স্পন্দ এবং ছন্দোবন্ধ হইতেই উপজাত! কাব্য নিজের ছন্দ-তন্ত্রে ওই প্রকার আনন্দকেও কিয়ৎ-পরিমাণে লক্ষ্য করে সত্য, কিন্তু, কদাপি অর্থবিস্মৃত ভাবে বা মুখ্যভাবে

করে না। সাহিত্য 'বাগর্থ প্রতিপত্তি'র রাজ্য; সার্থক বাক্যের প্রণালীতে বিভাব আদির সাহায্যে ভাব উদ্রিক্ত করিয়া, স্থায়ীভাবে পরিব্যক্ত 'রস সিদ্ধি' করাই ত সাহিত্যের লক্ষ্য! সাহিত্যে 'শব্দ' ও 'অর্থ' নামক দুইটী পরিব্যাপক কথার আমল বুঝিতে না পারিয়া অনেকে এই সংজ্ঞার্থ-বোধে ভুল করেন। উহাতে সাহিত্য অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া গেল আশঙ্কাতেই যেন ভীত হ'ন। অর্থ বলিতে অখিল সংসারের যাবতীয় পদার্থ, যাবতায় কর্ত্তা-কর্ম্ম-ক্রিয়া, নিখিল চিন্তা-ভাব ও ভাবুকতা, শব্দের সাক্ষাৎ বা সুদূরসঙ্কেতী ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা ও অনুরণনের যাবতীয় লক্ষ্যই ত উদ্দিষ্ট হইতেছে! এজন্য, সাহিত্যের প্রবেশকামী পাঠক এবং শিল্পীমাত্রের পক্ষেই 'শব্দার্থপ্রতিপত্তি' গোড়ার কথা। বুঝিতে হইবে, অর্থের সংগোপিকা রীতি কিংবা হিজিবিজি অর্থবাদের আদর্শে মৈতর্লিঙ্ক সিম্বালিক শিল্প অতিরিক্ত হইলে কোন প্রশংসনীয় প্রাপ্তিরূপে ত দাঁড়াইতেই পারে না, পরন্তু, সাহিত্যের ভিত্তিটাই ধ্বংস করিতে চায়।

৩৭। সাহিত্যতত্ত্বে সঙ্গীত আদর্শের অনধিকার প্রবেশ।

গ

বিস্তারিত কাব্য কিংবা নাটকের ক্ষেত্রে সিম্বোল-শিল্প কিরূপে ব্যর্থ ও বিরস হইবার সম্ভাবনা আছে তাহা দেখিয়া আসিলাম; এখন 'প্রদূষক' নাটকের ক্ষেত্রেও যে উহা কিরূপে বেগতিক হইতে পারে, তাহা দেখিব। বঙ্গ-সাহিত্যে 'আচলায়তন' ও 'মুক্তধারা' দুইটী সিম্বোলিক রীতির প্রদূষক নাটক। দেখিতে পারিব, প্রদূষক রীতি গতিকেই উহাদের উদ্দিষ্ট স্থায়ীভাব কিরূপে বিকল ও দুর্ব্বল হইয়াছে। 'প্রদূষক' নাটক বলিতে আমরা ইব্‌সেনের শেষবয়সের সমাজ-সমালোচনী নাটিকাগুলির প্রকৃতিই লক্ষ্য করিতেছি। উহারা প্রাচীন আদর্শের comedy নহে—farce (প্রহসন) ও নহে। উহারা অত্যন্ত serious বা তত্ত্ব-ভাবক। ইব্‌সেনের পর জর্ণ্‌সন্, সুইডেনের

৩৮। প্রদূষক নাটকের ক্ষেত্রেও সিম্বোলিক রীতির দুর্ব্বলতার কারণ, অপরিস্ফুট বিভাব ও অনুভাব।

ষ্ট্রীণ্ড্‌বার্গ্‌ ও ইংলণ্ডের বার্ণার্ড্‌শ ও গল্‌স্‌-ওয়ার্দ্দী প্রভৃতি নিজনিজ সমাজের দোষবিশেষ আক্রমণ পূর্ব্বক এই আদর্শের অনেক নাটক রচনা করিয়াছেন। বুঝিতে হইবে, এ প্রকার নাটকে, উহাদের সামর্থ্য এবং উৎকর্ষের স্থলে, তাঁহারা কদাপি সিম্বোলিকরীতি অনুসরণ করেন নাই; করিতে গেলেই তাঁহাদের শিল্পচেষ্টা ব্যর্থ ও বিরস না হইয়া পারে নাই। বলিতে চাই যে, প্রদূষক নাটক যখনই সমাজের দোষদর্শনরূপ লক্ষ্য সিদ্ধি করিয়াছে—তখনি উহা কোন একটী বিশেষ দোষের আলোচনা বা আক্রমণ পথেই করিয়াছে; কুত্রাপি সামান্যকথনের প্রণালীতে করে নাই। আক্রমণ করিতে হইলে নামরূপে নির্দ্দিষ্ট কুমন্ত্র-কুতন্ত্র বা কু-আচারকেই আক্রমণ করিতে হয়; কেবল 'দোষ' নামক একটা অনির্দ্দিষ্ট, অস্পষ্ট ও সামান্যার্থক তত্ত্বকে লক্ষ্য করিলেই কাব্যের স্থায়ীভাব অস্পষ্ট হইয়া এবং রসলক্ষ্য প্রহত হইয়া যায়। বঙ্গসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' ও 'মুক্তধারা' সিম্বোলিক আদর্শে অস্পষ্টভাবে সমাজের দোষ দর্শন করিতে গিয়াই দুর্ব্বল হইয়াছে। প্রথমতঃ, কোন বড় কবির পক্ষে মুখ্যভাবে প্রদূষক নাটক রচনা করিতে যাওয়াই একটা আদর্শভ্রম ও কবিত্বশক্তির অপব্যবহার বলিয়াই আমাদের ধারণা। কবিকে মনঃপ্রাণে বুঝিতে হয় যে, সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্ববলিষ্ঠ সংস্কারক। কবিকে মুখ্যভাবে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিই লক্ষ্য করিতে হয়; না করিলে কাব্যে স্থায়ীভাবের কৌলিন্য-হানি ঘটে; উহার রসাত্মাও নিম্নজাতীয় হইয়া দাঁড়ায়। অবশ্য, কবিও সমাজসেবক, সমাজের সংস্কারক এবং সমাজের শিক্ষক; কিন্তু, তাঁহাকে প্রকটভাবে কষায়িতনেত্র এবং বেত্রহস্ত দেখিলে আমাদের হৃদয়ের উচ্চবৃত্তি সমূহ (যেমন, হৃদয়ের প্রেম ভক্তি) কোন পুণ্য অবলম্বন ত পাইতেই পারে না; বরং প্রদূষণ-পদ্ধতির পক্ষে অপরিহার্য্য তীক্ষ্ণতা-কর্কশতা ও হিংস্রতার ধর্ম্মটাই মুখর এবং শৃঙ্গধর হইয়া উঠিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তিকে 'তাড়া করিতে' থাকে! শেকস্‌পীয়রের উচ্চশ্রেণীর 'বৈহাসিক নাটক' বা কমেডিগুলিতে কিংবা রবীন্দ্রনাথের

৩৯। প্রকৃত কবির পক্ষে কর্ম্ম ও অকর্ম্ম।

'চিরকুমার সভা'র কবির প্রতি যে একটা নর্ম্মমধুর ও পরিহাস-রসোজ্জল বন্ধুতা সঞ্চারিত হয়, প্রদূষক নাটকে তাহারও আমল নাই। ইব্‌সেনের প্রদূষক নাটকগুলি হইতে তাঁহার তীব্র-কঠোর, সূক্ষ্মরুক্ষ, শাণিত বুদ্ধি ও দোষদর্শনী ছুরিকার মর্ম্মান্তিক ধারটাই আমাদের প্রতীতি-ক্ষেত্রে জাগিয়া উঠে; তাঁহার দিকে প্রেমভক্তির অবকাশই ঘটে না। মনুষ্যের প্রেমভক্তি-প্রয়াসী কবির পক্ষে ছুরিকাহস্ত হইয়া প্রকট হওয়াটা একটা অপকর্ম্ম বলিয়াই মনে হয়। কবি মুখ্যভাবে সৌন্দর্য্যস্রষ্টা ও সৌন্দর্য্যের সাধক হইবেন। সাহিত্যে সৌন্দর্য্য আপনার দীপ্তিশক্তিতেই তাবৎ কুৎসিতের এবং পাপের বিপক্ষে একটা পরম বীর্য্যধর ও বিনাশন পদার্থ। সৌন্দর্য্যসাধক কবির আনন্দাত্মাই উহার প্রধান প্রমাণ। তিনি সুন্দর-কুৎসিতের দ্বন্দ্ববিষয় অবশ্যই শিল্পক্ষেত্রে অবলম্বন করিতে পারেন—কিন্তু, তাঁহার প্রধান লক্ষ্য থাকিবে, অস্খলিত লক্ষ্য থাকিবে, গুপ্ত বা প্রত্যক্ষভাবে কুৎসিতের পরাজয় তত্ত্ব। উহা সিদ্ধ করিতে না পারিলে, তাঁহার পক্ষে অসুন্দর এবং জুগুপ্‌সিত বিষয় স্পর্শ করাই যে অকর্ম্ম! উহা করিতে না পারিলেই তিনি কাব্যের অমৃতপিপাসী রসাত্মার প্রতি অবিচার করিবেন; নিজের কবি-আত্মার প্রতিও অবিচার করিবেন। যাহোক, এস্থলে অবশ্য কোনও কবির নিজের বিষয়নির্ব্বাচনের ঝোঁক এবং অভিরুচির কথা। অচলায়তনের শিল্পতন্ত্রে সৌন্দর্য্যসাধক, কবি রবীন্দ্রনাথ সমাজের দিকে রুক্ষ এবং 'নাছোড়বান্দা' ছুরিকা হস্তে দাঁড়াইয়াছেন। সমাজের দোষের বিরুদ্ধে ছুরী! সমাজের বিষ-ক্ষতের উপরে অস্ত্রচালনা! ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত অভিরুচি; এবং সমাজসংস্কার একটি সদুদ্দেশ্য বলিয়া উহা নিন্দনীয় নহে। কিন্তু, তিনি কোনও দোষ লক্ষ্য করিয়া উহাকে কাটিতে পারিয়াছেন কি? অন্ততঃ, উহার দিকে অস্ত্রচালনা করিতে পারিয়াছেন কি? অন্য কথায়, তিনি 'অচলায়তন'রূপ প্রদূষক নাট্যশিল্পে সমাজের কোন দোষের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে এবং উহার দিকে আমাদের বিরোধ-বিদ্রোহ কিংবা বিরূপ মতি অথবা জুগুপ্‌সাপূর্ণ বিরতি সাধিত করিয়া উক্ত

শিল্পের স্থায়ীভাব সিদ্ধ করিতে পারিয়াছেন কি? না পারিলে, কেন পারেন নাই? ইহাই হইল শিল্পতন্ত্রের দিক্ হইতে, সাহিত্যদর্শনের দিক্ হইতে জিজ্ঞাস্য।

৪০। অস্ফুট বস্তুতার দরুণ 'অচলায়তন' নাটকের শিল্পতা ও রসনিষ্পত্তি।

'অচলায়তন' নাটকে কবি সমাজের 'অচল' শাস্ত্রবাদ, মন্ত্রবাদ ও আচারবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন ও দেওয়াল ভাঙ্গিয়া আয়তনের উপর বাহিরের আলোক পাত দেখাইতে চাহিয়াছেন। ফলতঃ, সেইদিকে আমাদের বিচারবুদ্ধি ও ক্রিয়াশক্তিকে জাগাইয়া আমাদিগকে ধ্বংস বা সংস্কারের কার্য্যে কর্ম্মী করিতে চাহিয়াছেন। এখন, এই 'শাস্ত্র' 'মন্ত্র' ও 'আচার' বলিতে সামান্যভাবে যাহা বুঝায়, তাহার উপরেই ত মনুষ্য-সভ্যতার ভিত্তি; 'মনুষ্যত্ব' নামক আদর্শের প্রধান অবলম্বন; উহার উন্নতি এবং গতিশক্তির প্রধান বল! পূর্ব্বপুরুষের অভিজ্ঞতা যাহা হাতে আসিয়াছে, তাহাই বর্ত্তমান পুরুষের 'শাস্ত্র'। ঐরূপে, প্রত্যেক জীবনের গতকল্য পর্য্যন্ত উপার্জ্জিত অভিজ্ঞতাই অদ্যকার বা আগামী জীবনের 'শাস্ত্র'। যেমন, Thou shouldst not commit adultery—ব্যভিচার করিওনা, একটা শাস্ত্র। আর বহু মনুষ্যের মধ্যে ধর্ম্মক্ষেত্রে একটা সম্মিলন তন্ত্র, বহু লোকের ব্যক্তিগত বহুমুখতা সত্ত্বেও উপাসনাক্ষেত্রে একটা ঐক্যসম্পাদক সুস্থির অবলম্বনের নামই ত মন্ত্র—যেমন, 'Father who art in Heaven' ইত্যাদি, বা 'অসতো বা সদ্গময়' ইত্যাদি, বা 'অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও' ইত্যাদি, মন্ত্র। সেরূপ, সমাজে বা অধ্যাত্ম জীবনে একটা সাধু আদর্শ ও ঐক্যনিষ্ঠ ক্রিয়াচর্য্যার নিরূপণই ত হইতেছে আচার! যেমন, নিজের আসন্ন বা রক্তসম্পর্কিত ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহসম্বন্ধে অথবা যৌনসম্বন্ধে সংস্পৃষ্ট হইবে না; ইহা একটা সদাচার। এজাতীয় অসংখ্য শাস্ত্র-মন্ত্র ও আচার তন্ত্রের উপরেই মনুষ্যের সভ্যতা, সাধুতা, ধার্ম্মিকতা ও পুণ্যের আদর্শ, এক কথায়, 'মনুষ্যত্ব' নামক আদর্শ পৃথিবীতে দাঁড়াইয়াছে। 'দাঁড়াইয়াছে' বলাও একটা ভুল—অবশ্য একটা অপরিহার্য্য এবং 'সর্ব্বজনিক'

ব্যাকরণভুল। কেননা, জগতে 'দাঁড়ানো' এবং 'অচল' হইয়া থাকা বলিয়া কোন ভাব প্রকৃত প্রস্তাবে নাই। পৃথিবী প্রতি মুহূর্ত্তেই চলিতেছেন; অথচ, প্রতীয়মান অগতি লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার নামকরণ হইয়াছে 'অচলা'। প্রতীয়মান 'অচলতা' বা 'সনাতনতা'র মধ্যেই বিশ্ব সংসার চলিতেছে; ইহা কেবল truth নহে একটা truism। এজন্য, মানুষ উহার কথা উত্থাপন কিংবা চিন্তা করাও আবশ্যক মনে করে না। উহা জীবনের 'বৃহৎ বন্ধনী'; আদর্শ মাত্রের এবং সকল শাস্ত্র-মন্ত্র এবং আচারতন্ত্রের বাহিরেই একটা 'বৃহৎ বন্ধনী'। জগতের অনিচ্ছাকৃত বৃহৎ বন্ধনী।

মনুষ্য একটা উদ্দেশ্যকে মানিয়া চলে; একটা প্রয়োজনকে লক্ষ্য করিয়া চলে। এখন, এই প্রয়োজন, উদ্দেশ্য, স্থিরতা বা আদর্শ ইত্যাদি, বলিতে পারি, সমস্তই এক একটা প্রতীয়মান "অচল" বস্তু। স্থির ধারণার কিংবা পরিস্ফুট চিন্তার বিষয় হইয়া আসিলেই ত উহা 'অচল' হইয়া গেল! সুতরাং জগতের পদার্থমাত্রেই, মনুষ্যের চিন্তাগম্য ও বুদ্ধিসাধ্য আদর্শমাত্রেই, বলিতে পারি, এক একটা 'অচলায়তন'; স্বয়ং জগৎটাই অনিচ্ছাকৃত ও অবিরাম চলার মধ্যে, আমাদের ধারণার ক্ষেত্রে একটা 'অচলায়তন'।

এখন, কবি 'অচলায়তন' বলিতে যে কোন পর্ব্বতের উপরে নির্ম্মিত সন্ন্যাসীর আখেড়া উদ্দেশ্য করেন নাই, তাহা ত নিশ্চিত! তিনি উক্ত নামে অচলতা বা স্থির আদর্শকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু, তাঁহার এই প্রদূষক নাটকের ও উহার অবলম্বিত দূষণী রীতির উদ্দেশ্য কি? তিনি কি বিশ্ব-সংসাররূপ অনুভূতির পদার্থকে ধ্বংস করিতে চাহেন, অথবা যে-কোন শাস্ত্র মন্ত্র বা আচার নামক পদার্থকেই ধ্বংস করিতে চাহেন, এবং সেই পথে দেশবাসীকে পরিচালিত করিতে কোমর বাঁধিয়াছেন? কবি স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে মনুষ্য সমক্ষে এই Nihilism, এ'রূপ' সর্ব্বধ্বংসী ক্রিয়াতন্ত্র উপস্থিত করিতে প্রয়াসী, এতবড় অবিচার তাঁহার প্রতি করিতে পারিব না। অথচ, গ্রন্থের পাঠ ফলে, উহার স্থায়ীভাবরূপে উক্ত প্রকার একটা ধারণাই

পাঠকের চিত্তে বদ্ধমূল হয় কি না, প্রত্যেকে দেখিতে পারেন। এ'রূপ উদ্দেশ্য-সন্দেহ কেন ঘটিতেছে? প্রদূষণ ক্ষেত্রে নামরূপধারী সবিশেষ দোষকে পরিহার করিয়া, কেবল 'অচল' নামে একটা সামান্য লক্ষণের 'সিম্বোলিক' আদর্শ অবলম্বনই উহার হেতু। কবি সমাজের কোন্ বিশেষ শাস্ত্র, বিশেষ মন্ত্র বা সবিশেষ আচারকে ধ্বংস করিতে চাহেন, উহার দোষ প্রতিপন্ন করিয়া সমাজসংস্কার কিংবা ধর্ম্মসংস্কার করিতে তিনি উদ্যোগী, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বলেন নাই; বলিতে চাহেন নাই। কোনও বিশেষিত আদর্শের দোষ দর্শন বিষয়ে উক্ত গ্রন্থে তাঁহা হইতে বিন্দুমাত্র সাহায্য পাওয়া যায় না। দোষ হইলে উহাকে 'ভাঙ্গিতে' হইবে, ইহা ত সর্ব্ব-স্বীকৃত কথা! উহার জন্য আবার এতবড় আড়ম্বর কেন? 'অচলায়তনের' উদ্দিষ্ট রসের আলম্বন উদ্দীপন সমস্তই অস্ফুট হওয়ার ফলে দাঁড়াইয়াছে কেবল অপ্রয়োজন লীলাখেলায় ধ্বংস; যেন আপনার অহমিকা শক্তির দুর্দ্দম উত্তেজনাতেই ধ্বংস; অচলতার নিরুদ্দেশ্য এবং নিঃস্বার্থ হিংসাতেই ধ্বংস! অথবা, ধ্বংস বলিলেও একটা স্ফুটতর এবং ব্যাপকতর ও 'অচল' সংজ্ঞা আসিয়া পড়ে—ফলে ঘটিতেছে কেবল আংশিক ধ্বংস, 'অচলায়তনের' দেওয়াল টুকুরই ধ্বংস। এইদিকে বরং গ্রন্থের প্রতিপাদ্যটিই অর্দ্ধসম্পন্ন ও খণ্ডিত হইয়া রহিল কিনা, তাহাও বিবেচনা করা যায়। গ্রন্থের নামকরণে, কবির কথায়, আচারে, ইঙ্গিতে ও প্রণালীতে পাঠকের ধারণা হয়, যেন অচলতাকে চালিত করাই কবির উদ্দেশ্য; পাঠকের হৃদয় উহাই গ্রন্থটীর স্থায়ীভাবরূপে ফলিত হইয়া দাঁড়াইবে বলিয়াই যেন বিশ্বাসী হইয়া উঠে। পাঠক আশা করিয়াছিল দেখিবে, যে 'অচলায়তনটী' প্রকাশ্য পথে, উন্নতি মার্গে দিব্য চলিতে আরম্ভ করিয়াছে! কিন্তু পরিণামে এবং ফলশ্রুতিতে কেবল দেওয়ালগুলিই ভাঙ্গা হইল; অপ্রত্যাশিতভাবে বাহিরের আলোক আসিল সত্য এবং আয়তনের সকলে আনন্দ-উৎসবেও মাতিয়া গেল। কিন্তু, উহাতে গ্রন্থের 'গতি' আদর্শের সঙ্কেতটী, 'অচল'কে চালিত করার প্রতিজ্ঞাটি, কবির প্রয়োগ সূত্রটি নিদারুণ ভাবেই খণ্ডিত হইয়া গেল না কি? গ্রন্থের নাম 'অচলায়তন'

না হইয়া উপসংহারে বা পরিণামে বরং যেন 'রুদ্ধ আয়তন' বা 'রুদ্ধ গৃহ' হইয়াই দাঁড়াইতেছে! গ্রন্থটি যেন নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারে নাই!

এস্থলে দেখিতে হয় যে, 'অবিরাম চলা' বলিয়া জীবনের একটা আদর্শ রবীন্দ্রের প্রৌঢ়জীবনের কাব্যকবিতা মধ্যে পরিস্ফুট হইতেছে। তিনি সমস্ত জীবন কোন 'একটী' আদর্শে দীর্ঘকাল ধ্যানস্থ না থাকিয়া কেবল 'চলিয়া' আসিয়াছেন। 'চলতা' তাঁহার কবিচর্য্যা ও জীবনের একটা পরিব্যাপক তত্ত্ব, হয়ত, অবিতর্কিত তত্ত্বরূপেই পরিদৃষ্ট হইবে। কবির হৃদয় কোনও দিকে, কোনও বিশেষ ভাব কিংবা ধর্ম্মে একোদ্দিষ্ট না হইয়া যেন কেবল দর্পনের মত বহির্ম্মুখে এবং জগতের প্রত্যাভাসমুখেই উন্মুক্ত আছে! নিত্য নূতন বহিরাবেশে আবিষ্ট হইতেছে! উহা আপনার পরিধি মধ্যেই বহুশীর্ষতায় ও বহুরূপী ভাবে, প্রত্যাবেশে এবং সমাধিতে লীলায়িত হইতেছে! তাই, উহার অন্ত্য-কল্যের মধ্যে রীতি কিংবা স্থিতি বিষয়ে কোন সবিশেষ ঐক্য-সঙ্গতি নাই; উহার মতামত, আদর্শ কিংবা প্রকৃতির মধ্যে কোন স্থিরার্থতা এবং সামঞ্জস্য দর্শন করাও একরূপ অসম্ভব হইয়াছে। এ'জন্য, উৎকর্ষস্থলে উহার প্রত্যেক মূহূর্ত্তই মাহেন্দ্র, পূর্ব্বাপর হইতে স্বতন্ত্র এবং উর্জ্জস্বল। আবার, রবীন্দ্রনাথের ভাবুকতা রীতির মধ্যেও যেই অরূপনিষ্ঠ রোমান্টিক লক্ষণ এবং একটা 'আল্‌গা' থাকার লক্ষণ আছে, উহাতেও তাঁহাকে কোন পদবী এবং অবস্থায় একেবারে তদ্গত বা নিশ্চল না করিয়া, তাঁহার চিত্তকে বরং আনন্দাবেশেই নাচাইতে থাকে এবং পরমুহূর্ত্তেই অবস্থান্তরে চালিত করিয়া যায়। কবির বহুমুখী সারস্বতকর্ষণা, বহুগ্রন্থ সেবা ও গ্রন্থাগার-নিষ্ঠা হইতেও এই ধর্ম্মটি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ইহা শৈশব সঙ্গীত হইতে এ'কাল পর্য্যন্ত তাঁহার সকল কবিত্বধর্ম্ম এবং কবিকর্ম্মের প্রধান বিশেষণ; এবং এস্থলেই সাহিত্যজগতে রবিকবির ব্যক্তিত্বের একটা অতুলনীয় উপাধি। হেমচন্দ্রের ন্যায় দীর্ঘকাল একটিমাত্র মহাভাবেই রহিয়া-বসিয়া এবং মাজিয়া-ঘষিয়া একটা আত্মসম্পূর্ণ 'মহাকাব্য' রচনা, নবীনচন্দ্রের ন্যায়

৪১। রবীন্দ্রনাথের চলতা আদর্শ।

পঁচিশ বৎসর একোদ্দিষ্টভাবে নিযুক্ত হইয়া আধুনিকভারতের সমস্তা-চিন্তা এবং "ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত" সৃষ্টি, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এ'সমস্ত একেবারে অসম্ভব। অবশ্য, তাঁহার মধ্যেও নিজের পথে, নিজের মুহূর্ত্তন্ত্রীয় এবং 'কণিকা'জাতীয় নিষ্ঠা ও তৎপরতা আছে, পরমবিস্ময়করী অজস্রতা আছে। গীতি-ভাবুকতার ক্ষেত্রেই প্রত্যহ নবনব ভাব, রীতি এবং বস্তু! তাঁহার মধ্যে কখনও বা শেলীর তত্ত্বজীবী ভাবুকতা (Transcendental Idealism), কখন বা ওয়ার্ডসোয়ার্থের তত্ত্বজীবী বাস্তবতা (Transcendental Realism), কখন বা ব্রাউনীংএর বাস্তব-জীবী তত্ত্বতা (Realistic Idealism)! কবিকর্ম্মের এই অবিরাম কার-খানার স্থানও কখন নিজের অভ্যন্তরপুর, কখন বা বহির্দ্দার ও বহিঃ-সংসার, কখন বা গ্রন্থাগার! শেষোক্তের অনুপাতই সমধিক এবং উহার ফলটাও সুপ্রকট এবং অপরিহার্য্য। কারখানায় অবিশ্রাম কার্য্য চলিতেছে! সাহিত্যজগতের তাবৎ 'সূক্ষ্ম শিল্প' বা 'মোটামাল' (Rough Material) রবীন্দ্রপুরে আসিয়া, রাবীন্দ্র হাপরে গলিয়া, রাবীন্দ্র এসেন্স এবং বর্ণরসে জারিত হইয়া, রাবীন্দ্র 'গীতিকা' কিংবা 'অঞ্জলি'মুদ্রাঙ্কিত ভাবে প্রকাশিত হইতেছে! গীতিতন্ত্রের মাহেন্দ্রমুহূর্ত্ত-জীবী এই অনুপম যোগাভিনিবেশ, এই ক্ষণপ্রীতি ও 'চলতারীতি'—ইহা সাহিত্যজগতে নানাদিকে অভিনব ও অতুলনীয়। ইহার 'সহানুভূতি' ঘটিলেই বুঝিব, সাহিত্যজগতে এইত একজন যৌগিকতন্ত্রের বড়কবি! এইত একজন অনন্যসম্ভব, আধুনিক যুগের কবি—কর্ষণাযুগের সিদ্ধকবি!

৪২। 'অচলায়তনে' 'চলতার' আদর্শ ও উহার ফল।

বুঝিতে হইবে, রবীন্দ্রনাথের এই 'চলতা' ধর্ম্ম! উহা এখন আধুনিক ইয়োরোপের একটা 'দার্শনিক' মতবাদের দৃষ্টান্তোৎসাহে সচেতন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার জীবনে এবং শিল্পের ক্ষেত্রেও একটা প্রবল আদর্শরূপেই মাথা তুলিয়াছে। বিশেষতঃ, 'গীতাঞ্জলি'র পর হইতে তাঁহার বহু গীতিকবিতার ও সঙ্গীতকবিতার প্রধান বক্তব্যরূপে দাঁড়াইয়াছে 'কেবল চলা,' 'কেবল চলার উদ্দেশ্যেই একটা চলা,' একটা 'নিরুদ্দেশ

যাত্রা'। সামাজিক জীবন ও ধর্ম্মের আদর্শক্ষেত্রেও দাঁড়াইতেছে 'অপ্রয়োজনের নৌকায়' চড়িয়া কেবল একটা যাত্রা, অপ্রগতি ও অনর্থক যাত্রা—লক্ষ্যহীন যাত্রা! সুতরাং, প্রায় সকল তরফেই দাড়াইতেছে, কেবল অপ্রয়োজন ভাঙ্গা ও চলা! ইহা জীবনে সমাজে ধর্ম্মে ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেন কবির একটা সুপরিস্ফুট 'মত' এবং আদর্শ। কোন দিকে বিস্পষ্ট অর্থে 'ধরা দেওয়া' তাঁহার রীতি না হইলেও, কবির এই মত-মূর্ত্তি অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদিগকে বুঝিতে হয় যে, আধুনিক ইয়োরোপের জড়বাদের গর্ভে 'চলতা'রূপী দার্শনিক মতের জন্ম; আত্মতত্ত্বে অবিশ্বাস এবং ধর্ম্মতত্ত্বে সংশয়ের খোরাকে উহার পরিপুষ্টি ও আধুনিক পরিণতি। জগৎ একটা অর্থহীন, এবং লক্ষ্যহীন গতি, ইহা অনাত্মবাদী বা নাস্তিক্যবাদীর মত। রেণানের Transformism হইতে আরম্ভ করিয়া, বার্গসোঁ এবং আধুনিক যুগের জর্ম্মণীর Lipps প্রভৃতির মধ্যে পর্য্যন্ত উহার সূত্র-সন্ততি অনুসরণ করা যায়। অন্যদিকে, বৌদ্ধ সম্প্রদায়বিশেষের 'ক্ষণভঙ্গ' বাদের সঙ্গেও এই 'চলতা'-আদর্শের সহোদরত্ব প্রতীয়মান। জগতের আদিম কারণ বা অস্তিত্বের উদ্দেশ্যকে 'সৎ-চিৎ-আনন্দ,' 'শান্তংশিবমদ্বৈতম্' অথবা 'সত্য-শিব-সুন্দর' বলিতে গেলে, কোনপ্রকারে কিছু একটা নির্দ্দেশ করিলেই ত আদর্শের ক্ষেত্রে একটা'অচলায়তন' হইয়া গেল! ভগবৎগীতা জগতের কারণ কে লক্ষ্যকরিয়া বলিয়াছেন, "সর্ব্বত্র-গমচিন্ত্যং তৎ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্"। মনুষ্যের ধর্ম্মমাত্রেই দৃষ্টতঃ জগতের 'কারণ' রূপ একটা অচল তত্ত্ব ও অচল আদর্শের ধারণাকে ভিত্তি করিয়া এবং 'অচলায়তন' হইয়াই দাড়াইয়াছে। কবি ধ্রুবতা এবং সত্য-শিব-সুন্দর আদর্শের উক্ত 'অচলায়তন'টাও ভাঙ্গিতে চাহেন কি? ফলতঃ, বিশিষ্টলক্ষ্যের অস্পষ্টতা দোষেই নাটকটী প্রয়োগক্ষেত্রে দুর্ব্বল; এবং ঈদৃশ দৌর্ব্বল্যও নানামতে কবির অবস্তু-প্রীতি, অরূপ-তন্ত্রী ভাবুকতা ও গীতিকা রীতির অপরিহার্য্য ফল।

এস্থলে বলিতে হয় যে, রাজার স্থায়ীভাবটুকু বুদ্ধিতন্ত্রিক হইলেও, উহা 'অচলায়তন' অপেক্ষা সফলতর শিল্প। অবশ্য, কোনটাই প্রকৃত নাট্য নহে,

আপাততঃ নাট্যপ্রণালীতে রচিত thesis বা সন্দর্ভ। অচলায়তনের বক্তব্য আমাদের জ্ঞানভাবকে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন দিকে অগ্রসর করে না। সত্য-প্রীতি বা আলোক-প্রীতি মনুষ্যের স্বাভাবিক সিদ্ধি। সে বিষয়ে কাহারও কোন বিবাদ নাই—মনুষ্যসমাজে বিবাদ কেবল কোন একটী বিশেষসত্য, বিশেষ আদর্শের উন্নতি এবং বিশেষ আদর্শের আলোক লইয়া; অবস্থাবিশেষে গ্রহণ-বর্জ্জনের যোগ্যতা এবং কিংকর্ত্তব্যতা লইয়া। সে ক্ষেত্রে 'অচলায়তন' আমাদের বিন্দু মাত্র সাহায্য করিতে পারে নাই—উহা উন্নতি কিম্বা সংস্কারের ক্ষেত্রেও আমাদের ক্রিয়াচর্য্যাকে কোনদিকে সহায়তা করিতে পারিতেছে না। প্রদূষণক্ষেত্রে 'সামান্য কথনের' আশ্রয় লওয়াতে, শিল্পক্ষেত্রে স্ফুটকলেবর বিশেষকে বর্জ্জন করাতেই যে ঈদৃশ দুর্ব্বলতা ঘটিতেছে তাহাই আমাদিগকে বুঝিতে হয়।

সূক্ষ্মভাবে দেখিলে, হয়ত এই 'চলতা' রবীন্দ্র প্রতিভার পরম ধর্ম্ম ও তাঁহার অন্তঃকরণ তত্ত্বের 'পরমাপ্রকৃতি' রূপেই আত্ম পরিচয় করিবে। উহা হইতে রাবীন্দ্র কবিতার অতুলনীয় দ্রুতি ধর্ম্ম এবং ছন্দে ও ভাবে মাধুর্য্যের প্রবল অনুপাত টুকুও হৃদয়ঙ্গম হইবে। রবীন্দ্রের মধুচক্র চূড়ান্তে যে পরিমাণে মুগ্ধ করে সে অনুপাতে যে দীপ্ত ও উর্জ্জিত করে না; যে পরিমাণে আবিষ্ট করে সে অনুপাতে যে তদ্গত বা ধ্যানস্থ করে না, উহার রহস্যটুকুও হয়ত এ স্থানেই পরিদৃষ্ট হইবে।

কবির পক্ষে একদিকে কাব্যকলা ও কবিচর্য্যা, অন্যদিকে সমাজ সংস্কার বা তত্ত্ব প্রচার। এস্থলে যেন Scylla ও Chyrabdis; একটা দো'টানা ও 'দো'শিঙার' বিপদুৎপাত! 'অরূপতন্ত্রী' বা বিমানচারী কবিত্ব-ভাবুকতা বজায় রাখিতে চাও, দাঁড়াইবে এ'রূপই একটা কায়াদুর্ব্বল ও শক্তিদুর্ব্বল ব্যাপার। আবার, যদি 'প্রকাশ করিয়া কহ', ঘটিয়া পড়িবে হয়ত একটা নেহাৎ 'অ-কবির কার্য্য' এবং মাটীঘেঁষা গন্ধাচার! ইহার দৃষ্টান্ত ইদানীং বঙ্গসাহিত্যে অত্যন্ত সুলভ হইয়া পড়িয়াছে। অপরের ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্করণের 'সাধু' উদ্দেশ্যে বিচলিত হইয়া অনেক কবিধর্ম্মী বক্তা এবং ভাবুক কাব্যকলা বনের আড়াল হইতে অবিশিষ্ট ও অরূপনির্দ্দিষ্ট

'দোষ' নামের কোন একটা দুর্দমন পদার্থ আক্রমণেই উঠিয়াপড়িয়া লাগিয়াছেন! কাব্যকবিতা, নাট্যগাথা ও স্বাধীন চিন্তার অজস্র শরসন্ধান চলিতে থাকিলেও, উহাদের একটিও লক্ষ্যস্থিরতায় পতিত হইতে কিংবা লক্ষ্যভেদ করিতে পারিতেছে না!

৪৩। প্রদূষক হিসাবে ইবসেনের Ghosts নাটকের অপেক্ষাকৃত সফলতা।

ইব্‌সেনের Ghosts একটা বলবান্ প্রদূষক নাটক। ইয়োরোপীয় সমাজে, উহার অবিবাহিত যুবক ও ছাত্রমহলে একটা সবিশেষ কদাচার আছে। প্যারী নগরীর ছাত্রাবাসেই উহার বাস্তব মূর্ত্তি পরিস্ফুট। অবিবাহিত যুবকযুবতী বিমিশ্রভাবে বসবাস করে, স্ত্রীপুরুষের আচারেই বসবাস করে; যৌনসম্বন্ধের ক্ষেত্রে 'সুনীতি' বলিয়া কথাটি উক্ত সমাজে ফলে একেবারে অপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। উহাতে ব্যক্তিগত এবং জাতিগত হিসাবেও নৈতিক অবনতি; অধ্যাত্ম অবনতি। বিমিশ্র সম্বন্ধ হইতে দুরারোগ্য রোগের সৃষ্টি; মানুষের রক্ত অস্থি মজ্জা এবং মস্তিষ্কের পর্য্যন্ত বিকৃতি; মনুষ্যের বাতুলতা, পশুতা, ঘৃণিত মৃত্যু। এই বিকৃতি এবং পাপের সূত্র খ্রীষ্টান আদর্শের 'আদমী' পাপের মত, Original Sin এর মতই পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত হইতে পারে; Law of Heredity মূলে পূর্ব্বপুরুষের অপরাধ এবং পাপ-বিকৃতির এই অপদেবতা দৃষ্টতঃ নিরপরাধ পুত্র পৌত্রকে পর্য্যন্ত পাইয়া বসিতে পারে! এতাদৃশ ভীষণ অর্থ ও বক্তব্য অবলম্বনেই ইব্‌সেন Ghosts নাটক রচনা করেন। নির্দ্দয়-নিদারুণ ছুরিকা লইয়া আধুনিক ইয়োরোপীয় সমাজের একটা প্রত্যক্ষও পরিব্যাপ্ত মহারোগের সবিশেষ ক্ষতস্থানে তিনি অস্ত্রোপচার করিয়াছেন। উহা উচ্চ সাহিত্যের 'সত্য শিব সুন্দর' আদর্শকে সিদ্ধি করিতে পারিয়াছে কিনা, উহা একটা উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যশিল্প হইয়াছে কিনা, এই Ghosts হৃদয়মনের পক্ষে অমৃতস্যন্দিনী রসসিদ্ধি হইয়াছে কিনা, সে আলোচনা করিবনা; কিন্তু, উহা একটা শক্তিশালী প্রদূষক নাটক হইয়াছে; এবং বুঝিতে হইবে যে সামান্য লক্ষণের পুতুল (Symbol) ছাড়িয়া সবিশেষ দোষ, সবিশেষ সত্য, এবং বিশেষিত উদ্দেশ্য অবলম্বনে

এই 'সিম্বোল' অবলম্বন করিয়া An enemy of the people রচনা করেন। পরোক্ষভাবে 'অপদেবতা' নাটকের সাধু উদ্দেশ্য, এবং সত্যসন্ধতার সঙ্কেত করিয়া আত্মসমর্থন উদ্দেশ্যেই উক্ত নাটক রচিত। রবীন্দ্রনাথ ও বর্ত্তমানক্ষেত্রে ইবসেনের সহিত নিজকে সমাবস্থ বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং ইবসেনের 'দেশশত্রু' নাটকের সমজাতীয় একটা 'সিম্বোল' গ্রহণেই 'মুক্তধারা' প্রচার করিয়াছেন।

আপনাদের সাধু উদ্দেশ্যের সঙ্কেত ও 'দেশবন্ধু'তার সমর্থন এই বিশেষ উদ্দেশ্যটী উভয় গ্রন্থই সফল করিয়াছে, বলিতে পারা যায়। দেশের কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি তাঁহাদিগকে 'দেশ শত্রু' বলিয়া মনে করিতে পারে বলিয়াও ধারণা হয় না। তবে 'মুক্তধারা'র পুত্তলী রীতি রবীন্দ্রনাথের মূল 'সত্যের আহ্বান'এর কার্য্যকরিতা, উহার গ্রহণযোগ্যতা এবং বর্ত্তমানের অনুসরণযোগ্যতা কোনদিকে স্ফুটতর করিতে পারিয়াছে কিনা, তাহাই বিবেচ্য। কোন পুত্তলিকা রীতির প্রদূষক নাটকে সেই অর্থবত্তা এবং ক্রিয়াপরিচালনী যোগ্যতা থাকিতে পারে কি না, শিল্পতত্ত্বের ক্ষেত্রে তাহাই বিবেচ্য। সিম্বোলিকা একটা তির্য্যক্ রীতি! মনুষ্যের কর্ম্মক্ষেত্রে, সমাজে কিংবা রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াপ্রবর্ত্তনার ক্ষেত্রে কোন প্রকার তির্য্যক্ রীতিই দুর্ব্বল না হইয়া পারে না।

এক্ষেত্রে চিন্তার কথা এই যে, এরূপ Symbolic আদর্শের অস্পষ্টভাব বা বাক্য, কিংবা (পূর্ব্বোক্তরূপে) সাহিত্যক্ষেত্রে অনধিকারপ্রবেশী চিত্র বা সঙ্গীত আদর্শের কবিতা আমাদের কখন কখন ভাল লাগে। কতদূর ভাল লাগে? যে পরিমাণে উহারা ভাব বা emotion সাধন পূর্ব্বক সাহিত্যতা সিদ্ধি করে, সে পরিমাণেই ভাল লাগে। আবার, ভাল লাগে বলিয়া ভাবের আকৃতি আদর্শ কিম্বা সাহিত্যশিল্পের মূল শাস্ত্র ধূলিসাৎ হয় না। দেখিতে হইবে, ওই অস্পষ্টতা কেন ভাল লাগে, এবং কতদূর ভাল লাগে। অনর্থতা কুত্রাপি ভাল লাগিলে উহাতে বরং পাঠকের Self exercise,

৪৬। সাহিত্যের আকৃতি আদর্শের পরিব্যাপক ব্যাভিচার কুত্রাপি হৃদ্য হইতে পারে না।

ভাবার্জ্জনে তাহার আত্মচিত্তের ব্যায়ামশক্তি, এবং ভাবাকুলতা ও বিভাবনী শক্তিই সূচিত হয়—শিল্পীর নহে। পুনশ্চ, অস্পষ্টতাই 'ভাল লাগা'র প্রধান কারণ নহে। অস্পষ্টতা বা অনর্থতা একটা ভাবনী বৃত্তি বা emotion নহে, একটা emotionএর খাদ্যও নহে। শেষ প্রশ্নটীর সমাধানই এক্ষেত্রে প্রধান কথা। বিভাব ও অনুভাবকে স্ফুটতর ও বলিষ্ঠতর করিতে পারিলে, কথার অর্থ বা অর্থাভাসকে সুসঙ্গত করিলে, উক্ত 'ভাল লাগা'র বলিষ্ঠতা এবং কাব্যটীর 'শিল্পতা' আরও বাড়িয়া যাইত না কি? উহা হইতে ভাবের শিল্পক্ষমতা বা রসবত্তাও বর্দ্ধিত হইত না কি? ওইরূপ বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত এ সাহিত্যে নাই, কিংবা পাঠকের জানা নাই, কিংবা কেহ এ পর্য্যন্ত উহা করিতে পারেন নাই, প্রভৃতি অজুহাত হইতেও মূল প্রশ্নের সমাধান হয় না। উহাতে যে বরং বর্ত্তমানে সমর্থ কবিপ্রতিভার অভাবটীই প্রমাণিত হয়; শিল্পতত্ত্বের ছেদ বা ভাবের আকৃতিবাদের কোন ব্যভিচারও প্রমাণিত হয় না। দেখিতেছি, শ্রীমদ্‌ভাগবতের পথে প্রাচীন বাঙ্গালী কবি সাহিত্যের আমলেই সকল দার্শনিকতা, তাত্ত্বিকতা ও 'সিম্বোলিক' আদর্শ বজায় রাখিয়াই আধুনিক 'সিম্বোলিষ্ট্' অপেক্ষা বলিষ্ঠতর ভাবসিদ্ধি ও শিল্পসিদ্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। উহা সিম্বোলিক সাহিত্যক্ষেত্রেই উচ্চতর শিল্প সাধনার একটা প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। সাহিত্য শিল্পের ক্ষেত্রে রসাভাবের স্ফুটতর প্রতীক সৃষ্টি ও উচ্চতর শিল্পরস-সিদ্ধির স্বরূপ দেখাইতেই আমরা বৈষ্ণব কবির 'রাধাকৃষ্ণ'কে দৃষ্টান্তিত করিয়াছি। ভবিষ্যতে 'বলিষ্ঠতর শিল্প প্রতিভা, আমাদের এই 'ভারতীয় সিম্বোলিষ্ট্' রীতিতেই, জগতের 'রাজারাণী'র সম্বন্ধে, জীবব্রহ্মের সম্বন্ধে বা স্বর্গমর্ত্ত্যের প্রেম গাথার বিষয়ে অথবা মনুষ্যের সমাজ-ধর্ম্মের উন্নতি-গতির বিষয়ে আরও প্রশস্ততর শিল্পরচনা সমাধা করিতে পারিবেন, সে প্রত্যাশা আমরা করিতে পারি। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে 'রাজা' ও 'অচলায়তন'—দুইটি অতুলনীয় কাব্যসিদ্ধি; রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট কবিত্বের রত্নসম্পত্তি ও গীতিকাশক্তির অমূল্যতম ভাণ্ডার। সেক্‌সপীয়র-পদ্ধতির জীবনচিত্র রচনা রবীন্দ্রনাথের নহে। সৌভাগ্যক্রমে 'বিসর্জ্জন' এবং

'রাজা ও রাণীর' পর রবীন্দ্রনাথ আত্মশক্তির রহস্য বুঝিয়াছিলেন। জীবনার্থের দার্শনিকা প্রকাশরীতি, গীতিকা ও পুত্তলিকা-রীতিই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। তিনি এই দিকে বাঙ্গালীর সমক্ষে আধুনিক আদর্শের গতিপথ কাটিয়া গেলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে এবং এই পথের দোষ-গুণ-বিপত্তির অভিজ্ঞতায় সচেতন থাকিতে জানিলে ভারতীয় পূর্ব্বাপর সিম্বোল শিল্পিগণ তাঁহার উত্তরগামিতা সূত্রেই নব নব সিদ্ধিপথে অগ্রসর হইতে পারিবেন। উক্ত পথে আত্ম-পরিজ্ঞানের সহায়তা কল্পেই আমরা এই বিস্তারিত আলোচনা করিয়া আসিলাম।

(ঘ)

শিল্পতন্ত্রে সাহিত্যের আমল বা উহার স্বক্ষেত্রে অন্যশিল্পের অতিবর্ত্তন এবং অনধিকার প্রবেশের ব্যাপারকেও অল্প কথায় বুঝিতে হইলে, বলিব, মনুষ্যের শিল্পবৃত্তির মধ্যে ধ্বনিপথে হ্লাদিনীবৃত্তির ক্রিয়া অন্যতম। অতএব সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্র, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য প্রভৃতি মানুষের পঞ্চমুখী শিল্পসিদ্ধির মধ্যে সাহিত্য বা কাব্য অন্যতম। সঙ্গীত ও কাব্য মনুষ্যের 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিতে চায়'; উভয়ের মধ্যে সঙ্গীতই অগ্রজন্মা বা জ্যেষ্ঠ। সঙ্গীতই শিল্পের ক্ষেত্রে জীবের অগ্রসিদ্ধি; ইতর প্রাণীগণও সঙ্গীতকে ন্যূনাধিক সিদ্ধ করিয়াছে। মানুষের প্রথমা সিদ্ধিই অব্যক্ত ধ্বনি, ভাব প্রকাশের কেবল সুরতন্ত্রীয় ধ্বনি! পরে পরে, সরস্বতীর পূর্ণতর আবির্ভাবে, মানুষ আত্ম হৃদয়ের ভাবচিন্তাকে বাক্যার্থের প্রমূর্ত্তিতে আকারিত করিতে গিয়াই সাহিত্যসিদ্ধির ভিত্তিপাত করিয়াছে। কালক্রমে, কাব্য কেবল ছন্দের মধ্যেই অগ্রজের সহিত যৎকিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্য ও জ্ঞাতিসম্বন্ধমাত্র রক্ষা করিয়া দেশকালের সংকীর্ণতাজয়ী হইয়াছে; সুস্থির এবং অনন্তপরিব্যাপী অর্থক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছে; অভিনব, এমন কি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এজন্য, ভারতীয় সাহিত্যসাধকের আরাধ্যা সরস্বতীর

৪৭। পঞ্চবিধ শিল্পতন্ত্রে সাহিত্যের স্থিতি ও স্বরূপ এবং আধুনিক ইয়োরোপে উহার অর্থ বা আকৃতি আদর্শের ব্যভিচার।

প্রমূর্ত্তি বীণাপুস্তক-ধারিণী! বিবর্ত্তনপথে সাহিত্য ও সঙ্গীত দুইটি স্বতন্ত্র শিল্পজাতি হইয়াই দাঁড়াইয়াছে। ভাবপ্রকাশের অর্থহীন রীতি, অস্পষ্ট প্রণালী বা কেবল সুরতন্ত্রী এবং স্নায়ুলক্ষী রীতি, ইহা এখন সঙ্গীতের ক্ষেত্র। তন্ত্রী, কণ্ঠ ও তালযন্ত্র এই তিনটিই সঙ্গীতের উপায় এবং উপকরণ। এ কারণ, ভারতীয় সঙ্গীতকোবিদগণ তন্ত্রী ও কণ্ঠস্বরের ক্ষেত্রে যেমন নানা রাগরাগিনী আবিষ্কার করিয়াছেন, তেমন 'আনকের' ক্ষেত্রে ও তাল সমূহ দর্শন করিয়াছেন। আধুনিক ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-কোবিদ্ জাতি জর্ম্মণ—জর্ম্মণীর ভাগনের, মেণ্ডেল জোন্ ও বেটোফেন প্রভৃতি শাব্দিকধ্বনির ক্ষেত্রে নবনব প্রয়োগরীতির ঐক্যতান সঙ্গীত ও স্বরলিপি আবিষ্কার করিয়া ধন্য হইয়াছেন। বলিতে পারি, ভাগনেরই সর্ব্বপ্রথমে ন্যূনাধিক স্নায়ুতন্ত্রীয় সঙ্গীতকে সার্থকবাক্যের ক্ষেত্রে আনয়ন করিয়া, সঙ্গীতের অস্পষ্ট রসাত্মাকে সাহিত্যিক বাক্যপ্রণালীতে উন্নীত করিয়াছিলেন। তাঁহার হস্তেই সঙ্গীত কর্ত্তৃক সাহিত্যের ক্ষেত্রে সার্থক, মুগ্ধকর এবং মৌলিক অতিবর্ত্তন। উহা স্নায়ুতন্ত্রী ও 'আভাস'বাদী সঙ্গীতের পক্ষে বরং উন্নতি বলিয়াই পরিগণিত। কিন্তু, সঙ্গীতের অস্পষ্টতা ও নিরর্থতার এবং 'আভাসের' ক্ষেত্রে সাহিত্যের অতিবর্ত্তন! উহার নামই Decadence বা সাহিত্যের অধোগতি। যে অস্পষ্টতা ছাড়াইয়া উঠিয়া সাহিত্য স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং স্বতন্ত্র শিল্পসিদ্ধিরূপে গণ্য হইয়াছে সে পদবী ও ভিত্তি হইতেই অধঃপতন! বলিয়া আসিয়াছি, ভাগ্নেরের দৃষ্টান্তে যেন উৎসাহিত হইয়াই সর্ব্বপ্রথমে জর্ম্মণীর 'রোমান্টিক কবিগণ' দল বাঁধিয়া, বিপরীত চরমপন্থিভাবে কাব্যেও অস্পষ্টতা এবং অনর্থতার আদর্শ ঘোষণা করেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া ইয়োরোপে, মৌলিকতার গোড়ামিতে নবনব আখ্যায় আত্ম-বিজ্ঞাপক কবিসংঘ সাহিত্যের এই অর্ব্বাচীন রীতির সমর্থন করিতেছেন। তাঁহাদের যেন মুখপাত্র হইয়াই ভেয়ার্লেন ঘোষণা করিয়াছেন, "কবিতায় অর্থের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই"—"তরল ছন্দের লীলা সকলের আগে কবিতায়।" তাঁহাদের দৃষ্টান্তে, এতদ্দেশেও এমন

কবি বা শিল্পীর অভাব নাই যাঁহারা ঘোষণা করেন যে, কাব্যে অর্থ-সঙ্গতির কিছুমাত্র দরকার করে না। এই মতবাদের দোষগুণবিচার করিয়া, এই অতিবৃত্তি বিচার করিয়া ইয়োরোপে প্রকৃত শিল্পীর হস্তে কোন গ্রন্থ রচিত হইয়াছে কিনা, জানি না। টলষ্টয় কেবল রুশীয় কৃষাণের রুচিকে মাপকাঠি করিয়া আখ্যায়িকারীতির দিক হইতে যেন উহাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। মানুষের ব্যক্তিগত রুচিবুদ্ধির ঝোঁক ছাড়াইয়া সাহিত্যকে স্বধর্ম্মের বিশিষ্টতায় স্থাপন করিতে তিনিও চেষ্টা করেন নাই। লেসীং 'লেওকুন' গ্রন্থে সাহিত্যের রীতিকে যে চিত্র ও ভাস্কর্য্যের তুলনায় স্থাপন করিয়াছিলেন, সে পথও অনুসৃত হয় নাই। প্রকৃত মনোবিজ্ঞান ও শিল্পবিজ্ঞানের দিক হইতে সাহিত্যশিল্পের স্বরূপকোটী এবং অধিকার ধারণা পূর্ব্বক 'সাহিত্যদর্শন' নির্ম্মাণের চেষ্টা ইয়োরোপেও এখন যাবৎ হয় নাই। কিন্তু, এই প্রসঙ্গে আমরা সাহিত্যকে শিল্পতন্ত্র এবং রসতত্ত্বের দিক হইতেই চিন্তা করিতেছি। বিশেষতঃ দেখাইতে চাহিতেছি, কোন্‌দিকে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সাহিত্যের 'অনধিকার প্রবেশ', সাহিত্য শিল্পের 'আদর্শ দোষ। উহাতে সর্ব্বপ্রথম, সাহিত্যের 'অর্থ' আদর্শেরই ব্যভিচার। সাহিত্য সেবক সর্ব্বপ্রথম এই মতের উদ্দেশ্য ও বলবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিবেন। উহাকে সজ্ঞানে ও সতর্কভাবে বুঝিয়া লইয়া পরে, ইচ্ছা হয়ত, নিজের মেজাজ ও রুচিখেয়ালের হস্তে বা অনর্থপ্রিয়তার হস্তেও আত্মসমর্পন করিতে পারেন; অস্পষ্ট-প্রিয়তার স্রোতে বুদ্ধির হাল ছাড়িয়া দিতে পারেন। নিরর্থতা বা অস্পষ্টতাকে একান্ত আদর্শ বা স্বয়ংসিদ্ধ এবং স্বতন্ত্র আদর্শরূপে অবলম্বন করিলে ভালমন্দবিচারের 'ফ্যাসাদ' হইতেও মুক্তি পাওয়া যায়; যেহেতু উহার কোন মাপকাঠি নাই। কেবল জড়রসিক বা স্নায়বিক আনন্দ! যাহা একের পক্ষে আনন্দ, তাহা অন্যের পক্ষে একেবারে নিরানন্দতায় হেতু হওয়াও বিবিত্র নহে। ফলতঃ, তাহাই ঘটিতেছে।

মীষ্টিক বা সিম্বোলিক আদর্শ যে পর্য্যন্ত স্বল্প কথায়, ক্ষণিক ও অস্থায়ী-ভাবে তৃতীয় তত্ত্বকে—অব্যক্ত, অরূপ বা ব্রহ্মতত্ত্বকে ইঙ্গিত করিতে চায়, অথবা ক্ষুদ্র 'খণ্ড কবিতা', গীতিকবিতা বা সঙ্গীতকবিতার পথে

কেবল 'আমি তুমি'র বিভাব সাহায্যে ক্ষুদ্রক্ষুদ্র তত্ত্বের সঙ্কেত বা রসনিষ্পত্তি লক্ষ্য করে, সেই পর্য্যন্ত উহা কথঞ্চিৎ ঠিক থাকে। বিস্তারিত ভূমির রসকে লক্ষ্য করিতে গেলেই 'আউল' ও বাতুলরূপে প্রতীয়মান হয়। তবে, এইরূপ ক্ষুদ্রদেহী বা ক্ষুদ্রতাজীবী সঙ্গীতের কত শক্তি হইতে পারে? আকৃতিকে অল্লাঙ্গ করিয়া, সূক্ষ্ম কিংবা অস্পষ্ট করিয়াও সঙ্গীত Sentiment সাধনার ক্ষেত্রে কত ক্ষমতাশালী হইতে পারে? কোন প্রবল স্থায়ীভাব কিংবা মহাভাবের কথা বলিতে চাই না, কিন্তু, Sentiment বলিতে যেই ললিত-মধুর এবং অমুচ্চ ভাব বা ভাবাভাস বুঝায় তাহাকেই উদ্দেশ্য করিলে, সঙ্গীতের এই অস্পষ্টার্থক বা সংকেতাত্মক রীতি কত কার্য্যকরী হইতে পারে? উহার দৃষ্টান্ত জগতের একজন শ্রেষ্ট সঙ্গীত কবি, ছন্দশিল্পী এবং শব্দশিল্পী রবীন্দ্রনাথের 'সঙ্গীতকবিতা' বা 'গীতিকবিতা'র লক্ষ্যকরিতে হয়। এই কবির অনুত্তম শ্রেণীর উপার্জ্জন-গুলির মধ্যে পদবাক্যের সাক্ষাৎশক্তি-বিজয়ী বা বাচ্য-অতিশায়ী যেই সূক্ষ্মতার ও অনির্ব্বচনীয় মহিমার 'সিদ্ধি' আছে, সাহিত্যসেবীর পক্ষে উক্ত সিদ্ধির স্বরূপ এবং বল পরম অভিনিবিষ্ট ভাবেই অনুধাবনের যোগ্য। যেমন অন্যত্র বলিয়াছি, এই গীতিকবি কবিতাকে সাহিত্য ও সঙ্গীতের মধ্যপ্রদেশে স্থাপন করিয়াছেন। অবশ্য, সকল সঙ্গীতের, বিশেষতঃ রাবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রধান শক্তি হয়ত একটিমাত্র পংক্তিতে, অনেক সময় উহার প্রথম পংক্তিতে।

৪৮। মৌষ্টিক ও সাঙ্কেতিক গীতিকবিতার সংকীর্ণ ক্ষেত্র এবং পরিধি।

উহার সুরগত বা ছন্দোমুখ্য অনির্ব্বচনীয় উচ্ছাসটাই অনেকসময় চিত্তকে একটা ভাবাবেশ, mood বা তত্ত্বানুভূতির তন্ময় অবস্থায় তুলিয়া ধরিতে পারে। এইরূপ এক একটি পংক্তি কবির হস্তে যে শক্তি সংগ্রহ করে, তাহা সাধারণকবির একটা গ্রন্থও পারে না। যেমন সঙ্গীতে-সাহিত্যতন্ত্রের বরেণ্য কবি ভাগ্‌নের; তেমন সাহিত্যে-সঙ্গীততন্ত্রের বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ। এই 'সঙ্গীত' প্রধানতঃ একটিমাত্র ভাবের আবেশগ্রস্ত আকুলতা ও একটা অসাধারণ ভাবাবেশ বা মাহেন্দ্রক্ষণ-নিষ্ঠ সেন্টিমেণ্ট-

৪৯। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত ও 'গীতিকবিতা'র শক্তি।

অবস্থার ধারণা। অতএব, সঙ্গীতের একটি প্রধান রীতি Iteration—পুনরুক্তি। কেবল একই বাক্যে নহে, বিভিন্ন বাক্যে, নবনব অলঙ্কারে এবং প্রকারে অব্যক্ত, অর্দ্ধব্যক্ত, অনর্থক অথবা অসম্ভব বাক্যেও একমাত্র ভাবকে আক্রমণ! একটা পুনঃপৌনিকপ্রয়োগ! ভাবে আবেশ লাভের খাতিরেই সঙ্গীতের সকল অর্থদোষ এবং বাড়াবাড়ি সহ্য করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের 'সঙ্গীতকবিতা'য় এইরূপে একই অর্থকে পাঁচ রকমের বোলচালে এবং অর্থাভাসে পুনঃপুনঃ চর্ব্বণ আছে। অর্থের পাকচক্র, বাক্যের পুনরুক্তি, একার্থক বা সমানার্থক উক্তি—এ সমস্তই ভাবুকতামুখ্য 'সঙ্গীত-কবিতা'র প্রবল সহায়, যাহা সাহিত্য-আদর্শে হয়ত সঙ্গত নহে; কিন্তু, সঙ্গীতে পরমা শক্তিরূপেই আত্ম পরিচয় করে। সেরূপ, বলিতে পারি, বাক্যার্থের বা বিষয়ের অস্পষ্টতাও অনেক সময় সঙ্গীতের ভাবাবেশ-ঘটনায় পরম উপকারী স্বরূপেই আত্মপ্রতিষ্ঠা করে।

সাহিত্যে, এই দিকে, রবীন্দ্রনাথ হইতে বিভিন্ন-রীতির কবি কোলরীজ। 'গীতি কবিতা'ও কোন দিকে, কি পরিমাণে, অর্থবিষয়ে রহস্যময়, অনর্থক এবং অস্পষ্টার্থক হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত কোলরীজের Ancient Mariner ও Christabel। উহাদের কোথাও অনর্থক বাক্য নাই; কিন্তু আপাততঃ অর্থহীন অবস্থা ও ঘটনা আছে। তাঁহার বাক্য কোথাও অ-ন্যায়, বিরুদ্ধার্থক অথবা অসঙ্গত নহে। কোলরীজ কথাকে অযুক্তার্থক না করিয়া বরং বৃত্তান্তবস্তু ও অবস্থাকেই রহস্যময় করিয়াছেন; অচিন্ত্য এবং দৈবী বিভূতিময় ঘটনাবস্তুই উপস্থাপিত করিয়াছেন। ইহার কারণ ও প্রয়োগফল বুঝিতে পারিলেই সাহিত্য হইতে সঙ্গীত আদর্শের পার্থক্য বুঝিতে পারা যাইবে। কাব্য বাক্যের অর্থকে অজ্ঞেয় না করিয়া বরং ঘটনা ও অবস্থার তত্ত্বকেই দুর্জ্ঞেয় করে! পূর্ব্বোক্ত অনুপম কবিতাদ্বয়ের ঘটনাচক্রের মর্ম্মই হয়ত স্থানে স্থানে Mysterious। এইরূপে দুর্ব্বাশার শাপ বা অভিজ্ঞান, 'ছায়াময়ী উর্ব্বশী' ও 'ছায়া সীতা' প্রভৃতি 'বস্তু'সাহিত্যতন্ত্রে ভাবের একএকটী রহস্যময় 'রূপক' বা প্রতিমা।

৫০। সঙ্গীত হইতে সাহিত্যের বিভিন্ন রীতি ও পরিণাম।

সাহিত্যে নিন্দনীয় অস্পষ্টতা বলিতে বাক্যার্থের বা প্রকাশ রীতির অস্পষ্টতা এবং অনর্থতাই বুঝায়। রসের উৎকর্য প্রাপ্ত স্বরূপ ত অস্পষ্ট নহে, অনির্ব্বচনীয়। অনির্ব্বচনীয় বলিয়াই এক রসের এত বিভিন্ন আকৃতি সম্ভব হইয়াছে। বিভাব অনুভাবাদি রসের আকৃতি। অনন্তগতি, অনন্তাকৃতি ও অনন্ত প্রসারশীলা বাণীগঙ্গা দেশেদেশে জাতিতেজাতিতে অনন্তবিধ সাহিত্য মূর্ত্তিতে প্রকট হইতেছেন! দেশ কাল এবং পাত্রভেদে, কবিপ্রতিভার অনন্ত ক্রিয়াচর্য্যায় সাহিত্যের এত বিভিন্ন আকৃতি সম্ভবপর হইয়াছে! আত্মার ন্যায় রসও স্বরূপতঃ 'এক' হইয়াই অনন্ত 'বহু' হইতেছেন! রসের সত্যস্বরূপ অনির্ব্বচনীয় বলিয়া, উহাকে অস্পষ্টস্বরূপ ভাবিয়া অনর্থক বাক্যরীতির দ্বারা বা অস্ফুট আলম্বন-উদ্দীপনের আভাসে ধারণা করিতে যাওয়াই হইতেছে সাহিত্য-শিল্পীর ভ্রান্তি। রসের অনির্ব্বচনীয়তা 'অস্পষ্টতা' হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ। বিশেষতঃ, অস্পষ্টতাই মিষ্টতার বা সরসতার কারণ নহে। সঙ্গীত ও চিত্রের অস্পষ্টতা স্নায়ূতন্ত্রীয়, উহা 'সুড়সুড়ি' জাতীয়। সাহিত্যের স্বরূপ এবং ব্যক্তিত্ব সঙ্গীতের ব্যক্তিত্ব হইতে নানাদিকে স্বতন্ত্র; উহা বহুভাবের সাংকর্য্যে ও পরিব্যাপ্ত বিচিত্রতায় ঘনতর, উহা বিচিত্রবিস্তারিত আকৃতিতে স্ফুটতর ও পরিব্যক্ত বলিয়াই সঙ্গীতের উপরে সাহিত্যের বলবত্তা, শ্রেষ্ঠতা ও মাহাত্ম্য।

৫১। কাব্যসাহিত্যের আদর্শ বিষয়ে ভ্রান্ত দুইজন বিলাতী সাহিত্যদার্শনিক।

ইংলণ্ডের একজন বহুপ্রশংসিত সাহিত্যদার্শনিক Walter Pater তাঁহার Renaisance গ্রন্থের শেষভাগে সাহিত্যসম্পর্কে একটা অস্পষ্টার্থক ও সাহসিক কথার অবতারণা করিয়া অনেকের ভ্রান্তির কারণ হইয়াছেন; অনেক দুর্ব্বিচার ও দুর্ব্যবহারের হেতু হইয়াছেন! তিনি বলিয়াছিলেন Peotry যেন "more and more approaching to the condition of Music" তাঁহার কথায় উৎসাহিত হইয়াই যেন অপর সমালোচক Arthur Symous, আবার এক সাহসোক্তি করিয়া 'মহাভ্রান্তির জনক' হইয়াছেন! সঙ্গীতী ভাবুকতাই যেন কাব্যের একমাত্র লক্ষ্য বা শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য! বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, কাব্য বা

মহাকাব্য যেন কেবল "Lyric Poetry attached by strings of Prose" তাঁহাদের কথার ফেরে পড়িয়া সাহিত্যক্ষেত্রে যেমন অনেক কুপরামর্শ, তেমন কুবুদ্ধি এবং কুকার্য্যও সম্ভবপর হইয়াছে। কেবল 'গীতি কবিতা'ই কবিত্বের চূড়ান্ত কার্য্যরূপে ঘোষণা এবং জাহির করা হইয়াছে! তাঁহাদের মনোগত 'অর্থ' যাহাই হউক, তাঁহারা তথাকথিত Romantic আদর্শের Decadent, Mystic ও Symbolic কবিতার দ্বারাই যে প্রভাবিত ও দিক্‌বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সাহিত্য ত সঙ্গীতের দিকে অগ্রসর হইতেছে না! সাহিত্য শিল্পসোপানে সঙ্গীতের সহোদর ও কনিষ্ঠ। 'সঙ্গীত' সম্পূর্ণ অনর্থক, নিরর্থক এবং অস্পষ্টার্থকও হইতে পারে, কেবল 'জান্তব ধ্বনি'রূপেই দাঁড়াইতে পারে। কাব্য উহার ছন্দতন্ত্রে সঙ্গীতের স্নায়বিক প্রকৃতি ও লক্ষ্য কিছু কিছু রক্ষা করিয়াছে সত্য; কিন্তু, পরিস্ফুট বাকার্থের রাজ্যে রসভাবকে অগ্রসর করিয়া স্বয়ং সঙ্গীত অপেক্ষা বিভিন্ন পরিণামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ডার্বিনের ভাষায় বলিতে পারি, সাহিত্য বিবর্ত্তনপথে সঙ্গীতের Indefinite, Incoherent Homogeneity হইতে নিজের একটা Definite and Coherent Heterogeneityতে পরিণতি লাভ করিয়াছে। রামায়ণ, শকুন্তলা অথবা হ্যামলেটের সহস্রমুখী এবং সচ্চিদানন্দ-ঘনা প্রমূর্ত্তি ও রসসিদ্ধি কোন সঙ্গীতের সাধ্য নহে। Pater প্রভৃতির ভ্রান্ত বাক্যে উৎসাহিত হইয়া রোমান্টিক আদর্শের গীতিকবি ও মীষ্টিক্ কবিগণ যে একেবারে গোঁড়ামীর বশে, সাহিত্যক্ষেত্রেই 'অনর্থক বাক্যপ্রলাপ' আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, সুখদুঃখে তির্য্যক্ জাতির ন্যায় অব্যক্ত শব্দই করিতেছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। টল্‌ষ্টয় কোন 'দার্শনিক' কারণ না দেখাইয়া এরূপ ব্যাপার-কেই আক্রমণ করিয়াছিলেন।

এ সমস্যায় আমাদের প্রসঙ্গের আদিবন্ধের চিন্তাসূত্রই গ্রহণ করিতে হয়। পেটার প্রভৃতির ভ্রান্তি সবিশেষে বুঝিতে হইলে প্রাচীন ভারতের সাহিত্যিক দৃষ্টি ব্যতীত, অদ্বৈতবাদজুষ্ট আদর্শদৃষ্টি ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। এদিকে যে ভারতবর্ষ একেবারে সাহিত্যজগতের 'অসাধ্যসাধন' করিয়াছে

তাহা নির্ভয়ে বলিতে পারি। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতেই 'কাব্যের আত্মা' পদার্থকে ধরিতে চেষ্টা চলিয়াছিল। উহাকে সংজ্ঞামুষ্টিতে আবদ্ধ করিতে প্রাচীন সাহিত্যদার্শনিক ও কবিগণ নিয়তভাবে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। উহার সর্ব্বপ্রাচীন পর্য্যাপ্তনিদর্শন ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে। উহাতে নাট্যের ও তৎসঙ্গে কাব্যের আত্মাকে 'রস' নামে উদ্দেশ করা হইয়াছিল। সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ে সংস্কৃত ভাষায় ৮৭২ সংখ্যক গ্রন্থের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত। এ সকল গ্রন্থের বৃত্তান্তে দেখা যাইবে, ক্লাসিক, রোমাণ্টিক রিয়ালিষ্ট, নেচরেলিষ্ট প্রভৃতি আদর্শ ব্যাপার, (যাহার বিচারে আধুনিক ইয়োরোপের সাহিত্যজগৎ মুখরিত) তাহার কিছুই ভারতীয়-গণের সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়ায় নাই; সমস্ত বিচারই নামান্তরে বা প্রকারান্তরে আসিয়া গিয়াছে। কেহ প্রধানভাবে দেখিয়াছেন 'অলংকারই কাব্যের আত্মা,' কেহ বলিয়াছেন উহা 'রীতি'; কেহ 'বক্রোক্তি', কেহ 'ধ্বনি' বা 'ব্যঞ্জনা'—কেহ বলিয়াছেন 'রস'। ভরতমুনি বামন, ভামহ, দণ্ডী, অভিনবগুপ্ত, লোচন প্রভৃতি এ'ক্ষেত্রে এক একটি আলোকস্তম্ভ রূপেই দাঁড়াইয়া! প্রত্যেকের আদর্শকোটিতেই প্রভূত পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও লিপিচাতুর্য্যের পরিচয় পাই। অনেকেই যথার্থ কবি ছিলেন। অনেক সময় 'স্বমত' পোষণের জন্য 'এক গুঁয়েমি' দেখা গেলেও, প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু-না-কিছু 'সত্য' আছে। দেখা যাইবে, যেন সর্ব্বশেষে বহুসম্মত ভাবে দাঁড়াইয়াছে, মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতেই সুদৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়াছে, প্রাচীন ঋষির সেই 'রস'! এস্থলে লক্ষ্য করিয়া যাইতে পারি যে, সচরাচর 'ঋষি' বলিতে 'যাঁহাদিগকে বুঝায়' তাঁহাদের কাহারও এ বিষয়ে বেগতিক দৃষ্টির বা বিরূপ মতির পরিচয় পাই না। অগ্নি পুরাণ প্রভৃতিও রসকেই সঠিক ধরিয়াছিলেন। (১) 'সাহিত্যদর্পন'কার বিশ্বনাথের মধ্যে সবিশেষ

৫২। ভারতে সাহিত্যের 'আত্মা' দর্শন।

(১) আগ্নের পুরাণে আছে—

বাগ্ বৈদগ্ধ্যপ্রধানেঽপি রস এবাত্র জীবিতম্।

'মৌলিকতা' না থাকিলেও, তিনি প্রভূত পাণ্ডিত্য ও গবেষণা সাহায্যে এ'দেশের সাহিত্যচিন্তার ও অন্বেষণার সমস্ত সুফল একই গ্রন্থে সমাহার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'কাব্যপ্রকাশ'কার মম্মটভট্ট সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন,—"ব্যক্তঃ স তৈ র্বিভাবাদ্যৈঃ স্থায়ীভাবো রসঃ স্মৃতঃ"। প্রত্যেকটি কথার অর্থ বুঝিয়া, রসের স্বরূপ ও সাহিত্যে উহার পরিব্যক্তির প্রণালী হৃদয়ঙ্গম করিলেই, বেদান্তশীর্ষ প্রাচীন ভারতের কাব্যাদর্শ সমুজ্জ্বল হইতে পারে। বিশ্বনাথ অতুলনীয় ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন, রসের স্বরূপ কি? সাহিত্যের সকল আদর্শচিন্তা ও সমস্যার স্থলেই তাঁহার কথাগুলি নিয়তভাবে মনে রাখিতে হয়।

সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ড স্বপ্রকাশানন্দ চিন্ময়ঃ
বেদ্যান্তরস্পর্শ শূন্যো ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ॥
লোকোত্তরচমৎকারপ্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ
স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ॥

এই সংস্কৃত কথা কয়টীর মধ্যে ভারতবর্ষের ন্যূনাধিক তিন সহস্র বৎসরের একটা বিপুল সাহিত্যচিন্তার ও অন্বেষণার জগৎ বীজের ন্যায় সংক্ষেপিত আছে। প্লেটো-আরিষ্টোটল, প্লোটিনাস-লঞ্জীনিয়াস, ফিক্‌টেলেসীং, গ্যাঠে-শীলার, কোলরীজ্‌-ওয়ার্ডসোয়ার্থ, ম্যাথুআর্ণল্ড ও টলষ্টয় প্রভৃতির চিন্তাপথে, তাঁহাদের অনুসৃত আদর্শবিচারের পথে, প্রাচীন ভারতও নিজের দিক হইতে চলিয়া আসিয়াছে। অথচ, বলিতে পারি, নিখুঁত আদর্শদর্শনের পক্ষে তাঁহাদের অপেক্ষা সাফল্যে ও শ্রেষ্ঠতর সিদ্ধিতে উপনীত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রাচীনের সঙ্গে চিন্তাসূত্রের এবং সহানুভূতির যোগ নাই বলিয়া, অতীতের শিক্ষাদীক্ষার সূত্র বরং তাচ্ছিল্যভাবেই আমরা হারাইতেছি বলিয়া, এই দিকে, বঙ্গসাহিত্যে, এককালের 'চলা পথে'ই আবার নূতন করিয়া 'চলিতে' হইতেছে। একেবারে 'কেঁচে গণ্ডুষ' করাই অদৃষ্ট হইয়াছে! পূর্ব্ব পুরুষের চিন্তাসূত্র ও কর্ষণার সঙ্গে 'মতলব' পূর্ব্বক সম্বন্ধ বিচ্ছেদ ও মৌলিকতার অভিমানে আত্মচক্ষু মুদ্রিত করিয়াই আত্মবঞ্চনা!

কাব্যের 'আত্মা'র খোঁজ করিতে গিয়া সর্ব্বপ্রথমে বাক্যের দিকে অন্বেষকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক ছিল, কেন না, বাক্য ব্যতীত কাব্য দাঁড়াইতেই পারে না। এ'জন্য কেহ বাক্যের রীতিকে, কেহ বা উহার অলংকার ও ছন্দের বৃত্তিকেই (১) 'কাব্যের আত্মা' বলিয়া দেখিতে পারিয়াছিলেন! বলা বাহুল্য, কাব্যের এই রীতি বা বাক্য-বৃত্তির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়াতেই অলংকার, বক্রোক্তি বা ব্যঞ্জনাই কাব্যের সর্ব্বস্ব রূপে আভাসিত হইয়া অনেকের ভ্রান্তি জন্মাইতে পারিয়াছিল। তত্ত্বচিন্তার ক্ষেত্রে এরূপ ভ্রান্তিব্যাপার সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে নিত্যঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিলে অত্যুক্তি হয় না। দেহকে আত্মা বলিয়া ভ্রম হইতেই মনুষ্যলোকে দেহাত্মবাদের উৎপত্তি; তেমন, কাব্যের দেহরূপী বাক্যকেই উহার 'আত্মা' বলিয়া ভ্রমবুদ্ধি সাহিত্যদর্শনের ক্ষেত্রে, অবিবেকীর পক্ষে যেন একটী 'নিত্য ব্যাপার'। কিন্তু, মনুষ্যের মন ত উহাতেই থামে নাই! বাক্যের 'শক্তি' চিন্তা করিতে গিয়া কাব্যের কর্ত্তা বা ভোক্তার দিক হইতে কাব্যের সৃষ্টি ও স্থিতির রহস্যে মনুষ্যের দৃষ্টি গিয়াছে। কাব্যের সৃষ্টি কেন হয়? কেনই বা উহা নরসমাজে বাঁচিয়া থাকে? বলা বাহুল্য, ইহাই কাব্যের দর্শনক্ষেত্রে প্রকৃত Psychological দৃষ্টি, মনস্তত্ত্বিকের দৃষ্টি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি। এরূপ দৃষ্টিসমক্ষেই ধরা পড়িয়াছে যে বাক্য, উহার তাবৎ রীতি অলংকার ও ধ্বনি প্রভৃতি সহ, কাব্যের শারীরক উপাদান মাত্র; আনন্দই উহার নিমিত্তকারণ; আনন্দ-জন্য উহার সৃষ্টি এবং আনন্দের হেতুতেই উহা আনন্দপিপাসী নরসমাজে বাঁচিয়া আছে। এরূপে, 'কাব্যের আত্মা' দর্শন করিতে গিয়া, সাহিত্যদার্শনিক '<u>আনন্দ</u>'তত্ত্বে উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন।

এখন, বুঝিতে হইবে প্রাচীন ভারতের সুপরিদৃষ্ট এই 'আনন্দ'-তত্ত্ব এবং উহার ফল। বেদোপনিষদের যেই দৃষ্টি সৃষ্টিলীলার আদিকারণকে

(১) ভরতনাট্যশাস্ত্রে রীতি বলিয়া কোন সংজ্ঞা নাই—বৃত্তি

'আনন্দরূপ,' 'মধু-রূপ' ও 'রসস্বরূপ' বলিয়া দেখিয়াছে, সে দৃষ্টিই সাহিত্যের ক্ষেত্রে আসিয়া কাব্যের আত্মাকে 'রস' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। আবার, ত্রিমুখী মনোবৃত্তির ভূমি হইতে দেখিতে গেলে, মনোধর্ম্মী মনুষ্য জগতের 'আত্মা'কে, উহার আদিকারণকে কি বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে? কোন কথা না বলিয়া তাহার পক্ষে যেন উপায় নাই? আত্মার ত্রয়ীবৃত্তির সংযোগ এবং উহার গুণপ্রকৃতির সমাহরণরূপী ভিত্তি ব্যতীত জীবের ধারণায় যেমন জগৎকারণের 'স্বরূপ' দাঁড়াইতে পারে না, তেমন তাহার সাহিত্য-আত্মার স্বরূপও দাঁড়াইতে পারে কি? জ্ঞান-ইচ্ছা-ভাব বৃত্তিশালী মনুষ্যের মন স্বকীয় 'ভূমি' হইতেই যেন সাহজিক দৃষ্টিতে দেখিযাছে, জগতের কারণ—'সৎ-চিৎ-আনন্দ'। উহা যেমন ভারতীয় অদ্বৈতদৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য্য সিদ্ধান্ত; তেমন, অদ্বৈতমর্ম্মী ও বেদান্তশিষ্য সাহিত্য-দার্শনিকের পক্ষেও সাহিত্যের মূল উপাদান কিংবা স্বরূপের নির্দ্দেশ করিতে গিয়া এই কথাটি না বলিয়া উপায়ান্তর ছিল না—সৎ-চিৎ-আনন্দ। ভারতের সাহিত্য-দার্শনিক তাহাই করিয়াছেন। বুঝিতে হইবে, এই 'সচ্চিদানন্দের' সংক্ষিপ্ত নামই ভারতের ওই অসাধারণ শব্দ—'রস'। রসের কোন প্রতিশব্দ অপর ভাষায় নাই; থাকাও সম্ভবপর নহে। বলিয়াছি, চিত্তের অনুভূতি-ভূমি হইতে আমেরিক কবি 'পো'র ভাষায় কেবল উহার বর্ণনা চেষ্টা করিতে পারা যায়—উহা An intense and Elevating Excitement of the Soul. অভিনব গুপ্ত বলিয়াছেন, এই 'রস' কি? "স্বাকারে ইবাভিন্নো-হপি গোচরীকৃতঃ, চর্ব্যমানৈতৈক প্রাণো, বিভাবাদিজীবিতাবধিঃ, পাণকরস ন্যায়েন চর্ব্যমানঃ পুরইব পরিস্ফুরণ্, হৃদয় মিব প্রবিশন্, সর্ব্বাঙ্গীনমিবালিঙ্গন্, অন্যৎ সর্ব্বমিব তিরোদধৎ, ব্রহ্মাস্বাদমিবানুভাবয়ন্, অলৌকিক চমৎকারকারী শৃঙ্গারাদিকো রসঃ।" সাহিত্যের আদর্শবাদের ক্ষেত্রে আসিয়া, কবি-কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশক্ষেত্রে আনীত হইয়া এই 'সচ্চিদানন্দ' রসের অপর নামই 'সত্যশিব সুন্দর'রূপে দাঁড়াইতেছে। জীবনের আদর্শক্ষেত্রে আসিয়াও ভারতে 'কাব্য-আত্মা'র সাধক ও রসের সাধক কবি এবং জগদাত্মার প্রয়াণ-সাধক ঋষির আদর্শ সুতরাং অভিন্ন ও অ-দ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছে;

সাহিত্যের সাধনাও অধিকারভেদে একটা শিবাচরণ, মঙ্গল্যসাধনা ও পারমার্থিক সাধনারূপেও দৃষ্ট হইতে পারিয়াছে। সাহিত্যরস-সেবী কবির আদর্শও দাড়াইতেছে, বাক্য এবং মনের পথে, সচ্চিদানন্দসুন্দরের সাধনা; জগন্ময় ও জগৎপ্রমূর্ত্ত 'রূপরাজ' এবং রসরাজের সাধনা! সুতরাং, এই দিকে আসিয়া ভারতের দৃষ্টিতে শিল্পকলামাত্রেরই আদর্শ দাঁড়াইতেছে রসের ব্যক্তি বা রসের প্রমূর্ত্তি। সাহিত্যদর্পণকার রসের 'স্বাকার' পরিব্যক্তি এবং নিদান-উপাদানের রহস্যই উদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ে সংগ্রহ করিতে চাহিয়াছেন।

৫৩। ভারতীয় আদর্শে রসতত্ত্ব ও সাহিত্যসংজ্ঞা।

এই রসকে সাহিত্যের 'আত্মা' বলিয়া দেখিতে গেলেই, বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, রস যেমন সাহিত্যের কর্ত্তা তেমন রসানন্দশক্তিই সাহিত্যের ভোক্তা। রীতি, অলংকার, বক্রোক্তি বা ধ্বনি প্রভৃতি রসেরই গুণ ও ধর্ম্ম (১)। সুতরাং, রসের আকৃতি, রসের রীতি, রসের প্রকাশে দোষগুণ, অলংকার ও শব্দবৃত্তি—এ সকল লইয়াই এতদ্দেশে 'অলংকার শাস্ত্র'। এ স্থলে বিস্তারিত প্রসঙ্গের অবকাশ নাই; কিন্তু আমরা কেবল 'দিক্‌প্রদর্শন' স্বরূপেই বলিতে পারি যে, ভারতীয় 'বেদপন্থী' এবং অদ্বৈতবাদীর আদর্শস্থান হইতেই সাহিত্যে রসের এই 'সচ্চিদানন্দ'উপাদানের প্রকাশকে বুঝিতে হইবে। কেমন করিয়া রস সৎ-ত্ব-ময় ও 'স্বপ্রকাশানন্দ-চিন্ময়'? কি করিয়া সাহিত্যে উক্ত প্রকাশ 'স্বাকারবান্' ও 'লোকোত্তর চমৎকার প্রাণ'? আবার, কেমন করিয়া এই রসানন্দ 'অখণ্ডভাস্বর' ও 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর'?

(১) কাব্যপ্রকাশকার লিখিয়াছেন, আত্মার যেমন শৌর্য্যবীর্য্যাদি গুণ, তেমন দ্রুতি-দীপ্তি-প্রসাদ প্রভৃতি কাব্যের আত্মভূত রসেরই গুণ—

যে রসস্যাঙ্গিনো ধর্ম্মাঃ শৌর্য্যাদয় ইবাত্মনঃ।
উৎকর্ষ হেতবস্তেস্যু রচলস্থিতয়ো গুণাঃ॥

অদ্বৈতদৃষ্টি ব্যতীত যেমন জগতের আত্মা, যেমন ধর্ম্মের আত্মা, তেমন সাহিত্যের আত্মাও স্বরূপে পরিদৃষ্ট হইবে না। ভারতের শ্রুতি কোন্ দিক হইতে জিজ্ঞাসুকে পথ দেখাইয়াছেন—"আনন্দদেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং ব্রজন্ত্যভিসংবিশন্তিঃ। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম"? কেমন করিয়া বলিয়াছেন "রসো বৈ সঃ"? আবার বলিয়াছেন, "ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি"? কি করিয়া রসের ভূমাত্ব, ব্যাপকত্ব, বিষ্ণুত্ব? কি করিয়া রসসাধকের নাম বৈষ্ণব? 'উজ্জ্বল নীলমণি' নামক আপাতদর্শনে একটি সাহিত্যশাস্ত্র, তাহা 'অলংকার'-গ্রন্থই কি করিয়া এতদ্দেশে ধর্ম্মগ্রন্থ রূপে দাঁড়াইল? ভারতে বৈষ্ণবতা হইতে, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ব্যাসবাল্মীকি হইতেই কি করিয়া সাহিত্যের উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি? ভারতে কাব্যরসের সাধককবি কেমন করিয়া ধর্ম্মসাধক বা ব্রহ্মসাধক 'ঋষি'রূপে পরিণতি লাভ করে? কবি কেমন করিয়া রস-প্রেমিক ও রসক্ষেত্রের 'মীষ্টিক' হইয়া গিয়া ধর্ম্মক্ষেত্রের 'মহাভাব'সাধকরূপে উদ্বর্ত্তিত হইয়া দাঁড়ায়? ভারতের কবিই অদ্বৈতদৃষ্টিস্থান হইতে দেখিয়াছে, যেমন জগতের নিদানের, তেমন জগতের চরম লক্ষ্যের নামটিও 'আনন্দ' —রসরাজ! তিনি যেমন জীবের অন্তর্জগতে, তেমন জীবের সাহিত্য জগতেও 'সচ্চিদানন্দ'স্বরূপ ও 'অখিল রসামৃতমূর্ত্তি'! যা' আছিল তাঁহাতে, তাই আসিল ভাণ্ডে, তাই ছাইল ব্রহ্মাণ্ডে।

ভারতবর্ষ এ'রূপে আত্মবিজ্ঞান হইতেই মনস্তত্ত্বে অভ্রান্তদৃষ্টি পরিচালিত করিতে পারিয়াছিল এবং উক্ত দৃষ্টিবলে 'সৎ-চিৎ-আনন্দ'কেই বিশ্বজগতের উপাদান ও নিদানরূপে দেখিয়াছিল; উক্ত দৃষ্টিস্থান হইতেই আবার মনুষ্যের যাবতীয় 'জ্ঞানকর্ম্মভাব'চেষ্টার চূড়ান্ত লক্ষ্যকেই 'সচ্চিদানন্দ' বা 'সত্যশিব সুন্দর' রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিল! এই তত্ত্ব সমীপে এবং এই দৃষ্টিস্থানে আমাদিগকে বর্ত্তমান গ্রন্থপ্রসঙ্গে বারংবার আসিতে হইবে—অনিচ্ছাতেও আসিতে হইবে। উহা সাহিত্যদর্শনের চূড়ান্ত তত্ত্ব এবং সাহিত্যজগতের ধ্রুবকেন্দ্র! 'কেন্দ্র' বলিয়া এ স্থলেই যেমন মনুষ্য-জীবনের সকল বিষয়ের চূড়ান্ত গতি, তেমন মনুষ্যের সাহিত্যেরও চূড়ান্ত

যথা! কেন্দ্রকে বিস্মৃত হইলেই ভ্রম অনিবার্য্য। ভ্রম কতটা অনিবার্য্য, তাহা ইয়োরোপের সাহিত্য-সমালোচনার ইতিহাসই সর্ব্বত্র প্রমাণিত করিবে। আমরা দেখিতে পারি, ইয়োরোপীয় সাহিত্যে ক্লাসিক্, রোমান্টিক্, রিয়ালিষ্ট্, নেচরেলিষ্ট্ প্রভৃতি নামে যত 'মত' উদ্ভূত হইয়াছে, সাহিত্যের আদর্শদর্শনেও যত প্রকার বিবাদ, ভ্রান্তি ও গোঁড়ামী ঘটিয়াছে, সমস্তের গোড়ায় এই 'কেন্দ্র' দৃষ্টির অভাব—ভারতবর্ষের লোক বলিবে, অদ্বৈতদৃষ্টির অভাব! আসল 'এক্‌ ভুল' হইতেই সকল ভুল!

৫৪। সাহিত্যের 'আত্মা' নিরূপণে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ।

রসে মনের ত্রিমুখী বৃত্তি ও মনোমধ্যেই আবার 'জগৎপ্রতীতির' ভিত্তি চিন্তা করিয়াই বলিতে পারি যে, ভারতীয় সাহিত্যদার্শনিকের এই 'রসাত্মতা' অপেক্ষা সত্যবান্ এবং সার্থকতর কাব্যসংজ্ঞা সাহিত্যজগৎ দেখিতে পারে নাই। বিদেশের সাহিত্য-দার্শনিকগণ কেহই যেন বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে এবং মনস্তত্ত্বের ভূমি হইতে বিষয়টির দিকে দেখেন নাই। যখন ফিক্টে বলিয়াছিলেন "Poetry is an expression of a Religious Idea," প্লাতো যখন বলিয়াছিলেন উহা "Application of moral ideas to Life," রাস্কিন যখন বলিয়াছিলেন "All Art is Praise," কিংবা কোলরীজ যখন বলিয়াছিলেন "Poetry is best words in their best order," বা শেলী বলিয়াছিলেন, উহা An expression of the Imagination," অথবা ম্যাথুআর্ণল্ড্ যখন বলিয়াছেন "Poetry is Criticism of life" তখন তাঁহারা কাব্যের 'আত্মা' নিরূপণে যেন চেষ্টাই করেন নাই! কেহ কেহ কাব্যের নৈতিক আদর্শ ও কর্ত্তব্যতা নিরূপণকে এবং সেইদিক হইতে কবির কর্ম্মনিয়ন্ত্রনাকেই যেন লক্ষ্য করিয়াছিলেন; কেহ বা কবির বাক্যরীতিকেই লক্ষ্য করিতেছিলেন; কেহবা কবিচিত্তের 'জ্ঞান'বৃত্তি বা সত্যনিষ্ঠাকেই যেন মুখ্য করিতে ও জাগাইতেছিলেন। এরূপে, জর্ম্মণীর সাহিত্যদার্শনিকগণ হইতে আরম্ভ করিয়া রুশীয়ার প্রতিভাপুত্র টলষ্টয় পর্য্যন্ত, "What is Art" গ্রন্থের রচয়িতা টলষ্টয় পর্য্যন্ত সকলের 'সংজ্ঞা' নিরূপণের চেষ্টাফল চিন্তা করিলেই বুঝিব,

কেহই যেন কাব্যকে মনুষ্যমনের ত্রয়ী বৃত্তির ভিত্তিভূমির দিক্ হইতে দর্শন করেন নাই। কেবল ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থ যখন বলিয়া উঠিলেন, "Poetry is the Impassioned expression set in the Countenance of all science" অথবা, যখন বলিলেন যে, উহা "Emotion recollected in Tranquility" তখনই বুঝিতে পারি যে, তিনি কাব্যতত্ত্বের কাছাকাছি আসিয়াছেন! তত্ত্বনিরূপণের এ সমস্ত চেষ্টাকে পরিদর্শন করিয়া একটা বৃহৎ ইতিবৃত্ত এবং আলোচনার গ্রন্থ বিরচিত হইতে পারে। উহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা দেখাইতে চাই যে, ভারতীয় সাহিত্যদার্শনিকের অনুসরণে সাহিত্যকর্ত্তা জীবের রসতত্ত্বের দিক হইতেই সাহিত্যের 'আত্মা' নির্ণয়! কবি এবং কাব্যের তত্ত্বনিরূপণের পক্ষে উহা সর্ব্বাপেক্ষা সন্তোষজনক 'সংজ্ঞা'। সাহিত্যের আকৃতি ও প্রকৃতি, সাহিত্যের স্বধর্ম্ম, সাহিত্যের আদর্শ সমস্যা ও সাহিত্যের 'সাধনা' নির্দ্ধারণেও ভারতের এই 'রস' অপেক্ষা সন্তোষজনক বস্তু সাহিত্যজগৎ যে দেখিতে পারে নাই, তাহার সঙ্কেত উদ্দেশ্যেই আমরা এই 'বাহুল্য' করিয়া আসিলাম।

৫৫। ললিতকলার ক্ষেত্রে কাব্যের বিশেষত্ব ও মাহাত্ম্য।

ভাষার ক্ষেত্রে আসিয়া 'রস' যেই 'দেহ' গ্রহণ করে তাহার নামই কাব্য। ললিতকলা ক্ষেত্রে কাব্যের বিশেষত্ব ও তুলনায় মাহাত্ম্যটি না বুঝিলেও ভ্রম সম্ভাবনা থাকিবে। আবার, 'আকৃতিবান্' কাব্যের প্রাণস্বরূপ রসপদার্থের 'অখণ্ডতা'ও হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। কাব্যে শব্দ ও অর্থ নিত্যসম্বদ্ধ পদার্থ; উহাতে কেবল এইমাত্র বুঝিলেই চলিবে না যে, যেখানে শব্দ আছে সেস্থানে অর্থও আছে। বুঝিতে হইবে, উৎকৃষ্ট কাব্যে শব্দ হইতে অর্থকে কদাপি বিযুক্ত করিতে পারা যায়। প্রত্যেক শব্দের উচ্চারণ মধ্যেই একটা ছন্দ আছে—যাহা অদ্বিতীয় ও অসাধারণ; তেমন, প্রত্যেক শব্দেরই একটা 'সাক্ষাৎ সঙ্কেতো' অর্থ আছে; লক্ষণা (Indication) ও ব্যঞ্জনা বা অনুরণনের (Suggestion, Resonance) যোগ্যতাও আছে—বলিতে পারা যায় যে,

উহাও 'অসাধারণ'। উৎকৃষ্ট কাব্য এইরূপ শব্দার্থেরই সুযোগসমষ্টি। অতএব বলিতে পারি, যেমন প্রত্যেক বাক্য, তেমন প্রত্যেক কাব্যই একএকটী বিশেষত্বজীবী প্রাণী; এবং এই রস কিংবা প্রাণপদার্থও 'অখণ্ডণীয়'। এইরূপে, কাব্যের বাক্যই হইতেছে তাহার অর্থের বা বা ভাবের দেহ—রসার্থের রূপক (Symbol). এই দিক হইতে দেখিলে, কবিমাত্রেই রূপকবাদী বা সিম্বোলিষ্ট্, এবং কাব্যও দাঁড়াইতেছে—ভাবের নিরূপণা বা পরিমূর্ত্তনা।

কবি অসাধারণ সৌভাগ্যসুযোগে বাক্যের যেই প্রয়োগ প্রণালীতে তাঁহার অর্থকে বাক্যরূপিত করেন, অথবা বাক্যকে অর্থপ্রাণিত করেন, সাহিত্যশাস্ত্রে তাহার নাম 'রীতি'। এজন্য, রীতির মহাত্মতার উপরেই কাব্যের মাহাত্ম্য ফলতঃ নির্ভর করিতেছে দেখিয়া, উক্ত প্রকাশের দিকটাই বড় ভাবিয়া, প্রাচীন সাহিত্যদার্শনিক বামন বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "কাব্যস্য আত্মা রীতিঃ"। ঠিক এই ভাবে, বাক্যগত প্রকাশের শক্তিকেই কবির সর্ব্বস্ব স্থির করিয়া ফরাসী দেশের Buffon তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ উক্তিটি করিয়াছিলেন—"the style is the man"! এদিকে বামনের উক্তি বরং যেন ব্যুফঁ অপেক্ষা আরও অধিক অগ্রসর! কাব্যের যাহা আত্মা বা প্রাণ, যখন রীতি পথেই তাহার প্রকাশ, তখন ওই অচিন্ত্যস্বরূপা এবং অনির্ব্বচ্যগুণা 'রীতি'কেই বামন কাব্যের 'আত্মা' রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—The style is the soul. মনে পড়িতেছে, আধুনিক ইয়োরোপের কোন সমালোচনা গ্রন্থে বামনের উক্তিরই যেন হুবহু প্রতিধ্বনি পাইয়াছি—"The style is the soul". রীতির মধ্যে যেমন প্রত্যেক কবির স্বীয় আত্মার প্রকাশ, তেমন কাব্য-আত্মারও প্রকাশ। সুতরাং, প্রত্যেক কবির 'রীতি'ই সূক্ষ্মভাবে অনন্যসাধারণ ও অনন্যসম্ভব বলিয়া, কাব্যের ওই অসাধারণ বাক্যসমষ্টি, বাক্য-আকৃতি এবং বাক্য-আত্মা লইয়াই প্রত্যেক কাব্যের প্রাণীত্ব ও ব্যক্তিত্ব। এজন্যই কাব্যের বাক্য কিংবা অর্থকে খণ্ডেখণ্ডে বিভক্ত করিয়া এবং অনুবীক্ষণে উহাকে পরীক্ষা করিয়াও কাব্যরূপী প্রাণীটার ব্যক্তিত্বে এবং উহার

প্রাণের তত্ত্বে উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। তাই, আমরা অন্যত্র বলিয়াছি—

কবিতার সর্ব্বাকৃতি জুড়ে
নিবাসী পরাণ তার—বৃথা অন্বেষণ!
কাব্যের পরাণলক্ষ্মী অতলের পুরে!
হৃদয় সমুদ্রশায়ী কেশবের ধন।

অতএব, কাব্য বলিতে উহার বাক্যরূপী স্থূল শরীর ও অর্থরূপী সূক্ষ্ম শরীরের ধারণা অপরিহার্য্য; এবং সাহিত্য বলিতেও জড়সংসার হইতে বিভিন্নক্ষেত্রের একটা চিন্ময় সংসারকেই লক্ষ্য করা হয়। অদ্বৈতবাদী ভারতীয় ঋষির সমক্ষে এজন্য সাহিত্য 'এক'ই ব্রহ্মের শব্দার্থময় বিবর্ত্ত। সুতরাং, সাহিত্যের রসভাবের বা বাগর্থ প্রমূর্ত্তির সাধনাও চূড়ান্তে গিয়া জীব-জীবনের পরমার্থ ও চিন্ময়ী গতির সঙ্গে অভিন্ন ভাবেই দৃষ্ট হইতে পারে। শব্দব্রহ্মবাদীরসমক্ষে এ'জগৎ ব্রহ্মের বাগর্থরূপী লীলা-বিকাশ; সাহিত্যও উক্ত চরমতত্ত্বেরই পরিণতি বা বিবর্ত্ত। রুদ্রযামল বলিয়াছেন,

শব্দরূপং যদখিলং ধত্তে সর্ব্বস্য বল্লভা।
অর্থরূপং যদখিলং ধত্তে মুগ্ধেন্দুশেখরঃ॥

ললিতকলার সোপানে, সঙ্গীত ও কাব্যের বিভিন্ন রীতি এবং জাতি, সঙ্গীত হইতে কাব্যের বিভিন্ন ক্রিয়াভূমি, প্রযোগ তন্ত্র এবং শক্তিকে বিশেষিত ভাবে হৃদয়ঙ্গম না করিলেও নিত্যকাল ভ্রমসম্ভাবনা থাকিয়া যাইবে। অর্থক্ষেত্রে সঙ্গীত কেবল একটী মাত্র ভাববিন্দুকে অবলম্বন করিয়াই শক্তি প্রকাশ করিতে পারে। ভাবের সঙ্করতা ঘটিলে, অর্থের বিস্তারিতক্ষেত্রে আসিলে, চিন্তা অথবা মনোমূর্ত্তির বৈচিত্র্য এবং বহুত্ব ঘটিলেই সঙ্গীতের শক্তি প্রবল হইতে পারে না। বিস্তারিত অথবা দেশেকালে প্রসারিত বস্তুর ভূমিতে আসিলেই সঙ্গীত সাহিত্যের হস্তে স্থান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। এই দৃষ্টিস্থান হইতে, পেটার ও সাইমন্সের উল্লিখিত আপত্তি বহুশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতের সাহিত্যদর্শনে

ফলতঃ মীমাংসিত হইয়া গিয়াছিল। এ'দেশের সাহিত্যদর্শনের একটা 'গোড়ার কথা' এই যে, 'কাব্যের আত্মা' খুঁজিতে যাইয়া কোন দার্শনিকেই 'ছন্দকে' কাব্যতার পক্ষে অপরিহার্য্য বলিয়া মনে করেন নাই। এজন্য, এতদ্দেশে 'সাহিত্য' ও 'কাব্য' অনেক সময় অভিন্নার্থেই ব্যবহৃত। কাযেই, গদ্যবাক্যের আপাততঃ ছন্দহীন রূপ তাঁহাদিগকে ভাবিত করে নাই; কিন্তু, বিস্তারিত কাব্যমাত্রের মধ্যে যে বহু 'গদ্যপ্রকৃতির' বাক্য বা নীরস কথা থাকিতে পারে, উহাও তাঁহাদের দৃষ্টি এড়ায় নাই। উহা চিন্তা করিয়াই সাহিত্যদর্পণকার বলিয়াছেন যে, ওইরূপ গদ্যাত্মক বা বিরস বাক্য হইতেও 'কাব্য'ত্বের হানি হয় না; সে গুলি সমগ্র কাব্যের রসব্যক্তি এবং রসাত্মতার পক্ষে অপরিহার্য্য বলিয়া, অধিকন্তু সহায়ক বলিয়াই থাকে (১)। যেমন, মেঘদূত কাব্যের প্রথম কতিপয় শ্লোক! বিস্তারিত মেঘদূতকাব্যের রসসামগ্রী উহার সকল অপরিহার্য্য গদ্য ও পদ্য বাক্যের সম্মিলন ও সংগ্রহজনিত ঘনফল—Cumulative effect রূপেই উদ্বর্ত্তিত হইয়া দাঁড়াইতেছে। এইরূপে, আপাততঃ রসাত্মাহীন অনেক গদ্যকথাও কাব্যশরীরে আসিয়া, উহার প্রবন্ধরসে জারিত হইয়া, পরমসার্থক ও রসাত্মক হইতেও দেখা যাইবে।

ললিতকলার সোপানে একদিকে যেমন সঙ্গীতের তুলনায় কাব্যকে বুঝিতে হয়, তেমন অন্যদিকে, চিত্র ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রতত্ত্ব এবং শক্তির তুলনাতেও উহাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। যে আদর্শে বলা হয়, রসই কাব্যের আত্মা, সে আদর্শে তাবৎ শিল্পসম্ভূতির আত্মাকেই রসস্বরূপে নির্দ্দেশ করা যায়—রসাত্মকতা লইয়াই সকল ললিতকলার স্থিতি ও মাহাত্ম্য। কাব্যকে 'রসাত্মক বাক্য' বলিতে হইলে, চিত্রকে বলিতে পারি উহা 'রসাত্মক তৌল্য'। এরূপে সঙ্গীত প্রভৃতির প্রাণকেও

সাহিত্যদর্পনকার বলিয়াছেন—নমু তহি প্রবন্ধান্তর্বর্ত্তিনাং কেষাংচিৎ নীরসানাং পদ্যানাং কাব্যত্বং ন স্যাদিতি, ন। রসবৎ পদ্যান্তর্গত নীরসপদানামিব পদ্যরসেন প্রবন্ধরসেনৈব তেষাং রসবত্তাঙ্গীকারাৎ।

রসায়ণতার দিক হইতেই দর্শন করিতে পারি। ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্র এবং প্রয়োগযন্ত্র ভেদে একই রস ভিন্ন ভিন্ন ভৌম আকৃতি প্রাপ্ত হইতেছে! এইরূপ ভেদ হইতে প্রত্যেক শিল্পজাতিরই সবিশেষ শক্তি, সুবিধা এবং অ-সৌকার্য্যও আছে। বাক্য জড়জগতের অথবা মনোজগতের যাবতীয় মনোগম্য পদার্থ মাত্রেরই মানসী ছবি গ্রহণ করিতে পারে বলিয়া, কাব্যের শক্তি ও তাহার পরিধি দেশকালের কোন ক্ষেত্রগণ্ডী অথবা প্রয়োগযন্ত্রের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। মনুষ্যের ভাবনাশক্তি অসীম এবং তাহার মনের ক্ষেত্রও অনন্তপ্রসারী! চিত্র বা সঙ্গীত কেবল সীমাসৃষ্টির ক্ষুদ্রকে কিংবা ভাবের বিন্দুমাত্রকে লইয়াই আত্ম-প্রকাশ করিতে বাধ্য। কাব্যের পক্ষে সেরূপ কোন বাধ্যতা নাই, সত্য; কিন্তু, পরিদৃশ্য রূপের ক্ষেত্র এবং প্রত্যক্ষ আকৃতির ভূমি বলিয়া চিত্র স্বকীয় ভূমিতে যেই পরিস্ফুটতা (vividness) সিদ্ধি করে, তাহার নিকটবর্ত্তী হওয়াও কাব্যের সাধ্য নহে। এইরূপে সঙ্গীত, কাব্য, চিত্র, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য প্রভৃতি ললিতকলা পর্য্যায়ক্রমে স্থূল হইতে স্থূলতর ক্ষেত্রে ভাবের প্রয়োগতন্ত্র এবং রসসাধনার বিকাশ। প্রত্যেকটীর শক্তি স্বকীয় ক্রিয়াভূমির ধর্ম্মেই বিশেষিত এবং সীমান্বিত। জড়তন্ত্রতা বা জড়ের প্রত্যক্ষধর্ম্মের যতই বৃদ্ধি, ততই চিন্তা এবং ভাবের গভীরতা ও প্রসারের শক্তি-হানি। অন্যদিকে, জড়তন্ত্রীয় বাস্তবতা, দৃশ্যধর্ম্ম ও প্রত্যক্ষপ্রিয়তার যতই হ্রাস, ততই মনোমত্তা, মনস্বিতা এবং আত্মবত্তার বিকাশ।

৫৬। পঞ্চবিধ ললিত-কলার সোপানে সাহিত্যের তুলনায় স্থান ও বিশেষত্ব।

সর্ব্ববিধ কলার ক্ষেত্রে পরিকল্পনাই (Imagination) রসসাধকের প্রধান শক্তি এবং উহার সর্ব্বপ্রধান ব্যাপারটীও ভাব-চিন্তার Image বা আকৃতির নির্ম্মাণ—রসের অভিব্যক্তিরূপী চিন্ময় আকৃতির রচনা। কবি উহা ভাষাপথে শব্দের অর্থশক্তিতেই সমাধা করেন। চিদাকাশে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ ও শব্দ—এই পঞ্চবিষয়াত্মক আকৃতি বা imageই সৃষ্ট হইতে পারে; তন্মধ্যে, অবশ্য, 'মনোরূপা' আকৃতিই সর্ব্বাপেক্ষাঅধিক

স্থিতিবতী ও বলবতী। পরন্তু, এইরূপ শব্দ-সঙ্কেতিত আকৃতিও চারি প্রকারে দাঁড়ায়। (১) কবি শব্দের সাহায্যে যেই আকৃতি মনোলোকে সৃষ্টি করেন, চিত্রকর ও ভাস্কর আপনাদের প্রয়োগভূমিগতিকে উহাকে একেবারে দৃশ্য রূপেই, চক্ষুর সমক্ষে উপস্থিত করার সুযোগ পাইতেছেন। তাঁহাদের এই 'পরিস্ফুটতা' কবি কখনও পাইবার আশা করিতে পারেন না। শব্দ-শক্তিজাত চিন্ময় আকৃতি কদাপি চিত্রকর ও ভাস্করের উপস্থাপিত দৃশ্য প্রতিকৃতি বা প্রতিমা অপেক্ষা পরিস্ফুট হইতে পারিবে না—এ ক্ষেত্রে তাঁহাদের স্পষ্টতারই জয়—জড়ুতন্ত্রিক বলিয়াই জয়! কিন্তু, অন্যদিকে, প্রয়োগক্ষেত্রের এই বিস্পষ্টতা গতিকেই চিত্রকর কিংবা ভাস্করের ভাব ও চিন্তার ক্ষেত্র, ক্রিয়াভূমি এবং কল্পনার ক্ষেত্র অত্যন্ত সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কবি তাঁহার ভাষার সাহায্যে, শব্দের অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা শক্তির সাহায্যে যেই সূক্ষ্মজগতে প্রবেশ করেন, মনুষ্যত্বের প্রধান স্বত্বভূত ও ধর্ম্মভূত যেই মনোজীবন, গভীর মনস্তত্ত্ব ও আত্মতত্ত্বের অন্তঃপুরে কবি প্রবেশ করিতে পারেন, চিত্রকর বা ভাস্কর উহার সদরদ্বারটুকু ছাড়া-ইতেও পারেন না, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কাব্যের দূর-দূরান্তগামিনী চিন্ময়ী শক্তি! অনন্ত দেশকাল ও মনুষ্যমনের জ্ঞানকর্ম্মভাবের তাবৎ মনোগম্য এবঞ্চ অগম্য বিষয়ও কবিকল্পনার ক্রিয়াক্ষেত্র! কবি এই কল্পনার সাহায্যে অজড় ও অরূপলোকে, প্রত্যক্ষদৃষ্টির অগম্যলোকেও মনুষ্যচিত্তকে সঙ্কেতচালিত করিতে, উপনীত, উপনয়নযুক্ত অথবা সুস্থিত করিতে পারেন; কিন্তু, কেবলমাত্র দৃশ্য'রূপে' প্রকটিত পদার্থ ব্যতীত অন্য কুত্রাপি

(১) ভাষার যাবতীয় সঙ্কেতকে মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে সাহিত্যদর্পণকার জাতি, গুণ, দ্রব্য ও ক্রিয়া—এই চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। অতএব 'সাহিত্যের' জগৎ'কে এই চারিপ্রকার শব্দসংকেত-জাত জগৎ বলিতে পারা যায়; "সংকেতং গৃহ্যতে জাতৌ গুণ-দ্রব্যক্রিয়াসু চ।" এ'দিক হইতেই বলা যায় যে, সাহিত্যজগৎ প্রকৃত প্রস্তাবে বাস্তবজগৎ (Materialistic) নহে; শব্দসংকেতিত Imageএর বা মনোমূর্ত্তির জগৎ। বলিতে পারা যায়, উহা Idealistic জগৎ।

চিত্রকরের গতি নাই। যাহা দৈর্ঘ্যপ্রস্থযুক্ত পটে নিরূপণীয় বা চিত্রণসাধ্য নহে, তাহাই সুতরাং চিত্রকরের পক্ষে অনধিকার ও অসাধ্য। ভাবের ক্ষেত্রেও, মনুষ্যের অত্যন্ত স্থূলবৃত্তির Passion (যাহা মনুষ্যের মুখে বা তাহার আকারে-ইঙ্গিতে-চেষ্টায় প্রকাশ্য হইতে পারে কিংবা বহিঃপ্রকৃতির যেই 'রূপ' মনুষ্যের স্থূলদৃষ্টির 'গম্য' হইতে পারে তাহাই) সুতরাং চিত্রের 'বিষয়'। চিত্রকরের কল্পনাশক্তি, কিংবা চিত্রের লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনার শক্তিও সুতরাং সবিশেষ দূরগামী অথবা সূক্ষ্মগামী হইতে পারে না; প্রকাশের medium—প্রয়োগযন্ত্র ও ক্রিয়াভূমির দ্বারা চিত্রকরের কল্পনা সীমাবদ্ধ; উহার শক্তিও সুতরাং সামাবদ্ধ। আবার, দৃশ্যপ্রকৃতিকে, দৃশ্যের নৈসর্গিক ধর্ম্মকে, এমন কি, দৈর্ঘ্যপ্রস্থের স্বাভাবিক অনুপাতকে সামান্যমাত্রায় অতিক্রম করিতে গেলেই, অনুপাতের বাহিরে বা উহার বিপরীতে কোনরূপ লক্ষণা অথবা ব্যঞ্জনাকে পরিচালিত করিতে গেলেই চিত্রকরের চেষ্টা 'অস্বাভাবিক' হইয়া উঠে—তাঁহার 'অর্থ'ও বিরূপ, বিসদৃশ, বেদারা, বিচিকিৎস এবং বীভৎস হইয়া উঠে! এ'অবস্থায় ভাস্করের ত কথাই নাই। প্রয়োগক্ষেত্রে তিনি চিত্রকর অপেক্ষাও জড়তা এবং বিস্পষ্টতার সুযোগ পাইয়াছেন, দৃশ্যপদার্থকে উহার দৈর্ঘ্যপ্রস্থ-বেধে সুস্পষ্ট ও সুপ্রত্যক্ষ প্রতিমায় উপস্থিত করিতে পারিতেছেন। কিন্তু, উহার গতিকেই ভাস্করের পরিকল্পনা, দেশকাল-ভাব এবং চিন্তায় উহার লক্ষণা অথবা ব্যঞ্জনার শক্তি, চিত্রকর অপেক্ষাও পঙ্গু এবং শৃঙ্খলিত। সুতরাং, যেমন চিত্রে, তেমন ভাস্কর্য্য প্রভৃতির ক্ষেত্রেও পদার্থের স্বাভাবিক দৃশ্যতা-ধর্ম্মের বিপরীতে কোনরূপ Symbol, কোনরূপ রূঢ়ি (Convention), লক্ষণা অথবা ব্যঞ্জনার প্রয়োগ সহজেই সাংঘাতি হইতে পারে—রসের পক্ষে একেবারে হত্যাব্যাপার, কিংবা রসের আত্মঘাতী ব্যাপাররূপেই দাঁড়াইতে পারে।

এ'স্থলে দাঁড়াইয়া, কলাশিল্প গুলির অত্যাচরণ এবং পরস্পরের ক্ষেত্রে 'অনধিকার'প্রবেশের বিষয়টিও মোটামোটি দৃষ্টি করা যায়। বলিয়াছি, সঙ্গীত ভাবমুগ্ধ অবস্থায় স্নায়ুতন্ত্রিক হইয়া কেবল শ্রুতিসুখদায়ক শব্দ

এবং অস্পষ্ট বা অর্থহীন স্বরধ্বনিও করিতে পারে ; চিত্রকরও পদার্থের গতি দেখাইতে গিয়া কিংবা দূরাবস্থিত বস্তু দেখাইতে যাইয়া, পদার্থকে ছায়া-ছায়া অথবা ধোঁয়া-ধোঁয়া আকারে অঙ্কিত করিতে পারে—চিত্রের ক্ষেত্র কেবল পরিদৃশ্য 'ছায়া-আলোকের লীলাভূমি' বলিয়াও উহা পারে। এ'জন্য, গ্যাঠে যেমন সঙ্গীতক্ষেত্রে অস্পষ্টতার আদর্শ সমর্থন করিয়াছেন, তেমন রাস্কিনও চিত্রের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতার মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়াছেন। সঙ্গীত ও চিত্রের বিশেষ বিশেষ অধিকার বোধে ভ্রান্ত হইয়া এবং 'স্বাধিকার প্রমত্ত' হইয়াই যে কবিগণ সাহিত্যক্ষেত্রে অস্পষ্টতা এবং অনর্থতার আদর্শ ঘোষণা করেন—তাহা ইতঃপূর্ব্বে সঙ্কেতিত হইয়াছে। উভয়দিকেই, সঙ্গীত ও চিত্রের আদর্শক্ষেত্রে সাহিত্যের অতিবর্ত্তন! আবার, চিত্রকরও সাহিত্য কিংবা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কিরূপে অত্যাচারী হইতে পারেন? ভাষার ক্ষেত্রে শব্দের লক্ষণা বা ব্যঞ্জনা এক একটা পরম শক্তি। কবি উহার সাহায্যে আমাদের চিত্তলোকে নিত্যকাল 'আকৃতি'র সৃষ্টি কবিয়া আসিতেছেন। নিপুন এবং সাবধান ভাবে শব্দের এই শক্তির প্রয়োগ করিতে পারা লইয়াই কবিতে-কবিতে বর্ণনাশক্তি বিষয়ে প্রধান পার্থক্য। কবিত্বের সর্ব্বপ্রধান শক্তি, বলিতে পারি, শব্দ সাহায্যে মনোদৃষ্টির সমক্ষে এইরূপ 'বর্ণনা'; যাহার নাম দিতে পারি, সাহিত্য-ক্ষেত্রীয় 'চিত্রনী' শক্তি। নিপুন কবি শব্দের সাক্ষাৎ-সঙ্কেতে অথবা উহার কোন সবিশেষ লক্ষণা বা ব্যঞ্জনার উপর জোর দিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে শব্দটীর অনভীষ্ট সঙ্কেত গুলি নিবারিত করিয়াই উক্ত বর্ণনা সমাধা করেন। এই দিকে এতদ্দেশের একটা চিরাগত ও সুপ্রচলিত দৃষ্টান্ত, যেমন 'চন্দ্রমুখী'। 'চন্দ্রমুখ' বলিতে যদি চন্দ্রের নির্ব্বিশেষ সুগোল আকৃতিটুকুই মনোনেত্রে প্রাধান্যক্রমে স্ফুট হইয়া উঠে, তাহা হইলে একটি নিতান্ত হাস্যকর ছবিই দাঁড়াইয়া যায় না কি? ফলে, বিলাতফেরতা এক বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি, বাঙ্গলা গানের "Moon Faced Lady" অনুবাদ শুনিয়া কোন বিলাতী মহিলা 'হাসিয়া আকুল' হইয়া পড়েন! "Does she not

৫৭। কলাশিল্পের পরস্পর অনধিকার প্রবেশ।

look very foolish?" উহা একটা নির্ব্বোধের মুখশ্রী নহে কি? মহিলাটী না কি চিত্রকরও ছিলেন। তখন বন্ধুবরকে বুঝাইতে হইল 'চন্দ্রমুখ' অর্থে আস্ত গোলাকারটিই মুখ্য নহে; চন্দ্রের দীপ্তি এবং সুষমাই মুখ্য; তাহার সঙ্গেসঙ্গে চন্দ্রাকৃতির আভাসমাত্র এবং উহাও গৌণ। এস্থলে কেবল 'বিলাতী রুচি' অথবা বিলাতী চিত্রকরের 'জড়তন্ত্রিক' বুদ্ধির দোষ দিলেই চলিবে না। সাহিত্যের এই উপমা ভারতীয় কবির সৃষ্টি—আমাদের জাতীয় সাহিত্যে সুপ্রচলিত। বিপুল বিলাতী সাহিত্যে মুখের সহিত চন্দ্রের উপমা দুর্ঘট। ভারতবর্ষের দৃষ্টিতে মুখের শুভ্র সুষমা সৌন্দর্য্যের একটা মুখ্য লক্ষণ। রমনীমুখের চন্দ্রোপমার আদি কবি 'চন্দ্র' শব্দের 'আহ্লাদক' লক্ষণে জোর দিয়া, গোলাকৃতির অনভীষ্ট সঙ্কেতটী ন্যূনাধিক 'চাপা দিতে' পারিয়াছিলেন। আমাদের চন্দ্র এবং ইংরেজী Moon শব্দের ব্যঞ্জনাশক্তিতেও কত পার্থক্য! এস্থলে আবার চিত্রকরের দৃষ্টি! উহা ত ন্যূনাধিক জড়তন্ত্রিক না হইয়াই পারে না; এবং চিত্রকরও তাঁহার 'দৃশ্য'ক্ষেত্রে, কবির রীতি অনুসরণে, ওইরূপ 'লক্ষণা'র প্রয়োগ করিতে পারেন না, বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এই দৃষ্টান্তে যেমন সাহিত্যের 'বাক্য'চিত্র এবং চিত্রের 'দৃশ্য'চিত্রণের প্রয়োগ-পার্থক্য বুঝিতে হয়, তেমন সাহিত্যক্ষেত্রে শব্দের লক্ষণাবৃত্তি এবং উহার বিপ্রতিপত্তি ও বিপত্তির সম্ভবপর স্থলগুলিনও বুঝিতে পারা যায়। কাব্যে যাহা আকৃতি তাহার সঙ্কেত শব্দপথে মনোদৃষ্টি সমক্ষে আসে এবং তদনুক্রমে মন একটা আকৃতি সৃষ্টি করিয়া লয়; কিন্তু চিত্রের বেলায় মন আর সেরূপ সৃষ্টি-প্রয়াস করেই না; স্বয়ং চিত্রটিই দৃষ্টিসম্মুখে চিত্রকরের ভাবের হুবহু 'রূপক' হইয়া উপস্থিত! চিত্রকর স্বয়ং রেখাদ্বারা তাঁহার 'মানসী' আকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন বলিয়া, আমাদের মন উপস্থিত আকৃতিতেই সাক্ষাৎ-ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়ে। এ'জন্য চিত্রের 'আকৃতি'র পশ্চাতে পুনর্ব্বার কোন আকৃতিগত লক্ষণা দাঁড়ায় না; দৃশ্যান্তরে উহার কোনরূপ উপচার নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং, কবির শব্দগত লক্ষণায় কোনরূপ অনৌচিত্য ঘটিলে, বরং স্থলবিশেষে উহা মনের অসহ্য না হইতেও পারে;

কিন্তু, আমাদের চক্ষু কোন প্রকার আকৃতিগত অনৌচিত্য, কোন অস্বাভাবিক কিংবা অতিনৈসর্গিক লক্ষণা, রূঢ়ি বা Convention মানিতেই চায় না। এ জন্যই চিত্র-অঙ্কিত দৃশ্যরূপের বিপরীত কিংবা বিরোধী কোন প্রকার রূপ-সঙ্কেত দাঁড়ায় না। চিত্রকর সে ভাবের কোন দাবী উপস্থিত করিলে, আমাদের মনই উহাকে তৎক্ষণাৎ অগ্রাহ্য করে। মনুষ্যের মনস্তত্ত্বই উহার বিদ্রোহী হইয়া উঠে! এস্থলেই বুঝিতে পারি যে, এতদ্দেশের একদল আধুনিক চিত্রকর কাব্যের শব্দ-লক্ষণা এবং শাব্দী-ব্যঞ্জনার শক্তি দর্শনে মুগ্ধ ও লালায়িত হইয়া, অপিচ উহার অনুকরণ করিতে গিয়া কিরূপে 'স্বাধিকার প্রমত্ত' হইতেছেন—চিত্রের প্রত্যক্ষ-দৃশ্য আকৃতির ক্ষেত্রেই আবার লক্ষণার ও ব্যঞ্জনার আমদানী করিতে চাহিতেছেন! ফলে, চিত্রের 'লিখন'কেই মনোভাবের একটা স্বতন্ত্র 'লিপিরীতি'রূপে খাড়া করিতেছেন! অঙ্কিত ছবিকে নিজের মনোগত আকৃতির কেবল Symbol রূপে এবং রেখাবিন্যাসকে একটা স্বতন্ত্র 'চৈত্র'ভাষারূপে উপস্থিত করার দাবী করিতেছেন! চিত্র যেন আর দৃশ্যক্ষেত্রীয় স্বতন্ত্র ললিতকলা থাকিতেছে না; যেন, একমাত্র ভাষার বিভিন্ন 'অক্ষর রীতির' ন্যায়, চিত্রও সাহিত্য-ভাষারই নূতন একটী Alphabet ব্যাপার রূপেই দাঁড়াইতেছে!

চিত্রকলার অপর একটী 'অত্যাচরণ' এবং 'অনধিকার প্রবেশ' ও লক্ষ্য করিতে হয়। ভারতীয় চিত্রকলার এক অংশ অতি প্রাচীনকাল হইতে এরূপ অত্যাচার করিয়া আসিয়াছে। ভারতের অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি অপ্রাকৃত বা অতিনৈসর্গিক রূপেই পরিকল্পিত। উহারা ছিল কবিগণের বা চিন্ময়পথের সাধকগণের 'মানসীমূর্ত্তি'—ভাবের মূর্ত্তি। 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মনো রূপ কল্পনম্' বলিয়া, ওই সকল মূর্ত্তি তত্ত্বপদার্থেরই 'মানসী ছবি'—কেবল তত্ত্বে Concentration বা চিত্তস্থিতির সহায় স্বরূপেই উহাদের পরিকল্পনা। এইদিকে 'প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা' ও ভাস্কর্য্য কেবল সাধকগণের মনন-কার্য্যের সহায়তা উদ্দেশ্য করিয়াই সে সমস্ত 'মানসী ছবি'কে জড়তন্ত্রী পরিদৃশ্যতা দান করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

দেবদেবীর সৌন্দর্য্যকল্পনার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র কোন 'রূপদক্ষতা'র দাবী সুতরাং এ সকল চিত্রকর বা ভাস্করের ছিল না। চতুর্ভুজ, ষড়্ভুজ, দশভুজ, ত্রিনয়ন, চতুরানন, পঞ্চানন, গজানন, মহাকালী ও মহাবিদ্যার মূর্ত্তি সমূহ, "সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষ ও সহস্রপাদ্ পুরুষ", অথবা গীতার বিশ্বরূপ ও "অনন্ত বাহূদরবক্ত্রনেত্র" পুরুষ—সমস্তই ত ভাব ও তত্ত্বের মানসী মূর্ত্তি! কৃতী কবি বা সাধক কখনও আশা করেন নাই যে, ঐ সমস্তকে আবার জড়তন্ত্রতার ক্ষেত্রে আনিয়া দৃশ্য অথবা স্পৃশ্য রূপে আকারিত করা হইবে। তথাপি, সাধকচিত্তের স্থিতি-বন্ধনীর সাহায্যকল্পে অথবা মুগ্ধ ও প্রাকৃতজনের পরিতোষকল্পেই হৌক, শিল্পিগণ একটা অসাধ্যসাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন —চেষ্টা করিয়াছিলেন—সকলগুলিকে আঁকিবার চেষ্টা করিতেও সাহসী হ'ন নাই। কিন্তু, তাঁহাদের সকল চেষ্টার পশ্চাতে ছিল একটা প্রকাণ্ড এবং সর্ব্ববাদী সম্মত Apology। মনোরূপকে, অরূপকে, তত্ত্বরূপকে বা অরূপসাধ্যকে দৃশ্যরূপ দান করা! উহার পশ্চাতে একটা ত্রুটী-স্বীকার এবং পরিহার-ভিক্ষা না থাকিয়াই পারে না। শিল্পে স্বাভাবিক আকৃতি-তন্ত্রের ব্যভিচার, মানসিক পুত্তলকে জড়তন্ত্রের দৃশ্য পুত্তলে আকারিত করিতে গিয়া রূপতন্ত্রের ব্যভিচার! প্রকৃতি এবং নৈসর্গিকতাকে পদেপদে নিষ্পেষিত করিয়াও তাঁহারা যে প্রতিমাগঠনে সুষমা সৌষ্ঠব এবং সামঞ্জস্য লাভ করিতে পারেন নাই সে বিষয়ে তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা সচেতন ছিলেন। নরস্কন্ধের উপরে গজমুণ্ড কোন মতে 'থাপ খায়' নাই; একটি স্কন্ধ পঞ্চমুণ্ডকে কোনমতে আমল দিতে চাহে নাই; দশটী বাহুমূল কোনমতে দেহকাণ্ডের সঙ্গে সন্ধি করিতে রাজী হয় নাই! প্রত্যেকটি ছবি দর্শকসমক্ষে যেন এই প্রার্থনা করিতেছে যে, "আমি তোমার চক্ষু সমক্ষে দাঁড়াইয়াছি বটে, কিন্তু দয়া করিয়া আমাকে চোখ দিয়াই দেখিও না, মন দিয়াই দেখ। দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করিয়া আমার মনোমূর্ত্তিটাই দেখ!" বলিতে হইবে কি, যে এই আদর্শের চিত্রকলা কেবল দর্শকের ভাবুকতার সেবিকা মাত্র, মনোদৃষ্টির ও কল্পনার ত্রুটিময়ী দাসীমাত্র? উহার কোন স্বাধীন শক্তিপদবী কিংবা মাহাত্ম্য

নাই! কোন স্বতন্ত্র নিষ্ঠা কিংবা 'রূপদক্ষতা'র দাবীও নাই। কবি ও সাধকের, কাব্যকলা বা দর্শনের ভৃত্যস্বরূপেই উহার সৃষ্টি এবং স্থিতি। উহা যেন সাহিত্যিক ভাবুকতার কেবল টিপ্পনীকর এবং সে ক্ষেত্রেই উহার যোগ্যতা এবং সমাদর।

এই দৃষ্টি স্থান হইতে "ভারতীয় চিত্রকলা" নামে আত্মবিজ্ঞাপক একদল আধুনিক শিল্পীর আদর্শ এবং ঘোষণার তাৎপর্য্যটীও বুঝিতে পারা যায়। তাঁহাদের অনেক কর্ম্মই কেবল সাহিত্যসুলভ লক্ষণার আদর্শে চিত্রকলার 'অত্যাচার' ব্যতীত যেন আর কিছুই নহে! ভারতীয় চিত্রকলার কিংবা প্রতিমাকলার যেই আদর্শবিশেষ কেবল 'ত্রুটি-স্বীকার'বিশিষ্ট 'রীতি' মাত্র ছিল—তাহাই ফলে একদল ব্যক্তি কর্ত্তৃক উক্ত চিত্রকলার একটা স্বাধীন সৌন্দর্য্যসাধনা এবং মৌলিকতাশালী কৃতিত্ব-রূপেই বিঘোষিত হইতেছে! গজাননের 'চৈতন্ত'মূর্ত্তি দৃশ্যপটে অবতারিত করিতে গিয়া প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকরগণ আকৃতিতন্ত্রের যেই 'ব্যভিচার' করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, উক্ত ব্যভিচারকেই এখন ভারতের 'মৌলিকচিত্র-রীতি'রূপে খাড়া করিয়া এই শিল্পীর দল যে বাহ্বাস্ফোট করিতে আরম্ভ করিয়াছেন! দৃশ্য ক্ষেত্রীয় সত্যের এবং প্রাকৃতিক সত্যের অপলাপ—অনৈসর্গিক Symbol—ভাবের 'কুশপুত্তল'! উহাতে চিত্র দাঁড়াইতেছে, দৃশ্যভূমির কোন স্বতন্ত্র সৌন্দর্য্যসাধনী 'শিল্পকলা' রূপে নহে, কেবল মনের সমক্ষে সঙ্কেতকারিণী একটা রূঢ়ি বা অপহ্নব! যাহাকে বলিতে পারি—একটা Hieroglyphic, একটা 'চিত্র লিপি'র পদ্ধতি। উহারই বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছে!

এই যে চোখে চাহিয়াই আবার, চোখ বুজিয়া এবং শিল্পীর উপস্থাপনাকে হয় ত অগ্রাহ্য করিয়া, কল্পনাশক্তিতেই আপনার মনে ছবি আঁকিয়া লইতে হইবে, হয় ত উপস্থাপনার একেবারে বিপরীত ছবিই মনে আঁকিয়া লইতে হইবে, উহাতেই দাড়াইল যে প্রকৃত কারিগরী বা কৃতিত্ব শিল্পীর নহে—পরিদর্শকের! এবং 'চিত্রকলা'ও কেবল সাহিত্যিক ভাষা ও অর্থের একটা স্বতন্ত্র Alphabetical method—আক্ষরিক রীতি!

সাহিত্য-বাণীর একটা স্বতন্ত্র কায়া-প্রকাশ। ফলতঃ, কাব্যের সাদৃশ্যেই চিত্রের 'অধিকার' নিরূপণ করার চেষ্টা হইতেছে বই নহে। যেহেতু, কাব্য অতীন্দ্রিয় ভূমিতে এবং অব্যাকৃত কল্পনা ও দার্শনিকতার ক্ষেত্রেও ভাষার শক্তিতে 'আকৃতি' সৃষ্টি করিতে পারে, চিত্রের জন্যও সে স্বত্ব-দাবীই করা হইতেছে! ইহার মত ভ্রান্তি আর কি হইতে পারে? চিত্রকে সাহিত্যের আমল হইতে স্বতন্ত্র কোন 'শিল্পকলা'র স্বত্বে দাঁড়াইতে হইলে, প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে নিজের প্রত্যক্ষ উপস্থাপনার সাক্ষাৎ-শক্তিতেই দাঁড়াইতে হইবে; নিজের ভূমি, প্রয়োগতন্ত্র এবং স্বত্বের সীমা ও সঙ্কীর্ণতা মানিয়া লইতেই হইবে। আধুনিকের ঘোষণা মানিয়া লইলে, সাহিত্যের 'ভাষা ও অর্থ'-তন্ত্রের বাহিরে, 'ললিতকলা' স্বরূপে চিত্রের যেন কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নাই; অস্তিত্বের যেন কিছুমাত্র প্রয়োজনও নাই।

এইরূপে, গলায় গলগণ্ড দেখাইয়া 'কম্বু কণ্ঠতা'র ব্যঞ্জনা, পায়ে 'শ্লীপদ' দেখাইয়া মন্থরচলনের লক্ষণা! চোখের সম্মুখে একরূপ দেখাইয়া বিভিন্ন রূপের বা সন্নিহিত রূপের সঙ্কেত! আবার, 'পটলচেরা চোখ', 'গৃধিনী শ্রবণ', 'তিলফুল নাসা' প্রভৃতি শব্দশক্তিগত লক্ষণাকে চিত্রপটে আনিয়া, আস্ত পটোল, তিলফুল ও গৃধিনী আঁকিয়াই চিত্রের ক্ষেত্রে বেমালুম সাহিত্যিক রীতি অনুসরণ করার দাবী! সে'উদ্দেশ্যে দলবন্ধন, সাজোস ও Collusion! ইহাতে 'ললিতকলা'ক্ষেত্রের সর্ব্বস্বীকৃত 'সত্যশিবসুন্দর' আদর্শ টুকুই পদদলিত। তারপর, প্রত্যক্ষক্ষেত্রে যে কোন বিরুদ্ধ সঙ্কেত চলে না; পরন্তু, 'সত্যসুন্দর' না হইলে 'ভাবসুন্দর' হইবার দাবীই যে দৃষ্টিক্ষেত্রে দাঁড়ায় না, শিল্পকলা মনুষ্যের ইচ্ছা-নিয়ন্ত্রিত কৃতিত্বের ক্ষেত্র বলিয়া আমাদের অন্তরাত্মা প্রত্যক্ষ কুৎসিত দেখিলেই যে বিদ্রোহী হইয়া উঠে; উহার পর হাজার ভাববাদিতা, 'সত্যতা'র অজুহাত যে তাহাকে পুনর্ব্বার সাম্যাবস্থায় আনিতে বা অনুকূল করিতে পারে না! সে দিকে কাহারও যেন আদবেই দৃষ্টি নাই! চিত্রের ক্ষেত্রে 'রূপ সুন্দরী' না হইয়া 'ভাবসুন্দরী' হইবার জন্য যে দাবী-আমলও নাই! বরঞ্চ সত্য কথাটাকে এই আকারে, এবং 'চরমপন্থী'র ভাবেই উপস্থিত

করিব। 'মহাত্মা Quasimodo' (১) কাব্যে পারিলেও, চিত্রে দাঁড়াইতে পারে না। সৃষ্টিসংসারে সম্ভবপর হইলেও চিত্রে কুৎসিত, কুরূপ বা বিকৃত দেহের সঙ্গে উচ্চমহৎ চরিত্র বা মহাপ্রাণ হৃদয় কদাচিৎ দৃষ্টিসঙ্গত হইতে পারে। ললিতকলা সৌন্দর্য্যবুদ্ধির 'নির্ব্বাচণ' বা গ্রহণ-বর্জ্জনের ক্ষেত্র বলিয়াই বিষম, বেদারা, সৌষ্ঠবহীন বা অস্বাভাবিক কোন বস্তুচিত্র দেখিলেই যে মনুষ্যের মন উহাকে স্বয়ং শিল্পীর 'অক্ষমতা'র পরিচায়ক বলিয়াই ধরিয়া লয়! কোনরূপ তর্কজবরদস্তি এবং প্রতিজ্ঞাবন্ধন যে এস্থলে কুলায় না! দেশকাল-রুচির বাধ্য বলিয়া, কোন চিত্রের পক্ষে 'দৃশ্যক্ষেত্রে' সার্ব্বজনীনভাবে 'রূপসুন্দর' হওয়া যে অনেকসময় দুঃসাধ্য, তাহা স্বীকার করিতে হয়। সাহিত্যের 'মানস' তন্ত্রে এবং শাব্দী লক্ষণার দ্বারা মানসিকচিত্রের অঙ্কনক্ষেত্রে, হয়ত উক্ত ব্যাপার অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য। সুসাধ্য বলিয়াই, হয়ত, 'প্রাচ্যরুচি'র কবি কালিদাসের 'মানস সুন্দরী' শকুন্তলা, শব্দের লক্ষণাসাহায্যে সমঙ্কিত 'রূপসুন্দরী' ওই শকুন্তলা প্রতীচ্যপাঠকের 'দেশকালগত' সমস্ত রুচি-সম্বাধ ডিঙ্গাইয়া তাহার মনোনেত্র সমক্ষেও 'রূপসুন্দরী' হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছেন। বিজাতীয় চিত্রকরের পক্ষে সে সম্ভাবনা কিংবা সুবিধা তাঁহার 'ক্ষেত্র' গতিকেই নিবারিত। কিন্তু, স্বদেশের চিত্র-রুচি বা দেহ-রুচির ক্ষেত্রেই রূপতন্ত্রের ব্যভিচার! সুষমতা, সামঞ্জস্য এবং স্বাভাবিকতাকে অতিক্রম করিয়া, স্বজাতীয় রুচি এবং রূপতন্ত্রের সত্যকেই তাচ্ছিল্য করিয়া এই 'আধুনিকদল' যে চিত্রক্ষেত্রে স্বকীয় 'অধিকার' ও ক্ষমতার অতীতদেশেই দাঁড়াইতে চাহিতেছেন! সত্য এবং রসকে উদ্দেশ্য না করিয়া বরং কেবল অপ্রকৃত বস্তুবাদ ও দার্শনিকতা, মামুলী ভাব এবং সাজোসী Conventionকেই

(১) ভিক্টর হুগোর সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস Hunchback of Notre-dame নামক উপন্যাসের নায়ক—বিকট কদর্য্য শরীরে 'মহাভাব'-সুন্দর চরিত্র। কাব্যের স্থলেও, মনে রাখিতে হয় যে, পরম শিল্পরসিক গ্যাঠে উহাকে "The most abominable book in the world" বলিয়াছেন!

মুখ্য করিতেছেন! নিম্নের 'নামটীকা' বা চিত্রকরের 'ব্যাখ্যানা'টুকু না পড়িলেই যদি চিত্রের কিছুমাত্র ভাবগ্রহ হয় না, উহার রসাত্মক উপস্থাপনার প্রাণটুকু যদি সহৃদয় দর্শকের প্রাণে স্বতঃসঞ্চারী হয় না, সাহিত্যিকী ব্যাখ্যার 'অন্তরটিপ্পনী' ব্যতীত যদি চিত্রের 'অর্থ' দাঁড়াইতেই পারে না, বুঝিতে হইবে, উহা স্বতন্ত্র 'কলা' হিসাবে একেবারে নিষ্ফল। উহা ত কেবল 'সাহিত্যবাণী'র একটা বিভিন্ন অক্ষর মূর্ত্তি! উহা ত কেবল সাহিত্যের চাপরাসী এবং দর্শনের দাসী! এবং চিত্রকরও হইতে চাহিতেছেন কেবল 'সাহিত্যসেবী'—অবশ্য, বেয়াড়া রকমের সাহিত্যকর্ম্মী!

সাহিত্যের আদর্শে অপর কলাশিল্পের অত্যাচার—উহা আমাদের পক্ষে অবান্তর বিষয়। তথাপি, সাহিত্যের স্বরূপবোধে আলোকপাত উদ্দেশ্য করিয়াই আমরা এই বিচার করিয়া আসিলাম। সাহিত্যের স্বরূপ পদবী! সঙ্গীত ও চিত্র প্রভৃতি আপনাদের বিশিষ্ট ক্রিয়াক্ষেত্রে কোন-এক সবিশেষ শক্তি দেখাইতে পারে সত্য—উহা প্রধানতঃ জড়তান্ত্রিক শক্তি এবং কাব্যের তুলনায় উহা বৈনাশিক, অস্থির ও অব্যাপী শক্তি। কাব্য আপনার বাক্যে এবং রসাত্মায়, বাক্যের অভিধা-লক্ষণা ও ব্যঞ্জনায়, উহার বৃত্তি ও ছন্দতত্ত্বে, উহার দ্রুতি-দীপ্তি-প্রসাদগুণে, উহার শব্দালঙ্কার ও বাক্যালঙ্কারের শিঞ্জনে এবং অনুরণনে, উহার প্রকাশ-রীতির আকার-প্রকারে ও ইঙ্গিতে, উহার অবস্থা-ঘটনা-চরিত্র ও বিষয়বস্তুর অর্থে, 'আবহাওয়া'য় এবং ঈষারায় অপর সমস্ত ললিতকলা অপেক্ষা (সঙ্গীত-চিত্র-স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য অপেক্ষা) বহুদিকে পরিব্যাপ্ত শক্তিশালী, স্থিরতানিষ্ঠ এবং অনশ্বর প্রতিপত্তিশালী! এই কাব্য আনন্দ-লীলাময়ের জগৎসৃষ্টির পাশাপাশি একটা স্বতন্ত্র আনন্দসৃষ্টি। উহা জড়জগতে অধ্যাত্মরূপ, চিন্ময়রূপ এবং স্বয়ং অমৃতস্বরূপ। সঙ্গীত প্রভৃতির ন্যায় কেবল ভাব-বিন্দুকে আশ্রয় করিয়া নহে, কেবল ক্ষুদ্র অবস্থা-আকৃতি ও ক্ষুদ্র মূহুর্ত্ত লইয়া নহে, অগণিত ভাবের এবং অবস্থা-ঘটনার একদা ও একত্র অবস্থাপনে, সমীকরণে এবং সামঞ্জস্যবিধানে, দেশকাল-পাত্রে পরিব্যাপ্ত অবস্থা-ঘটনা ও পরিবর্ণনার একাগ্র সমাহারে কাব্য অন্ততাবং

শিল্পকলা অপেক্ষা স্থিরতর ও ব্যাপকতর, বলবত্তর এবং মহত্তর সিদ্ধিলাভ করিতে পারে বলিয়াই উহার 'তুলনায় মাহাত্ম্য'। এ'দিক হইতেই বলিয়াছিলাম যে, রামায়ণ, শকুন্তলা অথবা হ্যামলেটের বহুমুখী একাত্মতা কোন সঙ্গীতকর, চিত্রকর, স্থপতী অথবা ভাস্করের সাধ্যায়ত্ত নহে।

৫৮। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের উৎপত্তি মূলে তিনটি হেতু ও উহাদের সামঞ্জস্য।

সাহিত্যে 'আকৃতি' বলিতে সুতরাং শিল্পীর দিক হইতে বুঝায় ভাবের 'রূপক'। এ জন্য সংস্কৃত সাহিত্যে সুন্দর কবিতার অপর একটি নাম 'রূপক' এই আদর্শে, সাহিত্যের বাক্য হইবে—ভাবের সিম্বোল; এবং উৎকৃষ্ট কাব্যের কবি মাত্রেই Symbolist. বলিতে পারি, শ্রেষ্ঠ শিল্পী মাত্রেই পৌত্তলিক। উহাকে ইংরেজী কথায় বলা যায়, "The Artist knows only the Presentation of the Concrete." সাহিত্যজগতের শ্রেষ্ঠশ্রেণীর কবি এবং কাব্যকে এই আদর্শে বিচার করিতে হয়। শ্রেষ্ঠ কবিত্বের আকৃতিমুখ্য এই যে রসায়নী শক্তি, উহার নামই প্রকৃত কবিত্বশক্তি! উহার মধ্যে গীতি-ধর্ম্মতা এবং দার্শনিকতা আছে, চৈত্রধর্ম্মও আছে. কিন্তু উহারা পরস্পর বিদ্রোহী কিংবা অত্যাচারী হয় না—সমস্তেরই বেশীকম সামঞ্জস্য। জগতের শ্রেষ্ঠ কবিগণের মধ্যে, তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ সিদ্ধির অভ্যন্তরে, এই সামঞ্জস্য এবং সুষমারই ন্যূনাধিক প্রমাণ পাইব। সাহিত্যজগতে এ'রূপ শ্রেষ্ঠের সংখ্যা কাজে কাজেই স্বল্প—এ'কারণেই প্রকৃত কবিত্বশক্তি 'সুদুর্ল্লভা'। সুকবিগণের মধ্যেও আবার এই 'শক্তি স্তত্র সুদুর্ল্লভা'! (১)

এখন, ভাবের এই Symbol, এই পুত্তল বা এই আকৃতি আবিষ্কার করিবে কে? উপস্থিত 'হাজারো' ভাব এবং 'হাজারো' আকৃতির মধ্য হইতে 'শ্রেষ্ঠ' আকৃতির 'শ্রেষ্ঠ' যুক্তিপদবীতে কে কবিকে উপনীত

(১) সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের একটা প্রসিদ্ধ শ্লোক।—

নরত্বং দুর্ল্লভং লোকে, বিদ্যাতত্র সুদুর্ল্লভা
কবিত্বং দুর্ল্লভং তত্র শক্তি স্তত্র সুদুর্ল্লভ।

করিবে? সাহিত্যদর্শনের ভাষায় উহারই নাম 'শক্তি'—কল্পনা শক্তি। প্রাচীন সাহিত্য-দার্শনিক মম্মট ভট্ট কাব্যের উদ্ভবের 'হেতু' নির্দ্দেশ করিতে গিয়া, অনুপম অন্তর্দৃষ্টি সহকারে, মুখ্যভাবে তিনটি পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমতঃ, কল্পনা বা 'রূপণা' শক্তি—ইংরাজীতে যাহার নাম Imagination; তারপর, নিপুণতা—মনস্তত্ত্বের দিক হইতে যাহার নাম Reason; তৃতীয়তঃ, লোকশিক্ষা বা জাগতিক সত্য-পরিজ্ঞান—যাহার নাম দিতে পারি, Sense of Truth and Fact. (২) এই 'লোক-শিক্ষা'র অভ্যন্তরে 'কাব্যজ্ঞ-শিক্ষা' এবং 'অভ্যাসের' অপরিহার্য্য ভিত্তিটুকুও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। এখন, এই নির্দ্দেশের দিকে প্রত্যেক সাহিত্যসেবক ও তত্ত্ব-চিন্তকের দৃষ্টি এবং অভিনিবেশ আকর্ষণ করিতেছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে, বিশেষতঃ জর্ম্মণীর লেসীংএর সময় হইতে সমগ্র ইয়োরোপের সাহিত্যজগৎ সাহিত্যের প্রাণতত্ত্ব এবং উহার 'রহস্য'চিন্তায়, কেবল একদেশদর্শী প্রাবল্যে মুখরিত হইতেছে! এইদিকে, কবিত্বের রহস্য কোথায় বুঝিতে গিয়া 'রোমাণ্টিক' আদর্শবাদী যেমন ধরিয়াছেন—Imagination, 'ক্লাসিক আদর্শবাদী'গণ ও তেমনি 'প্রয়োগ বুদ্ধি' এবং বিশুদ্ধির উপরেই জোর দিয়া বলিয়াছেন,—Reason; অপর এক দল—তাঁহারা Realist ও Naturalist নামেই আদর্শপরিচয় করেন—তাঁহাদের মূলমন্ত্র কেবল Truth। তর্ক, বিতর্ক এবং বাদবিতণ্ডার অন্ত নাই—গোঁড়ামীরও শেষ নাই! এই হলহলার অভ্যন্তরে তিনেরই দৃষ্টি এবং মাহাত্ম্যবোধ ও সামঞ্জস্যের আদর্শবার্ত্তা কদাচিৎ শুনা যাইবে। মনোবিজ্ঞানের দিক্ হইতে কাব্য এবং কবিতত্ত্বে দৃষ্টি বা বিচার একেবারে হয় নাই। মৌলিকতার অভিমান এবং 'একটা নূতন কিছু করা ও কহা'র অহঙ্কার হইতেই সাহিত্যশাস্ত্রের 'বিজ্ঞান' চিরকাল বাধা পাইয়া আসিয়াছে। দেখিতেছি,

(২) শক্তির্নিপুণতা লোকশিক্ষা কাব্যাদ্যবেক্ষণাৎ
কাব্যজ্ঞ শিক্ষয়াভ্যাস ইতি হেতু স্তদুদ্ভবে ॥—কাব্যপ্রকাশ।

এতদ্দেশের প্রাচীন পণ্ডিত, হয়ত, তাদৃশ তর্কযুদ্ধের ন্যূনাধিক নিঃসম্পর্ক ও 'স্থিতধীঃ' ছিলেন বলিয়াই অপরূপ ভাবে, এ'বিষয়ে প্রকৃত তত্ত্বে উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন।

আমাদিগকে বুঝিতে হইবে শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর কবিত্বের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত গুণত্রয়ের এই সৌষ্ঠব, সুষমা এবং সামঞ্জস্য। আপনার তত্ত্বধর্ম্মেই, হয়ত, কবির সম্পূর্ণ অবিতর্কিত এই সুষমা! অনেক কবি আছেন, অনেক 'বড়' কবিই আছেন, যাঁহারা মুখ্যভাবে কেহ গীতিধর্ম্মে, কেহ চিত্র-ধর্ম্মে, কেহ দার্শনিকতায়, কেহ সৃষ্টিসামর্থ্যে 'বিশিষ্ট' হইয়াছেন; কেহ কল্পনার, কেহ নৈপুণ্যের, কেহ বা সত্যের শক্তিতেই একাংশী গরিষ্ঠতা ও বিশিষ্ঠতার উপরে সাহিত্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এ'ক্ষেত্রে অবিসম্বাদিত মহার্ঘতা এবং দুর্ল্লভতার উপরেই 'পদবী'। কিন্তু সকল 'প্রকৃত' শ্রেষ্ঠতা এবং মাহাত্ম্যের ভিত্তিমূলেই দেখিব—পূর্ব্বোক্ত গুণত্রয়ীর ন্যূনাধিক সমাহার, অপিচ 'সুদুর্ল্লভ' ওই সামঞ্জস্য। প্রকৃত সাহিত্যরীতির মধ্যে এবং 'সাহিত্য-আত্মা'-শালী কবিগণের মধ্যে, তাহাদের বরিষ্ঠ উপার্জ্জন-গুলির শ্রেষ্ঠতা-মূলে এই আকৃতি ও আত্মার এবং এই দৃষ্টি ও সৃষ্টিব্যাপারের ন্যূনাধিক সঙ্গতি এবং ঐক্যতান টুকুই সহৃদয়ের 'সংবেদ্য' হইয়া দাঁড়াই-য়াছে। যে কবির স্বীয় হৃদয়ের আনন্দ-স্পন্দ অনপনেয় এবং অনশ্বর 'প্রতীকে' সহৃদয়ের হৃদয় অধিকার করিতে পারে, তাঁহার বাণীই 'বিজয়িনী'! তাঁহার সরস্বতীই 'সাহিত্যজগতি জয়তে'! তাঁহার বাণীই, যেন ঐশী দয়ায় প্রগল্‌ভা হইয়া, 'বৃদ্ধ ব্রহ্মা'র এই সৃষ্টির পাশাপাশি যেন নবনব জগৎসৃষ্টির লীলাকৌতুকে বিলসিত হইতেছে! কবিতত্ত্বের অভ্যন্তরে ঐশ্বরিক 'হ্লাদিনী' শক্তির এই সৃষ্টি-লীলা! উহাকে অতুলনীয়ভাবে বর্ণনা করিয়াছিল প্রাচীন ভারতের কোন বিলুপ্তনামা কবির একটি শ্লোক—প্রাকৃতভাষার একটি শ্লোক! কবি-বৈদগ্ধী এবং কবির প্রগল্‌ভতার এমন সৌভাগ্যগর্ব্ব-সুন্দর পরিবর্ণনা সাহিত্যজগতে দ্বিতীয়টি নাই। এই প্রচণ্ড-পাষণ্ড কবি যোষিৎ ভাষায়, এবং যোষিৎ-সুলভ নিশ্চিন্ত ও নিরাশঙ্ক অহমিকাতেই যেন আত্ম-সরস্বতীর প্রশংসায় মুখর হইয়াছেন; একরূপ আত্মবিস্মৃত

ভাষেই যে কথা বলিয়া উঠিয়াছেন, সংস্কৃত আকারে তাহা এইরূপ দাঁড়ায়—

যা বৃদ্ধমিব হসন্তী কবি বদনাম্বুরুহ-বদ্ধবিনিবেশা।
দর্শয়তি ভুবনমণ্ডল মন্যদিব জয়তি সা বাণী॥

নিত্যযৌবনা কবি-সরস্বতী কবির মুখপদ্মে স্থিরাসনা হইয়া, এ'জগতের স্রষ্টা 'বৃদ্ধ' ব্রহ্মাকে পরিহাস পূর্ব্বক, যেন নূতন এক ভুবনের সৃষ্টি করিয়াই দেখাইতেছেন! যেন 'বুড়োটা'কে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি শিক্ষা দিতেছেন! কবিশক্তির সাপক্ষ্যে এত বড় সাহসিক দাবী কোন 'রোমাণ্টিক' কবির স্বপ্নেও আসে নাই! ইহা শেলী-রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব-অহমিকা এবং বৈদগ্ধীগর্ব্বকেও হার মানাইয়াছে!

প্রাচীন কালের কথা বলিতেছি না; কিন্তু, আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রসারিত নেত্রপাত করিলে, দুইজন কবির মহামূর্ত্তিই সর্ব্বাগ্রে এবং সর্ব্বোদগ্রভাবে যেন দৃষ্টি আকর্ষণ করে—ইংলণ্ডের শেক্সপীয়র এবং ফ্রান্সের ভিক্টর হুগো! উভয়ের মধ্যেই, সাহিত্য-রসিকের দৃষ্টিতে, অনেক 'দোষ', উৎকটতা, এমন কি—বর্ব্বরতা আছে! কিন্তু, উহা 'শক্তি'র প্রাচণ্ড্য-জনিত উৎকটতা এবং শক্তির উচ্চ-উগ্র লীলাজনিত বর্ব্বরতা! 'সহৃদয়'মাত্রের হৃদ্‌বুদ্ধি সে'সমস্তকে 'নগণ্য' বলিয়া অবহেলা করিতে পারে! প্রকৃত কবিশক্তির প্রধান ত্রৈগুণ্যে তাঁহাদের ন্যায় বিশাল সাহিত্য-আত্মা ও তাঁহাদের সমকক্ষ উচ্চ-উদগ্র দেহ এবং উচ্ছ্রিত উত্তমাঙ্গ সুবিপুল ইয়োরোপীয় সাহিত্যেও 'নাই' বলিয়াই ধারণা হইতে থাকে। হাজার 'দোষ' সত্ত্বেও শেক্সপীয়রকেই বিশ্বসাহিত্যের সর্ব্বোচ্চ-শেখররূপে কেন নির্দ্দেশ করা হয়? অবশ্য সাহিত্যের নিদানে এবং উপাদানে যেই 'সচ্চিদানন্দ' আছেন, হুগো অথবা সেক্সপীয়রের শিল্পসিদ্ধির মধ্যে সেই 'সচ্চিদানন্দ'মুখী কোন 'পতাকা' আছে কিনা, তাঁহাদের কাব্য মধ্যে চূড়ান্তের 'রসানন্দ'মুখী কোন ক্ষেপণী বা 'ইষু' আছে কিনা—উহা

২৯। প্রকৃত সাহিত্য আদর্শের কবিগণ শেক্সপীয়র গ্যাঠে ও হুগো।

সহৃদয়গম্যভাবে প্রবল হইয়াছে কিনা, সে বিচার এ'স্থলে করিব না। ইয়োরোপের কোন কাব্যে 'সচ্চিদানন্দ' প্রকৃত প্রস্তাবে জাগ্রৎ হইয়াছেন কিনা, বা ইয়োরোপের বর্ত্তমান 'অধ্যাত্ম' অবস্থায় উহা হওয়া সম্ভব কিনা, সে বিচারও করিব না। কল্পনাশক্তির অপর নাম দিতে পারি 'চণ্ডী'। এই চণ্ডীর সহচরী নিপুনতা ও সত্যদৃষ্টি! উভয়েই সাহিত্যক্ষেত্রে কবিত্ব-শক্তির 'জয়া' ও 'বিজয়া'! শ্রেষ্ঠ কবিত্বের নিদানভূত এই গুণত্রয়ী শেক্সপীয়রের মধ্যে অতুলনীয় বর্দ্ধিতমাত্রায় সমঞ্জসিত বলিয়াই আমাদের অন্তরিন্দ্রিয় অনুভব করিতে থাকে। শেক্সপীয়রের পর, গ্যাঠে অপেক্ষাও বরং যেন হুগোই কবিশক্তির সর্ব্বসাকুল্যে মাথা তুলিয়াছেন! হুগো ও সেক্সপীয়রের বিপুল ও সূক্ষ্ম এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসমন্বিত, প্রচণ্ডা সৃষ্টিশক্তি, তাঁহাদের 'লোকসত্ত্বা' জ্ঞান এবং সত্যবিজ্ঞানী মনস্বিতা এত সূক্ষ্মতাবিবেকী এবং প্রখর যে, আবার, তাঁহাদের কল্পনানেত্রে আপচ লেখনা মুখে idea কিংবা ভাবমাত্রেই এমন 'স্বাকার' হইয়া, এমন পরিস্ফুট আকৃতিবান্ হইয়াই উপস্থিত হয় যে, উভয়ের এই সুমহৎ গুণসমন্বয় প্রত্যেক 'দৃষ্টিবান্' সাহিত্য-রসিকের সমক্ষে অতুলনীয় বলিয়াই প্রতীত হইতে থাকে!

৬০। কালিদাস ও কীট্‌স।

ভারতীয় সাহিত্যক্ষেত্রেও ব্যাসবাল্মিকী! তাঁহাদের কাব্যদেহে দেশকালের শতসহস্র, আগন্তুক আবর্জ্জনা ও 'বেরসিক' অবলেপ এবং প্রক্ষেপ সত্ত্বেও, অস্খলিত সাহিত্যতন্ত্রের ওই ব্যাস-বাল্মীকি! আর, বাল্মীকির শিষ্য ও প্রতিভাপুত্র কালিদাস! কালিদাস ত' কথা লিখেন না! বাক্যতন্ত্রে আকৃতিঘনীভূত ভাবের মণিমালাই গাঁথিয়া চলেন! 'উপমা কালিদাসস্য' বলিয়া সাধারণ্য মধ্যে যে 'সমালোচনা' প্রচলিত আছে, তাহাও প্রকৃতপ্রস্তাবে কালিদাসের এই রসাকৃতি-মুখ্য এবং 'সুদূর ঐক্যদর্শিনী' দৃষ্টিরেই প্রশংসা করিতেছে। কালিদাসের উপমা-দৃষ্টির বিশেষত্ব বিষয়েও এ'স্থলে বলিয়া যাইতে পারি যে, উহা কেবল সাদৃশ্য উপস্থাপনে, বস্তুদ্বারা বস্তুর সঙ্কেত করিয়াই তৃপ্ত হয় না; ব্যঞ্জনা ও

অনুরণনের শক্তিতে, দূরদূরান্তরিত ও অচিন্ত্যপূর্ব্ব গুণ, ভাব বা চিন্তা সঙ্কেতিত করিয়া, কবির মনোগত অর্থটীর পরম 'উপকারী' স্বরূপেই' কালিদাসী উপমা, নিজের শক্তি প্রকাশ করিতে থাকে। কালিদাসের উপমায় দূরদূরান্তগামিনী কবিকল্পনা আপাততঃ বিভিন্নধর্ম্মী পদার্থ বা সত্যকেও সাদৃশ্য এবং তুলনার ক্ষেত্রে লইয়া আসিয়া, অপরূপ রসাত্মিকা 'শক্তি' অবলম্বনেই, মনুষ্যচিত্তে অচিন্তিত 'আলোক' দান করিতে পারে। উহা বচনাতীত সাধর্ম্ম্য সঙ্কেতেও চেষ্টা করে; কল্পনাসাগরে 'পাড়ী' যোগাইয়া, প্রতি ক্ষেপে অভাবিত ভাবরত্নের 'ভরা' লইয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করে! (১) ওই উপমা কেবল বাক্যের শোভাসম্পাদক নহে—পরম 'উপকারক'। (২) কালিদাসকে বাল্মীকির 'ভাবপুত্র' বলিয়াছি; তদ্ভিন্ন, সমগ্র সাহিত্যজগতে যেন কালিদাসের একমাত্র 'স্বজাতি' দেখিতেছি—ইংলণ্ডের অল্পায়ু ও অল্পকর্ম্মা কবি কীট্‌স! মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বে প্রকাশিত কবিতা, কাহিনীকথা ও ode গুলির রচয়িতা কীট্‌স। টেনিসনের বিশ্বাস ছিল, কীট্‌স বাঁচিয়া থাকিলে সেকপীয়র ব্যতীত অপরসমস্ত ইংরেজ কবিকেই অতিক্রম করিতেন! সহস্রাধিক বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ও 'ভারতীয় কবি' কালিদাসের একমাত্র সমধর্ম্মা ও নানা দিকে সমানাত্মা 'সাত সমুদ্র তের নদী' পারের এই 'আধুনিক কবি' কীট্‌স! এই কবিদ্বয়ের অনুপম সাধর্ম্ম্যও এই যে,

(১) যেমন শকুন্তলার একটী শ্লোক—

গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥

(২) এস্থলে বলিতে পারি, সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রেও, প্রকৃত-অলঙ্কার মাত্রকে ওইরূপে রসের 'উপকারী' হইতে হয়। এ'স্থলে কুতূহল-জনক ব্যাপার এই যে, বাক্যের 'রীতি' গতিকে অনেকানেক কবির হস্তেই অলঙ্কার 'রসের উপকারক' না হইরা বরং যেন 'আবরক' হইয়াই দাঁড়ায়। অলঙ্কারটিই 'মহাভার' ও বিপত্তিকর হইয়া পড়ে। এ'জন্যই মম্মট ভট্ট বলিয়াছেন—

উপকুর্ব্বন্তি তং সন্তং যেঙ্গদ্বারেণ জাতুচিৎ।
হারাদিবদলংকারা স্তেঽনুপ্রাসোপমাদয়ঃ ॥

তাঁহাদের মধ্যে মাধুর্য্যরসাত্মক সৌন্দর্য্য দৃষ্টি ও সৃষ্টি এবং আকৃতিঘটনী 'রীতি'র মাধুর্য্যটুকুই মুখ্য হইয়া 'তত্ত্ব' এবং 'অর্থ'কে দেহাবৃত, অধিকন্তু অলংকৃত করিতেছে; আবার 'রসাত্মা'ও প্রবল রহিয়াছে। এ স্থানেই তাঁহারা যেমন 'প্রাকৃত'বাদী বা 'সত্য'বাদী কবিগণ হইতে, যেমন 'তত্ত্ব'জীবী কবিগণ হইতে, তেমন সঙ্গীতভাবমত্ত কবিগণ হইতেও বিভিন্নজাতীয় কবি। ওয়ার্ডসোয়ার্থ বা শেলী রবীন্দ্রনাথ ব্রাউনীং প্রভৃতি হইতে অথবা কিপ্‌লীং (?) হইতেও ভিন্নাত্মা কবি। তাঁহাদের মধ্যে Sentiment আছে, কিন্তু Sentimentality নাই; ছন্দের ধ্বনিগত মাধুর্য্য আছে, গীতিমত্ততা নাই; 'প্রকৃতি' আছে, অথচ 'প্রাকৃত' প্রবল হইতে পারে নাই; তত্ত্ব আছে কিন্তু তাত্ত্বিকতা বা দার্শনিকতা কুত্রাপি মুখ্য নহে। নিখুঁত সাহিত্যতন্ত্রের কবি!

কালিদাস ত কোনদিকে কম তত্ত্বজীবী নহেন, কিন্তু কালিদাসের প্রয়োগরীতি সাহিত্যের রসতন্ত্রের সম্পূর্ণ অনুগত; উহা কদাপি তত্ত্বকে প্রবল ও মুখর হইতে দেয় না। যেমন, কুমারসম্ভব ও অভিজ্ঞান শকুন্তলে। বলিতে পারি, উভয়ের অভ্যন্তরেই বিবাহবিষয়ে, সমাজ ও পরিবারক্ষেত্রে কালিদাসের একটী 'অভিমত' গুপ্ত আছে। কন্যা স্বয়ং সমর্থা হইলেও, বিবাহ বিষয়ে কন্যাপক্ষে যে একজন 'প্রদাতা' নাই, তৃতীয় ব্যক্তির প্রমুখতা, সমর্থনা বা সাক্ষ্য যে চাই, তাহা আর্য্যঋষির দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফল। উহা হইতেই 'নিখুঁত' স্বয়ংবর প্রথা ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ, কেবল স্ত্রীপুরুষের কামপ্রয়োজন বিবাহ ও জীবনের পরমার্থ-লক্ষ্যশূন্য যৌনমিলন মাত্রই কালক্রমে ভারতীয় আর্য্যসমাজে 'অনভিমত' হইয়া এবং অপ্রচলিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গান্ধর্ব্ববিবাহ উহার নামেই অনার্য্যজুষ্ট পদ্ধতি রূপে চিরকাল নিন্দালাভ করিতেছিল। তাই, কুমারসম্ভবে, আর্য্যমাতা স্বয়ং শিবের উপযাচিকা হইয়াও, স্বয়ং তপস্যা করিয়া "তথাবিধং প্রেম পতিশ্চ তাদৃশঃ" উপার্জ্জন করিয়াও 'স্বয়ংবরা' হইলেন না; সখীমুখে শঙ্করকে জানাইলেন "দাতা মে ভূভৃতাং নাথঃ প্রমাণীক্রিয়তামিতি"। বলাবাহুল্য, এই শিব-বিবাহের আদর্শেই এখন ভারতের তাবৎ

আর্য্যজুষ্ট বিবাহপদ্ধতি নিয়মিত হইতেছে। এখন, আর্য্যবিবাহের এই 'ধর্ম্ম' এবং 'দান' আদর্শ বিষয়ে কালিদাস কত সজাগ ছিলেন, তাহা কেবল উমার ওই একমাত্র উক্তিতেই যে প্রকাশিত তাহা নহে; বিপরীত দিক্ হইতে, উহার অতিবর্ত্তনের দোষফল টুকুই যেন কালিদাস অভিজ্ঞান-শকুন্তলের নিয়তিচক্রে দেখাইয়াছেন। মধ্যস্থ একজন তৃতীয় ব্যক্তি বা আসন্ন অভিভাবক কণ্ব স্বয়ং প্রদাতা থাকিলে, নায়কনায়িকা কণ্বের আগমন কাল পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরিতে—'তর সহিতে' পারিলে, কিংবা আর্য্যশাস্ত্রাচার মতে বিবাহ সমাধা হইলে, পাণিবন্ধনের পরেইত শকুন্তলা স্বামীর সহধর্ম্মিনী এবং সহগামিনী হইতেন; তা' হইলে শকুন্তলার দুঃখচক্র সম্ভবপর হইত কি? অথচ, কালিদাস যেন কত সাবধানভাবে নিজের উক্ত সমাজতত্বাদর্শ উভয় কাব্যেই গোপন করিয়াছেন! কখনও কি মনে হয়, তাঁহার কাব্যগুলি সমাজরোগের এক-একটী 'কবিরাজী গ্রন্থ' বা বিবাহ-আদর্শের বক্তৃতা-ব্যগ্র Polemic?

সেইরূপ, অধ্যাত্ম-শ্রী ও তপস্যা-শ্রী ব্যতীত কেবল দৈহিক ও বাহ্যিক রূপ যে 'বন্ধ্যা', কেবল রূপতৃষ্ণাজনিত মিলনের মধ্যেও যে জীবনের শ্রেয়োবিষয়ে নিদারুণ 'বন্ধ্যতা' আছে, কেবল কামরূঢ় কিংবা তৃষ্ণামুখ্য যৌনমিলনের ব্যাপারও যে সংসারে নিদারুণ অনর্থতা এবং অশেষ দোষভ্রান্তির নিদান হইতে পারে, সংসারে 'শ্রেয়ঃ'কে—শিবকে পতিরূপে লাভ করিতে এবং তাঁহার 'প্রেম' লাভপূর্ব্বক "অবন্ধ্য-রূপতা"সিদ্ধ করিতে হইলেও অধ্যাত্মশক্তির 'সাধনা' বা 'তপস্যা' নামক অধ্যাত্ম ব্যাপারটিরই যে প্রয়োজন; এমন কি, কামকে 'বিদেহ' করা ব্যতীত, কামের 'বিনশন' ব্যতীত উক্তরূপ প্রেম যে সিদ্ধ হয় না; এবং ওই তপস্যাত্মক প্রেমের অপর নামটীই যে 'ধর্ম্ম' (১) এবং তাদৃশ ধর্ম্মের সাহায্যেই যে পার্ব্বতী এবং শকুন্তলা উভয়ে স্ব-স্ব প্রিয়তমের সঙ্গে পুনর্মিলিত—পুনর্ব্বিবাহিত

(১) মনে রাখিতে হইবে, ভারতের 'রস' ও 'ধর্ম্ম'—এ দুইটী শব্দের কোন প্রতিশব্দ অন্য কোন ভাষায় নাই; যেমন 'ক্লাসিক' ও 'রোমান্টিকের' প্রতিশব্দও আমাদের নাই।

হইলেন (১), কবি কালিদাসের ঈদৃশ অন্তঃসংজ্ঞা ও তত্ত্ব-আদর্শ, এই 'ধর্ম্ম'রূপী প্রেমের আদর্শ এবং 'মহাভাব' হইতেই কুমারসম্ভব ও অভিজ্ঞান শকুন্তলের উদ্ভব। কালিদাসের কাব্যমধ্যে একটী 'ধর্ম্মাত্মা' আছে। সাহিত্যশিল্পে ওইরূপ 'ধর্ম্মাত্মা' ব্যাসবাল্মীকি ব্যতীত—ভারতের 'ঋষিকবি' ব্যতীত সাহিত্যজগতের অন্য কোন কবির মধ্যেই এ'রূপে পাইব না। এ'রূপ ধর্ম্মাত্মার ও শিল্পচেষ্টার প্রাণীভূত একটী মহাভাবের বশেই কালিদাস (প্রাচীনভারতের হৃদয়-বিজ্ঞানী কালিদাস) 'বর্ণাশ্রম' আদর্শটাকেই কাব্যের একটী 'মহানায়ক'রূপে (২) ধরিয়া 'রঘুবংশ' সৃষ্টিপূর্ব্বক ভারতের সমক্ষে ধরিয়াছিলেন; প্রেমের ধর্ম্মাত্মতা, আত্মদান এবং 'তপস্যা'র আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই, আপাতদর্শনে বিরূপাক্ষ ও সাংসারিক বিত্তদরিদ্র 'শিব'রূপী নায়কের সঙ্গে হিমাদ্রিকন্যার—নিত্যযৌবনা, নিত্য সুন্দরী এবং মহাভাবিনী রাজকন্যার—বিবাহ ঘটাইয়া ভারতীয় আর্য্যের সমক্ষে সংসারজীবনের একটা 'নিত্য' আদর্শ ধরিয়াছিলেন। এই মহাপ্রাণ কুমারসম্ভবের শক্তি, উহার ব্যঞ্জনা ও অনুরণনের প্রসার কত দূরগামী? পরম রূপবতী ও যুবতী রাজদুহিতা কেন বৃদ্ধ, দিগম্বর ও বিরূপাক্ষের প্রতিই 'ভাবৈক রসে' স্থিরমতি ও স্থির-রতি হইলেন? দেখিতে উহা একটা পাগলামী বা 'মৌষ্টিক্' ব্যাপার নহে কি? কিন্তু, ভারতমাতা এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের 'সভ্যতা' ইহজীবনে ওইরূপে 'শিব'কেই ত বরণ করিয়াছেন! ভারতের দাম্পত্যপ্রেমের আদর্শ তাহার ওই মাতৃ-আদর্শেই চিরকাল নিয়ন্ত্রিত নহে কি? কালিদাস যেন ভারতের 'নিত্য

(১) ধর্ম্মেণাপি পদং সর্ব্বে কারিতে পার্ব্বতীং প্রতি।
পূর্ব্বাপরাধভীতস্য কামস্যোচ্ছ্বসিতং মনঃ॥
কুমারসম্ভব।

(২) রঘুবংশের নায়ক কে? এই প্রশ্নের সমাধান কালিদাস স্বয়ং রঘুবংশের গোড়ায় "সোহমাজন্ম শুদ্ধানাং" ইত্যাদি ৪টী শ্লোকে করিয়া গিয়াছেন। স্বয়ং 'রঘুবংশ' বা 'বর্ণাশ্রম' নামক ভাবগত আদর্শই উহার নায়ক।

হৃদয়’টী চিনিয়া, শিবশক্তির ওইরূপ বিবাহ হইতেই বিশ্ববিজয়ী শক্তিধরের ‘সম্ভব’ গান করিয়াছেন! শকুন্তলাতেও ভোগধর্ম্মী রূপজমোহকে মৃত্যুর মতই প্রকৃতের বিস্মৃতি এবং আত্মবিস্মৃতির আকর স্বরূপে প্রমাণিত করিয়া, উহাকে অনুতাপের তুষানলে পোড়াইয়া, চারিত্র-তপস্যার শান্তিজলে পরিশ্রুত করিয়া, বিশুদ্ধসুবর্ণের দিব্যপ্রতিমাকারে উহাকে সংসারের হৈম-কূট শৃঙ্গে, সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্য পদবীতে অভিষিক্ত করিয়াছেন! মনুষ্যের ‘বাসনা’বৃত্তিকেই, সংযম ও তপস্যার পথে, স্বর্গলোকের ‘পুর’ প্রদর্শন! জগতের একজন বড় কবি গ্যাঠে যে কারণে শকুন্তলাকে ‘স্বর্গমর্ত্ত্যের মিলন গাথা’ বলিয়াই যেন অঙ্গুলিপ্রদর্শনে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন! অথচ, সাহিত্যের ক্ষেত্রে, এই সমস্ত ‘তত্ত্ব’ কেবল রসকণ্টক ‘নীতিবাদ’ ও ‘রুচিবিকার’ এবং বজ্রগম্ভীর ‘দার্শনিকতা’ না হইয়া, কালিদাসের কাব্যের রীতি, বৃত্তি এবং পরিব্যক্তির মধ্যে, তাঁহার কাব্যের বস্তু বা কথা-শরীরের মধ্যে এমনই ঢাকা’ আছে যে, প্রত্যক্ষভাবে ‘টের পাইবার’ কোন সম্ভাবনাই ত নাই! সে সমস্ত, কাব্যের রসাত্মারই সিদ্ধগুণ ও ধর্ম্মরূপেই ত গুপ্ত আছে! কালিদাসের কাব্যে চিরকাল রসাত্মা এবং রসাকৃতিই মুখ্য। হেজ্‌লীটের ভাষায় বলিব, এস্থলেই “The greatest Art is to Conceal Art”। তবে, এই Art এবং এই শিল্পাত্মা কালিদাসের আত্মসিদ্ধ। বলিতে পারি, উহা কবির অদৃষ্টনিয়তি এবং বিভুকৃপাজনিত সিদ্ধি। কোন বহিরাগত নিয়ন্ত্রণা বা সবিচার পরি-মার্জ্জনা, কোনরূপ পাণ্ডিত্য-কর্ষণা অথবা সতর্কঘর্ষণার যন্ত্রবিরস ফল উহা নহে। এ’স্থলেই কবিতে ও দার্শনিকে এবং কবিতে ও অ-কবিতে নিদানের দূরতা এবং অদৃষ্টগত পার্থক্য; এবং এস্থলেই একজন মহাকবি।

কীট্‌সের মধ্যেও একাধিক দিকে কালিদাসের গুণধর্ম্ম! আমরা যাহাকে কালিদাসের ‘ঋষিশিষ্যতা’ ও ধর্ম্মাত্মা বলিয়াছি, ভারতীয় কবিগণের মধ্যে কেবল ভবভূতিই কালিদাসের শিষ্যতা ও কনিষ্ঠতার সূত্রে তাহা লাভ করিয়াছিলেন। কীট্‌সের মধ্যে ধর্ম্মাত্মার স্ফুটপ্রকাশ নাই, সত্য। তবে ইসাবেলা ও St. Agne's Eve এবং Ode গুলির আত্মা উহার

বিদ্রোহী নহে ; পরন্তু, প্রত্যেকটীর মধ্যেই জগতের 'সত্যশিবসুন্দর' তত্ত্বাভিমুখী একটা 'ক্ষেপণী' আছে। সময় ও সুযোগ পাইলে কীট্‌সের মধ্যেও, তাঁহার 'সৌন্দর্য্যতন্ত্র' পথেই, হয় ত উহা পূর্ণবিকাশ লাভ করিতে পারিত (১)। কালিদাসের এই 'ধর্ম্মাত্মা' তাঁহার সৌন্দর্য্যতন্ত্রের বা (সাহিত্যবিজ্ঞান সম্মত কথায়) রসতন্ত্রেরই 'আত্মা'। উভয় কবির প্রধান ঐক্য-স্থান—তাঁহাদের সৌন্দর্য্যমুখ্য প্রকাশ 'রীতি'—মাধুর্য্যরসাত্মক ও আকৃতিমুখ্য 'রীতি'। শেক্সপীয়র ও হুগোর ন্যায় বিশালতা এবং ওজস্বিতার সংঘটনা তাঁহাদের মধ্যে নাই ; গীতিধর্ম্ম বা ছন্দের প্রভুত্ব এবং সুর-তন্ত্রও তাহাদের মধ্যে মুখ্য নহে। পরন্তু, কবিত্বের পূর্ব্বোক্ত ত্রিগুণাত্মিকা শক্তির একটা বিশেষত্বময় সমন্বয় তাঁহাদের মধ্যে এমন সৌসাদৃশ্য লাভ করিয়াছে যে, ওই দিক হইতেই উভয়কে 'সহোদর' বলা যায়। সাহিত্যজগতে মাধুর্য্যরসাত্মক প্রকাশরীতির দিক হইতে কীট্‌স-কালিদাসের ন্যায় এমন নিঁখুত 'স্ফোট'বুদ্ধি এবং আকৃতিদৃষ্টিশালী এমন রসিকাত্মা দুর্লভ বলিয়াই বিবেচিত হইবে।

এ' দিক হইতেই, ইংরেজী সাহিত্যে যেমন কীট্‌সের Pagan বলিয়া খ্যাতি আছে, তেমন ভারতীয় সাহিত্যেও (অবিবেকীর দৃষ্টিতে) কালিদাসের 'জড়রসিক' বলিয়া দুর্নাম আছে। কালিদাসের দৃষ্টি সহজেই বৈচারিক পদ্ধতি অথবা দার্শনিকা রীতি এবং 'তাত্ত্বিকতা'কে পরিহার করিয়াই চলে। এই সিদ্ধ কবিশিল্পী মুখ্যভাবে মনুষ্যের 'ভাব'বৃত্তিকেই লক্ষ্য করেন। কীট্‌স বা কালিদাসের ভাবধর্ম্মের 'সত্যতা', তাঁহাদের সৌন্দর্য্যদৃষ্টি ও রসানুভূতির প্রসার কিংবা গভীরতা এ স্থলে বিচার করিতেছি না ; কিন্তু, প্রকাশের রীতি ও নিখুঁত 'সাহিত্যশিল্পি'তার বিষয়ে, ভাবের আকৃতিতন্ত্রীয় প্রকাশ ও প্রকাশের রসায়নী শক্তি বিষয়ে, কীট্‌স কিংবা কালিদাস অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর কবি আমাদের চোখে

(১) অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁহার New Essays is Criticism গ্রন্থে কীট্‌সের মধ্যে এইরূপ ধর্ম্মাত্মার একটা ক্রমবিকাশ দর্শাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

ঠেকিতেছে না—সমজাতীয় কিংবা সমতন্ত্রীয় এবং সমকক্ষ কবিও কদাচিৎ মিলিবে।

শিল্পীর এই মাধুর্য্যমুখ্য ও আকৃতিমুখ্য 'রীতি'। ইহা সাহিত্যে 'মস্ত-বড়' দুর্লভ পদার্থ। কবিত্ব ও শিল্পিত্বের মধ্যে আবার এ'রূপ জাতিভেদ, 'দুর্লভা' কবিশক্তির মধ্যেই আবার এ'রূপ 'সুদুর্লভতা'—ইহার পরিচয় করা' এবং ইহাকে ধরা'ও সাধারণ রসিক কিংবা পাঠকের কর্ম্ম নহে। তাহারা কেবল 'মুগ্ধ' হইতেই পারে। অন্তঃপটে অঙ্কিত, বিভিন্ন কবিত্ব-ছবির বিশিষ্টতা টুকুন সতর্কভাবে এবং তুলনামূলে পরিচিহ্ন করিতে অথবা মুষ্টিবদ্ধ করিতেও পারে না। এই 'বিশিষ্টতা' অনেক সময় কবির পরিকল্পনা এবং প্রকাশরীতির মধ্যেই লুক্কায়িত একটা 'আবহাওয়া' বই নহে। সকল সতর্ক কর্ষণার বহির্ভূত। তাই, 'বিভুকৃপা'-সূচক এবং পরম 'সৌভাগ্য'সূচক এই 'রীতি'! এই স্থান হইতে দেখিলে, কীট্স-কালিদাসের 'রীতি'ই তাঁহাদের কাব্যের 'Soul'। অবশ্য, এ স্থানে বলিতে পারি, জগতের প্রাচীন বা আধুনিক সকল 'প্রকৃত' কবির মধ্যে, সকল 'বড়' কবির মধ্যেই এক-একটী অনন্যসুলভ ও অসাধারণ পরিকল্পনা ও প্রকাশের 'রীতি' আছে; উহা কেবল যে তাঁহাদের 'কাব্যের আত্মা' তাহা নহে, বস্তুতঃ উহা তাঁহাদের স্বকীয় অন্তরাত্মারই 'স্বধর্ম্মসিদ্ধি'। যে রসিক ব্যক্তি কবির এই বিশেষধর্ম্মী 'রীতি'টুকুন ধরিতে পারেন, তিনিই কবিকে 'চিনিতে' পারিয়াছেন। সহস্রের মধ্যে বেমালুমভাবে লুকাইয়া রাখিলেও, কবির মুখের 'দু'টিকথা' শুনিয়াই তিনি 'কৃতী' কবিকে চিনিয়া লইতে পারিবেন। আরও বলিতে পারি যে, যিনি কবির এই 'রীতি' চিনিয়াছেন, তিনি উক্ত পথেই কবির সমস্ত 'অর্থ', ভাব এবং সত্যের 'বেশী অর্দ্ধাংশ'ই আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছেন।

সাহিত্যতন্ত্রের এই 'রীতি'বিষয়ে আমাদের প্রসঙ্গমধ্যে এতদধিক 'বাহুল্য' করার অবকাশ নাই; রীতিকে সকল দিকে চিন্তা করিয়া একটা বিপুল গ্রন্থই বিরচিত হইতে পারে। কেন না, সাহিত্যের 'আকৃতি'

মাত্রেই রীতিগত এবং ন্যূনাধিক 'রীতি-জন্য'। তবে, এ'ক্ষেত্রে 'গীতিকবিতা'র ন্যূনাধিক 'নিরাকার' রীতি ও কাব্য-নাটকের 'স্বাকার' রীতির পার্থক্যটুকু এবং সঙ্গেসঙ্গে সাহিত্যিক এবং চৈত্র প্রণালীর বিভিন্নতাটুকুনও দৃষ্টান্তসাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা করিয়া আমরা প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

৬১। গীতি কবিতার ও নাট্যকাব্যের রীতি—ওয়ার্ড্সোয়ার্থের অরণ্য-কন্যা ও কালিদাসের শকুন্তলা।

যে আদর্শে কবিমাত্রকেই প্রতিমাবাদী বা সিম্বোলিষ্ট বলিতে পারা যায়, সে আদর্শের ক্ষেত্রেই, গীতি-কবিতার এবং নাট্যকাব্যের প্রকাশ ও নিরূপণার পার্থক্য বুঝিতে গিয়া সাহিত্য-জগতের দুইজন মৌলিক কবির প্রসিদ্ধ শিল্প-বস্তুই গ্রহণ করিব—ওয়ার্ড্সোযার্থের 'অরণ্য কন্যা' (Three years she grew in Sun and showers কবিতার শৈলবালা) ও কালিদাসের শকুন্তলা। ওয়ার্ড্সোয়ার্থ গীতিকবি; গভীর দার্শনিক বিভাবনাকে কবি উক্ত কবিতায় 'রূপ' দান করিয়াছেন; উহাকে মনোরূপে প্রমূর্ত্ত করিয়াছেন। নিসর্গের হৃদয় বা অরণ্যানীর অন্তরাত্মা যদি আপনাকে মনোগম্য প্রমূর্ত্তি দান পূর্ব্বক মনুষ্যের সমক্ষে স্থায়ীভাবে পরিব্যক্ত হইয়া দাঁড়াইতে পারিত, তাহা হইলে নিসর্গপ্রকৃতিকে আমরা কোন্ 'রূপ-গুণে' পরিমূর্ত্ত দেখিতাম? নিসর্গের অন্তর্যোগী এবং পরম প্রেমযোগী কবি ওয়ার্ড্সোযার্থ যেন বলিয়াছেন, তা হইলে উহা হইত ওই Highland Girl! (১)

কালিদাসও পরম নিসর্গযোগী কবি; অথচ, ওয়ার্ড্সোয়ার্থের ন্যায় আধুনিক ধরণের Subjectivity, প্রকাশের গুণ-তন্ত্রতা অথবা দার্শনিকা রীতি তাঁহার নহে। বিশেষতঃ, এ ক্ষেত্রে, নাট্যকবি বলিয়াই তিনি objective—বাস্তবতন্ত্রী। আবার, তিনি ভারতীয় কবি; অদ্বৈতবাদা

(১) লুসীসম্পর্কে ওয়ার্ডসোযার্থের পাঁচটি কবিতাই এ' প্রসঙ্গে পাঠকের একবার পড়িয়া লওয়া উচিত।

ঋষির শিষ্য। তাঁহার হৃদয়গুরু কেবল বন নহে—'ভারতের তপোবন'। এখন, এই 'তপোবনের হৃদয়' যদি আপনাকে পরিমূর্ত্ত করিতে পারিত, 'শান্তমিদমাশ্রমপদম্' এর বুকে কাণ পাতিলে তাহার প্রাণ-গীতি যদি শুনিতে পারা যাইত, এবং উহাকেই যদি সাহিত্যতন্ত্রে, 'বাগর্থে' পরিমূর্ত্ত করিতে পারা যাইত, তবে তাহা কি হইত? কালিদাস বলিবেন—ওই শকুন্তলা। রাজা দুষ্যন্ত একজন পাকা জহরী। আজীবন সৌন্দর্য্যের উপাসক এবং রূপের ভোগতন্ত্রী হইয়াই ঘুরিয়াছেন। তিনি 'শান্তমিদম্' আশ্রমপদে প্রবেশ মাত্র, এবং শকুন্তলার দৃষ্টিপরিচয় মাত্র একটা অদৃষ্ট-পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য এবং জীবনে অপূর্ব্ব-পরিচিত একটী ভাববস্তুর পরিচয় পাইয়াই যেন উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন—

'পরাজিতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ॥'

পরম ভোগবাদী ও নারীসৌন্দর্য্যের অভিজ্ঞতা-গর্ব্বী দুষ্যন্তের এই পরাজয় স্বীকার! উহার পর, সমস্ত শকুন্তলাকাব্য কেবল উক্ত শ্লোকার্দ্ধের ব্যাখ্যানা এবং বাক্য-চিত্রনী উপস্থাপনা বলিলেই প্রকৃত কথা বলা হইবে।

ওয়ার্ড্সোয়ার্থের কবিতাটী সাহিত্য জগতে দুর্লভ সম্পত্তি। কবি ছয়টীমাত্র শ্লোকে অরণ্যবালার গুণমুখ্য 'মূর্ত্তি' অঙ্কিত করিয়া ছাড়িয়াছেন—আমাদের হৃদয়-দর্পণে, অন্তরের গভীরতম সংস্কারের 'আনন্দময় কোষে' অতুলনীয় দার্শনিকতা এবং ভাবুকতার একটি প্রতিমা খাড়া করিয়াছেন। এ'স্থলে মুখ্যভাবেই গীতি-কবিতার রসায়ণী, বিভাবনী এবং দার্শনিকা রীতি। কিন্তু, কালিদাস স্বস্থলে নাট্যকবি; কেবল দ্রষ্টা নহেন, তিনি মুখ্যভাবে স্রষ্টা। তাঁহার রীতিও সুতরাং কেবল 'দর্শনী' নহে, উপস্থাপনী। কথায় ও আচরণে, নাটকীয় (Action ও Situation) অবস্থায় এবং ঘটনায়, অগ্রপশ্চাতিক ও পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধধারণা এবং পরিবর্ণণায়, উহাদের সাক্ষাৎসঙ্কেতে, ব্যঞ্জনায় এবং অনুরণনে কালিদাস বিশ্বসাহিত্যে অচিন্ত্য-পূর্ব্ব এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব একটা ভাব-প্রমূর্ত্তি খাড়া করিয়াছেন—ওই শকুন্তলা! উহা কেবল একটা দার্শনিক ব্যাপার নহে; সৃষ্টিব্যাপার বলিয়াই, উহার দিকে সারাজীবন চাহিয়া থাকিতে পারেন; তথাপি হয়ত, উহার সমগ্র

রূপের ও সকল অর্থের 'দর্শন' শেষ হইবে না! এস্থলেই ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের 'দার্শনিকা'র সঙ্গে শকুন্তলার প্রধান পার্থক্য; হয়ত ঐ জন্যই সাহিত্যক্ষেত্রের একজন পাকা জহরী গ্যাঠে বলিয়াছিলেন, উহা একটি "Unfathomable Book"।

এস্থলে শকুন্তলাচরিত্রের সম্পূর্ণ ধারণা বা আলোচনা আমাদের লক্ষ্য নহে; কালিদাসীয় রীতির (বিশেষতঃ গীতিকবিতার তুলনায় নাট্যকাব্যের প্রকাশপদ্ধতির) বিশেষত্বটুকুন এবং উহার সবিশেষ ফলটী দর্শন করাই মুখ্য। তপোবন কি, উহার বহির্দ্দেহ ও অন্তরাত্মা কোন্‌ভাবে স্পন্দিত হয়, কেবল বন অথবা নগর হইতেও উহার 'আত্মা'র পার্থক্য কোথায়, তাহার পরিচয় বাক্যচিত্রকর কালিদাসের দুইটি অনুপম শ্লোক অভিজ্ঞান শকুন্তলে দিয়া গিয়াছে—"নীবারাঃ শুকগর্ত্তকোটর মুখ" ও "বল্মীকার্দ্ধনিমগ্নমূর্ত্তিঃ" ইত্যাদি। তপোবন কেবল Plain living ও High thinking এর স্থান যেমন নহে, তেমনি উহা যে কেবল সংসারপলায়ন, বা বৈরাগ্য ও নিষ্কর্ম্মতা-সাধনের স্থান, তাহাও নহে। একদিকে, উহার 'জীবন' পদ্ধতিতে যেমন চরাচর বিশ্বজীবনের সঙ্গে অপরূপ সঙ্গতি ও সঙ্গীতি, তেমন, চরাচরের সঙ্গে অপরূপ প্রেম এবং সহানুভূতি! ফলতঃ, প্রাচীন ভারতের তপোবনে আসিয়া প্রেম ও বৈরাগ্য উভয়ে চূড়ান্তে গিয়া যেন একার্থক শব্দ রূপেই দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। অন্যদিকে তপোবনের মধ্যে ছিল—প্রাচীন ভারতের নিত্যহৃদয়ের সেই নিত্যসিদ্ধ অধ্যাত্মসাধনার প্রণালীতে, দুনিয়াদারী ও নিরেট সাংসারিকতার সঙ্গে 'অহিংস-অযোগ' রীতির পথেই মনুষ্যজীবনে 'ভূমা'র সাধনা—জীবনেই বিশ্বচরাচরের অতীত লক্ষ্যে একটা 'ভাবুকতা'র সাধনা—ভাবজীবনের স্থিরতা, নীরবতা এবং অবিচল স্থাণুতার আরাধনা! তপোবনের এই আদর্শ মূর্ত্তিমান হইয়াছে—স্বয়ং ঋষি কণ্বে। তপোবনী' আদর্শের মূর্ত্ত প্রতিমা কণ্বকে ধরিলে, উহার প্রাণোচ্ছ্বাস বা হৃদয় হইতেছে শকুন্তলা। শিষ্য স্বয়ং সাক্ষ্য দিয়াছে, শকুন্তলা "কণ্বস্য কুলপতেরুচ্ছ্বসিতমিব"। অর্থাৎ, তপোবনপ্রকৃতি ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের গীতি কবিতার প্রথায় যেন বলিয়াছেন, "I will make a Lady of my own"

—এবং দাঁড়াইয়াছে শকুন্তলা! গীতিকবি ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থ বলিয়াছেন, " A lovelier flower on earth was never seen " নাট্যকবি কালিদাসও দুষ্যন্তের মুখে বলিয়াছেন, "স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে"! গীতি-কবি ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের এই অরণ্যবালা-চরিত্র ন্যূনাধিক নিরাকার কতকগুলি সংস্কারের 'সমষ্টি' বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু কালিদাসকে চরিত্রের 'অধ্যবসায়' দেখাইতে হইবে, Character in Action উপস্থিত করিতে হইবে। তাঁহার নাট্যরচনা কেবল দার্শনিকতা অবলম্বন করিলেই চলিবে না। নাটক চিরকাল দর্শনকে, গীতিকবিতা এবং সঙ্গীতকবিতাকেও বলিতে পারে "বক্তুং সুকরমিদং, দুষ্করমধ্যবসাতুং"। অথচ, কালিদাস প্রথমেই শান্তশীল আশ্রমপদার্থের সূচনা পূর্ব্বক এমন একটী পরিবেশ-পট গ্রহণ করিলেন, সংসারে দুর্লভ একটা অসাধারণ জীবনদৃশ্যের 'পশ্চাৎপট' উপস্থিত করিয়া যেন প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, ওই দৃশ্যের হৃদয়রূপে অঙ্কিত করিতে হইবে—শকুন্তলা! আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, উহা কত বড় সমস্যাপূর্ণ এবং দায়িত্বময় প্রতিজ্ঞাভার গ্রহণ! কারণ, তাঁহাকে তপোবনের শান্ততা ও স্তব্ধতা রক্ষা কবিতে হইবে, অথচ ক্রিয়াশীল ব্যক্তিত্ব, এবং 'অভিমান'ময় চারিত্র দেখাইয়াই ত শকুন্তলা মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে হইবে! সংসার-গিরির শিখরচারী, ধ্যানী নীরবতা ও স্থাণুত্বের আবহাওয়া রক্ষা করিয়াই আবার ওই চারিত্রগতি এবং কর্ম্ম-প্রবণতা! সকর্ম্মতা ও নিশ্চলতার সংমেলন সাধন!

উহার ফল কি দাঁড়াইয়াছে? শকুন্তলাকে একেবারে একটী অবাক্ ও 'বোবা' চরিত্র বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কাব্যের প্রধান নায়িকাটীই বোবা! সমগ্র সাহিত্যজগতে ইহার তুলনা নাই। নিজের এত কম কথা, অথচ এই শকুন্তলার ন্যায় এমন একটী মুখরার চরিত্রও সাহিত্যে দুর্লভ। শকুন্তলার এই মুখরতা কোন দিকে? শকুন্তলা কত কথা বলাইতেছেন, কত 'নীরব প্রাণ'কে ভাষা দিয়াছেন! অথচ, প্রায় সমস্তই প্রতিকৃত, প্রতিফলিত ও প্রতিবিম্বিত ভাষা! শকুন্তলা স্বয়ং নীরব থাকিয়া অন্যকে আপনার বিষয়ে কতমতে মুখর করিয়া তুলিয়াছেন!

অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, দুষ্যন্ত, শার্ঙ্গরব, শারদ্বত ও 'নীরবতাসিদ্ধ' স্বয়ং মহর্ষি কণ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া তপোবনের বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী ও মৃগশিশু—সকলে শকুন্তলার 'ভাষা' যোগাইতেই ত মুখর হইয়াছে! "শকুন্তলা কি ভাবিতেছে জান?" "শকুন্তলা কি চায় জান?"—চারিদিকে সকলের প্রধান চেষ্টাই যেন এই প্রশ্নের সমাধান! নাটকটীর সকল অবস্থা এবং ঘটনার প্রধান লক্ষ্যটাও যেন 'নীরব' শকুন্তলা চরিত্রকে 'মুখর' করা! নাট্যকবি শকুন্তলানাটকের সৃষ্টিতে একটি প্রধান সমস্যার সমাধান এ'রূপেই করিয়াছেন। শকুন্তলা যেন শান্ততপোবনের নীরব নিসর্গযোগী ও ধ্যানপরায়ণ হৃদয়! এ স্থলে ওয়ার্ডসোয়ার্থই যেন গভীর দার্শনিক দৃষ্টিতে শকুন্তলার হৃদয়টী চিনিয়া ফেলিয়াছেন—

> And hers shall be the breathing balm
> And hers the silence and the calm
> of mute insensate things.

তারপর, তপোবনের সেই বিশ্বসঙ্গত—বিশ্বের 'ঋত'সঙ্গত—জীবন, চরাচরের প্রতি সহানুভূতি ও প্রেমের জীবন! গীতা যাহাকে বিশেষিত করিতে চাহিয়াছেন—"ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতা"। এ'দিকে অনেক কথাই বলিতে পারা যায়। কবি শকুন্তলাচরিত্রের যাহা কিছু 'ক্রিয়া' দেখাইয়াছেন—সমস্ত এই 'প্রেম'কে অবলম্বন করিয়া! নিসর্গ-প্রেম, জীবপ্রেম, স্বামী প্রেম। শকুন্তলা প্রেমময়ী, প্রেমচারিত্রা, প্রেমস্পন্দিনী, প্রেমভাবিনী! প্রেমেই তাঁহার সকল বল ও দৌর্ব্বল্য! ওয়ার্ডসোয়ার্থের কথায় বলিতে পারি, প্রেমই তাঁহার পক্ষে Law and Impulse.

প্রথমতঃ, চরাচরে প্রেম—জীব ও নিসর্গে প্রেম! চরাচর মূকজগতের প্রতি—সচেতন বা বিচেতন জগতের প্রতি—এমন প্রেম-ভাবনা এবং প্রেমাচার, নিসর্গপ্রেমের এমন সরলসহজ, এবং (Sincere) সাধুতাময় ক্রিয়াস্ফূর্ত্তি সাহিত্যজগতে নাই। এ দিকেই শকুন্তলাচরিত্র সাহিত্য-

সংসারে যে অতুলনীয়, (১) তাহা স্বদেশী-বিদেশী রসিক মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ, এ স্থলেই সাধারণ পাঠকের প্রধান 'সংকট স্থান' বলিয়া অঙ্গুলিসঙ্কেতে নির্দ্দেশ করিতে পারি! সাধারণ শকুন্তলা-চরিত্রের এই মাহাত্ম্য—উহার প্রধানমাহাত্ম্য টুকুই—বুঝে না। উহা বুঝিতে হইলে, জীবনে একটি বিশেষশিক্ষা ও চিত্তকর্ষণার প্রয়োজন। অথচ, উহা যেমন ভারতবর্ষের ও তাহার তপোবন-জীবনের প্রধান 'সাধনা' এবং উহার প্রধান 'লক্ষণা' ছিল, তেমন আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্যের ভাবুকতাক্ষেত্রেও একটা প্রধান 'কর্ষণা' রূপেই বর্ত্তমানকালে—অন্ততঃ ওয়ার্ডসোয়ার্থের পর হইতেই—পরিগণিত। নিসর্গাত্মার সঙ্গে হৃদয়ের এই 'সংযোগ', সমযোগ ও সহানুভূতি, যাহার ফল 'বিবিক্তপ্রীতি' ও যাহার পরিচয়—"বিবিক্ত দেশ সেবিত্বমরতির্জন সংসদি"; চরিত্রের এই 'প্রত্যাহার'! ইহা ভারতীয় 'অধ্যাত্মসাধনা'র প্রথম সোপান; উহা ব্যতীত তপোবনে প্রবেশ নাই, স্থিতি ও নাই। এই পথে ব্যতীত ভারতীয় তপোবনের 'অধ্যাত্মতা'র সদরদ্বার 'রুদ্ধ', বলিতে পারি। শকুন্তলা তপোবনকন্যা—মনস্বিনী। তাঁহার হৃদয় নীরব এবং বিচেতন জগতের প্রতি আশৈশব শিক্ষায়, সহজেই যে এই 'কর্ষণা'সিদ্ধি, অপিচ প্রেমসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, কালিদাসের কবিহৃদয়, গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে উহা দর্শনপূর্ব্বক উক্ত 'প্রেম'কেই শকুন্তলাচরিত্রের প্রধান পরিচয়লক্ষণ রূপে, প্রথম হইতে উপস্থিত করিতেছে। তপোবনের 'প্রকৃতি' ওয়ার্ডসোয়ার্থের ভাষায় যেন বলিয়াছিল—

Myself will to my darling be
Both Law and impulse—

(১) কালিদাস শিবসাধিকা পার্ব্বতীর চরিত্রেও চরাচর মূকজগতের প্রতি এই 'প্রেম' দর্শন করিয়াছিলেন—

গুহোঽপি যেষাং প্রথমাপ্তজন্মনাং
ন পুত্রবাৎসল্যমপাকরিষ্যতি॥

কালিদাস যেন উক্ত কথাটীরই 'টিপ্পনী' করিলেন—প্রকৃতির ওই Law and Impulse হইতেছে, এক কথায়—Love—প্রেম ; উহাতেই দাঁড়াইল, 'প্রেমময়ী শকুন্তলা'! শকুন্তলার প্রেম-দৃষ্টি চরাচর নিসর্গকে সৌন্দর্য্য-উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বে এবং 'নাম-রূপে' দর্শন করিতেছে। শকুন্তলা "বনজ্যোৎস্নার সখী" ; তরুণ "সহকার তরুর ভগিনী" ; মৃগশিশু তাঁহার "কৃত পুত্র"! শকুন্তলার আত্মপ্রাণের প্রেমজ্যোৎস্নাই যেমন বিচেতন জগৎকে রঞ্জিত করে, তেমন উহার 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে ; উহার 'নামকরণ' টাও সমাধা করে। এ'রূপে, প্রেমময়ী অপরূপ 'নাম-রূপ'ময় জগতেরই অধিবাসিনী! "ইত ইত সখ্যো" বলিতে বলিতে, অন্তরাল হইতে, অপরূপ প্রেমোচ্ছ্বাসিত এবং বিস্ময়োজ্জ্বল দৃষ্টিতে সেই যে আমাদের দৃষ্টিসমক্ষে উদিত হইয়া, কবিকল্পনার নিত্যালোকে, উজ্জ্বলমূর্ত্ত 'ভাবুকতা এবং ক্রিয়া'য় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন! তাহার পর, সমগ্র নাটকে, উক্ত প্রেমেরই যেন অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে, উজ্জ্বলমূর্ত্ত 'রূপ' হইতে রূপান্তরে কেবল করুণকোমল, অথচ পাষাণার্পিত ভাস্করী মূর্ত্তিই সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন!

চরাচর নিসর্গবর্গের প্রতি, জীবজন্তু ও মনুষ্যের প্রতি প্রীতি-দয়া-সহানুভূতি, অতিথি সেবা, সর্ব্বোপরি, নিজের 'হৃদয়-রাজ' দুষ্মন্তের প্রতি দুর্দ্দম প্রেমের 'আচরণ'টিই নাটক মধ্যে এই শকুন্তলা-চরিত্রের প্রধান 'লক্ষণ'। এরূপে শকুন্তলা একটী প্রেমময়ী, প্রেমদানী, প্রেমদাসী এবং প্রেম-নীরব মনস্বিনীর চরিত্র! এ দিক হইতেই বুঝিতে হইবে, শকুন্তলাচরিত্রের Intensity—গভীরতা ও সাধুতা! তপোবনের বৃক্ষলতার প্রতিই 'সহোদর স্নেহ'! "তুমি সহকারবধু বনজ্যোৎস্নাকে ভুলিলে ?" "তখন ত নিজকেই বিস্মৃত হইব"। এরূপ উক্তিপূর্ব্বক হৃদয়োদ্ঘাটন ও আলিঙ্গনবদ্ধ লতা-পাদপের দিকে চাহিয়া "নিশ্চলভাবে অবস্থান"! প্রথমবঙ্কেই এ'সকল কথা ও ব্যাপার দেখিয়া-শুনিয়া আমাদের মনে সংশয় জাগিয়া উঠে যে, কবি কি একটা সেণ্টিমেণ্টাল চরিত্র, বাতুল ও 'ঢং-চটকী' চরিত্রই আঁকিতে বসিয়াছেন ? জর্ম্মনীর 'রোমাণ্টিক' কবিগণের দেখাদেখি, বিশেষতঃ ডেন্‌মার্কের কবি মুলারের পথে, আধুনিকসাহিত্যের কবিগণের মধ্যে

মরণের প্রতি 'প্রীতি' দেখান, সর্ব্বজীব-ভয়ঙ্কর এবং স্বভাবেই জীবনাতঙ্ক-ভূত মৃত্যুর সঙ্গে অভাবনীয় 'ইয়ারকী' দেওয়া যেমন একটা 'কায়দা' হইয়া দাঁড়াইয়াছে, শকুন্তলার এই 'সোদর স্নেহ'ও কি সে'রূপই একটা সেন্টিমেণ্টাল ঢং (Pose) মাত্র? ক্রমে এই সন্দেহ নিরস্ত হইতে থাকে! শকুন্তলা অত্যন্ত সাধু ও Serious চরিত্র—High seriousness! শকুন্তলার কথায়, আচরণে এবং বিশ্বাসে, তাঁহার পরিকরগণের আচারব্যবহারে, সর্ব্বোপরি, ঋষি কণ্বের সাক্ষ্যে শকুন্তলার নিসর্গ-প্রাণ চরিত্রের সত্যতা আমাদের চিত্তে গাঢ় হইতে গাঢ়তর রেখা অঙ্কিত করে। কণ্বের সেই অতুলনীয় সাক্ষ্য—হে তপোবন তরুগণ,

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা।
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্॥
আদ্যে বঃ কুসুমপ্রবৃত্তিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ।
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম্॥

ইহা হইতেও বুঝিতে পারি, উহা ত কেবল একটা ভাবুকতার ভঙ্গিমা নহে, উহা শকুন্তলা সম্পর্কে পরম সত্যকথা। নিসর্গের এই সকল 'ব্যক্তি'গণের সঙ্গে শকুন্তলার অভিন্নহৃদয় সখ্য ও সহানুভূতি। সমস্ত চতুর্থ অঙ্ক শকুন্তলাচরিত্রের এই অমায়িকতা ও গভীরতাই প্রমাণিত করিতেছে। তার পর, প্রথম অঙ্কের সেই 'ভ্রমর বাধা'! ভ্রমরটাকে মারিবার মত হিংস্রতা বা তাড়াইবার মত নির্দ্দয়তা ত শকুন্তলার নাই! সুতরাং, শকুন্তলার অহিংস প্রেমধর্ম্মের সুযোগেই দুষ্মন্ত তাঁহার জীবনে অবতীর্ণ হইতে এবং অধিপতি হইতে পারিলেন। আবার, এদিকে প্রাধান্যতঃ লক্ষ্যের বিষয়—নিসর্গের তরুলতা ও জীবজগতের প্রতি শকুন্তলার যেমন প্রেম ও সহানুভূতি, তেমন, উহারাও তাঁহার দিকে প্রত্যনুভূতি ও প্রতি-প্রেম প্রদর্শন করিতেছে! বিশ্বজগৎ হইতে—বিচেতন জগৎ হইতে—এই প্রতিস্নেহ ও প্রতিদান সিদ্ধি, ইহাই শকুন্তলাচরিত্রের সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা। শকুন্তলা স্বামীগৃহে

যাইবেন ; মহাপ্রাণ কণ্বের সম্বোধনে তপোবনের তরুগণ, যেন আপনাদের আত্মা উদ্ঘাটিত করিয়া, 'পরভৃত' কণ্ঠে উহার অনুজ্ঞা দান করিতেছে ! তাঁহার সেই 'কৃতপুত্র' মৃগশিশু—যাহার মুখে কুশক্ষত হইলে তিনি ইঙ্গুদী তৈলসেকে আরোগ্য করেন, এবং মাতৃহারা হইলে স্বহস্তে মুষ্টিমুষ্টি 'শ্যামাক' ধান্যের দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়া তিনি যাহাকে বড় করিয়া তোলেন বলিয়া মহর্ষি কণ্বেরও স্মরণ আছে—সেই বাক্‌শক্তিবিহীন 'আস্ত' পশুটিও যেন অতর্কিতে প্রেমকাতর হইয়া তাঁহার প্রস্থানে বাধা দিতেছে ; পশ্চাৎ হইতে তাঁহার অঞ্চল টানিয়া ধরিতেছে ! তপোবনের বৃক্ষগণ অদ্ভুত প্রেমাত্মা প্রদর্শনে তাঁহার বসনভূষণ যোগাইতেছে ! একটা বৃক্ষের বল্কল-বস্ত্র ফাঁক করিয়া একটি কোমলসুন্দর হস্তের প্রকোষ্ঠতল বাহির হইল, দেখা গেল তাহাতে ধরা' আছে আভরণ ! উহা বনদেবতার হাত—নিসর্গের 'তরু'ব্যক্তির আত্মাভূতা দেবতা। উহারও আবার শকুন্তলার প্রতি প্রেমাত্মতা ! ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের লুসীর মধ্যে কোনপ্রকার প্রেমের বিকাশ নাই—ঘটিতে পারে নাই। "How soon Lucy's race was run ?" প্রকৃতির দীক্ষা এবং সাহচর্য্যে কেবলমাত্র তাহার মনস্বিতার বিকাশটুকুই পাশ্চাত্যকবি দেখাইতে পারিয়াছেন। লুসীর মধ্যে প্রকৃতির ভিন্নভিন্ন পদার্থের ব্যক্তিত্ব-বুদ্ধি বা ব্যক্তি-আত্মার বিকাশ-বুদ্ধিও ততটা পরিস্ফুট নহে। তবে, ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থ অরণ্যানীর মধ্যে 'পরম আত্মা'র অবস্থান অনুভব করিতেন—Nutting কবিতা উহারই প্রমাণ। "There is a Spirit in the woods !" উহাকে (with gentle hands) প্রীতি স্নিগ্ধহস্তে 'স্পর্শ' করিতে কবি মানুষকে বলিতেছেন। ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের মধ্যে এই 'একাত্মা'র অনুভূতি–বিশ্বের সকল পদার্থের মধ্যে যাহা বহমান,"Which rolls through all things"—একটা পরম ধর্ম্ম (Religion) রূপেই আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে ; অপিচ ইয়োরোপীয় সাহিত্যে তাঁহাকে পরমবিশিষ্টতায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ। কিন্তু, তাঁহার মধ্যেও নিসর্গের প্রত্যেক বস্তুর স্বতন্ত্র প্রাণিত্ব ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অনুভব শকুন্তলার ন্যায় সবিশেষ প্রবল নহে। শকুন্তলা যেমন 'বহু' ব্যক্তি দেখিতেছেন—আবার বহুর মধ্যে 'এক'ও যেন

দেখিতেছেন! গীতার ভাষায়, "সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা" না হইলে এ'রূপ 'এক'ত্ব ও ব্যক্তিত্বের 'বুদ্ধি' দাঁড়াইতে পারে না; "পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু" ইত্যাদির সহিত সঙ্গত এবং অমায়িক আচরণও সম্ভবপর হয় না। তপোবনে অদৃষ্টপূর্ব্ব বসনভূষণ দেখিয়াই শিষ্য জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, "কিং তাপসী সিদ্ধি?" ঋষিপ্রবর কণ্বের এরূপ ক্ষমতা যে আছে তদ্বিষয়ে শিষ্যের কোন সংশয় ছিল না। কিন্তু, প্রত্যুত্তরে শুনিতে পাই যে, তপোবনের তরুগণ স্বতঃই উক্ত সমস্ত পদার্থ "আবিষ্কৃত" করিয়াছে! তখন বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, 'সিদ্ধি' বলিতে গেলে ওই সিদ্ধি শকুন্তলার। উহাকে ঠিক 'সিদ্ধি' বলা সঙ্গত নহে। কবি বলিতে চাহেন, মহাপ্রাণা শকুন্তলার সাহজিক প্রেমই, তপোবন-তরুগণের সুপ্ত-বিচেতন 'প্রাণ' এবং প্রেম পদার্থকে জাগাইয়াছে; উহাদিগকে স্নেহ-প্রতিদানে প্রাণিত এবং উদ্ব্যস্ত করিয়াছে!

বুঝিতে হইবে, ইহা কেবল একটা 'সাহিত্যিক' ভাবুকতার 'কায়দা' ও কবিকল্পনার 'খেলা' মাত্র নহে। ইহা অদ্বৈতবাদী এবং ঋষিশিষ্য ভারতীয় কবির কথা—অদ্বৈতবুদ্ধি-শীল এবং অদ্বৈতবিশ্বাসী কবির 'সত্য'বাদ এবং কাব্যনায়িকা শকুন্তলার পক্ষেও ইহা পরম 'প্রকৃতবস্তু' রূপেই উপন্যস্ত হইয়াছে। অপিচ, ভারতের 'বেদপন্থী' মাত্রেই উহাকে কবিকল্পনার অপরূপ 'বিলাস' রূপে যেমন গ্রহণ করিতে পারে, তেমন, সত্য এবং সম্ভবপর ঘটনারূপেও মানিয়া লইতে পারে! অদ্বৈতবাদী কবির মতে, 'এক'মাত্র 'আত্মা' হইতেই বিশ্বজগৎ সৃষ্ট এবং উহাতেই ওতপ্রোত। সৃষ্টির মধ্যে সেই 'এক' পদার্থটিই 'বহু' হইয়াছেন; আবার, 'এক'ও আছেন। মূলে নিজের 'বিশ্বাসের জোর' কবির না থাকিলে, কাব্যের কখনও প্রকৃত 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা' হয় না। কালিদাসের বিশ্বাসে, "সর্ব্বঃপ্রাণ এজতি"; 'এক' দেবতাই "ভুবন-প্রবিষ্ট" হইয়া "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব"। শকুন্তলার প্রথম শ্লোকটী আদিবন্ধে বিশ্বসংসারকে আত্মারই 'প্রত্যক্ষতাপ্রপন্ন' দেহাকৃতিরূপে আমাদের অধ্যাত্মদৃষ্টি সমক্ষে উপস্থিত করিতেছে। কবির এই বিশ্বাসের সঙ্গে যাহার সহানুভূতি নাই, তাহার পক্ষে

শকুন্তলাচরিত্রের অমায়িকতা ও উহার মহাপ্রাণ ভাবিনীশক্তির অর্দ্ধেক অর্থ এবং মাহাত্ম্যই অনধিগম্য থাকিবে। কালিদাসের বিশ্বাসে পদার্থমাত্রেই দেবতাত্মা—"যো দেবো অগ্নৌ, যো দেবোঽপ্সু"। তাঁহার দৃষ্টিতে হিমালয়পর্ব্বত 'দেবতাত্মা' এবং হিমাদ্রিকন্যা উমাও নৈসর্গিক পদার্থে পুত্র-বাৎসল্যেই প্রেমযোগিনী হইতে পারেন; (১) দেবযোনি যক্ষ "প্রকৃতিপুরুষ" ও "কামরূপ" মেঘকে দৌত্যে নিযুক্ত করে; তাঁহার দেবসুন্দরী উর্ব্বশী মানুষীরূপ পরিগ্রহ করিয়া মনুষ্যের প্রেমালিঙ্গনে ধরা' দিতে পারে; আবার নিসর্গের মধ্যেও অব্যাকৃত হইয়া মিলাইয়া যাইতে পারে! নিসর্গের অন্তর্ভূত এবং ছায়াভূত এই সুন্দরী-আত্মাকে, এই উর্ব্বশী-আত্মাকে ব্যক্তরূপে হৃদয়ে চাপিবার জন্য কবির প্রাণ কতবড় হাহাকার তুলিতে পারে, কতপ্রকারে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে পারে, তাহার প্রমাণ বিক্রমোর্ব্বশীর চতুর্থ অঙ্ক! কালিদাসের তরুদেবতা এবং বনদেবতাগণও অমায়িক প্রেমশক্তিময়ী শকুন্তলার দিকে 'প্রতি-প্রেম' প্রকটিত করিবে, বিচিত্র নহে। কালিদাসের প্রতিভাশিষ্য ভবভূতির হস্তে এই 'প্রকটন' ব্যাপার আরও অগ্রসর! তমসা, মুরলা ও গঙ্গা প্রভৃতি মনুষ্যমূর্ত্তিতে প্রকটা হইয়া ভূতপ্রেমময়ী সীতার প্রেমানুকূল্য ও কল্যাণচেষ্টা করিতেছেন! বনদেবতা বাসন্তীও মূর্ত্তিপ্রকটা হইয়া সীতার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন! মানুষে ও নিসর্গে এই দান-প্রতিদানের ব্যাপার! বলিতে চাই, এ'রূপ ব্যাপার, এইরূপ বুদ্ধি, দৃষ্টি এবং আচার কেবল অদ্বৈতবিশ্বাসী কবির পক্ষেই প্রকৃত সত্য এবং সম্ভবপর হইতে পারে। ঋষিশিষ্য কালিদাসই বলিতে পারেন, "যখন চরাচর ভূতগ্রাম একই 'আত্মা'র বিকাশ, তখন মানুষের আত্মা 'জাগ্রৎ' হইলে, প্রেমের শক্তিতে নিসর্গের গুপ্ত-সুপ্ত আত্মা এবং প্রাণপদার্থকেও জাগাইতে এবং উহাকে বিভিন্নরূপে 'প্রাণী' করিতে পারে; তাহাদিগকে সহকর্ম্মী এবং

(১) গুহোঽপি যেষাং প্রথমাপ্ত জন্মনাং
নপুত্র বাৎসল্যমপাকরিষ্যতি।—কুমারসম্ভব।

সহাচারী করিতে, সহমর্ম্মী এবং প্রতিদানী করিতেও পারে।" নিসর্গ-পদার্থ এবং উহার সঙ্গে মনুষ্যহৃদয়ের 'একাত্ম' সম্বন্ধ বিষয়ে এই "মীষ্টিক্" ব্যাপার—এস্থলেই প্রকৃত ভারতীয় Mysticism! এই রহস্যময় ব্যক্তিত্ব ও একাত্মতার বুদ্ধি এবং সাহিত্যক্ষেত্রে নামিয়া তদনুরূপ চরিত্র ও প্রকৃতির সৃষ্টি, পার্থিব জীবনের জড়-তাণ্ডবতার ক্ষেত্রে এরূপ কাব্যচিত্র-অঙ্কনের সাহসটুকুও কেবল আত্মবাদী এবং আত্মবিশ্বাসী কবির পক্ষেই সম্ভবপর। যেমন বলিয়াছি, উহার সঙ্গে সহানুভূতি না ঘটিলে শকুন্তলাকাব্যের রসবোধই খণ্ডিত হইবে। কালিদাসের রসমুখ্য এবং আকৃতিমুখ্য কল্পনার আবেশে এবং তাঁহার প্রকাশরীতির উপমা ও নিদর্শনার উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যে সাধারণ পাঠকের চিত্ত আবিষ্ট হইয়া শকুন্তলাচরিত্রের এই intensity সহজে বুঝিতে পারে না। কবির প্রধান মাহাত্ম্যটুকুই তাঁহাদের অজ্ঞাত থাকিয়া যায়! প্রকৃত শকুন্তলা অনেকেরই অপরিচিত থাকেন। কবির রূপসুন্দর উপমা, মনঃকর্ণে ঝঙ্কারময়ী, সালংকার ভাষা এবং মনোনেত্রে-উৎফুল্লতাময় বাক্যচ্ছটায় মুগ্ধ হইয়া কালিদাসের অধিকাংশ পাঠকেই শকুন্তলা পড়া' হইল মনে করিয়া, উহার সদরদ্বার হইতে ফিরিয়া যান।

ওয়ার্ডসোয়ার্থের অরণ্যবালার মধ্যে নিসর্গের প্রত্যেক বস্তুর স্বতন্ত্র প্রাণিত্ববুদ্ধি যেমন নাই, তেমন উহাদের প্রতি প্রেমবুদ্ধিও নাই। কোন প্রকার প্রেমই তাঁহার অরণ্যবালায় বিকাশ লাভ করে নাই। স্বকীয় তত্ত্বের ধর্ম্মেই হউক বা অকালে বৃন্তচ্যুত বলিয়াই হউক, এই পুষ্পে যে অলৌকিক চরিত্রের গন্ধ আছে, কিন্তু প্রেমের মধু নাই, তাহা লক্ষ্য করিতে হয়। উহা যেন অপরূপভাবের একটি নির্লিপ্ত চরিত্র এবং 'সন্ন্যাসিনী'র চরিত্র! তাহার কারণও আছে; এবং সে স্থলেই শকুন্তলার সহিত এই অরণ্যফুলের প্রধান বৈশিষ্ট। অরণ্যবালার পক্ষেও নিসর্গই Law and Impulse। কিন্তু, এই নিসর্গকে তিনি কোন্ দিক্ হইতে দেখিতেছেন? কোন্ দিক্ হইতে তাঁহার হৃদয় উহার সহিত 'যুক্তি' লাভ করিয়াছে? লুসীও একটা পরম মনস্বিনী-চরিত্র। কিন্তু,

কোন্ দিকে তাঁহার মন নিসর্গের চিত্তে সঙ্গত হইয়াছে? নিসর্গ স্বয়ং বলিতেছে—

and with me
The girl in rock and plain
In earth and heaven, in glade and bower
Shall feel an overseeing power
To kindle or restrain.

তিনি সর্ব্বত্র একটী মাত্র seeing শক্তি অনুভব (feel) করিতেছেন! উহাই তাঁহাকে উদ্দীপ্ত অথবা 'সংযত' করিতেছে! তাঁহার এই উদ্দীপনা এবং সংযম। কিন্তু এই উদ্দীপনা তাঁহাকে কোন দিকে লইয়া যাইতে পারে? ওই 'এক' শক্তির অন্তঃপুরের দিকে—গভীর গভীরতর অভ্যন্তরপুরে! উহাতেই মনস্বিনী অরণ্যবালা প্রেমিকা না হইয়া যেন যোগিণী ও সন্ন্যাসিনী হইয়াছেন; এবং শকুন্তলার সহিত তাঁহার প্রধান পার্থক্যটুকুও এ'দিকেই দাঁড়াইতেছে।

The stars of midnight shall be dear
To her; and she shall lean her ear
In many a secret place
Where Rivulets dance their wayward round
And beauty born of murmuring sound
Shall pass into her faee!

বলিতে পারি, মনস্বিতার এই দিক্—নিসর্গের দীক্ষায় চিত্তের এইরূপ অন্তঃপুর-মুখিতা—ইহা শকুন্তলার নহে। শকুন্তলা নিসর্গের 'প্রবাহিনী'র তীরেই বসতি করেন—যেই প্রবাহিনী বিস্তারিত বিশ্বে আপনার জীবনপ্রবাহকে ঢালিয়া দিয়া, দেশ জনপদ সরস করিয়া বহিয়া চলে—সেই 'মালিনী'র তীরে শকুন্তলার বাস এবং তাঁহার হৃদয়ের দীক্ষা, তাঁহার উদ্দীপনা এবং সংযম শিক্ষা। লুসীর ন্যায় নির্ঝরিণীতীরে besides

the springs of Dove তাঁহার বাস নহে—যেই নির্ঝরিণী মৃদুমন্দ শব্দমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করে, হয়ত অব্যবহিত পরেই আবার গুপ্ত রন্ধ্রে, নিসর্গের গুহাবিবরে আপনাকে লইয়া লুকাইয়া যায়, মজিয়া-হারাইয়া-হাজিয়া যায়, সেইরূপ নির্ঝরিণী কিংবা ফোয়ারাই লুসীর গুরু। এরূপ জীবনে যেমন সাংসারিক আদর্শের প্রেম নাই, তেমন নাটকীয় কর্ম্মতন্ত্রতা নাই; উহার অবকাশও নাই। এজন্য কালিদাস (যেন অপরূপ অন্তঃসংজ্ঞার বশেই) শকুন্তলাকে প্রকৃতির 'নিস্তব্ধতার দীক্ষা' দেন নাই। শকুন্তলা লতাসনাথ সহকার তরুর দিকে চাহিয়া, উহাদের ওই প্রেমালিঙ্গন ও প্রেমবন্ধনের রসে তদ্গত হইয়া "নিস্তব্ধস্থিত" হইতে পারেন; কিন্তু কখনও আকাশের দিকে চাহিয়া গভীর রাত্রির নিস্তব্ধ 'নক্ষত্র-প্রাণে' আপনার চিত্তপ্রবাহকে ঢালিয়া দিতে যান নাই, অথবা বিবিক্তসেবিনী হইয়া নির্ঝরিণীর শব্দমন্ত্রের বিন্দুরন্ধ্রে আপনার চিত্তকে প্রবিষ্ট করিতে কখনও কোন চেষ্টা তিনি নাটিত করেন নাই। কালিদাস জানিতেন, তাঁহার নায়িকা যদি একবার এ'রূপ আলোকযোগী—এরূপ নক্ষত্রজীবী এবং 'বিমানী' ভাবুকতা একবার প্রদর্শন করে, তবে হয়ত উক্ত ব্যাপারকে কেবল একটা আগন্তুক চিত্ত-বিক্রিয়া ও 'বহিশ্চর্ম্মা সেণ্টিমেণ্টালিটী' রূপেই বুঝাইতে হইবে, নতু বা 'নায়িকা'টাকে 'অনাহত শব্দযোগিনী সন্ন্যাসিনী' রূপেই দাঁড় করাইতে হইবে। এ'ক্ষেত্রে Sincerity ও স্থিরচিত্ততা এবং প্রকৃত সাধুতার সঙ্কেত করিতে গেলেই যে চরিত্রটীর সংসারভাব ও সমাজমুখিতা খণ্ডিত অথবা শিথিলিত হইত, এবং বর্ত্তমান 'শকুন্তলা নাটক'-এর অবসান হইত! শকুন্তলার সংসার জীবনে "How soon her race was run" গোছের একটা আপশোষ জুড়িয়া দিয়াই কালিদাসকে 'উপসংহার' করিতে হইত। অতএব, এস্থলে, যেমন দুইজন প্রথমশ্রেণীর কবির অন্তঃসংজ্ঞা ও প্রয়োগের পরস্পর বিশিষ্টতা, যেমন দর্শনতন্ত্রী গীতিকবিতা ও ক্রিয়াতন্ত্রী নাটকের প্রয়োগ পার্থক্য, তেমন সাংসারিক ও অসামাজিক চারিত্র্যেরও ব্যবধান।

শকুন্তলার নিসর্গপ্রেমের বৈশিষ্ট বিষয়ে আর বাহুল্য করিব না। বলিয়াছি, প্রেমই শকুন্তলার Law and Impulse; লুসী যেখানে Overseeing Power দেখিতেছে, বলিতে হয়, স্বকীয় অন্তর্ধর্ম্মেই শকুন্তলা সেখানে যেন একটা Everloving Power অনুভব করিতেছেন। এই 'প্রেম'ই তাঁহাকে যুগপৎ উদ্দীপ্ত এবং সংযত করিতেছে; এবং 'নিসর্গ প্রেম'ই ক্রমে জীবে-প্রেম ও প্রিয়স্বরূপের প্রেমে পরিণাম লাভ করিয়াছে। এস্থলেও, যুগপৎ উদ্দীপ্ত এবং সংযত প্রেমের চরিত্র। অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রিয়স্বরূপের দর্শনমাত্র শকুন্তলা প্রেমোদ্দীপ্তা হইলেন; কিন্তু, পরক্ষণেই সচেতন হইয়া আপনার 'হৃদয়'কে জিজ্ঞাসা করিলেন "একি! ইহাঁকে দেখিয়া আমার মধ্যে তপোবনবিরুদ্ধ ভাব আসিতেছে কেন?" তপোবনের সংযমময় ও অধ্যাত্মমুখ জীবনের উচ্চ আদর্শবুদ্ধি—সচেতন প্রশ্ন এবং সঙ্গেসঙ্গে মীমাংসা! 'অ-পুনরাবৃত্তি' মীমাংসা! শকুন্তলার এই 'হৃদয়ের সঙ্গে প্রশ্ন এবং সমুত্তর'—ইহা একাধিক বার শকুন্তলা নাটকে পাইবেন—এস্থলেই শকুন্তলার মনস্বিতা। "হৃদয় সমাশ্বস্ত হও" "অবধীরণা ভীরুকং বেপতে মে হৃদয়ম্" ইত্যাদি কথা এবং আচার-বিচারেই প্রমাণিত করে, প্রেম তাঁহার পক্ষে কেবল Impulse নহে, Law ও বটে। "হে হৃদয়রাজ, তুমি আমাকে অধিকার করিয়াছ, একচ্ছত্র হইয়াছ, সত্য; কিন্তু আমি ত "নাত্মানং প্রভবামি"—আমার উপরে কণ্ব আছেন।" এস্থলেই, রোমিওর নিকটে শেক্সপীয়রের জুলিয়েতের ন্যায় "If thy purpose be Honourable" ইত্যাদি মতে প্রকৃত অবস্থা স্মরণ করাইয়া দিয়া, 'মনস্বিনী'র উক্তি! আত্মদান করিতে তাঁহার যে সম্পূর্ণ ক্ষমতা নাই, তাহাই বলিয়া ফেলিলেন! শকুন্তলা কেবল ভাবুকতাময়ী ও স্নায়ুদুর্ব্বল চরিত্র নহেন, সচেতনচিত্তা ও মনস্বিনী। কিন্তু, এই মনস্বিতার ফল কি হইল? এই সরলা ও নিরীহচরিত্রা—যিনি নিসর্গের পদার্থসমূহেই প্রেম-যোগিনী, মনে-প্রাণে কেবল 'প্রেমময়ী', প্রেমের 'আত্মদান'ধর্ম্মই যাঁহার শিক্ষাদীক্ষা, তাঁহার পক্ষে, বীরধর্ম্মে বিজয়ী, বীরাচারী এবং প্রবল ভোগবিলাসী ওই দুষ্যন্তের সমক্ষে আত্মরক্ষার

উপায় কি ছিল? তথাপি ত 'প্রেমময়ী' ও 'মনস্বিনী' হৃদয়রাজ দুষ্মন্তের সম্মুখে আত্মসমর্পণ না করিয়া পারিলেন না—দুষ্যন্তের অজুহাত ত উপেক্ষা করিতে পারিলেন না! 'বহ্বো্য রাজর্ষিকন্যকা' পূর্ব্বে 'স্বয়ংবরা' হইয়া গিয়াছেন", প্রিয়তমের এই নজীর ঠেলিয়া ফেলিতে তাঁহার ক্ষমতা নাই। দুষ্যন্তের প্রার্থনা এবং 'অজুহাত'টাই 'অলঙ্ঘ্য আদেশ'রূপে দাঁড়াইয়া গেল। এস্থলেই, প্রেম তাঁহার পক্ষে both Law and Impulse। প্রেমের ঐকান্তিকতা ও আত্মদানী বিশ্বস্ততা—একেবারে প্রেমদাসিত্ব! দুষ্যন্ত ব্যতীত অপর কোন সামান্য পুরুষ শকুন্তলাকে 'স্বামী'ভাবে আকৃষ্ট করিতে পারিত না—এতকাল কেহই পারে নাই। শকুন্তলা এতকাল সকলের প্রতি মাতৃপ্রেমেই 'সাম্রাজ্ঞী' ছিলেন। ওই 'অসামান্য' পুরুষের প্রতি তাঁহার 'নারীপ্রাণ' একবার 'প্রেমে আকৃষ্ট' হইলে (প্রেমযোগিনী সাবিত্রীর মত) উহাই অপরিহার্য্য 'ধর্ম্ম' ও Law এবং অলঙ্ঘ্য অদৃষ্টরূপে তাঁহার জীবনের 'অধিপতি' হইয়া দাড়াইয়া গিয়াছে। এ'সকল 'নারী'র জন্য জগতে ও জীবনে কেবল একমাত্র 'পুরুষ'; এ সকল চরিত্রের জন্যও কেবল একবারমাত্র 'প্রেম'; একবার মাত্র 'দান'! অত্যন্ত ভাবপ্রবণ চরিত্র—নিজকে প্রিয়তমের একেবারে দাস্যনিযুক্ত করিতে পারে এবং প্রিয়জনের বিরহেও একেবারে 'বিরহিনীর দশ দশায়' পড়িতে ও স্নায়বিক বিকারগ্রস্ত হইয়া 'মৃত্যু'দশার সন্নিহিত হইতে পারে—এমনই প্রেমিকাচরিত্র! ভাবপ্রবণ, দিব্যধর্ম্মী স্বাতন্ত্র্যে অপ্সরা-প্রাণ, অথচ মনুষ্যদেহী চরিত্র! 'হৃদয়রাজা'র সমক্ষে একেবারে বিশ্ববিস্মৃত ভাবে আত্মদান ব্যতীত শকুন্তলার অন্য সাধ্য ছিল না। সংসারে এইরূপ প্রেমের 'দুঃখকষ্ট' ত আছেই; কিন্তু, এইরূপ দুঃখভোগেই যেন উহার আনন্দ—আত্মদান এবং আত্মোৎসর্গ জনিত (আধ্যাত্মিক তরফের) দিব্যানন্দ! উহাই তাঁহাদের পরমার্থ-তপস্যা, উহাই তাঁহাদের জীবনের অধ্যাত্মসাধনা, উহাতেই তাঁহাদের 'মুক্তি' বা জীবনের 'পরমা গতি'। উহাকেই ত 'সতীধর্ম্ম' বলিয়া আর্য্যঋষিগণ নতশির হইয়াছেন! অসাংসারিক কপালকুণ্ডলার ন্যায়,সংসারের হস্তে শকুন্তলার একেবারে 'মৃত্যু' যে ঘটে

নাই, তাহাই আশ্চর্য্য—কিন্তু, মৃত্যুযাতনার কাছাকাছি গিয়াছে। প্রেম যাহার পক্ষে both Law and impulse, এমন একটা মানুষীর আত্মাকে স্বভাবে বা in a state of Nature দেখাইতেই যেন কালিদাস বদ্ধপরিকর। মনস্বিতার সঙ্গেসঙ্গে উহার মধ্যে Passion ও প্রবল! তৃতীয় অঙ্কে প্রেমের এই 'স্নায়ুধর্ম্ম' ও Physiological অবস্থা কালিদাস অনুপম তুলিকায় পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন! প্রেমের 'মিথুনধর্ম্ম'-তার দিক্ হইতে দৃষ্টি ব্যতীত শকুন্তলার অন্তরাত্মা ও চরিত্র-রহস্য ধরা' পড়িবে না। ফুলের মতই কোমল, ফুলের মতই সরল, প্রেমাস্পদের সম্মুখে আত্মরক্ষণে সম্পূর্ণ অসমর্থ এবং 'আত্মদানী'; কিন্তু, প্রেমের ঐকান্তিকতায়, প্রাণান্তপরিচ্ছেদ একনিষ্ঠতায় পাষাণের মত শক্ত এবং কঠোর! অনড় এবং অবিচল! মরিবে তবু নড়িবে না! এইত আবার একটী (বাল্মীকির সেই) "বজ্রাদপি কঠোর এবং কুসুমাদপি কোমল" চরিত্র! পঞ্চমাঙ্কের প্রত্যাখ্যানদৃশ্যে, আত্ম জীবনের পূর্ব্বাপর-বিপর্য্যাস এবং সর্ব্বনাশের দৃশ্যে, "ভগবতি বসুন্ধরে, দেহি মে বিবরম্"—এই একমাত্র কথা হঠাৎ উচ্চারণ করিয়াই শকুন্তলা নীরব। যেন সংসারলোকে মরিয়া গেলেন! উহার পর দীর্ঘ কয়টী বৎসর শকুন্তলার আর সাড়াশব্দ নাই। তিনি আপন জীবনের দুঃখ-তপোবনে সমাহিতা—দুষ্যন্ত-হৃতা হইয়াও দুষ্যন্তগতপ্রাণা হইয়াই যেন বিদেহ অবস্থায় নীরব! উহার পর যখন শকুন্তলাকে দেখি, তাহার 'পূর্ব্বাহ্নে' কবি দেখাইয়াছেন শকুন্তলার 'নীরব' জীবনের প্রধান অবলম্বনটী ও সাধনার দর্শনীয় ফলটী। প্রেমময়ীর এই দীর্ঘনীরব, দুঃখেরজীবন কোন্ অবলম্বনে, কি ভাবে উৎযাপিত হইয়াছে, তাহার পরিচয় স্বরূপ, কবি আগে দেখাইলেন শিশুপুত্র ভরত। পুত্রের পশ্চাতে মলিন বসনা, 'নিয়মক্ষামমুখী' এবং 'ধৃতৈকবেণী' সেই নীরব মনস্বিনী এবং একনিষ্ঠ প্রেমতন্ত্রের তপস্বিনী!

দুষ্যন্ত কি করিলেন? ঐ নিদারুণ অপরাধীর পক্ষে, এ'ক্ষেত্রে, একমাত্র করণীয় যাহা ছিল—অমনি শকুন্তলার পায়ে পড়িলেন! (১)

(১) কালিদাসের মধ্যে প্রেমের 'দাস্য' আদর্শ সর্ব্বতোভাবে প্রবল, বলিতে পারি। প্রেম যেখানে, দাস্যবুদ্ধি ও দাস্যভাব সেখানে না আসিয়াই পারে না। প্রেমতন্ত্রে স্বামী যেমন

উহার পর, শকুন্তলাও এ'রূপ দৃশ্যে আর কি করিতে পারেন? কি বলিতে পারেন? একমাত্র কথা—অতুলনীয় কথা—যাহা শকুন্তলার হৃদয়-মন-জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখসাগর বিমন্থিত করিয়া নবনীতরূপে, সুধারূপে উদ্বর্ত্তিত ও উচ্ছাসিত হইয়াছে, একেবারে সর্ব্বপ্রকার কৈফিয়তের দাবীটুকুন বিস্মৃত হইয়াই সহজে উচ্চারিত হইয়াছে—"জয়তু-জয়তু অজ্জউত্তো"! এমন স্থানে, এমন একটী কথা, অপর কোন কবি বলিতে পারিতেন কিনা, সন্দেহ করি। "জয় দুষ্মন্তের জয়!" যাহার চরণে বিনা বিচারে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছিলেন, এক কথাতেই নিজকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাহার দ্বারাই 'অসতী' বলিয়া উপহসিতা, এত লাঞ্ছিতা, এত অবমানিতা, দীর্ঘজীবন তাহারই হৃদয়হীনতা ও অবিচারচক্রে এত নিষ্পেষিতা হইয়াও শকুন্তলার ওই কথা! এই জীবনে একটিবার মাত্র প্রাপ্য বিভুককরুণার প্রধান 'বর'টুকুন হইতে, জীবনতন্ত্রে প্রেমের দুর্লভ-মধুর যৌবনফলটুকু হইতে দৃষ্টতঃ প্রবঞ্চিত হইয়াও, শকুন্তলার ওই কথা! নিরাকুল প্রেম-প্রাণা, নতমুখী ও অল্পভাষিণী শকুন্তলার প্রাণপরিচয়স্বরূপে, প্রাণপূর্ণা সুধা ও অন্তশ্চরিত্রের 'নিত্যসত্য'টীর প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপে, বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে কেবল একটি মাত্র কথা—"জয়, দুষ্মন্তের জয়!" এই 'জয়' শব্দের তুলনা নাই। শিশুটি জিজ্ঞাসা করিল "মা এ আবার কে?

স্ত্রীর, তেমন পিতা ও শিশুপুত্রের—আত্মজমাত্রের দাস। কুমারসম্ভবে পার্ব্বতীর উপান্তে শিব আপনাকে উপস্থিত করিয়া, সর্ব্বপ্রাণে ও সকল 'স্বত্ব'দাবী'-বিস্মৃত ভাবে পার্ব্বতীকে বলিতেছেন "অদ্য প্রভৃত্যনবতাঙ্গি তবাস্মি দাসঃ"। সেইরূপ মেঘদূতের যক্ষও প্রিয়তমার পায়ে পড়িতেছেন। দুষ্মন্তও অপরাধভঞ্জনের নিমিত্ত (একেবারে 'স্বামীদেবতা'র শাস্ত্রসিদ্ধ 'দাবী'টুকুন বিস্মৃত হইয়াই) শকুন্তলার পায়ে পড়িতেছেন। যেখানে দাস্য নাই অথচ কেবল 'দাবী' ও 'স্বত্ব' আছে—স্থির জানিতে হইবে—সেখানে 'প্রেম' নাই; সেখানে স্ত্রীপুরুষ উভয়েই হতভাগ্য, এবং তাহাদের বিবাহ এবং মিলনও স্বতঃই ক্ষুণ্ণ এবং ছিন্ন। প্রেমের রাজ্যে 'নারীত্বের দাবী' অথবা পুরুষের স্বামি-স্বত্বের দাবীও নাই। যে স্থলে প্রেম, সে স্থলেই দাবীর আমল অতর্কিতে 'উবিয়া' গিয়াছে! সেখানে কেবল 'দান'। প্রেমের এই 'উৎসর্গ' এবং 'দান'তত্ত্ব ও 'দাসত্ব' যে বুঝিল না, সে প্রেমই বুঝিল না।

আমাকে 'পুত্র' বলিয়া জড়াইয়া ধরিলেন?" "বৎস নিজের অদৃষ্টকেই জিজ্ঞাসা কর!" প্রিয়তমের দোষ দর্শনে একেবারে অসমর্থা এই অদৃষ্ট-বাদিনী! এই 'বাষ্প'—এই 'অশ্রু'—এই 'অদৃষ্ট'—এই 'জয়'! এ সমস্ত সুখের না দুঃখের? স্বয়ং সুধাপ্রাণ কবির দৃষ্টি ব্যতীত, মানবচিত্তের গুহাদর্শিনী প্রতিভা ব্যতীত, এমনসমস্ত কথার আবিষ্কার অপরের পক্ষে সম্ভবপর নহে। উহাদের মধ্যে প্রেমতত্ত্বের 'বিষামৃত' উভয়েই যেন ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান।

দুষ্যন্তও আর এমত স্থলে কি বলিতে পারেন?—"প্রিয়ে,

বাষ্পেন প্রতিরুদ্ধেঽপি জয়শব্দে জিতং ময়া;
যত্তে দৃষ্টমসংস্কারং পাটলোষ্ঠপুটং মুখম্॥"

দুঃখিনীর এই নিদারুণ ছবিটি দেখিয়াই যেন দুষ্মন্ত আজ 'পরমসুখী' এবং নিজকে পরম সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেছেন! যেন পরম হর্ষবিষাদ-ক্ষুব্ধ হৃদয়ে এবং বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রেই চাহিয়া দেখিতেছেন—

বসনে পরিধূসরে বসানা
নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণী।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা
মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি!!

ইহা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মী দুষ্মন্তের পক্ষে, প্রাধান্যতঃ বীরাচারী এবং ভোগতন্ত্রী দুষ্মন্তের পক্ষে একেবারে একটী পুনর্জ্জন্ম—তাঁহার অন্তর্জীবনে দ্বিতীয় জন্ম!

এই ত প্রেমের Law and Impulseএর প্রত্যক্ষমূর্ত্তি শকুন্তলা! উহার পর, ঋষিবর মারীচ আসিয়া প্রণয়িযুগলের এই নবজীবন ও পুনর্মিলনের উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছেন। উক্ত আশীর্ব্বচনের আড়ালে আপনার সুকৃতসৌভাগ্যগর্ব্বী কবি নিজের গ্রন্থটীর সমালোচনাটাও যেন জুড়িয়া দিলেন! এই দুষ্মন্ত-শকুন্তলার মিলন টুকুও "উভয় লোকানুগ্রহ শ্লাঘনীয়"! ওয়ার্ডসোয়ার্থের Skylarkএর ভাষায় যাহার অর্থ করিতে পারি—"True to the Kindred point of Heaven and Home।"

গ্যাটের ভাষায় শকুন্তলা-কাব্য "বসন্তের পুষ্পমঞ্জুরী ও শরতের ফলের একত্র সম্মিলন" এবং "স্বর্গমর্ত্যের মিলন সঙ্গীত" ! যে কারণে গ্যাঠের মতে শকুন্তলা একটী "Unfathomable Book" এবং শীলারের মতে উহা "Too Delicate for the Stage" ! সিদ্ধশিল্পী কালিদাসের এই শকুন্তলা কাব্যটীর আকৃতিমুখ্য প্রত্যক্ষতার অন্তরাল-গুপ্ত তত্ত্বাত্মাটুকু চিন্তা করিয়াই শ্রেষ্ঠশ্রেণীর সাহিত্যদার্শনিক গ্যাঠে বলিয়া উঠিয়াছিলেন—উহা একটী অতলস্পর্শী গ্রন্থ !

৬২। গীতি কবিতার ও দার্শনিক কবিতার বিপত্তি-মূল—গুণধর্ম্মের অসামঞ্জস্য।

কেবল একস্থানে ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের অরণ্যবালা ও কালিদাসের শকুন্তলায় পার্থক্য আছে। বলিতে কি, উহা পরম পার্থক্য ; এমন কি, বিষম পার্থক্য ! ওয়ার্ড্‌-সোয়ার্থের কথাগুলিই উদ্ধৃত করিব—

She shall be sportive as the fawn
That wild with glee across the lawn
Or up the mountain springs.

ওয়ার্ডসোয়ার্থের লুসী 'বনের হরিণী'র মতই Sportive—লীলাচাঞ্চল্য-শীলা—চিত্তধর্ম্মে আনন্দচঞ্চলা—এবং হরিণীর মতই তাঁহার "লাফিয়ে চলা" ! বলিব, কবি-বর্ণিত লুসীর অপর সমস্ত 'প্রশান্ত' গুণধর্ম্মের সঙ্গে আমরা ইহার সামঞ্জস্য করিতে পারি নাই।

The floating clouds their state shall lend
To her ; for her the willow bend

এই কথা তবু আমরা বুঝিতে এবং লুসীর সৌন্দর্য্যসুষমায় উহার সাধর্ম্ম্য ধারণা করিতে পারি ; কিন্তু—

Nor shall she fail to see
Even in the motion of the storm
Grace that shall mould the maiden's form
By silent sympathy.

ইহার সঙ্গেও লুসীর পূর্ব্বোক্ত শান্তধর্ম্মী গুণসমূহের যেন একটা সামঞ্জস্য আমাদের মন ঘটনা করিতে পারে না। কবি যে লুসীর সৌন্দর্য্যে কতকগুলি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের (শান্ত ও অশান্ত ধর্ম্মের) একত্র সমাবেশ করিতে চাহেন, তাহা বুঝিতে পারি; কিন্তু, 'নিসর্গরাণী' যেই কুমারীকন্যা আকাশের ধ্রুব-প্রাণে নিজের প্রাণকে ডুবাইয়াছে, যাহার হৃদয়ে এবং চরিত্রে নিস্তব্ধহৃদয় নিসর্গের শান্তি এবং নীরবতা অনুস্যূত হইয়া গিয়াছে, তাহার দেহমূর্ত্তি এবং দেহসৌন্দর্য্যে নৃত্যলোলা মৃগীর ক্রীড়াচাঞ্চল্য এবং 'তুফানী'ভাব! দেহের এই 'ধর্ম্ম' কি মনেও অর্শিবে না? আমাদের মনোবুদ্ধি এবং কল্পনাদৃষ্টি ত এ সকল 'বিরুদ্ধ'কে কোন মতে সঙ্গত এবং সমঞ্জসিত করিয়া চিত্তপটে লুসীর চরিত্রছবি আঁকিতে পারিতেছে না! কবির এই বিরুদ্ধপ্রয়োগের একটী রেখা যে অন্যকে কাটিতেছে! কেবল ভাবুকতা মাত্রে—কতকগুলি বিযুক্ত এবং অবিচিন্ত্য, দার্শনিক Idea মাত্রেই থাকিয়া যাইতেছে! কতকগুলি অপ্রকৃত ও অবাস্তব গুণসঙ্গম এবং Philosophy রূপেই 'বেখাপ্পা' থাকিয়া যাইতেছে!

ওযার্ড্‌সোয়ার্থের অরণ্যবালা মুখ্যভাবে কেবল গুণদর্শনা এবং দার্শনিক বিভাবনার কবিতা। সে'দিকেই উহার সৌন্দর্য্য এবং মাহাত্ম্য। গম্ভীর পরিদর্শনা এবং উজ্জ্বল পরিবর্ণনা! দেখিতেছি, গুণসঙ্গমের প্রকৃত পরিমূর্ত্তি—পরিস্ফোটনা বা সৃষ্টি—তিনি করেন নাই। গুণকে কায়ায় এবং কর্ম্মে বিভাবিত, অথবা জীবনচরিত্রে নাটিত করিতে তিনি চেষ্টা করেন নাই। কোন সংগীত বা গীতিকবিতাই উহাকে হয়ত প্রকৃতপ্রস্তাবে এবং পরিপূর্ণভাবে পারে না। নাট্যকাব্যের তুলনায় দার্শনিক কবিতায় অথবা গীতিকাব্যরীতির বিপত্তিস্থল কোথায়, উহা ওযার্ড্‌সোয়ার্থের এই "Three years she grew" কবিতাটীর প্রদর্শিত স্থল গুলিই প্রমাণ করিতে পারে। শকুন্তলার সহিত উহার পার্থক্য, সৃজনে ও দর্শনে যেই পার্থক্য—গঠনে ও বিশ্লেষণে, সৃষ্টিকর্ম্মে এবং সমালোচনায় যেই পার্থক্য! লুসীর সদ্‌গুণ গুলি সমুচ্চয়িত হইয়া, পরস্পর গায়েগায়ে লাগিয়া এবং প্রাণীভাবে ওতপ্রোত হইয়া কোন সুসঙ্গত 'মূর্ত্তি' ত সৃষ্টি করিতে পারিতেছে না! আমরা

একটা গুণকর্ম্ম-ঘনীভূত জীবমূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি না। এই 'অরণ্যবালা'কে শকুন্তলার ন্যায় জীবনকর্ম্মে নাটিত করিতে গেলেই ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থ সঙ্কটে পড়িতেন—নিজের দার্শনিকতার দোষ টুকুনও বুঝিতে পারিতেন। লুসীকে 'প্রেমে' ফেলিলেও এই সমস্যা সমুজ্জ্বল হইয়া ধরা দিত। এখন লুসী যেন কেবল একটা 'অসঙ্গ' ও ভাবগত চরিত্র; কেবল কবির চিত্ত-মন্দিরের এবং 'আস্ত' গীতিভাবুকতার 'গুণচ্ছায়া'-নির্ম্মিত, অপি চ, নানা মতে 'বিরোধাভাস'ময় একটি অস্পষ্ট ছায়াচিত্র! এইরূপে, কালিদাসের রঘুবংশেও, প্রথম সর্গে দিলীপরাজার বিংশতি-শ্লোকব্যাপী গুণবর্ণনা—অতীব কবিত্বসুন্দর এবং রাজনৈতিক তত্ত্ব ও মনুষ্যজীবনের আদর্শ দর্শনে সুগভীর হইয়াও—কেবল দিলীপ নামক জীবটীর একটি অপরিস্ফুট 'ছায়াচিত্র' মাত্র প্রস্তুত করিতে পারিয়াছিল; কিন্তু, দ্বিতীয় সর্গের 'সিংহমায়ার' আখ্যানটী দিলীপকে সামান্য মাত্রায় কর্ম্মিত করিয়া—তাঁহার character in Action দেখাইয়া—যেন একটা ঐন্দ্রজালিক দণ্ডেই উক্ত 'ছায়ামূর্ত্তি'কে জীবন্ত জীবমূর্ত্তিতে পরিণত করিয়াছে! আমাদের মনোজগতে 'ক্রিয়া' বলিয়া ব্যাপার এবং 'নাটকীয় ক্রিয়া'ধর্ম্মের এতই শক্তি এবং মাহাত্ম্য!

প্রেমের উদয় হয় নাই বলিয়াও হয়ত, ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের শৈলবালা এত 'চঞ্চলা'। বলা বাহুল্য, দেহের এই যে 'লীলাচাঞ্চল্য', ইহা যেমন প্রেম-বিকাশের তেমন যৌবনবিকাশেরও পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা—'নওল কিশোরী'র অবস্থা। যখন রমণীকে "কো কহুঁ যুবতী, কো কহুঁ বালা", যখন সবেমাত্র যৌবন-রস সঞ্চারিত হইয়া দেহে এবং মনে একটা "আই-ঢাই" "আনছান" এবং "কিমিব কিমিব" ভাব আনিয়াছে—জোয়ার ভরপূর হইয়া তখনও দেহমনকে 'পূর্ণতা' দেয় নাই বা উহাকে 'ভারী' করে নাই—সে সময়ের অবস্থা। কথিত আছে, রাজ্ঞী এলিজাবেথ নাকি এক সময় কৌতুক বশে, ফল্‌ষ্টাপ মহোদয়কে 'in love' দেখিতে চাহিয়াছিলেন, এবং উহাতেই শেক্স্‌পীয়রকে পরবর্ত্তী নাটকে 'প্রেমিক' বা নারী-রসিক ফল্‌ষ্টাপ চরিত্র অঙ্কিত করিতে "কবিত্ব প্রেরণা" দিয়াছিল। আমাদেরও

কুতূহল হয়, লুসী in Love হইলে কেমন দাঁড়াইত? মনুষ্যজীবনের, বিশেষতঃ নারীজীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় ঘটনা এবং 'সমস্যা' প্রেমোদয়। প্রেমের আত্মোৎসর্গ এবং দাসত্বনিয়োগের সমস্যা কখনও লুসীর জীবনে উকি দেয় নাই। প্রেমের আত্মদান এবং সর্ব্বস্ব-উৎসর্গের আঘাত একবার প্রাণমর্ম্মে পৌঁছিলেই, প্রেমের মনোজীবন এবং মনস্বিতার দীক্ষা একবার ঘটিয়া গেলেই, বুঝিতাম, লুসীরাণীর এই 'মৃগীচাঞ্চল্য'টী কোথায় থাকিত!

কালিদাসও ত শকুন্তলার জীবনে এবং চরিত্রে মৃগীধর্ম্মের সাদৃশ্য দেখিয়াছেন! প্রাচীনভারতের তপোবনজীবনে হরিণ-হরিণী ও হরিণ শিশু একটী অপরিহার্য্য বস্তু। মৃগকে ছাড়িয়া তপোবন-জীবন বিকাশ লাভ করিতেই পারে না। কালিদাসও চিরকাল মৃগপ্রিয়; বলিতে পারি, মৃগমৃগী তাঁহার কাব্যে নিত্য-উপস্থিত বস্তু। রঘুবংশে, কুমার সম্ভবে ও শকুন্তলায়, ঋতুসংহার বিক্রমোর্ব্বশী এবং মালবিকাতেও, কোথাও বা গুণ-ক্রিয়া-ধর্ম্মে, কোথাও বা যেন এক-একটী স্বতন্ত্র নাট্যচরিত্র রূপেই 'মৃগ-মৃগী' আসিয়া পড়িয়াছে। দুষ্যন্ত আশ্রমে প্রবেশ করিতেই—মৃগ! মৃগ অবলম্বনেই সর্ব্বপ্রথম 'শীকারী' দুষ্যন্তের ও 'অতিলোলজীবিতা' 'মৃগী' শকুন্তলার পরস্পরসম্বন্ধের যেন সঙ্কেত! যেন নিত্যসম্বন্ধটীরই সঙ্কেত! সমস্ত শকুন্তলাকাব্যটিই যেন 'নারী-মৃগয়া' শীল এবং নিশিত-সন্ধানী দুষ্যন্তের শীকার বা 'বশীকার' তত্ত্বেরই একটা 'দর্শন' এবং গবেষণা! শকুন্তলা নাটকে এই 'মৃগ' অনেকস্থলে যেন একটী স্বতন্ত্র 'নাট্যপাত্র' ও 'চরিত্র'রূপেই ত দাঁড়াইয়াছে! দ্বিতীয় অঙ্কেও দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে, "মৃগশাবৈঃ সমমেধিতো জনঃ" বলিয়াই চিনিতেছেন। তৃতীয় অঙ্কের ঘটনাতেও মৃগের কাজ স্বল্প নহে। প্রত্যাখ্যান-দৃশ্যে, 'গান্ধর্ব্ব-পরিগ্রহের' প্রমাণ উপস্থিত করিতে গিয়া, সর্ব্বপ্রধান 'প্রমাণ' রূপে মৃগশিশুর আচরণ টুকুই শকুন্তলা দুষ্যন্তকে স্মরণ করাইতে চাহিলেন; মৃগশিশু রাজার হস্তে জল গ্রহণ করিল না—শকুন্তলা ধরা' মাত্র পান করিল! দুষ্যন্ত হাসিয়া একটা পরম আদরের কথা বলিয়াছিলেন, ভাবপ্রাণা শকুন্তলা লক্ষ কথার মধ্যে সে কথাটিই স্মরণ রাখিয়াছেন—

তোমরা "দ্বৌঅপি আরণ্যকৌ"—'ছুটাই বুনো'! আবার, মৃগের কুশল চিন্তাই 'অবস্থাজ্ঞানকুশলা' সখীর পক্ষে, শকুন্তলাকে শীকারী ও 'খাদক' দুষ্মন্তের সমক্ষে একাকী রাখিয়া লতাকুঞ্জ হইতে গা ঢাকা' দিবার একটা প্রকাণ্ড অজুহাত! চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলার 'পুত্রকৃতক' মৃগটিই ত পশ্চাৎ হইতে পরম আকুলতায় আঁচল টানিয়া ধরিয়া সর্ব্বভূতে প্রেমময়ী শকুন্তলা-চরিত্রের সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রমাণটী নাটিত করিয়াছে! বিদায়-দিনের সকল করুণরসের 'সেরা' পরিবর্ণনাটিই প্রদান করিতেছে! মৃগ ব্যতীত শকুন্তলার হৃদয়ের ও চরিত্রের প্রকৃত প্রতিকৃতি টুকু যেমন পরিস্ফুট হয় না; তেমন, মৃগের সম্বন্ধ ব্যতীত, উহার উপস্থিতি ব্যতীত, তাঁহার দেহের 'প্রতিকৃতি' টুকুও যেন 'প্রকৃত' এবং স্বভাবানুগত হয় না। ইহা স্বয়ং দুষ্মন্ত পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলা চিত্রের পশ্চাতে "পাদাস্তামভিতো নিষন্নহরিণা গৌরীগুরোঃ পাবনাঃ" আঁকিয়া দিয়াই ত (কথায় এবং কার্য্যে) স্বীকার করিয়াছেন! শকুন্তলার সর্ব্বত্র মৃগ—মৃগ—মৃগ! তপোবনের হৃদয়যোগী কালিদাস মৃগকে বিস্মৃত হইতে কিংবা উহাকে বাদ দিতে ত পারেন না! কিন্তু শকুন্তলায় এই মৃগতত্ত্বের সমস্ত লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা কোন্ দিকে গিয়াছে? মৃগের ক্রীড়াচাঞ্চল্য ও চাপল্য ধর্ম্ম টুকু কালিদাস কদাচিৎ মুখ্য করিতে চাহিয়াছেন। শকুন্তলার চরিত্রে মৃগমৃগীর বহিরঙ্গ sportiveness কদাপি সঙ্কেতিত করিতে বা মুখর করিতে কালিদাস চাহেন নাই। মৃগশাবকের "পরোক্ষ মন্মথ" সরল ভাব, "সদৃশেক্ষণ বল্লভা" হরিণাঙ্গনাগনের বিশাল নেত্রের অকপট শান্ত সৌন্দর্য্য, 'আরণ্যক' মৃগমৃগীর অকৃত্রিম ও স্বভাবানুগত জীবন, অমায়িক প্রেমরতির বশে 'কৃষ্ণমৃগের বামনয়ন কণ্ডূয়মানা মৃগীর' শান্তশীল ও সুবিশ্বস্ত চরিত্র এবং প্রেমনির্ভর আচরণ—কেবল এ সমস্ত মৃগলক্ষণ এবং 'মৃগধর্ম্মই' কালিদাস শকুন্তলা চরিত্রে সম্পাতিত করিতে চাহিয়াছেন। কবির উদ্দিষ্ট 'লক্ষণা' ও মর্ম্মানুযায়ী পরিব্যঞ্জনার দিকেই ত পাঠককে সর্ব্বপ্রযত্নে দৃষ্টি রাখিতে হয়! কালিদাসের কোন উপমা বা দৃষ্টান্তই শকুন্তলার দৈহিক ক্রীড়া-চাঞ্চল্য উপলক্ষ করিতে অথবা তাঁহার চিত্তধর্ম্মে ও চরিত্রে তপোবনী

শিক্ষাদীক্ষার বহির্ভূত কোন চিত্তবিক্রিয়া উপলক্ষিত করিতে চাহে নাই। মৃগীর sportiveness দেহে পরিস্ফুট হইলে, উহার প্রতিভাস চিত্তে এবং চরিত্রেও ফলিত হইবে না? Sportiveness বরং অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার মধ্যে শকুন্তলার সখ্যসম্বন্ধে আসিয়াই প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু, কালিদাস স্থির জানিতেন, শকুন্তলার চরিত্রে উহা অধ্যাত্মতঃ একেবারে 'সাংঘাতিক' হইয়া পড়িত; চরিত্রকে বিলকুল বিকেন্দ্র এবং উলটপালট করিয়া দিত। এস্থলে কবির 'বলা' অপেক্ষা 'না বলা'র অর্থ টুকুই বরং ভাল করিয়া বুঝিতে হয়। নাট্যকবির পক্ষে তাঁহার 'গ্রহণ' অপেক্ষা বর্জ্জনের মূল্যই হয়ত অনেক বেশী। সাহিত্যে শিল্পকর্ম্মীর প্রধান মাহাত্ম্যও অনেক সময় হয়ত তাঁহার 'কার্য্যে' নহে—'ধৈর্য্যে'।

এখন, স্বয়ং দুষ্যন্ত কোন্ ভাবে, কোন্ দিক হইতে শকুন্তলাকে দেখিয়াছেন ও চিনিয়াছেন? বলা বাহুল্য, এস্থলেই নাট্যকবি কালিদাসের প্রধান শিল্পিত্ব এবং শকুন্তলা কাব্যের অদৃষ্টচক্রের প্রধান পরিচালক তত্ত্বটীও এ' স্থানেই মিলিবে। দুষ্যন্ত প্রথমতঃ 'সুন্দরী শকুন্তলা'কেই চিনিয়াছিলেন—রূপসুন্দরী! বলিয়াছি, বহুস্ত্রী-ভোগী দুষ্যন্ত নারী-সৌন্দর্য্যের একজন জহরী। কিন্তু, এ'ক্ষেত্রে তাঁহারও 'পরাজয়' ঘটিয়াছিল; তিনিও প্রথম প্রথম মনস্বিনী এবং ভাবিনী শকুন্তলার অধ্যাত্মশ্রী উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কেবল একটা অননুভূতপূর্ব্ব ও অচিন্ত্য সৌন্দর্য্য, যাহা ধৃতি-নেত্রে কোনমতে পূর্ণভাবে উদিত হয় না; ভূতলে প্রভা-তরল 'বিদ্যুৎবল্লীর ন্যায়' একটা দিব্য প্রতিভাস, যাহা বুদ্ধির মুষ্টিতে ধরা' দেয় না; একটা "কিমিবহি" মাধুর্য্য, যাহা মনুষ্যপতি দুষ্যন্তের, 'সমুদ্রবসনা উর্ব্বী'পতি দুষ্যন্তের শুদ্ধান্তেও দুর্লভ! এ'ক্ষেত্রে, কেবল বনলতার দ্বারা উদ্যানলতা যে পরাস্ত তাহাই যেন স্থির ও পরিস্ফুট ভাবে তিনি বুঝিতেছেন। তথাপি, তিনিও ত কেবল ভোগের দিক হইতেই শকুন্তলার সৌন্দর্য্যকে চিনিতে পারিতেছিলেন! শকুন্তলার দেহে 'কুসুমবৎ লোভনীয়' যৌবন। শকুন্তলার 'রূপ' আগুনের মত দিব্যজাতীয় ও দিব্যদীপোজ্জ্বল দেখাইলেও উহাকে "স্পর্শক্ষমং রত্নম্" বুঝিয়াই তিনি আশ্বস্ত ও উৎসাহিত। তাঁহার

সকল চিন্তা ও স্বগত উক্তি কেবল ভোগের দিক হইতে—নিজের ইন্দ্রিয়যোগ্যতা ও ইন্দ্রিয়ভোগ্যতা। আড়াল হইতে দেখিতেছেন, ভোগের অপূর্ব্ব ডালিই উদঘাটিত! সখীগণ শকুন্তলার 'পিনদ্ধ বল্কল' শিথিল করিয়া উদ্ভিন্নযৌবনার সৌন্দর্য্যকে কারামুক্ত করিয়া দিল, দুষ্যন্ত তদ্দৃষ্টে লালায়িত হইতেছেন! 'অনাঘ্রাতং পুষ্পং' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শ্লোকেও প্রতিপদে দুষ্যন্তের ভোগতন্ত্রই প্রমাণিত করে। ভ্রমরটী বিকশিত কমলভ্রমে শকুন্তলার মুখের নিকটেনিকটে চারিদিকে ঘুরিতে পারিতেছিল, তাহা দেখিয়া দুষ্যন্ত ঈর্ষ্যান্বিত—"বয়ং তত্ত্বান্বেষাৎ মধুকর হতাস্ত্বংখলু কৃতী"! শকুন্তলার ওই সৌন্দর্য্য 'অখণ্ড পুণ্যের' ফল—"ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ"। ইহা প্রবল ভোগতন্ত্রীর যেন একটা নিদারুণ, নির্লজ্জ 'স্বগত' উক্তি বা 'ইয়ারকী' উক্তি। পঞ্চম অঙ্কে ধর্ম্মবন্ধনে হস্তপদবদ্ধ দুষ্যন্তের স্বগত উক্তিটিও ভোগতন্ত্রই প্রমাণিত করিতেছে—"ন চ খলু পরিভোক্তুং নাপি শক্নোমি হাতুম্"। মানুষমানুষীর প্রেমের মধ্যে, 'মিথুনধর্ম্মী' প্রেমের মধ্যে ভোগতন্ত্র আছে—এবং উহা উপেক্ষণীয় নহে। শিল্পী কালিদাস ভোগকলা না দেখাইয়া পারেন নাই। কারণ, এই 'ভোগতন্ত্র' অতিরিক্ত এবং 'বহুসেবী' হইলেই ত আত্মবিস্মৃত এবং সকলসম্বন্ধ-বিস্মৃত হইতে পারে; একেবারে পরিগ্রহ-সম্বন্ধের স্মৃতিটাই হারাইয়া বসিতে পারে! উহার উপরেই ত 'দুর্ব্বাশার শাপ' স্বতঃ-সম্ভবী ও সুসঙ্গত হইতে পারে! অপিচ, দুর্ব্বাশার শাপই ত এই নাট্যকাব্যের 'নিয়তি'-পরিচালক এবং 'অদৃষ্ট-রূপক' যন্ত্র! দুষ্যন্তের এই 'ভোগতন্ত্রী' প্রেমের স্থিরতার জন্য, এমন কি, উহার স্মৃতি-স্থৈর্য্যের পক্ষেই একটা বাহ্যিক সাক্ষ্য এবং অভিজ্ঞানেরই প্রয়োজন ছিল। 'পরিগ্রহ-বহুত্ব'শালী এবং কেবল আত্মভোগ-চিন্তক দুষ্যন্তরাজার পক্ষে জীবনপথের চোরাগলিতে একটা হঠাৎকার এবং 'গান্ধর্ব্ব'মিলনের বিস্মৃতিঘটনাই স্বাভাবিক ছিল। 'দুর্ব্বাসার শাপ' অতিরিক্ত ভোগধর্ম্মী ব্যক্তির মনস্তত্ত্বজগতের সেই 'অবশ্যসত্যের' 'রূপক' বই নহে। অন্যথা, সানুমতীর ভাষায় বলিতে পারা যায়, "নেদৃশোঽনুরাগো অভিজ্ঞানমপেক্ষতে"! দুষ্যন্তের অনুরাগ পরম

ভাবাবিষ্ট অনুরাগ হইলেও একটা ক্ষণজন্ম এবং ক্ষীণজীবী ভাবুকতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সেক্‌সপীয়রের ভাবুকতাবিষ্ট রোমিউর প্রেমের ন্যায়, উহার পক্ষে "অন্যসঙ্গাৎ বিস্মৃতঃ" হওয়াই ত পরম 'স্বাভাবিক' ছিল! ঈদৃশ হঠকারী প্রেম এবং মিলনের উপরে 'বিশ্বনীতি'র এবং বিশ্বজগতের 'ঋত' তন্ত্রের যে একটা অভিশাপই আছে! দুষ্যন্তকে এবং সঙ্গেসঙ্গে অনপরাধা (হয়ত অল্পাপরাধা) শকুন্তলাকে সেই অভিশাপফল ত 'ভোগ' করিতেই হইবে! আগুনে অজ্ঞানে হাত পড়িলে, উক্ত ব্যাপারের জন্য বিশ্বনীতির যেই 'অদৃষ্ট' নির্দ্ধারিত আছে—তাহা ত অপরিহার্য্য! শিল্পী কালিদাস 'নির্ম্মম' এবং নিরপেক্ষ ভাবেই উহা দেখাইয়াছেন—যেমন শিল্পী টলষ্টয় যৌনমিলন এবং স্ত্রীপুরুষের পরিণয় নীতির ভোগলুব্ধ অতি-বর্ত্তনের 'অদৃষ্ট' ফলটী তাঁহার 'আনা কারণীন' উপন্যাসে অতুলনীয়-নির্ম্মম ভাবেই দেখাইয়াছেন।

দুষ্যন্তের বহিশ্চক্ষু শকুন্তলাকে চিনিতে পারে নাই; "অনিমিত্ত নিরাকৃতা" হইয়া শকুন্তলা অদৃশ্যা হইলেই, "নিরাকরণ বিক্লবা" ও "প্রত্যাদেশ বিমানিতা" তপস্বিনীর এবং প্রণয়িনীর ছবি তাঁহার মনোলোকে পরিস্ফুট হইয়া উঠে! তিনি কাহাকে নিরাকৃত করিয়াছেন—কি ধন হারাইয়াছেন? যাহাকে পায়ে ঠেলিয়াছেন, পৃথিবীতে তাহার তুলনা আছে কি?

স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু
গতং নু তাবৎফলমেব পুণ্যম্॥

এখন আর শকুন্তলার 'রূপ'কেই 'অখণ্ড পুণ্যফল' জ্ঞান করিয়া উহার 'ভোক্তা' হইবার জন্য দুষ্যন্ত ভাবিত নহেন—এখন শকুন্তলারূপী ব্যক্তিকে, ও তাঁহার ব্যক্তিত্বের (Personalityর) সম্পর্ককেই জীবনের মহৎ পুণ্যফল ধারণা করিয়া দুষ্যন্ত অনুতপ্ত হইতেছেন। উহার জন্য প্রাণান্তিক বিরহে, প্রাণমনের ও অন্তরাত্মার ক্ষুধায় দগ্ধ হইয়া, অনুতাপের নবাগ্নিতে পুড়িয়াই দুষ্যন্তের হৃদয় বিশুদ্ধ সুবর্ণরূপে শকুন্তলার কণ্ঠহারের যোগ্য হইয়াছে। দুর্ব্বিষহ অনুতাপ এবং আত্মগ্লানির তুষানলে দহ্যমান দুষ্যন্ত

মহারাজার সেই অপরূপ ছবি, কবি ষষ্ঠ অঙ্কে অঙ্কিত করিতেছেন। জীবনের ভোগতন্ত্রের পরম 'শিল্পী' দুষ্যন্ত, সৌন্দর্য্যকলার পরম Artist দুষ্যন্তই কি না এখন "রম্যং দ্বেষ্টি"! "চিন্তাজাগরণ-প্রতাম্রনয়নঃ" এবং "শ্বাসোপরক্তাধর" হইয়া তিনি যেন প্রেম-তন্ত্রের 'তপস্যা'তেই নিযুক্ত হইয়াছেন—প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন! কুমারসম্ভবে উমার 'তপস্যা' বা দেহের লুব্ধতাজয়ী 'সাধনা'ই উমাকে অধ্যাত্মশক্তিধর এবং মদনভস্মকারী দেবদেবের 'প্রেম'লাভে যোগ্যতা দিয়াছে; যিনি "অরূপহার্য্যং মদনস্য নিগ্রহাৎ" তাঁহার হৃদয়বিলাসিনী হইবার যোগ্যা করিয়াছে। এরূপ স্থলেই বুঝিতে পারি, ভারতের হৃদয়ঙ্গমকবি কালিদাসের 'প্রেম' আদর্শ! প্রেমিক-প্রেমিকা উভয়ের পক্ষেই এ'রূপ একটা 'তপস্যা' ব্যতীত, বিরহগতি অথবা অনুতাপ-প্রায়শ্চিত্তের অধ্যাত্মশ্রী ব্যতীত যেন কালিদাসের মতে প্রকৃত 'মিলন' হইতেই পারে না! প্রকৃত প্রেমিক এমন কি বিবাহিত দম্পতির মধ্যেও, বাহ্যিক রূপতন্ত্রীয় মিলনের পরেও, যেন আবার এই দ্বিতীয় মিলন, এই অধ্যাত্ম মিলনের প্রয়োজন। প্রকৃত প্রেম মাত্রেই যেন একটা 'তপস্যা'র ফল এবং 'দ্বিজন্মা' পদার্থ; এবং প্রকৃত 'মিলন' মাত্রেই যেন একটা 'দ্বিজ' মিলন! ভারতের সতীধর্ম্মের আদর্শরূপিনী সাবিত্রীর চরিত্রেও উহারই আভাস। কুমারসম্ভবের পঞ্চম সর্গের 'উমাতপস্যা'র অনুভাসে, শকুন্তলার ষষ্ঠ অঙ্ককেও 'দুষ্যন্ত তপস্যা' নাম দিতে পারি।

৬৩। চিত্র ও কাব্যের পৃথক্‌ ২ বিশেষত্বময় রীতি ও ক্ষেত্র, পরিকর এবং পরিবেশ।

ষষ্ঠ অঙ্কের বিরহ পথেই দুষ্যন্ত প্রকৃত শকুন্তলাকে—মহর্ষি কণ্বের 'উচ্ছ্বসিত' ভূতা, তপোবনের হৃদয়ভূতা শকুন্তলাকে চিনিয়াছেন। উহার প্রধান প্রমাণ, উক্ত অঙ্কের "চিত্র সম্পূরণ" ব্যাপার। দুষ্যন্তের মনস্তত্ত্ব এবং উহার পূর্ব্বাপর গতি ও পরিণতি বুঝিতে হইলে উক্ত দৃশ্যটীর তুলনা নাই। প্রাচীন ভারতে, অন্ততঃ চতুর্থ শতাব্দীতে (?), চিত্রকলা কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, উহার আদর্শ এবং 'রীতি' কি ছিল, কাব্য ও চিত্ররীতির পার্থক্য কোথায়, এ সমস্ত বুঝিতে

হইলেও উক্ত দৃশ্য অতুলনীয়। কলিদাস যেমন একজন পরম 'বাক্যশিল্পী' তেমন পাকা 'চিত্রশিল্পী'—অন্ততঃ সমঝদার চিত্রকর। তাঁহার দুষ্যন্তও ছিলেন একজন পাকা চিত্রকর—একজন সর্ব্বকলা-কুশল 'চৌরশ' ব্যক্তি। অঙ্গুরীয়দর্শনে স্মৃতি উদগমের পর, নিজের চিত্তবিনোদনের জন্য তিনি স্মৃতি হইতেই শকুন্তলার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করেন। অবশ্য, বিরহি-জীবনের প্রথম অবস্থাতেই উহা অঙ্কিত করেন। বলিতে হয়, তখন যাহা 'সাধু' মনে করিয়াছিলেন তাহার অনুরূপেই উহা অঙ্কিত করেন। আগে যাহা আঁকিয়াছিলেন, এ দৃশ্যে (নিঃসন্দেহ কিছুকাল পরে) তাহাই আবার পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন এবং 'চিত্রে অর্পিতা'র জন্য অনুতাপ করিতেছেন। রাজা এমন নিপুনভাবে চিত্রটী আঁকিয়াছেন যে, এমন 'হুবহু' প্রতিমূর্ত্তি বা Verisimilitude দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, শকুন্তলার আসন্নসখী অপ্সরা সানুমতীই অন্তরাল হইতে উহা দেখিয়া সাশ্চর্য্যে ভাবিতেছেন—"জানে প্রিয়সখী মে অগ্রতো বর্ত্ততে"! উহা দেখিয়া বিদূষক 'সত্বানুপ্রবেশ শঙ্কা' করিতেছে! স্বয়ং চিত্রকর দুষ্যন্তই বিস্মিত হইতেছেন যে, "প্রেমামন্থ-মীষদীক্ষতইব, স্মেরা চ বক্তীব মাম্"! উহাকে প্রকৃত শকুন্তলা ভাবিয়া প্রেমাবেশে একেবারে আবিষ্টের আচরণই করিয়া বসিলেন! আবার, দুষ্যন্তচিত্রকরের একেবারে 'অশ্রুসিক্ত' এই চিত্র! কিন্তু, এইবার চিত্রটি পুনশ্চিন্তা করিতে গিয়াই রাজা বুঝিতে পারিলেন নিজের ভুল। একটা বিষম ভুল! 'প্রকৃত' শকুন্তলার চিত্র ত অঙ্কিত হয় নাই! দুষ্যন্ত বুঝিতে পারিয়াছেন, শকুন্তলার 'রূপ' ত কেবল শকুন্তলার দেহবিম্বিত বা দেহাশ্রিত 'রূপ' নহে! শকুন্তলারূপী 'ব্যক্তি'টাও ত কেবল নিজের দেহচ্ছায়ায় আবৃত 'ব্যক্তি' নহেন! তপোবনের 'রূপ'ও যে শকুন্তলার, অপরিহার্য্য ও অবিভাজ্য 'রূপাংশ'! তপোবনের ওই অপরিহার্য্য পরিবেষ-'রূপান্বিতা' ব্যক্তিটাই ত শকুন্তলা! তপোবনের হৃদয়ভূতা ওই শকুন্তলা! তপোবনী' দৃশ্যের পরিকর বা পরিবেষ ব্যতীত প্রকৃত 'শকুন্তলা চিত্র' অঙ্কিত হইতে বা উহা নির্ভুল হইতেও পারে না। সুতরাং দুষ্যন্ত স্থির করিলেন এবং বলিয়া উঠিলেন, শকুন্তলার ছবির পশ্চাতে "অভিমত দৃশ্য'

অঙ্কিত করিতেই হইবে—নচেৎ, এই চিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। দুষ্যন্ত কী আঁকিতে চাহিলেন ?

কার্য্যা সৈকতলীন-হংসমিথুনা স্রোতোবহা মালিনী
পাদাস্তামভিতো নিষন্নহরিণা গৌরীগুরোঃ পাবনাঃ।
শাখালম্বিত-বল্কলস্য চ তরো নির্ম্মাতুমিচ্ছাম্যধঃ
শৃঙ্গে কৃষ্ণমৃগস্য বামনয়নং কণ্ডূয়মানাং মৃগীম্॥

শ্লোকটী নানাদিকে বহুমূল্য! 'পশ্চাৎ দৃশ্য' অঙ্কিত করিতে হইবে—চলিত কথায় Back ground অঙ্কিত করিতে হইবে। উহা ব্যতীত শকুন্তলা-চিত্র 'সম্পূর্ণ' হইবে না। আবার, যে-সে দৃশ্য নহে—'অভিমত' দৃশ্য—যথোপযুক্ত 'পশ্চাৎ দৃশ্য'। পুনশ্চ, তপোবনের যে-সে দৃশ্য বসাইলেই ত 'অভিমত' হইবে না! শকুন্তলা মূর্ত্তিটির পশ্চাতে চাই, সর্ব্বোদগ্রভাবে, ভারতমাতার পিতা হিমাদ্রির—গৌরীগুরু হিমালয়ের—'পবিত্র'মূর্ত্তি। হিমালয়ের পাদদেশে (কেবল একটী সংকীর্ণ বা 'স্ব-সম্পূর্ণ' নির্ঝরিণী আঁকিলেই চলিবে না) চাই, প্রেমের স্রোতোরঙ্গিনী, আত্মদান-রঙ্গিনী মালিনী নদী! আবার, স্রোতোময়ী নদীটীর বক্ষেও চাই, (ভাসমান নৌকা অথবা স্রোতোৎপাটিত তরুগুল্মলতার সমুচ্চয় নহে) প্রেমের মিথুনমূর্ত্তি—শান্তচরিত্র এবং পরস্পর প্রেমে সমাস্বস্ত, অকুতোভয়, নিরীহ, হংসমিথুন! হিমালয়ের 'পবিত্র' পাদমূলেও চাই—সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী গণ্ডার নহে—অচপলভাবে এবং নির্ভয়ে উপবিষ্ট, অহিংস মৃগকুল। আবার, উহারা দাড়াইয়া থাকিলেও চলিবে না—শান্তনির্ভরে 'নিষন্ন' থাকিতে হইবে। তবে, উহাদের নিঃশঙ্ক রোমন্থন কর্ম্মটী।—অবশ্য, উহা 'চিত্রে' দেখান যাইতে পারে না। তারপর, এই চিত্রে অঙ্কিত করিতে হইবে একটী তরু। কেবল শাখাপ্রশাখায় একটী মহাতরু অঙ্কিত করিলেই চলিবে না; শাখায় নিরীহ তপস্বিজনের বল্কল—অবশ্য শুকাইবার জন্য—ঝুলিতে থাকিবে; কেবল যে লক্ষণেই বুঝা যাইবে যে উহা তপোবন দৃশ্য। তারপর! তারপর, উক্ত দৃশ্যের আরও সাম্নে আঁকিতে হইবে আবার 'একজোড়া' কৃষ্ণসার। এমন ভাবে আঁকিতে হইবে যেন দেখিলেই

হৃদয়ঙ্গম হয় যে মৃগীটাই 'প্রেমমুগ্ধ' ভাবে মৃগটীর 'বাম নেত্র' কণ্ডূয়ন করিতেছে। (১)

এই ত 'পাবন' তপোবন দৃশ্যের অন্তর্নিবাসিনী, উহার অন্তর্ভূতা, উহার হৃদয়ভূতা ও প্রেমের মিথুনধর্ম্মের 'পুত্তলভূতা,' পবিত্রা—'শুদ্ধশীলা'— শকুন্তলা! দুষ্যন্ত নিজের প্রেমতপস্যায় এই শকুন্তলাকে চিনিয়াই নিজের পূর্ব্ব-অঙ্কিত, 'পশ্চাৎ দৃশ্য'-বিহীন শকুন্তলাচিত্র 'অসম্পূর্ণ' বলিয়া স্থির বুঝিয়াছিলেন।

যাঁহারা বলেন, ভারতীয় চিত্রকলায় 'পশ্চাৎ দৃশ্য' নাই, অথবা উহার প্রয়োজন নাই, তাঁহারা দুষ্যন্তের এই চিত্র-সম্পূরণ ব্যাপার ও কালিদাসের 'সাক্ষ্য' চিন্তা করিতে পারেন। একে ত চিত্রের প্রকাশ-ক্ষমতা এবং উহার 'ক্ষেত্র'ও (কাব্যের তুলনায়) নানাদিকে সঙ্কীর্ণ, তাহাতে আবার 'পরিকর' না থাকিলে উহার 'প্রকাশ' কতদূর অসন্তোষকর হইতে পারে, তাহার প্রমাণ দুষ্যন্ত। কাব্যশিল্পী কালিদাস বাক্যের ক্ষেত্রে পরিকর সাহায্যেই স্বল্পবাক্ শকুন্তলাকে 'মুখর' করিয়াছেন, চিত্রের ক্ষেত্রে নামিয়া আসিয়াও দেখাইলেন যে উপযুক্ত 'পশ্চাৎ-দৃশ্য' ব্যতীত, পরিবেষ বা

(১) কালিদাস কুমারসম্ভবে দেখাইয়াছিলেন, "শৃঙ্গেন চ স্পর্শ নিমিলিতাক্ষীং, মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ॥" নিরীহ মৃগ-মৃগীর প্রেমনিভর বিশ্রব্ধ আচরণের এই চিত্রটি যে কবি কালিদাসের অত্যন্ত প্রিয় এবং তাঁহার দৃষ্টিতেও উহা যে 'চিরনূতন' তাহা পাঠককে বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু, এ ক্ষেত্রে কালিদাসের একটা চিত্তবিকাশের এবং প্রেমকলায় আদর্শপরিণতির প্রমাণও যেন পাওয়া যায়। কুমারসম্ভবে যেমন 'পুরুষ' মৃগটী, শকুন্তলায় সে স্থানে স্ত্রীটাই প্রেমাবেশে প্রগল্ভতা দেখাইতেছে। স্ত্রীর দিক হইতে এই প্রগল্ভতা এবং ভাবাবেশ কাব্যে 'সৌন্দর্য্য সৃষ্টি'র তরফে অধিকতর 'সুন্দর'; উহা প্রেম-কলা সম্মত এবং বাৎস্যায়নের 'কামশাস্ত্র' সঙ্গত। এস্থলেই শকুন্তলার লেখনীমধ্যে কুমারসম্ভব অপেক্ষা পূর্ণতর অভিজ্ঞতার পরিচয়। কালিদাসের কাব্যে বহুস্থলে বাৎস্যায়নের 'কামশাস্ত্র' কুশলতার প্রমাণ পাই। উহাতেই মনে হইতে থাকে, শকুন্তলা কুমারসম্ভব অপেক্ষা 'পরিপক্কতর' হস্তের শিল্পরচনা।

পরিকর ব্যতীত একাকিনী অথবা সখীসঙ্গিনী শকুন্তলার চিত্রও 'অপ্রকৃত' এবং নানাদিকেই অসন্তোষ-কর।

আরও ঘনিষ্টভাবে বুঝিতে হইবে উদ্ধৃত শ্লোকটি। উহা ত 'সাহিত্যাচারী' কবির পক্ষে একটা 'চিত্রাচার'! চিত্ররীতি ও কাব্যরীতির ওই মিলনকলে, ওই 'সম্ভূয়-সমুত্থানের' এবং সখীভূত প্রয়োগের ঘনফলরূপে উপচিত হইয়াছে শকুন্তলার 'পাবন' চরিত্র! আবার, ওই 'পাবন' শব্দটী! উহা ত এ'স্থলে একটা 'বেয়ারা' কথা—অ-চিত্রকরের কথা! চিত্রকরের ক্ষমতাতীত ও অধিকার-বহির্ভূত কথা! 'পাবনতা' একটা মনোজগতের সংস্কার—মনুষ্যের অধ্যাত্ম-জগতের ধর্ম্ম। চিত্রকর হিমালয়রূপী জড়পদার্থের দেহে কি করিয়া 'পবিত্রতা' অঙ্কিত করিবেন? ইহা পরম কুতূহলজনক—কেন না ইহার মধ্যেই কালিদাসের 'আত্ম সমালোচন'টুকু গুপ্ত আছে; 'শকুন্তলা চরিত্র' বিষয়ে কবি নিজের ধারণাটুকু ওই 'পাবনাঃ' কথার আড়ালেই গুপ্ত রাখিয়াছেন। 'পবিত্র' গৌরীগুরুর পাদমূলে 'পবিত্রচরিত্রা শকুন্তলা'—বাক্যে উহার সঙ্কেত কত সোজা! কিন্তু মনুষ্য ও জড়ের পরিবেষ সম্বন্ধ ও পরস্পর সম্বন্ধের ছায়াপাত ও 'ভূষণ-ভূষ্যভাব' ব্যতীত 'চিত্রে' উহা ত কোনমতেই ব্যঞ্জিত কিংবা সঙ্কেতিত হইতে পারে না! হইলেও সন্তোষকর হয় না। সুতরাং 'পাবন' কথাটি কবির বলাই চাই। না বলিলে, তাঁহার শকুন্তলা চরিত্র প্রকৃত অঙ্কিত হইয়াছে, কিংবা পাঠক উহা সঠিক বুঝিতে পারিবে বলিয়া কবির সন্তোষই হইবে না; হয়ত রাত্রিতে ঘুমই হইবে না! কথাটা এ'স্থানে যতই 'বেদস্তর' হউক।

কালিদাসের হৃদয়ে অধ্যাত্মপ্রকৃতির যে শকুন্তলা পরিমূর্ত্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, বাক্শিল্পী কবি চিত্রের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তাহাই 'বর্ণিকার' পরিস্ফুট করিতে চাহিলেন। তাঁহার অন্তরে বিশেষত্বময়ী যে শকুন্তলা অভিব্যক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তপোবন-পরিবেষে যে শুদ্ধশীলার মূর্ত্তি চিত্রলেখায় যেন প্রত্যক্ষ হইয়াই ফুটিত হইয়াছে, উহার সমাচার জানাইয়া না দিয়া কালিদাসের সোয়াস্তি নাই। লোকে তাঁহার ওই শকুন্তলাকে বুঝিতে পারিবে না—যেন তাঁহার সংশয় হইতেছিল।

তাই, নাট্যকবি আবার চিত্রকরের অধিকার ক্ষেত্রেই প্রবেশ না করিয়া পারেন নাই। পুনশ্চ, এ'ক্ষেত্রেও চিত্রকর কোন্ পরিমাণে শকুন্তলাকে ধারণা করিতে পারেন, কি পর্য্যন্ত তাঁহার ক্ষমতা এবং অধিকারের 'সাধ্য' তাহাও দেখাইয়া দিয়াছেন! কাব্যের দীর্ঘব্যাপক ভাব-অবস্থা-ঘটনা ও ক্রিয়ার বহুমুখী পরিব্যক্তি লক্ষ্য করার সাধ্য ত চিত্রকরের মোটেই নাই! তিনি কেবল মুহূর্ত্তমাত্রকে ধরিয়া, শকুন্তলা তত্বকে মূহুর্ত্ততন্ত্রে সংক্ষিপ্ত করিয়া, উহার আরম্ভ-নিশ্চল অবস্থানটুকু মাত্র ধারণা করিতে পারেন। উহাই চিত্রকরের ক্ষেত্র এবং ক্ষমতার পরিধি। চিত্রকর দুষ্যন্ত কেবল বলিতে পারেন এবং দেখাইতে পারেন—

প্রেয়া মন্মথমীষদীক্ষত ইব, স্মেরা চ বক্তীব মাম্!

এবং কবিও পার্শ্বে দাড়াইয়া কীট্‌সের ভাষায় বলিতে পারেন—

For ever shalt thou love and she be fair!

চিত্রের উহাই 'এক মূহুর্ত্ত'—অচল ও অনন্ত মূহুর্ত্ত!

কালিদাসের এই 'পরিকর' ও 'পরিবেশ' দৃষ্টির সঙ্গে ওয়ার্ডসোয়ার্থের কত সামঞ্জস্য! নিজের 'বনবালা'র মূর্ত্তি ধারণা করিতে গিয়াও ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থ বলিতেছেন (২)—

And these grey Rocks; this household lawn
These trees, a veil just half withdrawn;
This fall of water, that doth make
A murmur near the silent Lake;
This little Bay, a quiet road
That holds in shelter thy abode;
In truth together do ye seem
Like something fashioned in a dream;

(১) কবি কীট্‌সের Foward bending lover of the "Grecian Urn."

(২) ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের To a "Highland Girl."

ইহাই ত নৈসর্গিক পরিবেষ মধ্যে, নিসর্গের 'পরিকর-সমবায়ী' লুসীর মূর্ত্তি! নিসর্গের আত্মাভূতা এবং 'নিসর্গরাণী' লুসীর এই 'স্বরূপ'কে ওয়ার্ডসোয়ার্থও চিত্রকরের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই ত ধারণা করিতে চাহিয়াছেন! এক্ষেত্রে কালিদাস ও ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থ উভয়ের মনোদৃষ্টি ও ধারণারীতির এত সামঞ্জস্য এবং ঐক্য পরিলক্ষিত হইতেছে যে, কেবলই মনে হইতে থাকে—ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থ কি শকুন্তলা পড়িয়াছিলেন? দুইজন সমধর্ম্মা কবির পক্ষে কোন-এক বিষয়ে অতর্কিত ঐক্য ঘটিয়া যাওয়া অবশ্য অসম্ভব নহে। কিন্তু, ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের সঙ্গে কালিদাসের 'সমধর্ম্মতা' অন্য কোন দিকেই প্রবল নহে। কীট্‌সকে বাদ দিলে, অপর কোন ইংরেজ কবির সঙ্গে কালিদাসের রীতি অথবা মনোদৃষ্টির কোন প্রকার সাজাত্যই যেন পরিস্ফুট নহে। আবার, নিসর্গের দিকে ওই 'অদ্বৈত'-বুদ্ধি! ওয়ার্ডসোয়ার্থের ওই অদ্বৈতবুদ্ধি—যাহা খ্রীষ্টান সাহিত্যে তাহার Pantheism বলিয়া বহুনিন্দিত—উহা ত বিলাতের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ 'আগন্তুক' পদার্থ! ইয়োরোপীয় সাহিত্যে, বা ইয়োরোপীয় সভ্যতা ও কর্ষণার মধ্যেই বৈদান্তিক 'পরমাত্ম'বাদের কথা (Monism এর কথা) দূরে থাকুক্ এই Pantheism বা এই 'সর্ব্বেশ্বর-বাদ' (সর্ব্বের-মধ্যে-এক এবং একের-মধ্যে-সর্ব্বতার দৃষ্টি এবং বুদ্ধি) যেন সম্পূর্ণ 'অভ্যাগত' পদার্থ! অদ্বৈতবাদ যে খ্রীষ্টানী ধর্ম্ম ও খ্রীষ্টানী কর্ষণার মধ্যে নানাদিকে 'বিপরীত' পদার্থ তাহা ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ অস্বীকার করিতে পারেন নাই। উহাই ত Mysticism বলিয়া—প্রাচ্য 'ভাবুকতা রোগ' বলিয়া—ইয়োরোপীয় সাহিত্যে যেন 'মিষ্ট কটাক্ষ'লাভ করিয়া আসিতেছে! Mysticism শব্দে একটা নিন্দা আছে; এবং আমাদের অধ্যাত্মবাদই ফলে ওই নিন্দা লাভ করিতেছে। অদ্বৈতবাদী Mysticism যে সম্পূর্ণ ভারতীয় বস্তু, এবং উহা ভারতবর্ষ হইতেই যে পৃথিবী ছাইয়াছে—তাহা বহু ইয়োরোপীয় পণ্ডিত একরূপ সমস্বরে ঘোষণা করিতেছেন। অবশ্য, নিসর্গে প্রীতি এবং নিসর্গপ্রেমের কবিতা—ইহা পূর্ব্ব হইতে কেল্‌টিক জাতির সাহিত্যে ছিল; এবং কেল্‌টিক

৬৪। ইয়োরোপীয় সাহিত্যে ভারতীয় বিশেষতঃ কালিদাসের নিসর্গ কবিতার প্রভাব।

সাহিত্যের প্রভাবেইযে উহা টিউটনিক জাতির ও লাটিন-স্লাভ প্রভৃতি জাতি নিবহের সাহিত্য অভ্যন্তরে গত দুই শতাব্দী মধ্যে—বিশেষতঃ আসিয়ানের কাব্য প্রকাশের পর হইতে—ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহা ইয়োরোপের সাহিত্যপণ্ডিতগণ দেখিতে ভালবাসেন। কিন্তু, নিসর্গের দিকে ওই অদ্বৈতবুদ্ধি—ওই অধ্যাত্ম বা Mystic বুদ্ধি! Comparative Literature গ্রন্থ প্রণেতা পণ্ডিত পস্নেট্ গ্রন্থটীর শেষ ভাগে একটা প্রশ্ন তুলিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছেন। "এই অপরূপ নিসর্গ কবিতা কোথা হইতে আসিল?" প্রশ্নটুকু করিয়াই নিবৃত্ত!

এ' বিষয়ে প্রত্নতত্ত্বোদ্ধারে এবং পণ্ডিতী তর্কযুদ্ধে মাতিয়া যাওয়া আমাদের অধিকার নহে। তবে উক্ত প্রশ্নের সমসূত্রে আরও কয়েকটী প্রশ্নই জুড়িয়া দিতে পারি—ইয়োরোপে শকুন্তলা কখন প্রকাশিত হইয়াছিল? (১) সংস্কৃত সাহিত্যরূপী গুপ্তরত্নের নব অবিষ্কারে এবং উহার মাহাত্ম্যকথায় ইয়োরোপীয় সাহিত্য কখন মুখরিত হইতেছিল? ইয়োরোপের Comparative Philology, Comparative Literature, Comparative Mythology ও Comparative Religion প্রভৃতির অভিনব প্রারম্ভের কখন হইতে সূত্রপাত? হার্ডার ও শ্লেগেল-ভ্রাতৃদ্বয় এবং গ্যেঠে-শীলার প্রভৃতির মুখে কালিদাসের শকুন্তলার ও সংস্কৃত সাহিত্যের অভিনব প্রাণশক্তির আলোচনা কখন হইতে আরম্ভ হইয়াছে? গ্যাঠের ফাউষ্টের 'প্রস্তাবনা' হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বপাত্রে 'শকুন্তলা'র এবং সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের প্রভাব-মুদ্রা কখন হইতে পড়িয়াছে? জর্ম্মনীই ত ইয়োরোপে 'নব রোমান্টিক' সাহিত্যের ও 'অদ্বৈত'ভাবের বা Pantheistic দর্শনের ধাত্রী?—যেই রোমান্টিক ধর্ম্ম, যেই ভাবুকতা এবং যেই

(১) শকুন্তলা নাটকের অনুবাদ ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে স্যর্ উইলিয়ম জোনস্ কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হয়—অর্থাৎ ওয়ার্ডসোয়ার্থের Lyrical Ballads এর ৯ বৎসর পূর্ব্বে।

Idealism বা Pantheism প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতীয় সাহিত্যে ন্যূনপক্ষে দুইটি হাজার বৎসরের পুরাতন জিনিষ! এই জর্ম্মন সাহিত্যের প্রভাবে ইংলণ্ডের কোলরীজ ও ওয়ার্ডসোয়ার্থ (১৭৯৮ সালে প্রকাশিত Lyrical Ballads এর যুগ্ম কবি) যেন সহোদর ভাবেই যে প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণও দুরূহ নহে। ওয়ার্ডসোয়ার্থের 'শকুন্তলা'-পরিচয়ের আন্তরিক এবং বাহ্যিক প্রমাণও হয়ত দুঃসাধ্য নহে। মনুষ্যের সাহিত্যক্ষেত্রে (মনুষ্যজাতির ধর্ম্ম এবং দর্শনের ক্ষেত্রেও) 'রোমান্টিক' তন্ত্রের বা প্রকৃত 'ভাবোত্তমা রীতি'র 'আদি জননী'ই হইতেছেন ভারত ভূমি। সৃষ্টির রহস্য নিরূপণে 'অদ্বৈততত্ত্ব', এবং উহার 'সাধনা'র ভাবের পদ্ধতি দর্শন করিয়াছেন, ধর্ম্মে সাহিত্যে ও সমাজে ভাবুকতার মাহাত্ম্যও সমর্থন করিয়াছেন ভারতভূমি। এই দিকে যথোপযুক্ত রসিক ব্যক্তির, প্রত্ন-অনুসন্ধানী এবং গবেষক ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াই আমরা বিরত হইব।

সাহিত্যের বর্ত্তমান-পর্য্যাপ্ত অভিব্যক্তি এবং সমুদিত আদর্শটাই এ' প্রসঙ্গে আমাদের প্রধান চিন্তনীয়; সাহিত্যের কালক্রমাগত গতি কিংবা জীবনী নহে। কালিদাস এবং ওয়ার্ডসোয়ার্থের উদ্ধৃত দৃষ্টান্তদ্বয় হইতে, আমরা দুইটী বিভিন্নধর্ম্মা কবির পরস্পর সমতা এবং বৈষম্য যেমন জানিতে পারি; তেমন, গীতিকবিতা ও নাট্যকাব্যের পরস্পর ক্ষেত্রগত অধিকার, প্রকাশ পদ্ধতি এবং বিপত্তির স্থলগুলিন ও বুঝিতে পারি; আবার, চিত্রতন্ত্রের সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে উক্ত উভয়রীতির পার্থক্যও ধারণা করিতে পারি। সাহিত্যে কবির 'চিত্রাঙ্কণী প্রতিভা'ও নানা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সংস্কৃতসাহিত্য ভারতীয় প্রাচীন কবিগণের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার জন্যই কবিসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ভাবকে দৃশ্য ও মনোগত 'রূপে' চিত্রাকৃতি দান! উহার নাম কবিকল্পনার 'চিত্রণী' শক্তি—আকারণী শক্তি; উহার অন্যনাম দিতে পারি Word Painting। কালিদাসের মধ্যে এই বিশিষ্টতার পরিপূর্ণ প্রকাশ। তদনুরূপে, কালিদাসের

৬৫। গীতিকবিতা ও নাটক এবং চিত্রের পৃথক্ পৃথক্ ক্ষেত্রগত অধিকার ও প্রকাশের পদ্ধতি।

প্রায় প্রত্যেক কথাই পাঠকের মনে বাক্যশক্তিতে একএকটা 'চিত্র' আঁকিতে চেষ্টা করে এবং ওইরূপ বাক্যচিত্রের সঙ্কেত ব্যঞ্জনা অনুরণনেই ভাবকে অভিব্যক্ত করিয়া পাঠকের স্মৃতিক্ষেত্রে স্থায়ী করিতে চায়। এই বিশিষ্টতা ভারতবর্ষের মাটীরই ধর্ম্ম। উহার 'আদিপ্রকাশ', বলিতে পারি, বৈদিক কবিগণের মধ্যে। সেই হইতে ভারতের দর্শন এবং ধর্ম্মতন্ত্রেও এই 'শিল্পশক্তি' এবং 'স্বাকার'বাদ সমাগত। বেদ হইতেই ব্যাস-বাল্মীকির রামায়ণ-মহাভারত এবং পুরাণাদির মধ্যে এই 'বাক্য-চিত্রণী' প্রতিভা। উহা হইতেই আবার, শূদ্রক ভাস-অশ্বঘোষ এবং কালিদাস ভবভূতি ও অমরুর মধ্যে। দার্শনিকতা এবং গীতিভাবুকতাকে কিরূপে 'আকৃতি' দান করিতে পারা যায়, তাহার প্রমাণ—ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের লুশীর তুলনায়—কালিদাসের ওই শকুন্তলা। দেখিয়া আসিয়াছি, ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের লুশী সাহিত্যক্ষেত্রে কেবল গভীর দার্শনিকতার ঈষারামযী এবং গুণময়ী একটী ভাব-চ্ছায়া। ওয়ার্ড্‌-সোয়ার্থের গুণধর্ম্মিনী লুশীকে অঙ্কিত করা যেমন কোন চিত্রকরের সাধ্য নহে, নাটকে অভিব্যক্ত 'শকুন্তলা'ও তেমনি চিত্রের 'সাধ্যা' নহেন। লুশী কেবল সাহিত্য-শক্তিতে, বাক্যের সারস্বত শক্তিতে, শব্দের লক্ষণা এবং অনুরণনের শক্তিতেই অঙ্কনীয়। শকুন্তলাও কাব্য বা নাটকের ক্রিয়াতন্ত্রেই 'স্ফোটনীয়'। আবার, সঙ্গীত ও চিত্রের অধিকারই বা কতদূর, বিশেষতঃ কোনও চিত্রশিল্পী শকুন্তলাকে কি পরিমাণে এবং কোন্‌ দিকে ধারণা করিতে পারেন, তাহার পথ এবং সীমাও কালিদাস দেখাইয়া গিয়াছেন। চিত্রশিল্পী শকুন্তলার জীবনের বহু অবস্থা ও বহু ঘটনার মধ্য হইতে, পরিব্যাপক এবং নিবিষ্ট দৃষ্টিতে, নিজের নির্ব্বাচণ ও সমীকরণের শক্তিতে কেবল একটীমাত্র মুহূর্ত্তগত অবস্থাকে 'সিম্বোল'রূপে ধরিয়াই উহাকে প্রত্যক্ষ 'রূপ' দান করিবেন। এইদিকে চিত্রকরের নির্ব্বাচণ ও সিম্বোলিজমের শক্তি এবং 'আলোক-ছায়ায়' ভাব-চিত্রণের ক্ষমতাও বা কতদূর যাইতে পারে, চিত্রকর 'স্বাধিকার-প্রমত্ত' না হইয়া শকুন্তলার 'রস'তত্ত্বকে কি পরিমাণে ধারণা করিতে কিংবা 'স্বাকার' করিতে পারেন, তাহাও দুষ্মন্তের মুখেই পরিস্ফুট হইয়াছে। এ'স্থানে চিত্র

এবং কাব্যের বিভিন্নক্ষেত্র ও Medium বা প্রয়োগযন্ত্রের পার্থক্যবিষয়ে কালিদাসের একটা অতুলনীয় কথাই আছে—

"যৎ-যৎ সাধু ন চিত্রে স্যাৎ ক্রিয়তে তত্তদন্যথা।"

কেবল 'হুবহু' ছবি বা ফটোগ্রাফের ব্যাপারটী যেমন কাব্যের, তেমন চিত্রেরও উদ্দেশ্য নহে। আবার, বাক্যে বা কাব্যে যাহা 'সাধু', ক্ষেত্রের পার্থক্যগতিকে চিত্রে তাহাই 'সাধু' না হইতে পারে। সুতরাং, আবশ্যক হইলে, যেমন কাব্যে তেমন চিত্রেও 'প্রকৃতের অন্যথা' করিতে হয়। চিত্রের ক্ষেত্রে এই 'সাধু'তার আদর্শ! ইহা শকুন্তলার ওই 'চিত্র-সম্পূরণ' ব্যাপার অবলম্বনে শিল্পী কালিদাসের একটা পরম Message! ইয়োরোপে প্রথম-প্রকাশিত শকুন্তলা নাটকের 'মুখ্যচিত্র' (frontispiece) পর্য্যালোচনা-হইতেও দেখা যাইবে, শকুন্তলা-তত্ত্বের ধারণা করিতে গিয়া (শকুন্তলা-চরিত্রের মুখ্য লক্ষণগুলি ধারণা পূর্ব্বক চিত্রে উহার তত্ত্বস্বরূপ নিরূপিত করিতেযাইয়া) বিলাতী চিত্রকরওযেন দুষ্যন্তের পরিকল্পনাকেই "তত্র প্রমাণম্" রূপে বরণ করিয়াছেন!

এ'ক্ষেত্রে প্রাধান্যতঃ বুঝিতে হয় কালিদাসের 'কবি-আত্মা'! বলিয়াছি, কীট্‌সের যেমন Pagan বলিয়া অপযশ আছে, কালিদাসের রচনার রূপ-তন্ত্র ও মাধুর্য্যমুখ্যতা হইতে, অসম্যক্‌দর্শীর নিকটে তাঁহারও 'ভোগের কবি' বলিয়া দুর্নাম আছে। অথচ, কোনও শিল্পীর পক্ষে, ইহাই ত পরম গৌরবের স্থান! সাহিত্যে দার্শনিকতা সবিশেষ দুর্লভ নহে। সত্যের বা ভাবের এই 'নিরূপণা'ই পরম মহার্ঘ—সরস্বতীর সুদুর্লভ দয়া-নিদর্শন। কবির শকুন্তলা-কাব্যের 'হৃদয়' চিনিতে না পারিলেই, প্রথম তিন অঙ্ক হইতে, উহাকে 'ভোগবিলাসের কাব্য' বলিয়াই মানুষের ধারণা হইতে পারে; যেমন, 'আনা কারনীন্'এর প্রথম অংশ হইতে, টলষ্টয়কেও একজন 'জঘন্য-রসিক' শিল্পী বলিয়াই ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু, এস্থলেই ত শিল্পী কালিদাসের প্রধান 'আর্ট্' (১)!

(১) কেবল ইহাই নহে, অপর অনেক দিকেও পাঠক কালিদাসের 'হৃদয়' চিনিতে না পারার দৃষ্টান্ত আমরা পাইয়াছি। বাঙ্গালার একজন সাহিত্যশিল্পী—যিনি একজন বড়

কালিদাস যেন আত্মবুদ্ধিতে এবং আত্মপ্রাণে নিজের 'কবি-ব্যক্তিত্ব'কে "শাপেনাস্তংগমিত মহিমা" যক্ষাত্মার সমধর্ম্মা বলিয়াই ধারণা করিতেন ;

'নবেলশিল্পী বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন—তিনিই একদিন বলিতেছিলেন, "কালিদাসের শকুন্তলার বিশেষ কিছু মাহাত্ম্য ত দেখিতে পারিতেছি না ! শকুন্তলা পাঠে অগ্রসর হওয়া আমার পক্ষে অসহ্য। উহা একটা গ্রাম্য বালিকার চরিত্রচিত্র বই নহে—যে কোন গ্রাম্য বালিকা ! বাঙ্গালার অমুক কবিকে কালিদাস অপেক্ষা 'বড় কবি' বলিয়া আমার ধারণা।"

তাঁহার কথাগুলি—উহাদের অকপট এবং নিঃশঙ্ক আঘাত—আমাদিগকে একেবারে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল ! কোন্ জবাব দিব, কোন্‌দিক্ হইতেই বা আরম্ভ করিব—আমাদিগকে একেবারে দিশাহারা করিয়া দিল ! আমরা কেবল বলিলাম—"অমুক কবি ত একজন শক্তিশালী গীতিকবি ও সঙ্গীতকবি। তাহাকে 'শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকবি' বলিলেও বুঝিতে পারি, কোন্ দিক হইতে ওই উক্তিকরা সম্ভবপর। কিন্তু, কালিদাসের মেঘদূত, কুমারসম্ভব, রঘুবংশ ও শকুন্তলা—ইহাদের সজাতীয়, সমানাত্মা এবং সমকক্ষ কোন রচনা তাঁহার আছে কি, যাহাতে তুলনার আমল হইতে পারে ? শকুন্তলা একটী 'গ্রাম্য' বালিকা ! ইহাতে কেবল এই টুকুন বুঝিতেছি যে, আপনি সংস্কৃতের সঙ্গে উহার ভাষারীতি ও প্রকাশরীতির সঙ্গে—বিশেষতঃ কালিদাসী রীতির সঙ্গে প্রকৃত সহানুভূতি অর্জ্জন করিতে পারেন নাই ; কালিদাসে 'দাঁত বসাইতে' পারেন নাই।"

পথে আসিতে আসিতে ভাবিলাম, এ ব্যাপার কিছুমাত্র আশ্চর্য্যজনক নহে। ইনি একজন শিল্পী মাত্র—নিজের একটা বিশেষ দিকে 'আত্মপ্রকাশ' করিয়াই চলিয়াছেন। সংস্কৃতের রীতি, বিশেষতঃ কালিদাসের রীতির সঙ্গে 'সহানুভূতি' উপার্জ্জনের অবসর কিংবা ধৈর্য্যটুকু তাঁহার ঘটে নাই। শিল্পীমাত্রেই ভাল সমালোচক নহেন। তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্যই এ ক্ষেত্রে প্রবল বিরোধীপক্ষ। এরূপ স্থলে, নিজের বিরুদ্ধক্ষেত্রের কোন কবির সঙ্গে আত্মপ্রাণে সহানুভূতির অভাব বুঝিলে, দেখিতে হয় যে (নিজের শ্রেয়ঃকামী কিংবা আত্মপ্রসারে অভিলাষী ব্যক্তিমাত্রের পক্ষে প্রধান কর্ত্তব্য টুকু দাঁড়ায় যে) অন্য কোন শিল্পী, অপর কোন 'বড় কবি' বা 'সমঝদার' সমালোচক উহাকে কি ভাবে দেখিয়াছেন ? অপরের কথাগুলি 'হৃদয় দিয়া' বুঝিতে চেষ্টা করাই প্রথম 'করণীয়' হইয়া পড়ে। 'সমালোচনা' নামক পদার্থটী সাহিত্যজগতে যে কত বড় শক্তি, উহার যে কত উপযোগিতা তাহা এই দিন যেন আমরা ধারণা করিতে পারিলাম ! জীব-জীবনের বা পাঠকজীবনের প্রধান 'পাপ' কি ? সঙ্কীর্ণতা ও একদেশিতা ! সমালোচনাই এ অবস্থায় 'উদ্ধার' করিতে পারে। শকুন্তলা ত

নিজকে যেন ছিন্নপক্ষ 'বিহঙ্গম' বলিয়া, মানবজন্মের অবস্থাবশে হৃতদৈবত-শক্তি দেবযোনি বলিয়াই অনুভব করিতেন। মেঘদূত সে'রূপ দিব্য আত্মারই নিশ্বাস! দেবলোকের স্বপ্ন-সম্বেশময় উচ্ছ্বাস! সেইরূপ একটা অপার্থিব প্রাণের কল কল্লোলময় মন্দাক্রান্তার মর্ত্ত্যলোক-বাহিনী প্রবাহধারা! যে মানুষ নিজকে অধ্যাত্মতঃ 'হৃত-স্বর্গ' বলিয়া ধারণা করিতে পারে—অবশ্য, সকল 'সচেতন' জীবই জীবনের কোন না কোন শুভমুহূর্ত্তে নিজের মহাত্মতা বা 'স্বর্গভ্রষ্টতা'র লুপ্তস্মৃতি অনুভব করে —তাহার পক্ষে আত্মজীবনের অপহৃত 'প্রকৃতি'টাই ওইরূপে সুদূর 'প্রিয়ারূপিণী' এবং 'অলকাবাসিনী' বলিয়াও হৃদয়ঙ্গমা হইতে পারে! মেঘদূত সে'রূপ ব্যক্তির মনেপ্রাণে পরমহৃদ্য অমৃতসঙ্কেত রূপেই স্বপ্রকাশী হইবে। কাব্যটার 'সিম্বোল' বা প্রতীকের এত বড় শক্তি! নিজের প্রেমময়ী, প্রাণময়ী এবং 'বিদ্যা'রূপিণীর দিকে একটা নিত্যনিশ্বাস। আত্মার জড়াতিশায়ী একটা নিত্যবুদ্ধির ভূমিতে 'অলোকা'র বিরহানন্দী এবং আবেগচ্ছন্দী এই যে উচ্ছ্বাস, উহাই মেঘদূতের বিরহাশ্রিত

একটা 'গ্রাম্যবালিকা' নহে! কোন গ্রামিকা বা নাগরিকার Verisimilitude কিংবা তাহার জীবনের 'হুবহু ছবি' অঙ্কিত করাও ত কালিদাসের লক্ষ্য নহে! আধুনিক নবেলের Realism বলিয়া কোন প্রণালীর পৃষ্ঠপোষক ত কালিদাস নহেন! শকুন্তলা কাব্যের 'আত্মভূত' রস, বলিতে পারি, 'অসাধারণ'। চরিত্রটাও একটী অনন্যসাধারণ 'প্রেমযোগিণী'র চরিত্র। ঋষির তপোবনে শিক্ষাপ্রাপ্ত, জন্মসূত্রে দেবযোনি, অথচ মানবদেহী এবং'মানবপ্রাণী' এই চরিত্র! জগতের অন্য কোন দেশে, কি অপর কোন সাহিত্যে যাহার তুলনা বা 'জুড়ি' নাই। যে দিকে উহা কেবল ভারতীয় কর্ষণারই ফল। উহাইত গ্যাঠের সমালোচনাটার মর্ম্ম। শকুন্তলার 'প্রাণার্থ' ধরিতে না পারিলেই, কালিদাসের প্রতি অবিচার। দুষ্যন্ত প্রথমতঃ যে ভুল করিয়াছিলেন, অধিকাংশ পাঠকেও তাহাই করেন। শকুন্তলা কাব্যটার বুকে 'কাণ পাতিতে' না জানিলেই 'অবিচার'। এ ক্ষেত্রে সর্ব্ব-প্রাধান্যতঃ বুঝিতে হইবে, 'ভারতীয় কর্ষণা' এবং ভারতীয় কবির 'হৃদয়'ও তাঁহার 'কাব্যের হৃদয়'! কাব্যের বুকে 'সমাহিতে' কাণপাতিয়াই ত "কবির হৃদয়" বুঝিতে হয়!—'কাব্যটার 'আত্মা' কোন্ ভাবে পরিস্পন্দিত হইতেছে?'

আদিরসের প্রধান শক্তি। এস্থলেই কাব্যটীর স্থায়ীভাবের মহত্তমা অভিব্যক্তি! কালিদাসের প্রকাশরীতিটাও মেঘদূতেই সুপ্রকট! এই রীতি যেমন কেবল আত্মদর্শনী (Subjective) বা 'আত্মবিজ্ঞাপনী' নহে, তেমন 'গায়নী'ও নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে, উহার নাম দিতে পারি—উপস্থাপনী। যেমন মেঘদূতের দুইটি শ্লোকে—

অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিংস্বিদিত্যুন্মুখীভিঃ।
দৃষ্টোৎসাহ শ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ॥ ইত্যাদি

অথবা—

ত্বয্যাদাতুং জলমবনতে শার্ঙ্গিণো বর্ণচৌরে
তস্যাঃ সিন্ধোঃ পৃথুমপি তনুং দূরভাবাৎ প্রবাহম।
প্রেক্ষিষ্যন্তে গগনগতয়ো নূনমাবর্জ্জ্য দৃষ্টী
রেকং মুক্তাগুণমিব ভুবঃ স্থূলমধ্যেন্দ্রনীলম্॥

এ সকল শ্লোকের মধ্যে, ইংরেজী সাহিত্যের Pre-Raphaelite শিল্পীগণের মত, "Word Painter" গণের মত, কীট্‌স ও কোলরীজকে যাঁহাদের "পূর্ব্বগুরু" বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় সেই 'বাক্য'শিল্পী-দের মতই, যেন কালিদাসের একটা ভাব-উপস্থাপনী এবং 'চিত্রণী' রীতি! আবার, লক্ষ্য করিতে হয় যে, প্রায় প্রত্যেক দৃশ্য-উপস্থাপনার মধ্যেই যেন পাঁচটী করিয়া দর্শক! প্রথম কল্পে, মেঘ স্বয়ং; তারপর, যক্ষঃ; তাহার পর, গ্রাম্যবধূ, সিদ্ধাঙ্গনা বা 'গগনগামি'গণ; উহার পর, আবার, পাঠকের উপস্থিতিটাও যে কবির মনে নাই, তাহা নহে! সকলের উত্তরে, স্বয়ং 'দ্রষ্টা' কালিদাস। আপনার সৌন্দর্য্যবুদ্ধি এবং হৃদয়ের মাধুর্য্যসাগরে পরিস্নাত করিয়া, একটা পরম 'ব্যক্তিত্ব'বর্ণে ও দৃষ্টিবর্ণে রঞ্জিত এবং ভাব-স্বর্ণে অলংকৃত করিয়াই যেন কবি বিশ্বপ্রকৃতিকে এবং সঙ্গেসঙ্গে নিজের 'ভাবতন্ময়' মহাপ্রাণকে উপস্থিত করিতেছেন! মেঘদূতের প্রকাশরীতি যেন একাধারে Lyric ও Dramatic। বলিতে পারি, এই কাব্য রীতির ক্ষেত্রে একটা Epic Lyric. কীট্‌স্-কালিদাসের মধ্যে নানা স্থানে, জগতের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ সৌন্দর্য্যের

এমনই ঘননিবিষ্ট সম্ভোগতন্ত্র আছে, এবং উহার এমনই স্বরূপ-নিষ্ঠ এবং ঘননিবিঢ় প্রকাশ আছে! উভয়ের প্রকাশতন্ত্রেও এমনই একটা 'বিষয়বতী প্রবৃত্তি' আছে; পাঠকের মনকে মূর্ত্তিনিষ্ঠ এবং ভাব-স্থির করিবার জন্য একটা 'বিষয়া' শক্তি আছে! এ ক্ষেত্রে শেলীর 'রীতি' তুলনা করুন। প্রাধান্যতঃ গীতিতন্ত্রী—জগতের একজন শ্রেষ্ঠ গীতিকবি—শেলী নিজের ভাবুকতা-স্বপ্নে এতদূর আবিষ্ট এবং আত্মহারা হইয়া পড়েন যে, ভাবুকতার প্রাবল্যধর্ম্মেই নিজের Imaginative Reason কে—কবিত্বের 'রসায়ন' যন্ত্রকে—নিজের 'কবি-আত্মা'কেই যেন হারাইয়া বসেন! আত্মহারা এবং দিশাহারা হইয়া পড়েন! কীট্‌স-কালিদাস ভাবকে সে ক্ষেত্রে একেবারে 'মাত্রা-স্পর্শেই' যেন আকারিত করিতে চেষ্টা করেন! উভয় রীতির প্রয়োগধর্ম্ম এবং সবিশেষ ফলটিও বুঝিতে হয়। শেলীও একটী আকাশবিহারী অথচ অসাধারণ প্রমূর্ত্তি-দক্ষ 'কবি-আত্মা'। কিন্তু, শেলীর আত্মাকে কালিদাসের ভাষাতেই বিশেষিত করিয়া বলিতে পারি যে, উহা

"পশ্চোদগ্রপ্লুতত্বাৎ বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্ব্যাং প্রযাতি"!

ভাবের পথে মৃগবৎ উল্লম্ফনধর্ম্মে, উড্ডীনতার আধিক্যে বহুলাংশেই শেলীর 'বিমানী' গতি এবং বিমানী স্থিতি! মেঘদূতের আত্মা বা কবি কালিদাসের 'যক্ষ'-আত্মাও ভাবুকতার উড্ডয়নী এবং বায়বী শক্তিতে নানা-প্রকারে শেলীর সহোদর! কিন্তু, উহার প্রকাশরীতি, যেমন বলিয়াছি, "উভয় লোকানুগ্রহ-শ্লাঘনীয়"। ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের ভাষায় বলিতে পারি, উহা—

True to the Kindred Point of Heaven and Home.

বিবরণী কবিতার (Narrtive বা Epic), গীতি কবিতা ও নাট্য-কাব্যের এবং চিত্রের এ'রূপই পৃথক্ পৃথক্ প্রকাশরীতি বা 'আকৃতি'-সৃষ্টির রীতি। কাব্যের দুইটি মাত্র কারণ—'নিমিত্ত' ও 'উপাদন'—বা আত্মা ও আকৃতি হইতেছে রস ও বাক্য। অতএব, কাব্য বলিতে বুঝাইতেছে রসস্বরূপ আত্মা-যুক্ত বাক্য; এবং 'বাক্য' বলিতে, শব্দ

৬৬। কাব্যের প্রকাশে কবিত্বের প্রধান শক্তিটার নাম—রীতি।

ছন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া গুণ এবং অলঙ্কার জনিত সর্ব্বপ্রকার 'পদার্থ' বা ঘনফলিত 'আকৃতি'ই ত আসিয়া পড়িতেছে! অতএব 'আকৃতি' ঘটনের প্রণালী এবং ব্যাপারকেই সংক্ষিপ্ত নাম দিতে পারা যায়—রীতি। এতদ্দেশের প্রাচীন সাহিত্যদার্শনিক সুতরাং 'রীতি'র উক্ত শক্তি এবং মহার্থতার উপরেই 'জোর দিয়া,' অধিকন্তু (কাব্যের প্রকাশের দিক হইতে) ওই আকৃতি-ঘটনা এবং প্রয়োগতন্ত্রে দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়াই বলিয়াছিলেন—"কাব্যস্য আত্মা রীতিঃ"। এই 'রীতি' সুতরাং কবির একটা 'ব্যক্তিগত সাধনা'র ফল ও ব্যক্তিত্ব-গত সিদ্ধি। সাহিত্যের প্রধান শক্তি ও মাহাত্ম্য যেই 'ভাবুকতা', উহা প্রকাশের ক্ষেত্রে 'অনন্যসাধারণ' হইতে হইলে, অনন্যসাধারণ কবি-ব্যক্তিত্বের উপরেই সুতরাং নির্ভর করে। মনে এবং জীবনে অনন্যসাধারণ 'ব্যক্তিত্ব' ব্যতীত কবির পক্ষে কদাপি এই অসাধারণ 'রীতি'সিদ্ধি বা কবিত্বসিদ্ধি হয় না। সাহিত্যে সকল ভাবসমৃদ্ধির মেরুদণ্ডটুকুই কবির ব্যক্তিত্ব-গত—অতএব, ফলে তাহার 'রীতি'-গত। আমাদের ঘরের দিকে দৃষ্টি করিলেও দেখিব, বিদেশের সাহিত্য ছাড়িয়া বঙ্গসাহিত্যের অভ্যন্তরে দৃষ্টি করিলেও বুঝিব, এ'দেশে যাঁহাদের 'বড় কবি' বলিয়া খ্যাতি জন্মিয়াছে (মধুসূদন, হেম, নবীন, রবীন্দ্রনাথ) তাঁহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই এক একটা 'অসাধারণ' প্রকাশের স্বাতন্ত্র্য বা 'রীতি' আছে এবং এইরূপ 'অসামান্য'তার তৌলিক মূল্য হিসাবেই বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাদের মূল্য। সবিশেষ রবীন্দ্রনাথের! রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যজগতেই একজন অনন্যসাধারণ রীতিশালী ও ব্যক্তিত্বশালী কবি। তাঁহার অনেক 'ভাব' কিংবা 'বস্তু' হয়ত স্বদেশীবিদেশী পূর্ব্বকবিগণের মধ্যে মিলিবে; উহাদের অন্তস্তত্ত্বে কেবল 'রহস্য'বাদের প্রাবল্যও হয়ত অনুভূত হইবে; তাঁহার মধ্যে ভারতীয় অধ্যাত্মতা অপেক্ষা বরং ইয়োরোপীয় 'মীষ্টিক্' লক্ষণই হয়ত মুখর প্রতীত হইবে; কিন্তু এ সমস্ত স্বত্বেও, তিনি ওই সকল ভাবকে 'নিজস্ব' করিয়া, নিজস্ব রীতি-'জ্ঞানিত' যেই অসাধারণ 'গীতি-প্রকাশ' দিয়াছেন, উহাতেই তাঁহাকে পরমগৌরবে 'বিশিষ্ট' করিতেছে! নিজের কিংবা পরের অনেক 'পুরাণ কথা'ও তিনি নূতন-নূতন 'রীতি'তে

বলিতেছেন! বিশ্বসাহিত্যে এই একটি শ্রেষ্ঠশ্রেণীর 'রীতি-প্রতিভা'! পাঠকের রুচিভেদে এই 'রীতির' এমনই মূল্য এবং মাহাত্ম্য দাঁড়াইয়া যাইতে পারে যে, উহাতেই 'ভোলা' হইয়া পাঠক স্বকীয় রুচির 'প্রিয় কবি'কে 'জগতের শ্রেষ্ঠকবি'রূপেই ঘোষণা করিতে পারেন। শেলী, কীট্‌স, ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থ, ব্রাউনীং ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রত্যেকেই স্ব-স্ব ভক্ত কিংবা আবিষ্ট পাঠকের রসনায় যে 'জগতের শ্রেষ্ঠ কবি' রূপেই বিঘোষিত হইয়াছেন, উহাতেও সাধারণ পাঠকের রীতি-পক্ষপাত এবং রীতির মাহাত্ম্যই প্রমাণিত করে।

৬৭। কবিপ্রতিভার মহানুভবতা এবং অনন্য-সাধারণ ব্যক্তিত্বসিদ্ধি।

যাঁহারা সাহিত্যের অভিনিবিষ্ট পাঠক তাঁহারা জানেন, সাহিত্যে কোন নূতন ভাবুকতা-পদ্ধতির আবিষ্কার, ভাষার কোন অপূর্ব্ব 'ভাবায়ণী' রীতির অথবা ভাবের কোন অপূর্ব্ব 'রসায়ণী' পদ্ধতির দর্শন, কত দুর্ল্লভ, দুঃসাধ্য এবং সাধারণতঃ অসম্ভব ব্যাপার! একেত নিজের অন্তরাত্মার শ্রেষ্ঠ ভাবকে উহার শ্রেষ্ঠচ্ছন্দে অপর মনুষ্যের ধারণাগম্য ও অনবদ্য ভাষায় 'আকৃতি'-দান, উহা কতবড় 'কবি প্রতিভা'-সাধ্য এবং দুর্ল্লভ সামগ্রী! তাহাতে আবার, কোন্ ভাবের জন্য কোন 'রীতি' যোগ্য হইবে, কোন্ ছন্দই বা নিপুণ হইবে, তাহার কোন 'বাঁধা ধরা' গৎ নাই। নিয়ম হইতে পারে না বলিয়াই উহা কেবল কবির 'আত্মাগম'-সাধ্য ব্যাপার; উহা কেবল কবি-প্রতিভার "ফলেন পরিচীয়তে"। এ জন্যই সাহিত্য-জগতে—মানবজগতেই—কবি-প্রতিভার এত সমাদর। এ জন্য কবির একটী 'সিদ্ধ' কথার মূল্য দেওয়া মনুষ্যের সাধ্যাতীত। উহা অতুল্য ও অমূল্য। ভাবের দর্শন এবং ভাবের কবিত্বসুন্দর 'প্রতীক'লাভ—ইহা সকলের বা সকল 'কবি'র ভাগ্যেও ঘটে না। মহাভাবের আবেশ ঘটিলেও যথাযুক্ত 'প্রতীক' জোটে না। আবার, কাহারও বা প্রতীক জুটিলেও, উহার সদ্ব্যবহার করার শক্তি সুযোগ হয় না; ভাষায়, অলঙ্কারে এবং ছন্দে, শব্দের লক্ষণায় ব্যঞ্জনায় অনুরণনে, অনুরূপ প্রমূর্ত্তি এবং চারিত্র্যঘটনায় উহাকে সরস্বতীর মন্দিরে 'প্রতিষ্ঠা' দান করার সৌভাগ্যও

ঘটে না। এ জন্যই, কবি 'অনেক'; কিন্তু, সুকবি 'কোটীকে গুটিক'—সু-দুর্লভ। এ জন্যই বলা হয়, শ্রেষ্ঠকাব্যের 'সিদ্ধি' একটা দেবদত্ত—দৈবদত্ত পদার্থ। আবার, এ জন্যই কবি ঐন্দ্রজালিক। শ্রেষ্ঠকাব্য কার্য্য-কারণ বিজ্ঞানের অচিন্ত্য-সুন্দর 'ম্যাজিক'! 'যথা যোগ্যতা'র এরূপ ম্যাজিক-সিদ্ধির মাহাত্ম্য বা ভিত্তি কি? উহার প্রকৃতি বা পরিব্যক্তি কি? এই আগমলব্ধ এবং অগম্য-সুন্দর পরিব্যক্তির স্বরূপকেই কীট্‌সের ভাষায় উপলক্ষিত করিতে পারি—

Magic Casements opening on the foam
Of perilous seas, in Fairylands forlorn!

তথাপি, বলিতে হয় যে, প্রকৃত 'কবির মাহাত্ম্য' এবং বৈশিষ্ট্যসাধনার অবকাশ সাহিত্যজগতে চিরকাল আছে এবং থাকিবে। কবি আলাওল দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—

কাব্যরত্ন যতেক লুঠিল অগ্রগামী;
পৃষ্ঠগামী হৈয়া তার কি করিব আমি?

ইহা, অবশ্য, কবির বিনয়; এবং কথাটিকে যুগপৎ 'সত্য' এবং 'অপ্রকৃত'ও বলিতে পারি! মানুষের 'শিক্ষা' নামক ব্যাপার ফলে দাঁড়াইয়াছে কেবল পূর্ব্ব-বর্ত্তিগণের অনুকরণ ও অনুসরণ। অথচ, এ'রূপ 'শিক্ষা' ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। এই কারণে মনুষ্যসমাজে প্রকৃত 'মৌলিকতা'র সংঘটনা বিরল হইয়াছে, সত্য; কিন্তু, উহা সত্বেও, আমাদের 'কর্ষণা' যুগেই "নবনব উন্মেষ-শালিনী প্রতিভা"র বিকাশ পক্ষে ত কোন বাধা নাই। আত্মনিষ্ঠ এবং আত্ম-ভাস্কর কবি-প্রতিভারও অভাব নাই। মনুষ্যের এই ত দশাঙ্গুল-প্রমাণ মুখ-দেশ! তথাপি, এটুকুন পরিসরের মধ্যেই বিশ্বকবির কত নবনব আকৃতিঘটনার অবকাশ! কোনও বৃহৎ জন-প্রবাহের তীরে দাঁড়াইয়া সঞ্চরমান মনুষ্যগুলির মুখশ্রী লক্ষ্য করিলেই দেখিবে, কেবল দুইটী মাত্র চক্ষুবিন্দু লইয়াই কত অভাবনীয় আকৃতি ও প্রকৃতির বিকাশে 'পুরাণকবি' লীলা করিতেছেন! স্বল্পপরিসর দেশে, একই আলোকজল-বাতাসে বিভিন্ন উদ্ভিদের বীজপদার্থ কি অপরূপ বৈচিত্র্যলীলা দেখাইতেছে! প্রত্যেকেই ত

নিজ-নিজ স্বতন্ত্র রস, সারবত্তা এবং পত্র পুষ্পফলের বিশিষ্টতায় অগাণত ব্যক্তিত্বে এবং মাহাত্ম্যে দাঁড়াইয়া যাইতেছে! সে' রূপ, কবি-মাহাত্ম্যের প্রধান রহস্যই হইতেছে কবির অনন্যসাধারণ 'বীজাত্মা'। যিনি প্রকৃত ভাবুকতা ও ভাব-প্রাণতার বীজশক্তি লাভ করিয়াছেন, তিনি যদি নিজের অধ্যাত্মজীবনে স্বাতন্ত্র্যশীল এবং ব্যক্তিত্বশালী হইতে পারেন, জগৎকে নিজের চোখ দিয়া দেখিতে, ও নিজের হৃদয় দিয়া বুঝিতে এবং নিজের ভাষায় নিজের মুখে প্রাণমর্ম্ম প্রকাশ করিতে জানেন, তা'হইলেই তাঁহার নিজের 'ব্যক্তিত্ব'টী জগতে দাঁড়াইয়া যায়—জনতার মধ্যে অসাধারণ ভাবেই দাঁড়াইয়া যায়! তিনিই সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামিয়া কথার-মতন-কথা—মনুষ্যের শুনিবার-মতন-কথা—কহিতে পারেন। নিজের আত্মার বিশেষত্ব হইতেই তাঁহার কাব্যের 'আত্মা'; নিজের জীবনী-রীতির বৈশিষ্ট্য হইতেই তাঁহার 'ভাষার রীতি'! ফলতঃ, তাঁহার আত্ম-ব্যক্তিত্বের যোগ্যতা এবং আকর্ষণী হইতেই কাব্যের যোগ্যতা এবং আকর্ষণী! নিজের 'প্রাণের' মহানুভবতা হইতেই তাঁহার কাব্যে মহানুভবতা অনুস্যূত হইতে পারে; এবং এই 'কর্ষণা যুগে'ও স্রোতের মধ্যে, কোটি-কোটির মধ্যে তিনি 'গুটিক' সংখ্যার 'একটি' হইয়া দাঁড়াইতে পারেন।

৬৭। আদিম জৈব সঙ্গীতের অস্ফুট বা অর্থহীন 'বস্তু, হইতে সাহিত্যের 'আকৃতি' এবং রসতত্ত্বের উদ্বর্ত্তন ও অভিব্যক্তি।

সাহিত্যের ইতিহাসে, একএকটি ভাবকে (কোন মহতী কবি-দৃষ্টিতে আবিষ্কৃত কিংবা ঈষারায় পরিদৃষ্ট হইয়াও) অব্যক্ত অবস্থাতেই দীর্ঘকাল মনুষ্যমনের অব্যাকৃত রাজ্যে কেবল সঙ্গীতের আভাস-ইঙ্গিত এবং সুরতালের ঈষারায় অথবা অর্থহীন ভঙ্গীতেই ঘুরিতে দেখা যাইবে; প্রকৃত সাহিত্যিক মূর্ত্তিতে 'অধৃত' এবং অস্ফুট অবস্থাতেই (নিরাকার অবস্থাতেই) দীর্ঘকাল অস্পষ্ট-বাণী এবং ধ্বনির রাজ্যে অনেক ভাবকে ঘুরিতে দেখা যাইবে। সঙ্গীতের অস্ফুট ধ্বনিতন্ত্র এবং বীণাতন্ত্রের ক্ষেত্র হইতে প্রকৃত সারস্বতরাজ্যে ও পুস্তকরাজ্যে অবতীর্ণ হইয়া স্থায়ীভাবে সুধৃত এবং সুস্থিত হইতে সময়-সময় এক-একটা ভাবকেযে হাজার-হাজার বৎসর লাগিয়াছে, তাহাই লক্ষ্য করিব। বহুকাল

পরেই, হয়ত, কোনও সৌভাগ্যবান্ কবি সমুচিত 'কাব্য'মূর্ত্তিতে, অথবা "মূর্ত্তরসের স্ফূর্ত্তি"রূপে উহাকেই অবতারিত এবং আকারিত করিয়া 'ধন্য' হইয়া গিয়াছেন! রামায়ণের "বজ্রাদপি কঠোর এবং কুসুমাদপি মৃদুতা"র আদর্শ, উহার 'সত্যসন্ধ' ভাবাত্মা, উহার মহোদার 'রসাত্মা' উহার 'ধর্ম্মাত্মা' কতকাল ওইরূপে ভারতের চিত্ত ক্ষেত্রে ঘুরিয়াছে! রামচরিত্র 'কুশীলব' গণের এবং বীণাতন্ত্রী-বাদকগণের ক্ষুদ্রক্ষুদ্র মুষ্টিতে, অস্পষ্ট-অসমাহিত ও সঙ্কীর্ণ ধারণা রাজ্যে, কতকাল যে প্রাচীনভারতের হৃদয়ে ঘুরিয়াছে, তাহা কে বলিবে? নারদগণের বীণাতন্ত্রে, অস্পষ্ট ও খণ্ডবাণীর গীতি-ধর্ম্মে কেবল 'ভাবের আভাস' রূপেই ঘুরিয়াছে! মানুষের সমাজ ও ধর্ম্মের আদর্শ ক্ষেত্রে, তাহার পিতৃভক্তি, দাম্পত্যপ্রেম, সৌভ্রাত্র, বন্ধুপ্রেম, প্রেমের সেবা এবং দাস্যবুদ্ধি, পরার্থপরতা, আত্মদান ও আত্মত্যাগের স্বাভাবিকী নিষ্ঠা, মানব-হৃদয়ের অমৃত-তৃষ্ণা এবং মানবজীবনের অমৃত প্রতিষ্ঠা কেবল অব্যাকৃত ও বাক্যবিহীন 'সুর'তন্ত্রে অথবা গীতিকবিতা-তন্ত্রের ভাবুকতায়, ভাবজীবী মনুষ্য ও গায়ক মাত্রের কণ্ঠেকণ্ঠে 'অমূর্ত্ত' অবস্থায় কতকাল ঘুরিয়াছে—দেশে দেশে এখনও ঘুরিতেছে সৌভাগ্যক্রমেই এক একটি বাল্মীকি-সঙ্গম। প্রাচীন কালের 'রত্নাকর' বাল্মীকিও প্রাচীন ভারতের অপিচ সাহিত্যজগতের একজন 'সৌভাগ্যবান্' কবি; অধিকন্তু, আত্মসৌভাগ্যের সর্ব্ব-সুফল সার্থক-ভাবেই চয়ন করিতে পারিয়াছিলেন। মানুষের আত্মা ত চিরকাল বলিয়াছে "সত্যংপরং ধীমহি"; বাল্মীকি আসিয়াই 'সত্য সন্ধ'তাকে মনুষ্যের জ্ঞান-ভাব এবং ইচ্ছা-লোকে একটি সর্ব্বজনের স্থিরগম্য 'রসমূর্ত্তি' রূপে, এবং স্থায়ীভাবের 'অশ্মসারময়' ভাস্কর্য্যমূর্ত্তিতে বিধারিত এবং আকারিত করিয়া 'ধন্য' হইয়া গিয়াছেন। প্রাচীন 'গ্রাথক' (Rhapsodist) গণের সঙ্গীতুতন্ত্রই বাল্মীকিকে পাইয়া তাঁহার গঠনী ও নিরূপণী শক্তিতে, রামায়ণের ঘনবিপুল এবং রসাল আকৃতি-প্রকৃতিতে 'স্বাকার' হইয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছিল।

এইরূপে রামায়ণে, সমুচিত শিল্পীর হস্তে পড়িয়া ভারতীয় আর্য্যজাতির অন্তরঙ্গের বিশিষ্ট স্বরূপটীই প্রমূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। উহাতে একটি মহা

জাতির অন্তরতম জীবনের মূলধর্ম্ম, উহার বস্তুগত ও ভাবগত কর্ষণার মূলপ্রকৃতি, উহার ইহ পরকালের আশা এবং উদ্দীপনার অধ্যাত্মমূর্ত্তিটাই স্ফুট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার, বহিঃপ্রকৃতিকে একটী স্বতন্ত্র'ব্যক্তি' বলিয়া একটা ভাব (কিংবা ভাবুকতা) এবং মানুষের সহিত উহার একটা সামাজিকতা ও সখ্যের ধারণা এতদ্দেশে বহুপূর্ব্ব হইতেই অভিব্যক্ত হইয়াছিল। ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম প্রাণোচ্ছ্বাস ঋক্‌বেদের 'অরণ্যানী' সূক্ত এবং 'উষা সূক্ত'গুলির মধ্যেই সর্ব্বপ্রথম (?) উহা আভাসিত হইয়াছিল। নিসর্গের নিস্তব্ধতার সাহচর্য্য ও শিক্ষা ব্যতীত এতদ্দেশে মনুষ্যচরিত্রের শিক্ষা বা 'কর্ষণা' নামক ব্যাপারটী যেন 'সুসম্পূর্ণ' বলিয়াই গণ্য হয় না। তাই, ব্যাসবাল্মীকির 'বনপর্ব্ব' ও 'অরণ্যকাণ্ডের' মধ্যে, বিশেষতঃ বাল্মীকির মধ্যে এই 'নিসর্গ' পরম ভাব-মহিমান্বিত আকারেই পরিব্যক্তি লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। বাল্মীকির 'ভাবপুত্র' কালিদাসই পরিশেষে অভিজ্ঞান শকুন্তলের চতুর্থ অঙ্কে নিসর্গকে পূর্ণ-সচেতন নাটকীয় 'ব্যক্তি'ত্বের পরিস্ফুট প্রমূর্ত্তি প্রদান করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন।

সাহিত্যজগতে ভাবের এই 'পুত্তল', এই আকৃতি! এই রসময়ী পরিব্যক্তি! এই 'আকৃতি'টাই সাহিত্য-সরস্বতীর প্রধান শক্তি। উহাকে একেবারে তাচ্ছিল্য করিয়া কোনও 'সাহিত্য' দাঁড়াইতে পারে না। উহাকে সময় সময় গৌণ করিয়া 'সঙ্গীত-সরস্বতী' দাঁড়াইতে পারেন, সত্য; কিন্তু, উহা সাহিত্যের কোটি হইতে সঙ্গীতের 'অনর্থ ভূমি'তে, Chaotie বা অব্যাকৃত 'রেখারীতি'র ক্ষেত্রে অথবা 'চিত্রের ভূমি'তেই অতিবর্ত্তন। আবার, মনের ভূমি ছাড়াইয়া স্নায়ুর ভূমিতেও অতিবর্ত্তন। সাহিত্যের 'অনধিকার প্রবেশ'! শব্দের সঙ্কেতজনিত মানসমূর্ত্তির নামই সাহিত্যে 'অর্থ'। এই মানসমূর্ত্তি যতই পরিস্ফুট ভাবে এবং 'অর্থ'সঙ্গত ভাবে সমঙ্কিত অথবা সঙ্কেতিত হইতে পারে, ততই সাহিত্যের শক্তি এবং মাহাত্ম্য; ততই উহা 'স্থায়ীভাবে' স্থিরীকৃত 'স্থায়ী সাহিত্য'। এই আকৃতি বা প্রমূর্ত্তির আদর্শ ছাড়িলে বা উহা হইতে বিচ্যুত হইলেই

৬৯। সাহিত্যের স্বরূপে প্রতিষ্ঠা।

সাহিত্যে তাহার নাম হয় 'অনর্থতা'। এইরূপে, অর্থবিহীন আত্ম ভাবুকতা (Subjectivity) ভাববাদিতা ভাবাকুলতা বা ভাবসঙ্কেত, বুদ্ধিজীবিতা মনস্তত্ত্ব-রসিকতা বোধি-বাদ অথবা বোধি-সঙ্কেত, নিরাকার 'বস্তু'বাদ, নিরাকার 'তত্ত্ব'বাদ অথবা নিরাকার ঈষারা সঙ্কেত, অর্থের গোপনী রীতি কিম্বা Mystification, অস্পষ্ট 'অর্থ'বাদ বা অনর্থের দ্বারাই মহার্থের সঙ্কেত রীতি অথবা অরূপের দ্বারাই অপরূপের ঈষাড়াপদ্ধতি, সমস্তই সাহিত্য-শিল্পের হিসাবে ন্যূনাধিক মেরুদণ্ডবিহীন কায়োন্নতি এবং 'ভাবোন্মত্ততা'র প্রক্রিয়া। রূপনিষ্ঠ সঙ্কেতনী শক্তির উপরেই শিল্পের মাহাত্ম্য। 'স্থায়ী সাহিত্য' মনুষ্যের মনঃক্ষেত্রে 'অরূপ'কে মনোরূপের দ্বারা সঙ্কেতিত অথবা আকারিত করিয়া, পদার্থকে স্থায়ীভাবের 'সৎ-চিৎ-আনন্দ'ঘন-রূপা প্রমূর্ত্তিতে স্থির করিয়াই অমৃতত্ব লাভ করিতেছে।

সাহিত্যের প্রকৃতি।

বস্তু সংক্ষেপ

(ক)

'সাহিত্য-ব্যক্তি'র আকৃতি ও প্রকৃতি—'ভাব' কর্ত্তৃক 'রূপ' এবং 'ব্যক্তিত্ব' লাভ—ব্যক্তিত্বে অবয়ব এবং অবয়বীর সম্বন্ধ—ব্যক্তিত্বে অসামঞ্জস্য—আকৃতি ও প্রকৃতির সামঞ্জস্যে 'শিল্পের 'স্বরূপ'—শিল্প-প্রকৃতির মাহাত্ম্য বিষয়ে রামায়ণ রচনার দৃষ্টান্ত—শিল্পের মূল ভাবানুযায়ী যে 'প্রকৃতি' উহা শিল্পীর আত্মপ্রকৃতির ঔরসজাতা—'কালীদাসীয় কাব্য'সমূহের দৃষ্টান্ত—শিল্প-'প্রকৃতি'র সাধারণ দিক্-নির্ণয়—আধুনিক কালে মনোবিজ্ঞানের আলোচনা-ফলে সুপরিস্ফুট শিল্পের 'সচ্চিদানন্দ' বা সত্য-শিব-সুন্দর-'প্রকৃতি'—সৎ-চিৎ আনন্দের সামঞ্জস্য ব্যতীত শ্রেষ্ঠ শিল্পের 'ব্যক্তিত্ব'আদর্শ দাঁড়াইতে পারে না।

খ)

একান্তভাবে 'সত্য'ই সাহিত্যের আদর্শ নহে—সত্যের 'বিশ্লেষণ' 'দর্পণ' অথবা 'সংস্কার' প্রভৃতি আধুনিক আদর্শের দোষ—'দার্শনিকতা' 'প্রকৃত'বাদ বা 'প্রাকৃত'বাদ প্রভৃতি আধুনিক আদর্শের দোষ।

গ)

একান্তভাবে 'সৌন্দর্য্য'ও সাহিত্যের আদর্শ নহে—সৌন্দর্য্যবাদের ক্ষেত্রে চরম পণ্ডিতা—'সাহিত্য বিবেক'—ওই বিবেকেই কবিগণের বিচার—"স্বয়ং প্রয়োজন সৌন্দর্য্য" প্রভৃতি আদর্শে ফরাসী সাহিত্যসেবিগণের ভ্রম—সৌন্দর্য্য তন্ত্রে 'সেণ্টিমেণ্টাল' আদর্শ—সৌন্দর্য্যতন্ত্রে ভারতবর্ষীয় 'অধ্যাত্ম আদর্শ'—'সত্য'ও 'সৌন্দর্য্যের' ক্ষেত্রে জাতিভেদ।

(ঘ)

একান্তভাবে 'শিব'ও সাহিত্যের আদর্শ নহে—আধুনিক সাহিত্যে 'শিব' আদর্শের পরিব্যাপক ব্যাভচার—'গঁতিয়ে ফ্লোবেয়ার প্রভৃতি কর্ত্তৃক ব্যভিচারাত্মক 'কাম'কে 'আদি রস' বলিয়া গ্রহণ—প্রাচীন 'শিল্পশিষ্টাচারের' বিদ্রোহ—আধুনিক নভেল সাহিত্যের

প্রকৃতিতে 'শিব' বিদ্রোহ,—শিব-দ্রোহী 'সত্য' ও 'সৌন্দর্য্য' আদর্শ—'রিয়ালিষ্ট' শিল্পিগণের মধ্যে 'রোমান্টিক' প্রকৃতি'র 'কামকলা' —সাহিত্যের 'প্রকৃতি' বিচারে' সূক্ষ্ম 'অন্তর্বিবেকের' কার্য্য—'সৎ-চিৎ আনন্দ' রসই সাহিত্যের 'আত্মা' এবং রসের আলম্বন-উদ্দীপন সমূহের সামঞ্জস্য-সিদ্ধ 'আকৃতি-প্রকৃতিই 'চিরকালীয়' ও 'অমর' সাহিত্যের লক্ষণ।

ক

কোনও 'জাতীয় সাহিত্য' বলিতে যেমন বুঝায় জগতের অন্যজাতির সাহিত্য হইতে আকার-প্রকারে বিশেষিত উহা একটী স্বতন্ত্র পরিব্যক্তি; সেরূপ, 'জাতীয়' কবি বলিতেও বুঝায় যে উক্তরূপ 'জাতীয় ব্যক্তিত্বের' অভ্যন্তরেই (স্বকীয় প্রতিভা ও রীতির আকৃতি প্রকৃতিতে) তিনি একটী স্বতন্ত্র 'ব্যক্তি'। এই আদর্শে, আবার প্রকৃত 'কবি'মাত্রের কাব্যকেই বলা যায় যে, উহা (বিভিন্ন স্থায়ীভাবের আকৃতি-প্রকৃতির সাধনায়) সাহিত্য-সংসারে একটী স্বতন্ত্র 'ব্যক্তি'। এই 'ব্যক্তি'ত্বের তত্ত্বটি মোটামোটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া এবং হৃদয়ে নিত্য জাগরূক রাখিয়াই, যেমন জাতিবিশেষের সাহিত্যের আরাধনা করিতে হয়, তেমন, বিভিন্ন কবি এবং কাব্যের সঙ্গেও 'সংসর্গ' করিতে হয়; পরন্তু, সে'ভাবেই 'সমালোচনা' কিংবা 'বিচার' করিতে হয়। অতএব, দেখিতে হইবে এই 'ব্যক্তি'ত্বের ভিত্তি কোথায়? ব্যক্তি মাত্রেই এক একটা আকৃতি ও প্রকৃতি লইয়াই দাঁড়ায় এবং উভয়ের 'সংযুক্তা' শক্তিতেই আমাদের মনে মুদ্রিত হয়। সুতরাং, ঘনিষ্টভাবেই বুঝিতে হইবে এই সংযোগের ব্যাপারটি। গণনীয় শিল্পমাত্রের যেমন একটা 'আকৃতি' থাকা চাই, তেমন একটা 'প্রকৃতি'ও থাকা চাই। বলিতে কি, সাধারণতঃ, মনুষ্যমনে মুদ্রিত হইবার ক্ষমতা বিচার করিতে বসিলে, প্রকৃতি অপেক্ষাও আকৃতির প্রাগল্‌ভ্যই যেন অধিক বলিয়া ধারণা হইতে থাকিবে। যে সকল গুণে 'নরঃ প্রাপ্নোতি গৌরবম্' তন্মধ্যে, কেহ কেহ যে আকৃতিকেই প্রধান স্থান দিয়া থাকেন, তাহা ত আমরা জানি! অবশ্য, আকৃতি এবং প্রকৃতি উভয়ের মহিমা-সংযোগ ঘটিলে গৌরবের 'সীমা'ই থাকে না।

১। ব্যক্তিত্বে আকৃতি ও প্রকৃতি।

শিল্পের ক্ষেত্রে 'ভাব' কি প্রকারে 'রূপ' লাভ করে, আকৃতি কি ভাবে 'প্রকৃতির প্রমূর্ত্তি' হইয়া শিল্প-সমাধানকে 'ব্যক্তিত্ব' দান করে, তাহার সকল 'প্রকৃত কবি'র শ্রেষ্ঠ উপার্জ্জন গুলির আলোচনাই দান করিতে পারে। বঙ্গের নবেল সাহিত্যেই দৃষ্টি করিব।

২। ভাবের 'রূপ' এবং 'ব্যক্তিত্ব' লাভ।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কবি-হৃদয়' ছিল, এবং উহা সময় সময় নবেলের 'প্রাকৃত' ক্ষেত্রেও প্রকাশ পাইয়াছে। বঙ্কিম সাধুচরিত্র গোবিন্দ লালের অপরিহার্য্য ও 'অদৃষ্টজন্য' অধঃপতন দেখাইয়া একটি 'অদৃষ্টবাদী ট্র্যাজেডী' রচনা করিতে চাহেন; কোন্ উপায়ে উহার সমাধান হইতে পারে? রোহিণী ভীমা (বারুণী) পুষ্করিণীতে ঝাঁপ দিয়া মরিল; গোবিন্দ লালকে নিদারুণ ঘটনাচক্রে, তাঁহার 'সাধুতা'র বশেই, রোহিণীর প্রফুল্ল পঙ্কজবৎ মুখে মুখ সংযোগ পূর্ব্বক তাহার প্রাণসঞ্চার করিতে হইল! তৃষ্ণার্ত্ত, দুর্ব্বল 'জীব পতঙ্গ'কে ওই রূপশিখা-দীপ্ত তনুতরঙ্গিণীর আপাতশীতল মাধুরীধারা নিজের বক্ষে ধারণ করিতে হইল; অনিচ্ছাসত্ত্বেও অন্তর্মন পূর্ণ করিয়া তাহাকে এই মোহমদিরা পান করিতে হইল। উহার ফল যাহা, তাহাই ত গোবিন্দলালের উত্তর জীবন! অদৃষ্টের এই অরুন্তুদ পরিহাস! রোহিণীর জীবনদান-রূপ পুণ্যকর্ম্মের অপরিহার্য্য 'অদৃষ্ট' ফলেই গোবিন্দের 'মহামৃত্যু'! অধ্যাত্মতঃ নিরাশ্রয় এবং অসহায় সাধুতার অধঃপতনের এই নিদারুণ, হৃদয়ভেদী অথচ হৃদয়গ্রাহী অনর্থচিত্র! বঙ্গের গল্পসাহিত্যে উহার 'জুড়ি' মিলিবে না। এই ঘটনা- প্রমূর্ত্তির অভ্যন্তরে, শিল্পটীর 'ভাবাত্মা'র কি অভাবনীয় অর্থগৌরব, এবং শিল্পিকৌশলের কি অসাধারণ শক্তিই সুপ্ত এবং গুপ্ত আছে! নায়ক নায়িকার আস্তসংযোগের ব্যাপার ত আধুনিক নবেল সাহিত্যের একটা নিত্যনৈমিত্তিক দুর্ঘটনা! কিন্তু এই চিত্রটী কি অনপনেয় রেখায় চিত্তে মুদ্রিত হইয়া যায়! সেক্‌সপীয়রের মধ্যে অবশ্য উহার 'পূর্ব্বাভাস' আছে এবং মনে হয়, বঙ্কিম স্বপক্ষে বা পরোক্ষে অন্ততঃ উহার সাহায্য পাইয়াছিলেন। মহাকবি এরূপ একটী 'অনন্ত অমৃত'-পিপাসী

মৃত্যু চুম্বনেই হতভাগ্য রোমিও-জুলিয়েতের 'গুপ্তপ্রেম' সমাহিত করিয়াছেন—

"O churl! all drunk and not a friendly drop left!' এস্থলেই শিল্পের ক্ষেত্রে কবি সেক্‌সপীয়র-হস্তে ভাবের আকৃতি সংঘটন, Idealisation, ভাবকে পরিস্ফুট অবস্থা এবং ঘটনায় 'রূপ' প্রদান। একদিকে, ভাব এবং প্রমূর্ত্তির মহাযোগ; অন্যদিকে, একেবারে জীবন-মৃত্যুর সংযোগ! অপরিহার্য্য 'মৃত্যু'র গর্ভেই নিত্যানন্দদর্পী, আপনার সুধাদর্পী প্রেমের সমাধি! স্কট্, হুগো অথবা টলষ্টয়ের বাহিরে নবেলসাহিত্যে কদাচিৎ এ'রূপ মহাসম্মিলন সমাধা করিতে পারিয়াছে।

শ্রেষ্ঠশিল্পের পদবী অর্জ্জন করিতে হইলে ভাবকে যেমন ঐ প্রকারে সমন্বয়শক্তি-শালী 'অভিব্যক্তি' সাধন করিতে হয়, মহাসংযোগী অবস্থা এবং ঘটনায় 'রূপ' লাভ করিতে হয়; তেমনি, রূপের প্রত্যেক অঙ্গপ্রতঙ্গের মধ্যে 'অবয়ব-অবয়বী' ন্যায়ের সামঞ্জস্যসম্বন্ধ সিদ্ধ না হইলেও শিল্পক্ষেত্রে রূপের মাহাত্ম্য সাধন করা যায় না। শিল্পে ইহারই নাম সৌষ্ঠব! ভাব কিংবা রূপের একাঙ্গ খর্ব্ব অথবা কুব্জ-ন্যুব্জ-কদাকার করিয়া, অঙ্গবিশেষকে পৃথিবীর সৌন্দর্য্যসম্ভারে একেবারে উচ্ছলিত করিয়া ধরিলেও এই 'সৌষ্ঠব' আদর্শ সিদ্ধ হইবে না। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির সমক্ষে উক্ত অসঙ্গতি টাই নিত্যবেদনার কারণ হইয়া থাকিবে এবং সহৃদয়ের হস্তে প্রকৃত প্রস্তাবে কোনকালেই উহা মার্জ্জনা লাভ করিবে না।

৩। ব্যক্তিত্বে অবয়ব ও অবয়বী ভাবের সম্বন্ধ।

সাহিত্য শিল্পের পরিস্ফুট আকৃতি-প্রকৃতির ক্ষেত্রেই নিদারুণ অসামঞ্জস্যের এক দৃষ্টান্ত বঙ্গের একটি প্রসিদ্ধ উপন্যাস মধ্যেই মিলিতেছে। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর' উপন্যাসে লেখকের সুতীক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ এবং বর্ণনা শক্তির প্রশংসনীয় পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু, উক্ত গ্রন্থের প্রথমার্দ্ধের সহিত দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রকৃত কোন সংযোগ বা সামঞ্জস্য মোটেই পরিস্ফুট না হওয়ায় উহা শিল্পের আকার-প্রকার গত 'ব্যক্তিত্ব' হিসাবে নিদারুণভাবেই খণ্ডিত এবং পণ্ড

৪। ব্যক্তিত্বে অসামঞ্জস্য।

হইয়া গিয়াছে। উহার 'প্রকৃতি'র মধ্যেও একটা যেন আকস্মিক অবস্থান্তর বা যুগান্তরই মুখ্য হইয়া গিয়া শিল্পটির অন্তরাত্মাকেই খণ্ডিত করিতেছে। আনন্দ চন্দ্র মিত্রও একজন শক্তিশালী কবি। তিনি মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দের ধ্বনি-গৌরবকে স্পর্শ করার এবং আয়ত্ত করিবার শক্তিতে বঙ্গীয় কবিকুলের সকলকে অতিক্রম করিয়াছিলেন বলিলেও চলে। তাঁহার প্রধান কাব্য 'ভারত মঙ্গল'ও সেইরূপ একটা আকস্মিক পরিবর্ত্তনের বজ্রপাতে যেন মর্ম্মস্থলেই দ্বিখণ্ড হইয়া আছে! আকস্মিক বিঘটনাও একটা 'রস' স্বরূপে পরিণত হইয়া 'চমৎকারী' হইতে পারে, সত্য; এবং 'ভাবগত একটা যুগান্তর' প্রদর্শনও শিল্পের ক্ষেত্রে একটী গণনীয় বিষয়। সে আদর্শে 'যুগান্তর' এবং 'ভারত মঙ্গল' উভয়েই এক একটা 'ভাব-যুগান্তর' ধারণার শিল্প। কিন্তু, এরূপ যুগান্তরের মর্ম্মগতির সঙ্গে পাঠকের 'মর্ম্মপ্রত্যয়' উৎপাদন করা চাই! পাঠকের মনকে সুনিপুণ ঘটনা-সংবিধানে বা প্রয়োগের সাহায্যে সতর্ক এবং আশঙ্কান্বিত করিয়া উক্ত 'বিঘটনা' গ্রহণের উপযোগী সংস্কার-যুক্ত, এবং সমুদ্যত করিতে না পারিলে তদ্রূপ 'মর্ম্মপ্রত্যয়' জন্মিতেই পারে না; কবির প্রয়োগ-কৌশল সর্ব্বথা ব্যর্থ হইয়া যায়। উহা প্রত্যক্ষতঃ কবির একটা অসামর্থ্য এবং 'গোঁজামিল দেওয়া'র ব্যাপার রূপে প্রতীত হইয়াই 'রস-ভঙ্গ' করিতে থাকে। শিল্পের ক্ষেত্রে, উপক্রম-বিহীন এবং আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কিছুমাত্র মাহাত্ম্য নাই। সেইরূপ, বর্ত্তমান কালের একজন প্রসিদ্ধ এবং শক্তিশালী গল্পলেখক শরচ্চন্দ্রের 'বিরাজবৌ' গ্রন্থের নায়িকাটীর 'প্রকৃতি'র মধ্যেও একটা অসম্ভব পরিবর্ত্তনের 'দুর্ঘটনা' আছে। চরিত্রে ওইরূপ আকস্মিক বিবর্ত্ত কি দুর্ঘটনার জন্যও শিল্পের ক্ষেত্রে স্থান নাই। 'বিরাজবৌ'র চরিত্রের 'গোঁয়ার্ত্তমী'র মধ্যে ওইরূপ বিঘটনার কিছু কিছু উপক্রম সূচিত হইয়াছে, সত্য; কিন্তু সে সমস্ত পাঠককে উপযুক্ত মতে সচেতন করিবার মত প্রয়োগ-শালী বা 'অনুভাব'শালী নহে। 'বিরাজবৌ'র মত চরিত্রের পক্ষে উপস্থিত অবস্থায় স্বামী পরিত্যাগ সম্ভবপর হইতে পারে; কিন্তু, 'স্বামীভাবে' পর পুরুষের আশ্রয়গ্রহণ! বিরাজের সম্পর্কে ওইরূপ একটা 'সেকায়েত',

ওইরূপ একটা Libel লেখকের কলমে আসিতে পারিল! উহা একবারে বিভীষিকাময়—অপিচ বীভৎস হইয়া সমগ্র গ্রন্থের প্রাণ এবং সমাধানের উপর বজ্রাঘাতের মতই পতিত হইয়াছে! শরচ্চন্দ্র সূক্ষ্ম দৃষ্টিশালী শিল্পী। মানব চরিত্রে ধার তুলিতে, উহাকে 'কোণে কাণে'তীক্ষ্ণ এবং স্বাতন্ত্র্যময় বা 'রোখা' করিয়া তুলিতে এবং চারিত্রের সামঞ্জস্যে ঘটনার মধ্যেও এক একটা 'মোচড়' দিতে শরচ্চন্দ্র সিদ্ধহস্ত। এ ক্ষেত্রে তিনি ইংলণ্ডের হার্ডীর মতই 'মোচড় দেওয়া', 'রোখা' এবং ধারাল চরিত্র সাহায্যে কারুণ্য রস সমাধানে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কিন্তু, চরিত্রের 'বিঘটনা' কতদূর পর্য্যন্ত আমাদের রসবুদ্ধির সমক্ষে ভয়ানক কিংবা কারুণ্য-জনক হয়? কোথায় উহা একেবারে বীভৎস এবং জুগুপ্সার যোগ্য হইয়া উঠে? প্রয়োগ-বিজ্ঞানের সেইদিকে তাঁহার দৃষ্টি যেন যথোচিত প্রখর নহে! তাঁহার অনেক গ্রন্থে, সাচ্চা রসনিষ্পত্তির মধ্যস্থলে, এইরূপ বীভৎস এবং 'বে-ধারা' মোচড়ের এক একটা হঠকারিতা পাঠকের 'সহানুভূতি' না জন্মাইয়া বরং 'আস্ত' বেদনাই জন্মাইতে থাকে! 'চরিত্র হীন' উপন্যাসেও এইরূপে কিরণময়ী-চরিত্রে 'ধার' উঠিতে উঠিতে পরিশেষে উহা একেবারে 'ভাঙ্গিয়া' গিয়াছে! উহার নিজের 'ধার' নিজকেই কাটিয়াছে! একের দিকে নিস্ফল অনুরাগ বা 'হতাশ প্রেম'টা ক্রোধ এবং অভিমানের তাড়নায় যে-কোন-একটা আগন্তুকের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া একেবারে কুলটাধর্ম্মী আত্মদানে পরিণতি লাভ করিয়াছে! নিদারুণ বীভৎস হইয়া গিয়াছে! উহা সাহিত্য ক্ষেত্রে, পাঠকের সৌন্দর্য্য-বুদ্ধির মুখের উপরেই একটা বিপর্য্যয় বেত্রাঘাত এবং নির্দ্দয় অত্যাচারের দৃষ্টান্তরূপেই উজ্জ্বল থাকিবে। মোটের উপর, শরচ্চন্দ্র যেন মনুষ্যের রুচিক্ষেত্রে অসঙ্গত এবং বীভৎস বলিয়া কোন পদার্থকে গ্রাহ্যই করিতে চাহেন না। তাঁহার অনেক গ্রন্থের অবস্থা ও ঘটনায় এবং চরিত্র চিত্রণে উহার পরিচয় আছে। শুনিতে শুনিতে সমস্তই সহিয়া যাইবে, ইহা যেন তাঁহার ধারণা। এই ধারণা এবং (Experiment) পরীক্ষার ব্যাপার কোন উচ্চশ্রেণীর শিল্পীরই যোগ্য নহে। নিজের এইরূপ বিদ্রোহ-গর্ব্বে

নিপতিত হইয়া ব্যাকুল ও বিপর্য্যস্ত হইবার সম্ভাবনাটী বরং কর্তার লেখনীর পক্ষেই অধিক থাকে। মানুষ দেশে দেশে এতকাল যাহাকে 'বীভৎস' বলিয়া ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে তাহার কোন ক্ষুদ্র ভগ্নাংশকে কোন বিশেষদিক্ হইতে দৃষ্টি করিলে 'কুৎসিত' না দেখাইতেও পারে; Conventional বলিয়াও প্রতীতি হইতে পারে; কিন্তু, উহার সুপারিষে কোনও ক্ষমতাশালী শিল্পী নিজের শক্তি নিয়োগ না করিলেই ভাল হয়। মানুষের বীভৎসতা-বুদ্ধি কেবল একটা খামখেয়ালী ভাবও নহে; উহা একটা স্থায়ী ভাব; এবং মনুষ্যের 'মনোবিজ্ঞান' এবং 'নীতি' বিজ্ঞানের অপরিহার্য্য সত্য সমূহই ভিত্তিমূলে থাকিয়া সকল স্থায়ীভাবকে ধারণ করিতেছে। বীভৎসকে 'মানান-সই' করিতে গেলে শিল্পীর যেই শক্তি-ব্যয় হয়, সাফল্যের মূল্য হিসাবে উহাকে 'অপব্যয়' বলিয়াই নির্দেশ করিব। এই 'উদ্দেশ্য' সিদ্ধ করিতে গিয়া পাঠকের শ্রদ্ধার তরফেই শিল্পীর যাহা হানি ঘটে, কিছুতেই তাহার 'ক্ষতি পূরণ' করিতে পারে না।

সাহিত্যশিল্পের এই আকৃতি-নির্ভর ব্যক্তিত্বকে কেবল Plot, ঘটনা চক্র, বৃত্তান্ত-বিবরণী বা চরিত্র-চিত্রণ বলিয়া মনে করিলেই আমরা একদেশ-দর্শী হইব। 'ব্যক্তি' বলিতে যেমন ঐ সমস্ত লক্ষণ বাদ পড়ে না; তেমনি, তদধিক অনেক-কিছুই সঙ্কেতিত হইয়া থাকে। কেবল অবয়ব লইয়া 'ব্যক্তি' নহে; তৎসঙ্গে অবয়বী এবং তাহার 'অন্তরাত্মা'র সম্মিলন-জনিত, অনির্ব্বচনীয় সংস্কার-মূর্ত্তির নামই 'ব্যক্তি'। এই নিগূঢ় 'সামঞ্জস্য' সিদ্ধি করিয়া, পরন্তু, একটি স্বতন্ত্র 'প্রাণী' রূপে 'সৃষ্টি' করিয়াই, শিল্পকে 'স্থায়ী' পদবী লাভের যোগ্য করিতে পারা যায়। এইরূপে, উৎকৃষ্ট কাব্য মাত্রেই সাহিত্য-সংসারে আকৃতি এবং অন্তরাত্মার সামঞ্জস্য-সিদ্ধ এক-একটী স্বতন্ত্র 'ব্যক্তি'। এইরূপ 'ব্যক্তি'ই সাহিত্যের অমরলোকে প্রবিষ্ট হইবার 'প্রাথমিক দাবী' করিতে পারে। ফলতঃ, যখনই দেখা যাইবে যে, কোনও বিস্তারিত শিল্পরচনা নানাদিকে বহু-বহু গুণ সত্ত্বেও, সাহিত্যের ইতিহাসে কিংবা সহৃদয়বর্গের নিকট অনাদৃত হইয়াছে, অথবা 'বিস্মৃতি দণ্ড' লাভ

৫। আকৃতি এবং প্রকৃতির সামঞ্জস্যে শিল্পের 'স্বরূপ'।

করিয়াছে, তখনি, পর্য্যবেক্ষণ করিলেই দেখিব যে, হয় ত উহার আকৃতির মধ্যে, নয় ত প্রকৃতির সঙ্গে আকৃতির সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রেই কোন-একটা 'বিরূপতা' এবং বেয়ারা 'ধর্ম্মতা' বা লক্ষণই মুখ্য হইয়া আছে। উহা হয়ত একটা 'ব্যক্তি'ই হইতে পারে নাই ; অথবা ব্যক্তি হইলেও, হয়ত 'সজ্জন' এবং 'শিষ্ট' ব্যক্তির সংসর্গযোগ্য 'ব্যক্তি' হইতে পারে নাই। এরূপে, শিল্পের আকৃতি-বৈচিত্রের সঙ্গে সঙ্গে 'বৈরূপ্যের' বৈচিত্র্যও নানাদিকে এবং নানারূপে গড়াইতে পারে (১)।

৬। শিল্পে প্রকৃতির মহত্ব এবং উহার সংসর্গ।

শিল্পের ব্যক্তিত্ব! কথাটার উপর চারিদিক হইতে আলোক পাত করিতে পারিলেই আমাদের বক্তব্য সুপরিস্ফুট হইয়া যায়। ব্যক্তিত্বশালী জীবমাত্রেই যেমন নিজের আকৃতি এবং প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যে আমাদের চিত্তপটে 'সুন্দর কুৎসিৎ' বা 'স্থায়ী-অস্থায়ী' সংস্কারে মুদ্রিত হয়, তাহার সংসর্গ যেমন 'ভাল-মন্দ' নামে বিশেষিত হইতে পারে, মনুষ্যচিত্তে শিল্পের 'ব্যক্তিত্ব'-ধারণা ও সংস্কার-উৎপত্তির সময়েও উক্ত মনস্তত্ত্বের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে না। অন্যদিকে, ব্যক্তিবিশেষের ন্যায় শিল্পের আকৃতিও রুক্ষ, অসম্পূর্ণ, অসামঞ্জস্যময় অথবা কুৎসিত হইতে পারে ; অথবা, ঐ সমস্ত সত্ত্বেও, তাহার প্রকৃতিটা উদার, উন্নত মনোজ্ঞ, রসায়ণ এবং চিত্তপাবন হইতে পারে। এমন কি, আকৃতির গঠন 'অনবদ্য' এবং সকলদিকে 'সমলঙ্কৃত' হইয়াও, শিল্পের এই 'প্রকৃতি'টুকু পাঠকের অন্তরাত্মা সম্পর্কে নিদারুণ ভাবে অব্যবস্থিত, শূন্য, জঘন্য অথবা ভয়ঙ্কর হইয়া পড়াও অসম্ভব নহে। অনুসন্ধান করিলে ইহার 'হুবহু' দৃষ্টান্ত সাহিত্য সংসার হইতে উদ্ধার করা যায়। 'মণিমণ্ডিত সর্প' 'বক ধার্ম্মিক' বা 'বিষকুম্ভ পয়োমুখ' প্রকৃতির শিল্প যেমন সম্ভবপর, কিন্নরী নর্ত্তকী উর্ব্বশী বা স্বৈরিণী প্রকৃতির শিল্প যেমন সম্ভবপর, দেসদিমনা ভায়োলা পোর্সিয়া বা সীতা সাবিত্রী অরুন্ধতী এবং গার্গী-প্রকৃতির শিল্প

(১) শিল্পের আকৃতির বৈচিত্র বিষয়ে এই গ্রন্থের ৩৭-৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ও তেমনি সম্ভবপর। এবং উহাদের 'পাঠ-ফল'টুকুও মনুষ্যের সংসর্গফল-হইতে অভিন্ন। ফল কথা, পাঠকের সাহিত্য-বিবেকের দর্পণটুকু মার্জ্জিত হইয়া গেলে, শিল্পের কি আকৃতিগত অসৌষ্ঠব, কি প্রকৃতিগত ধর্ম্ম বা জাতিভেদ, সমস্তই স্থিরীকৃত হইতে এবং পাঠকের অন্তরাত্মায় রসনায় শিল্পের সংসর্গ-ফলের আস্বাদটুকু পরিচিহ্নিত হইতেও কিছুমাত্র বিলম্ব ঘটেনা। রুচিভেদে, অগঠিতচিত্ত কিংবা অশিক্ষিত পাঠকের মধ্যে হয়ত আকৃতি-প্রকৃতির কোনও একটীর দিকেই একটা আত্যন্তিক 'ঝোঁক' দেখা যাইবে—মানুষের বেলায় সাধারণতঃ যেমন ঘটিয়া থাকে। আবার, কেবল আকৃতি-পক্ষপাতী বিচারে প্রবঞ্চিত হইবার সম্ভাবনাও সমধিক। বলিতে কি, সাহিত্যজগতের এই শিল্পরূপী 'ব্যক্তি'টি কেবল আকৃতি-সুন্দর হইয়া, প্রকৃতির বিষয়ে সময় সময় 'পণ্ডিতের চক্ষু'তেও ধূলা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়া যায়। এই 'ব্যক্তিটা' কেবল ধূর্ত্ত, 'প্রবঞ্চক' এবং লম্বপাট-পটাবৃত 'দুর্জ্জন' মাত্র হইয়াই, প্রকাশ্য আকার-প্রকারে 'এক' দেখাইয়া পাঠকের অন্তরাত্মার সম্পর্কে অবিতর্কিতে 'আর' হইতেও দেখা গিয়াছে। দৃষ্টতঃ অনন্ত-আকাশ বিহারী হইয়াও, অন্তরে-অন্তরে উহার কেবল 'ভাগারেই দৃষ্টি' থাকিতে পারে! মুখে মাত্র নিজকে ভববিষহরী এবং মহাভাব-শুভঙ্করী দেখাইয়া, উহা অনেক সময় মনুষ্যের অন্তরঙ্গে 'বিষকন্যা'রূপে হলাহল উদ্গার করিয়া যাইতেও পারে! ফল কথা, মনুষ্যকে মানুষের সংসর্গবিষয়ে সতর্ক করিয়া, সমাজ-বদ্ধ মনুষ্যের উপকারার্থে অনেক শাস্ত্র-শাসন প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু মনুষ্যের পক্ষে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল সংসর্গ, যাহাতে তাহার প্রাণ-মনের এবং ইহ-পরকালের 'মহা পরিবর্ত্তন' সংঘটিত হইতে পারে, সেই 'গ্রন্থ' এবং 'গ্রন্থের সংসর্গ ফল' বিষয়ে মনুষ্যকে সতর্ক করিবার জন্য নরসমাজে যথোচিত ব্যবস্থা আছে বলিয়া কোন মতেই ধারণা করিতে পারি না। প্রাচীনকালে হয়ত উহার তত আবশ্যক ছিল না। প্রাচীনগণ সামাজিক মঙ্গলের মহৎ উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া, এমন কি, যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মোদ্যত ব্যক্তির ন্যায় সৎসঙ্কল্প এবং 'মঙ্গলাচরণ' করিয়াই গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইতেন; উহাতে সাহিত্যক্ষেত্রে কদাচিৎ ধর্ম্মদ্রোহিতা প্রবেশ লাভ

করিতে পারিত। তখন আদর্শ ছিল—গ্রন্থ-রচনাও একটা মহাযজ্ঞ। সত্য সন্ধান, সত্যানুধ্যান এবং তপোদান প্রভৃতির ন্যায়, কবির পক্ষে সাহিত্যসেবা কিংবা কাব্যরচনাও একটা পুণ্যকর্ম্ম; অমরজীবনের জন্য অর্থসঞ্চয় এবং 'পরম অর্থ' উপার্জ্জন। এখন কিন্তু অনেকেই প্রকৃত প্রস্তাবে 'সাহিত্য-রস' উদ্দেশ্য ছাড়িয়াই যেন 'সাহিত্য রচনা' করিতেছেন। সমাজ-ধর্ম্ম অথবা নীতির ক্ষেত্রে 'সংস্কার' বা 'বিপ্লব' উদ্দেশ্য করিয়াই 'কাব্য' বা নাটক রচনা! যেমন 'বার্ণার্ড শ' প্রভৃতির অনেক 'নাটকাকৃতি' সাহিত্য রচনা? উহারা কেবল 'আকারে' সাহিত্য মাত্র—প্রকৃত সাহিত্যের একএকটা Apology! ধর্ম্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে যেন এক একটা 'পরীক্ষা' ব্যাপারের 'প্রস্তাব' করিয়া, 'সমাজ পরিবর্ত্তন' উদ্দেশ্য করিয়া, অথবা ঐসকল ক্ষেত্রে একেবারে 'বিপ্লব' লক্ষ্য করিয়াই শিল্প-গ্রন্থ রচনা! কেবল শিল্পসাহিত্যের বাহ্য 'আকৃতি'টুকু মাত্র গ্রহণ! 'প্রকৃতি' হিসাবে উহারা এক একটা Essay বা বক্তৃতা ব্যাপার, Polemic। নিরেট দর্শন অথবা বিজ্ঞান-অধিকারের প্রচেষ্টাও শিল্পসাহিত্যের ভূমিকা এবং 'নাম-রূপ' গ্রহণে সাহিত্যক্ষেত্রে 'অনধিকার প্রবেশ' করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সরস্বতীর 'সেবা' আদর্শ এখন কেবল অর্থসঙ্কুলী বাণিজ্য-ব্যবসায়েই পরিণত! সারস্বত জীবনের কৌলিন্য-বুদ্ধি এবং দায়িত্বজ্ঞানও লুপ্ত! প্রতিদিন শত সংখ্যাতীত, স্থিতিনীতিদ্রোহী এবং মনুষ্যত্ব-বিদ্রোহী অপাঠ্য গ্রন্থও মুদ্রাযন্ত্র হইতে উদ্গীর্ণ হইয়া নূতনত্ব-বিলাসী পৃথিবী-কীটের খোরাক যোগাইতেছে। এইকালে শ্রেয়ঃকামী পাঠকমাত্রকে একবার—দুইবার—বারবার সতর্ক করিয়া দিবার সময়টিই উপস্থিত।

এইকালে পাঠকমাত্রকেই মনে রাখিতে হয় যে, সাধারণ ব্যক্তি-চারিত্রের বিচার হইতে শিল্পের বা কাব্য বিচারের পার্থক্য কোথায়? সমাজে কোনও মনুষ্যের বাহ্যিক আকৃতি বা দেহের বিকৃতি কোন ভদ্রলোকই বিচারের বিষয় বলিয়া মনে করেন না। মনুষ্যদেহের কোন বিকলাঙ্গতা, উহাতে 'অঙ্গ-অঙ্গী' ভাবের কোনরূপ অসামঞ্জস্য শিষ্টগণ লক্ষ্য করিতেই চাহেন না। আকৃতিতে কুশ্রী, বিশ্রী বা বিরূপ হইয়া একেবারে

অষ্টাবক্র হইয়াও যে মানুষ মহানুভব এবং মহৎ হইতে পারে, 'মহর্ষি' হইয়াই দাঁড়াইতে পারে! কিন্তু কাব্যশিল্পের 'আকৃতি' বিচারে এই শিষ্টাচার ব্যাপ্ত এবং প্রযুক্ত হয় না। কাব্য মনুষ্যের 'ইচ্ছা-কৃতি' এবং 'কৃত্রিম বলিয়াই এ'স্থলে পার্থক্য। মনুষ্যের 'ইচ্ছ-কৃত' বলিয়াই আমাদের 'ভাল মন্দ'রুচি এবং বিচারবুদ্ধির সমক্ষে, শ্রেষ্ঠ শিল্পমাত্রকে আকৃতি এবং প্রকৃতি উভয়তঃ 'রুচির' এবং অনবদ্য হওয়া চাই। আকৃতি-অবয়বের শোভনতা এবং সৌষ্ঠবের সহিত উহার প্রকৃতিগত মাহাত্ম্য এবং সমঞ্জসিত ভাবোন্নতি হইতেই শিল্পের মাহাত্ম্য। এই মাহাত্ম্য-বোধির নামই 'সাহিত্য-বিবেক', এবং উহাই 'সাহিত্য-ব্যক্তি'র চরম বিচার। সুতরাং এই বিচার আকৃতির সঙ্গেসঙ্গে বিশেষভাবে শিল্পের মর্ম্ম এবং প্রকৃতির অভ্যন্তরে দৃষ্টি করে; পাঠকের অন্তরাত্মা সম্পর্কে শিল্পের 'অধ্যাত্ম' প্রকৃতি এবং আচরণের উদারতা ও মহাত্মতার দিকেই লক্ষ্য করে।

অতএব শিল্পকৃতির চরম বিশেষত্ব ও মাহাত্ম্য তাহার 'প্রকৃতি'র মধ্যে —অন্তশ্চরিত্রের মধ্যে। শিল্পের চরিত্র! কেবল গ্রন্থস্থ পাত্রসমূহের চরিত্র নহে, গ্রন্থের সর্ব্বপ্রকার আলম্বন এবং উদ্দীপন বস্তুকে লইয়া, লেখকের ভাব ভাষা ভঙ্গী প্রভৃতির সহযোগে সমগ্র শিল্পটির যেই 'চরিত্র' এবং 'আত্মা'র ছবি চিত্তে মুদ্রিত হয়, গ্রন্থকার যেই 'চরিত্র' প্রবল করিতে লক্ষ্য করেন এবং যাহা পাঠের 'উত্তরফল'রূপে চিত্তে স্থির থাকিয়া যায়, এই চরিত্র সেই Impression বা সংস্কার-প্রমূর্ত্তি। এইরূপ 'সংস্কার' সৃষ্টির ভিতরেই ত কবিগণের চরম কারিকরী ও কারুকর্ম্মের পরম 'ব্যক্তিত্ব'! তবে, এই কারিকরী টুকুন কবিদের ইচ্ছাশক্তির খুব 'বাধ্য' বলিয়াও মনে হয় না। কবির স্বীয় অন্তরাত্মার মধ্যে বিশ্বতন্ত্রের সহিত একটা সাম্য এবং সামঞ্জস্য না থাকিলে, কাব্যস্রষ্টার নিজের মধ্যেই ভাব ও বস্তু এবং বর্ণের একটা 'তৌল' স্বতঃসিদ্ধভাবে না থাকিলে, অর্থাৎ, ঐরূপে কবির নিজের ভাব ও সত্য-বুদ্ধি এবং প্রয়োগশক্তি 'প্রকৃতিস্থ' না থাকিলে, তাঁহার নিজের 'যন্ত্র-শক্রতা' হইতেই সমস্ত 'প্রয়োগ' বিপর্য্যস্ত ও 'বেয়ারা' হইয়া পড়িতে থাকিবে। সুতরাং, বলিতে হয়, শিল্পের 'প্রকৃতি' লেখকের

আপন প্রকৃতির 'আত্মজা' ব্যতীত আর কিছুই নহে। শিল্পের মহাত্মত্যা কবির স্বীয় রসাত্মার ঔরসজাতা। এক্ষেত্রে বাহির হইতে আগন্তুক কোন 'আদর্শ'-ব্যাপার বা শিক্ষাসাধ্য 'পাণ্ডিত্যের' ব্যাপার মাত্রেই ন্যূনাধিক শক্তিহীন।

এ'স্থলে রামায়ণ-রচনার ব্যাপার হইতে আমরা কাব্যের 'সৃষ্টি' বিষয়ে আর একটি সূক্ষ্মতত্ত্বের জ্ঞানলাভ করিতে পারি। (১) কাব্যের ভিত্তি মূলেই, উহার প্রাণীভূত প্রেরণারূপে, উহার সকল ভাবের 'আত্মা'রূপে কবির একটা 'মহাভাব'। কবির হৃদয় মনুষ্যের সমক্ষে একটি দুর্লভ ভাবসন্দেশ উপস্থিত করিতে চায়, আপন হৃদয়ের পরিপূর্ণ ভাবানন্দে মধুময় করিয়াই ওই 'সন্দেশ' উপস্থিত করিতে চায়। বাল্মিকীর পক্ষে ওই 'দুর্লভ ভাবসন্দেশ' ছিল—'মানুষের মহাধর্ম্মতা বা দেবত্ব'। এই মহাতত্ত্ব বাল্মিকী জীবনপথে স্বকীয় জীবন-দেবতার শ্রীহস্ত হইতেই 'দান' স্বরূপে লাভ করিয়াছিলেন এবং দেবতাও তাঁহাকে ওই অপূর্ব্ব এবং দুর্লভের অসাধারণ 'গ্রহীতা' জানিয়াই যেন উহা উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। কবি স্বয়ং জীবন-জলধির 'অতলের ডুবারী' হইয়া যে রত্ন লাভ করেন, উক্ত লাভের প্রধান 'সর্ত্ত' এবং অন্তরাদেশ যেন এই ছিল যে, তিনি উহা বিশ্বভুবনে বিলাইয়া দিবেন। সুতরাং 'অপরিহার্য্য' ছিল বলিয়াই তাঁহার লেখনী ধারণ। সকল মহাশিল্পের মূলে এই অন্তরাদেশ ও অপরিহার্য্যতা থাকে; এবং এস্থলেই মানবসমক্ষে কবিহৃদয়ের 'অপূর্ব্ব-সমাচার' বা Message। তদ্ভিন্ন কেবল চরিত্র সৃষ্টি, চরিত্র বিশ্লেষণ, প্রাকৃত সত্যবাদ বা ঐতিহাসিক 'সত্য দর্পণ' প্রভৃতি উপস্থিত করাও কবির 'মূল লক্ষ্য' নহে। সে সমস্ত উপস্থিত মতে উক্ত 'মহাভাব' প্রকাশের উপায় রূপেই উদ্দেশ্য-পথে কবিকে অবলম্বন করিতে হয়।

৭। শিল্পের প্রকৃতিগত 'মাহাত্ম্য' বিষয়ে রামায়ণ রচনার দৃষ্টান্ত।

(১) এই গ্রন্থের ১৫।২০ পৃষ্ঠায় সমসূত্রে পাঠ করিতে হইবে।

আদৌ হৃদয়ে উক্তরূপ মহাভাবের সৃষ্টি-সমুল্লাসী প্রেরণা জাগিলেই, পরে বিষয় নির্ব্বাচনের 'ডাক' পড়িতে পারে। সুতরাং, ওই 'অবস্তুনির্ভর' মহাভাবটিই কাব্যের মূল উপাদান বা মূল প্রকৃতি। কবির বিষয় নির্ব্বাচণ, ভাষা ও বর্ণ রীতি এবং ছন্দ প্রভৃতি উক্ত 'মূল প্রকৃতি'র দ্বারা যেন অতর্কিতেই নির্দ্ধারিত পরিণামিত এবং পরিচালিত হইতে থাকে। 'শ্রেষ্ঠ' কাব্যের মধ্যে উক্ত প্রকৃতিটাই প্রতি পত্রে ওতপ্রোত থাকিয়া, পরিশেষে গ্রন্থের উদর্ক বা 'পাঠ ফল'রূপে এবং পাঠকের চূড়ান্ত 'প্রাপ্তি' রূপে উপজাত হইয়াই পাঠককে কাব্যের 'উপসংহারে' রাখিয়া যায়।

৮। শিল্পের মূল ভাবানুযায়ী প্রকৃতি; উহা লেখকের আত্ম প্রকৃতির ঔরসজা।

মিল্‌টনের মধ্যেও এরূপ একটি 'মহাভাব' আছে যাহা Paradise Lost কাব্যের প্রতিপত্রে, প্রতিচ্ছত্রে ওতপ্রোত থাকিয়া চিত্তকে প্রতিনিয়ত অনন্তের মহিমায় এবং আনন্ত্যের অনুভবে জাগাইয়া রাখে! উহাকে এক বিলাতী সমালোচক নিজের ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—Ever present sense of the Immensity of Space উহা অনন্তের নিত্য অনুভূতি ও স্পর্শবুদ্ধি! উহাই Paradise Lost কাব্যের মহান্ আত্মা—মিল্‌টনী রীতি এবং মিল্‌টনের কবি-আত্মার পরমা সিদ্ধি। প্রাণ-বীণার এই নিয়তস্থির উচ্চতার আন্তরিক স্বানুভূতি! স্বয়ং বিশ্বেশ্বরের সিংহাসনতলে বসিয়াই বীণা বাজাইতেছেন বলিয়া একটা নিত্য-সুস্থির ও সচেতন 'মহাভাব', নিত্য উদগ্র ভাব! উহা হইতেই মিল্টনের কণ্ঠে এবং কাব্যচ্ছন্দে যেই স্থির কৌলিন্য অনুস্যূত হইয়াছে, তাহা জগতের অপর কোন কবির মধ্যেই এ'ভাবে মিলিবে না। সাহিত্যে সমুন্নত প্রাণ-প্রকৃতির ইহাপেক্ষা বড় দৃষ্টান্ত আর নাই।

সুতরাং প্রধান জিনিষটাই হইতেছে কাব্যের এই 'মূল প্রকৃতি'; এবং উহা কবির আত্ম-প্রকৃতির ঔরসজাতা। এস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা দেখিতেছি যে, আর কথা নাই! 'ঔচিত্য' নিরূপণ করিতে হইলেও বলিতে হয় যে, উপায়ান্তর নাই। কবিকে 'প্রকৃতিস্থ' কাব্য লিখিতে হইলে,

সর্ব্বাগ্রে তাঁহার 'নিজের প্রকৃতি'টাই 'সাধন' করিতে হইবে; উহাকে 'বিনয়'পথে বিশ্বতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গতিশীল করিয়াই 'সংযোগী' করিতে হইবে। যে কবির হৃদয় মনুষ্যতন্ত্র কিম্বা জগৎ-তন্ত্রের বিষয়ে কোনও মহানন্দের 'রসিক' হইতে পারে নাই, যিনি প্রকৃত প্রস্তাবে কোন মহাভাবের 'সমুদ্র স্নান' করিয়া উঠিতে পারেন নাই, যাঁহার অন্তরাত্মা কেবল খণ্ডিত কিম্বা কুণ্ঠিত ভাবে মানবজীবনের সুখদুঃখতত্ত্বে বিগাহী হইয়াছে অথবা কেবল চিত্তপুরের কবিত্ব-তেতালার উপরে-উপরে উদাসীন ভাবে বসিয়া-বসিয়া যিনি জীবন-কুরুক্ষেত্রের পাপপুণ্য সমর দেখিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার অন্তরাত্মা কদাচিৎ 'প্রকৃতি যোগ'-সিদ্ধ হইতে পারে; কদাচিৎ 'প্রকৃতিস্থ' হইতে পারে। তাঁহার প্রাণের প্রসার, উহার সহানুভূতির প্রকার, এমন কি, তাঁহার কল্পনাশক্তি পর্য্যন্ত কদাচিৎ সত্যপথিক হইতে পারে। তাঁহার আত্মপ্রকৃতিও কদাচিৎ প্রসারিত হইয়া কোন মহাভাবের গ্রাহক হইতে, কবি-চরিত্র লাভ করিতে, কিংবা জীবন-বিধাতার হস্ত হইতে কবি হইবার 'পাশ' পাইতে পারে।

আমাদের বঙ্গসাহিত্যের কবি মধুসূদনের দিকেই দৃষ্টি করুন। কবি মধুসূদন স্বীয় জীবনের বিদ্যা-সাধনা, অধিকন্তু দুর্দ্দশার অভিজ্ঞতা পথে জীবন-বিধাতার হস্ত হইতে যে একটি মহাতত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন উহাই তাঁহার তিলোত্তমা সম্ভবে, বিশেষতঃ তাঁহার শ্রেষ্ঠকাব্য 'মেঘনাদ বধে'র 'মহাভাব' রূপে কাযে আসিয়াছে? উহাই 'প্রাণ'রূপে উভয় কাব্যের 'ব্যক্তিত্ব' ও 'চরিত্র' নির্ণয় করিয়াছে; তাঁহার 'বিষয়-নির্দ্ধারণ' এবং কাব্যটীর আকৃতি-সমাধানও নিয়মিত করিয়াছে। কবির পক্ষে জীবনতন্ত্রের এই 'তত্ত্ব' ছিল Fate—অদৃষ্ট—গ্রীক অদৃষ্ট। দুর্জ্জয়, দুরতিক্রম, মহাশক্তি-শালী Fate বা দৈবই মনুষ্যজীবনে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্; "দৈবো বলী কেবলঃ।" মনুষ্যের সকল শক্তি, ধর্ম্ম-পুণ্য বা পুরুষকারের সামর্থ্য দৈবের গতিসমক্ষে তৃণের মত উড়িয়া যায়! এই 'দৈব'রোষে মহাপুরুষ, মহাবল

১। মিলটন, মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের অভ্যন্তরে কাব্যের 'মূল প্রকৃতি'গত মহাভাব ও উহার সহানুভূতি এবং অভিব্যক্তি।

পরাক্রান্ত রাবণ 'বিনাদোষে' নরবানরের হস্তে ধ্বংশ প্রাপ্ত হইল! মহাবীর, "শূলী শম্ভু সম ভাই" কুম্ভকর্ণ, 'ইন্দ্রজিৎ' মেঘনাদ, 'বীরচূড়ামণি' বীরবাহু প্রভৃতি রাবণ-শক্তি এ'রূপে উহার সমক্ষে চূর্ণিত-চূর্ণায়মান হইয়া উড়িয়া গিয়াছে! গ্রীক অদৃষ্টবাদের আদর্শে মানুষ, অনেক মহাত্মা মনুষ্যই বিনাদোষে, মনুষ্যের অনির্ব্বাচ্য ও অজ্ঞেয় কারণে, দুঃখদৈন্য-দুর্দ্দশা এবং ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তথাপি, মানব জগতের 'মহাপুরুষগণের' প্রধান লক্ষণ ও মাহাত্ম্য এই যে, তাঁহারা "অত্যন্ত বিমুখ" দৈব সমক্ষেও অনমিত মেরুদণ্ডেই মৃত্যুকে বরণ করিয়া যান; কদাপি আত্মস্থিতি ও 'আত্মাদর' হইতে ভ্রষ্ট না হইয়া, অপরাজিত ব্যক্তিত্বে, মৃত্যুর কবলেও আত্মপ্রতিষ্ঠায় সুস্থির থাকিয়াই ধ্বংসলাভ করেন; ভবজীবনে ইহাই মহত্ত্বের অপরিহার্য্য নিয়তি। কবি মধুসূদনের মতে, শূর্পনখার "দুঃখে দুঃখী" রাবণ, বিশ্ববিজয়ী ঐ রাবণ, যুযুৎসু-ধর্ম্মে, ভগিনীর অপমানের প্রতিশোধ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই সীতাকে হরণ করেন; নতুবা, পর নারীর প্রতি কোন নীচ প্রবৃত্তি আত্মাদরশীল, মহাবীর রাবণের ছিল না। আর, সীতা লঙ্কাপুরে আসিয়াই নিদারুণ অদৃষ্টের 'পাবকশিখা রূপিণী' হইয়া 'স্বর্ণলঙ্কা' দগ্ধ করিতেছিলেন! তথাপি রাবণ 'সর্ব্বংসহ' হইয়া, ওই সর্ব্বসংহারকারী নিয়তির প্রলয়াগ্নি-চিতার বুকে, অম্লান মুখে, সুস্থির হইয়াই ত দাঁড়াইয়া আছে! এ স্থলেই 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের 'নায়ক' রাবণ; এবং এ'স্থলেই সমগ্র কাব্যটীর 'করুণাশ্রিত বীররসের পরিচালক' মহাভাব! বলিতে পারি, উহাই সমগ্র কাব্যটীর 'প্রধান প্রকৃতি' এবং তাহার 'পরিণামী' শক্তিতেই কাব্যটীর সৃষ্টি। কবি মধুসূদনের 'হৃদয়' ওই মহাভাবের "বোধি" লাভ মাত্র, সরস্বতীর মহাপ্রাণী 'প্রেরণা'য় যে 'উদাত্ত বিস্ময়' ধ্বনি করিয়া উঠিয়াছিল, যেই Exclamation উদ্গীর্ণ করিয়াছিল, তাহার 'নিঁখুত' প্রমাণটাই কবির একটী পত্রে মিলিতেছে—"Ravan fires me with Enthusiasm; he is a Grand Fellow!" বলিতে কি, রাবণ চরিত্রের এই 'মাহাত্ম্য' বোধ, এই Grandeur বোধ হইতে এবং ওই মহাভাব-প্রেরিত প্রাণ-স্পন্দন হইতেই 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের আদি

জন্ম। উহাই কাব্যটীর রাগরাগিণী-তালের 'প্রাণ' স্থির রাখিতেছে; কাব্যটীর Tone এবং তাহার 'কড়ি-কোমল'কেও নিয়মিত বা পরিচালিত করিতেছে। উহাই কাব্যটীর 'নব সর্গ'-বিস্তৃত বীর-করুণ উচ্ছ্বাসের আকৃতি-প্রকৃতিতে ওতপ্রোত থাকিয়া এবং নানামুখে লীলায়িত হইয়া বঙ্গসাহিত্যে এই 'মেঘনাদ কাব্য'কে 'মূর্ত্তিমান' এবং 'ব্যক্তিত্ববান্' করিয়া গিয়াছে। (১)

সে'রূপ, হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারের মূলপ্রকৃতি এবং গঠনী শক্তির মধ্যেও একটী 'মহাভাব'। তবে, সাহিত্যশাস্ত্রে উহার নাম Fate নহে, Nemesis—'অদৃষ্টের প্রতিশোধ' বা 'অদৃষ্টের পরিহাস'।

> অদৃষ্টের ক্রূর পরিহাস
> বাড়ায়ে করিতে সর্ব্বনাশ!
> যে যত্ন তুলিতে ভাগ্য-গগনের ভালে
> সেই ফিরে টানিতে পাতালে!

শেকস্পীয়রের ম্যাক্‌বেথ্‌এর ন্যায়, তৃতীয় রীচার্ডের ন্যায় এই 'অদৃষ্টশক্তি'ই আপাততঃ নিষ্কণ্টক ও অপ্রতিহতগতি উচ্চাভিলাষ রূপে সহায় হইয়া 'ধর্ম্মদ্রোহী' বৃত্রাসুরকে 'স্বর্গজয়ী' করিয়া তুলিয়াছে; আপন সাংসারিক উন্নতির উচ্চতম শিখরে বাড়াইয়া তুলিয়া, পরিশেষে অধঃপাতের মুখে ও মৃত্যুনিরয়ের নিম্নতম গহ্বরে লইয়া গিয়াছে! লোকপূজ্যা ইন্দ্রাণীর অপমান পর্য্যন্তই বৃত্রের উন্নতির উচ্চতম সীমা এবং উহা হইতেই অধঃপতনের সূত্রপাত। কবির ভাষায়, উহাতেই "বৃত্রের অদৃষ্টলিপি অকালে খণ্ডিত"। বৃত্রসংহার কাব্যের মূলপ্রকৃতির 'নিদান' সুতরাং মেঘনাদবধ হইতে নানাদিকে পৃথক। কিন্তু, উভয়েই স্ব স্ব কবির হৃদয়কে অধিকার করিয়া এবং 'মহাভাব'রূপে পরিচালক হইয়াই যথোচিত বিষয়বস্তু বা আকৃতি-চরিত্র-ঘটনাদির সংঘটন ও সমাধান

(১) এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোক লাভ করিতে চাহিলে লেখকের "মধুসূদনের কবিত্ব ও প্রতিভা" নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বক বঙ্গসাহিত্যে এই দু'টী উচ্চকণ্ঠ কাব্যসঙ্গীতের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে।

কবির বিষয় — নির্ব্বাচন প্রভৃতিও আত্ম প্রকৃতির অতর্কিত সহানুভূতিবশে, একরূপ 'অপরিহার্য্য'ভাবেই ঘটিয়া থাকে। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে, কবির 'স্বাধীন ইচ্ছা'-কৃত এই যে নির্ব্বাচন, উহার 'স্বাধীনতা'র মধ্যেও একটা 'ব্যক্তিত্ব' এবং ন্যূনাধিক 'অপরিহার্য্যতা' আছে। কালিদাসের দৃষ্টান্তটাই চিন্তা করুন। (১)

১০। কালীদাসের কাব্য সমূহের দৃষ্টান্তে তাঁহার কাব্যের 'মূলপ্রকৃতি' ও প্রাণের সহানুভূতির ধারা।

কালীদাস ভারতের একজন মহানুভব, মহাভাবুক এবং অসাধারণ প্রবেশশালী মনস্বী ব্যক্তি। বহির্জগতের দিকে অপরূপ সৌন্দর্য্যরসানন্দে তাঁহার হৃদয় যেমন চিরকাল একটী দর্পণের মতই উন্মুক্ত ছিল, তিনি 'সে কালে'ই সমস্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক মর্ম্মদর্পণে প্রত্যেক দেশের সৌন্দর্য্যশ্রী যেমন একটা বিশেষভাবে আহরণ করিয়াছিলেন, তেমনি 'মানবত্ব'কেও আপন জীবনের বিশিষ্ট অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতায় আনিয়া জাগ্রৎভাবে গ্রহণ এবং উপভোগ পূর্ব্বক আত্মপ্রাণে 'কবি' হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কালিদাস অনাবিল 'সৌন্দর্য্য'তত্ত্বের এবং রসানন্দের কবি; জগতের কুশ্রী দিক অথবা উহার পাপ-তাপ দুঃখ ও জঘন্যতা তাঁহাকে কবিত্ব-চেষ্টায় উত্তেজিত করিতে পারে নাই। আবার, তিনি 'প্রেম'রসের কবি। মানবতার ক্ষেত্রে কালিদাস এই 'সৌন্দর্য্য' এবং 'প্রেম' বিষয়ে জীবনদেবতার হস্ত হইতে যে বিশিষ্ট তত্ত্বটী লাভ করেন, তদ্বারাই তাঁহার সমস্ত কাব্যের অধ্যাত্ম ধারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। তাঁহার কাব্যসমূহের অভ্যন্তরে দৃষ্টি করিলেই, কালীদাসীয় আত্মার 'মূল প্রকৃতি' এবং প্রবৃত্তি স্ফুট-স্ফুটতর হইতে থাকে। উহা কি? আদিবন্ধের একটী ভাবপ্রবণ এবং যৌবনরস-বিলাসী আসঙ্গলিপ্সা বা 'অসামাজিক' প্রেমকে অলঙ্ঘ্য নিয়তির 'অভিশাপ' এবং 'বিরহ'ব্যাপারের মধ্য দিয়া অথবা সংযম-সাধনার মধ্য দিয়া পরিচালন

১। কালিদাস বিষয়ে ১৫৪—১৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বক নিদ্বন্দ্ব নির্ম্মল এবং বিশ্বতন্ত্রের সহিত 'সঙ্গত' করিয়া উপস্থাপন! সুতরাং, কালিদাসীয় প্রেমের পথে একটা বিরহ অথবা অভিশাপের নিয়তি-বজ্রপাত এবং 'প্রায়শ্চিত্ত-শুদ্ধি' আছেই আছে। স্ত্রী কিংবা পুরুষ উভয়কে সাক্ষাৎভাবে এই 'প্রায়শ্চিত্ত' করিতেই হইয়াছে। মালবিকা, বিক্রমোর্ব্বশী, অভিজ্ঞান শকুন্তল, মেঘদূত বা কুমারসম্ভব—সমস্তের মূল-প্রকৃতি 'কুম্পাসের কাঁটা'র মতই জীবনের 'শিব'মুখী বা সংসারের 'মঙ্গলোত্তরমুখী' হইয়া আছে! যেমন, ধরুন অভিজ্ঞান শকুন্তল। গুপ্তপ্রেম, গুপ্তবিবাহ বা 'অসামাজিক বিবাহ' মিলনের প্রতি সমাজবদ্ধ মানবনীতির 'নির্ম্মম দুর্ব্বাসামুনি'র তরফ হইতে যে নিদারুণ 'অভিশাপ' আছে, নিরীহ শকুন্তলাকে এবং অপরাধী দুষ্যন্তকে জীবন-দুর্ব্বিপাকে উহার বশেই নিদারুণ 'প্রায়শ্চিত্ত' করিতে হইয়াছে। কবি কালিদাসের লেখনী আপাততঃ শকুন্তলার প্রথম তিন অঙ্কে পরম যৌবনরস বিলাসে 'হাবুডুবু' খাইতে থাকিলেও, পরবর্ত্তী অঙ্কগুলির মধ্য দিয়া দুষ্যন্ত-শকুন্তলা উভয়কেই যম-যন্ত্রণায় নিষ্পীড়িত করিয়া পরিশেষে 'আরোগ্য স্নান' করাইয়াছে। তবে, কালিদাস পাকা শিল্পী কিনা, তাই কোথাও নীতিশাস্ত্রকে 'জগদ্দল' হইয়া উঠিতে এবং কাব্যের 'রসতত্ত্ব'কে নিষ্পীড়িত করিতে দেন নাই। তাই শিল্লাত্মার 'সত্যসুন্দর' কোথাও 'সাম্য' বিস্মৃত হইয়া একেবারে 'শিবচক্ষু' হইয়া বসেন নাই! কালীদাসীয় কাব্যের আকৃতি প্রকৃতি, জীবনের জ্ঞান-কর্ম্ম-ভাবক্ষেত্রে কবির সকল বিশেষ অনুভূতি এবং বিশেষ প্রাপ্তির সমযোগিতায়, হয় ত অতর্কিতেই পর্য্যাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার জীবনের কিছুমাত্র কাহিনীকথা ইতিহাস মুষ্টিবদ্ধ করিতে না পারিয়া থাকিলেও, দু'টী হাজার বৎসর পরেই, তাঁহার ওই 'কবি-আত্মা' ও উহার সহানুভূতির মূল গতি এবং তাঁহার 'অন্তঃপ্রকৃতি' কাব্যের গুহান্তর হইতেই আত্মপ্রকাশ পূর্ব্বক দেদীপ্যমান হইতেছে!

শিল্পের ঈদৃশ ব্যক্তিত্বের মূল ধর্ম্ম কি হইতে পারে? কবি কোন্ 'জাতি'র বা কোন্ প্রকৃতির মহাভাবের দিকে হৃদয়কে কুম্পাসের কাঁটার

ন্যায় ধ্রুবোত্তরমুখী করিয়া চালিবেন? সকল কবি-প্রেরণার পক্ষে সেরূপ একটা 'সামান্য' দিক্‌নির্ণয় বা একটা সাধারণ 'ধর্ম্মতা' লক্ষ্য করিতে পারা যায় কি? আধুনিক বিজ্ঞানের তুলাদণ্ডে উহাকে ওজন করিয়া লওয়া যায় কি? বিষয়টি গুরুতর, কিন্তু উত্তর করিব, যায়। আধুনিক কালে মনোবিজ্ঞানের উন্নতি গতিকেই এ'বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ার অবকাশ ঘটিয়াছে।

১১। শিল্প প্রকৃতির সাধারণ ধাতুনির্ণয়।

এ বিষয়ে পূর্ব্বেও সঙ্কেত করা আছে যে, আধুনিক মনোবিজ্ঞান মনুষ্যের মনোবৃত্তিগুলির যেই স্বরূপ এবং ক্রিয়াভিব্যক্তি নির্ণয় করিয়াছেন, উহা হইতেই যেমন ভারতীয় বেদান্ত-দর্শনের, তেমনি সাহিত্য-দর্শনের, সর্ব্ব প্রধান লাভটুকু দাঁড়াইতেছে। (১) আগে যাহা সন্দিগ্ধছিল, সাহিত্য দর্শন আদিকাল হইতে যে তত্ত্বের ঘোষণা করিয়াছিল, নিজের অন্তরনুভূতির বলেই যে তত্ত্ব দর্শন করিয়াছিল, অথচ স্বয়ং বৈজ্ঞানিকের ন্যায় 'জোর গলা'য় ঘোষণা করিতে পারে নাই, আধুনিক কালের 'মনোবিজ্ঞান' ভূয়োদর্শন এবং পরীক্ষাপ্রণালীর পথেই তাহাকে সেইদিকের 'সাহায্য'টুকু করিয়া গিয়াছে। মনোবিজ্ঞানের মূলপ্রাপ্তিটুকুন পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিব, এ'দিকে বিষয়টি কত সোজা ছিল; অথচ, 'অতিবড় সোজা' ছিল বলিয়াই হয়ত অত্যন্ত কঠিন ছিল। এত কঠিন ছিল যে, অনেক পাকা শিল্পী, অনেক পাকা সাহিত্য-দার্শনিকেও এ'ক্ষেত্রে মোহগর্ত্তে পতিত হইয়া গিয়াছেন!

যেমন বলিয়াছি, মনোবিজ্ঞান দেখাইতেছে যে, মনুষ্যের মন বা আত্মা নামক পদার্থটি স্বরূপতঃ অনির্ব্বচনীয় হইলেও উহার তিনটিমাত্র 'মুখ' এবং জগতের দিকে উহার ত্রিমুখী ক্রিয়া প্রণালীই প্রত্যক্ষ। জ্ঞান (Cognition) ভাব (Emotion) ইচ্ছা (Vollition) দিয়াই বৈজ্ঞানিকের 'আত্মা' বা 'মন'; মন দিয়াই মনুষ্য, এবং মনুষ্য-মনের এই তিনটিমাত্র ক্রিয়াপথ। এই ত্রিতয়

১২। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের উপার্জ্জন ফলে সমর্থিত শিল্পের সত্যশিব সুন্দর লক্ষ্য বা আদর্শ।

(১) এ বিষয়ে এই গ্রন্থের ৬০—৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বৃত্তিশীল মন লইয়াই মানুষ বিশ্বসংসারকে 'ধরিতে-বুঝিতে এবং উপভোগ করিতে' চাহিতেছে। অতএব, বিশ্বসৃষ্টির 'আদিকারণ'কেও এই 'মন'টুকু দিয়াই ত মনুষ্যকে বুঝিতে হইতেছে! যে হেতু, তাহার হস্তে অন্য উপায় বা অপর কোন 'বুদ্ধি-যন্ত্র' নাই। জগৎবাসী জীবের 'স্বকীয়' আত্মার শক্তি, বৃত্তি ও উহার পরিধি দ্বারাই সুতরাং তাহার সকল বিজ্ঞান ও দর্শন সীমাবদ্ধ। (এই পরিধি 'উত্তীর্ণ' হইবার বা আত্মার 'অতিজাগতিক' দৃষ্টি বর্দ্ধিত করিবার যেই 'আদর্শ' বা প্রণালী ভারতে আছে, এ'স্থলে তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতেছি না।) কিন্তু এইরূপে, নিজের সমস্ত চিত্তবৃত্তির সমূহিত উপার্জ্জন এবং প্রাপ্তিরূপে মানুষ কী বুঝিয়াছে? সৃষ্টি-প্রবাহের আদিকারণকে এবং আপন জীবনের লক্ষ্যকে কি বলিয়া ধারণা করিয়াছে? এবং কোন্ ধারণা ব্যতীত তাহার অপর কোন 'উদ্গতি' বা 'প্রাপ্তি' নাই? উহাও মনোবিজ্ঞানের দ্বারাই যে সমর্থিত, তাহাই দেখিতেছি। মনুষ্যের জ্ঞান-বৃত্তি কেবল বুঝাইতে পারে, এই সৃষ্টি-প্রবাহের আদিম 'নিদান' এবং বহমান গতির ভিত্তি এবং চূড়ান্ত 'লক্ষ্য' সত্য বা 'সৎ'; মনুষ্যের ইচ্ছা-বৃত্তি কেবল বুঝাইতে পারে, উহা-চিন্ময় বা 'চিৎ'; তাহার ভাব-বৃত্তি কেবল বুঝাইতে পারে, উহা 'আনন্দ'। এরূপে, মানুষের পক্ষে যাহা না বুঝিয়া উপায়ান্তর বা জ্ঞানান্তর নাই, তাহাকেই বাক্যে পরিব্যক্ত করিয়া, ভারতের প্রাচীনতম 'অধ্যাত্ম'দার্শনিক (মনুষ্যের 'দার্শনিক-চেষ্টা' ইতিহাসের প্রত্যুষ-কালে) যেন 'মাথার দিব্য' দিয়াই বলিয়া গিয়াছেন যে, বিশ্বসংসারের নিদান বা চূড়ান্তকে যদি 'মানুষের মন' দিয়া বুঝিয়া 'মানুষের ভাষা'য় উহার সমাচার ব্যক্ত করিতে হয়, তবে তাহা এক কথায়—'সৎ-চিৎ-আনন্দ'। সৃষ্টিলোকের অধিবাসী জীব আপনার মনস্তত্ত্বে এবং 'বিভু-করুণার সত্ত্বে' অনন্তশক্তিশালী বিশ্বকারণের কেবল ত্রিশক্তির মাত্র আভাস বা পরিচয় লাভ করিতে পারে—'হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সংবিৎ; যাহার আভাস—'অস্তি-ভাতি-প্রিয়ং'। বলিতে পারি, ইহা কেবল 'তর্কযুক্তি'র কথা নহে, বেদান্তের প্রাচীন দার্শনিক এ'ক্ষেত্রে 'অপৌরুষেয়'বিজ্ঞানী বেদ ও উর্দ্ধলোকবাসী 'মহাত্মাগণ হইতে প্রাপ্ত 'আগম' রূপ সাক্ষ্য দ্বারাই

নিজের এই মহাসিদ্ধান্তকে সমর্থন করিয়াই বলিতেছেন—"অস্তি-ভাতি-প্রিয়ং ব্রহ্ম, নামরূপমিদং জগৎ"। মনুষ্যের সকল জ্ঞান-কর্ম্ম-ভাব চেষ্টার চূড়ান্ত লক্ষ্যস্বরূপে 'ব্রহ্ম'কেই নির্দ্দেশ করিয়া সুতরাং বলিতেছেন—

এষোঽস্য পরমা গতিঃ এষোঽস্য পরমা সম্পদ্।
এষোঽস্য পরমোলোকঃ এষোঽস্য পরমানন্দঃ॥ ইতি॥

এই ত বিশ্বের 'চূড়ান্ত' তত্ত্বের বিষয়ে আমাদের বৈদিক দর্শন বা বেদান্তের কথা—উপনিষদের সাক্ষ্য! সুতরাং 'বাক্যকথন'শীল, মননশীল, 'ইচ্ছা-জ্ঞান-ভাব'শীল মনুষ্যের সকল বাক্যব্যাপারের আদি হইতে অন্তের 'গতি', তাহার সর্ব্ব প্রচেষ্টার, (সকল জ্ঞানকর্ম্ম-ভাব চেষ্টার) 'পরমা সম্পৎ' এবং 'পরমাপ্রাপ্তি'টাও অপর কী হইতে পারে? দার্শনিকের পরিভাষায়, সাহিত্যসেবীর সর্ব্বচেষ্টার আদ্যন্ত-মধ্যের নিদান-উপাদান এবং চূড়ান্ত 'লক্ষ্য'-রূপে (সর্ব্বসাধারণ 'ভিত্তি ভূমি ও আদর্শ'রূপে) উক্ত প্রাপ্তির কোন্ নামকরণ হইতে পারে? সাহিত্যসেবীর সমক্ষেও দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকের ভাবে কোন্ তত্ত্বটি 'আদর্শ'রূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? যেমন বলিয়াছি, প্রাচীনকাল হইতে উহাও অভ্রান্ত স্বরূপেই পরিদৃষ্ট হইয়া আসিতেছিল; কেবল নিঃসন্দেহ হওয়া যায় নাই। সাহিত্যেরও 'আদর্শ' কি? কোনও oughtness রূপে, 'ইতি কর্ত্তব্যতা' অথবা লক্ষ্য-নিরূপণ স্বরূপে দেখাইতে গেলে সেই আদর্শকে কি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়? তাহাও ত আবার ভারতের সেই সর্ব্বস্ব কথাটি, ঐ "সকলের-সব-এবং-সবার-সকল" কথাটি—জানা কথাটি—সৎ-চিৎ-আনন্দ। গ্রীকগণ কোনরূপ 'অধ্যাত্ম-যোগ' বা 'দর্শন' পথে না গিয়াও, (হয়ত অতর্কিত 'বোধি' পথেই) যাহাকে চিনিয়াছিলেন—সত্য-শিব সুন্দর! "The True, the Beautiful and the Good" উহাতে কেবল একটিমাত্র 'টীপ্পনী' হয়ত বাকী থাকে—'শিবং' কেন? মনুষ্যের ইচ্ছা তত্ত্বকে, চিৎ তত্ত্বকে, লক্ষীভূত করিতে গেলেই (১) সাহিত্যের আদর্শ হয় 'শিবম্'। সাহিত্য কোনরূপ বাহ্যিক,

(১) যথাস্থানে দেখিব যে, সাহিত্যকে গৌণ বা মুখ্যভাবে মনুষ্যের ইচ্ছাতত্ত্বকে লক্ষ্যকরা ব্যতীত অনেকসময়েই 'ছাড়া' নাই—উপায়ান্তর নাই।

বহিরিন্দ্রিক বা দৈহিক আনন্দকে চাহিবে না; চিনি-মিষ্টি অথবা 'রসগোল্লা'র 'ভোগ'জাতীয় সুখকে অথবা স্নায়বিক আনন্দকে, কিম্বা 'কামানন্দ'কেও লক্ষ্য করিবে না; আধ্যাত্মিক, মানসিক, চিন্ময়পথিক আনন্দকেই আদর্শ করিবে। সারস্বত পথে ঐরূপ 'আনন্দ'-লক্ষ্য সুসিদ্ধ করিতে হইলেই সাহিত্যের আদর্শ হয় 'শিবম্'। সুতরাং, এই স্থানে দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছি না যে, সাহিত্যের এই 'আদর্শ'র সঙ্গে, মনুষ্যমনের বা মনুষ্যজীবনের ঐহিক পারত্রিকের যাবতীয় ক্রিয়া-ভাব কিংবা জ্ঞান আদর্শের অথবা 'ধর্ম্মক্ষেত্রীয়' চরান্ত লক্ষ্যের কোনও দিকে কিছুমাত্র 'বেমিল' ত নাই-ই; পরন্তু, সাহিত্য নিরাবিল ভাবে এবং প্রকাশ্যতঃ, মনুষ্যের 'অন্তিম লক্ষ্যো' গতি, উহার ধারণা এবং 'প্রাপ্তি'রই সাহায্য করিতেছে! ভারতের বেদান্ত আদর্শে যেমন সাহিত্যের, তেমন বিশ্বজগতের তাবৎ নিদানও উপাদানবস্তুর চরমের লক্ষ্য এবং প্রাপ্তি—সৎ-চিৎ-আনন্দম্। এ'দেশের 'ঋষি'শিষ্য, অদ্বৈতবাদী বেদান্তের শিষ্য, প্রাচীন সাহিত্যদার্শনিক বিশ্বনাথ কি পরম উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া যান নাই যে, সাহিত্যের লক্ষীভূত ওই 'রসানন্দ' টুকুন 'ব্রহ্মানন্দ সহোদরঃ'? পুনরুক্তি করিয়াও এস্থলে বলিব যে, সাহিত্যের ওই 'রস'-সিদ্ধি, সাহিত্যের 'সৌন্দর্য্য'বাদ বা 'আনন্দ'নিয়তির 'পরমাগতি' এবং 'পরমা সম্পৎ' যাহা, তাহা

সত্ত্বোদ্রেকাৎ অখণ্ডস্ব-প্রকাশানন্দ চিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ॥

আমাদের জাগরণার্থে একই অর্থের পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ করাও প্রয়োজন হয়। বিশেষতঃ এ'কালে সাহিত্যের 'আদর্শ বোধ' এবং কর্ত্তব্য নিরূপণের ক্ষেত্রে, আমাদের নিত্যনিয়ত ভ্রম ঘটিতেছে, ভ্রান্তির কুফল একেবারে অসহ্য হইয়াছে। বলিয়াও পুনরুক্তি অপরিহার্য্য। অনেক সরল প্রাণ, সত্যজিজ্ঞাসু এবং তত্ত্বপিপাসু পাঠক এবং শিল্পী বা কবিও ভ্রমের দৃষ্টান্ত হইতেছেন! সর্ব্বপ্রধান ভ্রম এই যে, আমরা মনে করি,

১৩। সত্যশিবসুন্দর তত্ত্বের সামঞ্জস্য ব্যতীত শিল্পের 'প্রকৃতি'র আদর্শ দাঁড়াইতে পারে না।

কেবল 'সত্য'ই সাহিত্যের লক্ষ্য; অথবা কেবল শিব বা সৌন্দর্য্যই সাহিত্যের আদর্শ। এই ভুল আমাদের একজন 'বড় কবি'ও করিয়া গিয়াছেন! আধুনিক ইউরোপের অনেক সাহিত্যসেবী কেহবা অ-চিন্তা ও 'অ-তর্ক'বশে, কেহবা একেবারে বিদ্রোহের বশেই উক্ত ত্রি-তয়ের 'একতম'কে 'সাহিত্যের আদর্শ' বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্র হইতেই দেখিতেছি, মনুষ্যমনের ত্রিতয় বৃত্তির সমান ক্রিয়া এবং সামঞ্জস্য ব্যতীত যেমন মনের 'তত্ত্ব' ও মনের কোন ক্রিয়াই দাঁড়াইতে পারে না, যেমন মনের কোনও 'বৃত্তি'র অভিব্যক্তি সিদ্ধ হয় না, যেমন 'মনুষ্যত্ব' সিদ্ধ হয় না, যেমন মনুষ্যের 'ব্যক্তিত্ব'ও সিদ্ধ হয় না, তেমন, ঐরূপ সামঞ্জস্য ব্যতীত সাহিত্যনামক 'ব্যক্তির' আদর্শ কিম্বা মাহাত্ম্যও সিদ্ধ হয় না। এই কথাটুকুন সকল দিকে বুঝিলে সাহিত্যজগতের অনেকানেক 'বিপুল ভ্রম' ও তাহার কুফলের মূলোচ্ছেদ হইতে পারে। অতএব এ বিষয় এবং ত্রিতত্ত্বের উক্ত সামঞ্জস্যের মধ্যে একটা ক্রম এবং অনুপাত যে আছে, তাহা পরিদর্শন করাই বর্ত্তমান প্রসঙ্গের প্রধান উদ্দেশ্যরূপে দাঁড়াইতেছে।

(খ)

১৪। একান্ত ভাবে সত্যই সাহিত্যের আদর্শ নহে।

সত্যই সাহিত্যের একান্ত আদর্শ নহে; সাহিত্য তা'হইলে ইতিহাস, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, ধর্ম্মশাস্ত্র ও রাষ্ট্র বিধির ক্ষেত্রে, এমন কি, একেবারে গ্যানো সাহেবের Physics এর ক্ষেত্রেই অতিব্যাপ্ত ও অত্যাচারী হইতে পারে। এই কথা শোনামাত্র আমাদের অনেকের মনই হয়ত তৎক্ষণাৎ 'সায়' দিবে—তাইত, 'কেবল সত্য' কদাপি সাহিত্যের আলম্বন নহে। কিন্তু, মনে রাখিতে হইবে, এ'স্থানেই সাহিত্যক্ষেত্রে একটা প্রকাণ্ড 'ভ্রম'—সর্ব্বপ্রধান ভ্রম—যেমন পাঠককে, তেমন কবিকেও পাইয়া বসে। কার্য্যক্ষেত্রে সত্যমুখ্য রচনাই অনেকসময় সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকে। ইউরোপে, একেবারে, Realism (সত্যবাদ) Naturalism

(প্রাকৃতবাদ) ইত্যাদি নামেই নিজের আদর্শঘোষণায় অসংখ্য গ্রন্থ প্রতিমাসে মুদ্রাযন্ত্র হইতে উদ্গীর্ণ হইতেছে। সমাজতত্ত্ব, সমাজ সংস্কার বা নিরবচ্ছিন্ন 'প্রচার' (Propaganda) আদর্শকে মুখ্য করিয়াই এ সকল গ্রন্থ শিল্পসাহিত্যের 'মুখশ'পরিধানে অবতীর্ণ হয়। ধর্ম্মপ্রচারের আদর্শও আছে। উহাদের প্রকৃতি এত প্রত্যক্ষ যে, উহাদের অ-সাহিত্য উদ্দেশ্য এত প্রবল যে ইয়োরোপীয় সাহিত্যের পাঠকের নিকট আর 'নাম করিয়া' নির্দ্দেশের আবশ্যক হয় না। রেনল্ড্, জোলা, বাল্জাক্ প্রভৃতি শক্তিশালী লেখকগণও 'প্রাকৃতবাদ'কে অবলম্বন পূর্ব্বক সাহিত্যক্ষেত্রে এইরূপ 'অত্যাচার' করিয়াছেন। আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রও স্বয়ং তাঁহার শেষবয়সের 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' প্রভৃতি গ্রন্থে (সাংপ্রদায়িক ধর্ম্ম না হইলেও) একটা 'ধর্ম্মধ্বজা' ধরিয়াই 'শিল্প' ক্ষেত্রে এই অত্যাচার করিয়া গিয়াছেন। বলিতে কি, একা মধুসূদন ব্যতীত বঙ্গসাহিত্যে অপর কোন 'বড় কবি'ই হয়ত এই অভিযোগ হইতে মুক্ত নহেন। সাহিত্যের সত্যকে যুগপৎ 'সুন্দর' এবং 'শিব' উভয়েই হওয়া চাই। কেবল সত্য আদর্শ বা কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক লক্ষ্য মুখর হইয়া আপনার উদ্দেশ্য 'প্রবল' করিলেই উহার নাম হয় 'শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যভিচার'—তাহা যত সদুদ্দেশ্যেই হউক না কেন।

'মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণী, অথবা 'সমাজের ব্যাধি নিরূপণী' রীতিও যে প্রকৃত প্রস্তাবে সাহিত্যের আমলে আসে না, তাহা উহাদের নামেই প্রমাণ করে। এ সমস্ত মনোবিজ্ঞান এবং সমাজ বিজ্ঞানকেই ত নিজের প্রধান উপজীব্য রূপে ধরিয়াছে! মনে করুণ, জেল বিধির সংস্কার বা দাসত্ব প্রথার বর্জ্জন কিংবা দাম্পত্য আদর্শের প্রসার অথবা লোকস্থিতির দর্পণ প্রভৃতি উদ্দেশ্যকে মুখর করিয়া কেহ যদি কোন নাটক-নবেল-উপন্যাস রচনা করেন, তাহা হইলে, তিনি সে উদ্দেশ্যে যে পরিমাণে সফল হইবেন সে পরিমাণেই 'সাহিত্য-আদর্শ' হইতে ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে; সে পরিমাণেই রস কিংবা সৌন্দর্য্যকে গুণীভূত করিয়া

১৫। 'সত্যের বিশ্লেষণ' 'দর্পণ' অথবা 'সংস্কার' প্রভৃতি আধুনিক আদর্শ।

'শিক্ষকের কার্য্য'কেই মুখ্য করিতে হয়। শিল্পীর দাবী রাখিয়া পাঠকের সমক্ষে যে 'প্রমূর্ত্তি' ধরা হইতেছে, তাহা হয়ত এত 'পাতলা' এবং স্বচ্ছ যে উহাতে 'রস প্রত্যয়'কে একেবারে ছিন্নভিন্ন করিয়া শিল্পীর অ-সাহিত্যিক উদ্দেশ্যের (Purpose) 'ভিতর বাড়ীর' কল-কব্জাকৌশল এবং হাতিয়ার গুলি পর্য্যন্ত পরিদৃশ্যমাণ করিয়াই ইষ্টনাশ করিতে থাকে! 'বিশ্লেষণী রীতি'র গ্রন্থ যে কুত্রাপি শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর সাহিত্যশিল্প রূপে দাঁড়াইতে পারে না, বা পারিবে না, এমন 'সাহসোক্তি করিতে চাই না; কেন না, কবিপ্রতিভা অনেক সময় 'অসম্ভবকেও সম্ভব' করিতে পারে। কিন্তু, আধুনিক ইয়োরোপের 'বিশ্লেষণ'শিল্পের দৃষ্টান্ত মনকে আশ্বস্ত করিতে পারে নাই। উহাতে 'শিল্পের আকৃতি' আদর্শকে একেবারে পদদলিত করিয়া, শিল্পের আলম্বন বস্তু এবং অবয়ব পদার্থকে এত 'জলীয়' এবং 'নিরাকার' করিয়া তোলে যে, ঐ সকল গ্রন্থ না-বিজ্ঞান, না-দর্শন, না সাহিত্য! সকল 'তত্ত্ব কচকচির' শেষ পৃষ্ঠায় একবার আসিয়া গেলে, অথবা লেখকের সমস্যা-নিরূপণটা একবার বুঝিয়া লইলে পরে গ্রন্থটির আর কোন আকর্ষণই যেন থাকে না! বলিতে কি, এই 'বিশ্লেষণী রীতি'র মধ্যে, কেবল 'মনস্তত্ত্বের সত্য' আদর্শকে অনুসরণ করিতে যাওয়াতেই সাহিত্যের আকৃতি-তত্ত্বের পরম ব্যভিচার ঘটে। এ সকল 'সত্যবাদী' লেখক যেন বলিতে চাহেন যে, আকৃতিবস্তুকে অসামঞ্জস্যময় 'ধোঁয়া-ধোঁয়া' বা 'ছায়া-ছায়া' না করিলে রচনায় 'মনস্বিতা' এবং অধ্যাত্মধর্ম্ম উজ্জ্বল করিতে পারা যায় না; অতএব 'বিশ্লেষণ শিল্প' বেশী-কম 'নিরাকার' হওয়াটা অপরিহার্য্য। সঙ্গীত এবং গীতিকবিতার ক্ষেত্রেও এরূপ 'নিরাকার' ভাবুকতা এত প্রবল হইয়া গিয়াছে যে, উহা সাহিত্যের 'অর্থ'-আদর্শকেও পদদলিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে! এমন কি, নাট্যক্ষেত্রেও নিরাকার আদর্শ উপপন্ন! ইব্‌সেন, জর্নসন, ষ্ট্রীণ্ড্‌বর্গ, আঁদ্রে ইউপ্ প্রভৃতির অনেক 'স্থান-কাল নির্দ্দেশবিহীন' আধুনিক নাটক, এবং মৈতর্‌লিঙ্কের 'নাট্য মায়া-পুরী' কেবল স্ফুট আকৃতিহীন এবং 'আস্থানিক' সত্যবাদ, 'সংস্কার'-বাদ অথবা সত্যের ঈশারা-ইঙ্গিত এবং সঙ্কেত উদ্দেশ্য করিয়াই রচিত!

কেবল ভাবুকতায় উপর ভাবুকতাকে উপন্যস্ত করিয়া ক্ষণবিধ্বংসী চিত্ত-সংস্কারের ছায়াবাজী রচনা করার একটা প্রচেষ্টা মৈতর্‌লিঙ্কের মধ্যেই প্রথম লক্ষ্য করা গিয়াছে। আপাতদর্শনে এই সকল শিল্পের যেন 'দেশকাল-পাত্র'গত প্রকৃত কোন ভিত্তি কিংবা নির্ভর নাই। যে-কোন কাল, যে-কোন দেশ, যে-কোন জাতি—এ'প্রকার একটা 'নির্দ্দেশনা' ও প্রস্তাবনার উপর ভিত্তি করিয়া আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্যে এমন অনেক 'নাট্য শিল্প' বিরচিত হইতেছে, যাহাতে অনভিজ্ঞের মনে হঠাৎ একটা ধাঁধা লাগিতে পারে যে, শিল্পে আকৃতি-অবয়ব-বস্তুর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। কিন্তু, তলাইয়া দেখিলে বুঝিব, অনেকস্থলে সে'সমস্ত শিল্পেরই একটা (অস্বীকৃত হইলেও) অস্পষ্ট আকৃতি আছে, অনির্দ্দিষ্ট হইলেও 'স্থান-কাল'ধর্ম্মের একটা পরিবেষ্টনী এবং ভাবের 'আবহাওয়া' আছে যাহা ব্যতীত উহাদের 'দাঁড়ান'ই অসম্ভব ছিল। নাম করিতে হইলে, বলিতে পারি, উহার নাম 'খৃষ্টানী কর্ষণা' বা 'বিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপের 'নিত্য-নবতা প্রয়াসী' এবং 'প্রাচীনতা-বিদ্রোহী' একটা আবহাওয়া। এই অতর্কিত এবং 'সর্ব্বজানিত' ভিত্তি ভূমির উপরেই যে উক্তসমস্ত রচনার যৎকিঞ্চিৎ যাহা 'সামর্থ্য' তাহাই নির্ভর করিতেছে! 'আকৃতি'আদর্শের বিচারকালে পূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি যে, এরূপ 'আস্থানিক' রীতি এবং রচনার ঐরূপ 'তুরীয়পদ্ধতি' শিল্পের 'রস-প্রত্যয়ের' ক্ষেত্রে বাস্তবিকপক্ষে কোন 'গুণ' নহে—প্রকৃত প্রস্তাবে 'দোষ'। এ'রূপ 'আদর্শ-বিরোধ' এবং সংকটের ক্ষেত্রেই সাহিত্যের 'চিরকালের শিল্পি-গণ'কে মনে পড়ে। 'ক্লাসিক' বা 'বস্তুত্তম'রীতির প্রথমশ্রেণীর কবিগণের দিকে সেক্‌স্‌পীয়র এবং স্কট্ প্রভৃতির দিকেই ফিরিয়া দৃষ্টি যায়! কবি ইব্‌সেন 'প্রাকৃতবাদী' হইয়া তবু আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু, তাঁহার শিষ্য বার্ণার্ড্‌ শ' এবং গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দী প্রভৃতিকে প্রাচীনগণের সমক্ষে, কেবল সোসিয়ালিজমের 'থিওরী'বাদী বলিয়া এবং কেবল নিজের 'উদ্দেশ্য-খেয়ালী' Pamphletoer বা 'সন্দর্ভপঞ্চানন' বলিয়াই মনে হইতে থাকে! মনে হয়, ইঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ কৃতিত্ব কেবল তত্ত্ব-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে; 'থিওরী প্রেম'ও মৌলিকতার অভিমানে, সামাজিক বা নৈতিক সমস্যাদর্শনে

এবং 'সংস্কার'-বক্তৃতায়; উদ্দেশ্যানুযায়ী 'ঘটনা' ও চারিত্ররচনায়; অথবা (নাটকের রীতিতেই) আত্মমতলবী আদর্শের 'দর্পণ' বা 'প্রতিকৃতি' ধারণায়। কেহ 'উৎকৃষ্ট' শ্রেণীর সাহিত্যশিল্পী এবং কবির 'সমকক্ষ' হওয়া ত দূরের কথা, 'নিকটবর্ত্তী'ও নহেন। 'পাশাপাশি' রাখিয়া 'তুলনায় দৃষ্টি' ব্যতীত, কখনো 'সাহিত্য শিল্প' বা 'কাব্য' নামক পদার্থটীর স্বরূপ এবং শেকস্-পীয়র প্রভৃতির 'মাহাত্ম্য'টুকু পরিস্ফুটভাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে না। বার্ণার্ড শ' স্বয়ং নিঃশঙ্ক এবং নির্লজ্জভাবেই শেকস্পীয়রের 'শিল্প' আদর্শ আক্রমণ করিয়াছেন; শেকসপীয়রের মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিয়াই যেন নিজকে বাড়াইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন! আবার, ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি স্বয়ং একজন Artist Philosopher! অনভিজ্ঞের দৃষ্টিতে, আপাততঃ, এরূপ 'হামবড়া'-হুঙ্কারকারী বার্ণার্ড শ' এবং গল্স্‌ওয়ার্দ্দি প্রভৃতিই 'আধুনিকতা'র ক্ষেত্রে, তথাকথিত 'প্রকৃতবাদ ও সত্যসন্ধতা'র ক্ষেত্রে সবিশেষ 'অগ্রগামী' এবং 'বেশী জান্তা' বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারেন। যাঁহারা কেবল 'উপস্থিতের হুমকি'তেই আবিষ্ট হন, তাদৃশ সহজমুগ্ধ এবং অসতর্কের দৃষ্টিতে শিল্পক্ষেত্রে কেবল বিদ্যাসর্ব্বস্ব, 'থিওরী'মত্ত এবং বাহ্বাস্ফোটকারী এ'সকল বক্তৃতাবাগীশকে শেলী-কীট্‌স অপেক্ষা 'বড় কবি' বলিয়া প্রতীতি হইতে পারে; কেবল সমাজতত্ত্ব-পিপাসিত অথবা 'অর্থনীতির সমস্যা'লুব্ধ পণ্ডিতমানুষের দৃষ্টিতে যেমন সাহিত্যের সরযূ বালাকেও 'রবি কবি' অপেক্ষা গভীরজল-সঞ্চারী বলিয়া ধাঁধা লাগিতে পারে!

সত্য! মনে রাখিতে হয়, সত্য ব্যতীত সাহিত্য নাই; কিন্তু, এই সত্যের উপাদান এবং উহার অনুপাতটুকু সাহিত্যশিল্পের 'প্রমূর্ত্তনা'মধ্যে প্রধান নহে। আধুনিক ইয়োরোপের সাহিত্যে এই সত্যবাদ যে সাহিত্যের গঠনে এবং আকৃতি প্রকৃতিতে 'শিব' ও 'সৌন্দর্য্য'-অনুপাতের 'বৈরূপ্য' ঘটাইয়া একেবারে কাব্যতত্ত্বের বিদ্রোহীরূপেই প্রকাশ পাইতেছে, তাহা আধুনিক কালের লেখক এবং পাঠককে প্রতিনিয়ত

১৬। 'দার্শনিকতা' ও 'প্রাকৃতবাদ' প্রভৃতি আধুনিক আদর্শ।

মনে রাখিতে হয়। 'প্রাকৃত'বাদী নবেল-লেখকগণের কথা দূরে থাকুক, আধুনিক 'কবি'সম্প্রদায়ের মধ্যেও বরং এ'দিকে একটা নিদারুণ ভ্রান্তিই মুখর হইয়া উঠিয়াছে! স্বয়ং কবি ব্রাউনীংএর মধ্যে এই 'সত্য'আদর্শ টুকু নানাস্থানে মারাত্মক হইয়া গিয়াছে। ধরুন, Ring and the Book। একেবারে প্রাকৃত সত্যকেই মুখ্য করিয়া, 'সত্যবিজ্ঞান'কেই কাব্যচেষ্টার প্রধান লক্ষ্যরূপে ধরিয়া, মনোবিজ্ঞানকে সন্মুখে রাখিয়া, অগ্রে 'গদ্য'কথায় সমগ্র ব্যাপারটি লিখিয়া, পরে উহাকে পদ্যে রূপান্তরিত করার চেষ্টা! জীবনী পাঠে জানা যায়, এই অদ্ভুত এবং হতভাগ্য প্রণালী নাকি ব্রাউনীং অনেক সময় অবলম্বন করিয়াই তাঁহার বহু কাব্য রচনা করিয়াছেন! প্রাণের ভাব-গতি বা Feelingকে, Emotion বৃত্তির উজ্জীবনা এবং প্রত্যাবেশকে গৌণ করিয়াই কাব্য রচনা! এমন অদ্ভুত ব্যাপার ইংলণ্ডের এই তত্ত্বপ্রাণ, বুদ্ধিপ্রধান এবং মনস্বী কবির পক্ষেই সম্ভব হইয়াছিল। ব্রাউনীংএর অনেক রচনার অভাবনীয় বৈরূপ্য এবং বিরসভাব, উহাদের নির্জ্জীব 'কথাবার্ত্তা'র রীতি, উহাদের প্রাকৃততন্ত্র ও অমুচ্চকণ্ঠ, উহাদের মধ্যে যত সমস্ত 'মনমরা' এবং 'জীয়ন্তমরা'র ন্যায় 'হাল-হরিপত'—এ সকলের 'আদি রহস্য' হয়ত এ'স্থানেই মিলিবে।

সত্যের ক্ষেত্রেই অপর একটি বড় কথা এইযে, জড়জগতের প্রত্যক্ষ বস্তুজাতের সঙ্গে সাহিত্যের 'মুখ্য সম্বন্ধ' নাই। বিশ্বজগৎ মনুষ্যের মনে আসিয়া যেই ছবি—যেই Impression—ধারণ করে, সাহিত্য উহা লইয়া ব্যাপৃত। অতএব, যে হিসাবে ফটোগ্রাফী 'চিত্র শিল্প' নহে; সেই হিসাবে, নিরবচ্ছিন্ন প্রাকৃত 'নকশা' বা অনুকরণী রচনাও 'কাব্যশিল্প' নহে। 'সাহিত্যের সত্য' হইতেছে জগতের সঙ্গে মনুষ্য-মনের সম্পর্ক-গত সত্য; এবং 'সত্য' মনুষ্যের মনের মধ্য দিয়া আসিতে গেলেই আর 'প্রকৃত' থাকে না। অতএব, স্থিরজ্ঞানেই বুঝিতে হয়, সাহিত্যের 'প্রকাশ'ক্ষেত্রে Realism, Naturalism প্রভৃতি সংজ্ঞা কেবল 'কথার কথা', একদেশী গোঁয়ার্ত্তমী', অহংকারের ও আত্মম্ভরতার সাহসোক্তি এবং কোন

শিল্পীর পক্ষে (হয়ত অতর্কিতেই) এক-একটা আত্মবঞ্চনার ব্যাপার ব্যতীত আর কিছুই নহে। আরও মনে রাখিতে হয় যে, প্রকাশক্ষেত্রে Classicism ও Romanticism বলিয়া আদর্শবাদ অল্পেই শিল্পীর 'আত্ম-বঞ্চনা' রূপে দাঁড়াইয়া যায়; এবং আধুনিকের 'সত্য' ও 'প্রকৃত' প্রভৃতিও বস্তুতঃ আধুনিক শিল্পীর সেই 'ঘৃণিত পদার্থ'—Romance। ইয়োরোপের সাহিত্যময় এখন প্রকৃত প্রস্তাবে Romanticismই 'ঢলাঢলি' করিতেছেন! 'প্রাকৃত' ও সত্যের নাম দিয়া লেখকগণ সকলে আপন মনের 'মায়া জাল'ই বুনিতেছেন। সকলে নিজ-নিজ 'মতলব মাফিক' আদর্শটুকুই প্রতিফলিত করিতেছেন। 'প্রাকৃত'বাদীগণ যেই সত্যের বা প্রকৃতের বড়াই করেন, তাহাও বস্তুতঃ সংসারে কিংবা সমাজে কুত্রাপি নাই। তাঁহারাও নিজের মতলবী বুদ্ধির বশেই, চারিদিক চাহিয়া, নিজের মতলবের খোরাক সংগ্রহ এবং আকর্ষণ পূর্ব্বক, নিজের অভিসন্ধি-অনুযায়ী সাহিত্যিক 'প্রমূর্ত্তি'ই গঠন করিতেছেন। সকল প্রাকৃতবাদী শিল্পীর প্রত্যেক পৃষ্ঠাতেই এরূপ রোমান্সের দৃষ্টান্ত মিলিবে। একদিকে বার্ণার্ড শ' অন্যদিকে এমিলী জোলার (দু'জনেই নামজাদা লেখক) যে কোন গ্রন্থ গ্রহণ করুন। অধিকাংশই 'রোমান্স্'—তবে একেবারে 'মৃত্তিকাভোজী' এবং 'মাটী ঘেঁশা' রোমান্স্! তাঁহাদের লেখনী-অঙ্কিত অনেক পাত্রের জীবনই, বলিতে গেলে, মনুষ্যত্বের ক্ষেত্রে কেবল 'জন্তুধর্ম্মী' ব্যক্তির বা নীচ-শঠ-লম্পট-ধূর্ত্ত ও আত্মাভিমানী এবং আত্মম্ভরীর 'রোমান্টিক' জীবন! মানবাত্মার 'ধর্ম্মজীবন'কে, মনোজীবন এবং অধ্যাত্মজীবনের 'ক্ষুধা-তৃষ্ণা'-অতৃপ্তি বা পরিতৃপ্তিকে একেবারে 'কোণায় ঠেলিয়া', উহাকে কেবল একটা 'তুরীয়ভাব' ও 'ভাবুকতা' বলিয়া অবজ্ঞাপূর্ব্বক তাঁহারা কেবল মনুষ্যের 'পশু-সাধারণ' প্রবৃত্তি গুলিকেই মুখ্য এবং 'সারাৎসার' ধরিয়াছেন; মনুষ্যের পাশব বৃত্তি গুলিকেই মনুষ্যের 'স্বধর্ম্ম' বলিয়া অবলম্বন এবং ঘোষণা করিয়াছেন! 'পশু ধর্ম্ম'ই না কি 'খাঁটি মনুষ্যত্ব'! এ'ত বড় 'মতলবী' উক্তি এবং 'মনুষ্যতা'বিষয়ে ইহাপেক্ষা মিথ্যা উক্তি আর হইতে পারে কি না, মানুষের পক্ষে ইহাপেক্ষা অধম 'নেকারেত' ও মিথ্যা

অপবাদ অপরকিছু সম্ভবপর কি না, সেকথা প্রমাণের জন্য কষ্টস্বীকারের সময় অন্ততঃ ভারতবর্ষে এখনও আসে নাই।

সকল 'সত্য'ই সমান ওজনের নহে। আবার, সকল সত্য সাহিত্যের আলম্বন বা উদ্দীপন হইবার যোগ্যও নহে। 'দুয়ে দুয়ে মিলিয়া চার' হয় বা 'দশ হইতে পাঁচ গেলে পাঁচ থাকে' এ সমস্তই 'সত্য' সন্দেহ কি? কিন্তু ওইরূপ সত্যে সাহিত্যের 'আমল' নাই। সেরূপ, গণিতবিজ্ঞান ও বা ভূত বিজ্ঞানের সত্যেও সাহিত্যের অধিকার পরিব্যাপ্ত নহে। আবার, কোনও সত্য এত প্রতীয়মান এবং সুলভ যে আপনা হইতেই সাহিত্যের আমল হইতে বহির্ভূত হইয়া আছে। মানুষের বাস্তবজীবনের অনেকানেক সত্যও হয়ত এত প্রাকৃত, এত নিম্নশ্রেণীর এবং কদর্য্যগন্ধী যে, আপনা হইতেই সকল রসানন্দবুদ্ধির বা সৌন্দর্য্য-বুদ্ধির সংহারক বলিয়া সাহিত্যে নির্ব্বাসন-দণ্ড লাভ করিয়াছে।

১৭। সাহিত্যক্ষেত্রে সত্যের আদর্শ।

তার পর, কপট অথবা 'মেকী' সত্যও হইতে পারে। 'এক পয়সা'র তাম্র খণ্ডের উপরে 'মূল্য ষোল টাকা' লিখিয়া সাধারণ্যে 'মোহর' রূপে চালাইতে পারা যায় না। স্থান কাল অবস্থা গতিকে কিছু কাল চলিলেও, সাহিত্যের চিরন্তন ভাণ্ডারে উহা একদিন-না-একদিন নিজের যোগ্য পদবী এবং ব্যবহার লাভ করিবেই। সত্যের দীপ্তি এবং ওজস্বিত্ব, মহত্ত্ব এবং দুর্লভতার উপরেই সাহিত্যে সত্যের প্রাথমিক 'দৃষ্টি মূল্য' নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে; সামাজিকের সম্বন্ধে উহার কৌলীন্য, পবিত্রতা এবং মাহাত্ম্যের ওজনেও 'মূল্য' স্থির হয়।

আবার, কবির 'হৃদয়' এবং গ্রাহিকাবুদ্ধি, তাঁহার দৃষ্টি এবং লেখনীর প্রবৃত্তি ও ঝোঁক হইতেও সত্যের প্রকৃতি, সত্যের উপস্থাপনা ও প্রমূর্ত্তি নিদারুণ ভাবে বিগঠিত এবং কলুষিত হইতেও দেখা যায়। এ সকল উক্তির প্রত্যেক অংশের যাথার্থ্যই প্রচলিত সাহিত্যের ক্ষেত্র হইতে দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে। লেখকের সত্য-প্রেম ও সত্য-ভক্তি হইতেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সত্যের উপস্থাপনা অপরূপ বর্ণিমা এবং মহার্ঘতা লাভ

করিতে পারে। ফলতঃ, শিল্পীর পরিচালক উদ্দেশ্য (motive) হইতে তদবলম্বিত সত্যের মূল্য সীমাবদ্ধ হইতেও দেখা যাইবে। অবস্থাবিশেষে, অত্যন্ত 'সামান্য ক্রিয়াকর্ম্ম' পর্য্যন্ত ভাববত্তা এবং পরিবেষের সম্বন্ধে আসিয়া যোগ্যতা লাভপূর্ব্বক মহীয়ান্ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। এস্থলে, যোগ্যতা-বুদ্ধি এবং যোগ্যতা-সংঘটনের উপরেই শিল্পের মাহাত্ম্য। অনন্ত ও অচিন্ত্য যোগ্যতাবুদ্ধিশালী ভগবৎশিল্পীর এই সৃষ্টি মধ্যে, সত্যশিবসুন্দরের রাজত্ব মধ্যে 'সকল সত্যই সুন্দর', 'পূর্ণের রাজত্বে সমস্তই পূর্ণ', ভক্তগণ এ কথা বিশ্বাস করেন। তর্ক-যুক্তি এবং হৃদয়ের 'বোধি'ও উক্ত 'তত্ত্বে' প্রবোধ জন্মাইতেছে। কিন্তু, স্থূলদৃষ্টি ও স্বল্পবুদ্ধি মনুষ্যের চক্ষু জগতের 'সম্পূর্ণ'কে দেখে না; সীমাসন্তুষ্ট কবি কিংবা শিল্পীর নেত্র ততদূর যায় না বলিয়াই, জগতে 'অর্দ্ধসত্য' যেমন দেখা যাইতেছে; কদর্য্য এবং 'অসুন্দর' সত্যও প্রতীয়মান হইতেছে। জীবের 'সর্ব্বসম্পূর্ণ', 'সর্ব্বসম্মত এবং 'সর্ব্বসঙ্গত' দৃষ্টির অভাবগতিকেই 'কদর্য্য সত্য' সম্ভবপর হইয়াছে। এবং 'সত্য'কেও সৌন্দর্য্য-চমৎকারী প্রবর্ত্তনায় উপস্থিত করা ব্যতীত 'উৎকৃষ্ট সাহিত্য' দাঁড়াইতেছে না।

লেখকের দৃষ্টি কিংবা পাঠকের সহানুভূতি-সংঘটনার উপরেই সত্যের মূল্য কি পরিমাণে নির্ভর করিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত, বঙ্গসাহিত্যের 'চৈতন্যচরিত' গ্রন্থ সমূহ। শ্রীচৈতন্যের অত্যন্ত সাধারণ ক্রিয়া-কর্ম্ম পর্য্যন্ত ভক্ত-হৃদয়ের প্রেমরাগে এবং দিব্যধর্ম্মে জ্যোতির্ম্ময় হইয়াই যেন 'লীলা'রূপে উপস্থিত! কবিগণ সাহংকারে বলিতেছেন—

চৈতন্যের হাটে নিত্য ঝাড়ুগিরি করি!

এ স্থলে ঝাড়ুদারের কদর্য্য কর্ম্মটী পর্য্যন্ত প্রেমাভিমানে মহোদ্দীপ্ত হইয়া ভাবলোকে দাঁড়াইয়া যাইতেছে।

আবার, লেখকের 'ভাও'দোষে, তাঁহার কদর্য্য আত্মাভিমান হইতেও যে সত্যের 'প্রকাশ' কদর্য্য এবং কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে! তাঁহার ছন্দটী হৃদয়ের ভাবস্পন্দন প্রকাশ না করিয়া বরং নিজের কারিকরীর দিকেই মনুষ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে থাকে! তিনি যে একটা অসাধারণ 'কসরৎ'

করিতেছেন, পাঠকের মনে কেবল সে'রূপ ধারণাই জাগাইতে থাকে। তিনি যে নিজকে একজন 'বড় কবি' অথবা সত্যদর্শী ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন, অনেকের রচনায় ভাবে-ভঙ্গীতে সহৃদয়ের মনে তাহাই অতর্কিত পথে মুদ্রিত হইয়া গিয়া এবং স্বয়ং কবিটীর প্রতিই পাঠকের বিদ্রোহবুদ্ধি চেতাইয়া তুলিয়া, তাঁহার কাব্যের 'সত্যমূল্য' হ্রাস করিতে থাকে; সত্যের উপস্থাপন 'রসাল' না হইয়া বরং 'বেদনার কারণ' হইতে থাকে।

যেমন সকল সত্যই সাহিত্যের বিষয় নহে, তেমন সত্যমূর্ত্তনের সকল প্রণালীও সাহিত্যের আমলে আসে না। বাস্তবসত্যের কেবল ফটোগ্রাফ বা 'হুবহু প্রতিকৃতি' ঘটনাও সাহিত্যের আমলে কদাচিৎ আসিতে পারে। আবার, 'ছন্দ' সাহিত্য-জগতে ভাব প্রকাশের একটা প্রণালী—শ্রেষ্ঠ প্রণালী। মনুষ্যচিত্তে ভাবের পরিস্পন্দের মধ্যেই যে একটা ছন্দ আছে, কাব্য উক্ত ভাব-চ্ছন্দকে আয়ত্ত করিয়াই 'ভাবের উদ্দীপক' সত্যটুকু প্রকাশ করিতে চায়। ছন্দোবন্ধী ভাষা নিশ্চয়ই একটা Verisimilitude নহে; অথচ, উহাই ত সাহিত্যে ভাব-প্রকাশের প্রধান 'ঋত' (Law) ও সর্ব্বস্বীকৃত 'রীতি'। কবিয় বাক্য-রীতির মধ্যেও যে একটা ছন্দ আছে, বিভিন্ন কবির লেখনীগত 'গন্ধ'মধ্যেই যে অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব-জ্ঞাপক এক একটী কায়দা আছে, সহৃদয়ের প্রতীতিগম্য ও অনির্ব্বচনীয় একটা ভঙ্গিমা আছে, কাব্যের প্রকাশক্ষেত্রে প্রত্যেক কবির পক্ষে উহাই হয়ত সর্ব্বাপেক্ষা গণনীয় পদার্থ। যেমন, বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদনের অমিত্র ছন্দ। উহা ত অননুকরণীয় ও অদ্বিতীয়! অথবা, ইংরাজী সাহিত্যে মিণ্টনের কিংবা শেলী-কীট্‌স-ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের ছন্দ রীতি! সাহিত্যে সত্যের 'প্রকাশরীতি' প্রকৃত প্রস্তাবে 'বস্তু'র অনুগত (Objective) নহে; উহা 'ব্যক্তি'গত (Subjective); 'ব্যক্তিগত' বলিয়াই কবিতে-কবিতে উহার বিভিন্ন অভিব্যক্তি—এবং এই 'ব্যক্তি'ত্বের স্থলেই কবির 'মাহাত্ম্য'।

১৮। সাহিত্যেসত্য প্রকাশের জন্য ছন্দই শ্রেষ্ঠ রীতি।

১৯। সাহিত্যের প্রকাশে স্বতন্ত্র 'করণ' ও ব্যাকরণ; তদনুগত ছন্দরীতি।

প্রত্যেক শিল্পজাতিরই 'সত্যপ্রকাশে' স্বতন্ত্র 'করণ' এবং স্বতন্ত্র ব্যাকরণ। কাব্যসঙ্গীত চিত্র ভাস্কর্য্য প্রভৃতি প্রত্যেকেরই যেমন স্বতন্ত্র ক্রিয়া-যন্ত্র ও ক্রিয়া প্রণালী, তেমন স্বতন্ত্র ক্রিয়াশাস্ত্র। অন্যদিকে (পূর্ব্বেই বলিয়াছি) জাগতিক জড়তা, স্থূলতা বা প্রত্যক্ষতার সঙ্গেও সাহিত্যের সাক্ষাৎসম্বন্ধ নাই। নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া, উহাকে বরং 'গৌণ' সম্বন্ধ বলিলেই যথার্থ হয়। জগতের প্রত্যক্ষ বস্তুসমূহ মনুষ্যের ইন্দ্রিয়দ্বার-পথে মনে উপস্থিত হইয়া যেই 'সম্বন্ধ' লাভ করে, যেই 'আকৃতি-প্রকৃতি লাভ করে, মনুষ্যমনে যেই 'ছবি' সৃষ্টি করে, মানুষের মনে যেই ভাব উদ্রিক্ত করে, তাহা লইয়াই সাহিত্য। সুতরাং, 'সাহিত্যের সত্য'মধ্যে যেমন 'বহিস্তত্ত্ব' বা বহির্জ্জগতিক তত্ত্ব, তেমন কবির আত্মতত্ত্ব— উভয়েই প্রবল। পরন্তু, কবির Personal element টুকুই, বলিতে গেলে, সাহিত্যের পরম 'পরিচিহ্ন', প্রধান পরিচায়ক চিহ্ন ও মাহাত্ম্যের প্রধান লক্ষণ। অতএব, সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'সত্যবাদ' বা Realism ও Naturalism প্রভৃতির প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে, সাহিত্যের উক্ত 'করণ ও ব্যাকরণ' টুকু মনে রাখিয়াই বুঝিতে হইবে এবং সেদিক হইতেই সাহিত্যের 'সত্যপ্রকাশ'রীতির শাস্ত্র বা Oughtness টুকু ধরিতে হইবে। সাহিত্যে কবির 'আত্মপ্রাণ'প্রকাশের পক্ষে এবং ভাবের 'পরিস্পন্দ' ধরণার পক্ষে 'ছন্দ'ই যে বলীয়ান্ সুহৃদ্ এবং তেজস্বী সহায় তাহা শেকস্পীয়র প্রাণে-প্রাণে বুঝিতেন। অতএব নাট্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও, Real বা Natural চিত্র উপস্থিত করার সময়েও কবি শেক্সপীয়র—বরং 'প্রকৃতি'র বরপুত্র (Nature's Child) শেক্স্পীয়র—ছন্দকেই ত অবলম্বন করিয়াছেন! না করিয়াই যেন পারেন নাই! এই কথা না বুঝিলে, সাহিত্যে 'সত্য প্রকাশ' বা সাহিত্যিক Naturalism এর প্রধান ব্যাকরণটাই অজ্ঞাত থাকিবে।

শেক্সপীয়র নাটকীয় সাহিত্যেও কাব্যের ছন্দোরীতি অবলম্বনেই সত্যের প্রকাশ' সিদ্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন। এ'জন্য, শেক্সপীয়রের নাটক

মধ্যে যেমন প্রকৃতের, যেমন প্রাকৃতের, তেমনি ভাবসুন্দরের অপরূপ সমন্বয় আছে; Realism, Naturalism, ও Idealism প্রভৃতি সমস্তই যেন অবিতর্কিতে যুগপৎ দ্রষ্টা ও স্রষ্টা এবং অপূর্ব্ব 'কালোয়াৎ' শেক্সপীয়রের হস্তে অপরূপ প্রমূর্ত্তি এবং ঐক্যতান লাভ করিয়াছে। কিন্তু, ইব্‌সেন শেষবয়সের নাটক গুলিতে 'ছন্দ'কে পরিত্যাগ করিলেন; 'ভূমিকা' করিয়া বলিতে চাহিলেন যে, 'ছন্দ' বাস্তবজীবনের Verisimilitude এর বিপরীত—মানুষ ত ছন্দে কথাবার্ত্তা কহে না! সে'জন্য তিনি ছন্দ পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যজীবনের 'বাস্তব চিত্র' অঙ্কিত করিতে চাহেন; একেবারে, Illusion of Reality সিদ্ধি করিতে চাহেন। বলিতে কুণ্ঠিত হইব না যে, ইহা সাহিত্যক্ষেত্রে একটা Heresy। কবির পক্ষে, বীনাবাদিনীর মন্দিরে, সরস্বতীমাতার পদতলে বসিয়াই একটা মাতৃবিদ্রোহী নাস্তিক্যের উক্তি! 'ব্রাণ্ড্' ও 'পীয়রগীণ্ট্' এর সিদ্ধকবি ইবসেনের পক্ষে ইহা যেন একটা নিদারুণ ও অসম্ভবরকম 'আত্মবিস্মৃতি'র ব্যাপার—ডালে বসিয়া উহারই মূলোদ্দেশে কুঠার চালনার ব্যাপার! উহার ফল কি হইয়াছে? ইবসেনের 'সামাজিক নাটক'গুলি উহাদের অন্তরাত্মায় প্রকৃত প্রস্তাবে 'কাব্য' হয় নাই—অপরূপ কবিপ্রতিভা এবং কল্পনাশক্তিশালী ইবসেনের হস্তেই ত 'কাব্য' হইতে পারে নাই। হইয়াছে কেবল Realism ও Naturalismএর দৃষ্টান্তভূত এক-একটা নাট্যব্যাপার—কেবল 'অভিসন্ধি-যুক্ত ও প্রতিপাদ্যের উদ্দেশ্যান্বিত জীবনকথা এবং ঘটনাসৃষ্টির ব্যাপার! কেবল সাধারণ্যে অভিনয়যোগ্য, সাধারণের সহজবোধ্য এবং ইয়োরোপের 'ড্রয়ীং রুম্'টীর গালিচাঘেঁষা একটা আলাপ-প্রলাপের কারদানী! Problem Drama নামে উদ্দিষ্ট একটী সিদ্ধান্ত-চেষ্টার ব্যাপার! উহাদের মধ্যে লেখকের 'মতলবী' দৃষ্টান্তপ্রয়োগ ও সিদ্ধান্তসাধনের লক্ষণটুকু এত প্রবল এবং কণ্টকপ্রবণ যে, উহাদের 'শিল্প'ত্ব বা সাহিত্যতা ইবসেনের হস্তেই অনেকস্থলে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। আবার, মনুষ্যের অন্তরঙ্গে

২০। শেক্সপীয়রের ছন্দোরীতির বিপক্ষে ইবসেনের গদ্যরীতি, সত্যবাদ ও Illusion of realityর আদর্শ।

যেই গুপ্ত-সূক্ষ্ম মানুষটী আছে, যাহাতে মানুষ নিজের 'তৈজস'প্রকৃতি-সূত্রে বিশ্বের 'ভূমা'তৈজসের অংশভাগী এবং সন্ততি, কবি হৃদয়ে উহার স্পর্শসিদ্ধি ও 'আবেশ' লাভ করিতে পারিলে যেই আনন্দস্পন্দ অনুভব করিতে পারিতেন, সেই স্পন্দনটী অনুরূপ বাক্যচ্ছন্দে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিলেই উহা 'কাব্য' হইত। কবি ইবসেন প্রথমতঃ গদ্য-সংকল্প করিয়াই উহার দিকে নিজের হৃদয়দ্বার যেন বন্ধ করিয়া দাঁড়াইলেন! অন্তরাত্মার আনন্দস্পন্দী ও আনন্দচ্ছন্দী এবং নিজের আনন্দ-অনুযায়ী সৃষ্টিব্যাপার হইতেই মনকে নিবারিত করিলেন—দাঁড়াইয়া গেল কেবল Intellectual রীতি, ব্যক্তি বা সমাজের দোষদর্শনী রীতি! আনন্দদ্বারী সহানুভূতি রুদ্ধ করিলেন, প্রবল থাকিল কেবল Irony! ইবসেন যেই গ্রামে নিজের হৃদয়যন্ত্র বাঁধিয়া আসরে নামিলেন, উহা সূক্ষ্ম লোকের স্পন্দন ধরিতেই পারিল না—ধরিল কেবল প্রাকৃত সামাজিকতা ও বৈঠকখানাবিহারী ইয়োরোপীয় সামাজিকের জড়তন্ত্রিক সুর এবং তাল! ইবসেনের বিষয়ে এ সকল কথা হয়ত 'বেঙ্গায় অতিরিক্ত' হইতেছে; কারণ, ইবসেন সূক্ষ্মদর্শী। গদ্যের ক্ষেত্রেই—Doll's House ও Hedda Gabbler ও Rosmersholm এর রচয়িতার পক্ষে আমাদের কথাগুলি হয়ত যথাযথ হয় না। কিন্তু, প্রোক্ত কথাগুলিতে বুঝাইতে চাহিতেছি, ইবসেনের ওই গদ্যতন্ত্রের ফল; Illusion of Reality কথায় উপলক্ষিত অ-সাহিত্যিক আদর্শের স্বরূপ! স্বয়ং কবিকর্তৃক কাব্যের ব্যাকরণদ্রোহ, 'Art condition' এর বিদ্রোহ! এরূপ বিদ্রোহ এবং বৈমুখ্যভাব সত্বেও, ইবসেন তাঁহার 'গদ্যনাটক'গুলিতে আধুনিক ইয়োরোপীয় সমাজের অন্তর্জীবন ও সংসারজীবনের প্রকোষ্ঠে যেই বুদ্ধিযন্ত্র বা 'অনুবীক্ষণ' চালাইয়াছেন, সামাজিক নরনারীর হৃদয় এবং জীবনতন্ত্রে যেই সূক্ষ্ম 'সত্য' ও 'সমস্যা' নিরূপণ করিয়াছেন, ওইরূপে আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্যে যেই অভিনব নাট্যপদ্ধতির গুরু হইয়াছেন, সে সমস্তের 'মাহাত্ম্যে' আমরা সম্পূর্ণ সচেতন। নাট্যক্ষেত্রে ইবসেনী গদ্যনাটকের ঐ 'বোধায়নী' রীতি, ঐ সমস্যাদর্শনী ও দোষদর্শনী পদ্ধতি যে কবি ইবসেনের শক্তিশালী

হস্তেও অনেক সময়ে 'কবি-লোক' স্পর্শ করিতে পারে নাই, তাহাই বলিতে চাই। এ'দিকে স্বয়ং ইবসেনের গুরু যিনি—ইয়োরোপের আধুনিক নাটকের ক্ষেত্রে প্রধান 'নাট্য কবি' যিনি—সেই হেবেলের (Hebel) নামও আমরা বিস্মৃত নহি। ইবসেনের 'সত্য'সমাচার সমূহের মূল্য কত, সে বিষয় এস্থানে বিচার্য্য নহে। বুঝিতে হয়, শিল্পক্ষেত্রে ওই গন্ধতন্ত্রী Illusion of Realityর ফলটি। ইবসেন তবু অনেক সময় 'কবিত্ব' রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু, তাঁহার শিষ্যগণ, বার্ণার্ড 'শ' ও আধুনিক গন্ধপন্থী শত শত নাট্যকার! বার্ণার্ড শ' স্বয়ং' শিষ্যতা' স্বীকার করিয়া, তাঁহার Quintessence of Ibsenism গ্রন্থে ইবসেনকে নিজের 'মতলব' অনুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা ইবসেনকে যে বলিয়া জানি অথবা যাহা কদাপি তাঁহার 'মর্ম্ম' নহে বলিয়াই বিশ্বাস করি, শ' তাহার বিরুদ্ধে 'তাল ঠুকিয়াছেন'। ইবসেনকে সর্ব্বপ্রকার Idealismএর বিদ্রোহী ও 'ধর্ম্ম'বিদ্বেষী এবং একজন 'সমাজবিপ্লব'কারী বলিয়াই প্রমাণ করিতে প্রযত্ন করিয়াছেন। 'শ' নিজকে বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন, তিনি Artist philosopher—উহাও হয়ত ঠিক নহে। বলিতে পারি, তিনি বরং একটী Philosopher Artist; অর্থাৎ তাঁহার সম্পর্কে Philosophy টাই মুখ্য। কিন্তু এই Philosophyর স্বরূপ কি? Philosopher ব্যক্তির পক্ষে Artist হওয়ার অর্থ—দর্শনের সন্দর্ভরীতি পরিহার করিয়া, প্রকাশ্য যুক্তি-প্রমাণ ও বিচার-বিতর্ক- সিদ্ধান্তের ঋজু পদ্ধতি এড়াইয়া, মানুষের তর্কের চোখে অজানিতে 'ধুলা দিয়া', তাহাকে সহজে নিজের 'মতলবী সত্য'টী গেলাইবার চেষ্টা! বলিতে কি, বার্ণার্ড শ' কোন-কিছুই মানেন না। দর্শন বলিতে যাহা বুঝায়, জগতের ও জীবনের 'চূড়ান্ত' বিষয়ক প্রশ্ন ও সিদ্ধান্ত —ঈশ্বর, আত্মা, অমরত্ব ও পরলোক আদির তত্ত্ব—তাহার কিছুই যেমন তিনি মানেন না, তেমন 'ধর্ম্ম ও সত্য' নিষ্ঠা, এবং দয়া-মমতা-স্নেহ-প্রেম-ভক্তি ও শম-দম প্রভৃতি মনুষ্যের পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র ও ধর্ম্মের যাবতীয় আদর্শের উপরে, মনুষ্যের সমস্ত সদ্ধর্ম্ম ও সদ্ভাবের উপরেই, তাঁহার বিজাতীয় ঘৃণা।

২১। ইবসেনের শিষ্য বার্ণার্ড শ' ও গন্ধপন্থী এবং 'সত্য ও প্রকৃত' বাদী নাট্যকারগণ।

তিনি সমস্তকে কেবল Idealism এর 'মিথ্যামুখোশ' ও 'তুরীয় ভাব' এবং 'মানুষের আত্মবঞ্চনা' ও 'বেকুবীর ব্যাপার' ঘোষণায় অপরিসীম ঘৃণা-পরিহাসে পদে পদে উড়াইয়া দিতেছেন! বার্ণার্ড শ' কি 'মানেন', জীবনে তিনি কোন্ 'আদর্শ' প্রবল করিতে চাহেন, তাহা কেহ আমরা জানিনা। এইমাত্র প্রতীয়মান যে, মনুষ্যতার ক্ষেত্রে তিনি একজন প্রত্যক্ষবাদী, প্রাকৃতবাদী ও জড়তাসেবক—কেবল দৈহিক বলের এবং জড়তাশক্তি ও প্রত্যক্ষের পূজারী। ঈশ্বর-আত্মা-পরলোক বা 'ধর্ম্ম' বলিয়া কোন পদার্থকে বিচার-বিবেচনার 'অযোগ্য' ধরিয়াই যেন তিনি অগ্রসর হইয়াছেন; উহাদের 'নাস্তিত্ব' একটা স্বতঃসিদ্ধ রূপে ধরিয়া লইয়াই তিনি আপন মনে 'মস্তকরী সম' চলিয়াছেন। তিনি জীবনে স্পষ্টভাবে পূজা করেন কেবল Life Force [illegible] একটী পদার্থ! অতএব সুখে নিজের ইহ-জীবনটী যাপন করাই আমাদের এই Philosopher ব্যক্তির প্রধান বার্ত্তা—Message. জড়বাদী শ' মনুষ্যের Intellectual শক্তির দাবী প্রকারান্তরে মানিতে বাধ্য হইলেও, মনুষ্যের Moral অথবা Spiritual বলিয়া কোন স্বরূপ বা উহার কোন শক্তি-সামর্থ্য, মহত্ত্ব কিংবা উচ্চতার কোন স্বত্ব তিনি মানেন না। কেন মানেন না, সে বিচার করিয়া এই Philosopher ব্যক্তি কোন Philosophy রচনা করাও প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই। তিনি, নিজের কথায়, একজন সোসিয়ালিষ্ট, Revolutionist, নিজের বিশ্ব-পদাঘাতকারী মৌলিকতার অভিমান টুকুই মুখ্য করিয়া যে তিনি চলিতেছেন—তাহাই জাজ্বল্যমান সত্য! তাঁহার মতামতের কোন নৈতিক মূল্য এস্থলে বিচার্য্য নহে। বুঝিতে হইবে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁহার এই ত একটি পরম 'অসাধু'রীতি! দার্শনিক যুক্তিপ্রমাণের প্রণালীতে নিজের অনুমোদিত বা বিশ্বস্তসত্যকে প্রচার করার স্বত্ব তাঁহার আছে; ঐরূপ স্বত্ব এবং স্ব-মতপ্রকাশে স্বাধীনতা সকল মনুষ্যেরই থাকা উচিত। কিন্তু, এ যে 'আর্টিষ্ট' স্বরূপে 'আনন্দ দান' করিবার প্রতিজ্ঞায় মানুষের গা ঘেঁষিয়া বসিয়াই তাহার অভ্যন্তরে অতর্কিতে যেন বিষপ্রয়োগ করার রীতি! মানুষের আত্মবিশ্বাসের সর্ব্বস্বধন,

তাহার মন-প্রাণ-অধ্যাত্ম জীবন 'চুপিসারে'ই যেন 'চুরী করা'র পদ্ধতি! অজানিতে 'নরত্ব' হত্যা ও ধর্ম্ম-ডাকাতির রীতি!

এস্থলে নিজের মনপ্রাণেই বুঝিতেছি যে, সাহিত্যক্ষেত্রে 'দোষদর্শন' নামক ব্যাপারটী কত অল্পপ্রাণ পদার্থ! উহাতে 'আনন্দ' নাই—কোন 'রস' নাই। কিন্তু সরস্বতীর সুধাপুরী যখন কেবল 'মাংস-বিপণি' ও 'কশাইখানা'তেই দাঁড়াইয়া যায়, জীবনযাত্রী মনুষ্যের 'সর্ব্বস্ব'নাশ এবং তাহার 'ধর্ম্ম' ও 'বিশ্বাস' হত্যার গুপ্ত 'মশান'রূপেই পরিণত অথবা ব্যবহৃত হইতে থাকে, সে অবস্থায় সাহিত্যের 'যাত্রী'কে অন্ততঃ 'সতর্ক' করিয়া দেওয়াই ত নিদারুণ একটী 'কর্ত্তব্য' হইয়া পড়ে! অতএব, সাহিত্যের আধুনিক পাঠকমাত্রকে উহার 'আধুনিক ধর্ম্ম' বিষয়ে সাবধান করিয়া দেওয়াই অপরিহার্য্য হইয়াছে। বার্ণার্ডশ' স্বয়ং একজন সুবিধাবাদী; অধ্যাত্মতা বা ধর্ম্ম-সত্য-প্রভৃতি আদর্শবাদ মানুষের 'বেকুবী' বলিয়াই তিনি ঘোষণা করেন। অতএব তাঁহার এই Artist স্বরূপটী সমুচিত বাক্যে উদ্দেশ না করিলে সমালোচকের একটী প্রধান কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। তাঁহার বিষয়ে সুতরাং সাহিত্য পাঠককে আদৌ জাগাইয়া দিতে হয় যে, সাহিত্যে তাহার এই Art ও 'সত্যবাদ' স্বরূপতঃ কি? উহা আর কিছুই নহে, কেবল 'আপাত বন্ধুতা ও আনন্দদানের অছিলায় মানুষকে পরামর্শ দান'। তাঁহার এই Art ব্যাপার সুতরাং সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা কপট ও অসরল রীতি একটা দুর্ব্বৃত্তি ও দুর্বৃত্ততা! শিল্পীর পেশা ঘোষণা পূর্ব্বক গোপনে গোপনে বিপ্লববাদীর এবং ধর্ম্মহন্তা ও আদর্শঘাতকের অভিসন্ধি! ইহাই তাঁহার 'সত্য', Art ও 'রীতি' বিষয়ে এস্থলে প্রধান কথা। বার্ণার্ড শ' কবি নহেন; কিন্তু, তাহার রচনায় একটা আত্মাভিমানী পৌরুষ ও পরুষ ভাব আছে—একটা আত্মম্ভরিতা ও মৌলিকতার গর্ব্ব এবং ঔদ্ধত্য আছে, যাহা অতর্কিতে প্রত্যেক মনুষ্যের সুষুপ্ত অভিমান ও জান্তব ধর্ম্মকে, স্বেচ্ছাচারকে, ধর্ম্মদ্রোহ-শিবদ্রোহ-বিশ্বদ্রোহকে জাগাইয়া এবং চেতাইয়া তুলিয়া অতর্কিতেই তাঁহাকে একজন পরামর্শমন্ত্রী এবং 'বন্ধু' স্বরূপে খাড়া করিতে পারে! সকল Purpose

Drama মধ্যে মানুষের কর্ম্মমন্ত্রী হইবার একটা অভিসন্ধি যে আছে, উহার রীতির মধ্যে একটা সুগুপ্ত দুর্ব্বৃত্ততা যে আছে, একটা 'অসাহিত্যিক লক্ষ্য'ও 'ধর্ম্ম' যে আছে, তাহা আধুনিক পাঠককে প্রতিনিয়ত মনে রাখিতে হয়। বার্ণার্ডশ'র রচনায় একটা তীব্রতা ও Pique আছে, তীক্ষ্ণতা আছে এবং নিজের মতলব মতে চরিত্র-সংঘটনা ও অবস্থা সৃষ্টি করার 'শিল্পি-গুণ'টুকুনও তাঁহার স্বল্প নহে। উহা হইতে তিনি সকল আত্মম্ভরী, পণ্ডিতন্মন্য, অগঠিতবুদ্ধি ও স্বাভিমান-দম্ভী মনুষ্যের, বিশেষতঃ যুবকজনের অন্তর্কিতেই যেন একটী 'পরম বন্ধু' হইয়া উঠিতে পারেন! তাঁহার রচনায় 'কাব্যগুণ' অপেক্ষা বরং এইরূপ 'পরামর্শ মন্ত্রী' হইবার ক্ষমতা টুকুই যে সবিশেষ প্রবল, তাহা 'সহৃদয়' মাত্রকে বুঝিতে বিলম্ব ঘটে না। রচনা-প্রণালীতে ছন্দকে অবলম্বন করিলে, নাট্যকাব্য লিখিতে বসিলে, তাঁহার নিভৃত 'কবি-আত্মা' ও প্রাণের গুপ্ত স্বরূপটী—তাঁহার অনিচ্ছাতেও—নিজকে প্রকাশ করিয়া বসিত। কাব্য-সরস্বতীর প্রধান 'ধর্ম্ম' এই যে, উহা কবির অন্তরাত্মার 'দর্পণ' স্বরূপেই দাঁড়াইয়া যায়; কবির মনপ্রাণের গুপ্ত-সূক্ষ্ম স্বরূপটী তাঁহার 'অজানিতে'ই প্রকাশ করে। 'দুহৃদয়' ব্যক্তি কখনও কাব্যের ক্ষেত্রে আত্মগোপন করিতে, কিংবা আত্ম-গোপন করিয়াই আবার 'কবিস্বরূপে' আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। ছন্দের 'স্বধর্ম্ম'টাই স্বয়ং কবির মুখরতা, নীরস বাচালতা ও কুকথা বারণ করিয়া, কবিকে কেবল আত্মহৃদয়ের উচ্চতম ও মহত্তম ভাবাদ্রির শিখরচারী হইতেই বাধ্য করে। এ'জন্য কাব্য কেবল মনুষ্যের মহাপ্রাণতার 'ভাণ্ডার' হইয়া আছে—হইতে বাধ্য হইতেছে। সাহিত্যে নিরেট প্রাকৃতগন্ধের রীতি ও প্রাকৃতবাদী নাটক-নবেল প্রভৃতির অবাধ প্রচলন হইতে, সাহিত্যের আসরে কেবল অরসিক ও অকবির ভিড় বাড়িয়াছে এমন নহে, দুর্ব্বৃত্ত-হৃদয় এবং অসাধু-হৃদয়ের অনেক জুগুপ্সিত এবং জুগুপ্সাযোগ্য চিন্তা-চেষ্টা-চরিত্রও আত্মপ্রকাশের সুবিধা পাইয়া কোলাহল তুলিতেছে—মনুষ্যহৃদয়ের 'দুর্ব্বলতা'র খোরাক যোগাইয়াই পসার করিতে পারিতেছে।

ইবসেন ছিলেন একজন প্রকৃত কবি। মানুষের মনস্তত্ত্বের গভীরগাহী ইবসেন, যৌনমিলন ও আধুনিক ইয়োরোপের পরিবার এবং সমাজবন্ধনের নিগূঢ় মর্ম্মস্থান ও সমস্যার স্থানগুলিতে তীক্ষ্দৃষ্টি পরিচালন পূর্ব্বক যে সমস্ত 'গদ্যনাটক' লিখিয়াছিলেন, উহারা সেইদিকে পরম 'মৌলিকতা'য় উর্জ্জস্বী হইয়া আছে। কিন্তু শিষ্যগণ কেবল ইবসেনের ছিন্নশৃঙ্খল গদ্যরীতির, অপিচ প্রাকৃতবাদ এবং স্বৈরগতির স্বচ্ছন্দ অনুকরণে এখন শুদ্ধ 'অকাব্য' নাটক গ্রন্থই লিখিতেছেন! উৎকর্ষপক্ষেও সে সমস্ত হইতেছে কেবল সমাজস্থ প্রাকৃত ব্যক্তিগণের এক একটী ফটোগ্রাফীর ব্যাপার! কেবল ভূয়োদর্শন ও পুঞ্জীকরণ! উৎকর্ষপক্ষে কোন-একটা সমস্যা-প্রশ্নের চারিদিকে কেবল 'নবেলিয়ানা' রীতির চরিত্রচিত্রন! অধিকাংশই কেবল বৈশিষ্টবিহীন, ভাবপ্রাণহীন বহিশ্চিত্র। মনুষ্যহৃদয়ের অধ্যাত্মধর্ম্মের 'মনিকোঠা'য় উহারা কদাচিৎ প্রবেশ করিতে পারিতেছে। প্রাকৃতরীতি হেতু নিজের প্রাণমর্ম্মকে চমৎকারী কিংবা সমুজ্জ্বল ভাবে উপস্থিত করিতেও পারিতেছে না। কাব্যের ভাবচ্ছন্দতা ও ভাবপ্রাণতা পরিহার করিয়া উহারা কেবল মনুষ্যহৃদয়ের নিম্নতলা ও বহির্ব্বাটীতেই প্রবেশ বা আনাগোনা করিতেছে এবং আমাদিগকেও 'বাহিরবাড়ী'তেই রাখিতেছে! দাঁড়াইয়াছে কেবল উদ্দেশ্য কণ্টকিত Purpose Drama, সামাজিক Essay অথবা দাম্পত্যসমস্যার Polemic! উহাদের উদ্দেশ্য কেবল কোন একটী বিশেষআদর্শে সমাজ-সংস্কার অথবা তত্ত্বপ্রচার। বুঝিতে হইবে, ছন্দকে ছাড়িয়া দেওয়াতেই শ্রেষ্ঠকাব্যের উচ্চ প্রকৃতি, ভাবাত্মা, মহাপ্রাণতা এবং রসবত্তাকেও সঙ্গেসঙ্গে বিদায় দিতে হইয়াছে। উদ্দেশ্যমতলবী 'সত্যতা' ও 'প্রকৃতত্ব' গুছাইতে গিয়া কেবল নিম্নশ্রেণীর ভাবা ব্যাপার হইতে বাধ্য হইতেছে। ইবসেনের Brand বা Peer gynt এর তুলনায়, তাঁহার পরবর্ত্তী 'সামাজিকনাটক'গুলির অথবা তাঁহার সিদ্ধান্ত-বাগীশ শিষ্যগণের নাট্যচেষ্টা গুলির 'প্রাণ' একেবারে বিজাতীয় পদার্থ। হাজার ভাল হইলেও, উহাদের কোনটাই দ্বিতীয়বার পাঠের দাবী যে করিতে পারে না—কেন পারে না, তাহার কারণটাই চিন্তনীয়।

বুঝিতে হইবে, ছন্দ ব্যতীত প্রকৃত 'কাব্যতা' দাঁড়াইতে পারে না। যেখানে গদ্যই চমৎকারিতা লাভ করিয়াছে (যেমন De Quincy র 'Dream Fugues') সেখানে গদ্যই (হয়ত অতর্কিতে) ভাবের ছন্দকে সুসিদ্ধ করিয়াছে বলিয়া উহার প্রধান সৌন্দর্য্য-ও কাব্যত্ব। 'ভাবের ছন্দ' লাভ ব্যতীত কোন 'প্রকাশ'ই সৌন্দর্য্য-চমৎকারী হইতে কিংবা মনোমদ মাধুর্য্য অর্জ্জন করিতে পারে না। সেইণ্টসবারী বলিবেন, ঐরূপ স্থলে 'গদ্য' বাক্যকে পদ্যের মতই 'গণ'বিভক্ত করিতে (Scan করিতে) পারা যায় (১)। সত্য ব্যতীত কাব্য নাই; কিন্তু, সত্যের প্রকাশে ভাবের ছন্দ সিদ্ধি ব্যতীত, উক্ত 'প্রকাশ' কদাপি রসবত্তা ও হৃদয়গ্রাহিতা লাভ করিতে যে পারে না, উহা সাহিত্যসেবী মাত্রকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। এমার্সন, কার্লাইল, রাস্কিন, বার্ক, ব্রাউন্, মেতরলিঙ্ক, অস্কার ওয়াইল্ড, রবীন্দ্র নাথ প্রভৃতি 'গদ্য-সাধক'গণের উৎকর্ষস্থলে 'ছন্দাত্মা'ময় গদ্য এবং রসুচ্ছন্দযুক্ত সত্য প্রকাশই সর্ব্বত্র লক্ষ্য করিব; ইবসেনের উৎকর্ষস্থলেও লক্ষ্য করিব। উহাই সাহিত্যে শ্রেষ্ঠপ্রকাশের অপরিহার্য্য 'ব্যাকরণ'।

২২। নাটকের 'প্রকাশে', গদ্যরীতির ফল—শীলার ও দ্বিজেন্দ্র লাল।

আমাদের দেশের দ্বিজেন্দ্র লালের সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি কিংবা অধ্যাত্ম 'প্রবেশ' হয়ত ছিল্ না। কিন্তু, নাটকীয় কবিত্বশক্তি যে ছিল, অসামান্য মাত্রাতেই ছিল, উহা তাঁহার পাষাণী ও সীতা নাটকদ্বয়ে বুঝিতে পারি। তবে, দ্বিজেন্দ্র আধুনিক বঙ্গরঙ্গে 'অভিনেয় নাটক' লিখিতে বদ্ধপরিকর হইয়া (হয়ত উপস্থিত বাহবা কিংবা অর্থসিদ্ধি লক্ষ্য করিয়াই) নিজের হৃদয়যন্ত্রকে প্রাকৃত ও নিম্ন 'গ্রামে' বাঁধিলেন; যেন ইবসেনের ন্যায়, কেবল 'প্রাকৃত'জীবনের সত্যকে এবং 'গদ্য'সাধ্য 'ভাবাবেশ'কেই লক্ষ্য করিলেন। উহার ফলে, তাঁহার হৃদয় গদ্যনাটক গুলির মধ্যে উন্নত ভাবলোক স্পর্শ করিতেই পারিল না! সময় সময় ভাবুকতায় উন্মুক্ত আকাশে পাখা

১। এ'বিষয়ে কুতুহলী পাঠক Saintsbury র 'History of English Prose' নামক গ্রন্থ দেখিতে পারেন। গ্রন্থকার ইংরেজী সাহিত্যের বহুবহু উৎকৃষ্ট গদ্যকে মাত্রা বা গণে বিভক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন। বাঙ্গালা গদ্যেও উক্ত সত্য প্রযুক্ত হইবে।

তুলিতে পারিলেও, সত্য প্রকাশে স্থায়ীভাবের স্থির ছন্দকে, প্রকৃত 'কাব্যছন্দ'কে আয়ত্ত করিতেই পারিল না! এই আদর্শের ফল, দ্বিজেন্দ্রের Patriotism-ভাবোদ্দীপক নাটকগুলির মর্ম্মে মর্ম্মে প্রকটিত। কবি শীলারের William Tell কিংবা Joan of Arc. প্রভৃতি 'স্বাদেশিকতা' ও 'স্বাধীনতা' আদর্শের নাট্যকাব্যের পাশাপাশি রাখিলেই শীলারের শিল্প-রীতি এবং ভাবোত্তম ছন্দ ও প্রকাশরীতির মাহাত্ম্য উজ্জ্বল হইতে থাকিবে। শীলারের নাট্যকাব্য ইয়োরোপীয় সাহিত্যের স্থায়ী সম্পত্তি; আর দ্বিজেন্দ্রের 'মেবার পতনের' ন্যায় নাটকগুলির, উহাদের সমুজ্জ্বল ঘটনা, ভাবময়ী পরিবর্ণনা এবং শৌর্য্যবীর্য্যের অভিমানময় ক্রিয়াব্যাপার সত্বেও শীলারের শ্রেষ্ঠনাটক সমূহের 'সমকক্ষ' কিংবা 'সমানাত্ম' কি না, তাহা কাব্যামোদী মাত্রের সংশয়স্থলী থাকিতে বাধ্য হইতেছে!

২৩। সাহিত্যের 'বস্তু' ও প্রকাশ রীতিতে একদেশী দৃষ্টি এবং গোড়ামি হইতেই 'সত্যবাদীও 'প্রকৃত' বাদীর ভ্রান্তি।

'প্রকৃত'বাদী ও 'সত্য'বাদী লেখকগণ বস্তুতঃ কেবল সাহিত্যের 'আলম্বন' ও 'প্রকাশ'রীতি লইয়াই একদেশ-দর্শিতা ও 'গোঁড়ামী' দেখাইতেছেন। সাহিত্য যে সকল সত্য লইয়া 'নাড়াচাড়া' করে, যে সমস্ত তথ্যকে অবলম্বন করে উহারা ত কেবল জড়তাপুরীর, অন্নময় পুরীর বা জীবের সংসারপুরীর বৃত্তান্তগত সত্য নহে! 'মানুষ', 'নিসর্গ' ও 'ভূমা'র স্বরূপগত এবং পরস্পর সম্বন্ধগত যাবতীয় সত্য ও তথ্যই সাহিত্যের উদ্দীপন কিংবা আলম্বন হইতে পারে। উহাদের নামই সাহিত্যশাস্ত্রে 'বস্তু'। দেশ কাল, জীবন মৃত্যু, সুখ দুঃখ ও শ্রেয়ঃ-প্রেয়ের যাবতীয় সম্বন্ধ ও রহস্য লইয়া এই 'বস্তু'। সাহিত্য দেখাইতে পারে, উহাদের স্বরূপ কি, মানব জীবনে উহাদের পদবী বা সামর্থ্য কি? আত্মা, জীব, জড়, অমরত্ব, পরলোক, পুনর্জন্ম বা অবতারতত্ত্ব—এ'সমস্তের অন্তর্নিহিত যাবতীয় 'সত্য'ই সাহিত্যের স্বাধিকারগত 'বস্তু'। উচ্চ-সাহিত্যের 'রস' এরূপ সত্যকে অবলম্বন করিয়াই দাঁড়াইতে পারে। যে কবি তদ্রূপ কোন সত্যকে ধারণা করিতে পারেন, অন্নপুরীর 'তথ্য'কে যথেচ্ছ ডিঙ্গাইয়া বা উল্টাইয়া যে-কোন রীতিতেই তিনি উক্ত সত্যের

'বার্ত্তা' মনুষ্যসমক্ষে উপস্থিত করিতে থাকুন। মনুষ্যের ধর্ম্ম, সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্রের যে সকল সত্য, সত্যাভাস বা সম্বন্ধসমস্যা মানুষকে ইহজীবনে পর্য্যাকুল করিতেছে, কবি পারেন ত, সে সকল সত্যকে, সমস্যা-'পূরণ' কিংবা সিদ্ধান্তকে উপস্থিত করিবেন—তবে, প্রধান কথা, সাহিত্যশিল্পের প্রণালীতে 'চমৎকারী' বা 'রসাত্মক' ভাবে 'প্রমূর্ত্ত' করিয়াই উপস্থিত করিবেন ; অর্থাৎ, মনুষ্যের উচ্চতর ভাববৃত্তির 'ধর্ম্ম'সঙ্গত ও শিল্পের 'ঋত'সঙ্গত করিয়াই উপস্থিত করিবেন। মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে 'সঙ্গতি' রক্ষা পূর্ব্বক, পারেন ত, 'প্রকৃত' অর্থ বা জড়তন্ত্রিক 'তথ্য'কে ডিঙ্গাইয়া এবং ইচ্ছামতে পরিবর্ত্তন করিয়াই চলিবেন। এরূপে, মেঘদূত কাব্য কি অনুভাবে-বিভাবে পার্থিব তথ্যকে নানাদিকে ডিঙ্গাইয়া, অলকাবিহারী যক্ষ-যক্ষিনীকে ও বিমানবিহারী মেঘ'পুরুষ'কে অবলম্বন করিয়া, মনুষ্যের অন্নময়-ভূমির সমস্ত 'প্রাকৃত' তথ্যকে বা তথাকথিত 'বাস্তব'সত্যকে একেবারে 'পদদলিত' করে নাই ? কিন্তু, 'অপ্রাপ্ত সৌন্দর্য্যের আদর্শরূপিণীর জন্য মনুষ্য-হৃদয়ের নিত্যপিপাসা' রূপী যেই নিগূঢ় সত্যকে স্থায়ীভাবে সুসিদ্ধ করিয়াছে এবং উহাকে সঞ্চারিত করিতে গিয়া, পদে পদে (অবশ্য মনুষ্যের মনস্তত্ত্বের 'ব্যাকরণ' বা জ্ঞান-ইচ্ছা-ভাবের 'ধর্ম্ম'সম্মতে) যেই 'সৌন্দর্য্য' চয়ন করিয়াছে, ঐরূপে 'অধ্যাত্ম'সত্যকে যেই 'তথ্যমূর্ত্তি' অবলম্বনে খাড়া করিয়াছে, তাহা ত শিল্পশাস্ত্রের সকল 'আলম্বন' প্রণালীর উদ্দেশ্য ! মেঘদূত কাব্যটী প্রকৃতপ্রস্তাবে একটা কাল্পনিক পুরীর—অলোক পুরীর তথ্যভিত্তিতেই নিজের স্থায়ীভাবকে ও উদ্দিষ্ট সত্যকে খাড়া করে নাই কি ? উহাই ত সাহিত্যের 'শাস্ত্র' সম্মত। আলম্বন যাহাই হোক না কেন, 'সহানুভূতি' অর্জ্জন করিতে পারিলে, অর্থাৎ জীবের মনস্তত্ত্বসঙ্গত প্রণালীতে সত্যের অনুভব উদ্দীপ্ত করিতে পারিলেই ত হইল ! সেরূপ, কবি শেলীর Sky Lark অথবা Ode to West Wind কবিতা, একটা 'পাখী' এবং কেবল একটা 'হাওয়া' অবলম্বন করিয়াও, মনুষ্যাত্মার

(১) মেঘদূত বিষয়ে এই সূত্রে এতদ্ গ্রন্থের ১৯-২১ ও ১৮৯-৯১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মধ্যে যে জড়াতিশায়ী স্বাধীনতার 'ভাব' আছে তাহাকে উদ্দীপিত ও সুপ্রতীত করিয়াই 'রসাত্মক' হইয়াছে; অতুলনীয় ও অনির্বচনীয় ম্যাজিকের রীতিতেই ত উক্ত 'সৌন্দর্য্য' সিদ্ধি করিয়াছে। শেলী ও কালিদাস যাহা 'অতিপ্রাকৃত' বা একেবারে কাল্পনিক আলম্বনে সমাধা করিলেন, তাহা কেহ প্রাকৃত আলম্বন সাহায্যেই পারেন কিনা, শক্তি থাকে করুন! আমরা চমৎকার অভিব্যক্তি এবং 'সিদ্ধি' টুকুই চাই! সেকস্‌পীয়র তাঁহার Tempest, A Midsummer Night's Dream, হ্যামলেট ও ম্যাকবেথ প্রভৃতির আলম্বনবিভাবে মনুষ্যের 'অন্নময়'ভূমির সত্যকে নানাদিকে পদদলিত করেন নাই কি! সেরূপ ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের Immortality Ode অথবা Laodomia? এস্‌কইলাস বা শেলীর Prometheus ও গ্যাঠের 'ফাউষ্ট'? আলম্বনের 'তথ্য'ভিত্তি বা Realism ও Naturalism রীতির উপর গোঁড়ামী করা সাহিত্যশাস্ত্রের ব্যাকরণ-জ্ঞানহীন ও মনস্তত্ত্বে দৃষ্টিবিহীনের কথা।

শ্রেষ্ঠ কাব্যের 'সত্য' আদর্শ কি? কাব্য-কবিতা-নাটক-গাথা-কাহিনী উপন্যাস-নবেল—যে জাতীয় শিল্পই হউকনা কেন, তন্মধ্যে উচ্চ অঙ্গের প্রাণবত্তা, সৌন্দর্য্য-চমৎকারময় সত্যের বার্ত্তা বা কল্পনাশক্তির স্বাধীন-লীলাত্মক রসসিদ্ধি না ঘটিলে, অন্য কথায়, উহাতে উচ্চ অঙ্গের স্থায়ীভাব 'ব্যক্ত' না হইলে, উহা যে তৎক্ষণাৎ 'শিকায়' তুলিয়া রাখার যোগ্য! উহা গণনীয় সাহিত্যই নহে। যত 'সঠিক' সত্যই হউক না কেন, কেবল মাটীঘেঁষা তথ্য কিংবা প্রাকৃত জীবনের নকলী নক্‌শা কখনও সাহিত্যে ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। দেশে দেশে সাহিত্যের ইতিহাস প্রমাণ করিতেছে, সাহিত্য কখনও সে-জাতীয় রচনার কবিকে 'গুণিগণ-গণনারম্ভে' ধরে নাই। উহার আপাত মূল্য, কিংবা সমসাময়িক প্রাবল্য যতই হউক। মুদ্রাযন্ত্রের সুবিধা, এবং 'সাধারণ শিক্ষা'র প্রসার গতিকে অনেক ব্যক্তি, যাহাদের কেবল হাতুড়ি-বাটখাড়া-লাঙ্গলই যোগ্য 'হাতিয়ার' হওয়া উচিত ছিল, তাহারাই সারস্বত মন্দিরে ঢুকিয়া কলম ধরিয়াছে! বাঙ্গালী কবিওয়ালার প্রাকৃতরীতি অবলম্বনে বলা যায়—

যত ছিল নাড়াবুনে, সবাই হল কীর্ত্তনে',
হাল কোদাল বেচে করলে খোল করতাল ॥

উহাতেই যেমন প্রাকৃত ভাবের ('প্রাকৃত' বলিতে এ'দেশে চিরকাল 'নীচ জাতীয়'ই বুঝায়) তেমন মাটীঘেঁষা ও মেঠো ভাবের বাড়াবাড়ি ঘটিতেছে —সমাজের 'অধিকাংশের' ক্ষুধার খোরাক যোগাইতেই হয় ত ঈদৃশ 'বাড়াবাড়ি' আপন্ন হইতেছে। অন্যদিকে, সর্ব্বপ্রকার 'সভ্যতা'বিদ্বেষী, কর্ষণা ভদ্রতা ও লালিত্যের (Refinement) বিদ্রোহী, জীবজীবনে 'মহত্ব' ও 'মাহাত্ম্য' আদর্শের বিদ্বেষী একটা 'দল' যেমন সমাজে এবং রাষ্ট্রে প্রবল হইতেছে. তেমন, সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াও কোলাহল করিতেছে! বলিতে পারি, উহারা সাহিত্যক্ষেত্রের 'বলসেবক'—কেবল জড়তার 'সেবক'; 'সত্য'বাদ প্রকৃত'বাদ ও স্বাধীনতার 'নামডাকের' আড়াল ধরিয়া কেবল স্বেচ্ছাচার-'সেবক'। এ বিষয় 'সাহিত্যে সৌন্দর্য্য'আদর্শের বিচারকালে আমরা আরও ঘনিষ্টভাবে দেখিতে পারিব। এখন দেখিতে হয় যে, এরূপে, 'সত্য' ও 'প্রাকৃত'আদর্শের ঘোষণা সাহায্যে আধুনিক সাহিত্যে বস্তুতঃ মনুষ্যত্ব বিষয়ে পরম 'মিথ্যাবাদ'ই চলিতেছে—মনুষ্যত্বের অযথা কলঙ্কই বিঘোষিত হইতেছে! আধুনিক ইয়োরোপের শিল্পরচনা, উহাদের উদ্দেশ্যে এবং প্রণালীতে, মানুষের মনুষ্যত্বের যত প্রকারে অবমানকর ও অবনতিকর, বিরক্তিজনক এবং অবসাদজনক হইতে পারে, সে চেষ্টায় কিছুমাত্র ক্রটি নাই। ফলে, মনুষ্যকে একেবারে 'পশু' বলিয়া প্রমাণিত করিতেই যেন এসকল 'সত্য'বাদী কোমড় বাঁধিয়া নামিয়াছেন! উহাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য, এবং এ উদ্দেশ্যটী অপর একটি গুপ্ত অভিসন্ধির সহায়! অতএব এ'রূপ অভিসন্ধি-জীবীর হস্তে কোনবিষয়ে 'সত্য'-সমাচার লাভের আশা কেহ করিতে পারেন কি? নিজের অভিসন্ধিতে এসমস্ত লেখক, মনুষ্যের সকল উচ্চমহৎ মনোবৃত্তির মুখে চূণকালি দিয়া, মানুষকে একেবারে পশু ও 'আহার নিদ্রা মৈথুন'সার 'জন্তু'রূপে দেখাইতে লালায়িত; মানুষকে

২৪। সাহিত্যে 'বলসেবক'; উহাদের গুপ্ত অভিসন্ধি, মনুষ্যের চিরাগত ধর্ম্ম ও অধ্যাত্ম আদর্শের ধ্বংশ এবং সর্ব্বত্র বিপ্লব সাধন।

একেবারে বেল্লিক-বেআরা-বেরসিক এবং বেকুব করিয়া দেখাইতেই বদ্ধ-পরিকর। স্বধর্ম্ম বিষয়ে উক্তরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া, অজানিতে মনুষ্যের 'গাঁঠ' হইতে তাহার সর্ব্বস্বটী চুরী করিতেই অভিসন্ধি ; তাহার জীবনের ধর্ম্ম ও মহত্বের-আদর্শ টী, বিশ্বাসের অধ্যাত্ম সম্বলটী, তাহার 'পারের কড়ি'টী 'গাঁঠ কাটিয়া' লইতেই অভিসন্ধি ! অনেক গ্রন্থের, 'আধুনিক নবেল' নামধারী শতশত গ্রন্থের, এরূপ গুপ্ত অভিসন্ধি, জড়সেবকী' ও বলসেবকী' রীতি ! না চিনিয়া এ সকল গ্রন্থ স্পর্শ করাই বিপজ্জনক হইয়া গিয়াছে—অনভিজ্ঞ ও অশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে একেবারে 'সর্ব্বনাশকর' হইয়া পড়িয়াছে। অজানিতে মনুষ্যের এমন কুপরামর্শ দাতা, কুসঙ্গী এবং কুবন্ধু আর নাই ! এসকল গ্রন্থ-বিস্তারের ফলে বিজ্ঞানের ও অভিজ্ঞতার প্রসার হইতেছে বলিয়া যদ্যপি মনে করিতে হয়, সঙ্গেসঙ্গে বুঝিতে হইবে, এতাধিক 'দুষ্ট সরস্বতী'ও ত আর হইতে পারে না। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এরূপ অভিসন্ধিযুক্ত সত্য'বাদী ও 'প্রাকৃত' বাদী নাটক নবেলের একটা গুণ—অতর্কিত গুণ আছে ; উহাদের মধ্যে আধুনিক যুগের অধ্যাত্ম ইতিহাস, এ'কালের মনুষ্যের জীবন এবং হৃদয়ের 'মত্ততা'র ইতিবৃত্ত টুকুই লিখিত হইতেছে ; এ'কালের মানুষ নিজের অভাব-অভিযোগে কত-দিকে কত-কি যে চিন্তা এবং আশা করিতেছে, তদ্বিষয়ে একটা বৃত্তান্ত-বিজ্ঞানই অজানিতে লিখিত হইয়া যাইতেছে ! ভবিষ্যতের প্রত্ন-গবেষকগণের কোদালি মুখে হয়ত উহা ধরা পড়িবে। কিন্তু, ওইটুকু লাভের জন্য এতটুকুন অপব্যয় ? উহার জন্য ত 'ইতিহাস' বলিয়া একটা স্বতন্ত্র বিভাগই আছে !

২৫। সাহিত্যের সত্য ও রীতি, বনাম, ইতিহাস-বিজ্ঞান-দর্শনের সত্য ও রীতি।

সাহিত্যের রচনাক্ষেত্রে প্রধান কথা এই যে, সাহিত্যের সত্য কদাপি বৃত্তান্তকে অনুসরণ করে না ; বরং বৃত্তান্তই সত্যের অনুসরণ করে। এস্থলেই সাহিত্য সৃষ্টির প্রধান শাস্ত্র। কবি হৃদয়ে, নিজের অন্তরাত্মার অন্তর্দৃষ্টিতে যে সত্য দর্শন করেন, উহা নিজেই নিজের চারিদিকে বৃত্তান্ত সৃষ্টি করিয়া সদেহ হইয়া প্রকাশ পায়—জীবাত্মা ঠিক যে উপায়ে 'যোগস্থ' হইয়া, নিজের

কর্ম্মানুরূপ শরীরপিণ্ড সংগ্রহে এবং বিগ্রহধারণে মাতৃগর্ভ হইতে শরীর-লোকে ভূমিষ্ট হয় বলিয়া বেদান্ত বলিবেন। কিন্তু বিজ্ঞান বা ইতিহাসের সত্য ত বৃত্তান্তকেই অনুসরণ করে! এ'জন্য, ইতিহাস বা বিজ্ঞান হইতে সাহিত্যের রীতি ও ধাতু উভয়ই পৃথক্। এই পার্থক্যটুকু না বুঝিয়া অনেক পণ্ডিতেও ভুল করেন—"কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ"। দৃষ্টিশালী কবি কীট্‌স্, একজন শ্রেষ্ঠশ্রেণীর কবিশিল্পী কীট্‌স্ একদা ভাবের 'মহানন্দ'বশে বলিয়া উঠিয়াছেন—Truth is Beauty; Beauty is Truth উহাতে অনেকের চক্ষুতে ধাঁধা লাগাইতে পারে। কিন্তু, বুঝিতে হইবে, কীট্‌স ওই স্থানে Truth বলিতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন—কবির হৃদ্গত সত্য, ভাবদৃষ্টিতে অনুভূত সত্য—আমাদের পূর্ব্বোক্ত 'মহাভাব'। এ সম্পর্কে অরিষ্টোটলের সেই 'মহাবাক্য'টীর কথাও মনে রাখিতে হয়—"Poetry aims at a higher truth than History ** poetry aims at the Universal; History at the Particular" সাহিত্যের সত্যটী বিজ্ঞান অথবা ইতিহাসের ক্ষেত্র কোটি হইতে উচ্চতর ধামের সত্য! কবির পক্ষে, তাঁহার হৃদ্গত ও'ঋত'সঙ্গত সেই সত্য টুকুন প্রকাশের জন্যই জাগতিক জীবন-বৃত্তান্ত-বস্তু, চরিত্র ও ঘটনা প্রভৃতি 'আলম্বন' মাত্র। আলম্বনের প্রকৃতত্ব, (Actuality) বা 'তথ্যতা' বিষয়েও কবি একেবারে নিশ্চিন্ত—কেবল 'সম্ভাবনা'কে অতিক্রম না করিলেই হইল। এ দিকেই সাহিত্যের প্রণালী যেমন ইতিহাস হইতে, তেমন বিজ্ঞান হইতেও 'পৃথক্'; বরং গণিত বিজ্ঞানের রীতিসঙ্গেই উহার সামঞ্জস্য আছে। জ্যামিতি-বিজ্ঞান যে রূপে বিন্দু ও রেখা এবং ত্রিভুজ-চতুর্ভুজ প্রভৃতির সংজ্ঞা নির্দ্দেশের পর, 'মূর্ত্তি' আঁকিয়াই ত্রিভুজ-চতুর্ভুজ প্রভৃতির 'ধর্ম্ম' নির্দ্ধারণ করিতে বসে, তাহার ওই 'ত্রিভুজ-চতুর্ভুজ' পদার্থ অঙ্কন-সাধ্য কি? বিশ্বসংসারে উক্তরূপ সংজ্ঞার 'বস্তু' কুত্রাপি আছে কি? তাদৃশ সংজ্ঞার পর জ্যামিতিক সত্য-অনুধ্যান বা সত্য-প্রকাশের জন্য ত্রিকোন-চতুষ্কোণ প্রভৃতির অঙ্কনব্যাপার 'প্রকৃত'পক্ষে দাঁড়ায় কি? জ্যামিতি-শাস্ত্রের পক্ষে সর্ব্বপ্রকার প্রমূর্ত্তি বা অঙ্কনার ব্যাপার যেমন 'আলম্বন' মাত্র; সাহিত্যের পক্ষে, তেমনি, সত্যের

'প্রকাশ' করিতে যাইয়া, জীবনের বৃত্তান্ত-বস্তু-ঘটনা প্রভৃতির প্রমূর্ত্তি আলম্বন ব্যতীত অপর কিছুই নহে। অন্তরাত্মার 'মাহেন্দ্র ক্ষণ' দৃষ্ট সত্যকে বা হৃদয়ের 'প্রত্যাবেশ' লব্ধ মহাভাবকে প্রমূর্ত্তি দানে 'প্রকাশ' করাই কবির লক্ষ্য; অন্য কথায়, বিভাব ও অনুভাব আদির সাহায্যে সত্যের 'রসাল' পরিব্যক্তি টুকুই মুখ্য। আলম্বন ব্যতীত সত্যের রসোদ্দীপনা হইবে না বলিয়াই আলম্বন!

'সাহিত্যের সত্য' বিষয়ে বাল্মীকি রামায়ণের গোড়ায় একটা গভীর তত্ত্বসঙ্কেত আছে। বাল্মীকি নিজের 'মহাভাব' প্রকাশ করিতে গিয়া নারদের উপদেশে রাম চরিত্র অবলম্বন করিলেন। কিন্তু, তাঁহার হস্তে ত রাম চরিত্রের বিস্তারিত তথ্য-বৃত্তান্ত কিছুমাত্র নাই! কবির সম্মুখে আপাততঃ সমস্তই 'অন্ধকার' দেখাইতেছিল। তখন বলা হইয়াছে যে, তিনি দৈবী করুণায় সারস্বত শক্তি লাভ করিলেন—সত্যে 'প্রত্যক্‌দৃষ্টি' লাভ করিলেন, Inspired হইলেন! বাল্মীকি কবিসুলভ 'সত্যদৃষ্টি'—সত্যানুভাবক অন্তর্দৃষ্টি বা 'দিব্যচক্ষু' লাভ করিলেন; অন্য কথায়, মহাভাবের 'প্রকৃতিস্থ' হইলেন। এরূপ 'দিব্য দৃষ্টি'র 'স্বরূপ' কি? উহার 'ক্রিয়াপ্রণালী' ও 'অভিব্যক্তি' কি? তাহার সংবাদও অতুলনীয়ভাবেই রামায়ণে লিপিবদ্ধ আছে। চিন্তান্বিত কবিসমক্ষে 'সরস্বতীর অধিপতি', 'পুরাণ কবি' ব্রহ্মা অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,—"বাল্মীকি, তুমি আমার বরেই রামতত্ত্বের 'কবি' হইলে। তোমাতে সরস্বতী স্বচ্ছন্দেই 'প্রবৃত্তা' হইয়াছেন। অতঃপর ভাব প্রকাশ করিতে বসিয়া তুমি পদে পদে, আমার প্রসাদে, এই 'কবি দৃষ্টি'র বশেই রামসীতা-চরিত্রের সকল প্রকাশ্য বা 'রহস্য'তথ্য এবংসত্যকে (তোমাররামায়ণী কথার পাত্রগণের অবস্থা-ঘটনাক্রিয়া হাবভাব বৃত্তান্ত ও চারিত্র সমস্তই) 'দর্শন' করিবে; রামসীতা প্রভৃতির অনন্ত দৃষ্ট ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম 'হসিতং-ভাষিতং-রুদিতং' পর্য্যন্ত তোমার 'কবিদৃষ্টি' সমক্ষে 'সত্যানুগত' ভাবেই সমুদিত হইবে। কোন ভয় করিও না—তুমি যাহা লিখিবে, তাহাই 'সত্যানুগত' হইবে; তাহাই রাম চরিত্রের 'প্রকৃত'

২৬। সাহিত্যের 'সত্য'ও রীতি বিষয়ে রামায়ণ রচনার সাক্ষ্য।

হইবে; সত্য ও তথ্য হইতে অনন্ত এবং অভিন্ন হইবে। তোমার বাণী কখনও সৃষ্টির 'ঋত'তত্ত্বের বিদ্রোহী কিংবা বিরোধী হইবে না।" এ'স্থলেই ত কাব্যের 'সৃষ্টি'তত্ত্ব এবং উহার 'সত্য', 'তথ্য' ও 'রীতি' বিষয়ে সাহিত্য শাস্ত্রের চূড়ান্ত কথা—

"ন তে বাগনৃতা কাচিদত্র কাব্যে ভবিষ্যতি॥"

'প্রকৃত' বা Actual যাহা, তাহা তোমার হৃদয়োদিত 'সত্য' এবং তাহাকেই অনুসরণ করিবে। এ স্থানেই 'কবির সত্য দৃষ্টি'—Inspiration বা সত্যানুভবের এবং মহাভাবের 'প্রকৃতিস্থ দৃষ্টি'! কবির হৃদয়স্থিত Universal সত্যের 'দর্পণ'রূপেই ত কাব্যাঙ্গে Particular চরিত্রের সৃষ্টি—সামান্যের উদ্দেশ্যেই বিশেষের সৃষ্টি! এ'দিকেই কবি যুগপৎ দ্রষ্টা ও স্রষ্টা; এবং এ'স্থানেই কবি-শক্তি—সৃষ্টি-বিধাতার দয়াজনিত, তাঁহারই স্বশক্তির আবেশলাভে সমুদ্দীপ্ত এবং অভ্যাসযোগে মহিমান্বিত এই কবিত্ব শক্তি!

ইবসেনের শিষ্যগণের প্রকৃতবাদিতার প্রধান ভ্রম, সাহিত্যের Means কেই End বলিয়া গ্রহণ—উপায়টাকেই উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা, ফলতঃ আত্মবঞ্চনা। জগতের বৃত্তান্ত বস্তু ও তথ্য সমূহ সাহিত্যের 'উদ্দেশ্য'প্রকাশের অবলম্বন মাত্র; সত্যকে রসভাবে প্রকাশ দান করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। সে ক্ষেত্রে যে উহারা অবলম্বনটাই মুখ্য এবং সর্ব্বস্ব বলিয়া ধরিতেছেন! বুঝিতে হইবে, এরূপে আধুনিকের দল কেবল 'প্রকাশের রীতি'টাকেও 'মুখ্য' করিতেছেন; ফলতঃ—জাগতিক তথ্যের 'অনুকরণ'কেই সাহিত্যের 'সর্ব্বস্ব'রূপে বরণ করিতেছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ফটোগ্রাফী বা প্রতিবিম্বনী পদ্ধতি কদাপি গণনীয় সাহিত্যরীতি নহে; উচ্চসাহিত্যের রীতি ত নহেই! কেন নহে? উহা ত কেবল একটা বুদ্ধিহীন ও প্রজ্ঞাবিহীন ব্যাপার! কেবল 'অ-মানসিক' অনুসরণের একটা জড়তন্ত্রী কৃতিত্ব! সত্যের মহনীয়ত্ব বা মহার্ঘতাও বুঝায় না। যাহা প্রকৃতির মধ্যে আছে, তুমি যদি ভাষার সাহায্যে উহার 'নকশা' মাত্র আঁকিলে, তোমার একটা কারিকরী আছে, বুঝিলাম। কিন্তু, তুমি ত কোনদিকে অপূর্ব্বকে

২৭। 'উপায়'কে 'উদ্দেশ্য' বলিয়া গ্রহণ হইতেই আধুনিকের প্রধান ভ্রম।

দিলে না। সাহিত্যে কবি-মাহাত্ম্যের প্রধান মাপকাঠি—অপূর্ব্বের সংঘটনে। কবির পূজ্যপদবী অঘটন-ঘটনে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথম প্রশ্নই হইতেছে, তুমি যাহা উপস্থিত করিতেছ তাহা রসাত্মক কি না, কাব্য কি না? তুমি কোন্ বস্তুরূপে বা কোন্ রীতি অবলম্বনে তোমার 'কৃতি' উপস্থিত করিতেছ—উহা গদ্য-পদ্য নাটক কিংবা নবেল, সামাজিক নাটক বা পৌরাণিক নাটক, প্রাকৃতবাদী কিংবা সত্যবাদী বা যাহাই হউক—সাহিত্যের 'বিচার' এরূপ কোন প্রশ্ন করিতে চায় না। আদ্যতম ও প্রধান প্রশ্ন, তোমার রচনাটী চমৎকারী হইয়াছে কি না? 'কাব্য' হইয়াছে কি না? না হইলে, উহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে।

সংস্কৃত সাহিত্যদর্শন, সাহিত্যের উপাদানচিন্তায়, সত্য কিংবা তথ্য অথবা শিবকে প্রধান না করিয়া 'রসাত্মকতা' বা চমৎকারিতাকেই মুখ্য করিয়াছিল। উহাতেই হয়ত Realism, Naturalism প্রভৃতির গোঁড়ামী এবং অতিরিক্ততা সংস্কৃতসাহিত্যে মাথা তুলিতে পারে নাই। কালিদাস কিংবা শেক্‌সপীয়র তাঁহাদের কাব্যে Realist নহেন, Naturalistও নহেন, Moralistও নহেন—তাঁহারা 'কবি'; তাঁহাদের কাব্য আনন্দ-চমৎকারী। তাঁহারা মনুষ্যের সমক্ষে তাহার বিজ্ঞানাত্মার ও আনন্দাত্মার স্বাধীনতাবোধ এবং স্বধর্ম্মপ্রত্যয়ের সাহায্য করিয়াই 'সুন্দর', চরিত্রচিত্রনের কারণেও নহে, তথ্যপ্রদর্শনের সামর্থ্যেও নহে। 'সচ্চিদানন্দময়' রসের অনির্ব্বচনীয় 'ম্যাজিক', বিষয়বতী প্রকৃতি এবং মনের স্থিতিবন্ধনী প্রতীতিশক্তি উহাদের আছে; সুতরাং, বিধাতৃশক্তির রহস্যময়ী পরিস্ফূর্ত্তিই উহাদের মধ্যে আছে।

আধুনিক নাটক-নবেল, অথবা Realism ও Naturalism প্রভৃতি আদর্শ-বিরোধী সাহিত্যের পাঠককে একটি তত্ত্ব—বেদশিষ্য ভারতীয় সাহিত্যের একটি বিশেষ কথা—নিয়তভাবেই মনে রাখিতে হয়। এগুলি প্রাধান্যতঃ, কেবল মনুষ্যের 'প্রাণ'ধর্ম্ম বা Animalismএর সাহিত্য; বড় জোর (এবং তাহাও 'উৎকর্ষ' স্থলে) Rationalism বা মনস্তত্ত্বের সাহিত্য। মনুষ্যের স্বীয় অন্তরঙ্গে 'বিজ্ঞানাত্মা' বা সমুচ্চ 'ধর্ম্মাত্মা' এবং 'আনন্দাত্মা

বলিয়া, Spirituality বলিয়া যেই 'তত্ত্ব' আছে, আমাদের আধুনিক সাহিত্য' উহাকে বাস্তবিক 'স্পর্শ'ও করে না ; স্বীকারও করে না। সুতরাং, উহাদের 'সত্য'তা বা 'প্রকৃতত্ব' বলিতে (দর্শনের তরফ হইতে) কেবল 'জান্তব'ধর্ম্মের সত্যতাই বুঝিতে হয়। ইয়োরোপে, যেমন তাহার 'আধুনিক সাহিত্যে', তেমন আধুনিক সঙ্গীত, চিত্র বা ভাস্কর্য্যের ক্ষেত্রেও নানা আকারে মনুষ্যের 'আত্মার' ধর্ম্মবিরোধী এবং 'অধ্যাত্ম তত্ত্ব'বিদ্রোহী আদর্শই দেখা দিয়াছে—Impressionism, Cubism, Vorticism, Futurism প্রভৃতি! যেমন সাহিত্যে, তেমন চিত্রে এবং ভাস্কর্য্যেও একই 'রীতির' 'অধ্যাত্ম' সত্যবিদ্বেষী একটা 'গোঁ'—কেবল জান্তবধর্ম্মী একটা অতিরিক্ততা ও চরমপন্থিতা! সকলের মুখে আপাততঃ যেন এক কথা—'প্রাকৃত' ও 'সত্য'। এ স্থানে উহাদের শিবত্বের, নৈতিক 'ধর্ম্মতা'র বা অন্তরাত্মার সমালোচনা করিতে চাই না। সমস্তের 'সামান্য লক্ষণ এই যে উহারা কেবল মনুষ্যের 'অন্নময়' ভূমির প্রিয়গ্রাহিতা, কেবল বৈশিষ্ট্যবিহীন 'প্রাণ' এবং 'রয়ি'র সাহিত্য। মানুষের 'তৈজস' প্রকৃতি অথবা 'প্রাজ্ঞ' প্রকৃতির কোন 'সত্য' বিষয়ে কোনরূপ ভাবনা-চিন্তা অথবা জল্পনা-কল্পনার ধার দিয়াও উহারা চলে না। এস্থলেই উহাদের 'সত্য'বাদের সীমা। এই সীমা হইতে, এরূপ Limitation হইতে সুতরাং কবিগণের কল্পনা দৃষ্টি এবং ভাবাত্মার প্রসারিতার ক্ষেত্রেই একটা 'সীমা' আসিয়া গিয়াছে। উহাকে কোনরূপে উত্তীর্ণ হইবার জন্য ইয়োরোপের 'কবি-কল্পনা'র পক্ষেও যেন ক্ষমতা নাই। উহার প্রধান 'রহস্যস্থান' এই যে, উহারা মনুষ্যের 'অন্নময়' প্রকৃতি ব্যতীত অপর কোন 'প্রকৃতি' স্বীকার করিতেই চায় না ; কোন তর্ক-যুক্তি-বিচারে যে অগ্রাহ্য করে তাহা নহে, অনেকের অধ্যাত্ম 'ধাৎ' এবং মেজাজ-মর্জ্জিই উহার বিদ্রোহী। যেমন Philosopher Artist 'বার্ণার্ড শ'র quintessence of Ibsenism এবং Revolutionist's Hand Book গ্রন্থে, তেমন সকল 'সত্য ও প্রকৃত'বাদী আধুনিক শিল্পীর মধ্যেই, মনুষ্যের 'অধ্যাত্মতত্ত্ব' বিষয়ে প্রশ্নটুকু পর্য্যন্ত সতর্কভাবেই পরিত্যক্ত। আবার, কেবল উহার পাশ কাটিয়াই যে তাঁহারা চলেন, তাহা ত নহে; বরং

উহার নির্ব্বিচার তাচ্ছিল্য ও নিশ্চিন্ত নিন্দাবাদেই তাঁহাদের গ্রন্থ পরিপূর্ণ।

এ স্থানে বলিয়া যাইতে পারি যে, মিল্‌ট'নর Paradise Lost, শেক্‌স্‌পীয়রের ম্যাক্‌বেথ ও হ্যামলেট, দাঁতের Divine Comedy, শেলীর প্রমাথিয়ূস, গ্যেঠের ফাউষ্ট্‌, ব্রাউনীংয়ের পারাসেল্‌সস্‌ প্রভৃতি স্বল্পকতিপয় গ্রন্থ মনুষ্যের তৈজস বা প্রজ্ঞাব ক্ষেত্রকে যে টুকুন এবং যতদূর স্পর্শ করিয়াছে, সে পর্য্যন্তই ইয়োরোপীয় সাহিত্যের 'অধ্যাত্ম সামা'! ইয়োরোপীয় গীতি কবিতা (এবং আধুনিক সাহিত্যে গীতি ক'বতাই কবি-আত্মার 'স্বধর্ম্ম' ও আত্মিক ক্ষুধাতৃষ্ণার পরিধি টুকু মুখ্যভাবে প্রকাশ করে) উৎকর্ষ ক্ষেত্রে Pantheism এর তরফেই যে-কিছু অগ্রসর! স্পীনোজা হইতে নিজ্জে (Nietze) পর্য্যন্ত জর্ম্মন দার্শনিকগণ নানাদিকে (আস্তিক্য অথবা নাস্তিক্য বুদ্ধিতে) Pantheism কেই মনুষ্যের 'অন্নময়' ক্ষেত্রের 'কাজে লাগাইতে' চেষ্টা করিয়াছেন বই ত নহে! ব্লেক্‌-ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-শেলী হইতে টমসন পর্য্যন্ত ইংরেজ কবি ও গ্যাঠে হইতে ডিহ্‌মল্‌ পর্য্যন্ত জর্ম্মনকবিগণের মধ্যে প্রাধান্যতঃ Pantheism এর মধ্য দিয়াই মনুষ্যের অধ্যাত্মসত্যের বার্ত্তা কিছু-কিছু লাভ করিতে পারি। গল্প-নবেলের ক্ষেত্রেও হুগো, টল্‌ষ্টয় বা হ'থরন্‌। তদ্ভিন্ন বিশুদ্ধ জড়বাদের ক্ষেত্রে সমধিক অগ্রগামী এবং সর্ব্বাধিক প্রতিষ্ঠাপন্ন শিল্পী এইচ্‌, জি, ওয়েলস্‌—তাঁহার উপার্জ্জনের মূল্য বিষয়ে আমরা সম্মুখে অন্যত্র বিবেচনা করিব। টল্‌ষ্টয়ের আনা কারনীনের প্রধান মহাত্ম্য এই যে, উহাতে লেখক, জীবের মধ্যে যে একটা ধর্ম্মাত্মা (Moral Essence) আছে, একটা যে তৈজস বা প্রাজ্ঞ অবস্থা আছে, তাহা গ্রন্থটীর অন্তস্তত্বে যেন স্বীকার করিয়াছেন। আনা-ভ্রন্‌স্কীর অবৈধ মিলন ঘটাইবার পর, যেন অতিরিক্ত কামুকতার 'অদৃষ্টনীতি' অনুসরণে, এবং জীবের ধর্ম্মক্ষেত্রের অলঙ্ঘ্য নিয়তিচক্রের অনুসারেই, উভয়ের জীবনতন্ত্র এবং গ্রন্থের ঘটনাচক্রকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, অপিচ যথোচিত উপসংহারে লইয়া গিয়াছেন! সেরূপ, হ'থরনও তাঁহার Scarlet Letter নামক উপন্যাসগ্রন্থে জীবের আধ্যাত্মিক ধর্ম্মজগতের 'সত্য'

এবং নিয়তির 'ঋত'আদর্শেই নায়কনায়িকার জীবনচক্র নিয়মিত করিয়াছেন। যাহা হথরন্ ও টলষ্টয়ে আছে, বলিতে গেলে, তাহা ইয়োরোপীয় সাহিত্যের মধ্যে 'কোটিকে গুটিক'! আধুনিকের Sex Psychology বা Sex Idealism এর 'ধাং' পর্য্যন্ত Rationalismকে ছাড়াইয়া উঠে না।

সাহিত্যের উপাদানতত্ত্বে বা উহার গঠনে সত্যের স্থান কোথায়, 'সৌন্দর্য্য' ও 'শিব'তত্ত্বের তুলনায় আনিয়া তাহা আমরা পর-পর প্রসঙ্গে দৃষ্টি করিব। বর্ত্তমান সূত্রে কেবল এ'টুকুন অনুধাবন করিতে হয় যে, সত্যই সাহিত্যের উপজীব্য এবং 'সত্যই' উদ্দেশ্য। রসাত্মক ভাবে সত্যকে লক্ষ্য করিলেই হয় কাব্য বা সাহিত্য; অন্যথা দর্শন, বিজ্ঞান, Essay, Polemic, ধর্ম্মশাস্ত্র ও সমাজ তত্ত্বেই উক্ত 'সত্য'বাদ পর্য্যবসিত হইতে পারে। এ' স্থানেই জীবের অপর ভাবং ভাষাব্যাপার মধ্যে 'সাহিত্য'জাতির ভেদ। এ সমস্ত সত্ত্বেও সাহিত্যে সাধারণতঃ যাদৃশ এবং যে-জাতীয় সত্যের দর্শন পাওয়া যায়, সত্যবাদীগণ যাহার উপর এতটা জোর দিয়া থাকেন, উহার সমস্তই 'অন্নপুরী'র সত্য। জীবের তৈজস ও প্রাজ্ঞ প্রকৃতি বলিয়া যে সত্য-প্রকৃতি আছে, তাহা কবিগণের অনেকেই সন্ধান পান না, জানেনও না। ভারতে জীবনসমস্যা দর্শন করার ও বিচারমার্গে 'পরিদৃষ্ট' সত্যকে জীবনেই প্রাণপণে অনুসরণ করার যেই 'ধারা' প্রবর্ত্তিত আছে, 'সত্য'কে বাস্তবজীবনে উপলব্ধি (Realise) করার যেই 'সম্প্রদায়' প্রচলিত আছে, ইয়োরোপের 'দার্শনিক'গণের মধ্যেও তাদৃশ কিছুই প্রবর্ত্তিত নহে। সুতরাং ইয়োরোপে 'সত্য'বিষয়ক সকল 'দর্শন' কেবল Rationalism রূপে এবং কেবল মানুষের মনোবৃত্তির ব্যায়ামরূপেই থাকিয়া যাইতেছে! অতএব, জগতে জীবের উন্নততর লোকের 'সত্য'চিন্তা ও তদ্বিষয়ক উপলব্ধির কাব্যকবিতা বা সাহিত্য অত্যন্ত স্বল্প বলিতে হইবে। সংস্কৃত সাহিত্যে জীবের অধ্যাত্মদেহের সত্যচিন্তা ও তদ্রূপ সত্য-বিষয়িণী রসকবিতা কিছু কিছু আছে; হয়ত অনেক স্থলে কেবল অব্যাকৃত 'সঙ্কেত' রূপে অন্নপুরীর বিবরণের মধ্যেই মিশ্রিত আছে। এ দিকে যেমন

ইয়োরোপীয় সাহিত্যের, তেমন মনুষ্যজগতের সকলসাহিত্যচেষ্টায় যে একটা পরম সীমা এবং সঙ্কীর্ণতা, তাহার স্বরূপ না বুঝিতে পারিলে বিশ্বসাহিত্যের 'সত্য'উপাদানটীর প্রকৃত আয়তন এবং উহার অভাব-অভিযোগও হৃদয়ঙ্গম হইবে না। উহা চিন্তা করিয়া আমরা এ বিষয় উল্লেখ মাত্র করিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছি। উক্তসকল সত্যকে দর্শন ও প্রকাশ করা, সাহিত্যের বিভাব অনুভাবের প্রণালীতে উহাদিগকে অধিগত ও 'প্রমূর্ত্ত' করা হয়ত অত্যন্ত 'কঠিন'। উহা অল্পেই হয়ত ধার্ম্মিকী বা নৈতিকী গোঁড়ামিতে পরিণাম লাভ করে—'পৌরাণিকতা'য় (১) পর্য্যবসিত হয়; কিন্তু, উক্ত 'অভাব'টুকুই বুঝিতে হইবে। বলিতে কি, মানবের সাহিত্যচেষ্টা তাহার স্বলোকের ও স্বধর্ম্মের সকল 'সত্য' বিষয়ে কেবল যে অপূর্ণ তাহা নহে, নিদারুণ অন্ধতাপূর্ণ এবং অভাবনীয় অভাব গ্রস্থ! যে সচেতন কবি প্রাণেপ্রাণে এ অভাবটুকু বুঝিতে পারিবেন তিনি হয়ত নিদারুণ হতভাগ্য হইবেন। তাঁহার জীবনে অপর কোন কবিকৃত্য বা সংসারের 'দাবিপূরণ' বলিয়া অপর কোন কর্ত্তব্য হয়ত থাকিবে না; তিনি প্রাণপণে মানব সাহিত্যের এই চূড়ান্তিক অভাব ও চূড়ান্তের সমস্যানুধানেই হয়ত নিযুক্ত হইয়া যাইবেন। আধুনিকের কর্ষণা এবং শিল্পরীতিতে উক্ত 'চূড়ান্তের বার্ত্তা' দেওয়াটাই হয়ত তাহার একান্ত কৃত্য রূপে না দাঁড়াইয়া পারিবে না।

(১) মনুষ্যজীবনের প্রধান সত্যসমস্যা—জগদাত্মা, জীবাত্মা, অমরত্ব, জন্মান্তর, অবতারবাদ ও জীবনযাপনে 'ধর্ম্মনীতি' প্রভৃতি বিষয়ে এককালে আর্য্যভারতে যেই সুবিপুল সাহিত্যচেষ্টা ঘটিয়াছিল উহার নামই প্রকৃতপ্রস্তাবে 'ইতিহাস কাব্য' বা পুরাণ উহা কালক্রমে 'সাহিত্যিক আদর্শ বিস্মৃত হইয়া কেবল সাংপ্রদায়িকতা ও গোঁড়ামীর বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে। হেগেল এজন্য (উহাদের নিন্দা করিয়াই) নাম দিয়াছিলেন Oriental. তিনি বলিতে চাহেন, তিন-প্রকৃতির সাহিত্য আছে—ক্লাসিক, রোমাণ্টিক এবং ওরিয়াণ্টেল। হেগেলের সংজ্ঞাটীর যুক্তিবিচার করিতে চাই না। ওরিয়াণ্টেল আদর্শের মর্ম্মস্থলে যে জীবনের চূড়ান্ত সত্য দর্শন ও সত্য প্রকাশের প্রমূর্ত্তি আদর্শ এবং উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিক লক্ষ্য ছিল, আমরা উহার 'স্বরূপ'কেই প্রসঙ্গসূত্রে লক্ষ্য করিতেছি।

আত্মা, অমর জীবন ও পরলোক যে আছে, মানবিক মর্ত্যলোকের পরেও সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর স্তরে অগণ্য জীবলোক যে আছে, নিত্যনিয়ত Universal Law ও ঋতের সাম্রাজ্য যে লোকলোকান্তরে বিস্তারিত আছে, উহা ভারতবর্ষে কেবল একটা Truth নহে Truism। 'আগুণ দগ্ধ করে' এ সত্য যেমন প্রমাণের আবশ্যক রাখে না, মানুষ দাহিকাশক্তির কারণ না বুঝিতে পারিলে বা উহার কোন যুক্তি যোজনা করিতে বা Explanation দিতে না পারিলেও, উহাতে উক্ত 'সত্য'টীর কিছু মাত্র আসিয়া যায় না; ভারতের ঋষি ও দার্শনিক সেজন্য পরলোকের 'অস্তিত্ব'প্রমাণে পরোক্ষ যুক্তিতর্কের প্রয়োগ করিতে কিছুমাত্র চেষ্টাই করেন না।

২৮। জীবতত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রকোটির 'সত্য' ও ভারতীয় সাহিত্যে উহার 'আগ্রহ' চেষ্টা।

ইয়োরোপ-আমেরিকা এখন Spiritualism নাম দিয়া, শত সহস্র ঘটনা বৃত্তান্তের সংগ্রহ ও যুক্তি গবেষণা পূর্ব্বক পরলোক প্রমাণে চেষ্টা করিতেছে। একাদশ সংস্করণের Encyclopœdia Brittanica আশঙ্কা করিতেছেন যে, মনুষ্যের ধর্ম্ম ও দর্শনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই অধ্যাত্মবাদের ভবিষ্যৎ গভীরার্থময় ও অভাবনীয় ভাবেই সমুজ্জ্বল! আত্মা এবং পরলোক প্রভৃতি বিজ্ঞানসঙ্গত ভাবে প্রমাণিত হইয়া গেলে, মনুষ্যের ইদানীন্তন ধর্ম্ম ও কর্ম্ম জগতে, জীবের জীবনযাপনের আদর্শে, তাহার দর্শন বিজ্ঞান ও সাহিত্য ক্ষেত্রে যে অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন এবং অভাবনীয় সম্মার্জ্জনীব্যাপার ঘটিয়া পড়িবে—একেবারে বিপ্লব ঘটিয়া যাইবে! (২) বলিতে পারি, এ স্থানে Encyclopeadiaর একটা অনিচ্ছা-স্বীকৃত কথা—নিজের অনভিমত সত্যের বার্ত্তা।

২৯। অধ্যাত্ম সত্যবাদ ও সাহিত্যে ওরিয়াণ্টেল আদর্শ।

(২) এস্থলে আমাদের কথা, সেরূপ বিপ্লবে অন্ততঃ ভারতীয় সমাজে অনেকদিকেই কোন সবিশেষ বিপ্লবের প্রবাহ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হয়ত নাই; অপর দিকে অজস্র দোষ সত্ত্বেও বৈদিক ধর্ম্ম ও সমাজতন্ত্র সে সমস্ত 'অধ্যাত্ম সত্য' স্বীকার পূর্ব্বক' 'বর্ণাশ্রম' আদর্শেই গঠিত এবং নিয়ন্ত্রিত। তবে 'অধ্যাত্মবাদ কখনও Science

সত্য! সত্য বিষয়েই আবার মনে রাখিতে হয় যে, মনুষ্য 'ত্রিলোকী' জীব বলিয়া, যুগপৎ ত্রি-লোকবাসী তত্ত্ব বলিয়া, তাহার দৃষ্টির 'অধিকার'ভেদে ত্রিলোকের সত্যই যদৃচ্ছাক্রমে পরিদৃষ্ট ও সাহিত্যে প্রকাশিত হইতে পারে! ভারতবর্ষ অধিকারবাদের দেশ—যে 'অধিকার বাদ' অধ্যাত্মক্ষেত্রে পরম সত্য, অথচ ভবজীবনে যাহাকে পরম সতর্কভাবেই গ্রহণ ও অনুসরণ করিতে হয়। সংসার ও সমাজজীবনে আধ্যাত্মিক 'অধিকার'তত্ত্বের 'সত্য' প্রয়োগ করিতে গিয়া যে মনুষ্যের প্রতিনিয়ত ভ্রম হইতে পারে, ভারতবর্ষের সমাজতন্ত্রেও এরূপ ভ্রম যে নানাদিকেই আপন্ন হইয়াছে, সে অভিজ্ঞতার 'তিক্তবড়ী' চিন্তাশীল ভারতীয় মাত্রকে নিদারুণ দৈন্যলাঞ্ছনায় প্রতিদিনই গলাধঃ করিতে হইতেছে। তথাপি, বুঝিতে হইবে, সত্যের দ্রষ্টা, সন্ধাতা ও অন্বেষ্টা ভারতে অনেকেই জন্মগ্রহণ করিয়া এ দেশকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সংসারতন্ত্রে অধ্যাত্মসত্যের প্রয়োগ বিষয়ে, দেশকালপাত্রে উহার যুক্ততার জ্ঞান বিষয়েই বর্ত্তমানে এতদ্দেশে নিদারুণ অভাব! মনুষ্যের পার্থিবতত্ত্বের নিম্নতম সত্য হইতে চূড়ান্ততম সত্য পর্য্যন্ত এতদ্দেশের 'ঋষিদৃষ্টি' অনেক দিকে দেখিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে উহার সম্যক্ বোধ এবং অনুধাবনেই হয়ত যোগ্য অধিকারীর অভাব—উহার

Laboratoryতে প্রমাণসহ হইবে কি? জীবের অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ ব্যতীত অধ্যাত্ম সত্য বা উহার প্রমাণগুলি বোধগম্য হইবে কি? উহা কখনও মানুষের 'স্থূলদৃষ্টি' গম্য হইবে কি? এখনও সহস্র সহস্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ—জড়তাক্ষেত্রীয় প্রমাণ সত্ত্বেও বহুলোক উহাকে অগ্রাহ্য করিতেছে। হয়ত ইয়োরোপীয় Spiritualist গণের ব্যাখ্যা বুঝিতে না পারিয়াও অগ্রাহ্য করিতেছে। স্বকীয় প্রকৃতি, রুচি ও মেজাজের গঠনই অনেককে অধ্যাত্ম-তত্ত্বে বা পরলোক চিন্তায় দৃষ্টি করিতে দেয় না। প্রত্যক্ষ দেখিলেও বিশ্বাস করিতে দেয় না। ইহাইত 'অদৃষ্ট'! এ 'অদৃষ্ট' কোনও Science ঘুচাইতে পারিবে কি? ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে একটা যে 'পর্দ্দা' আছে, উহা জড়বিজ্ঞান পথে কদাপি লঙ্ঘনীয় নহে—সৃষ্টির মধ্যে যেই মায়াশক্তি বা স্রষ্টার ইচ্ছাশক্তি এবং বিবর্ত্ত নীতি কার্য্য করিতেছে, জড় এবং জীবের, নরলোক ও সূক্ষ্মলোকের বা ইহ-পরলোকের মধ্যবর্ত্তী বেড়াটুকুন উহারই সম্মত—উহাই সৃষ্টির 'ঋত' ও জীবের 'অদৃষ্ট'।

যথার্থ 'বোদ্ধা' ব্যক্তিও হয়ত "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ"। অনেকের পক্ষে এ'কালে ঋষিগ্রন্থ যে একেবারে অপাঠ্য, সে নির্দেশটাই হয়ত সমুচিত হইবে। কোন কোন ভাণ্ডের পক্ষে সত্যবিশেষ হয়ত একেবারে 'আগুণ' —উহাকে গ্রহণ বা ধারণ করার যোগ্যতা টুকুই তাহার নাই। চূড়ান্তের 'তত্ত্ব' ও 'সত্য' বিষয়ে এরূপ 'দ্রষ্টা'গণের মধ্যেই কেহ লিখিয়াছেন 'পঞ্চদশী', কেহ লিখিয়াছেন 'শ্রীমদ্ ভগবৎগীতা', কেহ 'মনুসংহিতা', কেহ বা 'শ্রীমদ্ভাগবত'! কেহ কেহ লিখিয়াছিলেন রামায়ণ-মহাভারত। উহাদের কোনটী হয়ত আধুনিকের 'সাহিত্য শিল্প' পদ্ধতির সঙ্গে 'সঙ্গত' হইয়াছে, কোনটী অংশত হইয়াছে, কোনটী বা একেবারেই হয় নাই—হয়ত, হেগেলের Oriental সংজ্ঞারই যোগ্য হইয়াছে। এ দেশের এক প্রাচীন ঋষিকবি সত্যের অনুধ্যান এবং মহাভাবের বাধ্য হইয়া এবং মনুষ্য জীবনের চূড়ান্ততত্ত্ব দর্শনে সমুদ্দীপ্ত হইয়াই, 'বাল্মীকি'র নাম দিয়া, নিজের রীতিতে এক 'মহাকাব্য' চেষ্টা করিয়াছিলেন—যোগবাশিষ্ট। উহাতে অভাবনীয় পরিবর্ণনা ও পরিমূর্ত্তনার সঙ্গে সঙ্গে অতুলনীয় দর্শনী শক্তির সংযোগ আছে। তিনিও বলিতে চাহিয়াছেন, নিজের মহাপ্রাণে অনুভূত একটী মহাসত্য— বিশ্বসৃষ্টির এবং মনুষ্যজীবনের চূড়ান্ত তত্ত্ব! গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করিয়া দেখিলেন—শ্রোতা নাই! কে শুনিবে? কোটিকোটীর মধ্যে হয়ত গুটিকতক মাত্র শুনিতে, বুঝিতে এবং সত্যকে জীবনে প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিবে! তথাপি, তিনি আত্মদর্শনের 'ঋত' বার্ত্তা এবং অমৃতের সিদ্ধান্তটুকু, পরম উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নাচিয়া নাচিয়াই ত গাহিয়া গিয়াছেন—

> ঊর্দ্ধবাহু র্বিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিচ্ছৃণোতি মে।
> দীর্ঘং স্বপ্নমিদং বিদ্ধি দীর্ঘং বা চিত্তবিভ্রমম্॥

জগতের বা মনুষ্যজীবনের চূড়ান্ত সত্যের অনুসন্ধাতা, শ্রোতা অথবা বোদ্ধা জগতে কয়জন? বুঝিতে পারিলেও 'সত্য'কে অধিগত করিবার জন্য চেষ্টা-চরিত্রের মেজাজ টুকুই বা কয়জনের অধিকারে? অনেকের পক্ষে,

সংসারের সহস্রকড়া ৯৯৯ জনের পক্ষে, বরঞ্চ আমাদের এই 'স্বপ্ন'লোকের ঋত, সত্য বা 'ধর্ম্ম'গুলিকেই জানিয়া এবং উহাদের 'সদ্‌ব্যবহার' করিয়া চলিতে পারাই আশু করণীয়—সন্নিহিত এবং প্রধান কর্ত্তব্য। উহার জন্যই ত ভারতের 'অধিকার'বাদ ও বর্ণাশ্রম আদর্শ। জীবনের চূড়ান্ত 'গৌরীশঙ্কর' যাত্রীর সঙ্গে কচিৎ—কদাচিৎ দেখা! তাঁহাদের মধ্যেও আবার অধিকাংশই হয়ত কেবল মহাভাবের উদ্দীপনায়, কেহ বা আত্মবঞ্চনায় অথবা কেবল 'নাম ডাক শুনিয়া'ই বাহির হইয়া আসিয়াছেন! তবু, সত্য। ঋষি ত স্বীয় হৃদয়ে এবং 'মহাগুহা'য় অনুভূত মহাসত্যের বার্ত্তাটুকু মহনীয় ভাবেই দিয়া গিয়াছেন! মনুষ্যের সাহিত্যভাণ্ডারে উহার স্থান থাকুক! জড় পরমাণু হইতে মহান্ পর্য্যন্তই সাহিত্যিক সত্যের অধিকার। রেনল্‌ড্‌, জোলা ও বার্ণার্ডশ' হইতে ব্যাসবাল্মিকী এবং প্রজাপতি ঋষি পর্য্যন্ত সাহিত্যিক প্রকাশরীতির অধিকরণ প্রসারিত! যাহার অধিকার আছে—

"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত!"

গ

তার পর সৌন্দর্য্য। প্রবেশ দ্বারেই বুঝিতে হয় যে, সৌন্দর্য্যের স্বরূপ কি, সেরূপ প্রশ্ন লইয়া সাহিত্যদর্শন মাথা ঘামাইতে চায় না।

৩০। সৌন্দর্য্যকে বস্তুরূপে নিরূপণ করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত।

সৌন্দর্য্য বলিয়া কোন 'পদার্থ' বা 'বস্তু' আছে কি? উহা নিরূপণ করিতে গিয়া মানুষ সৌন্দর্য্যতত্ত্ব (Aesthetics) বলিয়া একটী বিপুল বিস্তারিত বিজ্ঞানপ্রচেষ্টা করিয়াছে। বলিতে পারি, সৌন্দর্য্যের তত্ত্ব কিংবা 'রহস্য' পদার্থকে 'গণ্ডীবদ্ধ' করিয়া ধরিতে পারে নাই; সৌন্দর্য্যকে স্থূলহস্তের মুষ্টিনিবদ্ধ করিতে পারে নাই। এদিকে মনুষ্যের তুর্জ্জনীচেষ্টা নিস্ফল হইয়াছে।

নিস্ফলতার প্রধান হেতু মনুষ্যের নিজের মধ্যে। মনুষ্যের 'দেহতত্ত্ব' এবং 'মনস্তত্ত্ব'ই যে উক্তরূপ নিরূপণের অতিপ্রবল নিষেধক পক্ষ!

প্রথমতঃ, মনুষ্যের 'দৈহিক সৌন্দর্য্য'বুদ্ধির ক্ষেত্রেই ত প্রবল নিষেধ—ককেসীয়, মঙ্গোলীয়, নিগ্রো, মালয়, আমেরিক প্রভৃতির আকৃতিক্ষেত্রেই মনুষ্যের দেহসৌন্দর্য্যের স্বরূপগত জাতিভেদ এবং তদনুবর্ত্তি রুচিভেদ ও মতভেদ। দেহক্ষেত্রের 'সুন্দর'কে সর্ব্বসামান্য ভাবে নির্দ্দেশ করা মনুষ্যের সাধ্যের মধ্যে নহে। সেরূপ, মনের ক্ষেত্রেও, মনুষ্যের মনোধর্ম্ম গতিকেই সৌন্দর্য্যকে 'বস্তুগত্যা' উদ্দেশ করা মানুষের সাধ্য নহে। মনুষ্যত্বের বিভিন্ন 'গুহা' ভূমি, মনুষ্যের 'দেশ-কাল-পাত্র'গত বিভিন্ন মনোরুচি, শৈশব-যৌবন-জরা প্রভৃতি দশা এবং রুগ্ন অথবা সুস্থ অবস্থাজনিত মেজাজ-মর্জ্জি, আবার, সুপথ্য অথবা কুপথ্যপ্রিয়তার বিভিন্ন চারিত্রগতি—এসমস্ত চিন্তা করিলেই বুঝিব যে, মনুষ্যের মনোদৃষ্টি সমক্ষে 'স্থির সুন্দর' বলিয়া কোন 'বস্তু' হইতে পারেনা। সৌন্দর্য্য ধারণায় Subjective লক্ষণ বা ব্যক্তিগত চশমার গুণধর্ম্ম অত্যন্ত প্রবল বলিয়াই তাদৃশ 'নিরূপণা' সম্ভবপর নহে। তথাপি, মনুষ্যমাত্রের মধ্যে 'সুন্দর' বলিয়া একটী ভাববোধ যে আছে, তাহা ত সত্য কথা! Evolutional মনস্তত্ত্ববিদ্যা বলিতেছে জীবমাত্রের মধ্যেই উহা অল্পাধিক পরিমাণে আছে। বেদান্ত বলিবেন পরমাণুর মধ্যেই বীজভাবে আছে।

টলষ্টয় What is Art গ্রন্থে মনুষ্যের সৌন্দর্য্যবুদ্ধি ও সৌন্দর্য্য স্বরূপকে ধরিবার মানুষী চেষ্টাবিষয়ের একটা ইতিহাস মোটামোটি সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন। কেবল উক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণটুকু পাঠ করিলেই বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, মনুষ্যত্বের ক্ষেত্রে 'সুন্দর'কে 'বস্তু'রূপে, সর্ব্ববাদিসম্মত ভাবে স্থিরনির্দ্দেশ করার আশা মানুষের 'দুরাশা' মাত্র।

সৌন্দর্য্য আছে এবং মনুষ্য সমক্ষে প্রতীত হইতেছে; অথচ মনুষ্যের বাক্যমনের ধৃতিমুষ্টির অতীতে থাকিয়াই যেন প্রতীতি জন্মাইতেছে। সৌন্দর্য্যবুদ্ধি মনুষ্যকে চালাইতেছে, তাহার সর্ব্ব প্রকার উন্নতি, শ্রেয়ঃপ্রেয়, ভালমন্দ এবং সভ্যতা ও ভব্যতার বুদ্ধিকেও পরিচালিত করিতেছে—অথচ স্বয়ং বাস্তবরূপে 'অধৃত' এবং অপ্রাপ্ত থাকিয়াই চালিত করিতেছে। ইয়োরোপীয় সৌন্দর্য্যতত্ত্বের ইতিহাস, আমরা ভারতবর্ষীয়ের সমক্ষে,

এদিকে কেবল মনুষ্যশক্তির সীমাটুকুন এবং সৌন্দর্য্যের অবাঙ্মনসোগোচর স্বরূপটুকুই যেন সমুজ্জ্বল ভাবে প্রমাণিত করিয়া দেখাইতেছে!

ভারতের সাহিত্যদার্শনিক রূপের বাস্তবী মূর্ত্তি নিরূপণ করার কিছুমাত্র আবশ্যক অনুভব করেন নাই; বাহিরের দিকে দৃষ্টিই করেন নাই। তাঁহার ছিল মনস্তত্ত্বিক (Psychological) দৃষ্টি! তিনি মনোবিজ্ঞানীয় আন্তর দৃষ্টিতেই সৌন্দর্য্যকে বুঝিতে চাহিয়াছেন—আনন্দজনক বা 'মানুষের যাহা ভাল লাগে'? অতএব সে দিক হইতেই সুন্দরের নামকরণ করিয়াছেন 'রসাত্মক'। এদেশের সাহিত্যদর্শনে রসাত্মক পদার্থেরই অপর নাম, বলিতেপারি, 'সুন্দর'। দার্শনিক উক্ত রসকে বুঝিয়াছেন, উহা 'অনির্ব্বচণীয় স্বরূপ,—উহা 'আনন্দরূপং অমৃতং যদ্বিভাতি"। সৌন্দর্য্যের বা রসাত্মকের অনির্ব্বণ্যতার এবং উক্ত রহস্যতার প্রধান কারণটাও চিনিয়াছেন—ওই রহস্যের মধ্যে সৃষ্টির 'চূড়ান্ত রহস্য' টুকুই লুক্কায়িত কিনা! সুতরাং, সৃষ্টির 'নিদান'কে জানা বা পাওয়া যাহা, সৌন্দর্য্যের কিংবা রসের স্বরূপকে পাওয়াও ত তাহাই হইবে। এবং ঈদৃশ না-পাওয়ার মধ্যেই ত জগতের রহস্য এবং উহার 'গতি' নামক ব্যাপারের চরম হেতুটুকুন লুকাইয়া আছে! এজন্য ঋষি জগতের অজ্ঞাত নিদানটীকে ভাবপথে উদ্দেশ করিতে গিয়া যেমন বলিয়াছেন—"রসো বৈ সঃ"; আবার, রস বা আনন্দের তত্ত্বকে চূড়ান্তে নির্দ্দেশ করিতে গিয়াও, বলিয়া ফেলিয়াছেন, "ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি"। মানুষের জ্ঞানোত্তমা দৃষ্টি যাহাকে দেখিয়াছে "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্", তাহার ভাবোত্তমা দৃষ্টি তাহাকেই দেখিয়াছে 'সচ্চিদানন্দম্'। বলিয়া যাইতে পারি, এই কথা কয়টীর মধ্যে যেমন সাহিত্যদর্শনের চূড়ান্ত তত্ত্বের নির্দ্দেশ আছে; তেমন মনুষ্যজীবনের বিষয়ে বৈদিকদর্শনের চূড়ান্ত বার্ত্তাটাও সংক্ষেপিত আছে—

৩১। ভারতের সাহিত্যদর্শন মনোবিজ্ঞানীয় রীতি অনুসরণে 'সুন্দর'কে রসাত্মক স্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছে।

অন্যো 'বিজ্ঞানময়'তঃ আনন্দময় আন্তরঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যো ইতি বৈদিকদর্শনম্॥ পঞ্চদশী।

জগতে মনুষ্যের অন্ন-প্রাণ-মনো বুদ্ধির 'প্রতীতি' ক্ষেত্রে, বিভিন্ন সম্বুদ্ধির ক্ষেত্রে 'রসাত্মক'কে লাভ করা, 'রস স্বরূপ'কে উপলব্ধি করাই যেমন ঋষিচেষ্টার, তেমন কবিচেষ্টার প্রধান লক্ষ্য।

অতএব, আমরা এ গ্রন্থে অনেক স্থলেই সুন্দর বা সৌন্দর্য্যশব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইব; এবং উহার অর্থটাও বুঝিতে হইবে মনুষ্যের বুদ্ধিদৃষ্টির সমক্ষে 'প্রিয়'—তাহার অন্তরাত্মার উপভোগ্য বা রসাত্মক।

কাব্যের মধ্যে কবিগণ সৌন্দর্যের 'পরিবর্ণনা' দিয়া থাকেন—সৌন্দর্য্যকে নির্ব্বচনা পথে, বাক্যের অর্থগত করিয়া ধারণা করিতে এবং জগৎকে নিজের সহানুভবে 'জাগ্রৎ' করিতে চেষ্টা করেন। সুতরাং সৌন্দর্য্যের পরিবর্ণনা দুইটী প্রণালীতে সাহিত্যে সমুজ্জ্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

৩২। সাহিত্যে সৌন্দর্য্য ধারণায় বস্তুগত ও ভাবগত রীতি।

প্রথমতঃ, সৌন্দর্য্যের বস্তুগত বর্ণনা—উহাতে, কবি যে সুন্দর বস্তুটী দেখিয়া স্বয়ং প্রীত বা আবিষ্ট হইয়াছেন তাহার একটা যথাযথ Narrative বা বিবরণ দিতেই চেষ্টা করেন। দ্বিতীয়তঃ, সুন্দরের ভাবগত বর্ণনা বা কবির ব্যক্তিগত অনুভবের পরিবর্ণনা—উহাতে, কবির স্বীয় অন্তরাত্মায় সুন্দর বস্তুটী যে Impression সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে 'আবিষ্ট' করিয়াছে, সেই মনোগত ছবিটি এবং সঙ্গেসঙ্গে তাঁহার ভাবাবেশ ও প্রাণের স্ফূর্ত্তি টুকুই পাঠকের হৃদয়মধ্যে সংক্রামিত করিতে কবি চেষ্টা করেন। শ্রেষ্ঠ কবিগণ প্রধানতঃ শেষোক্ত রীতি টুকুই অবলম্বন করেন। জগতের 'অন্নময়'পুরীর সৌন্দর্য্য বর্ণনায়, বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য কিংবা মনুষ্যের দৈহিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিতেও তাঁহারা এরূপ 'ভাবগত' প্রণালী টুকুই অবলম্বন করেন। ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস ওইরূপে, শকুন্তলার সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতেগিয়া, শকুন্তলার দেহবস্তুর বর্ণনা অপেক্ষা, দুষ্মন্তের মনস্তত্ত্বের দিক্ হইতে Impression বা মনোমুদ্রিত ছবিটুকু এবং সঙ্গে সঙ্গে দুষ্মন্তের প্রিয়তাভাব এবং ভাবের আবেশ টুকুই পরিবর্ণিত করিতে চাহিয়াছেন—

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয় মলূনং কররুহৈ
রনাবিদ্ধং রত্নং মধু নব মনাস্বাদিতরসম্ ॥
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপ মনঘং।

ইত্যাদিতে শকুন্তলার 'রূপ বর্ণনা'য় দুষ্মন্তের চিত্তসংস্কার-গত ছবিটুকুই মুখ্যভাবে উদ্দিষ্ট হইয়াছে। সেরূপ, রবীন্দ্র নাথও 'মানভঞ্জন' গল্পে গিরিবালার রূপবর্ণনায় মনস্তাত্ত্বিক সংস্কার বর্ণনা এবং 'মানসী ছবি' ধারণার প্রণালীই অবলম্বন করিয়াছেন—

"গিরিবালার সৌন্দর্য্য অকস্মাৎ আলোক রশ্মির ন্যায়, বিস্ময়ের ন্যায়, নিদ্রা ভঙ্গে চেতনার ন্যায় একেবারে চকিতে আসিয়া আঘাত করে এবং একাঘাতে অভিভূত করিয়া দিতে পারে। তাহাকে দেখিলে মনে হয়, ইহাকে দেখিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। চারিদিকে এবং চিরকাল যেরূপ দেখিয়া আসিতেছি, একেবারে হটাৎ তাহা হইতে অনেক স্বতন্ত্র। গিরিবালা আপনা লাবণ্যোচ্ছ্বাসে আপনি আদ্যোপান্ত তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে। মদের ফেনা যেমন পাত্র ছাপিয়া পড়িয়া যায়, নব যৌবন এবং নবীন সৌন্দর্য্য তাহার সর্ব্বাঙ্গে তেমনি ছাপিয়া পড়িয়া যাইতেছে। তাহার বসনে, ভূষণে, গমনে, তাহার বাহুনিক্ষেপে, তাহার গ্রীবার ভঙ্গীতে, তাহার চঞ্চল চরণের উদ্দাম ছন্দে, নুপুর নিক্কনে, কঙ্কনের কিঙ্কিণীতে, তরল হাস্যে, ক্ষিপ্র ভাষায়, উজ্জ্বল কটাক্ষে একেবারে উচ্ছৃঙ্খল ভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে। আপন সর্ব্বাঙ্গের এই উচ্ছলিত মদিররসে গিরিবালার একটা নেশা লাগিয়াছে। প্রায় দেখা-যাইত, একখানি কোমল রঙ্গীন বস্ত্রে আপনার পরিপূর্ণ দেহ খানি জড়াইয়া সে ছাতের উপরে অকারণে চঞ্চল হইয়া বেড়াইতেছে। যেন মনের ভিতরকার কোন এক অশ্রুত অব্যক্ত সঙ্গীতের তালেতালে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নৃত্য করিতে চাহিতেছে। আপনার অঙ্গকে নানা ভঙ্গীতে উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত প্রক্ষিপ্ত করিয়া তাহার যেন বিশেষ কি এক আনন্দ আছে। সে যেন আপন সৌন্দর্য্যের নানা দিকে নানা ঢেউ তুলিয়া দিয়া, সর্ব্বাঙ্গের উত্তপ্ত রক্তস্রোতে অপূর্ব্ব পুলকসহকারে বিচিত্র আঘাত

প্রতিঘাত অনুভব করিতে থাকে। সে হঠাৎ গাছ হইতে পাতা ছিঁড়িয়া দক্ষিণ বাহু আকাশে তুলিয়া সেটা বাতাসে উড়াইয়া দেয়। অমনি তাহার বালা বাজিয়া উঠে; তাহার অঞ্চল বিস্রস্ত হইয়া পড়ে; তাহার সুবলিত বাহুর ভঙ্গীটি পিঞ্জরমুক্ত অদৃশ্য পাখির মত অনন্ত আকাশে মেঘরাজ্যের অভিমুখে উড়িয়া চলিয়া যায়! হঠাৎ সে টব হইতে একটা মাটির ঢেলা তুলিয়া, অকারণে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়; চরনাঙ্গুলির উপর ভর দিয়া উচ্চ হইয়া দাঁড়াইয়া প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া বৃহৎ বহির্জগৎটা একবার চট্-করিয়া দেখিয়া লয়; আবার ঘুরিয়া আঁচল ঘুরাইয়া চলিয়া আসে; আঁচলের চাবির গোছা ঝিন্ ঝিন্ করিয়া বাজিয়া উঠে! হয়ত আয়নার সম্মুখে গিয়া খোঁপা খুলিয়া ফেলিয়া অসময়ে চুল বাঁধিতে বসে; চুল বাঁধিবার দড়িদিয়া কেশমূল বেষ্টন করিয়া সেই দড়ি কুন্দ দন্তপংক্তিতে দংশন করিয়া ধরে; দুই বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া মস্তকের পশ্চাতে বেণী গুলিকে দৃঢ় আকর্ষণে কুণ্ডলায়িত করে—চুল বাঁধা শেষ করিয়া হাতের সমস্ত কাজ ফুরাইয়া যায়। তখন সে আলস্যভরে কোমল বিছানার উপরে আপনাকে পত্রান্তরালচ্যুত একটী জ্যোৎস্নালেখার মত বিস্তীর্ণ করিয়া দেয়।"

যে "অবহেলিতা, অবমানিতা পরিত্যক্তা" পত্নী পরিশেষে স্বামীর উপরে প্রতিহিংসা লইতে গিয়া একেবারে কুলটাবৃত্তি অবলম্বন করিবে প্রথম কতিপয় পংক্তিতে সাহিত্যপথে তাহারই আন্তরিক ছবি! কামানলে ধূমায়িতা কামিনীসৌন্দর্য্যর Impression বা মনঃপ্রতীত ছবিচিত্রনের ইহাপেক্ষা মনোমদ্য দৃষ্টান্ত হয়ত সাহিত্যে আর পাইব না। ভাবচ্ছন্দে উজ্জ্বলিত এবং উদ্বেলিত গদ্যরীতির পক্ষেও এস্থানে একটি অতুল এবং মনোরম উদাহরণ। বাঙ্গলা পদগুলির খামখেয়ালি হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণ টুকুন মানানসই করিয়া (সংস্কৃতের গুরুলঘু নিয়মে ধরিয়া) সমস্ত বাক্যটিকে 'গণেবিভক্ত' করিতে পারা যায়! কবির হৃদয়সঞ্জাত ভাবের তরঙ্গগুলি কথায় ছন্দভঙ্গিমায় অনুস্যূত এবং প্রবাহিত হইয়াই যেন উহার প্রাণসঞ্চার করিতেছে। অধিকন্তু, এস্থানে বুঝিয়া যাইতে পারি যে, সাহিত্যের এরূপ বাক্যচিত্র এবং মানসচিত্র-অঙ্কন কোনও তুলিচিত্রকরের ক্ষেত্রায়ত্ত কিংবা

ক্ষমতায়ত্ত নহে—যদিও কবিগণের দৃষ্টান্তে উদ্দীপ্ত এবং 'স্বাধিকার প্রমত্ত' অনেক আধুনিক চিত্রকর Impressionist Painting নামক অনেক ব্যর্থ-কাম চিত্রচেষ্টায় ইয়োরোপ খণ্ডে (এবং দেখাদেখি এতদ্দেশে) কোলাহল তুলিতেছেন ! এরূপ চিত্র-অঙ্কনে কেবল অমৃতযোনি সরস্বতীর দয়াদর্পিত কবিগণেরই স্বাধিকার ! উহা মর্ম্মপটে প্রতিফলিত ছবিটুকুরই বাক্যচিত্রণী পদ্ধতি। এরূপে, কবি ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থও তাঁহার লুসীকে অন্তরপটেই দেখিয়াছেন—

Fair as a star when only one
Is shining in the sky !

কথাগুলিন কি অপরূপ ভাবেই লুসীসৌন্দর্য্যের অসঙ্গ 'মাহাত্ম্য' এবং কবির মর্ম্মমুদ্রিত লাবণ্যরসোজ্জল ছবিটুকু দ্যোতিত করিতেছে ! কবির মানসপটে প্রতিফলিত লুসীসৌন্দর্য্যের সুদূর ঔজ্জ্বল্যপদবী এবং ভাববত্তায় অদ্বিতীয় ও অসঙ্গসুন্দর ছবিটুকুন পরিবর্ণিত করিতেই ত চেষ্টা করিতেছে ! কবির Highland Girl কবিতাটিও অন্তরঙ্গভাবে, সৌন্দর্য্যের এরূপ মনঃপ্রস্ফুট অধ্যাত্মচারিত্র এবং ভাবাত্মিকা শক্তিটুকুই ত আমাদের মনে ভাষাদ্বারে, অতুলনীয় ভাবুকপদ্ধতিতে উপস্থিত করিতেছে ! এরূপে, কবি ট্যাসো তাঁহার Jerusalem delivered কাব্যেও একস্থলে, নায়িকার সৌন্দর্য্যের 'মরমী ছবি' টুকুই অপরূপ বর্ণনায় ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

বেদের "আলোক দুহিতা" উষা, "মধুক্ষরন্তী সিন্ধু", "প্রাণকম্পান্বিতা অরণ্যাণী", "মধুমৎ পার্থিবং রজঃ", "মধুমান্ সূর্য্য"—সমস্তই ত, বলিতে গেলে, এক একটী মনোমুদ্রান্বিত মূর্ত্তিরই শব্দশক্তি-সুধৃত প্রতিচ্ছবি ! বৈদিককবির 'মনোমূর্ত্তনী' রীতির পরিপূর্ণ শক্তিবিকাশ কবিগুরু বাল্মীকির হস্তে ! 'বাল্মীকির 'অশোকবনে চেড়ীবেষ্টিতা জানকী', অথবা 'অভিমানগৃহে কৈকেয়ীর ছবি'ও পাঠককে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই দেখিতে হয়। সুন্দরী কৈকেয়ী কিরূপে—

নাগকন্যেব নিশ্বস্য দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ ভামিনী।
সংবিবেশাবলা ভূমৌ নিবেশ্য ভ্রূকুটিং মুখে ॥

দশরথ প্রবেশানন্তর বাহ্যিক সৌন্দর্য্যময়ী কৈকেয়ীকে দেখিলেন—

স বৃদ্ধস্তরুণীং ভার্য্যাং প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্।
অপাপঃ পাপসঙ্কল্পাং দদর্শ ধরণীতলে ॥
লতামিব বিনিষ্কৃত্তাং পতিতাং দেবতামিব।
কিন্নরীমিব নির্দ্ধূর্তাং চ্যুতামপ্সরসং যথা ॥
মায়ামিব পরিভ্রষ্টাং হরিণীমিব সংযতাম্!

মহাপণ্ডিত হনুমান্ অন্তর্দৃষ্টিতেই অধ্যাত্মসৌন্দর্য্যময়ী সীতাকে চিনিলেন,

দুঃখেন বুবুধে সীতাং হনুমাননলংকৃতাং
সংস্কারেণ যথা হীনাং বাচমর্থান্তরং গতাম্ ॥
আম্নায়ানামযোগেন বিদ্যাং প্রশিথিলামিব!

বুঝিতে হইবে, দ্রষ্টা ও পরিচিহ্নকর্ত্তা স্বয়ং এ'দেশের 'দাস্যপ্রেম'ধর্ম্মের গুরু মহাবীর হনুমান্, এবং লক্ষ্যবস্তুটাও এদেশের জননীভূতা অশোকবনস্থা জানকী! হনুমান্ লক্ষ্য করিলেন—

ভূমৌ সুতনুমাসীনাং নিয়তামিব তাপসীম্।
সংসক্তাং ধূমজালেন শিখামিব বিভাবসো ॥
তাং স্মৃতিমিব সন্দিগ্ধাং ঋদ্ধিং নিপতিতামিব।
বিহতামিব চ শ্রদ্ধামাশাং প্রতিহতামিব ॥

* * * * *

অভূতেনাপবাদেন কীর্ত্তিং নিপতিতামিব ॥

ভূমিলুণ্ঠিতা সুন্দরীদ্বয়ের এ' দুইটী বিভিন্নধর্ম্মী ছবি কবিগুরুর অন্তর্লোক হইতেই বাণীলোকে অবতীর্ণ হইয়াছে। বুঝিতে হয়, বাল্মীকি কর্ত্তৃক মূর্দ্ধাভিষিক্ত কালিদাস—কালিদাসের দীক্ষাশিষ্য ভবভূতি। ভবভূতির সেই—

ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে।

অথবা— ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়োঃ।

প্রভৃতির মধ্যে রামহৃদি-অঙ্কিত তাঁহার প্রিয়তমা জানকীরই অন্তশ্ছবি। উহার দিকেও মনকে অন্তর্মুখ করিয়াই চাহিতে হয়। রবীন্দ্র নাথ উদ্ধৃত 'রূপবর্ণনা'র কালিদাস-ভবভূতির দীক্ষাপথ অনুসরণেই যেন শ্রী-পুরে পাদচারণ করিতেছেন! শ্রেষ্ঠশ্রেণীর কবিমাত্রেই বহির্দ্দিকে চাহিয়া নহে, নিজের মনের দিকে চাহিয়া, তাঁহার মানসিক মূর্ত্তিই বাক্যে পরিবর্ণিত করিতে চেষ্টা করেন। পূর্ব্বোধৃত শ্লোকাংশে, 'সৌন্দর্য্যের কবি' কালিদাশ শকুন্তলার 'রূপ'বস্তুকে ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বর্ণনায় মুষ্টিবদ্ধ করিতে যা'ন নাই! 'অনাঘ্রাতং' ইত্যাদি বাক্য কবির অন্তর্দৃষ্টির ভূমি হইতেই শকুন্তলা-রূপের রসবত্তা ও 'প্রিয়তা'টুকু পাঠকের বিভিন্ন অনুভবস্থানে সঙ্কেতিত করিতে চাহিতেছে!

পূর্ব্বকালে এদেশে দেহসৌন্দর্য্য বর্ণনার আর একটা রীতিও ছিল, তাহার নাম দিতে পারি 'তালিকা রীতি'—রূপ বর্ণনার 'সাংখ্যরীতি', (Anatomical) 'শরীর স্থানী' পদ্ধতি। ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দরীর, আলাওল পদ্মাবতীর এবং কবীন্দ্র কালিদাস— সম্ভবতঃ যুবক কবি কালিদাস—কুমার সম্ভবে উমার রূপবর্ণনায় 'গতানুগতিক' ভাবে এরূপ তালিকা পদ্ধতির পথিক হইয়াছেন! একশ্রেণীর লোকের নিকট প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পুঙ্খানুপুঙ্খ 'গণৎকারী'রীতি এবং উপমা-অনুপ্রাসের জাঁকজমকটাই 'রূপবর্ণণা' রূপে চমৎকারী হইয়া দাড়ায়। উহাতে সুন্দরীটার 'রূপ'-অনুভবের দিকে পাঠকের কিছুমাত্র সাহায্য হয় কিনা জানি না; তবে, বুদ্ধিশক্তির একটা ব্যায়াম হয় এবং আনন্দ কিছু জন্মিত হইলে, তাহাও হয়ত উক্তরূপ আত্মব্যায়াম হইতেই ঘটে। উহা'ও ত একটা (intellectual) 'বোধায়নী' রীতি! কবি কালিদাস, কিন্তু, ঐরূপে 'পা হইতে আরম্ভ করিয়া মাথা পর্য্যন্ত' উমার অবয়বগুলি সুন্দর সুন্দর উপমায় তদন্ত করিয়াও উমারূপসীর 'রূপ'টুকুন কোনদিকে বর্ণিত হইল বলিয়া যেন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না; পরিশেষে, যখন নিজের মনের দিকে চাহিয়া, দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করিয়া, যেন নিজের আন্তর প্রতীত ছবিটী চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন—উমার সৌন্দর্য্য কিরূপ? না—

উন্মীলিতং তূলিকয়েব চিত্রং
সূর্য্যাংশুভি র্ভিন্নমিবারবিন্দম্ !

তখনই যেন, প্রকৃত মহাকবির ন্যায়, রূপ পদার্থটিকে নিজের বাক্য তুলিকার 'এক পোঁচে'ই অতুলনীয় ভাবে সঙ্কেতিত করিয়া বসিলেন; বর্ণনার যেন 'চক্ষু দান' করিলেন ! প্রতিমার চোখ ফুটাইলেন ! সৌন্দর্য্যের অনির্বচনীয় তত্ত্বটাকে অতুলমূর্চ্ছনা বাক্যব্যঞ্জনার মুষ্টিতেই বুঝি আঁটিয়া ধরিলেন ! কবির সমস্ত রূপবর্ণনাটীর এই ত চক্ষুদান—উহাকেঅধ্যাত্ম-তন্ত্রীয় প্রত্যায়ন বা 'উন্মীলন' দান ! জগদম্বার 'দিব্য সৌন্দর্য্য'ও মনোদৃষ্টি সমক্ষে যেন একটা অতুলনীয় 'উন্মীলন' ব্যাপার। একটা অগম্য ও মনের অ-স্পর্শসাধ্য অংশুদীপ্তি এবং আকস্মিক আবির্ভাব !

অতএব, বলিতে পারি, সৌন্দর্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে বস্তুগত নহে—ভাবগত; এবং উহাতে Objective অপেক্ষা বরঞ্চ Subjective লক্ষণই প্রবল। গ্রাহকের দৃষ্টিশক্তির তারতম্য বা তাহার চশমাটীর ক্ষমতা ভেদেই যে সৌন্দর্য্যের প্রকাশ শক্তি ! ইহা না বুঝিলে এ দিকের প্রধান তত্ত্বটাই অচিন্তিত থাকে। আরও বলিতে পারি যে, বস্তুধর্ম্মের অপরিহার্য্য বাধ্যতার গতিকে, বহিস্তত্ত্বের দাস্য গতিকেই ভাষাক্ষেত্রে 'স্থূল রূপ'-বর্ণনী ও বিবরণী রীতি অথবা চিত্রক্ষেত্রের তুলিকাপদ্ধতিও সৌন্দর্য্যকে 'ভাবুক রীতি'র কবির ন্যায় ধারণা করিতে ক্ষমতা রাখে না। চিত্রকর তাঁহার আলম্বন-পটের ও জড়ধর্ম্মের অপরিহার্য্য বশবর্ত্তিতার গতিকেই ততটুকু 'অন্তর্মুখ' হইতে পারে না, কবি যতটা পারেন। পটের উপর 'মানসচিত্র' অঙ্কণের চেষ্টা অল্পেই বেয়ারা ও বিচিকিৎস হইয়া পড়ে। চিত্রে রূপের পরিব্যক্তি anatomical হইতেই বাধ্য হয়। ফলতঃ, প্রত্যক্ষের বাস্তবিক প্রভুত্ব ও জড়তন্ত্রতার মধ্যেই চিত্রকরের যেমন বল, তেমন সূক্ষ্মতর ভাব-সাধনার ক্ষেত্রেও তাঁহার প্রধান বিপত্তি—বিপ্রতিপত্তি এবং দুর্ব্বলতা ! *

৩৩। সৌন্দর্য্যতত্ত্বে ব্যক্তিগত ঝোঁকের প্রাবল্য।

* কাব্য ও চিত্ররীতির বিষয়ে ইহার সমসূত্রে এ গ্রন্থের ১৭৮—৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সৌন্দর্য্যক্ষেত্রে এরূপে 'ব্যক্তিগত ঝোঁক' টুকুন অত্যন্ত 'প্রবল' বলিয়াই হয়ত এ দেশের সাহিত্যদার্শনিক উহার সংসর্গ—উহার 'দৃশ্যধর্ম্ম' যথাসাধ্য পরিহার করিতে চাহিয়াছিলেন; 'মানসোত্থ এবং মনোময়' রসকেই সাহিত্যবিচারের 'মাপকাঠি' রূপে ধরিয়াছিলেন; তথাপি, 'বিপত্তির স্থল' গুলিন যে সর্ব্বথা পরিহৃত হয় নাই, তাহা আমরা ক্রমে পরিদর্শন করিতে পারিব।

৩৪। সৌন্দর্য্যবিজ্ঞানের বিপত্তি স্থল—যৌন প্রভাবের প্রাবল্য।

সৌন্দর্য্যবিজ্ঞানের কিংবা রসনিষ্পত্তির একটী প্রবল বিপত্তিস্থল এই যে, মনুষ্যদেহের 'যৌনভাব'টী প্রচণ্ড ও বলীয়ান্ বলিয়া উহা তাহার মনের উপরেও প্রভাব বিস্তারিত করে; যৌন 'আনন্দ'ই মানুষের মনে প্রবল আকর্ষণের ও আত্ম-বিস্মৃতির কারণ হয়। অনেকের নিকট সুন্দর বলিতে কেবল 'সুন্দরী স্ত্রী' অথবা 'সুন্দর পুরুষ' ব্যতীত প্রকৃত প্রস্তাবে অপর কোন ভাবই যেন বুঝায় না। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও 'সৌন্দর্য্য' বলিতে অনেকে যে কেবল স্ত্রী-পুরুষাত্মক যৌন ভাবের উদ্দীপনা ব্যতীত অপর কিছুই বুঝিতে জানেন না—ইহা সত্য। এ সত্যটী কবি ভর্ত্তৃহরি অনুপমভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন—

যদাভূদজ্ঞানং স্মরতিমিরমোহান্ধজনিতম্।
তদাপশ্যং সর্ব্বং নারীময়মশেষং জগদিদম্॥

৩৫। জগতে 'প্রেম' 'সৌন্দর্য্য' ও 'রসের' পরস্পর পরিবর্ত্তী ও সহযোগী ভাব।

অনেকের নিকট কেবল যৌন মিলনটুকুই যেন 'আদিরস' নামে পরিচিত। 'আদি'রস—কথাটুকু হইতেই বুঝিতে পারি, সাহিত্যদর্শন স্বীকার করে যে, প্রেম হইতেই প্রেমময় বিশ্বভাবন কর্ত্তৃক বিশ্বের সৃষ্টি এবং উহা হইতেই সৃষ্টি রক্ষিত হইতেছে; জগতে প্রেমশক্তির ধ্বংসের অপর নামই দাঁড়ায় 'প্রলয়'। প্রেমই সৃষ্টিঘটনার আদ্যাশক্তি। উক্ত একটী মাত্র শক্তিই এ-পিঠে ও-পিঠে, আকর্ষণী এবং বিকর্ষণীরূপে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া এবং বিস্তার লাভ করিয়া, ক্রমে বহুধা এবং অনন্তধা বিভক্তি লাভ পূর্ব্বক আমাদের এই জড়-জীবাত্মক বিশ্বসংসার

বিস্তারিত করিয়াছে। প্রেমই সংসারের মহাকর্ষণ! আবার, জগতে সর্ব্বত্র সৌন্দর্য্য ও প্রেম যেন সহযোগী, সহচর এবং সহোদর তত্ত্ব। সৌন্দর্য্যে প্রেম জন্মায়, আবার, প্রেমেও সুন্দর করে। এরূপে, মনুষ্যের হৃদয়ে এবং তাহার সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একই প্রেমবস্তু বা একই আদিরস বহুধা বিভক্ত হইয়া, সমস্ত রসভাবের জনক এবং অনন্ত প্রিয়তাধর্ম্মের কারণ হইয়াছে। সুতরাং প্রেম যেমন সৃষ্টিসংসারের আদিরস, তেমন সাহিত্যেরও আদিরস! একটী মাত্র রস হইতেই গৌণমুখ্য ভাবে ও সহানুভূতির উপাদানে নবরসের উৎপত্তি! আবার, সাহিত্যে যেমন স্ত্রীপুরুষের, যেমন স্বামী স্ত্রীর, তেমন মাতাপুত্রের ও ভ্রাতাভগিনীর স্নেহ সম্বন্ধজনিত রসও ত আদিরস! তেমন, স্বজাতীয়-বিজাতীয় সর্ব্বপ্রকার প্রেম-সহানুভূতি ও প্রীতিজাত ভাবানন্দের নামও ত 'আদিরস'! বাঙ্গালী বৈষ্ণবের ভাষায় বলিতে পারি, "আদ্যএব পরো রসঃ"। এজন্যই, অধ্যাত্মতঃ প্রেমরস-সাধক বৈষ্ণবের সমক্ষে তাঁহার ভগবান্ 'সচ্চিদানন্দঘন' প্রেমমূর্ত্তি, 'অখিল রসামৃত মূর্ত্তি'! এবং 'উজ্জ্বল নীলমণি' সাহিত্যক্ষেত্রের রসসাধক গ্রন্থ হইয়াও আবার বৈষ্ণব ভক্তি-সাধকের একটি 'ধর্ম্মগ্রন্থ'! বলিতে পারি, সাহিত্যে, হাস্য করুণ বীর বীভৎস ভয়ানক শান্ত প্রভৃতি প্রবল হৃদয়'ভাব' গুলি একই আদিরসের পরিণামে এবং হৃদয়ের প্রেম-'সহানুভূতি' সম্বন্ধ হইতেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। সাহিত্যের 'রস'মাত্রেরই উদ্দীপনার মূলে প্রীতি ও সহানুভূতি; এবং সাধারণতঃ 'রসাত্মক' গুণের নামই সাহিত্যক্ষেত্রে 'সৌন্দর্য্য'রূপে দাঁড়াইতেছে। সুতরাং, সাহিত্যক্ষেত্রে রামসীতার বা সাবিত্রী-সত্যবানের প্রেম যেমন আদিরস, যেমন এণ্টনী-ক্লিওপেটার, আনা-ভ্রনস্কীর, বিমলা-সন্দীপ বা মহেন্দ্র-বিনোদিনীর যৌন লালসা এবং আত্মম্ভর বিলাসও আদি-রস, তেমন রাম লক্ষ্মণের, রাম এবং মহাবীরের সম্বন্ধও আদি রসাত্মক। এরূপে, রসের 'কোটা'তেই আবার একটি উচ্চনীচ ভেদ, ভালমন্দ ভেদ বা প্রেয়-শ্রেয়ঃ বলিয়া জাতিভেদ আসিতেছে এবং সাহিত্যের এ'সকল প্রকাশের পরস্পর রসগত পার্থক্য এবং বিশেষত্ব দর্শন করিতে যেই বিবেকটীর দরকার হয় তাহার নামটাও 'সাহিত্য-বিবেক' রূপেই দাঁড়াইতেছে।

ঈদৃশ সাহিত্যবিবেকের স্বরূপ ও ক্রিয়াপ্রণালী কি, তাহা পূর্ব্বেই সঙ্কেতিত হইয়াছে। রচনা মাত্রেরই সর্ব্বপ্রথম বিচার, উহা 'কাব্য' হইয়াছে কিনা? উহা আনন্দ-চমৎকারী বা রসাত্মক হইয়াছে কিনা? রসপ্রত্যয়টুকু মুখ্য না হইলে অথবা বৈজ্ঞানিক সত্যপ্রতীতি ও সত্যের বার্ত্তাটুকুই মুখর হইলে, উহাকে তৎক্ষণাৎ পংক্তিচ্যুত করিতে হয়। উহা আর যাহাই হউক, সাহিত্য নহে। এ বিচারে টিকিলে পরেই, দ্বিতীয় প্রশ্ন—অপরিহার্য্য প্রশ্ন, উহার 'রস' কোন্‌জাতীয়? উচ্চ কিংবা নীচ জাতীয়? আমি ত আনন্দ লাভ করিয়াছি—আমার আনন্দিত হওয়া উচিত ছিল কিনা? বলা বাহুল্য, এ স্থলেই সাহিত্যের শেষ বিচার। উহার স্বরূপ পরে বিশেষিত হইবে। বুঝিতে হয়, শ্রেষ্ঠশ্রেণীর কবির হৃদয় উচ্চ-জাতীয় রসঘটনা এবং সমুচ্চ ভাবপ্রতীতির ক্ষেত্রে অসাধারণ পটুতা প্রদর্শন করে বলিয়াই তাঁহাদের মাহাত্ম্য। উচ্চাঙ্গের রসই উচ্চ সাহিত্যের অন্তরাত্মা এবং অন্তঃপ্রকৃতি—এরূপ 'রসাত্মক' রচনাই উচ্চ সাহিত্য। উক্ত বিবেকের দৃষ্টিতেই রসের জাতি-পরিচয় ও সাহিত্য নামক 'ব্যক্তির' অন্তশ্চরিত্রের চরম পরিচয়—সাহিত্যের প্রকৃতি পরিচয়। সুতরাং কোন নীচজাতীর রসানন্দকে প্রবল অথবা মুখ্য করিয়া অথবা ব্যাপকভাবে আশ্রয় করিয়া কোন শিল্পই প্রকৃত 'সাহিত্যবিবেকী' সহৃদয় ব্যক্তির নিকট পূজনীয় হইতে পারে না। ফলতঃ, পাঠক মাত্রকে কোন রসাত্মক নিবন্ধের সম্মুখীন হওয়া মাত্র একবার 'গা ঝাড়া' দিয়া, নিজের অন্তরাত্মাকে সচেতন করিয়াই বসিতে হয়; স্থির করিতে হয় যে, কেবল চৌর্য্য-আনন্দে, হিংসানন্দে; অধর্ম্মানন্দে, পাপানন্দে কামানন্দে অথবা ব্যভিচারানন্দে প্রীতি ও সহানুভূতি করিয়া একটা পাপকর্ম্মে রত হই নাই ত? কেহ কেহ গ্রন্থকে 'রূপক' স্থির করিয়া রসের 'জাতি বিবেক' বিষয়টির পাশ কাটিয়া যাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু রূপকই হোক, কিংবা 'প্রকৃত' বা 'সত্য' প্রয়োগই হোক, কোন্‌-প্রকৃতির 'আনন্দ'টি মুখ্য হইয়া আমার হৃদয়কে অধিকার

৩৬। রসের জাতি ও উহার নিরূপণ ক্ষেত্রে 'সাহিত্য বিবেক'।

করিতেছে? কি-জাতীয় সহানুভূতি পাঠের উত্তরফল রূপে কবির সকল কথার চূড়ান্তে আসিয়া আমার অন্তরাত্মাকে অভিভূত করিয়া যাইতেছে? উহা স্থির করাই প্রকৃত সাহিত্য-বিবেকের কার্য্য!

বলা বাহুল্য, এস্থানেই রসবস্তুর অপর উপাদানটী, সত্য ও আনন্দ ব্যতিরিক্ত তৃতীয় উপাদানটী (শ্রেয় বা শিব উপাদানটী) আমাদের দৃষ্টিপথে উদিত হইতেছে। আনন্দ! আনন্দই মুখ্য! সাহিত্যের 'আত্মা' নিরূপণে উহার জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ ও বরিষ্ঠ পদবী। বলিতে পারি, সাহিত্য একটী 'ত্রিশিরা' ব্যক্তি; আনন্দ বা সৌন্দর্য্য টুকুই উহার 'মুখ্য' মুখ। তথাপি, সত্য ও শিবকে ধ্বংশ করিলে বা উহাদের বিরোধী হইলে এই 'সৌন্দর্য্য' দাঁড়াইতেই পারে না। তিনটীতে এমনই একটী একত্ববর্ত্তী পরিবার যে পরস্পরকে এড়িয়া-ছাড়িয়া চলাটার ও যো নাই। মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে যেমন জ্ঞান-ভাব-কর্ম্ম নামক তিন ব্যক্তি পরস্পরকে ছাড়িয়া চলিতে পারে না, কাব্যের রসাত্মার ক্ষেত্রেও সত্য-সৌন্দর্য্য-শিব পরস্পর বিদ্রোহী হইয়া কিংবা স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন হইয়াও দাঁড়াইতে পারে না! উহাদের মধ্যে বরং সৌন্দর্য্যেরই যৎকিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে। সৌন্দর্য্যের প্রকৃত ভিত্তি কি? যাহা আমাদের মনোদৃষ্টিতে সুন্দর, তাহা মনস্তত্ত্বের কোন-না-কোন সত্যকে অবলম্বন করিয়া, অন্ততঃ তাৎকালিক ক্ষেত্রে আমাদের চিত্তকে সত্যপথে 'খুসী' করিয়াই ত সুন্দর! সুতরাং, সৌন্দর্য্যবোধ বা আমাদের আনন্দপ্রতীতির ভিত্তিমূলে কোন-না-কোন সত্যের অবলম্বন আছে—না থাকিয়া পারে না। এজন্য, কবি কীট্‌সের সম্পূর্ণ কথা—সাহিত্যে Truth is Beauty বার্ত্তাটী—ঠিক না হইতে পারে, কিন্তু, Beauty is Truth কথাটী অন্ততঃ সৌন্দর্য্যের অনুভাবক ব্যক্তিটীর সাময়িক 'রুচি' এবং ('অবস্থা'গতিকে উপস্থিত) ভাবটীর বিষয়ে একটা সত্যের বার্ত্তা। সৌন্দর্য্যের এরূপ 'সত্যসন্ধতা' মনে রাখিয়াই ত কীট্‌স গাহিয়া ছিলেন—

৩৭। রসবিবেকের ক্ষেত্রে 'উচ্চ ও নীচ' বলিয়া জাতি-ভেদ; 'শিব' আদর্শের উদয়।

> A thing of Beauty is a joy for ever.
> Its loveliness incrases, it shall never
> Pass into nothingness!

সাহিত্যে সৌন্দর্য্যের শক্তি এবং পরমায়ু বিষয়ে ইহাপেক্ষা সত্য এবং মনোমদ বার্ত্তা অন্য কোন কবি দিয়াছেন কিনা জানি না! কিন্তু, এস্থলেও ত 'রুচি' এবং 'অবস্থা'। অবস্থা বলিতে, মনুষ্যের দেহমনের সুস্থ অথবা রুগ্ন 'অবস্থা', শিক্ষিত অথবা 'অশিক্ষিত' অবস্থা, পঞ্চদশবর্ষীয় বালক এবং পরিণতবুদ্ধি সহৃদয়ের যাবতীয় সম্ভবপর ভেদই ত আসিয়া পড়িতেছে!

বলিতে হয়, এস্থানেই সাহিত্যদর্শনের একটা নিত্যবিবাদের ক্ষেত্র। ইহার গতিকেই সাহিত্যদর্শন আধুনিক আদর্শের 'বস্তু বিজ্ঞান' বা Science হইতে পারিতেছে না; Artই থাকিয়া যাইতেছে। সৌন্দর্য্যবিদ্যাও একটা সর্ব্ববাদিসম্মত ও সকলের অনুভবগম্য 'প্রকৃতি বিজ্ঞান'রূপে বিবেচিত হইতে পারিতেছে না; মনস্তত্ত্ব অথবা নীতিবিদ্যার সঙ্গেও একাসনে স্থানলাভ করিতে পারিতেছে না। কিন্তু, অন্যদিকে 'বিজ্ঞান' নহে বলিয়াই হয়ত 'সমালোচনা'র প্রধান মাহাত্ম্য এবং গৌরব। সৌন্দর্য্যের স্বরূপ, কাব্যকবিত্বের নিগূঢ় প্রকৃতিবিচার অথবা কবির সৌন্দর্য্যসংঘটনী প্রতিভার ক্রিয়ারহস্যের আলোচনা বিজ্ঞানজাতীয় নহে বলিয়া, সে সমস্ত বিশ্লেষণগম্য, পরীক্ষাসাধ্য অথবা নরের শিক্ষাসাধ্য নহে বলিয়াই হয়ত গুণ গরিমার ক্ষেত্রে উহাদের গৌরবদেবী—কবিত্ব-রসিকের জন্যও গুণিসভায় একটা পূজার দাবী! যেমন কবি তেমন সহৃদয় হওয়াটাও সাহিত্যজগতে একটা দুর্লভ সৌভাগ্যলক্ষণ রূপে অভিনন্দিত হইতেছে। কিন্তু রসদর্শনের ও বিজ্ঞানের মধ্যবর্ত্তী উক্ত ভেদসীমাটুকু সচেতনভাবেই যথাসম্ভব বুঝিয়া রাখিতে হয়। "এ গ্রন্থ রসাত্মক কি না?" "রসই উহাতে মুখ্য কি না?" "উহা কাব্য কি না?" মোটামোটি এরূপ নির্দ্ধারণ পর্য্যন্তই হয়ত সাহিত্যসমালোচনা সর্ব্ববাদিসম্মত হইতে পারে। উহার পরে, সরস্বতীর খাশকামড়ায় প্রবিষ্টগণের মধ্যেই, আবার ভালমন্দতা ও উচ্চনীচতার লক্ষণ এবং প্রতিষ্ঠা লইয়া যে বিচার, উহা সাহিত্য তরফের 'চূড়ান্ত বিচার'; এবং উহাই পূর্ব্বোক্ত 'সাহিত্য' বিবেক-সাধ্য এবং 'সহৃদয়'সাধ্য ব্যাপার! সৌন্দর্য্যরসিক কালিদাস স্বীকার করিতে বাধ্য

৩৮। উক্ত 'ভেদ' নিরূপণের পথে মনুষ্যের অশিক্ষিত মনোবৃত্তির পাশব ধর্ম্ম হইতেই সাংঘাতিক ভ্রান্তির সম্ভাবনা।

হইয়াছেন, "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ"। সাহিত্যের 'রুচি' নামক পদার্থটী যেমন ব্যক্তিগত, যেমন বহুপরিমাণে 'জীবের ব্যক্তিত্বের অদৃষ্ট'জাত, তেমনি উহা মানুষের সামাজিক অবস্থা ও শিক্ষাগত; আবার তেমনি, উহা বহুদর্শন, বহুপর্য্যবেক্ষণ এবং "বুদ্ধিস্বাস্থ্যকরী" শিক্ষার উদার ফল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'রুচি' একটী Liberal Education এর উদ্বৃত্ত ফল। অন্যদিকের কথাটাও বলিয়া রাখিতে হয় যে, যাহা হয়ত সাধারণের পক্ষে এত কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তাহাই ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে একেবারে 'সহজাত বোধি' এবং জন্মসিদ্ধ অন্তঃপ্রজ্ঞার 'প্রাপ্তি'রূপেই সমাপন্ন হইতে পারে। এস্থলেই 'সৌভাগ্যযোগ' বলিয়া একটা পদার্থের দৃষ্টান্ত। আধুনিক সভ্যতা, বাহ্যিক সুখশান্তিযোগ বৃদ্ধি করিয়া ও গ্রন্থাদি সুলভ করিয়া মনুষ্যকে এরূপ সাহিত্যরুচি এবং বহুদর্শী অভিজ্ঞতা ও স্বাস্থ্যলাভের পক্ষেই অপূর্ব্বসম্ভব সাহায্য করিতেছে। উহা চিন্তা করিয়াই আশা করিতে পারি যে, অন্ততঃ সাহিত্যের 'রসিকতা' বা 'সমালোচনা'ও ক্রমেক্রমে বিজ্ঞানক্ষেত্রেই সীমা বিস্তার পূর্ব্বক বর্দ্ধমান হইতে পারিবে। তথাপি, বর্ত্তমানের বিবাদক্ষেত্র টুকু স্বীকার করিয়াই অগ্রসর হইতে হয়। আপাততঃ এরূপ স্বীকার ও অভাব বোধটুকুই চিত্তের স্বাস্থ্যলাভ পক্ষে পরম উপকারী হইবে। মনুষ্যজাতির অতীত ইতিহাসে সৌন্দর্য্য যেমন ঐহিক তরফেই নানা বিবাদবিসম্বাদ, মারামারি ও রক্তারক্তির নিদানরূপে প্রকটিত হইয়াছিল, তেমন আধুনিকের সাহিত্যক্ষেত্র এবং সারস্বত মন্দিরেও সৌন্দর্য্য (বস্তুতঃ এবং তত্ত্বতঃ) অনেক বিবাদ বিরোধ, দলাদলি এবং গোঁয়ার্ত্তমীর 'হেতু' হইয়াছে। অনেক সাহিত্যরসিক এবং সাহিত্যের সেবকপক্ষেও, তাঁহাদের সৌন্দর্য্যবুদ্ধি এবং কৃতিত্বের আদর্শটী শিল্পক্ষেত্রে একেবারে 'সর্ব্বনাশ'কর রূপে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ফলতঃ, 'রুচিশিক্ষা'র জন্যই সাহিত্যদর্শন বা সমালোচনা নামক একটা স্বতন্ত্র সাহিত্যের সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য্য হইয়া গিয়াছে। 'রুচি'বিষয়ে এস্থলে কেবল বলিয়া যাইতেছি যে, সাহিত্যদর্শন যাহাকে 'সৌন্দর্য্য' নামে লক্ষ্য করে, কবি বা পাঠকের চিত্তবৃত্তির দিক হইতে উহার নামই 'আনন্দ' বলিয়া, আনন্দকর্ম্মী কবির জীবনমনের সুস্থতা ও শিক্ষাভেদে, তাঁহার

চরিত্রগত অদৃষ্টভেদে সাহিত্যের বিচারেই রুচিভেদ আসে; শ্রেয়ঃপ্রেয় আদর্শের মধ্যেই একটা জাতিভেদ আসিয়া পড়ে। পাঠকের আনন্দের আদর্শেও ব্যক্তিগত রুচিবিকার নিদারুণ প্রাবল্য লাভ করে। পরন্তু, সাহিত্যে রুচি নামক পদার্থটাও একটা পরম 'সাধনার ধন'। এমনও দেখা যাইবে যে, অনেক ব্যক্তি বিজ্ঞান দর্শন বা ইতিহাসের ক্ষেত্রে 'উদার শিক্ষা'ই লাভ করিয়াছেন, তথাপি, সাহিত্য রুচির তরফে যাহাকে 'প্রাথমিক শিক্ষা' বলা যাইতে পারে, তাঁহাদের উহাই ঘটে নাই। সাংসারিক পদগৌরবে, জ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে পরম সুপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি, অথচ 'রসবোধের ক্ষেত্রে', সুকুমার বৃত্তির ক্ষেত্রে একেবারে 'অজামিল'। 'সহৃদয়তা' বলিয়া একটা পদার্থই বিকাশলাভ করে নাই! কোনদিকে 'চিত্তখিল' টুকুই ঘুচে নাই! কবিত্বের ন্যায় সহৃদয়তাও একটা দুর্লভ বস্তু। জীবের বেদনা ও চেতনার ক্ষেত্রে উহা মুক্তের অবস্থা। উদার সহানুভূতি পথে জীবনে চিত্তমুক্তি সুসিদ্ধ করাই 'সাহিত্যচর্চ্চার মুখ্য উদ্দেশ্য। মানুষে মানুষে শিক্ষা তরফেই বদ্ধ ও মুক্তের ভেদ, উন্নত ও অনুন্নত আত্মার ভেদ এবং চিত্ত-ধর্ম্মের অধ্যাত্মভেদ যে পর্য্যন্ত আছে, সে পর্য্যন্ত রুচিভেদও আছে; সুতরাং সুশিক্ষা লাভ করিয়া বরেণ্য রুচিবুদ্ধি ও রসানন্দ সিদ্ধি করাও মনুষ্য জীবনে একটা মহার্থ রূপেই গণ্য থাকিবে। হৃদয়ের সর্ব্বব্যাপী সহানুভূতি সিদ্ধিও একটা পরমার্থ। কারণ, মনুষ্যের অধ্যাত্ম উন্নতিটুকুন তাহার সহানুভূতির শক্তি ও চিত্তের আনন্দবুদ্ধির উপরেই অনেক দিকে নির্ভর করে। আমরা পরবর্ত্তী প্রসঙ্গে দেখিব, শিক্ষিতরুচির প্রধান প্রমাণ—জীবনের শ্রেয়ঃ ও প্রেয় বস্তুর অনাবিল ভেদদৃষ্টি। এজন্য সজ্জনগণ, সহৃদয়গণ চিরকাল উচ্চশ্রেণীর রুচিদৃষ্টি লাভ করিতে চাহেন ও 'রুচির' বা আনন্দ বস্তুকে শ্রেয়ের দৃষ্টিতেই নিরূপণ করেন। এ দিকের মোটা কথা, অবশ্য, "শাস্ত্রং দৃষ্টির্বিবেকিনাম্"। 'শাস্ত্রদৃষ্টি' কথাটার অর্থ বা সামর্থ্য কি, তাহাও আমরা 'শিব' আদর্শের বিচার স্থলে দেখিতে পারিব। এস্থলে কেবল উল্লেখ করিয়া যাইতে হয় যে, মনুষ্যের দেহধর্ম্মের সহজাত দুর্ভাগ্য গতিকে, সোজা কথায়, দেহপিণ্ডের প্রাণিধর্ম্ম বা পশুধর্ম্ম গতিকেই কুৎসিত,

অসত্য, অবিজ্ঞান এবং পাপ মাত্রেই আপাতরম্য ও 'শ্রেয়'রূপে প্রতিভাত হয়; অসুস্থ, অপরিণতমস্তিষ্ক বা অনাত্ম ব্যক্তির নিকট কার্য্যক্ষেত্রে—ভেদের অনুভব কিংবা পরীক্ষার স্থলে—প্রেয় কিংবা শ্রেয়ের পার্থক্যটুকুন বিন্দুমাত্র প্রতীতি হয় না! আবার, সাহিত্যের ক্ষেত্রে, কবির 'প্রয়োগ' গতিকে, রসের প্রতীতিটুকুই চিত্তকে মুখ্যভাবে 'আবিষ্ট' করে বলিয়া, পাঠকের রুচিগত বিভ্রান্তি ও চিত্তের 'বৈচিত্ত' আরও অধিকতর অপ্রত্যাশিত এবং সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইতে পারে। সুতরাং, সাহিত্যে নিষ্কলুষ দৃষ্টি ও বিনির্ম্মল বুদ্ধি এবং সুবিবেক লাভ করাও একটা সাধনার ফল।

অতএব, মার্জ্জিতরুচিশীল সৌন্দর্য্যরসিকের সমক্ষে সাহিত্যের বিপুল ক্ষেত্রই প্রসারিত। উহার আমল, মোটামোটি বলিতে গেলে, জীব নিসর্গ ও পরম বা তুরীয়—যাহা মানবদৃষ্টির সমক্ষে তৃতীয় তত্ত্ব—অসীম, অজ্ঞাত, অনন্ত, পূর্ণ বা 'কালা'র তত্ত্ব। সাহিত্যে মানুষ সহজ দৃষ্টিতে, প্রাধান্যতঃ জীব তত্ত্বকে, নিজের ব্যক্তিত্বকে, সমাজবদ্ধ বা একক মানবত্বকেই 'দর্শন' করিতেছে; নিজকে নিসর্গ অথবা পরমের সম্বন্ধে আনিয়াও 'দর্শন' করিতেছে এবং উক্ত দর্শনের ফলকেই সাহিত্যের রসপরিব্যক্তি দান করিতেছে। কাব্য কবিতা নাটক নবেল গল্প প্রভৃতি যাবতীয় সাহিত্য-প্রকাশ এরূপ 'দর্শন' এবং রসানুভূতি জাত ক্রিয়াচেষ্টার ফল! সাহিত্যের 'রস' মধ্যে দার্শনিক লক্ষণ প্রবল বলিয়াই, হয়ত, কবি ও সাহিত্যদার্শনিক ম্যাথু আর্ণল্ড্ নিজের ভাবে কাব্যের সংজ্ঞানিরূপণ করিয়াছিলেন—"Poetry is Criticism of Life". সাহিত্য যে 'জীবনের দর্শন'জাত সত্য-বার্ত্তা! এ ক্ষেত্রে 'জীবন' বলিতে জীব-পরম-নিসর্গের সম্বন্ধগত জীবনই বুঝিতে হয়। আর্ণল্ড যে রসতত্ত্বকে প্রাবল্য দান করিতে চাহেন নাই, সাহিত্যে 'তত্ত্ব'কে যে আনন্দিত ভাবে 'অভিব্যক্ত' ও প্রমূর্ত্ত হইতে হয়, সে বিষয় এস্থলে আলোচনা করিব না। কিন্তু, ত্রি-বস্তুর মধ্যে মানুষ যে তাহার সাহিত্যে কেবল 'নিজের কথা'টাই অধিক পরিমাণে কহিতেছে—সাহিত্যের কাব্যনাটক প্রভৃতিতে এবং অধিকাংশ কবিরচনায় যে নিসর্গের বা পরমের সম্বন্ধ মুখ্য

৩৯। সৌন্দর্য্যের ত্রিবিধ পদার্থ জীব, নিসর্গ ও পরম।

কিংবা সমুজ্জ্বল নহে, তাহা লক্ষ্য করিতে হয়। নিসর্গ ও পরমের সম্বন্ধবুদ্ধি এবং 'সহানুভূতি' পদার্থটা হয়ত জৈবসংগ্রাম-মগ্ন মনুষ্যের পক্ষে নিজের কিংবা সমাজের তত্ত্ব এবং সাংসারিক স্বত্ব-স্বার্থের মত ততটা সন্নিহিত এবংঅন্তরঙ্গ নহে—অধিকাংশ কবি বা শিল্পীর পক্ষেই নহে। আত্মার ঊর্দ্ধতর গুহাক্ষেত্রে জাগরণ এবং অধ্যাত্মমুখী ক্ষুধাতৃষ্ণার উন্মেষণা বলিয়া ব্যাপারটাও হয়ত অধিকাংশ কবির পক্ষে আসন্ন কিংবা প্রবল নহে।

সাহিত্যের সাধারণ সমতলে মনুষ্যের 'অন্নময় পুরী'র কথা, তাহার নিজের বা পবিবার-সমাজ রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় ভাবুকতা ও অভিজ্ঞতার বার্ত্তাই প্রবল; আবার, স্বাধীন 'দৃষ্টি' ও কল্পনাশক্তির 'লীলা' অপেক্ষা বরং পর্য্য-বেক্ষণ, 'অনুকরণ' অথবা প্রতিবিম্বনের রীতিটুকুই সমুজ্জ্বল। এ শ্রেণীর কাব্যশিল্পে কেবল প্রাকৃতের নকশা এবং ইতিহাস (ইতিহ+আস বা 'এরূপ ছিল') গোছের পদ্ধতিটাই যে 'মুখ্য', তাহাও স্বীকার করিতে হয়। Deleneation of Character পথে, নাটকী রীতি কিংবা বিবৃতির পদ্ধতিতে জীবনচিত্রনের ব্যাপারটাই সকল সাহিত্যের মুখ্য পরিচিহ্ন সুতরাং সাহিত্যের এই 'নরত্ব' (Humanism) বা জীবত্ব সম্পর্কিত শিল্প ও সৌন্দর্য্যের লক্ষণ চিন্তায় এ স্থলে আমরা আর বাহুল্য করিতে চ'ই না। এ গ্রন্থে, সময়ে অসময়ে, উক্ত লক্ষণের বিচারেই ত আমাদিগকে আসিতে হইবে। সাহিত্যব্যাপার মাত্রেই মুখ্যতঃ মানবত্বের অনুচিন্তন বলিলেই চলে। মানবিক চরিত্রচিত্রনের ক্ষেত্রে শতসহস্র প্রকারের শিল্পচেষ্টা এবং সৌন্দর্য্যপ্রকাশের প্রচেষ্টাই ত সর্ব্ব সাহিত্যে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। "এ কবির চরিত্রচিত্রণ কিরূপ"? "কবির চরিত্রসৃষ্টি স্বভাবসঙ্গত কি"? "চারিত্রদৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও প্রখর কি"? কাব্যের 'সৌন্দর্য্য'বিচারে এরূপ প্রশ্নই সর্ব্বত্র মুখর হইতেছে। অধিক স্থলে, এই 'সৌন্দর্য্যের আদর্শ'টাকেও বুঝিতে হয়—কেবল যথাযথ ভাবে অঙ্কন বা প্রতিবিম্বন। এ আদর্শে, রাম যুধিষ্ঠির ও রাবণ দুর্য্যোধন, আয়াগো, রেবেকা শার্প, কাউণ্ট ফোস্কো অথবা কাউণ্ট মণ্টিক্রীষ্টোর নানাবর্ণী ও সু-কু চরিত্রচিত্র শিল্পরসের ক্ষেত্রে 'সুন্দর'। এ ক্ষেত্রে জীবনের 'সৌন্দর্য্য' ও শিল্পক্ষেত্রের 'সৌন্দর্য্য'

সংজ্ঞার মধ্যে যে একটা পার্থক্য আছে তাহাই মুখ্যভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এ দিকে শিল্পক্ষেত্রের 'সুন্দর' পদটার—অর্থই হইতেছে 'রসাত্মক'—সহানুভূতির পথে পাঠকের আনন্দজনক। রসানুভূতিই সাহিত্যের প্রবেশপথ। প্রথমেই সুন্দরের কোন Ethicol বিচার—বা 'ধর্ম্মগত' বিচার নাই। উহা 'প্রবিষ্ট'গণের মধ্যেই 'চূড়ান্ত বিচার'।

সাহিত্যে সৌন্দর্য্যের দ্বিতীয় বস্তু হইতেছে নিসর্গ। অনেক সময় মনুষ্যেতর জীবপর্য্যায়কেও 'নিসর্গ' সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১০। সাহিত্যে সৌন্দর্য্যের দ্বিতীয় মহাবস্তু—নিসর্গ।

ইয়োরোপের প্রাচীনসাহিত্যে নিসর্গের প্রকৃত স্থান ছিল না; নিসর্গসৌন্দর্য্যের অনুভূতি, প্রতিষ্ঠা কিংবা গৌরবপদবী উহাতে যথোচিত উজ্জ্বল নহে। গ্রীক বা রোমক সভ্যতায় মনুষ্যহৃদয় নিসর্গের প্রভাব যে প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই, তাহাই সমুজ্জ্বল। সামুদ্রিক বাণিজ্যশ্রী ও সংসারশ্রীর উৎকর্ষপিপাসী গ্রীকসভ্যতা—আর, যুদ্ধবিগ্রহী রোমক সভ্যতা! রোমের কৃষিকর্ম্ম পর্য্যন্ত 'দাস'গণের দ্বারাই পরিচালিত হইত। সুতরাং এ সকল জাতি যে উন্মুক্তনিসর্গের গুহাহৃদয়ে বা প্রত্যক্ষপ্রকৃতির ঝড়ঝঞ্ঝা-তরঙ্গময়ী বিভূতি অথবা শান্তশ্রীর 'অন্তঃপুরে' যথার্থ 'প্রবেশ' লাভ করিতে পারে নাই, সে দিকে কোনপ্রকার ধ্যানী প্রজ্ঞা বা অভিনিবেশের 'রস' লাভ যে করে নাই, তাহাই সত্যকথা; উহা সাহিত্যপাঠকের প্রতীতিসিদ্ধ কথা। গ্রীকরোমক সাহিত্যে পাঠকের রসবুদ্ধির খোরাকরূপে, সমাজবদ্ধ মানবের পাপ-পুণ্য কর্ম্ম ও জ্ঞান-ভাবচেষ্টার ব্যাপারই মুখ্য; কেবল মানবস্বই প্রধান উপজীব্য। কবিগণের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সর্ব্বত্র নরত্ব, নরস্বার্থ ও নরের অদৃষ্টই গ্রীকরোমক সাহিত্যের সাধারণ বস্তু এবং প্রকৃতি রূপে প্রকাশ পাইতেছে। উভয় সাহিত্যে অনেকসময় নিসর্গ আসিয়াছেন, কেবল অলঙ্কার রূপেই প্রবেশ করিয়াছেন। রস-পরিব্যক্তির একটা গৌণ উপায় রূপেই নিসর্গ-কথা গ্রীক কিংবা রোমক সাহিত্যে আসিয়া গিয়াছে। বুঝিতে হইবে, ঐ সকল সাহিত্যে, হোমর বর্জ্জিলের মধ্যেও, নিসর্গ-সৌন্দর্য্যের কেবল

'নৈমিত্তিক' ধারণাই আছে; কিন্তু নিসর্গ জীবসমক্ষে স্বতন্ত্র 'ব্যক্তি'রূপে, একটা দ্বিতীয় বন্ধুব্যক্তি বা সাহিত্যব্যক্তিরূপে পরিগণিত হয় নাই! ভারতীয় সাহিত্যে, বেদের সময় হইতেই নিসর্গ যেমন একটা স্বতন্ত্র দেবশক্তি, এবং দেবতাব্যক্তির সমষ্টিরূপে, মনুষ্যের সাহিত্যব্যাপারে এবং সংসারব্যাপারে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, তাহার সমকক্ষ দৃষ্টান্ত সে সকল সাহিত্যে নাই। বেদের অরণ্যানী, বসুন্ধরা ও ঊষা-নিশা প্রভৃতি একএকটী স্বতন্ত্র রূপসুন্দরী, ভাবসুন্দরী ও সাহিত্য-রসসুন্দরী 'ব্যক্তি'। রামায়ণ-মহাভারতের 'অরণ্য' ও 'বন' মনুষ্যের আত্মধর্ম্ম-শিক্ষায় (রাঘব-পাণ্ডবের জীবন-সাধনায়), মনুষ্যের সভ্যতা এবং কর্ষণার পথেও, একএকটী অপরিহার্য্য 'ব্যক্তি'—গুরু এবং সুহৃদ্ ব্যক্তি। মধ্যযুগের সংস্কৃতসাহিত্যে জীবের সঙ্গে নিসর্গের এই সৌহার্দ্দি, সমতন্ত্রতা ও সমপ্রাণতার সম্বন্ধ-ধারা এবং গুরু-শিষ্যতার ধারা অক্ষুণ্ণভাবে বহমান এবং বর্দ্ধমান হইয়াই চলিয়া আসিয়াছে।

নিসর্গের সৌন্দর্য্য এবং সে সৌন্দর্য্যের অনুধাবনা বিষয়ে, ঊনবিংশ শতাব্দী হইতেই ইয়োরোপীয় সাহিত্যে নানা পথ-স্বস্তি ও প্রশস্তি পরিলক্ষিত হইতেছে। ইয়োরোপের হৃদয় অষ্টাদশের শেষ ভাগে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতেই নিসর্গসৌন্দর্য্যের একটা অভিনব দীক্ষালাভপূর্ব্বক নানা দিকে নব নব ভাব-ফল চয়ন করিতেছে। কিন্তু, মনুষ্যের নিত্যতত্ত্ব বা নিত্যজীবনের সঙ্গে নিসর্গপ্রেম কিংবা নিসর্গসৌন্দর্য্যের কোন সবিশেষ যুক্তিযোজনা সে সাহিত্যে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ভারতীয় অদ্বৈতদৃষ্টি (Monismএর দৃষ্টি) সে সাহিত্যে প্রবল নহে। যেমন সাহিত্যসেবা, সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য ও সাহিত্যিক আনন্দ বিষয়ে, তেমন, নিসর্গসেবা ও নিসর্গপ্রেম এবং নিসর্গানন্দ বিষয়েও বৈদিক অদ্বৈতবাদের একটা 'বিশেষ কথা' আছে; উহাদের আনুকূল্যে অনুমতি এবং অভিমতি আছে। অদ্বৈতবাদ মতে নিসর্গের সংসর্গে এবং নিসর্গপ্রেমেও জীবের চরম-তত্ত্বের সহায়যোগ এবং জীবের পরমার্থগতির সাহায্য-যুক্তি ও সঙ্গতি আছে।

সাহিত্যের বস্তু-ত্রয়ীর মধ্যে নিসর্গ একতম—উহাও একটা 'মহাবস্তু'। নিসর্গসৌন্দর্য্যের অনুচিন্তন পথে নিসর্গপ্রেমিক কবিও মহাসৌন্দর্য্যে উপনীত হইতে এবং 'মহাসুন্দর'কে ধারণা করিতে পারেন; ভাবের পথেই অদ্ভুতসৌন্দর্য্যে ও 'বিস্ময়'রসে উপনীত হইতে পারেন। 'অদ্ভুত রস'ই ত সাহিত্যজগতে 'মহাসুন্দর' তত্ত্বের সাধক—অদ্ভুতের নামই Wonderful, Sublime. 'বিস্ময়'রস বিষয়ে কোন সাহিত্যরসিক বলিয়াছেন—

বিবিধেষু পদার্থেষু লোকসীমাতিবর্ত্তিষু
বিস্ফারশ্চেতসো যস্তু স বিস্ময় উদাহৃতঃ॥

কবি লোকসীমাতিবর্ত্তী পদার্থের আলম্বন ও অদ্ভুতের উদ্দীপন পথে জীব-চিত্তের 'বিস্ফার'কেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। মনুষ্যত্ব অবলম্বনে, মানুষের দেহ সৌন্দর্যের অথবা আন্তরিক 'মহাধর্ম্ম'গুলির ধারণায় এবং অনুধ্যানে যেমন চিত্তের একটা 'অদ্ভুত-বিস্ফার' সংঘটিত হইতে পারে, তেমন, নিসর্গের সৌন্দর্য্যবস্তু অবলম্বনেও কবিপ্রতিভার সমক্ষে হৃদয়ের অদ্ভুত-বিস্ফারী 'রস'সঙ্ঘটনার অবকাশ আছে; 'তুরীয়' বস্তুর বিষয়ে ত কথাই নাই। অবশ্য, গ্রহণের শক্তি এবং বিগাহী দৃষ্টি লইয়াই কথা। ভাবুকধর্ম্মী এবং ভাবের দৃষ্টি-দীক্ষিত কবির চক্ষে নিসর্গও একটা 'প্রাণ'ময় এবং ভাবময় মহাপদার্থ; নিসর্গ একটী স্বতন্ত্র মহাপ্রাণী। উহাতে জড়তার আবরণেই ভাবসুন্দর এবং রসসুন্দরের বিভূতি তত্ত্ব ওতপ্রোত হইয়া আছে। নিসর্গের সিন্ধু শৈল আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক ছোটবড় পদার্থই স্বকীয় আত্মার 'আগ্রহ' ভেদে, রসসাধক কবির আলম্বন ও উদ্দীপন হইতে পারে; তাহাকে চিত্তবিস্ফার দান করিতে এবং তাহার 'গুহাপ্রথের গুরু' হইতে পারে। (১)

(১) গুহা শব্দের শ্রুতি পুরাণাদিতে সর্ব্বত্র বহুপ্রয়োগ দৃষ্ট হয়। উহার মোটামুটি অর্থ 'হৃদয় গুহা'—বেদান্তের 'পঞ্চকোষ'—জীবের গুপ্ত আত্মস্থান ও প্রয়ানের পথ। পঞ্চদশীকার সংখ্যা ও পরম্পরা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক এ বিষয়টী বিশদ করিয়াছেন—

নিসর্গের প্রতি অমায়িক প্রেম জীবহৃদয়ের স্বাভাবিক অভ্যুন্নতির প্রমাণ; উহা জীবচিত্তের ধৃতি এবং চৈতন্যস্থিতি, পুণ্যসমুদায় ঋদ্ধি ও শম-দমাদি গুণসিদ্ধিই প্রমাণিত করে। মানুষের হৃদয় জীবত্বের কিংবা মানবত্বের পর্য্যায়ে সমধিক অগ্রসর না হইলে, জড়তামুখী স্বার্থপরতার 'কোটি' অতিক্রম করিতে না পারিলে, অন্তঃস্থিত কামাদি রিপুর বিক্ষেপ পরিহার পূর্ব্বক 'শান্ত' হইতে না পারিলে, উপরতি এবং তিতিক্ষার পথেই সাহজিক অনুরক্তি না ঘটিলে নিসর্গের প্রতি তাহার প্রকৃত সহানুভূতি কদাপি জন্মিতে পারে। নৈসর্গিক প্রকৃতি বহির্দ্দিকে এবং 'প্রত্যক্ষ' ক্ষেত্রে জীবের 'বড়দিদি'ও জীবনের অগ্রজা রূপেই ত প্রতীয়মান! সৃষ্টিতত্ত্বে দুইটী 'গতি'ই দেখা যাইতেছে—'মহৎ' হইতে আরম্ভ পূর্ব্বক জড় 'পরমাণু' মুখে একটা Involution বা সংবেষ্টন; আবার, ফিরিয়া পরমাণু হইতে মহৎ অভিমুখে একটা Evolution বা সংবর্ত্তগতি। ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে মূল (সৃষ্টি ও প্রলয়রূপী) ব্রাহ্মী কল্পগতির অভ্যন্তরে আবার এরূপ দ্বিবিধ গতিই ঘন আবর্ত্তে, বহু ধারায় এবং বিমিশ্র ধারায় চলিতেছে—জড়তামুখী ও আত্মামুখী গতিধারা। একই 'পরমাত্মা' চিৎ ও অচিৎ উভয়তঃ এই 'জগৎ'রূপ গতিব্যাপার সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব, অনু হইতে 'মহৎ'-অভিমুখে সৃষ্টির যেই আংশিক গতি বা যে 'ফেরতা গতি' দেখিতে পাইতেছি, সে তত্ত্বেই নিসর্গ কিংবা জড়প্রকৃতি জীবের অগ্রজা ও জীবের 'ধাত্রী'। প্রত্যক্ষ পৃথিবীর জীব পর্য্যায়ে ও জীবন পথে—ক্রমোন্নতিশীল প্রাণ-মন-বুদ্ধিধর্ম্মের বিকাশ পথে—প্রাণী এবং মনুষ্য মাত্রেই নিসর্গ হইতে অগ্রসর ও 'উন্নত' বলিয়া আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে। কিন্তু, নিসর্গের মধ্যে জগতের 'শান্তং শিব মদ্বৈতং' তত্ত্বের আদিম বিকাশেচ্ছার (বা 'শুদ্ধ সত্ত্বা মায়া'র) স্ফুট লীলাই জড়তত্ত্বের

দেহাদভ্যন্তরং প্রাণঃ প্রাণাদভ্যন্তরং মনঃ।
ততঃ কর্ত্তা ততো ভোক্তা গুহাসেয়ং পরম্পরা॥

সুতরাং, গুহার অর্থ না বুঝিলে ভারতীয় Mysticism কিংবা ভারতীয় অধ্যাত্মসাহিত্যের অনেক কথাই হৃদয়ঙ্গম হইবে না।

সহিত বিমিশ্রভাবে গুপ্ত আছে—আত্মতত্ত্বের সন্নিহিতভাবেই আছে। মানবহৃদয় শান্ত ও সত্ত্বগুণান্বিত হইতে পারিলে, নিসর্গের অন্তর্গুপ্তা এবং গুহাসুপ্তা এই 'ভাগবতী শান্তি'র স্পর্শলাভ করে, এবং অবিতর্কিতেই তৃপ্তি ও তুষ্টি লাভ করে। এ কারণেই নিসর্গের সংসর্গ জীবের তাপ-নিসূদন, রিপুদমন ও চিত্তপাবন। সাংসারিক মানবাত্মা একদিকে চিন্তা এবং চিত্তশক্তির পথে, বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের শক্তিতে নিসর্গ অপেক্ষা অনেক পরিমাণে অগ্রসর; কিন্তু, মর্ত্ত্যজগতের কর্ম্ম-কোলাহল, 'ধর্ম্মাধর্ম্ম' ও পাপপুণ্যের যুদ্ধ এবং ভালমন্দবিচারের 'নৈতিক দ্বন্দ্ব' কিংবা বিবাদ-বিক্ষোভের মধ্যে জীবাত্মা নিদারুণ ভাবেই 'জড়াইয়া' গিয়াছে; জড়ুতা লাভ করিয়া বিজড়িত, ব্যামোহিত, বিকেন্দ্র এবং উন্মুক্ত হইয়াই ঘুরিতেছে; মানবাত্মা অনাত্মতা ও অজ্ঞানের 'স্বখাদ সলিলে' ডুবিয়া, নিদারুণ ভাবে ছটফটি করিয়া মরিতেছে; জন্মমৃত্যু চক্রের অধীন হইয়াই ঘুরিতেছে! এরূপে 'জড়াইতে' পারে বলিয়াই ত জীবাত্মা নৈতিক ক্ষেত্রে 'জড়' হইতে উন্নত ও অগ্রসর। নিসর্গে এরূপ সংগ্রামের 'কোলাহল' এবং ছটফটি নাই। এ দিকে নিসর্গকে বরং দায়িত্বশূন্য, পাপ ও অধর্ম্মের প্রলোভনসীমার বহির্ভূত এবং 'শান্ত' বলিয়াই ত নির্দ্দেশ করিতে পারি! অতএব, একজন 'পরম শান্ত-দান্ত ও উপরতি শীল' সাধু পুরুষের সংসর্গ হইতে মানুষের আত্মা যেই 'রস' লাভ করে, নিসর্গের সংসর্গে মন ডুবাইতে পারিলেও উহার কাছাকাছি ফলটুকু এবং সাহায্য-টুকু ঘটিয়া যায়। এ জন্যই বিবেকী পুরুষগণ সকলেই যেন ন্যূনাধিক নিসর্গ প্রিয়! "বিবিক্তদেশ সেবিত্বমরতির্জন সংসদি" যেমন অধ্যাত্মপথিক মাত্রেরই অনুভবসম্মত একটী 'সত্য' কথা; তেমনি, 'শান্ত' আত্মার প্রধান পরিচয়চিহ্নটাও হয়ত—নিসর্গাত্মার সঙ্গে উহার আত্মীয়তা ও সহানুভূতি! সুতরাং, জগতের গুহাগামী অথবা হৃদয়গুহায় প্রবেশকামী সাধুগণ নিসর্গপ্রেমিক এবং নির্জ্জনসেবী! বিগহন মরুপ্রান্তরে, সমুচ্চ শৈলশিরে অথবা সমুদ্রতীরেই নিসর্গের হৃদয়স্পর্শকামী ও শান্তিপথগামী ব্যক্তিগণ বাস করিতে ভালবাসেন—অনেক সময়, অতর্কিতে, জীবাত্মার 'সাধর্ম্ম্য' প্রীতি

ও সহানুভূতির বশেই হয়ত ভালবাসেন। মানবজগতের ধর্ম্মমন্দির গুলিন হয়ত এজন্যই লোকালয় হইতে দূরে, নির্জ্জন নিসর্গবক্ষে প্রায়স্থলে নির্ম্মিত হইয়া থাকে; অনেক সময়, হয়ত, নিসর্গাত্মার অতর্কিত সহানুভূতি বশেই নির্ম্মিত হইয়া থাকে। মনুষ্যজাতির অধ্যাত্মপথিকগণের 'সহানুভূতি'র মধ্যেই নিসর্গাত্মার মাহাত্ম্যপরিচয়।

নিসর্গের বিক্ষোভ বা 'কোলাহল' প্রভৃতি যেন মনুষ্যের সংসারজনতার কোলাহল হইতে পৃথক্ পদার্থ! জড়তার হুঙ্কার'বিক্ষুব্ধ', জনহীন সমুদ্রতীর যেন শান্তিসমুদ্রে ডুবিবার পক্ষেই একটী সহায়-স্থান! ওয়ার্ডসোয়ার্থের একটী সুন্দর কবিতা—Picture of Peel Castle in a Storm। উহাতে সংসারজনতার সংঘাতকলকলির মধ্যে বিবেকী এবং স্থিতধী পুরুষগণের আত্মদুর্গের মর্ম্মছবি টুকুই যেন অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে! কবিতাটী যেন জীবনযুদ্ধালিপ্ত মনুষ্যের সুগুপ্ত, 'শান্তংশিবং অদ্বৈতম' অন্তরাত্মাটীর ছবিটুকুন ফুটাইয়া তুলিয়া এবং উহার মাহাত্ম্যবোধে পাঠককে মর্ম্মপ্রতীতি দান করিয়াই এত 'সুন্দর'! অধ্যাত্মতার ক্ষেত্রে 'প্রেম'মাত্রের প্রধান মাহাত্ম্য—অনাত্মীয় দেশে আত্মার সংপ্রসার; স্বার্থের অতীত ক্ষেত্রেই প্রয়াণ। যে জন্য, আত্মপথিক ব্যক্তির পক্ষে প্রেমের পথই শ্রেষ্ঠপথ; উহা প্রাণের সুখসম্মত প্রয়াণ পথ। নিসর্গের সংসর্গমধ্যে ভালমন্দের, সুরুচিকুরুচির কিংবা ধর্ম্মাধর্ম্মের বিক্ষোভ নাই বলিয়া, নিসর্গপ্রেম জীবহৃদয়ের পক্ষে দিব্য-আলোকের উদাত্ত পন্থা; উহা আনন্দের পথেই আত্মার জড়তা-বিলজ্ঘা উজানী পাড়ী; উহা প্রাণের অমৃততরীর কাণ্ডারী! উহা শুদ্ধসত্ব, অপাপবিদ্ধ; উহার মহিমা 'স্বানুভূতি' প্রমাণেই জীবের পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ।

ইয়োরোপীয় সাহিত্যে, উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্তই নিসর্গ প্রকৃত প্রস্তাবে কেবল একটা 'বর্ণনার' উপসর্গ ও প্রকাশরীতির 'অলঙ্কার' মাত্র ছিল। শিল্পদার্শনিক রাস্কিনের Modern Painters পাঠে (উক্ত গ্রন্থ বিশেষ ভাবে এ'কালের নিসর্গ-চিত্রকর'গণের মাহাত্ম্য চিন্তাতেই রচিত) দেখিতেছি, চতুর্দ্দশশতাব্দী পর্য্যন্ত ইয়োরোপের

৪১। ইয়োরোপীয় সাহিত্যে নিসর্গকবিতা এবং সে সূত্রে ওয়ার্ডসোয়ার্থ।

চিত্রকলাতেও নিসর্গ কেবল প্রকাশরীতির 'অলঙ্কার' মাত্র ছিল; মনুষ্যত্বের একটা 'ভূষণ' স্বরূপেই ছিল। মানবত্ব বিষয়ে চিত্রশিল্পিগণের 'ধারণা' প্রকাশে একটা সহকারী আলম্বন স্বরূপেই নিসর্গের অবতারণা! তিসিয়ান প্রভৃতি জগৎপ্রসিদ্ধ চিত্রকরগণের রচনা মধ্যেও নিসর্গ স্বতন্ত্র পদবী লাভ করিতে পারে নাই।

ইদানীং নিসর্গ একটা স্বতন্ত্র-'সুন্দর' 'ব্যক্তি'রূপেই যেমন ইয়োরোপের চিত্রে, তেমন সাহিত্যে আসিয়া পড়িয়াছে। ভারতের সংস্কৃত সাহিত্যে যে বহুকাল হইতে নিসর্গ একটি স্বতন্ত্র 'ব্যক্তি' বা 'পাত্র' রূপে দাঁড়াইয়াছিল, তাহা রসিকমাত্রের সহজবোধ্য। ভারতীয় কবিই সাহিত্যজগতে প্রকৃত নিসর্গকবিতার 'অগ্রদূত'। বেদের 'স্তোত্রাঙ্গ' ঋক্‌গুলি বাদ দিলেও, দেখিতে পারি যে, নিখুঁৎ গানাঙ্গের উষা সূক্ত, অরণ্যানী-বসুন্ধরা বা 'নদী' সূক্ত সমূহের মধ্যে নিসর্গ একটী মহাপ্রাণী 'হৃদয় সখা' রূপে, এক একটী ভাব-প্রাণময় মহা'ব্যক্তি' রূপেই কবিগণের আনন্দাধার হইয়া দাঁড়াইয়াছেন! পরবর্ত্তী কবিগণ এ সখ্যসূত্র আরও ঘনিষ্ঠ করিয়াছেন, ওই আনন্দরাজ্যের অধিকার আরও বিস্তারিত করিয়াছেন! অথর্ব্ব বেদের বসুন্ধরা সূক্তটি (রবীন্দ্রনাথের সুন্দর 'বসুন্ধরা' কবিতা যাহার সন্ততি) সাহিত্য সংসারে অনুপম পদার্থ! 'মৃন্ময়ী প্রেম' ও 'মৃন্ময়ী' পূজা রূপে যে আধুনিক ভাবুকতা একদিকে জর্জ্জ মেরিডিথ্ ও রবীন্দ্র নাথের মধ্যে, অন্যদিকে 'প্রাকৃত'বাদী কবিগণের মধ্যে বিকাশ লাভ করিয়াছে, উহার 'আদি উদ্বোধন'টুকুও অথর্ব্ব বেদের 'বসুন্ধরা' সূক্তের মধ্যেই পাইব। (১)

ইয়োরোপের অদ্বিতীয় নিসর্গকবি ওয়াড্‌স্যোয়ার্থের পর হইতেই নিসর্গ ইয়োরোপীয় সাহিত্যে স্বতন্ত্র পাত্র-পদবী এবং ভাবময় চারিত্রের অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। Seasons কাব্যের কবি টমসন বা স্কটলণ্ডীয় কবিগণ হইতে নহে, গ্যাটে-শীলার প্রভৃতি জর্ম্মন কবি হইতে বা রুশো প্রভৃতি ফরাসিস কবি হইতেও নহে, ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ হইতেই ইয়োরোপের নিসর্গকবিতা একটা ধ্যাননিষ্ঠতা, গভীরতা

(১) এতৎসূত্রে গ্রন্থের ১৮৪—৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ও রসবত্তার অভিনব গুরুদীক্ষা এবং উপনয়ন লাভ করিয়াছে। এখন ইয়োরোপের সাহিত্যে নিসর্গও মনুষ্যব্যক্তির মত নিজের স্বাধীন সৌন্দর্য্যে এবং ব্যক্তিত্বে একটা স্বতন্ত্র 'পদবী' লাভ করিয়াছে। ইংরেজী সাহিত্যের একজন পণ্ডিত—বাক্যশিল্পী ও সাহিত্যপণ্ডিত—ওয়াল্টার পেটার ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের নিসর্গকবিতার স্বরূপ এবং রীতি অনুপমভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। উহার ভাবার্থ এই যে, ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থ মানবচিত্তকে 'শান্ত' করিয়া নিসর্গের সমক্ষেত্রে এবং সহানুভূতিক্ষেত্রে আনয়ন করেন; আবার, নিসর্গকেও 'প্রাণী' করিয়া মানবের 'প্রাণ'তত্ত্বের সমতলে ও সহজীবনের ক্ষেত্রে লইয়া আসেন। কথাগুলির গুরুত্ব বুঝিতে পারিলেই ঠিক পাইব যে, সাহিত্যের নিসর্গকবিতার ক্ষেত্রে ওয়াড্‌সোয়ার্থ কেন গুরুস্থানীয়; নিসর্গসাহিত্যে তাঁহার স্থান কেন অদ্বিতীয় এবং কতদিকে অতুলনীয়। সাহিত্যে নিসর্গপূজা ও নিসর্গে আত্মতত্ত্বসাধনার প্রগাঢ়তায় ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থ আমাদের দৃষ্টিতে একটি 'ঋষি' আত্মা!

নিসর্গকবিতার বিষয়ে বাহুল্যের স্থান ইহা নহে। তবে, সাহিত্যের 'সৌন্দর্য্য'চিন্তার অধ্যায়ে নিসর্গের স্বতন্ত্র সত্তা ও ভাবাধিকার চিন্তা না করিলে, উহার স্বতন্ত্র পদবী স্বীকারিত না হইলে, আলোচনা নিদারুণভাবে অসম্পূর্ণ থাকে। নিসর্গের সৌন্দর্য্যকে অন্তরাত্মায় গ্রহণ এবং উপভোগ করা' মনুষ্যত্বের ক্ষেত্রেও একটা স্বতন্ত্র মাহাত্ম্যসাধনা—একটা স্বতন্ত্র কর্ষণা। উহা মানবাত্মার Higher Education এর একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। বলিয়াছি, অনেক সময় সাধু, সরল ও সমুন্নত আত্মার প্রধান মাপকাঠি—নিসর্গপ্রেম ও নিসর্গসৌন্দর্য্যের অনুভূতি! ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের কবিতার মধ্যে সহৃদয়গণ যে একটা Healing power (বেদান্তানুগত কথায় 'বুদ্ধিস্বাস্থ্য-করী শক্তি') অনুভব করেন, যাহা জগতের অন্য কোন কবির মধ্যেই এ ভাবে নাই, তাহা আন্তরিক নিসর্গ-দীক্ষা ও নিসর্গের সাহচর্য্য হইতে উপক্রান্ত হইয়াছে; অনুভবপথে নিসর্গাত্মার একটি ঘনিষ্ঠগভীর শিষ্যতা হইতে উপজাত হইয়াই কবির জীবনে 'অভ্যাস-সিদ্ধি' রূপে দাঁড়াইয়াছে। সকল গভীরগাহী সাহিত্য-রসিকের রসনাতেই ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের নিসর্গ-

কবিতা যে একটা অতুলনীয় 'রসাল' পদার্থ, তাহা ইয়োরোপের আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রে একটা স্বীকার্য্য রূপেই দাঁড়াইয়া গিয়াছে। মানবচরিত্রের ধারণাক্ষেত্রে যেমন সেক্সপীয়র, নিসর্গের প্রাণ ও চরিত্রের একটা অন্তর্মুখ এবং অধ্যাত্ম বৈশিষ্ট্যময় অনুধ্যানের ক্ষেত্রেও তেমনি ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থ্‌। অনেক কবিই নিসর্গপ্রেমিক এবং নিসর্গরসিক হওয়ার 'পদবী' টুকু দাবী করিয়া গিয়াছেন। অনেকের দাবী হয়ত 'অগ্রাহ্য' হইবে—তবু ত দাবী! উহা হইতেই সাহিত্য-রসিক নিসর্গের মাহাত্ম্য ও প্রাধান্য বুঝিতে পারেন। যেমন, কবি ল্যাণ্ডর বলিয়া গিয়াছেন—

'I loved Nature and next to Nature Art'.

আবার, বায়রণ বলিয়াছেন—

'I love not man the less but Nature more'

কবিগণের 'দাবী' হইতেই নিসর্গের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি।

৪২। ভারতীয় কবিগণের 'অদ্বৈববাদ' এবং সাহিত্য-সাধনার স্বরূপ; সে সূত্রে কালিদাস।

বেদের নিসর্গকবিতায়, অথবা ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাসের নিসর্গ কবিতায় অন্তর্গাহী ব্যক্তিমাত্রের পক্ষে বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, ভারতের নিসর্গকবিতা তত্ত্বতঃ ও 'ব্যক্তি'তঃ কি পদার্থ! ভারতীয় ঋষি বা ঋষিশিষ্য কবি মাত্রেই অদ্বৈতবাদী! জীব ও নিসর্গকে তাঁহারা 'তৃতীয়' তত্ত্বেরই পরিপ্রকাশ রূপে ধারণা করেন। কেহবা 'চিৎ' ও 'অ-চিৎ' নামে উভয়কেই 'এক'তত্ত্বের প্রকট দেহ রূপে, কেহ বা একেরই 'সৃষ্টি নির্ম্মানেচ্ছা'ময়ী 'আত্মকৃতি'র (বা "মায়া"র) পরিনাম' রূপেই ধারণা করেন। নিসর্গবিষয়ে ঋষি-শিষ্য ও বৈদান্তিক কবির দৃষ্টিস্থান কি হইবে, কি হওয়া উচিত, তাহা ত ভারতের অদ্বিতীয় হৃদয়মর্ম্মবিৎ কবি কালিদাসের 'শকুন্তলা'র প্রথম শ্লোকটিই আমাদিগকে চিনাইয়া গিয়াছে! কবিও অদ্বৈততত্ত্বের সাধক। কবি বাক্য ও অর্থের 'প্রতিপত্তি' এবং বুদ্ধিযোগের পথে কিরূপে জগতের নিত্যসংযুক্ত পিতৃমাতৃ-তত্ত্বে উপনীত হইবার আদর্শ রাখেন, উহার সমাচারটাই

কালিদাস রঘুবংশের প্রথম শ্লোকে দিয়াছেন। আবার, প্রত্যক্ষ জগতের নিসর্গ কিংবা জীবকে কবি কোন্ তত্ত্বরূপে ধারণা এবং আত্মস্থ করিবেন, জগৎজীবনের সঙ্গে কবিজীবনের সহযোগ ও সঙ্গতি কোন্ দিকে রক্ষা করিবেন, কবিজীবনের সেই আদিম ও প্রধানতম সমস্যা টুকুই ত কালিদাস শকুন্তলার প্রথম শ্লোকে সমাধা করিয়াছেন!

"যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যাহবির্যাচহোত্রী" ইত্যাদি কালিদাস-রসিক মাত্রের জানা শ্লোকটীর অর্থ কি? যখন শ্লোকটার প্রথম পরিচয় লাভ করি (টীকাকার গণের ব্যাখ্যাচেষ্টা এবং 'পাণ্ডিত্য' ও 'গবেষণা'রূপ নানা দুর্লভ পদার্থের সন্মুখীন হই) তখন এবং দীর্ঘকাল পরেও শ্লোকটি কিছুমাত্র বুঝিতে পারি নাই। "উপমার কবি", 'সৌন্দর্যের কবি' কালিদাস তাঁহার শ্রেষ্ঠকাব্যটীর প্রবেশদ্বারেই এমন একটি 'কটমটি'ময় শ্লোকই বা কেন জুড়িয়া দিলেন? ভাল কোন 'রসের কথা', ভাবের কথা কি পারিলেন না? তাঁহার ভাবুকতার পুঁজিটা এতই স্বল্প ছিল? এখন বুঝিতেছি, 'অদ্বৈতবাদী' কবির পক্ষে ওই শ্লোকোক্তি কত 'অপরিহার্য্য' ছিল। 'এক'চিন্তক কবির পক্ষে, জীবনের চরম সমস্যাতত্ত্বে সচেতন এবং 'মীমাংসা'কামী কবির পক্ষে, আত্মজীবনের পরমার্থ ও কাব্যার্থ-ব্যবসায়ের সঙ্গতি চিন্তা এবং আপন সিদ্ধান্তের 'ঘোষণা'টুকুন কতমতে অপরিহার্য্য হইয়াছিল। আদি কর্ত্তব্য রূপেই দাঁড়াইয়াছিল। আদর্শের 'মীমাংসা' এবং সিদ্ধান্তে সচেতন স্থিতিই ত জীবনক্ষেত্রে জাগ্রতসাধকের কিংবা কবিমাত্রের প্রধান বল! কবিও অদ্বৈততন্ত্রের সাধক—নিজের পথে তিনিও 'অধ্যাত্মসাধক'; কবির 'ব্যবসায়' পথে, রসধারণা ও আনন্দসাধনার পথে তিনিও জীবনিসর্গের বা জগতের সেবক; স্বয়ং অধ্যাত্মপথিক এবং পরমতত্ত্বেরই সাধক। কবি জীব বা নিসর্গকে কি রূপে, কোন্ 'তত্ত্ব'রূপে ধারণা করিয়া এ জীবনে চলিবেন? কবিজীবনের বাহ্যিক ব্যবসায় ও আত্মিক লক্ষ্যের সঙ্গতিসমস্যা টুকুই কালিদাস কাব্যটীর উক্ত আদিশ্লোকে সমাধান করিলেন।

৪৩। শকুন্তলার প্রথম শ্লোকে ভারতীয়কবির 'ইহা-মুত্র'আদর্শের সমন্বয়দৃষ্টি।

প্রকৃতি ত পরমেরই প্রত্যক্ষতাপন্ন মূর্ত্তি! পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্ত পদার্থ লইয়াই নিসর্গ; অষ্টম পদার্থ, জীবন-যজ্ঞের যজমান মূর্ত্তি—"জীব মূর্ত্তি"। পরমের এই অষ্ট প্রকট মূর্ত্তি (১) লইয়া যেমন সৃষ্টির ব্যাপার—তেমন সাহিত্যের ব্যাপারও মোটামোটি সম্পূর্ণ। এই ত্রিতত্ত্ব—ত্রি-সংখ্যাত জীব, নিসর্গ ও পরমেশ! তিনে-এক এবং একে-তিন লইয়াই সাহিত্যের 'জগৎ'। কবি কালিদাসের দৃষ্টি ও জীবনাদর্শ সম্বন্ধে পরমই জীব এবং নিসর্গ রূপে প্রকট হইয়াছেন; তিনি সৃষ্টি-নির্ম্মাণ কারিণী শক্তি বা মায়ায় অধিরূঢ় হইয়া প্রত্যক্ষ রূপে প্রকট হইয়াছেন। এই প্রকট সৌন্দর্য্যের 'নাম রূপ' লইয়াই ত কবির 'ব্যবসায়'। কবি সকল বিষয় বা পদার্থকে সর্ব্বত্র দেববুদ্ধিতে, দিব্য ভাবাশ্রয়ে চর্চ্চা করিয়াই চলিবেন—নাম-রূপের বৃহগুপ্ত 'অস্তিভাতি প্রিয়ং' তত্ত্বকে চরম লক্ষ্যধরিয়াই কবি সর্ব্বপ্রকার 'চর্চ্চা' করিবেন; নিজের সর্ব্বেন্দ্রিয়-প্রাণ-মন ও বুদ্ধির পথে, ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর গুহায় চলিবেন। সুতরাং কবির প্রার্থনা—এ'রূপ 'চর্চ্চা'ই তাঁহার জীবনে 'অর্চ্চা'রূপে পরিণাম লাভ করুক! তাঁহাকে এবং জগৎকে 'অবন' করুক! দিব্যের, পরমের এবং একের লক্ষ্যেই কবির গতি, ধৃতি, পূর্ত্তি ও প্রাপ্তির সহায় হউক!

ইহাই ত শকুন্তলা কাব্যের প্রথম শ্লোকটীর 'অর্থ'! একটি উদগ্র-জাগ্রত, এবং উর্দ্ধপ্রয়াসী কবি-আত্মা কর্ত্তৃক জীবনের 'ইহা-মূত্র' আদর্শের সঙ্গতি নিরূপণ! একতত্ত্ব-বাদী কবির অধ্যাত্ম আদর্শের সঙ্গে (আপাততঃ বিরোধিবৎ প্রতীয়মান) তাঁহার 'বিষয় বিলাসিতা'র সঙ্কট সমাধান! জীবনের পরমার্থ লক্ষ্যের সঙ্গে কাব্য-ব্যবসায়ে'র সঙ্গতি সাধন এবং জীবনমন্থনোদ্ভূত কাব্য-অমৃতের সদাব্রতে জগতের জীবমাত্রের নিমন্ত্রণ!

(১) পৃথিবী সলিলং তেজো বায়ুরাকাশ এব চ।
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ সোমযাজীত্যষ্ট মূর্ত্তয়ঃ॥ মনু

৪৪। ভারতীয় নিসর্গ-কবিতার Pantheism ও উহার স্বরূপ।

এস্থলে ভারতীয় সাহিত্যের কবিগণের ঋষিশিষ্যতা ও অদ্বৈত-বুদ্ধির স্বরূপ এবং উহার ফলটুকুন মোটামোটি চিন্তা করা উচিত বোধ হইতেছে। কেনন, সচেতন সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যরসিক মাত্রের জীবনের মূল সমস্যাটি, তাঁহাদের অধ্যাত্মজীবন ও ব্যবসায়জীবনের চূড়ান্ত 'সমস্যা' ও সিদ্ধান্তটাই এ'সূত্রে নিহিত আছে। ভারতে দুনিয়াদারীর ক্ষেত্রে একজন পরম Authority বা 'প্রমাণ' হইতেছেন কৌটিল্য। মানুষের সাংসারিক অর্থ-স্বার্থ ও ব্যবসায়বুদ্ধির ক্ষেত্রে তাহাকে 'হিতোপদেশ' দানের পরম 'কর্ম্মমন্ত্রী' ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি হইতেছেন এই কৌটিল্য! তিনিই ত মনুষ্যকে সাহিত্যচর্চ্চার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন! সংসাররূপী বিষবৃক্ষটার নাকি দুটিমাত্র 'অমৃত ফল'; এবং তন্মধ্যে 'কাব্য' একটি! অন্যদিকে, ব্যাসবাল্মীকি প্রভৃতি 'চরমতত্ত্ব' পিপাসু ঋষিও সাহিত্যচর্চ্চায় জীবনাতিপাত করিয়াছেন, বলিলে হয়ত অত্যুক্তি হইবে না। দুনিয়াবিষয়ী এবং জগৎ-বিলাসী ও জগদুপজীবী এই যে সাহিত্য, ইহার 'চর্চ্চা' যদি একটা রিক্তসার ও যোগহীন পদার্থই হয়, কবি-জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যের সঙ্গে, তাঁহার জাগতিক ব্যবসায়কর্ম্মের যদি কোন ঐক্যসূত্র এবং আধ্যাত্মিক সঙ্গতি না থাকে, তা হইলে কবির কর্ম্মজীবন যেমন একটা নিঃসার পদার্থ, তাঁহার কাব্যকবিতা গুলাও তেমনি একএকটা ভণ্ড, ফাঁকা, বেরসিক এবং অসরল পদার্থ ও পাপিষ্ঠবস্তু না হইয়া ত পারে না! ভারতীয় দৃষ্টিতে এরূপ অসঙ্গত 'কর্ম্ম'মাত্রেই পরম 'অকর্ম্ম' ও অধর্ম্মের ব্যাপার না হইয়া পারে না। কবি জগৎকে ও তাঁহার কর্ম্মজীবনকে যদি আত্মকেন্দ্র হইতে, দিব্য দৃষ্টিতে, দিব্য ভাবে গ্রহণ করিতে না পারেন, তা হইলে জাগতিক বিষয়ে সকল কর্ম্ম-চর্চ্চাই ত অধ্যাত্মতঃ নিদারুণ হতসাধন, ভণ্ড, পণ্ড এবং অসার হইয়া যায়! তাই বুঝি, জগতের একজন আত্ম-জাগ্রত কবি এবং শ্রেষ্ঠশ্রেণীর কবি কালিদাস তাঁহার শ্রেষ্ঠকাব্য শকুন্তলার প্রথম শ্লোকে, নিজের কাব্যচেষ্টার চূড়ান্ত লক্ষ্য ঘোষণা করিয়া গেলেন। কাব্যের বিষয়াদর্শ, উহার আলম্বন এবং

বৈষয়িক ধর্ম্মের চূড়ান্ত 'লক্ষ্য' প্রকাশ করিলেন! তাহার আত্মপ্রতীতি এবং কাব্যসাধনার চরম তত্ত্ববার্ত্তা, অপিচ কবিধর্ম্মের 'ঘরের কথাটুকু' ওইরূপে সঙ্কেত করিয়া গেলেন! তদ্রূপ, কালিদাস রঘুবংশের প্রথম শ্লোকেও, তাঁহার কাব্যরীতির মুখ্যস্বরূপ ও চূড়ান্ত লক্ষ্য কি, উহা কিরূপে বিশ্বতত্ত্বের সহিত সঙ্গতি লাভ করে, সে 'বার্ত্তা'টুকু প্রকাশ্যভাবেই 'গুপ্ত' রাখিয়া গিয়াছেন! কাব্যের প্রথম এবং শেষকথা গুলি সমাহিত ভাবেই বুঝিতে হয়। সেখানেই ত কবিগণ নিজের অনেক 'রহস্য'কথা 'প্রকাশ্য ভাবেই গুপ্ত' রাখিয়া যাইতে লক্ষ্য রাখেন!

(বুঝিতে হয়, প্রকৃত অদ্বৈতবাদী ভারতীয় কবি মাত্রেই (যথা কালিদাস) একদিকে, সাহিত্যের 'রীতি'ক্ষেত্রে, যেমন হৃদয়মনের 'ভাবোত্তমা' পদ্ধতি এবং 'রসমুখ্য' প্রকাশরীতির সাধর্ম্ম্যে পরম Romanticist; অন্যদিকে, দর্শন ক্ষেত্রেও অধ্যাত্মতঃ পরম 'একত্ব'-সাধক ও 'জ্ঞান' বাদী বলিয়াই, একেবারে Absolute Idealist; আবার, জীবনের কিংবা সংসারের বিষয়বস্তু এবং কাব্যের আলম্বন ক্ষেত্রেও ন্যূন Realist নহেন।)

সবিশেষ বুঝিতে হয় যে, নিসর্গের 'আত্মা'চিন্তক বা নিসর্গে 'আত্মতা'ভাবুক কবিগণ নানাদিকে Pantheist না হইয়া পারেন না। এজন্য ইয়োরোপের (দ্বৈতবাদী) খ্রীষ্টানগণের দৃষ্টিতে কবি ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থ Pantheist রূপে নির্দ্দিষ্ট—ফলতঃ নিন্দিত। একালের নিসর্গপ্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির মধ্যেও Pantheist লক্ষণটী সময় সময় আসিয়া গিয়াছে, না আসিয়া পারে নাই। এ স্থলে আরও বুঝিয়া যাইতে হয় যে, ইয়োরোপীয় সাহিত্যের কিংবা দর্শনের Pantheism হইতে বৈদিক Monism বা "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বাদ স্বতন্ত্র। আমাদের অদ্বৈতবাদকে Pantheism রূপে অনুবাদ একটা অপনাম এবং 'অপবাদ' বই নহে। অদ্বৈতবাদ Pantheism হইতে, অধ্যাত্মতঃ আরও এক 'ধাপ' উপরের এবং গভীরের পদার্থ। যাঁহারা Pantheist, তাঁহারা Monist নাও হইতে পারেন; কিন্তু, যাঁহারা Monist তাঁহারা Pantheist

৪৫। নিসর্গবিষয়ে ভারতীয় 'অদ্বৈত' আদর্শ ও বিলাতী 'জগৎরূপী ঈশ্বর' বাদের পার্থক্য।

অবশ্যই ! ইয়োরোপের Pantheism দর্শনক্ষেত্রে এবং সাহিত্যেও অনেক-সময় তাহা 'নিরীশ্বরবাদ বা নাস্তিক্যের লক্ষণই দেখাইয়াছে। কে বা কাহারা নাস্তিক্যবাদী Pantheist সে বিচারে সাহিত্যদর্শনের 'আমল' নাই ; পার্থক্যটুকুন লক্ষ্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। নাস্তিক Pantheism আদর্শে জগৎটাই "ঈশ্বর" ; সুতরাং উহা 'জগৎরূপী ঈশ্বর'বাদ—যে ঈশ্বরের জগদতিরিক্ত অপর কোন সত্তা কিংবা শক্তি-সামর্থ্য-ক্ষমতা নাই। এ আদর্শে, ঈশ্বর সুতরাং জগতের মতই অপূর্ণ এবং মনুষ্যত্বের মধ্যেই নাকি জগদীশ্বরের চূড়ান্ত ক্ষমতার বিকাশ; মানবের ললিত কলার মধ্যে (সঙ্গীত কাব্য চিত্র ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের মধ্যেই) ঈশ্বরের চূড়ান্ত 'ঐশ্বর্য্য' এবং সৃজনী শক্তির শেষসীমা ! তাঁহার ভগবত্তা, সৌন্দর্য্যসৃষ্টির শক্তি এবং আত্মোপলব্ধিটুকুও সুতরাং জগন্মধ্যেই পর্য্যবসিত ! ভারতীয় অদ্বৈতবাদ ত ইহা নহে ! হইতেই পারে না। ভারতীয় অদ্বৈতবাদী বলিতে পারেন "সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম, তজ্জলানিতি" ; কিন্তু, ফিরাইয়া, "ব্রহ্মখল্বিদং সর্ব্বম্"—একথা কদাপি বলিতে পারেন না। গীতায় 'ব্রহ্মবিদ্' (সুতরাং ভারতীয় আদর্শে 'ব্রহ্মভূত') শ্রীকৃষ্ণ আত্মমুখে ভারতের 'অদ্বৈত ব্রহ্ম'তত্ত্বই প্রকাশ করিয়াছেন—

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ ॥

আবার বলিয়াছেন—

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেনস্থিতো জগৎ।

পঞ্চদশী একটি প্রামাণিক বেদান্ত গ্রন্থ। উহার চিত্রদীপ প্রকরণে ভারতবিস্তৃত বেদপন্থী ধর্ম্মের বা হিন্দুধর্ম্মের সাধনা ও উপাসনা পদ্ধতির সমন্বয়-দৃষ্টি এবং সমর্থনাই প্রকটিত আছে। উহাতে "এক অদ্বিতীয়" ব্রহ্মের বিবর্ত্তরূপী মায়ার পরিণাম রূপে ঈশ্বরাদি হইতে আরম্ভ করিয়া নিসর্গের প্রস্তর তৃণাদির পূজাপর্য্যন্ত বৈদিক দর্শনের আদর্শে পরিদৃষ্ট হইয়াছে; পরমতত্ত্বের সাধনায় অধিকারী ভেদে উত্তমাধম উপাসনা রীতি এবং ভাবভেদে উহার 'ভাল-মন্দ' বিশেষফলটুকুও বিশদীকৃত

হইয়াছে। এস্থলেই ভারতীয় 'ঋষিদৃষ্টি'— অদ্বৈতবাদী অথচ Pantheist দৃষ্টি ! (১) নিরাবিল দৃষ্টিতে অথচ নিদারুণ সত্যদর্শন ও নিরপেক্ষ নির্ম্মমতার ভাবেই বলা হইয়াছে—"পূজ্য-পূজানুসারেই" সর্ব্বত্র উচ্চনীচ কিংবা ভালমন্দ ফল —

যথাযথোপাসতে তং ফলমীয়ুস্তথাতথা।
ফলোৎকর্ষাপকর্ষৌতু পূজ্যপূজা নুসারতঃ ॥

(১) 'বেদান্ত পঞ্চদশী' খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ 'সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ' রচয়িতা মাধবাচার্য্যই রচনা করিয়াছেন। মাধব শেষজীবনে চতুর্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া 'বিদ্যারণ্য মুনি' নাম গ্রহণ করেন এবং ক্রমে শঙ্করমঠের (শৃঙ্গেরী) কর্ত্তা হন। পঞ্চদশীর প্রথম ৬ অধ্যায় রচনা করিয়াই বিদ্যারণ্য নরলীলা শেষ করিলে, তাঁহার গুরু 'ভারতী' তীর্থ পরের ৯ অধ্যায় বিন্যস্ত করিয়াছেন। পঞ্চদশী ভারতের অদ্বৈতবাদের ও (তথাকথিত) জ্ঞান-ভক্তি-মার্গের 'সাধনা' ও 'উপাসনা' আদর্শের সমন্বয়ময় প্রামাণিক গ্রন্থ; শঙ্করভাষ্যের পরেই বেদার্থ এবং বেদান্ত বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ভারতীয় Mysticism বা অধ্যাত্মবিদ্যা বিষয়ে উহাপেক্ষা বড় যুক্তিবাদের গ্রন্থ সাংসারিকের হস্তে নাই। পঞ্চদশী বলিয়াছেন

ঈশ-সূত্র-বিরাড়-বেধো-বিষ্ণু-রুদ্রেন্দ্র-বহ্নয়ঃ।
বিঘ্ন-ভৈরব-মৈরাল-মরিকা-যক্ষঃ-রাক্ষসাঃ ॥
বিপ্র ক্ষত্রিয় বিট্‌শূদ্রা গবাশ্বমৃগপক্ষিনঃ।
অশ্বত্থ বটচূতাদ্যা যবব্রীহিতৃণাদয়ঃ ॥
জল পাষাণ মৃৎ কাষ্ঠ বাস্যা কুদ্দালকাদয়ঃ।
ঈশ্বরাঃ সর্ব্ব এবৈতে পূজিতাঃ ফলদায়িনঃ।

এ'সমস্ত যে ঈশ্বরের প্রকটমূর্ত্তিএবং এ সমস্তের পূজায় যে 'কাম্য ফল' হয়, ভাবানুরূপ ফল হয়, তাহা ভারতীয় অদ্বৈতবাদীর স্বীকৃত কথা। গীতার সেই অত্যন্ত জানা' কথাগুলিন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং ॥
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ॥

সমস্তই অদ্বৈতদর্শনের সিদ্ধান্ত-সমর্থিত কথা। আমাদের 'যজ্ঞ' বা 'পূজা' কথার অর্থও বিলাতী Worship হইতে নানাদিকে পৃথক্ ও বহুব্যাপক। 'পূজা'র অর্থ—পূজ্যে আত্ম-ভাবনা ও পূজ্যশক্তির উদ্বোধন। এজন্য বিষ্ণুপূজায় বিধি—"আত্মানং বিষ্ণু রিতি ভাবয়েৎ"। এ, দেশের 'পূজা'বিদ্বেষী ও আক্রমণকারিগণের অনেকেই হয়ত এ'কথাটি ভাবেন না; ভাবিতেও চাহেন না।

এস্থলেই বাহ্য 'পূজা'মাত্রের অপরিহার্য্য 'ফল'তত্ত্ব। অবশ্য, কোন প্রকার পূজাই একেবারে বিফল হয় না। কিন্তু, চূড়ান্ত সত্য কি? সত্যকে উপলব্ধির স্বরূপ কি? তাহাও পরবর্ত্তী শ্লোকেই নিদারুণ খোলাখুলি ভাবে বলা হইয়াছে—

মুক্তিস্তু ব্রহ্মতত্ত্বস্য জ্ঞানাদেব ন চান্যথা। (১)

মহানির্ব্বাণতন্ত্র এই 'পূজা'র আদর্শকে আরও বিশদ করিয়া বলিয়াছেন—'পূজা'-আদর্শের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত কথাটাই বলিয়াছেন—

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
জপতপোঽধমো ভাবো বাহ্যপূজা ধমাধমঃ॥

অতএব, যেমন সকল উপাসকের প্রতি, তেমন নিসর্গসেবী সাহিত্যিকের প্রতিও বৈদিক দর্শনের সিদ্ধান্ত কথা—নিজের ভাবনা এবং 'পূজার' ধর্ম্ম অনুসারেই তুমি 'ধর্ম্মবান্' হইবে। তুমি যাদৃক ভাবযোগে জীবনপথে চলিবে, তদনুরূপেই অধ্যাত্ম 'ফল' প্রাপ্ত হইবে। অন্তরালনিবাসী ভগবান্ বা তাঁহার 'ঋত'ই (cosmic Law) ফলদাতা। বেদান্ত-বৈজ্ঞানিক বশিষ্ঠ ঋষি বলিবেন, এ দিকের চূড়ান্ত বার্ত্তাটাই বলিবেন,—'আত্মার বিভুশক্তি'ই উক্ত ফল দান করে। অতএব, তুমি যদি 'জগদীশ্বর নাম দিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে একটা রাক্ষসগুণধর্ম্মী তত্ত্বকেই অর্চ্চনা কর, তুমি অধ্যাত্মতঃ উপাস্যের ধর্ম্মেই ধর্ম্মিত হইবে; প্রকৃত 'ভগবৎ বস্তু অগম্যই থাকিবেন। অধ্যাত্মক্ষেত্রে, (আত্মার সূক্ষ্মপ্রকৃতির ক্ষেত্রে) 'নাম' কিছুই নহে—

(১) জীবনের 'ব্রাহ্মী মুক্তি' (Final freedom) কি করিয়া হয়, বা 'ব্রাহ্মীস্থিতি, সুসিদ্ধ হয়, তাহা আমাদের প্রতিপাদ্য নহে। প্রত্যেক জিজ্ঞাসু জীবকে স্বতন্ত্রভাবে উক্ত প্রতিপত্তি লাভ করিয়াই জীবনে চলিতে হয়। উহা সচেতন জীবমাত্রেরই প্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য। তথাপি, উক্ততত্ত্ব সাহিত্যসেবকের লক্ষ্য ও ব্যবসায়ের সম্পর্কে যে পর্য্যন্ত আসে, তাহা 'সাহিত্যে-শিব' অধ্যায়ে চিন্তিত হইবে।

তোমার উদ্দেশ্যমর্ম্ম এবং উহার গুণধর্ম্মই প্রবল। তুমি যে পরিমাণে আপনার ধর্ম্মদেহে ঊর্দ্ধক্ষেত্র-লক্ষী এবং ধর্ম্মক্ষেত্রেও ঊর্দ্ধআদর্শ গামী হইতে পারিবে, সে পরিমাণেই ব্রহ্মগতির ধর্ম্মশীল হইবে। তোমার চর্চ্চার ধর্ম্ম লইয়াই তোমার অর্চ্চা। উন্নত ভাব অবলম্বনে, চিন্তায়, মনোজীবনে ও চরিত্রচেষ্টায় চলিতে পারিলেই, প্রকৃত ধর্ম্মের পথে চলিবে এবং একদিন জগতের ধর্ম্মেশ্বরে উপনীত হইবে। এস্থলে, সাহিত্যে জীবনিসর্গসেবী কবির জন্যও চরম কথা এই যে, এই জড়-জীবপূর্ণ বিশ্বজগৎ সর্ব্বত্র 'সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম'ময়; সর্ব্বত্র তিনি সৃষ্টিবিধায়িনী মায়ার সঙ্গে ওতপ্রোত থাকিয়া বিশ্বরূপী আত্মবিভূতি প্রকাশ করিতেছেন। জীব শুধু অনাত্মদৃষ্টির গতিকেই ব্রহ্মান্ধ হইয়া সংসরণ করিতেছে—উহার নামই ত দর্শনের 'অবিদ্যা'! জীব শুধু নিজের চশমাটার গতিকেই সর্ব্বত্র ওতপ্রোত আনন্দসুন্দরকে দেখিতেছে না! জগতে যে স্থানেই জ্ঞান-কর্ম্ম-ভাবক্ষেত্রের বৃহৎ, মহৎ, ধর্ম্মসুন্দর, ভাবসুন্দর ও চরিত্রসুন্দরের প্রকাশ অনুভব করিবে, সমস্ত তাঁহারই তত্ত্বছায়া। পরমাণু হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত, সূর্য্য চন্দ্র আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া জীবহৃদয়ের সূক্ষ্ম-মহীয়ান্ ধর্ম্ম-প্রকাশ পর্য্যন্ত, "যদ্ যদ্ বিভূতি মৎ সত্ত্ব শ্রীমদূর্জ্জিত মেব বা" সর্ব্বত্রই অনন্ত রসসুন্দর ভগবানের 'তত্ত্ব'ই ছায়া-গুপ্ত ভাবে প্রকাশিত হইয়া আছে! এ'লোকে প্রকাশের নামই তত্ত্বতঃ 'আবরণ'। এ'স্থলে বৈদিক ঋষির সেই অতুলনীয় কথা—এ'জগতের 'প্রকাশ' মাত্রেই তাঁহার ন্যূনাধিক আবরণ! সূর্য্যের ওই জ্যোতিঃ-প্রকাশের মধ্যেই সত্য 'গুপ্ত' আছেন। সে জন্য ইহজগতে বিচরণশীল এবং দর্শনশীল ব্যক্তিমাত্রের যেমন প্রাণের কথা—'অস্তিভাতি প্রিয়ং ব্রহ্ম নামরূপ মিদং জগৎ,' তেমন তাহার প্রার্থনাটাও এই—

৪৬। সাহিত্যিক জীবনের 'চর্চ্চা' ও 'অর্চ্চা'র আদর্শ।

হিরন্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥

বেদের প্রজাপতি ঋষি হইতে আরম্ভ করিয়া বাক্‌দেবী পর্য্যন্ত, পুরুষ সূক্ত বা হিরণ্যগর্ভসূক্ত প্রভৃতির অতুলনীয় প্রবেশশীল দ্রষ্টা পর্য্যন্ত সকলে সেই 'প্রকাশ-গুপ্ত' তত্ত্বের দিকেই ত উদাত্তমন্ত্রে নতশির হইতেছেন। তাঁহাদের শিষ্যতা ও দৃষ্টিপথেই ত গীতার মহাকবি বিশ্বের 'ঈশ্বরকে বিশ্বমধ্যে' এবং 'ঈশ্বরমধ্যে বিশ্বকে' দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন! গীতার মধ্যে বেদের 'দ্রষ্টা' কবিগণের সেই 'আগম'-লব্ধ বস্তু "এক মেবা দ্বিতীয়ং"-বার্ত্তারই ত শিষ্যতা! সৃষ্টির মধ্যে বিশ্বেশ্বরের প্রকট সৌন্দর্য্যরূপিনী মহাদেবীই জগদম্বা এবং জগন্ময়ী 'মায়া'রূপে, 'ছায়া'রূপে, পুষ্টি-কান্তি-শ্রদ্ধা রূপে, অনন্ত রূপে এবং ভাবে জীবনেত্রে প্রকটিত-গুপ্ত আছেন! মার্কণ্ডেয় কবি তাঁহাকেই ত

"নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ"

বলিয়া প্রণাম করিতে অবধি পান নাই! মনুষ্যজাতির বীরপুরুষ অর্জ্জুন ক্ষণকালের জন্য ভগবদ্দয়ায় সমুদ্দীপ্ত দিব্যচক্ষু লাভ পূর্ব্বক যে দিকে দৃষ্টিমাত্র করিয়া, যুগপদ্ ভীত-ত্রস্ত-হর্ষিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন!

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে। নমামিতে সর্ব্বত এব সর্ব্ব॥

বলিয়া প্রণাম করিতে-করিতে তৃপ্তির উদ্দেশ পান নাই। ভগবানের সৌন্দর্য্যসূর্য্যের সম্যক্‌দর্শনে জীবের সাধ্য কি! তবু, নিসর্গপ্রকৃতির মধ্যে, (মনুষ্যের অধ্যাত্মপ্রকৃতির মধ্যেও) ঊর্জ্জিতসুন্দরের যে টুকু খণ্ডাংশ ও ভগ্নাংশ মাত্র প্রকটিত হইযাছে, জীব উহা দেখিতেই শক্তি রাখে না; অন্ধতার গতিকে, অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার অদৃষ্টগতিকে, ইচ্ছা-মর্জ্জি অথবা অভিরুচিও ত অনেকেই রাখে না!

জীবের পক্ষে, সৌন্দর্য্যের বা আনন্দের 'সাধক' কবির পক্ষে নিসর্গের 'সৌন্দর্য্য যোগ' কত বড় কথা, তাহাই বুঝিতে হয়! ওয়ার্ডসোয়ার্থ তাঁহার Tintern Abbey কবিতায় উহাকেই That sublime and the blessed mood বলিয়া সঙ্কেতিত করিতে চাহিয়াছেন। বলিতে পারি, এস্থলে মানবজাতির Mystic বা গুপ্ততত্ত্ব-পথিক সকল ব্যক্তিরই এক

৪৭। নিসর্গযোগী কবি জীবনের 'অর্চ্চা' আদর্শ।

কথা—দেশকালের পার্থক্য এখানে নাই। এখানে "সব শেয়ালের এক রা"। জাগ্রতবুদ্ধির 'বিচার' পথে অথবা ধ্যানপথে নিসর্গের এই পাপপুণ্যাতীত, অনাবিল প্রশান্তির অনুভবে হৃদয়কে সচেতন রাখিতে পারিলে অধ্যাত্ম সাধনায় অর্দ্ধেক পাড়ীই যোগান যায়। চিত্তকে শান্তনির্ম্মল হ্রদ রূপে, এবং অনন্তের ধারণাযোগী দর্পণ রূপে পরিণত করার পক্ষে এমন 'গুরু' আর নাই! নিসর্গের সৌম্য কান্তি এবং শান্তি ও দীপ্তির মধ্যে উর্জ্জিতসুন্দর জগৎ-ভাবনের সন্নিহিত অভিব্যক্তি টুকু হৃদয়ঙ্গম হইলে, উহা 'পথিক' ব্যক্তির পরম সাধনসহচর এবং তাহার অন্তরাত্মার পরম পাথেয় রূপেই দাঁড়াইয়া যায়! বুঝিতে বাকী থাকেনা যে, নিসর্গ আনন্দময়ের মন্দিরপথে জীবের পরম আনন্দবন্ধু ও চরমের সুগুপ্ত আনন্দের অনন্ত সিন্ধু!

যে কবি নিসর্গে পূতচিত্তের যোগানন্দ সাধন করিতে পারিবেন, হৃদয়কে নিসর্গের তানলয়-সিদ্ধ গায়ক রূপে পরিণত করিতে পারিবেন, সমুচিত বাক্য পথে আত্মানুভব প্রকাশ করিবার বিভু-দয়া লাভ করিতে পারিলে, তিনি জীবনে এবং সাহিত্যক্ষেত্রে রসানন্দের পরম 'অমৃত নাভি'ই লাভ করিবেন; রসের অজ্ঞাতসুন্দর, অভিনব উৎস খুলিয়া দিতে এবং জীবের চিত্তকে পরম সখ্য এবং আর্জবের সুখসিদ্ধ পথেই বিমুগ্ধ করিতে পারিবেন। নিসর্গের 'রূপ সুন্দরী'কে ভাবিনী রূপে, নিজের বা জগজ্জীবের স্বজাতি রূপে দেখাইতে পারিলে, উহাকে অনন্তের 'মহাভাবিনী' অথবা 'তুরীয়-কামিনী' রূপে গ্রহণ-পথে প্রতীতি জন্মাইতে পারিলে, কবির সে কবিতা সংসারে একটী স্বতন্ত্র 'তত্ত্ব ব্যক্তি'হইবে; শিল্পক্ষেত্রেই তুরীয়ের একটী পরম মৌলিকতাময় সাধক, মহাসত্ত্ব 'ব্যক্তি' হইয়া দাঁড়াইবে। সে কবিতা তুরীয়েরই একটী প্রণবগীতি ও লীলাগাথা এবং স্তুতিগাথা রূপে সচেতন চিত্তকে উর্দ্ধলোকের পথে সত্যগতিক ও ঊর্দ্ধপথিক 'জাগরণ' দান করিয়াই জীবের পরম মিত্রপদবী ও গুরুপদবী লাভ করিবে। তখন, উহার দৃষ্টান্তেই রাস্কিনের কথাটি সমর্থনা লাভ করিবে—All Art is Praise; ফিক্‌টের কথাটাও ব্যাখ্যাত হইবে,—Poetry is expression of a religious Idea.

সাহিত্যদর্শনের দিক হইতে কোন ধর্ম্ম-দেশনা বা প্ররোচনা সঙ্গত হইলে, উহা সাহিত্য-সেবককে বলিতে পারে, "কবি, নিসর্গে উপনীত হও। হৃদয়ে নিসর্গহৃদয়ের পরিচয় এবংনিসর্গগুরুর দীক্ষা ও উপনয়ন লাভ কর! নিসর্গাত্মার প্রয়াণপদ্ধতির অধিকারী হও! তখন বুঝিবে—জীব ও নিসর্গের একত্ব! তুরীয় চত্বের সঙ্গেও উভয়ের অনন্যত্ব! জগতের অন্তরীয় এবং তুরীয় একই তত্ত্ব। বুঝিবে, আত্মকেন্দ্রী ও আত্মার বিভূতি (Self-becoming) ময় এই বিশ্বসংসার। ইহা তুরীয়েরই আত্মপ্রকাশ। এই জগৎ জীব ও নিসর্গ—তিনকে লইয়াই সাহিত্যের সৌরজগৎ। ভাবের পথে সচেতন জীব মাত্রেই, নিসর্গসাধক কবিমাত্রেই দেখিবে ও বুঝিবে যে, তাহার গুপ্ত 'আত্মা'ই বিশ্ব জগৎরূপ বিভূতি বিস্তার করিয়া 'আত্মলীলা'তেই বিলাসী হইতেছে! অনন্য! তুরীয় বস্তুতঃ তাহার আত্মতত্ত্ব হইতে অনন্য। এই তত্ত্বজ্ঞানটী 'উপলব্ধি' করাই হয়ত পঞ্চদশীর সেই চূড়ান্তের কিস্তটীর উদ্দেশ্য। উহাই হয়ত চূড়ান্তের সেই 'মুক্তি'র বা জীবের Freedom লাভের বার্ত্তা—"মুক্তিস্তু ব্রহ্মতত্ত্বস্য জ্ঞানাদেব ন চান্যথা"। নিজের এই অজ্ঞাত ও অপ্রাপ্ত আত্মার প্রাপ্তিইত সর্ব্বচূড়ান্তের লক্ষ্য! নিসর্গে প্রয়াণপদ্ধতির অধিকারী হও! চরম 'প্রাপ্তি'র দিকে নিসর্গের সহানুভূতি, উহার অন্তর্বিবেক এবং অন্তর্গতিই একটী পরম পন্থা! এরূপে, সচেতন কবিমাত্রেই সহজে তাঁহার সাহিত্য-সাধনাকে 'পরমার্থ সাধনা'র সহিত অভিন্ন করিতে পারেন। এস্থলেই নিসর্গ-কবির হৃদয় হইতে জীবজগতের দিকে পরম 'আনন্দ-সমাচার'! এ 'দীক্ষা' লাভ করিলেই যেন বিদ্যুৎ-বিভাসে অন্তরনুভূতি লাভ করিতে পারি—"অপৌরুষেয় আগম"-বাদীর সেই 'বার্ত্তা' গুলির অর্থ কি! "ওঁতৎসৎ" "সচ্চিদানন্দম্" "অদ্বৈতং ব্রহ্ম" "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" বা "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" প্রভৃতির 'তত্ত্ব' জীবহৃদয়ের কত নিকটে! অপরিচয়, অজ্ঞানতা (১) বা অনাত্মতার যেন একটি সামান্য পর্দ্দামাত্রের ব্যবধান! আগুণ জ্বলিতেছে। প্রতিমুহূর্ত্তেই ইন্দ্রিয়পর্দ্দার আড়াল উত্তীর্ণ হইয়া, উহার দীপ্তি ঝলকে,

(১) উহাকে দর্শন শাস্ত্রে 'অবিদ্যা' নাম দেওয়া হইয়াছে।

ঝিলিকে, উচ্ছাসে-উল্লাসে আসিয়া পড়িতেছে! অকস্মাৎ বুঝিতে পারি, আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় গুলা ত 'প্রকাশক' নহে, সেই নিত্যসত্যের—"এক মেবাদ্বিতীয়ং" সত্যের আবরক! নাম-রূপের সামান্য মাত্র পর্দা; অথচ, উহা সবাইতেই অজ্ঞানা এবং অপ্রেমিকের পক্ষে হয় ত কোটি-কোটি বৎসরব্যাপী 'জন্ম-মৃত্যু'যাত্রার সুদীর্ঘ পথ—সৃষ্টির ঋত-অনুসারী গতি ও অভিব্যক্তি-যাত্রার পাড়ী! অন্ধের এবং অপ্রেমিকের পক্ষে দূর-দূরান্তরের, যুগ-যুগান্তরের ব্যবধান! অপ্রেমই ত অন্ধতা! অপ্রেম ত আত্মদ্রোহ এবং বিশ্ববিদ্রোহ! প্রেম-দৃষ্টি (যাহার অন্য নাম বিজ্ঞান-দৃষ্টি) খুলিয়া গেলেই আর প্রতিবন্ধক নাই; কোন অন্তরায় নাই—স্বর্গে মর্ত্ত্যে, অন্তরে বাহিরে, অখিল রসসুন্দরই লীলায়িত হইতেছেন! উহাই মুক্ত দৃষ্টি—ইহাই ত আত্মার 'মুক্তি'!

সাহিত্যদেশে, জীব ও নিসর্গ ব্যতীত, সৌন্দর্য্যের অপর তত্ত্বটীর নাম 'তৃতীয়' বা 'তুরীয়'। সংস্কৃত ভাষায় এ দুইটি শব্দের মধ্যে জীবের অন্তর্দৃষ্টির এবং তত্ত্ববুদ্ধির ও সংখ্যাবুদ্ধির ক্রমিক বিকাশের একটা ইতিবৃত্তই সুপ্ত আছে। জীব নিজের বিপরীত দিকে, প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে, যেমন জগৎ রূপ একটা দ্বিতীয় পদার্থ দেখিতেছে; তেমন, অপর একটী পদার্থের অস্তিত্বও অনুভব বা অনুমান করিতেছে। দ্বিতীয়ের উত্তরণ করিয়া, উহাকে অতিক্রম করিয়া অপর একটি তত্ত্ব! সংখ্যার ক্ষেত্রে দ্বিতীয়ের উত্তরে, উহার অতিক্রামক (Transcendental) ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়াই প্রকৃত প্রস্তাবে 'তৃতীয়' নামকরণ! তৃতীয়ের ভাবার্থই Transcendental. অন্যদিকে, জীব নিজের মধ্যেই তিনটি অবস্থা দেখিতেছে—জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। উহাদের অতীত যে একটি অবস্থা আছে, উহাও তাহার প্রতীতি বা অনুমানসিদ্ধ—যাহাতে তাহার 'জীবন' থাকে, অথচ অনুভূতি থাকে না! এদেশের 'আদি বিদ্বান'গণ উহার নামকরণ করিয়াছিলেন—তুরীয়! উপনিষদে প্রমাণ আছে যে, সুষুপ্তি অবস্থাকে 'ভাঙ্গিয়া' উহার মধ্যেই এক চতুর্থ অবস্থার নামকরণ করিয়াছে 'তুরীয়'। উভয় শব্দই

৪৮। সংস্কৃত ভাষার 'তৃতীয়' ও 'তুরীয়' পদ।

উহার শেষার্দ্ধকেই 'তুরীয়' নাম দেওয়া হয়। ফলতঃ 'তৃতীয়' ও 'তুরীয়' একপ্রকৃতি নিষ্পন্ন এবং তন্মধ্যে জীবের সংখ্যাবুদ্ধি ও অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিবিকাশের আদিম চেষ্টাচরিত্রের একটা স্মৃতি লুক্কায়িত আছে বলিয়াই আমরা মনে করি (১)। মানবচিত্তের স্মরণাতীত ও যুগগর্ভ লুপ্ত একটা দর্শনচেষ্টার ইতিহাস।

তুরীয় তত্ত্বের দার্শনিক বিচারে আমাদের আমল নাই। তবে সাহিত্য-ক্ষেত্রে উহার শক্তিমত্তা ও ব্যাপকতা চিন্তা না করিলে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয়টীরই গুরুত্ব বুঝিতে পারিব না। বলিতে হইবে না যে, উহাকেই মানুষ লৌকিকধর্ম্মে জেহোবা, জোভ, God, Father in Heaven, আল্লা বা ঈশ্বররূপে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে; উহাকে জগতের এবং জীবনের চূড়ান্ত তত্ত্ব ধরিয়াই মানুষ জীবনের যাবতীয় ধর্ম্মকর্ম্ম উপাসনা বা সাধনাকে উক্ত ধারণার ছায়াতেই নিরূপণ করিয়া আসিয়াছে। দেশে এবং কালে মানুষে মানুষে প্রধান পার্থক্যটাও উক্ত 'ধারণা'র সূক্ষ্মপ্রকৃতি ও 'ধর্ম্ম' মূলেই যে দাঁড়াইতেছে—তাহাও মনুষ্যত্ব বিষয়ে প্রধান বার্ত্তা। মানুষের সর্ব্বচেষ্টার উহাপেক্ষা বড় লক্ষ্য, 'প্রয়োজন' বা 'নিমিত্ত' আর নাই। উহা মানবজীবনের সকল ইচ্ছা-জ্ঞান-ভাবের চূড়ান্ত লক্ষ্য। মানুষ স্বীকার করুক বা নাই করুক—এবং উহাও নিত্যকাল নরদৃষ্টিতে 'অগম্য' বা 'অদৃশ্য' যাহাই থাকুক—ওই 'অদৃশ্য' পদার্থের দ্বারা তাহার জীবনের সকল 'দৃশ্য'তত্ত্ব পরিচালিত—'তৃতীয়' বিষয়ে জীবের ('সংস্কার') টুকুর দ্বারাই অপর সমস্ত নিয়ন্ত্রিত। মানুষ অপর দুই পদার্থকে—জীব বা নিসর্গকে—'তৃতীয়ে'র সংস্কার-ছায়ায় আনিয়াই দৃষ্টি করিতেছে। সে সংস্কার যতই 'অকেজো' বা অস্পষ্ট হউক, উহার ছায়াতেই মানুষের সকল 'স্পষ্ট'তত্ত্ব এবং 'কাজের তত্ত্ব'

৪৯। জীব নিসর্গের আত্মযোগী সাহিত্যিকের পক্ষে তৃতীয়ই "একমেবা দ্বিতীয়ং" পদার্থ।

(১) বৈয়াকরণগণ 'প্রকৃতি প্রত্যয়' স্থির করিতে না পারিয়া 'নিপাতন' তত্ত্বের আশ্রয় লইয়াছেন। "তুরীয়"কে 'চত্বার' হইতে নিপাতন-সিদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন:

নিয়ন্ত্রিত। তুরীয় বিষয়ে ব্যক্তিগত বা জাতিগত 'ধারণা' টুকুর উপরেই মনুষ্যের সাহিত্য-সমাজ-পরিবার ও রাষ্ট্র জীবনের এবং তাহার ইহ-পরজীবনের যাবতীয় চেতনা, পরিচালনা এবং গতির ব্যাপার সূক্ষ্মভাবে নির্ভর করিতেছে। জীবনতন্ত্রে উক্ত সূক্ষ্মেরই পরমা শক্তি! জাতি কিংবা ব্যক্তির দর্শন-ইতিহাস-বিজ্ঞানের রীতি এবং ধাতু পদার্থ, ওই অস্পষ্ট এবং অপদার্থের সূক্ষ্ম চাবীটুকুর দ্বারাই পরিচালিত না হইয়া পারিতেছে না। অতএব সে বিষয়ে 'চোখ বুজিয়া' ফল নাই; উহাকে যেমন জীবনের সকল বিবেচনার সময়, তেমন সাহিত্যচিন্তার সময়েও 'ধরিতে' হইবে; না ধরিলে, মানুষের পক্ষে কেবল যে আত্মবঞ্চনা হইবে তাহা নহে, আত্মহত্যাই হইবে।

মনুষ্যজাতির সচেতন ব্যক্তিমাত্রের সমক্ষে 'তৃতীয়' নিত্য উপস্থিত তত্ত্ব। এই 'বিশ্বসৃষ্টি' নামক জ্ঞানব্যাপার বা অনুভূতি ব্যাপারের যাবতীয় 'অর্থ' ও জীবনের যাবতীয় 'স্বার্থ' এবং জীবন-পরিচালনার যাবতীয় আদর্শ উহার ছায়াতেই নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং উহা অপেক্ষা বড়তত্ত্ব যেমন নরের জীবনে নাই, তেমন তাহার সাহিত্যেও নাই। ফলতঃ, উভয়ক্ষেত্রে উহাকে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' পদার্থ বলিয়াই নির্দ্দেশ না করিলে প্রকৃত কথা বলা হয় না। উহাকে বাদ দিলে, জীব এবং নিসর্গ বিষয়ে সাহিত্য-ক্ষেত্রের যাবতীয় ধারণাই 'কাণা', বলিতে পারি। যখন তৃতীয়ই গুপ্ত বা প্রকাশ্যভাবে থাকিয়া জীবনিসর্গ বিষয়ক যাবতীয় রস-ভাব এবং তত্ত্বের সৃষ্টিস্থিতি বিলয় সংঘটন করিতেছে, তখন সাহিত্যে উহাকে বিস্মৃত হওয়ার অর্থই আত্মান্ধ হওয়া, যাহার অর্থ বিশ্বান্ধ হওয়া—রসান্ধ হওয়া। অথচ, এ'দিকে প্রকৃত ব্যাপার কি? 'তৃতীয়' তত্ত্ব আধুনিক সভ্যজগতের সাহিত্য লোক হইতে নির্বাসিত বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। মানুষ উহাকে জোভ, খোদা, ঈশ্বর ইত্যাদি নাম দিয়া, সাংপ্রদায়িক Religion বা 'ধর্ম্ম' নামক একটী মনগড়া কোটায় তালাবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিয়াছে; অথচ অতর্কিতে বা 'চোক বুজিয়া' ওই 'চাপা দেওয়া' পদার্থটীর দ্বারাই সর্ব্ববিষয়ে শাসিত হইতেছে! ইদানীন্তন মনুষ্যের অধিকাংশ 'ধর্ম্ম' প্রাচীনকালে, তাহার

সতর্ক দর্শন, 'বিচার' ও 'গ্রহণ' ভূমি হইতে বহুদূরে, সংকীর্ণ 'গতানুগতিক' ভাব ও গড্ডালিকার ভাবেই প্রভূত হইয়াছিল; প্রাচীনকালের প্রবল জ্ঞাতি-গোষ্ঠী-বংশের ও গ্রাম্য সমাজের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই সম্ভূত হইয়াছিল। ইদানীং 'আধুনিক সভ্যতা' নামক পদার্থ হইতে, বাহ্যিক সুখ সুবিধার উন্নতি এবং ব্যবসায়বানিজ্যের বিস্তৃতি হইতেই মানুষের সম্বন্ধ-সম্মিলনের ও ভাবের আদান-প্রদানের প্রসার ঘটিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের সামাজিক জীবন ও মনোজীবন বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। আধুনিকের 'কর্ষণা' বলিতে যাহা বুঝায়, প্রাচীন 'ধর্ম্ম'গুলি কোনমতেই উহার সহিত 'তাল রাখিতে' পারিতেছে না। 'ভক্তি'বাদী, 'আপ্ত'বাদী বা বিশ্বাসনিষ্ঠ ধর্ম্মের ভিত্তিটাই যেন আধুনিক মনুষ্যের সংশয়-বিচার-বিতর্কের ঘাতসহ নহে। অতএব, ধর্ম্মক্ষেত্রে চিন্তাশীল মাত্রের মধ্যেই যেন একটা 'সামাল সামাল' রোল পড়িয়া গিয়াছে; সকলেই প্রাচীনকে ঘাঁটিয়া, আপনাদের ধর্ম্মের নিত্যতত্ত্ব আবিষ্কার করিতে ও উহাকে যুগধর্ম্ম সংগ্রহে এবং যুগোপযোগী সম্বন্ধে স্থাপন করিতে লাগিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মক্ষেত্রে এই অবস্থা। সাহিত্য সার্ব্বজনীন ভাবুকতার রাজ্য বলিয়া, বিচার-বিতর্ক-যুক্তির এবং অনুভূতির রাজ্য বলিয়াই, ধর্ম্ম-আলোচনা সুতরাং উহার অধিকার হইতে সহজেই দূরে সরিতে চাইতেছে; তর্কযুক্তির স্পর্শ হইতেই সসঙ্কোচে দূরে সরিতেছে। এ রূপে সুসভ্য জাতিসমূহ তাহাদের 'ধর্ম্ম'কে সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে ঢাকা দিয়াছে, সত্য; কিন্তু, কার্য্যকালে অতর্কিত ধর্ম্ম বিশ্বাসের নিদারুণ 'দাস্যতা'ই তাহাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। যেমন, 'খ্রীষ্টধর্ম্ম' বলিতে অন্ততঃ, দ্বাদশটি (fact) বৃত্তান্তের বা তথ্যের উপরে একেবারে নির্ব্বিচার বিশ্বাসই বুঝায়। খ্রীষ্টান জাতির আধুনিক সাহিত্যে সুতরাং তাহার ঈশ্বরপুত্র, ঈশ্বর, সৃষ্টি, পতন, নরক, 'উদ্ধার' প্রভৃতির দৃষ্টতঃ কোন আলোচনা আমল নাই; ঐ সকলের নাম করাই যেন সভ্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা 'অসভ্যতা'! তথাপি, 'ঈশ্বরপুত্র' হইতে আরম্ভ করিয়া মুক্তি পর্য্যন্ত কয়েকটি সত্য ও তথ্য-বিশ্বাসের অতর্কিত আবহাওয়াতেই সমগ্র খ্রীষ্টান জাতির সাহিত্য ন্যূনাধিক 'ধর্ম্মিত' বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বিচার পূর্ব্বক গ্রহণ বা বর্জ্জন নাই ; অথচ, বৃত্তান্তনির্ভর কতকগুলি শক্তি-শালী 'সংস্কার' দ্বারা ইয়োরোপীয় মনুষ্যের অন্তর্মন এবং জীবনটাই শাসিত !

এ সঙ্কোচ কেন, এস্থলে তাহা চিন্তা করিতে চাইনা। তবে, ভারতের মানস ক্ষেত্রে উক্তরূপ সঙ্কোচ কিংবা অসহন ভাবের কিছুমাত্র পসার নাই। 'শ্রুতির যুগ' হইতেই এ'দেশের ধর্ম্মচিন্তকগণ, 'আগম' বাদী বা 'আপ্ত'বাদীগণ পর্য্যন্ত, নিরপেক্ষ তর্কযুক্তি-বিচারের আশ্রয় করিয়াই সত্য দর্শন করিতে চাহিতেছেন ; 'আপ্ত'কেও যুক্তিপথে সমর্থন করিতেছেন। ভারতের 'ধর্ম্ম' শব্দও মহাব্যাপক পদার্থ ; উহার জাগতিক অর্থ Law ; উহা 'ঋত' বা 'সত্য' হইতে অভিন্ন ; মনুষ্যত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া দেবত্ব বা ঈশ্বরত্ব পর্য্যন্ত উহার ব্যাপ্তি। ভারতের 'ঈশ্বরত্ব' প্রভৃতিও যুগপৎ জগৎ-গত এবং জগদতীত 'অবস্থা'। এ দেশের 'ঈশ্বর' একদিকে লৌকিক ধর্ম্মের 'উপাস্য' ; অন্যদিকে, মানব জগতের একটী জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ ও বরিষ্ঠ দর্শনশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য 'বস্তু'। বৈদিক দর্শনের 'অদ্বৈতবাদ' ও 'জিজ্ঞাসা'ধর্ম্ম হইতেই এ উদারতা ও মহাত্মতা সম্ভবপর হইয়াছে ; ধর্ম্মের, সাহিত্যের এবং দর্শনের আমল এতদ্দেশে সমব্যাপক হইতে এবং অভিন্ন হইতে পারিতেছে। সুতরাং, আবশ্যক স্থলে, সাহিত্য-আলোচনায় তুরীয়ের কথা পাড়িতে আমাদের কিছুমাত্র ভয় বা সঙ্কোচ নাই। পরন্তু, সাহিত্যের 'রস'ধাতুর 'সচ্চিদানন্দ' আদর্শ হইতেই ত বোঝা যায়, উহা চূড়ান্তে 'তুরীয়' তত্ত্বকেই অভিন্ন ভাবে উদ্দেশ্য করিতেছে। আমাদের 'তৎ'বাদ সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক তত্ত্ব বলিয়াই সাহিত্যক্ষেত্রে উহার স্থান ; সর্ব্বমানবের অনুভবেই উহার 'প্রমাণ'।

অতএব, সাহিত্যক্ষেত্রে সৌন্দর্য্যের অপর মহাবস্তু 'তুরীয়'। উহার 'ধারণা'র উপরে সাহিত্যিকের জীব ও নিসর্গ আদর্শ, মানবত্ব ধারণা

৫০। ভারতীয়সাহিত্যে তুরীয় এবং সৃষ্টিব্যাপার—মহাভারত-রচয়িতার সাক্ষ্য।

জগৎজ্ঞান এবং সৃষ্টিবিজ্ঞান (Cosmology) পর্য্যন্ত নির্ভর করে বলিয়াই উহা সাহিত্যচিন্তার স্থলে অপরিহার্য্য। তুরীয় বিষয়ে নিজের ধারণার স্বল্পমাত্র পার্থক্য হইতে সাহিত্যে কবির আলম্বনে, উদ্দীপনে এবং

রসপরিব্যক্তির মধ্যেও অশেষ পার্থক্য উদ্ভূত হইতে পারে—কবির অবিতর্কিতেই উদ্ভূত হইতে পারে। ফলতঃ, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিমাত্রেই সাহিত্যের সকল প্রকাশ এবং গুণাভিব্যক্তির মূলে, ব্যক্তিগত কবি-প্রতিভার বিকাশ কিংবা জাতিগত 'ধর্ম্ম'তার মূলেও, মানুষের এই 'তুরীয়'-ধারণার পার্থক্যজনিত গুপ্ত 'ফল'টুকুই দেখিবেন। সুতরাং, এস্থানে দেখিতে হয়, ভারতীয় সাহিত্যের ও ভারতের জাতীয় প্রজ্ঞার 'তুরীয়' আদর্শ কি? বেদান্তশিষ্য এবং ঋষিশিষ্যের সাহিত্য-আদর্শের মধ্যে, সাহিত্যের বিষয়ীভূত ব্যাপারের মধ্যেও, 'অদ্বৈত বুদ্ধি' ও 'অদ্বৈত লক্ষ্য' বলিয়া কিছু আছে কি?

বলিব, এ বিষয়ে মহাভারতের 'ব্যাস-ভূমিকা'র মধ্যে একটা পরম অদ্ভুত বার্ত্তাই পাইয়াছি, যাহার মর্ম্ম এবং সামর্থ্য না বুঝিতে পারিলে ভারতীয় সাহিত্যের বিষয়ে হয়ত সর্ব্ব প্রধান তত্ত্বটাই অনধিগত থাকিবে। 'মহাভারত' রূপ স্বীয়কৃতি এবং কাব্যকৃতি বিষয়ে ব্যাসকবির নিজের ধারণা কি ছিল, তাহাও উক্ত 'ভূমিকা' হইতে ধরিতে পারা যায়। বিশ্বসৃষ্টির পুরাণ কবি (এবং জীবের সাহিত্যসরস্বতীর অধিনায়ক) ব্রহ্মাকে ব্যাস বলিতেছেন—

"আমি এরূপ এক পরমপবিত্র কাব্য রচনা করিতে সংকল্প করিয়াছি, যাহাতে ঋক্ যজু সাম অথর্ব্ব বেদের নিগূঢ় তত্ত্ব, বেদাঙ্গ ও উপনিষদের ব্যাখ্যা, ইতিহাস ও পুরাণের প্রকাশ, বর্ত্তমান ভূত-ভবিষ্যৎ কাল-ত্রয়ের নিরূপণ, জরামৃত্যুভয় ব্যাধি ভাব এবং অভাবের নির্ণয়, বিবিধ ধর্ম্মের ও বিবিধ আশ্রমের লক্ষণ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বর্ণ চতুষ্টয়ের নানা পুরাণোক্ত আচার বিধি, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য, পৃথিবী চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র তারাবিজ্ঞান ও যুগ চতুষ্টয়ের প্রমাণ, আত্মতত্ত্ব নিরূপণ, ন্যায়, ধর্ম্ম, শিক্ষা, চিকিৎসা, দানধর্ম্ম ও পাশুপত ধর্ম্মের বিবরণ, দিব্য বা মানবাদি যোনিতে জীবের জন্মান্তর ও সংসারের তত্ত্ব, পবিত্র তীর্থাদি ও জনপদ নদ নদীর সমুদ্রের বিবরণ, দিব্যপুরী ও দুর্গাদি রচনা, সেনা ব্যূহাদি রচনা ও বাধ করিতে যুদ্ধ কৌশল, সাহিত্য কৌশল প্রভৃতি নানাবিধ লোকযাত্রা ব্যাপার কথা—

হইবে; অথচ যিনি সর্ব্বগত তত্ত্ববস্তু রূপে অখিল সৃষ্টিসংসার ব্যাপিয়া আছেন সেই পরম ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইবেন।—(১) "যত্তু সর্ব্বগতং বস্তু তচ্চৈব প্রতিপাদিতম্"।

বলিতে পারি, এরূপ কথা সাহিত্যসংসারে অন্যত্র কুত্রাপি মিলিবে না; ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য কোন দেশে মিলিবে না; এবং অদ্বৈতবাদী কবি ব্যতিরিক্ত অন্য কোন ব্যক্তির মুখেও আসিবে না। এই "যত্তু সর্ব্বগতং বস্তু তচ্চৈব প্রতিপাদিতম্"—কথাটির মর্ম্মে কত বড় একটা তত্ত্বের, বিশ্বাসের ও সিদ্ধান্তের বার্ত্তা! বাস্তবিক, কোন দ্বৈতবাদী ধর্ম্মের (Theist বা Deist ধর্ম্মের) পক্ষে, হীব্রু কিংবা হীব্রুশিষ্য খ্রীষ্টানাদি ধর্ম্মশাসিত মনুষ্যের সমক্ষে, ইহা একটা অদ্ভুত কথা নহে কি? নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় এবং হাস্যকর কথা! সংসারজীবনের দিকে এবং কবিচর্য্যার দিকেও এ কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিস্থান! তুমি যাহাই লিখিবে, মনে রাখিবে যে, সকল কর্ম্মে সর্ব্বগত তুরীয় বস্তুকেই 'পরিচিন্তা' করিতেছ!

সংসারের এই অনন্ত বহুত্বের হলহলার মধ্যে, এই পাপপুণ্যের যুদ্ধ এবং রোগ-শোক-দুঃখ-পাপ-তাপ-জঘন্যতার কুরুক্ষেত্র মধ্যে এবং ঐ সমস্ত অবলম্বন পূর্ব্বক তুমি যাহা-কিছু কল্পনা-জল্পনা বা রচনা কর না কেন, নিত্য-নিবৃত চিত্তে স্থিরলক্ষ্য রাখিবে যে, তুমি সেই সর্ব্বগত পরম তত্ত্বের চর্চ্চায় এবং সেবাতেই কলম চালাইতেছ! ও'খানেই তোমার লেখনীর কুম্পাস এবং কুম্পাসের উত্তর দিক্—উত্তম দিক!

যা'হোক, খ্রীষ্টজন্মের অন্ততঃ দু'টী হাজার বৎসর পূর্ব্বগামী এবং ভারতের সাহিত্যগুরু ব্যাসকবির এ কথাগুলি—তাঁহার কবিজীবনের ও কবিকর্ম্মের অন্তস্তত্ত্ব বিষয়ে এই খবরটি এবং উক্তরূপ আদর্শ হইতে ফলিত, সম্ভূত এবং সম্ভবপর সিদ্ধান্ত গুলি—আধুনিক কবি বা সাহিত্য সেবককে একটিবার চিন্তা করিয়াই, পরে 'অগ্রাহ্য' করিতে অনুরোধ করিব। ফলতঃ, কবিগুরুর কথাগুলি যেন সাহিত্যের উৎপত্তিস্থলে উহার গোমুখীতেই একটা [ভাল-বা-মন্দ] মহাপ্রকৃতির ধারণা

মহাভারত-গ্র(১) কালী প্রসন্ন সিংহের অনুবাদ অনুসরণেই বিন্যস্ত হইয়াছে।

রসায়ন বিধান, এবং সমগ্র সারস্বত গঙ্গার আন্তন্ত-মধ্য প্রবাহকে উক্ত মহাপ্রকৃতির রসায়ণ ধর্ম্মেই ধর্ম্মিত, ভাবিত এবং জারিত করা'। ভারতীয় সাহিত্যের সত্য এবং সৌন্দর্য্যের মূল ধাতু যে এবম্প্রকারেই অদ্বৈতবাদের দ্বারা জারিত হইয়া গিয়াছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে কালিদাসের দৃষ্টান্তে দেখিয়া আসিয়াছি। উহার 'শিব'আদর্শ মধ্যেও অদ্বৈতবাদের এবং তুরীয় বিজ্ঞানের ঐকান্তিক প্রভাবই পরিদর্শন করিতে পারিব।

এখন, এ দেশের ওই 'সর্ব্বগত বস্তু', 'একতত্ত্ব' বা 'তুরীয়' কি?

সকলের আদিবন্ধে বলিতে হয়, বৈদিক ঋষি ভাষাপথে উহাকে নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, উহা 'তৎ'। সৃষ্টির অধিবাসী জীব, সংস্কারের (Emperical জ্ঞানের) দাস জীব 'মানবী করণের' বাধ্য হইয়া, (Anthropomorphism এর বাধ্য হইয়া), নিজের মনোধর্ম্মে উহাকে পাছে "স্ত্রী বা পুরুষ" ব্যক্তি বলিয়া ধরিয়া লয়, পাছে 'অনন্ত'কে নিজের বামনহস্তের 'গুজকাঠি'র প্রমাণে মাপিয়া, 'ছাপ মাড়িয়া' লয়, এ'জন্য সূক্ষ্মদর্শী ঋষি উহাকে বলিয়াছেন 'তৎ'। সুতরাং, এস্থানে দাঁড়াইয়া হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বকার ঋষির Soul টুকু বুঝিয়া লইতে পারি! যে জীব সে কালেই উহাকে 'তৎ' ব্যতীত অপর শব্দে নির্দ্দেশ করিতে চায় নাই, তাহার বিচার বুদ্ধির প্রমাণ কত? ঋষি উহাকে কেবল বলিতে চাহিয়াছেন "ওঁ তৎ সৎ" (১)—অতএব ঋষিতন্ত্র কেবল 'তৎবাদ' বা 'তত্ত্ববাদ'। বলিয়া যাইতে পারি, এসিয়ার

৫১। তৃতীয় বিষয়ে 'আগম' জ্ঞান বাদিগণের শ্রুতির বা শ্রৌতদর্শনের সিদ্ধান্ত।

(১) বলিয়া রাখিতে পারি, 'দার্শনিক' উপাধিধারী কোন কোন ব্যক্তি ('ব্যক্তিগত ঈশ্বর' উপাসক বা সম্প্রদায়িক 'ভক্তি'বাদী ব্যক্তি) এস্থানেও 'দোষ' ধরেন। শ্রুতির 'তুরীয়' একটা Impersonal God উল্লেখে কটাক্ষ করিয়া জিজ্ঞাসুর পথ রোধ করিতে চেষ্টা করেন। কেহ কেহ বলিয়া ফেলিয়াছেন "দেখ' দেখ', উহাদের কি খারাপ কথা— কেবল তৎ! একটা Impersonal God!"

চীন অতি প্রাচীন কালে, কংফুসেরও বহুপূর্ব্বে, 'তৎ'বাদের শিষ্যতা পথেই, তাহার Taoism দর্শন করিয়াছিল।

তারপর, সৃষ্টি। 'সৃষ্টি' বলিয়া পদার্থ টী ত আমাদের 'অনুভব সিদ্ধ' রূপেই দাঁড়াইয়াছে! উহা সেই 'এক', 'তৎ' বা 'সৎ' হইতে কি করিয়া হইল—উহা নিজের বিচারযুক্তিতে যথাসাধ্য বুঝিতে না পারিলেও জীবের সোয়াস্তি নাই।

এদিকে শ্রুতির মর্ম্ম এক কথায় বলিতে গেলে—এই বিশ্বসৃষ্টি, এই জড়জীবাত্মক, 'চিৎ এবং 'অচিৎ'-আত্মক সংসার একটা 'কৃতি' নহে 'ভূতি'। উহাকে তুরীয়ের 'কৃতি' বলিলে ঠিক দর্শনসঙ্গত কথা বলা হয়না; উহা ভূতি—বা বিভূতি এবং সৃষ্টির প্রকৃত নাম 'ভব'! এস্থলে আমরা আর্য্য ভারতের এবং "অপৌরুষেয়" আগম বাদিগণের চূড়ান্ত কথা এবং জগৎ ও তুরীয়ের সম্বন্ধ তত্ত্ব বিষয়ে চরম বার্ত্তাটিই সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি। বিশ্বসৃষ্টিকে তুরীয়ের একটা doing ব্যাপার বলিলে প্রকৃত কথা চাপা' পড়িতে পারে। কারণ, 'ক্রিয়া' বলিতে মনুষ্যবুদ্ধিতে কর্ত্তার বহির্দ্দেশিক একটা ব্যাপারই বুঝায়। বাস্তব পক্ষে, চরমতত্ত্বের সম্পর্কে মনুষ্য-ভাষার করণাত্মক ধাতু মাত্রেরই অর্থ—বা প্রকৃত মর্ম্ম—'ভূ'! 'সৃষ্টি' সেই 'এক' বা সৎ' বা 'তৎ' পদার্থের doing ব্যাপার নহে—becoming; সেই এক Being এরই Becoming; সৃষ্টি সেই 'সৎ' পদার্থের 'ভব'কর্ম্ম। সে সৎ পদার্থ 'এক' আছেন, অথচ, অনন্ত 'বহু'র রূপেই আভাসিত হইতেছেন—ইহার নামই 'সৃষ্টি'। যাহা 'একমেবা দ্বিতীয়ং' তত্ত্ব, তাহার আপনা হইতে ব্যতীত ও আপনার মধ্যে ব্যতীত, আত্মতত্ত্বের কর্ত্তৃ-কর্ম্ম করণ-সম্বন্ধ-অপাদান বা অধিকরণ ব্যতীত সৃষ্টি কিরূপে সম্ভূত হইতে পারে? তিনিই এ সৃষ্টির নিদান ও উপাদান—এ সত্যটী ব্যতীত অপর কোন্ সত্যনির্দ্দেশ সম্ভবপর হইতে পারে? অতএব আমাদের দৃষ্টিবন্ধনের জন্য পুনরুক্তি করিয়াও বলিব, এস্থলেই বৈদিক ঋষির চরম বার্ত্তা এবং ঋষিতন্ত্রীয় দর্শনেরও চূড়ান্ততত্ত্ব—'অদ্বৈতবাদ'। জীব আপন বিচার শক্তির সামান্য মাত্র সদ্ব্যবহার করিলে, অদ্বৈততত্ত্বই পরম 'সত্য' রূপে

আপনাকে সঙ্কেতিত করিতে থাকে। জীবমাত্রেই বলিতে বাধ্য হইবে, অন্ততঃ এ টুকু ধারণা করিতে পারিবে যে সৃষ্টি কোন্ ধারায় ঘটিল যদিও সে জানে না, কিন্তু 'অদ্বৈত'তত্ত্বই 'সত্য'। বিশ্বের সমস্ত ব্রহ্ম হইতে আগত এবং ব্রহ্মময়—'সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি"। জীবের বিচার দৃষ্টি এবং 'কার্য্যকারণ'চিন্তার বুদ্ধি এ সত্যে উপনীত না হইয়া পারে না। ফলতঃ, অতি প্রাচীনকালে, বোধ করি মনুষ্যজাতির বুদ্ধি-উদ্গমব্যাপারের সঙ্গেসঙ্গেই এ সত্য মনুষ্যদৃষ্টিতে আভাসিত হইয়াছিল। এ সত্য, অন্ততঃ এ সত্যের সহজ বোধিগত আভাস, যেমন স্মরণাতীত কালেই ভারতীয় ঋষিগণের মধ্যে, তেমন মিসরীয়, চাল্‌ডীয় ও বাবিলোনীয় জ্ঞানিগণের দৃষ্টিতেও প্রকট হওয়ার প্রমাণ ইতিহাস উদ্ধার করিয়াছে। এ সূত্রেই মনে রাখিতে হয়, আমাদের শ্রুতি বলিতেছেন, ব্রহ্মজ্ঞান জীবমাত্রেরই নিত্যসিদ্ধ পদার্থ। কেবল, 'অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানম্'। এ স্থলেই যেমন জীব জীবনের 'রহস্য', তেমন সৃষ্টিরও 'রহস্য'; এবং এ জগতের প্রতীয়মান বহুত্বমধ্যে ওই 'এক'বুদ্ধি, 'এক'ধারণা বা একানুভবের ভিতরেই মানুষের সাহিত্য কিংবা দর্শনের সকল Mysticism ব্যাপারের নিদান।

বলিতে পারি, উপরের (এবং নিঁম্নের) কয়টি কথাতেই বৈদিক দর্শন বা আর্ষ বিজ্ঞানের এবং বেদপন্থী ভারতীয় ধর্ম্মমাত্রের মূল 'দর্শন'তত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব সংক্ষিপ্ত আছে। ঋষিদর্শনে সৃষ্টি অনাদি ব্যাপার; কিন্তু, জীবের দৃষ্টিক্ষেত্র হইতে এই 'ভব'ব্যাপারকে 'ক্রিয়া' হিসাবে বোধায়ত্ত করিতে এবং বুঝাইতে গিয়াই ঋষি বলিয়াছেন—

"সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ—সো ঽমন্যত একোঽহং বহু স্যাম্ প্রজায়েম্। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত (১)। "ওঁ তৎসৎ"। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"।

(১) ছান্দোগ্য শ্রুতি।

(১) জিজ্ঞাসুগণ দেখিতে পারেন, ঋষিদর্শনের অনেক কথাই আধুনিক ইয়োরোপের অদ্বিতীয় মীষ্টিক্ সুইডেন্‌বার্গের Heaven and Hell প্রভৃতি গ্রন্থের প্রকাশিত তত্ত্ব-বার্ত্তায় সঙ্গে অপরূপ ভাবেই মিলিয়া যায়।

এই 'অমন্তত', 'বহুস্যাম্' এবং 'প্রজায়েয়ম্' কথাগুলির মধ্যেই সমগ্র বেদান্তদর্শন বীজভাবে আছে। সৃষ্টি 'তৎসৎ' পদার্থের একটা 'ভব'কর্ম্ম; এ'জন্য উহা একটা 'বিভূতি'। তিনিই এ সমস্ত হইয়াছেন। বিশ্বসংসার ব্রহ্মের একটা 'মনন' ব্যাপার—'তপঃ' ব্যাপার। 'মনন' ক্রিয়ার কর্ত্তাই সুতরাং সৃষ্টিরূপে আভাসিত হইতেছেন। এ'জন্য 'ভূতি' 'বিভূতি' প্রভৃতি শব্দ চিরকাল এ দেশের অভিধানে ঈশ্বরীয় ক্রিয়া বা 'ঐশ্বর্য্য' প্রভৃতির সহিত একার্থক হইয়া আছে। সৃষ্টি একটা তপঃশক্তির ব্যাপার। সুইডেন্ বার্গ বলিবেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও বলিতে পারেন, ঐ 'তপঃ' কথাটার মধ্যে উন্নততম বিজ্ঞানের বার্ত্তাই পরিদৃষ্ট বা বোধিগত ও সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। 'ব্যাপার' ভাবে বুঝাইতে গেলে, সৃষ্টি তুরীয়ের জ্ঞানমূলক ও তপোমূলক 'ব্যাপার'; 'তপঃ' হইতেই জাত এবং তপেই বিধৃত। 'তপঃ' হইতেই তাপ—Eeerjy কিংবা Force—শ্রুতিতে যাহার নাম 'রয়ি'। একথা হয়ত অনেকেই গলাধঃ করিতে পারিবেন না (এবং কাহাকেও চেষ্টা করিতে বলি না) যে, আধুনিক বিজ্ঞান (প্রাচীন 'পরমাণুবাদ' ধ্বংস পূর্ব্বক) যাহাকে সৃষ্টির মূলপ্রকৃতি বা একমাত্র Electro-magnetic Element of the universe নামে সঙ্কেত করিতেছেন, অগণ্যবৎসর পূর্ব্বগত, এতদ্দেশের বনচর, 'অবৈজ্ঞানিক' ঋষির 'দৃষ্টি'তে বা আগমে তাহাই আসিয়া গিয়াছে! যা'হোক শ্রুতির প্রাণ ও রয়ির জগৎ, সেই 'সৎ' পদার্থেরই 'কল্প'জগৎ; এজন্য প্রলয়ের নাম এ দেশের অভিধান-গ্রন্থে 'কল্পান্ত'। এ'জন্যই বেদান্ত বলিতেছেন, তুরীয়ের আত্মচ্ছন্দেই জগৎ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে বহমান। এজন্য একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য; জগৎ অনিত্য; যাহার দার্শনিক সংজ্ঞা 'মিথ্যা'। জগতের প্রকৃতি-তত্ত্ব—Impermanence—Appearance—That which Passeth away. তুরীয়ের আত্মচ্ছন্দে এজগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় বা Rhythmic Creation and Dissolution এর রহস্যবার্ত্তা—ইহাও বেদান্ত সম্মত। প্রচলিত বেদান্তদর্শনের "পটবচ্চ" সূত্রে ঋষি বলিতেছেন, এ বিশ্বসৃষ্টি ভাজ করা' বস্ত্রের ন্যায় তুরীয়ের কল্পবিন্দুতেই স্থিত ছিল; উহাই

'সৃষ্টি'রূপে ক্রম-প্রকটিত হইতেছে, ; এরূপেই সৃষ্টি-স্থিতি-লয় চলিতেছে। পঞ্চদশী উহার মর্ম্মই দিয়াছেন—

ফলপত্র লতাপুষ্প শাখাবিটপ মূলবান্
নমু বীজে যথা বৃক্ষ স্তথেদং ব্রহ্মণি স্থিতম্ ॥

ঋষির যে কোন একটী কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেই আর্য দর্শনের সকল কথা বুঝিতে পারা যায়। তুরীয়কে মনুষ্য ভাষায়, মনুষ্যের নেত্রে এবং একদেশ হইতে দৃষ্টিপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিতে গেলে জীব যাহা বলিতে পারে, স্বদেশ-বিদেশের (Monist বা Pantheist) দার্শনিক-গণের মধ্যে উহারই প্রমাণ পাই। অনেকসময় একদেশদর্শিতার প্রমাণ! নিজের জ্ঞান-ভাব-ইচ্ছার স্থান হইতে জীব বলিতে পারে, 'তৎ' পদার্থ 'ইচ্ছা'ময়—Absolute Will; তিনি "শান্তং শিবমদ্বৈতম্"। 'জ্ঞান'ক্রিয়া ধরিয়া বলিতে পারে, তিনি Absolute Thought (১) তিনি 'জ্ঞান'—তিনি সত্য—তিনি অনন্ত বা পূর্ণ। তিনি 'জ্ঞান'স্বরূপ—সেই 'জ্ঞান' পদার্থ হইতে অভিব্যক্ত হইয়া 'জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞানব্যাপার' মূলা এই বিশ্বসৃষ্টি। সৃষ্টি সেই 'সৎ' পদার্থেরই 'জ্ঞান'ময় কর্ম্ম—জ্ঞানেই জীবিত; জ্ঞানেই ধৃত। অথচ, তাঁহার মধ্যেই সকল জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের একতা। বিশ্বমধ্যে সে 'জ্ঞান' তত্ত্বই Universal Consciousness বা সর্ব্বজ্ঞ। তিনি সৃষ্টির প্রত্যেক অনু-পরমানুতে, প্রত্যেক ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে যুগপৎ আত্মানুভব করিতেছেন বলিয়াই তাঁহার নাম লোকে লোকে বিরাট্ হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর। "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাদ্" ইত্যাদি মন্ত্র আমাদের এই জীবলোকের সমষ্টি-অভিমানী দেবতা-পুরুষ বিরাটেরই বিশেষণ। আবার স্বরূপে তিনি 'তৎ'পুরুষ বা এক'পুরুষ' বলিয়া,

(১) শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন—

পরাস্যশক্তি র্বহুধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়াচ।

বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—

সর্ব্বশক্তি পরংব্রহ্ম নিত্যমাপূর্ণ মদ্বয়ম্ ॥

তাঁহার মধ্যে Absolute Identity of Subject and Object (২) এই 'জ্ঞান'পুরুষই 'অমস্তত' বা মননশক্তিতে অধিরূঢ় হইয়া (দর্শনের পরিভাষায় 'মায়া' শক্তিতে) জীবক্ষেত্রে জ্ঞান-ইচ্ছা-ভাবরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। আবার, ভাবের দিক হইতে, জীব আপনার অন্তঃপ্রজ্ঞা বা বোধি পথেই বলিতে পারে, তুরীয়ের নাম আনন্দ—সৌন্দর্য্য বা সুন্দর। তিনি "সত্যং জ্ঞানমানন্দম্" বা "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম", "সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম"। যেমন বলিয়াছি, শ্রুতি 'জ্ঞান'তত্ত্বের দিক হইতেই 'দৃষ্টি' করিয়াছেন। সুতরাং, শ্রুতিমতে ব্রহ্ম 'জ্ঞান'স্বরূপ এবং সৃষ্টিও 'বিজ্ঞানময়ী'; এবং জীবচিত্তের ইচ্ছা-জ্ঞান-ভাবের বৃত্তি উক্ত জ্ঞানেরই পরিপ্রকাশ। এরূপে, তুরীয়ই জীবক্ষেত্রে 'সত্যজ্ঞানমানন্দং' রূপে, 'সৎ-চিৎ-আনন্দ' রূপে, এবং বিশ্ব-সংসারে 'অস্তি-ভাতি-প্রিয়ং' রূপে প্রকটিত। লক্ষ্য করিতে হইবে, বিশেষ ভাবে ব্রহ্মের এই 'আনন্দ' নাম! জীবের সমুচ্চ দার্শনিক প্রজ্ঞা ও 'বোধি' উহার সমাচার দিতেছে—উহা প্রমাণিত করিতেছে। মনুষ্যজাতির 'মহাবোধি'শীল ও মহাযোগী ব্যক্তিগণই ভগবানের এ'নাম প্রচার করিয়াছেন। আনন্দ—পূর্ণ আনন্দ! এ আনন্দশক্তি ধরিয়াই বলিতে পারি, বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মূল 'ধৃতি' এই আনন্দের মধ্যে! 'আনন্দ মূলেই' পরমানন্দ কর্তৃক এ বিশ্বের সৃষ্টি। শ্রুতির ভাষায় বলিতে পারি—"কোহেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশঃ আনন্দো ন স্যাৎ?" বলিতে পারি, "আনন্দাদেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযান্ত্যভিসংবিশন্তি। বলিতে পারি, "রসো বৈ সঃ"। এরূপে, সমগ্র উপনিষৎসাহিত্য জীবের জ্ঞান-ইচ্ছা-ভাববৃত্তির ভূমি হইতে

(২) কুশাগ্রবুদ্ধি শঙ্কর শ্রুতির 'সত্যং জ্ঞান মনন্তম্' তত্ত্বের আদিম 'জ্ঞান' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঋষি ব্রহ্মকে 'জ্ঞাতা' বলিতেই চাহেন নাই। 'জ্ঞাতা' বলিতে সান্ততা-ভাব এবং খণ্ডতা আসে। স্বরূপাবস্থায় তন্মধ্যে Absolute Identity of Subject and Object ইহাই ধারণা করিতে হইবে। যাহা 'পূর্ণ জ্ঞান'স্বরূপ সেখানে আমাদের ন্যায় জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতার 'ত্রিপুটী' বা ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণতা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?

তুরীয়তত্ত্বের উদ্দেশ বার্ত্তাতেই আম্ভন্তমধ্য পরিপূর্ণ। ফলতঃ সংযোগী ঋষিগণ কখন কোন্ দৃষ্টিস্থান হইতে কথাগুলি—মন্ত্রগুলি বলিতেছেন, তাহা বুঝিয়া লওয়াই আদিম কর্ত্তব্য। তুরীয়তত্ত্বকে ভাষায় সঙ্কোতিত গিয়া মানুষের 'দর্শনী' শক্তির অতুলনীয় প্রকাশ বেদের দশমমণ্ডল ও উপনিষৎ! 'তৎ'ত্ব বিষয়ে এমন বিনির্ম্মল প্রবেশ বার্ত্তার ও যোগবার্ত্তার পরিচয়গ্রন্থ বিশ্বসাহিত্যে নাই।

মীষ্টিসিজমের তত্ত্বজিজ্ঞাসু মাত্রকে বুঝিতে হইবে, উপরের মন্ত্র কয়টীর মধ্যে মনুষ্যের 'দর্শন' শক্তির চূড়ান্ত বার্ত্তা টুকুই সংক্ষিপ্ত আছে। এ সমস্ত মন্ত্র চূড়ান্ত প্রজ্ঞা ও ভাবের 'অগ্নিবাণ'! সচেতন হইয়া এ বাণ হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারিলেই উহাদের শক্তি, দ্রুতি এবং দীপ্তি বুঝিতে পারা যায়! মানুষের দর্শনবিজ্ঞান এ যাবৎ ইহাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সত্যকথা বলিতে পারে নাই। এ স্থানে যেমন ভারতীয় Mysticism এর মূলদৃষ্টি, তেমন সকল সাহিত্যের Mysticism এর রহস্তেও দৃষ্টি। আবার, এ ক্ষেত্রে 'অপৌরুষের শ্রুতি' বাদিগণের একটা কথাও মনে রাখিতে হয়—যাঁহার যেমন-ইচ্ছা উহাকে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করিতে পারেন। তাঁহারা বলেন, চরমতত্ত্ব বিষয়ে এই যে 'সচ্চিদানন্দ' প্রভৃতি বার্ত্তা ইহা 'বিজ্ঞান' নহে 'আগম'। বিজ্ঞান এখন ইহাকে বিচার-যুক্তিপরীক্ষণে সমর্থন করিতে পারে। যেমন, মহামতি শঙ্কর যুক্তি ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিকের 'কার্য্য কারণ' বাদ অবলম্বনে, অদ্বৈতবাদ সমর্থন করিয়াছেন। নীচের দিক হইতে জগতের বহুত্ব ঘাঁটিয়া, ভূয়োদর্শন ও পরীক্ষণ পথে আধুনিক জড়বিজ্ঞান জড়তাক্ষেত্রের চূড়ান্তে গিয়াই এখন শ্রুতির 'এক'তত্ত্বের সঙ্কেত করিতেছে। কিন্তু, শ্রুতিবাদিগণের মতে এই মহাবিজ্ঞান, এ অধ্যাত্ম বিজ্ঞান বা অদ্বৈত বিজ্ঞান—'আগম'! 'ঋষির' যোগযুক্ত দৃষ্টিতে 'আগত' অথবা উর্দ্ধলোকবাসী দয়ালু জীবাত্মাগণ হইতে 'আগত' বলিয়াই উহা 'আগম'। 'আগম' ব্যতীত এ তত্ত্ব বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া বহির্ম্মুখ এবং অনাত্ম জীবের সাধ্য ছিল না। এ 'আগম' জ্ঞানের উপরেই শ্রুতির মাহাত্ম্য এবং 'বেদ'বাদীর সমক্ষে সমগ্র শ্রৌত দর্শনের

গুরুত্ব নির্ভর করিতেছে। বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র এবং উহার ভাষ্যাদি 'কার্য্যকারণ' বাদের যুক্তিপথে উক্ত 'আগম'বার্ত্তারই সমর্থন করিতেছে বলিয়া উহারে নাম 'বেদান্ত দর্শন'। সংশয়ীর জন্য এবং 'বিবুদ্ধি-প্রতিবুদ্ধয়ে' উদ্দেশ্যেই উক্ত 'দর্শন শাস্ত্র'।

সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা ক্ষেত্রেও তৃতীয় তত্ত্বের আলোচনা অপরিহার্য্য কেন? কেবল সাহিত্যিক মীষ্টিসিজম বুঝিবার জন্য নহে; জিজ্ঞাসু কবিমাত্রকে, জীবনপথে সচেতন দৃষ্টিসম্পন্ন সাহিত্যসেবী মাত্রকেই জীব-নিসর্গ ও তুরীয় বিষয়ে একটা দৃষ্টিস্থানে দাঁড়াইতে হয়। তাঁহাকে অন্ততঃ তর্ক-যুক্তি-বিচার পথে, বিশ্বসৃষ্টির ও জীবজীবনের চরম রহস্য বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত স্থানে (অথবা 'শূণ্য'স্থানেই) নিজকে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে। সূক্ষ্মদর্শী মাত্রেই বলিতে বাধ্য হইবেন যে, 'এক' হইতেই যখন জীব নিসর্গ ও কবিচেষ্টার 'অখিল জগৎ' প্রকটিত হইয়াছে, তখন, কবির উক্ত 'একত্ব' দর্শনের (বা তদ্বিষয়ক সংশয় অথবা প্রত্যয়ের) প্রকৃতির উপরেই ত তাঁহার সকল কবিত্বের, সচ্চিদানন্দ বিষয়ে সকল ভাবুকতার এবং Idealism বা Realism এর মূল না দাঁড়াইয়া পারে না। যেমন, হীব্রু ধর্ম্ম ও হীব্রু-শিষ্য ধর্ম্মগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে 'আপ্ত'বাদী। এমন আপ্তবাদী যে, উহারা ধর্ম্মগ্রন্থের Authority প্রমাণের উপরে বিশ্বাসকে, ভক্তি বা Faith কেই সার করিয়া চলে। এ'জন্য, ঐ সমস্ত (Religion) ধর্ম্মের মূলে প্রকৃত 'তৃতীয়' জিজ্ঞাসা বা 'তুরীয় দর্শন' নাই। ঐরূপ ধর্ম্মাক্রান্ত জাতি সমূহের মতিগতি ও চিত্তধাতু এবং সাহিত্যের আবহাওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের ধর্ম্মের উক্ত 'মূল-প্রকৃতি' দ্বারা ধর্ম্মিত না হইয়া যে পারে নাই, তাহা স্বীকার করিতে হয়। আবার, উহারা ত দ্বৈতবাদী! অন্যদিকে, ভারতীয় সাহিত্যিক, বিশেষতঃ সংস্কৃত সাহিত্যের কবিগণ (সতর্কে অথবা অতর্কিতে) প্রায় সকলেই অদ্বৈতবাদী, সুতরাং 'জ্ঞান'বাদী; এবং জিজ্ঞাসাই তাঁহাদের প্রবেশপথ। বেদ পুরাণ তন্ত্রাদি ও সংস্কৃতসাহিত্য নামক বিস্তারিত ব্যাপারটি

৫২। সাহিত্যক্ষেত্রে তৃতীয় তত্ত্বে অবিশ্বাসের বা সংশয়ের অধ্যাত্মফল অপরিহার্য্য।

মূলতঃ অদ্বৈতবাদী কবিগণের রচনা বলিয়া সে সমস্তের মূলপ্রকৃতি এবং মর্ম্মগতি অদ্বৈতধর্ম্মে ধর্ম্মিত, তত্ত্বজিজ্ঞাসু এবং জিজ্ঞাসা-সহিষ্ণু না হইয়া ও পারে নাই। উহা না বুঝিলে, শ্রুতিসাহিত্যের বা রামায়ণ-মহাভারতের অন্তরাত্মা যেমন অবোধ্য থাকিবে, তেমন 'শকুন্তলা'র অন্তরাত্মাও দুরস্থ থাকিবে। শকুন্তলার পরিশেষে কবি কেন এই প্রার্থনা টুকু করিলেন?

মমাপিচ ক্ষপয়তু নীললোহিতঃ
পুনর্ভবং পরিগতশক্তি রাত্মভূঃ॥

'তৎ'বাদ, তুরীয়বাদ এবং উহার ব্যাপ্তি ও পরিধি না বুঝিলে, সাহিত্যে ভারতীয় কবির 'জীবন' আদর্শ, জন্মান্তর ও ভবচক্রের আদর্শ এবং চূড়ান্তের 'স্বাধীনতা'র অর্থটাও বুঝা যাইবে না। বর্ত্তমান মানবজগতে খ্রীষ্টান জাতির প্রাধান্য বলিয়া মানবসাহিত্য যে ব্যাপক ভাবে দ্বৈতবাদের অধীন হইয়াই বিকাশ লাভ করিতেছে, এবং 'আপ্ত'আদর্শে বিশ্বাসের 'মূল' নড়িয়া উঠিলে একেবারে নাস্তিক্যই যে প্রভূত ও অনুভূত হইতেছে, সাহিত্যের সূক্ষ্মদর্শী মাত্রেই উহা প্রতিপদে প্রত্যক্ষ করিবেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ভাগে, ইংরাজী সাহিত্যের কবিগণের মধ্যে, প্রচলিত খ্রীষ্টানীতে 'বিশ্বাস'ধ্বংস ও বিশ্বাসভ্রংশের দরুণ যে অধ্যাত্ম হাহাকার উঠিয়াছিল, তাহা সহৃদয় মাত্রেরই প্রত্যক্ষ। বিখ্যাত Oxford Movement নামক ব্যাপারটাও উহারই অবান্তর ফল। ম্যাথু আর্ণল্ড্ ও ক্লাফ প্রভৃতি শক্তিশালী কবি "Religion is failing us"মর্ম্মের যে হাহাকার তুলিয়াছেন, প্রকৃতপ্রস্তাবে 'বিশ্বাস' লাভের জন্যই যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছেন, তাঁহাদের রচনা যে ভববিদ্বেষ, মহাসংশয় এবং নাস্তিক্যের হতাশ্বাসে ধর্ম্মিত হইয়াছে, Cynicism দ্বারা কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সাহিত্যরসিক বুঝিয়া লইতে পারেন। বায়রণ বা শেলী ত প্রকৃত নাস্তিক নহেন; প্রচলিত খ্রীষ্টানীর 'ধর্ম্ম'ফর্ম্মার বা Dogmaর সংশয়ী ও অবিশ্বাসী। বায়রণের সমস্ত দুর্হৃদয়তা, 'কেইন্' ও 'ম্যানফ্রেড' প্রভৃতির

সর্ব্ববিধ্বংসী ভাবুকতা এবং 'কেতাবের খ্রীষ্টানী' হিংসার মূলেও এরূপ 'জিজ্ঞাসা' এবং গভীর 'বিচিকিৎসা'। বিশ্বাসের জন্য কোন যুক্তিসিদ্ধ হেতু না পাইয়াই যেন বায়রণ বাইবেলের আপ্তবিদ্বেষ্টাও বিশ্বদ্বেষ্টা হইয়া পড়িয়াছেন! শেলীর "নাস্তিকতা আবশ্যক" নামক সন্দর্ভ, 'রাণী ম্যাব' ও 'ইসলামের বিদ্রোহ' প্রভৃতি কাব্যও প্রচলিত খ্রীষ্টানীতে অবিশ্বাসেরই প্রমাণ। সুইন্‌বার্ণের Carrion Crucified হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার সকল কাব্যকবিতার মধ্যেই প্রচলিতধর্ম্মের Dogma প্রভৃতিতে অবিশ্বাস এবং উহার ঘনফল টুকুই আত্মপ্রকাশ করিতেছে। রবার্ট বুকেননের Wandering Jew হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকানেক সাহিত্যসেবীর রচনাতে উহারই প্রভাব। বায়রণ ও শেলী তাঁহাদের অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা, সংশয় ও অবিশ্বাসের সাহসিক ঘোষণার দরুণেই স্বদেশে অসম্ভব রকম নির্য্যাতন ভোগ করিয়া পরিশেষে স্বদেশ হইতে নিজকে নির্ব্বাসিত করিতেই বাধ্য হইলেন! অধুনা বিলাতে সে গোঁড়ামী নাই; সংশয়ীর প্রতি আপ্তবাদী এবং ভক্তিবাদিগণের সে বিদ্বেষ বা নির্য্যাতনাও নাই। কিন্তু, উহা ত লোকের ধর্ম্মজ্ঞানের 'উন্নতি' হেতু নহে! জড়-বিজ্ঞানের ও জড়বাদের আক্রমণে আক্রমণে লোকের খ্রীষ্টানীর মূল একেবারে খোয়াইয়া গিয়াছে; খ্রীষ্টানীতত্ত্বেই অধিকাংশের অনাস্থা ঘটিয়াছে; উহা হইতে সে সাহিত্যের অবস্থা এবং আবহাওয়াটাও পরিবর্ত্তিত না হইয়া পারিতেছে না। একেবারে নিরীশ্বর অপিচ ঈশ্বরবিদ্রোহী ভাবের এবং 'শয়তানী' ভাবের সাহিত্যই রচিত ও প্রচলিত হইয়া চলিয়াছে! সাহিত্যের সৃষ্টিতে জীব ও নিসর্গ ব্যতীত তৃতীয়ের বিষয়ে জীবের ধারণার প্রভাব সর্ব্বত্র। রোমের নাস্তিক কবি (একজন শ্রেষ্টশ্রেণীর কবি) লুক্রিশিয়ুসের সময় হইতেই পশ্চিমের সাহিত্যে এ প্রভাব-সূত্র অনুধাবন করা যায়। তৃতীয় বিষয়ে একটা অকপট সিদ্ধান্ত-স্থানে উপনীত হওয়া প্রত্যেক মনোজীবী মনুসন্তানের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দেশ করিতে হয়। তদ্ব্যতীত 'মনুষ্য' নামেরই যোগ্যতা হয় না।

ভারতের সচেতন সাহিত্যসেবী মাত্রকে, সৃষ্টিতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু বা তুরীয়-চিন্তক মাত্রকে, অদ্বৈতবাদী মাত্রকে 'মায়া'র অর্থ মোটামুটি বুঝিয়া লইতে হয়।

৫৩। ভারতীয় Mysticism ক্ষেত্রে মায়া ও অবিদ্যা।

বৈদিক দর্শন অদ্বৈতবাদী—বেদপন্থী ধর্ম্মমাত্রেই অদ্বৈতবাদী; শাক্তশৈব বৈষ্ণব সৌর গাণপত্য প্রভৃতি 'অর্চ্চনা' শীল প্রণালীমাত্রেই অদ্বৈতবাদী; সুতরাং সকলেই 'মায়া'বাদী! সকলেই চূড়ান্তে ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের 'অনন্যত্ব' এবং ব্রহ্মের সঙ্গে সৃষ্টির 'অনন্যত্ব'ও স্বীকার করেন বলিয়াই 'মায়া'বাদী না হইয়া পারেন না। বুঝিতে হইবে, 'মায়া' ও 'অবিদ্যা' এ দুটী সংজ্ঞাশব্দের মধ্যেই অদ্বৈতবাদের মূল বিশেষত্ব। এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, বহু জীব ও বহুরূপা বিশ্বসৃষ্টির 'স্বরূপ' এবং উহাদের পরস্পর ঐক্যসম্বন্ধ বুঝাইতে গিয়াই 'মায়া'বাদ; ও জীবের সংসার জীবনে দুঃখ-শোক-তাপ-দুর্বৃত্ততা-পাপ ও অধর্ম্মের আগন্তুক স্বরূপ ধারণা করিতে গিয়াই 'অবিদ্যা' সংজ্ঞার অবতারণা—তদ্ব্যতীত শ্রৌত অদ্বৈতবাদ দাঁড়ায় না। পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার Monism বা Pantheism এর সঙ্গে এ স্থলেই বৈদিক দর্শনের পরম বিশেষত্ব; ভারতীয় অদ্বৈতবাদ একটী সুসম্পূর্ণ ও সর্ব্বসামঞ্জস্যপূর্ণ দর্শনশাস্ত্র এবং সঙ্গে সঙ্গে কোটীকোটী হিন্দুর 'ইহামুত্র' জীবনের আদর্শ পরিচালক 'ধর্ম্মশাস্ত্র'! দর্শনই যেন ধর্ম্মশাস্ত্রতা লাভ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। (১)

(১) অদ্বৈতবাদ যে বৈদিক ভারতের নিজস্ব, উহাই যে স্বপক্ষেপরোক্ষে প্রভাব বিস্তার পূর্ব্বক প্রাচীন এসিয়া এবং ইয়োরোপের যাবতীয় Pantheism আদর্শের এবং Mysticism এর জনক হইয়াছিল; এ বিষয়ে অনেক ইয়োরোপীয় পণ্ডিত একমত হইয়াছেন। (এ সূত্রে গ্রন্থের ১৮৪-৮৫ পৃষ্ঠাও দ্রষ্টব্য) সে আলোচনায় আমাদের আমল নাই। তবে বুঝিতে হয়, ব্রহ্ম, জীব এবং সৃষ্টির স্বরূপসম্বন্ধ বুঝাইতে গিয়া বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যকার ও টীকাকার গণের মধ্যে কিঞ্চিৎ মতভেদ ঘটিয়াছে। শঙ্কর, রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, নিম্বার্ক প্রভৃতির মধ্যে মতভেদ গণ্ডিকেই শুদ্ধাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত বা 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ' প্রভৃতি। এ ক্ষেত্রে মুখ্যতঃ বুঝিতে হইবে, সকলেই

প্রথমতঃ, সাহিত্যক্ষেত্রে আপাততঃ 'দুষমন' শুনাইলেও, 'মায়া' পদটীর মর্ম্মার্থ বুঝিতে হয়। কেননা, স্বদেশী ও বিদেশী দ্বৈতবাদীগণের হস্তে এবং পরধর্ম্ম-আক্রমণ ব্যবসায়ি গণের হস্তে ইহার বড়ই দুর্ব্যবহার! গোঁড়া শাক্তগণ উহার নিন্দা করেন, এ দেশের সাংপ্রদায়িক বৈষ্ণব ও 'ভক্তি'বাদিগণের অনেকে বেদের এবং শ্রৌতদর্শনের এক দফা নিন্দা না করিয়া তাঁহাদের ভজন পূজন পর্য্যন্ত আরম্ভ করিতে পারেন না বলিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে। গোঁড়া খ্রীষ্টানগণ এবং তাঁহাদের আধুনিক শিষ্যানুশিষ্যগণ উহা লইয়া অত্যন্ত শস্তা রকমের ঠাট্টাতামাসা ও 'ভাঁড়ামী' করিয়া থাকেন। উহাদের অজ্ঞতা এবং অপ্রেমের জ্বালায় সাহিত্যক্ষেত্রেও সোয়াস্তি নাই। ইয়োরোপীয়গণ 'মায়া'কে Illusion নামে অনুবাদ করিয়াছেন (যেমন 'অনন্ত'কেও 'identical' করিয়াছেন), সে হইতেই যত বিপত্তি। সকলকেই সময়ে-অসময়ে বিভ্রান্ত ও বিত্রস্ত হইতে হয়। ফলে দাঁড়াইয়াছে, বিলাতী সেই প্রবাদটীর দৃষ্টান্ত—'Give the dog a bad name and hang it.' প্রথমেই মনে রাখিতে হয়, সৃষ্টির অন্তর্গত কোন বিশেষ্য-বিশেষণীয়ের দ্বারা যেমন স্রষ্টার প্রকৃত স্বরূপ ধারণা করা যায় না; তেমন সৃষ্টিকারিণী 'মায়া'র স্বরূপও ধারণা করা যায় না, শঙ্কর বলিয়াছেন, ব্রহ্মকে যে "সচ্চিদানন্দ" বলা হয়, তাহাও 'দিক্ প্রদর্শন' মাত্র—Approximation বই নহে। উহাও জৈব অনাত্মতা ধর্ম্মে, জীবের অন্তঃকরণের মলধর্ম্মে অনুধর্ম্মিত এবং ছায়ামলিন না হইয়া পারে না।

ত "অদ্বৈত"! ভারতের বৌদ্ধ ও জৈনগণকে পর্য্যন্ত 'সংশয়ী বেদান্তী' ও 'প্রচ্ছন্ন বেদান্তী' নামে নির্দ্দেশ করিব! বেদের আদিম আগমসম্পত্তি ও সিদ্ধান্তের প্রভাব নিদারুণ বিপক্ষগণও এড়াইতে পারেন নাই। বৌদ্ধ সংপ্রদায় বিশেষের 'মায়া'কেই Illusion নামে অনুবাদ করা চলে। শঙ্কর বৌদ্ধ মায়াবাদ ও শূন্যবাদ খণ্ডনে 'অদ্বৈতব্রহ্ম' বাদ প্রতিষ্ঠা ও 'বর্ণাশ্রম' আদর্শের সমর্থন করিয়াছেন। শঙ্কর ত 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' ছিলেন না। উহারাই বরং বিপরীত এবং অনিচ্ছুক বেদান্তবিজ্ঞানী! এ বিষয়ে জিজ্ঞাসুব্যক্তি পণ্ডিত রাধাকিষণের অনুপম Indian philosophy গ্রন্থপ্রদত্ত বিবরণ পাঠ এবং চিন্তা করিতে পারেন।

এজন্য মায়াকেও বলা হইয়াছে—'অনির্ব্বচনীয়া'। ব্রহ্মের অনন্ত শক্তির মধ্যে 'মায়া' একটী। পঞ্চদশী দেখাইতেছেন, "ইত্যেক দেশবৃত্তিত্বং মায়ায়াঃ বদতি শ্রুতিঃ"। মায়া সৃষ্টিরচনায় ঐশী শক্তি—সৃষ্টি-'নির্ম্মাণ' শক্তি; সৃষ্টিরচনা রূপ অঘটন ঘটনপটীয়সী শক্তি! মায়া 'স তপোহতপ্যত' কর্ত্তার তপঃশক্তি (Meditation), কল্পশক্তি। সৃষ্টি ত হইয়াছে—অর্থাৎ আমরা ত সৃষ্টির 'প্রতীতি' করিতেছি! বুঝিতে হইবে, কোন্ শক্তিতে ইহা হইল? 'একমেবাদ্বিতীয়ং' কি করিয়া 'বিভিন্ন' ও 'বহু' হইলেন? এমন 'বহু' হইলেন যে 'একত্ব তত্ত্ব'কে কুত্রাপি 'প্রত্যক্ষ' করা যাইতেছে না! উহা পরমার্থতঃ বুঝাইতে গিয়াই শ্রুতি বলিতেছেন, ব্রহ্মের এ সৃষ্টিশক্তির নামই 'মায়া'। এই সৃষ্টিপুরী, এই দেশকাল-পুরী এবং উহার কুক্ষিগত কোটি-কোটি সৌরজগৎময়ী ও অনন্ত কল্পান্তব্যাপিনী এই 'বিশ্বসৃষ্টি' 'সর্ব্বশক্তি'মান্ ব্রহ্মের কল্পজনিত সৃষ্টি; জ্ঞানস্বরূপ ও "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" ব্রহ্মের কল্প বিন্দুতেই অবস্থিত! (ক) এজন্যই এদেশের শাক্তগণের মতে মহেশ্বরের হৃদয়স্থা 'মহামায়া' চিন্ময়ী এবং তাঁহার নাম 'বিন্দুবাসিনী'। বিষ্ণুর হৃদ্গতা লক্ষ্মী বা কৃষ্ণের হৃদয়স্থিতা রাধিকা—সমস্তই ঈশ্বর ও তাঁহার হৃদ্গতা 'মায়া'শক্তির বাহ্যিক Symbol বা পুত্তল।

এক, অনন্ত, অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপ 'শুক্তি', নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত শুক্তিই আছেন, অথচ বহু জীব ও বিপুল সৃষ্টিরূপ 'রজত' আকারে প্রতিভাত হইতেছেন; অনন্ত রূপে প্রতিভাসিত ও প্রতীয়মান হইতেছেন। উহার নামই সৃষ্টি এবং এই অচিন্ত্য জগৎ-রচনা শক্তির নামই 'মায়া' এবং মায়ার অপর নাম 'ব্রহ্মকৃতি' বা 'আত্মকৃতি' (ক)! 'এক'তত্ত্বই বহুরূপে প্রকটিত

(ক) খ্রীষ্টধর্ম্মের সৃষ্টিবাদের মধ্যেও প্রকারান্তরে যেন বৈদিক সৃষ্টিতত্ত্বের সমর্থনা "—God said let there be light and there was light" ইত্যাদি কথার প্রকৃত অর্থ, সৃষ্টি ব্রহ্মের 'কল্প' ব্যতীত আর কিছুই নহে।

(ক) 'কৃতি' শব্দের দার্শনিক পরিভাষা একটি শ্লোকে সংগৃহীত আছে :—

আত্মজন্যা ভবেদিচ্ছা ইচ্ছাজন্যা ভবেৎ কৃতিঃ
কৃতিজন্যা ভবেচ্চেষ্টা চেষ্টাজন্যা ক্রিয়াভবেৎ॥

হইতেছেন; সুতরাং, দার্শনিকের ভাষায় 'মায়া'র ক্রিয়াস্বরূপ কি? একের 'অ-তথাভাস'। বিবর্ত্ত শক্তিতেই একের 'অতথাভাস'।

ব্রহ্মের 'বিবর্ত্ত' মায়া—এবং মায়ার 'পরিণাম' এ বিশ্বসৃষ্টি। এই শ্রৌত দর্শনকে সংক্ষিপ্ত করিয়াই বাদরায়ণ ঋষি সূত্র রচনা করিয়াছেন—'আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ' (খ) (ব্রহ্মসূত্র—১ অঃ—৪-২৬)

বুঝিতে হইবে, শ্রুতি এই বিশ্বসৃষ্টিকে Subjective স্থান হইতেই দৃষ্টি করেন; ব্রহ্মকেন্দ্র হইতে, 'আত্মকেন্দ্র' হইতেই সৃষ্টি ব্যাপারের প্রসার ও প্রকটন দর্শন করেন; এবং 'ব্রহ্মস্থান' হইতেই জীবাত্মা ও ব্রহ্মের অনন্যত্ব এবং ব্রহ্মের সঙ্গে সৃষ্টির অনন্যত্ব ঘোষণা করেন। শ্রৌত দর্শনে ব্রহ্মেরই অপর নাম 'আত্মা'। এ 'দৃষ্টি' হইতেই সুতরাং জগতের 'পারমার্থিক' সত্ত্বা ও ব্যাবহারিক সত্ত্বা উভয় বিচার স্থান অপরিহার্য্য হইয়াছে।

(খ) বিবর্ত্তেরও কোন প্রতিশব্দ ইংরেজী ভাষায় নাই। পণ্ডিত ডাঃ ব্রজেন্দ্র নাথ শীল উহাকে (তাঁহার Positive Science of the Hindus গ্রন্থে) Self alienation অনুবাদ করিয়াছেন; অনুবাদ কাছাকাছি আসিলেও সুসম্পূর্ণ নহে। শুক্তি যে রজতরূপে প্রতিভাসিত হইতে পারিতেছে, উভয়ের মধ্যে যেমন ঐক্য তেমন পার্থক্য ও ত আছে! আবার self differentiation এর সঙ্গে সঙ্গে Self reversion ও যেন আছে! বিবর্ত্তের মধ্যে এই বিপরীত প্রতীতি টুকুন না থাকিয়া পারে না। নিখিল সৃষ্টিসংসার ত শ্রৌতদর্শনে—"ঊর্দ্ধমূল মধঃশাখমশ্বথং প্রাহু রব্যয়ম্"! জীবের দেহতরু ও ত তাই! শ্রৌতদর্শন বলিতে পারেন, জীবের সমগ্র Experience এর জগৎ, Empirical self এর ব্যাবহারিক জগৎ এই বিবর্ত্তধর্ম্মে ধর্ম্মিত। পার্থক্য মূলক সৃষ্টির মূলধর্ম্মটীর নামই 'বিবর্ত্ত'। আবার, কঠশ্রুতি বলিতেছেন—"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎস্বয়ম্ভু, স্তস্মাৎ পরাক্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্"। সুতরাং ভেদাভেদ উভয়ই ত আছে—না থাকিলে বহুত্বের প্রতিভাস কিংবা বহুত্বের অনুভবমূলা জগৎসৃষ্টি সম্ভবপর হইত না। অতএব, বিবর্ত্তক্রিয়ার মধ্যে সত্য-অনুভাবন ও বিপরীত অনুভাব উভয় আছে। মহামতি শঙ্কর নিখিল শ্রুতিমর্ম্ম উদ্‌ঘাটিত করিয়া বিবর্ত্তবাদ সমর্থন করিয়াছেন। এ স্থলে বলিয়া যাইতে হয়, জগৎরচনার স্বরূপ বিষয়ে একটা মতভেদ আছে। পরবর্ত্তী কালের রামানুজ প্রভৃতি মায়াকে ব্রহ্মের 'বিবর্ত্ত' না বলিয়া 'পরিণাম' বলিতে চাহিয়াছেন; এবং তুরীয়

ব্রহ্মবাদের অপর নামই সুতরাং 'অধ্যাত্ম বাদ'। আত্মকেন্দ্র হইতে যাহা 'হওয়া', বহির্দৃষ্টিতে বা বৈজ্ঞানিকের Objective দৃষ্টিতে তাহাই স্রষ্টার (কিংবা অপরের) 'করা'রূপে প্রতিভাত। সুতরাং সৃষ্টিব্যাপারকে 'হওয়া' এবং 'করা' উভয় ক্রিয়ারূপে দৃষ্টি করা সম্ভবপর হইয়াছে। সৃষ্টি ব্রহ্মের কল্পক্রিয়া বা জ্ঞানক্রিয়া বলিয়াই সৃষ্টিব্যাপার 'জ্ঞানময়'; ব্রহ্মও "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"; ঈশ্বরের অপর উপাধি 'সর্ব্বজ্ঞ'; সর্ব্বজ্ঞের অর্থও

পদার্থেও 'হাত পা' দিয়া বৈষ্ণবগণের 'উপাস্য' 'শ্রীমূর্ত্তি'র সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইয়োরোপের স্পীনোজাও আমাদের দৃষ্টিতে অদ্বৈতবাদী; কিন্তু এরূপ 'পরিণাম' বাদী। ব্রহ্মের প্রধান গুণ Extension ও Thought, ইহা তাঁহার সিদ্ধান্ত। বিস্তৃতি একটা জড়ধর্ম্ম নহে কি? আবার, স্পীনোজার মতে, জগতের পাপাদিও সুতরাং ব্রহ্মেরই অঙ্গ। উহাতেই স্পীনোজা ডাহা Materialist এবং "Dead Dog Spinoza" দুর্নামে খ্রীষ্টানগণের নিন্দালাভ করিয়াছেন। শঙ্করের শিষ্যগণ (আনন্দগিরি ও বিদ্যারণ্য প্রভৃতি) দেখাইতে পারেন, পরিণাম বাদে জগতের প্রতীয়মান অপূর্ণতা ও পাপতাপ জঘন্যতা, জীবের কামাক্রোধাদি রিপু ও অধর্ম্মগতি এবং এই আরব্ধ সৃষ্টিচক্রের সম্পূর্ণ আবর্ত্তন ও 'সমাপ্তি' আদর্শ কোনমতে ব্যাখ্যা করা যায় না। আবার, বিকারী, পরিণামী এবং সাবয়ব পদার্থমাত্রেই ত অনিত্য! উহা কি করিয়া 'স্বয়ংকারণ' হইতে পারে? জিজ্ঞাসুগণ এ বিষয়ে ঘনিষ্ঠ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে তাঁহাদের গ্রন্থাদিই পাঠ করিবেন। বঙ্গদেশে অদ্বৈতবাদ প্রবল নহে; এদেশের 'চতুর্থ আশ্রমীর' মধ্যে বৈদান্তিক আছেন; প্রাচীন 'পণ্ডিত'গণের মধ্যেও কেহ কেহ আছেন; কিন্তু এ যুগের উপযোগী 'তুলনায় দৃষ্টি' তাঁহাদের নাই। বেদান্ত বিষয়ে শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রীর 'উপনিষদের উপদেশ' ও ইংরাজী 'অদ্বৈতবাদ' গ্রন্থ এতদ্দেশে অনুপম। শ্রুতির মর্ম্ম এবং শঙ্করের প্রকৃত উদ্দেশ্য উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে পাওয়া যাইবে। দ্বৈতবাদীর আদর্শে এবং সাংপ্রদায়িক স্বার্থে অদ্বৈত বাদের ও শঙ্করমতের অনেক অযথা নিন্দা ও কদর্থ সাধারণ্যে প্রচলিত করা হইয়াছে। শঙ্কর নাকি 'হিন্দু বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পাণ্ডা ও শ্রুতিমতের প্রতিষ্ঠাতা' এ জন্যও নানাদিক হইতে, নানান মতলবে অযথা আক্রমণ! শঙ্করের বিরুদ্ধে ডিক্রী পাইলেই যেন সকল অভীষ্টসিদ্ধি! কিন্তু, শঙ্কর ত শ্রুতির 'ব্যাখ্যাতা' মাত্র! উপনিষৎগুলির কোন্ গতি হইবে? বস্তুতঃ, শঙ্করমতের অপহ্নব হইতে শ্রুতির মর্ম্ম বিষয়ে ও দুরবিলুপ্ত ঋষিজাতির প্রকৃত 'ধর্ম্ম' বিষয়ে এ দেশ অন্ধকারেই আছে। মানবত্বের এবং মানবধর্ম্মের ক্ষেত্রে

দাঁড়াইতেছে সর্ব্বত্রগ, সর্ব্বশক্তি এবং যুগপৎ সর্ব্বদর্শী। 'জ্ঞানময়ী' সৃষ্টি বলিয়াই সর্ব্বজ্ঞের এরূপ অর্থ সম্ভবপর হইয়াছে। ব্রহ্মশক্তি মায়াও সুতরাং জ্ঞানময়ী এবং ব্রহ্মময়ী—তিনি গুণাশ্রয়ী এবং গুণময়ী ও জগৎ-কারিণী 'প্রকৃতি'। তিনি "দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া"। আবার, "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্"। এই মায়া শুদ্ধসত্ত্বা—এবং জগৎ-রচনায় অচিন্ত্য শক্তিময়ী। অতএব মায়াকেই 'জ্ঞানময়ী জগৎকর্ত্রী' এবং 'মহাশক্তি' রূপে, 'মহামায়া'রূপে, জ্ঞানদা ও মোক্ষদারূপে বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সম্প্রদায় বিশেষ (শাক্ত) উপাসনা করিতে পারিতেছেন। শঙ্করপ্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসী সম্প্রদায়বিশেষও মায়াকেই উপাসনা করেন। 'অবিদ্যা' উত্তীর্ণ হইবার জন্যই উপাসনা।

এ অবিদ্যা কি? জীবের অজ্ঞানতা—অনাত্মতা—সৃষ্টিতত্ত্বে যাহা Principle of Negativity। ব্রহ্মজ্ঞান জীব মাত্রেরই নিত্যসিদ্ধ বলিয়া, আবার, আত্মকেন্দ্রী এবং আত্মমূলা 'সৃষ্টি' বলিয়া, জীবাত্মা মাত্রেই বিশ্বাত্মা; কিন্তু, জীবের সে 'জ্ঞান' ত নাই! অনাত্মতাবশে জীব নিজকে ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন মনে করিতেছে; ব্রহ্মাত্মতা হইতে স্খলিত হইয়াছে; উহার নামই 'অবিদ্যা'। জীবনের দার্শনিক বলিবেন, ব্রহ্ম সুতরাং জীবমাত্রের 'হারাধন'। (১) এ ধন হারাইয়া জীব উহার পুনঃপ্রাপ্তির আশায় ঘুরিতেছে। এই

মনুষ্যজাতির সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দার্শনিক মণীষা এবং দৃষ্টিশালী পুরুষগণের সিদ্ধান্ত বিষয়ে, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্যবুদ্ধি ও বীরবুদ্ধি ব্যক্তিগণের 'দর্শন' বিষয়ে, অপিচ সর্ব্বগরিষ্ঠ বীরকর্ম্মী ও সত্যধর্ম্মী পূর্ব্বপুরুষগণের 'ধর্ম্ম' বিষয়েই (তাঁহাদের বংশধর বলিয়া গর্ব্বকারী) আমরা অভাবনীয় এবং নিদারুণ অন্ধকারেই আছি! আমার প্রয়োজন, রুচি বা অভীষ্ট-অনভীষ্ট লইয়া ত 'সত্য' স্থির হইবে না; প্রকৃত 'তত্ত্ব' কি? জীবস্থান হইতে প্রকৃত 'দর্শন', 'জ্ঞান' বা 'গতি' কি? উহার নিরপেক্ষ ও বীরত্বপূর্ণ নির্দ্দেশই শ্রৌত দর্শন বা উপনিষৎ।

(১) এখনও জীবের সংবিতের মধ্যে, Consciousness এর মধ্যে কিরূপে হারাধনের সঙ্গে যোগ-সূত্র আছে; জীব প্রত্যহ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির মধ্য দিয়া কিরূপে সেই হৃতপদ অজ্ঞানে মাড়াইয়া আসে, 'বেদান্ত দর্শন' তাহা প্রদর্শন করিতেছেন। বেদান্ত প্রকৃত প্রস্তাবে সত্যানুসন্ধানী ও ব্রহ্মাত্মদর্শিগণের, Practical Mystic বা ব্রহ্মচারিগণেরই

অজ্ঞান এবং অস্পষ্ট অভাববোধ এবং হারামণির অন্বেষণই দার্শনিকের দৃষ্টিতে সৃষ্টিব্যাপার—'জগৎ'ব্যাপার, জীবের 'সংসারব্যাপার'। কামনা মাত্রেই, কর্ম্মসংকল্প মাত্রেই সৃষ্টিমূলের সেই অনাদি অভাবের তাড়না ফল। জীব সকল কামনা-বাসনায় এবং কর্ম্মচেষ্টায়, জ্ঞানে অজ্ঞানে, প্রকৃত প্রস্তাবে সে 'হারাধন'কেই খুঁজিতেছে; সকল ভুলের পথে, সকল ঘোরাঘুরির নিয়চে নিদানের সেই 'এক'কেন্দ্রটাই খুঁজিতেছে। উহার সংপ্রাপ্তি (বা পুনঃ-'প্রাপ্তি') ব্যতীত এ সংসারগতির নিবৃত্তি নাই; অন্য কথায়—উদগতি নাই; জ্ঞান নাই; মুক্তি নাই; উদ্ধার নাই। এ 'অবিদ্যা' হইতেই সুতরাং জীবের যাবতীয় ভ্রান্তি—Unreason, Unspirituality ও Immorality—পাপ-তাপ-দুঃখ এবং অধর্ম্ম। খ্রীষ্টানী পরিভাষায়, অন্ততঃ এক দিক হইতে যাহার নাম দিতে পারি—জীবের 'ব্রহ্মদ্রোহ'ও অহঙ্কাররূপী 'সয়তান'; বৌদ্ধ পরিভাষায় 'মার'। অবিদ্যাই সংসারের যাবতীয় পাপ-তাপের বৈচিত্র্য, দুঃখশোক এবং জঘন্যতার হেতু। "অবিদ্যা—কাম-কর্ম্ম" ইহাই জীবের 'হৃদয় গ্রন্থি'; যাহার বন্ধনে "জীবো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে" তাহারই 'সূত্র'। ব্রহ্ম হইতে জীবনের 'কেন্দ্রাপসারিণী' গতির ইহাই 'মূল'—এই Principle of Negation! তত্ত্ববিদের দৃষ্টিতে, এস্থলেই 'এক' হইতে বহুত্ব সৃষ্টির ও সংসার চক্রের নিত্য রহস্য।

বিজ্ঞান এবং যুক্তিশাস্ত্র—যদিও অধুনা সাংসারিক বিদ্যালয়াদিতেই আলোচিত হইতেছে। আবার, সৃষ্টিরচনা কিরূপে ঘটিয়াছে, আত্মা হইতে বিশ্বব্যাপার বহির্ম্মুখে প্রসারিত হইয়া অনন্তলোক সমূহের সৃষ্টি করিয়াছে; ব্রহ্ম কিরূপে মায়াধিষ্ঠিত হইয়া 'ঈশ্বর' অবস্থায় সৃষ্টির অনন্ত'প্রাজ্ঞ লোক' ও 'প্রাজ্ঞ' জীবাত্মাসমূহের জনক হইয়াছেন, আবার 'হিরণ্যগর্ভ' রূপে অনন্ত 'তৈজস' আত্মার হেতু হইয়াছেন, পুনর্ব্বার 'বিরাট' রূপে অনন্ত 'বৈশ্বানর' জীবাত্মার জনক হইয়াছেন; আমাদের এই দেশকাল-গতিস্থিতিময় এবং চিৎ ও অচিৎ-ময় সর্ব্বসংসার কিরূপে সমষ্টি-অভিমানী বিরাটের জ্ঞানে এবং আধিপত্যেই অবস্থিত, সে রহস্যও আর্ষদর্শন জীবের "পঞ্চকোষ" বিজ্ঞানে দেখাইতেছে। জিজ্ঞাসু দেখিবেন, আধুনিক ইয়োরোপ ও আমেরিকার Spiritualist গণ বিভিন্ন দিক হইতে, তাঁহাদের 'ভূয়োদর্শন ও পরীক্ষা'মূলে প্রাচীন ঋষি-বিজ্ঞানেরই হুবহু সমর্থন করিতেছেন।

এ 'গ্রন্থি' ত পড়িয়াছে ! বুঝিতে হইবে, এ স্থানেই সৃষ্টির 'ঋত'-রহস্য ; এ স্থানেই বহুত্ব-বিচিত্রা সৃষ্টি ও সংসারচক্রের আবর্ত্তগতির 'গুপ্তরহস্য'—চরমের 'তৎ-ত্ব' হইতে, 'আত্ম'তত্ত্ব হইতে স্খলন—উহা হইতে অভাব বোধ—অভাব বোধ হইতে ঘোরাঘুরি রূপ 'কর্ম্ম'। অতর্কিত অভাব বোধ হইতে যেমন সুখাশা ও সুখতৃষ্ণা তেমন ঐ অভাব-বোধ হইতে যাবতীয় 'পৃথক্‌ভাব', দেহাত্মজ্ঞান, অহংকার, 'প্রাণী-কর্ম্ম' ও 'কামকর্ম্ম', অজ্ঞানতা এবং অনাত্মতা। গীতা উহাকে উদ্দেশ্য করিয়াই বলিয়াছেন—"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে—সঙ্গাৎ সংযায়তে কামঃ" ইত্যাদি। অনাত্মতা হইতেই বিষয়াত্মজ্ঞান এবং অভাবচক্র, এ' সংসারের ঘূর্ণীচক্র—সৃষ্টি-বৈজ্ঞানিক ঋষি এরূপেই নিদানের 'গ্রন্থি'তত্ত্বকে এবং সংসারচক্রকে দেখিয়াছেন। এ জন্য শ্রুতি বারংবার, মাথার দিব্যদিয়া বলিতেছেন—যাঁহারা জগতের চরম' জিজ্ঞাসু ও 'চূড়ান্ত'পিপাসু, যাঁহারা জাগরিত হইয়াছেন, অথবা জীবনের চরম রহস্যতত্ত্বে যাঁহারা জাগরিত হইতে চাহেন, কেবল তাঁহাদিগকেই বলিতেছেন—'এ গ্রন্থি না ছিঁড়িয়া জগৎসিন্ধুর ও'পাড়ে যাওয়া যায় না ; এই 'কাম ও কর্ম্মের গ্রন্থিচ্ছেদ' ব্যতীত স্বাধীনতা নাই—পরমার্থ নাই'। দ্রষ্টাঋষি বজ্রকণ্ঠে গ্রন্থিচ্ছেদের মহাখড়্গটীর কথা এবং 'ব্রহ্মাস্ত্র'টীর উদ্দেশ করিয়াই ত বলিতেছেন—

তাঁহাদের সেই Planes of Man, আত্মা ও অমরত্ব প্রভৃতি আমাদের বেদান্তকেই সমর্থন করিতেছে। তবে, যাঁহারা প্রকৃত 'জিজ্ঞাসু' নহেন, যাঁহারা জড়বাদী বা যাঁহারা আত্মতত্ত্বে বিশ্বাস করিতে পারেন না, তাঁহাদের পক্ষে ঐ সমস্ত কেবল কল্পনার ভেল্কী এবং Mysticism ব্যতীত অপর কি হইতে পারে? ঘনিষ্ঠ অনুসন্ধানী ও গবেষকগণই অধ্যাত্ম বিদ্যার সামর্থ্য বুঝিবেন। ফলতঃ, অদ্বৈতবাদ এবং ব্রহ্ম, আত্মা, মায়া, অবিদ্যা, মিথ্যা, সংসার প্রভৃতি দার্শনিক সংজ্ঞা। ঐ সমস্ত সংস্কৃতসাহিত্যের দ্বারা বর্ণাশ্রমধর্ম্মী ভারতবর্ষের একেবারে Race-consciosness হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ; এখন বরঞ্চ নব্যশিক্ষিতগণই যে পরিচয় অভাবে প্রতিনিয়ত উহাদিগকে কদর্থে গ্রহণ করিয়া 'ভ্রম' করিতেছেন, বিশেষতঃ সাহিত্যক্ষেত্রে এ ভ্রম যে সাংঘাতিক হইতেছে, তাহার সংবাদ উদ্দেশ্যেই আমরা এ 'বাহুল্য' করিতেছি।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে॥

পুনরুক্তি করিয়াও বলিব, সৃষ্টির এই যে রহস্যবিজ্ঞান এবং চরমগতির নির্দ্দেশ, ভারতীয় অধ্যাত্মবাদীর মতে ইহা 'অপৌরুষেয়' বা Revealed জ্ঞান। ভগবদ্দয়ায়, উর্দ্ধলোকবাসী 'মহাত্মা'গণের কৃপায় এবং ব্রহ্মবিদ্‌গণের অন্তর্দৃষ্টি মূলেই সংসার এ 'বার্ত্তা' লাভ করিয়াছে; অন্যথা মনুষ্য-বুদ্ধির উহা প্রাপ্য ছিলনা। 'বেদান্ত দর্শন' লৌকিক তর্কযুক্তি মূলে 'প্রাপ্ত'তত্ত্বের 'সমর্থন' করিতেছে—এইমাত্র। অন্যদিকে, এই "একমেবা দ্বিতীয়ং" বাদ বা Unity in Diversity দর্শন—ইহাই ত সাহিত্যে বা ধর্ম্মে সর্ব্বপ্রকার মীষ্টিসিজমের গোড়া! মানবের শ্রেষ্টশ্রেণীর চিন্তাশীলগণের, জগতের জাগ্রত দার্শনিক, জ্ঞানী, কবি এবং ভক্তগণের ইহাই 'গুহানুভূতি' ও বিশ্বসিত 'তত্ত্ব' ছিল, আছে এবং থাকিবে। বেদোপনিষদের প্রত্যক্‌দর্শী ঋষিগণের ত কথাই নাই; পঞ্চদশী তাঁহাদের কথাই সংক্ষিপ্ত করিতেছেন—

ব্রহ্মজ্ঞঃ পরমাপ্নোতি শোকং তরতি চাত্মবিৎ।
রসো ব্রহ্ম রসংলব্ধা নন্দীভবতি নান্যথা॥

এই 'মীষ্টিক বিদ্যা'! ভারতের বাহিরেও নরজগতের অনেক চিন্তাশীল, সাধু-সন্ত এবং কবির ইহাই 'গুপ্ত বিজ্ঞান'! রূপের মধ্যে 'অরূপ' দর্শন, ও অরূপের মধ্যে একত্বের অনুভূতি—ইহা কোন-না-কোন মতে প্লেটো এবং জেনোফনের মধ্যে, আলেক্সান্দ্রিয়ার ফাইলোর মধ্যে, প্লোটিনাশ, পরিফিরী ও প্রোক্লাসের মধ্যে, ইয়োরোপের আধুনিক দর্শনগুরু স্পীনোজা ও তাঁহার শিষ্য (জর্ম্মনদার্শনিক) ফিক্‌টে শেলীং-শোপেনহর-হেগেল প্রভৃতির মধ্যে আসিয়া গিয়াছে; নানারূপে ব্লেক, ওয়ার্ডসোয়ার্থ-শেলী, এমিলী ব্রণ্টী ও কবেণ্ট্রী প্যাট্‌মোর প্রভৃতি কবিগণের মধ্যেও আসিয়া গিয়াছে। অবশ্য, সত্যের অস্পষ্ট এবং খণ্ড ধারণা; অনেক সময়, কেবল সত্যের ঈষারা, ক্ষণপ্রভা এবং ক্ষণাভাস। তবে, উহার 'স্বরূপ'দৃষ্টি, সে পথে সুস্থির প্রয়াণ বার্ত্তা ও পথগতির পরিচয়পদ্ধতি কেবল ভারতবর্ষের বৈদান্তিক মীষ্টিক্‌গণের মধ্যেই শিষ্যপ্রশিষ্যক্রমে চলিয়া আসিয়াছে। এদেশে স্মরণাতীত

যুগের এই অপৌরুষেয় 'এক-বিজ্ঞান'! অথচ, এ যাবৎ মনুষ্যের দর্শন বা বিজ্ঞান 'কার্য্যকারণ', তত্ত্বের বিচারে এবং ভূয়োদর্শনে ইহাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ জ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই। আধুনিক কালে জড়বিজ্ঞানের আক্রমণে পৃথিবীর সর্ব্বত্র 'জগৎ হইতে পৃথগীশ্বর' তত্ত্ব বা 'স্বর্গস্থ ঈশ্বর' বাদ এবং বহির্ম্মুখ ভক্তের 'গোলোক পতি' বা 'কৈলাসেশ্বর' আদর্শ একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে! কোন দার্শনিক বলিয়াছেন, "The deist's God appears to be nowhere"। আধুনিকের 'বিজ্ঞান'ও ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় 'এক'তত্ত্বের দিকেই চলিতেছে। জড়বাদের আশ্রয়দুর্গ, বহুগর্ব্বিত, প্রাচীন 'পরমাণু বাদ' বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই বিধ্বস্ত হইয়াছে। 'ইলেকট্রণ' বাদীরাও ভারতের অধ্যাত্মসাধকগণের 'এক শক্তি'র দিকে—উপনিষদের 'প্রাণ ও রয়ি'তত্ত্বের দিকে—শাক্তগণের "আধারভূতা জগত স্তমেকা"র দিকেই অগ্রসর হইতেছেন! এই Monism! ইহা চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক গণেরও 'তত্ত্ব এবং ধর্ম্ম' না হইয়া পারিতেছে না। (১)

(১) আগেকার জড়বাদী বৈজ্ঞানিকগণের প্রধান অবলম্বন ছিল 'পরমাণু'। জড়পরমাণুকেই জগতের শেষতত্ত্ব, ও কারণ ঘোষণা করিয়া তাঁহারা চিরকাল অধ্যাত্ম-বাদকে আক্রমণ করিয়াছেন। একালের বৈজ্ঞানিকগণ 'পরমাণুবাদ' ধ্বংস করিয়া দেখাইতেছেন যে, পরমাণু স্বয়ং শক্তির (বৈদ্যুতিক শক্তির) ক্রিয়াফল। রামজে, ফ্লেমীং ক্রুকস, ওয়াট্সন, লজ, রিচার্ডসন্ প্রভৃতি ইহা অবিসংবাদিত ভাবেই দেখাইতেছেন। লজ ও ক্রুকস্ প্রভৃতি ত একেবারে 'বিজ্ঞান'ক্ষেত্রেই অধ্যাত্মবাদী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন! লজ বলেন—The modern tendency of Science is towards the invisible kingdom; the more we exhaust the Physical, the more shall we find ourselves pushed into the other terrritory. তাঁহারা এক মাত্র 'প্রাণশক্তি'কেই সর্ব্বজগতের 'কারণ' রূপে উপসংহার করিয়াছেন। ডাক্তার বন্‌ষ্ট্রান্ Origin of Chrystal বিষয়ে গবেষনা করিয়া বলেন, একমাত্র 'প্রাণ-শক্তি'ই পদার্থ মাত্রকে গঠিত করিতেছে। "I have been compelled to believe from the way in which 'Life force' forms chrystals and from all the attendant phenomena, that all other force—Heat Light, Chemical

এ'সূত্রে ভারতীয় মীষ্টিকগণের আর একটী কথাও বলিয়া যাইতে হয়; না বলিলে কেবল আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে, তাহা নহে; তুরীয় বিষয়ে ভারতীয় ঋষির চূড়ান্ত কথা এবং প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে জীবের সাধারণ বুদ্ধির বিবাদস্থানের কথাটাও অকথিত থাকে। এই 'তুরীয়'কে পাওয়ার বা জীবের চূড়ান্ত স্বাধীনতা লাভের 'উপায়' কি? এ প্রশ্নটীর উত্তর যেমন শ্রৌত দর্শনের, তেমন মানবজীবনেরও চূড়ান্ত কথা রূপেই দাঁড়াইতেছে। লোক প্রচলিত 'ধর্ম্ম' নামক সকল ব্যাপারের (গুপ্ত বা প্রকাশ্য) চরম বার্ত্তাটিও এস্থলে! 'গুপ্ত' বলিতেছি, কেননা অনেক ধর্ম্মে প্রকাশ্যতঃ 'চূড়ান্ত প্রাপ্তি'র কথা প্রকৃত দার্শনিকভাবে উঠে নাই। উহাদের

Force, Electricity Cohesion are but different manifestations of Life Force. Chicago Tribune 1897.

এ "Life Force"ই ত ব্রহ্মবাদীগণের 'প্রাণ ও রয়ি'। ব্রহ্মের সৃষ্টিলীলার আদি বিকাশ! পরম মিষ্টীক' শঙ্করের কথাগুলি চিন্তা করুণ—"কারণস্য আত্মভূতা শক্তিঃ। শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যম্"। (২-১-১৮ ভাষ্য) আবার, "ন চ অনেকাকারা শক্তয়ঃ শক্যা কল্পয়িতুম্ প্রলীয়মান মপি চেদ্‌জগৎ শক্ত্যবশেষমেব প্রলীয়েত, শক্তিমূলমেবচ প্রভবতি। ইতরথা আকস্মিকত্ব প্রসঙ্গাৎ" [শা-ভাষ্য ১-৩-৩০]

প্রাচীন দার্শনিক ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক সুতরাং সকলেই 'এক'তত্ত্বের কথাই বলিতেছেন! চিৎ ও অচিৎ উভয় একতত্ত্বেরই বিকাশ। প্রত্যক্ষদৃষ্টির এবং আপাত দৃষ্টির সম্পূর্ণ বিপরীতে, সর্ব্বতত্ত্বের মধ্যে ওই 'একতত্ত্ব' উপলব্ধি করাই ত বৈদিক দর্শনের চূড়ান্ত বার্ত্তা! শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা যাহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন—

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম॥
যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যাচেতসঃ॥

বিংশশতাব্দীর বৈজ্ঞানিক লজ্‌ ও মা'য়ার প্রভৃতি ভারতীয় প্রাচীনঋষির সেই সত্য (বিশ্বের আত্মময়তা এবং আত্মার জগন্ময়তাই) প্রমাণিত করিতেছেন। ব্যাপার এই যে, লজ্‌ যখন নিরেট জড়তা বা physical ক্ষেত্রে একএকটা আবিষ্কার করেন তখন জড়বাদী জগৎ 'অদ্ভুত শক্তি' ও 'অদ্ভুত আবিষ্কার' বলিয়া সাধুবাদ দিতে থাকেন,

শ্রৌতদর্শনের মহাতত্ব; কেবল ব্রহ্মোপাসনা নহে—ব্রহ্মসাধনা! (ক) উহা লইয়াই 'উপনিষৎ' এবং উহার গুরুত্বেই উপনিষদের অতুল মাহাত্ম্য! যে উপনিষৎ শব্দের অর্থ, গুপ্তবিদ্যা—Mysticism! আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি বহু—অনন্ত বহুত্ব! তুমি, আমি, সে—অপ্রমেয় বহু! তুমি নাকি বলিতেছ, সমস্তই 'এক'! আরও বলিতেছ, "য এবং বিদুরমৃতা স্তে ভবন্তি"! আমিও অন্য 'জ্ঞান' ত চাহিনা; 'অপরা বিদ্যা' চাই না; "যেনাহং নামৃতা স্যাম্, কিমহং তেন কুর্য্যাম্?"। অতএব, "শিষ্যস্তেহং, শাধি মাম্ ত্বাং

(ক) এস্থলে, সত্যপ্রকাশের উদ্দেশ্যে একটা অপ্রীতিকর কথাই লিখিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছি। ইয়োরোপীয় কোন গবেষক—মোক্ষমুলর, ম্যাক্‌ডোনাল্‌ড, কীথ প্রভৃতি কেহই, কোন পণ্ডিতই বৈদিক যজ্ঞবাদ বা উপনিষদ্‌ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ ধারণা করিতে পারেন নাই; কুত্রাপি পারিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে পারিতেছিনা। তাঁহারা খ্রীষ্টশিষ্য খ্রীষ্টান; ভজনবাদী, দ্বৈতবাদী এবং "জগৎ হইতে পৃথগীশ্বর" বাদী খ্রীষ্টান। তাঁহাদের চিত্ত ইহুদীর একেশ্বরবাদের দাস্য বা উহার মাহাত্ম্য প্রভাব হইতে কিঞ্চিমাত্রও 'মুক্ত' হইতে পারে নাই। বৈদিক ধর্ম্মকে Animism, Naturalism, Theism, Henotheism বা Kathenotheism প্রভৃতি তাঁহাদের জানা কথার কোনটার অন্তর্ভুক্ত করিবেন সে দিকেই সকলে প্রকাণ্ডভাবে চিন্তিত ছিলেন। ঋক্‌বেদের ঋক্‌গুলি যে Prayer নহে, Psalm ও নহে, উহাদের নাম যে 'মন্ত্র'! বৈদিক 'কর্ম্ম কাণ্ড' প্রণালীও যে worship নহে, সাধারণে প্রচলিত আদর্শের 'পূজা' নহে, 'উপাসনা' বা 'অর্চ্চনাও নহে, সে দিকে কেহ যথার্থ চিন্তা করিয়াছেন বলিয়া কোন মতেই মনে করিতে পারিতেছিনা। ধর্ম্ম জগতে এই একটি 'নূতন ধর্ম্ম' আবিষ্কৃত হইলে, উহাকে তাঁহাদের জানা Ism এবং Ityর কোন কোঠায় ফেলিবেন, উহার জন্যই কেবল ব্যস্ততা! বেদ 'ব্রহ্মাত্মবাদী' ঋষির 'কর্ম্ম কাণ্ড' বা সাংসারিক 'কাম্য সাধনা'র ব্যাপার; "দেবাত্ম শক্তিং স্বগুণৈ র্নিগূঢ়াং" যাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন বা আত্মা, ব্রহ্ম ও জগৎ ব্যাপারকে মূলে একতত্ত্ব বলিয়া যাহারা জানেন ও বিশ্বাস করেন, সে রকম লোকেরই সাংসারিক 'অর্থ' সাধনার ব্যাপার! বাহ্যিক অর্থেই অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের প্রয়োগ! সে জন্য, প্রকৃত আত্মশক্তির অপচয় ও অপব্যয় বলিয়াই 'যজ্ঞ' ক্রিয়া অধ্যাত্মবাদীর নেত্রে ন্যূনাধিক নিন্দিত ছিল; চিরকাল ছিল। জাগতিক অভীষ্ট লাভ করিতে হইলে ব্রহ্মাত্মবাদী ঋষি (যদিও স্বার্থ কামনায় কিছু করা সকলেরই হেয় ছিল) যাহা করিতেন; তাহাই 'যজ্ঞ' বা ব্রহ্মাত্ম-শক্তির উদ্বোধন ও প্রয়োগ। ঋষি নিজকে 'দেবাত্মভাবিত' করিয়া স্বয়ং বাঞ্ছিতক্রিয়ার অনুষ্ঠান

প্রপন্নম্" ; দাও ত আমাকে দেখিয়ে তোমার সেই 'এক' !" এ 'জিজ্ঞাসা' হইতেই ত উপনিষৎ ! একান্তে, গুরু-পাদান্তে উপনীত শিষ্যের প্রতি গুরুর উপদেশ এবং শিষ্যের অবিদ্যার ধ্বংস ! উহা কেবল 'একেশ্বর বাদ' নহে ; বুদ্ধির 'উদয়' সম্পন্ন কোন মনুষ্যের পক্ষে, বহু ইন্দ্রিয় ও বহু উপাদান-পূর্ণ দেহের মধ্যগত 'একাত্মা' অনুভবের সহজ ধর্ম্মেই 'জগতের একেশ্বর' বুদ্ধি ও একপ্রাণতায় বিশ্বাস একেবারে 'সহজ প্রাপ্তি'—যদিও উহা 'ঘোলাইয়া'

(বা অভিনয় করিতেছেন) ; ক্রিয়া ফলকে 'চরু'রূপে গ্রহণ বা উপভোগ করিতেছেন। অদ্বৈত-বাদীর এই mystic ব্যাপার ! তিনি আত্মকেন্দ্রে দাঁড়াইতে পারিলেই বিশ্বকেন্দ্রে 'যাওয়া' বা স্থিতি লাভ করা হইবে, এবং তাহার অনুষ্ঠিত ক্রিয়াই বিশ্বতন্ত্রে অনুষ্ঠিত ও প্রার্থিত ফলপ্রসূ হইবে, ইহাই ঋষির 'বিশ্বাস' বা Theory— যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন। যে শক্তি বিশ্বময়ী, বিশ্বরূপিণী, তাহাই ত 'আত্ম'শক্তি। ঋষি যখন যে নামে, যে শক্তির উদ্বোধন করিতেছেন, তাহাকে ঐকান্তিক ভাবে, একচিত্তে এবং এক প্রাণেই করিতেছেন ! তদ্দৃষ্টে খ্রীষ্টান পণ্ডিত অমনি ডাকিয়া উঠিবেন—এই ত Henotheism—Kathenotheism—একদা একেশ্বর বাদ। ঋক্ বেদের মন্ত্রগুলির কখন রচনা করিয়াছিল, ঐসমস্ত উপনিষদের পূর্ব্বকালবর্ত্তি না সমসাময়িক সে বিষয়ে মাথা ঘামাইতে চাই না। কিন্তু, ইহা স্থির যে উহাদের যখন সংগ্রহ হইয়া 'ব্যাস' হইয়াছে (তাহাও বুদ্ধজন্মের বহু পূর্ব্বে এবং 'ব্রাহ্মণ' যুগে) তখন একটা নির্ব্বাচন-রীতিই অনুসৃত হয়। 'এয়ী'-পরিত্যক্ত ঋক্গুলিই পরবর্ত্তিকালে অথর্ব্ববেদে (চতুর্থবেদে) সংগৃহীত হইয়াছে। উক্ত নির্ব্বাচনের মূল পদ্ধতি বা লক্ষ্য কি ছিল, আদিম ব্যাসের আদর্শটাও কি ছিল, তাহা ত ঋক্ বেদের প্রথমসূক্তের, প্রথম মন্ত্রটাই একেবারে উদ্ঘাটিত করিতেছে ! সম্মুখে অগ্নিনামক একটী প্রত্যক্ষোজ্জ্বল পদার্থ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে ; ঋত্বিক্ উপবিষ্ট ; শোলজন পুরোহিত উপবিষ্ট ; যজ্ঞীয় উপকরণ পদার্থ 'রত্ন'ধাতু প্রভৃতিও স্তরেস্তরে সজ্জিত ! হোতা মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন—"অগ্নির উদ্বোধন করি। কেমন সে অগ্নি ?—যিনি পুরোহিত, যিনি আবার যজ্ঞেরই দেবতা, যিনি আবার ঋত্বিক্, যিনিই আবার হোতা, যিনি আবার আমাদের এই প্রত্যক্ষ রত্নধাতু !" এত সমস্ত বহুরূপে যিনি প্রত্যক্ষ হইয়াছেন, সেই 'এক' অগ্নিকেই আবাহন ও অবলম্বন করি !" এস্থলেই ত সমগ্র ঋক্সংহিতার মুখচাবী—Key Note, একত্ববাদ ! এ অর্থের যাহা সমর্থন করে না, বা যাহা এ অর্থের বিদ্রোহী, অন্ততঃ সেরূপ কোন ঋক্ যে ব্যাসকার তাহার 'সংহিতায়' স্থান দেন নাই, সে কথা মনে রাখিয়া এবং ব্যাসের সে 'দৃষ্টিস্থান' হইতেই ঋকসংহিতার সমগ্র সূক্তকে দেখিতে হইবে ! উদ্ধৃত মন্ত্রার্থ চিন্তা করুন। ও কেমন Henotheism বা Theism ! উহা কি ভারতের

যাইতে পারে। এদেশ সে প্রয়োজন কদাপি অনুভব করে নাই ; ঈশ্বর এক-না-দুই সেরূপ প্রশ্ন বা সংশয়-মীমাংসার কোন প্রয়োজন এ বিশাল দেশের হাজার হাজার বৎসরের বেদবেদান্ত-পুরাণ-তন্ত্র সাহিত্যের কুত্রাপি অনুভূত হওয়ার প্রমাণ নাই। সমস্ত যে 'একতত্ত্ব' তাহাই ভারতের, অন্ততঃ বেদ-ব্যাসের পূর্ব্বগত কালের মহাবিদ্যা এবং উহাই বিশ্বের 'বিজ্ঞান' ক্ষেত্রে ভারতের 'মহাদান'। সাহিত্যের 'আদারবেপারী'র পক্ষে জাহাজের সে খবর দেওয়া, জীবকে ভাঙ্গিয়া-বুঝাইয়া-দেখাইয়া দেওয়া কোনমতে সম্পর্কিত কিংবা সুসাধ্য 'কর্ম্ম' নহে। তবে, এ স্থানে বলিয়া যাইতে হয়

সেই 'এক'দৃষ্টি বা অদ্বৈতবাদ নহে—সর্ব্বের মধ্যগত একে 'দৃষ্টি'। অথচ, পাশ্চাত্য পণ্ডিত বুঝিতে চাইবেন না, এই সমস্ত মন্ত্রে প্রার্থনার কোন cringing, 'নাকি সুর,' বা কোন whining নাই কেন? উহাদের ভিক্ষাতেও এতটা জোর কিসে? আবার, সময় সময় ইন্দ্র অগ্নি বায়ু বরুণ প্রভৃতিকে ঋষি একেবারে 'ভ্রাতা' বলিয়াই সম্বোধন করিতেছেন, যজ্ঞক্রিয়াকেও একবারে দেব-নরের পরস্পর 'শক্তি আদান প্রদান' ও 'পরস্পর ভাবনা'র রূপেই দেখিতেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের কবিগণও যজ্ঞ ক্রিয়াকে দেব-মানবের মধ্যে কেবল 'অন্যোন্যকৃত্য' রূপেই দেখিতেছেন কেন? এটী কেমনতর prayer বা worship? কেবল মনুষ্যভিক্ষুকের কতকগুলি prayer বা প্রার্থনা হইলেই (যাহা সকল মানুষেই করে এবং সাধারণ কবিমাত্রেই রচনা করিতে পারে) উহাদের এত আদর হইল কেন? হাজার হাজার বৎসর পরম দুর্লভ এবং মহার্ঘ বোধে একটা মহাজাতি উহাদিগকে মহাযত্নে একেবারে বুকের মধ্যেই রাখিয়া দিল। এমন রাখিয়া দিল যে, হাজার হাজার বৎসরে উহাদের 'ক' অক্ষর কোথাও বেশকম হয় নাই! ব্রাহ্মণ বলিয়া একটা অনড় অচল সংপ্রদায়ই সমাজ মধ্যে দাঁড়াইয়া গেল, উহাদের প্রয়োগে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া একটা মহাবিস্তৃত কার্য্য বিধির গ্রন্থই গড়িয়া উঠিল—"শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষম্" প্রভৃতি বিস্তারিত বিদ্যার ব্যাপারই জমিয়া গেল। বেদপাঠ মনুষ্যনাম উপার্জ্জনেরর পক্ষে অপরিহার্য্য ও মনুষ্যত্বপদবীর 'সদরদ্বার' রূপে দাঁড়াইয়া গেল। কেবল PriestCraft এবং 'পুরোহিতি ভেল্কী' হইতেই কি একটা জাতি এরূপ আত্মবঞ্চনা করিতে পারে? অন্য জাতির সম্পর্কে এরূপ নিশ্চিন্ত, নিরাশঙ্ক অশ্রদ্ধা কেবল খ্রীষ্টশিষ্য 'গোঁড়া' ব্যতীত অন্যের পক্ষে সম্ভবপর নহে। অপরজাতি ও পরচরিত্রের বিষয়ে এরূপ গোঁড়ামী ও অশ্রদ্ধা যে খ্রীষ্টানীর হাড়ে-মাষে ঢুকিয়াছে, সাহিত্য কিংবা পাণ্ডিত্য গবেষণার ক্ষেত্রেও যে উহা হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছে না—এ অভিজ্ঞতা ভারতীয় এবং এসিয়াবাসী মাত্রের পক্ষেই ত নিয়ত হইয়া

"তমেব বিদিত্বা"র বিদ্ ক্রিয়ার অর্থ, একদা 'জানা—পাওয়া—হওয়া'। ঋষি 'একগুলিতে তিনটী বাঘই' যেন মারিয়াছেন! তৃতীয়দর্শনের ক্ষেত্রে জানা, পাওয়া এবং হওয়া নিদানতঃ একার্থক ব্যাপার না হইয়া পারে না; সে ক্ষেত্রে স্বাধীনতা, মুক্তি এবং প্রাপ্তিও একপদার্থক না হইয়া পারে না। ব্রহ্মকে 'জানা'র অর্থ কি? যিনি এই 'জ্ঞান'রূপ জগৎ'সৃষ্টি'র জ্ঞাতা, যিনি হওয়া-পাওয়া-করা প্রভৃতি ক্রিয়ারূপী জগৎব্যাপারের 'কর্ত্তা', ইংরেজী কথায় যিনি এ জগতের Subject, তাঁহাকে object রূপে, 'জ্ঞেয়'রূপে জানা সম্ভব কি? এজন্য যাজ্ঞবল্ক বলিয়াছেন, "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ?" 'জ্ঞাতা' 'জ্ঞেয়' হইলেই খণ্ডিত হইলেন; তাঁহার অনন্তত্ব বা পূর্ণত্ব আর

দাঁড়াইয়াছে। 'পৃথগীশ্বর' বিশ্বাসী পণ্ডিত নিজের অভিমানেই বিভোর, ভারতের বেদকে Heno-theism বলিয়া নাম দিতেছেন—উহাই যেন কত দয়া! আবার এরূপ বহুত্ব বিশ্বাসী বেদের আবহাওয়ার মধ্যে 'একত্ব'দর্শী উপনিষদের কি করিয়া জন্ম হইল, তাহা চিন্তা করিয়াই অনেকানেক পণ্ডিত যেন ওর পান নাই। কখনও চিন্তা করিবেন না যে, স্মরণাতীত কাল হইতেই বেদ-উপনিষদের বিশেষণ হইয়াছে "কর্ম্ম কাণ্ড" ও "জ্ঞান কাণ্ড"। একই 'ব্রহ্মাত্ম' বাদী ঋষির সংসারার্থের ও পরমার্থের ব্যাপার—এ'টুকুই পার্থক্য।

আসল কথা, জগতের বর্ত্তমানজীবিত কোন রিলিজনের সঙ্গে এই 'জ্ঞান কাণ্ডী' ও 'কর্ম্ম কাণ্ডী' ধর্ম্ম 'ব্যাপার' যে মিলে না, উহার পদবী টুকু সুতরাং কি, এবং আধুনিক জগতের সর্ব্বধর্ম্মের তুলনাবাজারে সত্যমূল্য বিচারের ক্ষেত্রে বৈদিক ধর্ম্মের কোন স্বতন্ত্র মূল্য বা পদবী আছে কি না সে বিচার কোন পণ্ডিত (স্বদেশী বা বিদেশী প্রাজ্ঞ বুদ্ধি Theist কিংবা Deist) করিতেই চাহিবেন না।

মহাভারতে পবননন্দন ভীমকে বলিতেছেন, সত্যযুগে ঋষিগণ ব্রহ্মসদ্ভাব বাদী ছিলেন; প্রাচীন গ্রন্থাদিতে সর্ব্বত্র এ উদ্দেশ এবং বেদের বিষয়ে এ অভিমত পাইবেন। সে কথাটী বুঝিয়া লইতে অনেকেরই ইচ্ছা নাই। যাহোক, এই বেদ ও উপনিষৎ এমন একটা বিগত এবং দূরবিলুপ্ত জাতির 'ধর্ম্ম' যাহাদের আত্মশক্তি, আত্মক্ষমতার অধিকার এবং মনীষার বহর আমাদের এ' কালের Theism বা Deism এ'র মুষ্টি মধ্যে ধরা' দেয়না। বলিতে পারেন, উহা অন্ধযুগের কতকগুলি বিশ্বান্ধ এবং 'একোন্মত্ত' জীবের 'ধর্ম্ম'।

রহিল না ; সুতরাং জ্ঞাতাকে জ্ঞেয় রূপে বা কোন 'ক্রিয়া'র 'কর্ম্ম'রূপে পাওয়ার কল্পনাও ভ্রমাত্মক। এজন্য, শ্রুতি বলিছেন জ্ঞাতাকে জ্ঞাতা হইয়াই 'জ্ঞাতা'স্বরূপে পাইতে, বুঝিতে বা জানিতে হইবে ; আত্মাকে 'আত্মতা' লাভ করিয়াই প্রাপ্ত হইতে হইবে। উহাতেই শ্রুতির সিদ্ধান্ত "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"—যাহার মর্ম্ম, "তৎ ভূত্বৈব তৎ বেত্তি"।

object কি করিয়া subject হইতে পারে, জ্ঞেয় কি করিয়া জ্ঞাতা হইতে পারে ? বলিতে পারি এ স্থলেই ভারতবর্ষের সকল ধর্ম্ম আদর্শের, ধর্ম্মচেষ্টার এবং সকল জ্ঞানগরিমার গৌরীশঙ্কর ! কালেকালে, যুগে যুগে এ দেশের মানুষ ঐ চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। সত্যকে, সত্যের নিত্য অনন্ত বা পূর্ণ স্বরূপকে যখন তর্কযুক্তি বা অনুমানে বুঝিয়াছে, কিংবা 'দর্শন' করিয়াছে, অথবা নিজের হৃদয়গুহায় যখন উহার 'আভাস' লাভ করিতে এবং তাহা 'বিশ্বাস' করিতে পারিয়াছে, তখন হইতে একেবারে সর্ব্বভোলা হইয়াই এদেশের লোক হাজারে হাজারে, লক্ষে লক্ষে সেদিকে ছুটিয়া যাইতেছে ! ইহাতেই বুঝিব, সত্যপিপাসা কিংবা দর্শনচেষ্টা এদেশে কেবল বুদ্ধিবিলাস রূপে Intellectual Exercise বা Sentimentalism রূপে থাকিয়া যায় নাই। এ'রূপে কোন লক্ষ্যে সর্ব্ববিস্মৃত হওয়া বা একান্ত হওয়ার নাম যদি সংসারে 'মরণ' ধরা' হয়, তা হইলেও বলিতে পারি—এ দেশের অগণিত লোক নিজের বিশ্বাস বা দর্শনের লক্ষ্যপথে 'মরিতে' পারিতেছে। দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, কবি, যোগী, ভোগী, রাজা (মহারাজা হইতে মহাভিখারী)—সকল শ্রেণীর লোকই স্মরণাতীত কাল হইতে এই 'গৌরীশঙ্কর' যাত্রারূপ 'মৃত্যুচেষ্টা' ও মরণতৃষ্ণার বশবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে ! রাজা রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়া, সংসারী অন্যবিস্মৃত ও সর্ব্বত্যাগী এবং একান্ত হইয়া এ মৃত্যুপথকেই 'অমৃত পথ' বিবেচনায় ছুটিতেছে।

এরূপ 'যাত্রা' বা প্রয়াণের প্রণালী কি ? ঋষি বলিতে পারেন, জীবের আত্মপ্রকৃতির অদৃষ্টভেদে, "ঋজুকুটিল নানা পথজুষাং" রুচিভেদে উহার অগণিত প্রণালী ; কোন Absolute বা 'সর্ব্বভদ্র' প্রণালী নাই। ঋষি

সংসারক্ষেত্রে পরম 'সমাজ তন্ত্রী' (বা ব্যক্তিত্বের সংযমবাদী) হইলেও, অধ্যাত্মক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের ঐকান্তিক বিকাশই তাঁহার পরমলক্ষ্য। উহার নাম, 'জীবের স্বধর্ম্মগতি'। এই 'গতি'পদ্ধতির নাম দেওয়া হইয়াছে 'একতত্ত্বে যোগ'—Union বা Unitive State। যোগে জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এক হইয়া যায়; দ্রষ্টা ও দৃশ্য 'এক' হয়। এদেশের যোগি গুরু পতঞ্জলি বলিয়াছেন, যোগ "দ্রষ্টুঃ স্বরূপে অবস্থানম্"। তিনি অষ্ট প্রকার যোগপথের নির্দ্দেশ করিয়াছেন! গীতায় শ্রীকৃষ্ণ জীবের জ্ঞান-ইচ্ছা-ভাব বৃত্তিভেদে উহাকে তিনভাগে সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন—জ্ঞান, কর্ম্ম, ও ভাবের (ভক্তি) পথে প্রয়াণ। (ক) সর্ব্বজীব যাহাতে আপন অন্তরাত্মা ও অন্তশ্চরিত্রের 'স্বধর্ম্ম'পথে, অশিথিলভাবে পরমার্থপ্রয়াণী হইতে পারে, আপন প্রকৃতিগত অদৃষ্টের শ্রেয়ঃপথ লাভ করিতে পারে, সে উদ্দেশ্যেই অধিকার ভেদে ব্রহ্মগতির বিভিন্ন প্রকারভেদ। সকল 'যোগে'রই সুতরাং গৌণমুখ্য লক্ষ্য চূড়ান্তের সেই 'এক'বিজ্ঞান—দার্শনিক পরিভাষায় যাহার নাম জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতার 'একত্বপদবীর সমাধান'। অতএব

(ক) মধুসূদন সরস্বতী বলিতেছেন, গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় মধ্যে জ্ঞানভক্তি ও কর্ম্মের জন্য সমভাবে ছয়টী করিয়া অধ্যায় নিযুক্ত আছে। এরূপ গোঁড়ামিহীন সমন্বয় দৃষ্টিই গীতার পরম বিশেষত্ব। 'হিন্দু ধর্ম্ম' নামক প্রতিষ্ঠানটীর এস্থলেই দোষ এবং গুণ—উভয়। এদেশে ব্যক্তিগত 'দীক্ষা' ব্যতীত 'ধর্ম্ম' নাই; দীক্ষিত হিন্দু মাত্রেই স্বীকারতঃ অদ্বৈত-বাদী—মীষ্টিক। অথচ, শতসহস্র প্রকারের মূর্ত্তিপূজা ও 'কাম্য'লাভ উদ্দেশ্যে উপাসনা-অর্চ্চনা প্রভৃতিকেও 'অধিকার' আদর্শে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে! অদ্বৈতবাদী জানেন, 'বিজ্ঞানমূলা সৃষ্টি বলিয়া, ইন্দ্রিয়ার্থের বিভাবনা মূলক জগৎ বলিয়া বাহ্যিক ক্রিয়া-কর্ম্ম এবং পূজা-অর্চ্চনা প্রভৃতিরও ন্যূনাধিক 'মানসী গতি' এবং জ্ঞানধর্ম্মতা সিদ্ধ হইয়া থাকে। "সর্ব্বকর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে"। এ আদর্শের বশবর্ত্তী বলিয়াই হিন্দুধর্ম্ম কোন 'ধর্ম্ম'কে বা উন্নত কর্ম্মসাধনাকেই হিংসা করে না; পরধর্ম্মকেও আক্রমণ করে না। মানুষ নাস্তিক বা আস্তিক যাহাই হউক, উন্নত কর্ম্মাবলম্বী হইলেই তাহার 'ধর্ম্মগতি' অক্ষুন্ন থাকে, ইহা অধ্যাত্মবাদী Mystic মাত্রেরই বিশ্বাস। তাহার মতে জগৎপ্রমূর্ত্ত ঋত, সত্য বা ধর্ম্মের অপর নামই ঈশ্বর বা ভগবান্—ঐ সমস্তই জগতে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা প্রতিমা।

ব্রহ্মাত্মবাদীর অনুসৃত 'যোগ'পথের মূলতত্ত্ব কি? দ্রষ্টা ঋষি বলিতেছেন, বাহিরের কোন পথ নাই—তোমার আত্মার পথই 'পথ'; তোমার গুহা-পথেই বিশ্বের চূড়ান্ত কেন্দ্র-পথ। যদি ধরিতে পার', তোমার আত্মকেন্দ্রই নিখিল বিশ্বের কেন্দ্র! তোমাকে সংবিৎমধ্যে—তোমার Cousciousness কেই—বিশ্বজ্ঞাতা স্পর্শ করিয়া আছেন, বিশ্বভাবন তুমিই হইয়াছেন; ও সূত্রেই তোমার গতিপথ—সে-ই তোমার একমাত্র ঋজুপথ। এ' সংসার ভিতর হইতে, Spirit কেন্দ্র হইতেই, বহির্ম্মুখে প্রসারিত হইয়াছে; এ সৃষ্টি অন্তর হইতেই বাহিরে আসিয়াছে। অতএব যে সূত্রে 'আগমণ' সে সূত্রেই 'গমন'—প্রয়াণ। জ্ঞানে-কর্ম্মে-ভাবে সমগ্র জীবনটার কেন্দ্রগতি ও কেন্দ্রে স্থিতি—উহার নামই গীতার "ব্রাহ্মী স্থিতি"। বহির্ম্মুখে অর্চ্চনা বা উপাসনা করিয়া কোটিকোটি বৎসর চলিলেও তুমি হয় ত কেন্দ্রকে 'স্পর্শ' করিতে পারিবেনা; আত্মার ভাগবতী লীলাময় অনন্ত জগদরণ্যে হারা'হইয়া যাইবে; কোনদিকেই কূলকিনারা পাইবে না। ভিতর পথে যেন একটি সামান্য পর্দ্দামাত্রের ব্যবধান! বিশ্বের সৃষ্টিরহস্য, তোমার জীবনমরণ ব্যাপারের চূড়ান্ত রহস্য, এবং তোমার জীবনবন্ধনের মূল সূত্রই অন্তর্মুখে! শ্রুতি সকল কথার 'এককথা'য় এই 'পথের খবর' শেষ করিয়াছেন—

> পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভু
> তস্মাৎ পরাক্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
> কশ্চিৎধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ
> ব্যাবৃত্ত্য চক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥

বলিতে পারি, কঠোপনিষদের এ একটী শ্লোকের মধ্যে বৈদিক ধর্ম্মের মীষ্টিসিজম, বিবর্ত্তবাদ এবং অধ্যাত্মসাধন পদ্ধতির বহুশাখা-বিস্তারী মহাবৃক্ষ বীজ-ভাবে নিহিত আছে! এ আদর্শ গতিকেই অদ্বৈতবাদী গণের মধ্যে একই 'ব্রহ্ম'সাধন উদ্দেশ্যে শত শত সংপ্রদায়—'নেতি নেতি' অথবা 'ইহেতি ইহেতি' তত্ত্বের সাধক, 'সেশ্বর' বা 'নিরীশ্বর' পদ্ধতি—জ্ঞানকর্ম্ম ও ভক্তির বিভিন্ন পন্থা। অজ্ঞানতার রহস্য—ইন্দ্রিয়গুলির পরাঙ্মুখগতি

বা বিবর্ত্ত-গতি; সুতরাং ব্রহ্মে বা আত্মকেন্দ্রে 'ব্যাবর্ত্তন'ই 'জীবের' সাধনা। (১) 'আত্মবোধ' বলিতেছেন—

(খ) বৈদিক ঋষির Psychologyতে, যাঁহারা জগতের (নিদান ও উপাদান) কারণ বিষয়ে "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" বাদী তাঁহাদের মনোবিজ্ঞানে, জ্ঞান ব্যতিরিক্ত অপর কোন মনোবৃত্তি নাই। তাঁহাদের মতে 'ভাব' যেমন জ্ঞানমূলক ক্রিয়া; 'কর্ম্ম'ও জ্ঞানমূলক ক্রিয়া; সুতরাং তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম প্রাপ্তির একমাত্র 'পথ' জ্ঞান বা বিজ্ঞান। 'বিজ্ঞান' তত্ত্বের মধ্যে শ্রদ্ধা বা ভক্তি এবং কর্ম্মাদর্শও অন্তর্ভুক্ত আছে। এজন্য ঋষি বলিতেছেন—

"তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"॥

"দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভি" প্রভৃতি পন্থানির্দ্দেশ তাঁহাদেরই বার্ত্তা। কিন্তু, জনসাধারণ আর ঋষি, জ্ঞানী বা 'বিজ্ঞান'শক্তিধর নহে! বেদের কর্ম্ম কাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড উভয়ই 'ব্রহ্মাত্ম-বিজ্ঞানী' ঋষিগণ করিতেছেন। জন সাধারণ 'জ্ঞান'ও বুঝে না, 'একংসৎ' ও বুঝে না—বুঝিতেও চাহে না। তাহারা সংসারের রোগ শোক দুঃখ-তাপে কোন 'ব্যক্তি'র নিকট আবেদন-নিবেদন করিতে এবং প্রতীকার প্রত্যাশা করিতে চায়। 'জ্ঞানী' কিংবা পুরোহিত-প্রতিনিধির সম্পর্কদুরে ব্যাক্তিগতসম্পর্কের 'উপাস্য' প্রয়োজন উহা হইতেই দাঁড়াইয়াছে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রয়োজন হইতেই সুতরাং 'ব্যক্ত ব্রহ্ম' (manifested) সগুণ ব্রহ্ম বা 'ঈশ্বর' যেমন আর্যধর্ম্মে স্বীকৃত হইয়াছে, তেমন খ্রীষ্টানাদি সর্ব্ব দেশের লৌকিক ধর্ম্মেই 'ঈশ্বর'বাদ সহজে আসিয়া গিয়াছে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রয়োজন হইতেই 'ভক্তি' নামক 'ভাব' অধিকারের পদার্থটীর উদয়। সাহিত্যসেবক মাত্রকেই অধুনা যেমন ভারতের, তেমন মানব জগতের এই 'ভক্তি' ধর্ম্মগুলির স্বরূপ ও প্রকৃতি বুঝিয়া লইতে হয়; নচেৎ পদে পদে বিড়ম্বিত ও 'হতভম্ব' হইতে হইবে। ব্রহ্মবাদীগণও 'ব্যক্তি ঈশ্বর' স্বীকার পূর্ব্বক, উহাকে ব্রহ্মসাধনার পক্ষে উন্নত সোপানপথ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। নিয়ত মনে রাখিতে হইবে, ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে ভারতের অদ্বৈতবাদী মাত্রেই দ্বৈতবাদী ও ঈশ্বরবাদী। উহা হইতেই 'বিজ্ঞানী' ঋষির 'ধর্ম্ম'মধ্যে ব্রহ্মের তিন ব্যক্তমূর্ত্তি ও শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব প্রভৃতি 'ভক্তি পন্থা' আসিয়া গিয়াছে। উপনিষৎ ধর্ম্মের সমকালেই 'নারায়ণধর্ম্ম' ও 'পাশুপত'ধর্ম্ম প্রভৃতি ভারতে স্বীকৃত ও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বৈদিক 'শক্তিবাদ'টুকুই আধুনিক শাক্তধর্ম্মে পুরাপুরি আসিয়া গিয়া (যজ্ঞ কাণ্ডকে গৌণ করিয়া) 'পূজা' 'উপাসনা' 'প্রার্থনা' প্রভৃতির পথে

অন্যথা শাস্ত্র গর্ত্তেষু পততাং ভবতামিহ
অপি কর্ম্মসহস্রানাং কল্পৈরপি ন নিষ্কৃতিঃ।

গ্রন্থি সেইখানে—তোমার আত্মকেন্দ্রে। বলিতে পারি, স্মরণাতীত কাল হইতে এ দেশের অগণ্যসংখ্যক 'বাতুল' লোক ওই গুহাপথে এবং

জনসাধারণের ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির খোরাক যোগাইয়া গিয়াছে। আবার, মহাভারতের শান্তিপর্ব্বেই দেখা যায় "প্রবৃত্তিলক্ষণো ব্রহ্মন্ ধর্ম্মো নারায়ণাত্মক" এবং উহা ছিল 'একায়ন' ধর্ম্ম (Monotheism)। এরূপে ভক্তিবাদ বা আধুনিক আদর্শের Theism সেকালেই আর্য অদ্বৈত সাধনার পন্থায় স্থান পাইয়াছিল। খ্রীষ্টানী Faith হইতে ভারতীয় 'ভক্তির' একটু পার্থক্য এই যে, খ্রীষ্টধর্ম্মে 'বাইবেল গ্রন্থে একান্ত বিশ্বাস'ই ফলতঃ ভক্তির মুখ্য অঙ্গ; ভগবানে প্রীতি এবং প্রিয়কার্য্য সম্পাদন উহার দ্বিতীয় প্রবল লক্ষণ। ভারতীয় 'ভক্তি'তে ঈশ্বরে 'বিশ্বাস'ই ভিত্তি, তবে উহাতে কোন 'গ্রন্থ' নির্ভর' নাই; কেবল 'ভজন' প্রকৃতি, Praise বা স্তুতি-স্তাবকতা এবং 'সেবা' ও 'প্রপত্তি'গত মানুষ ব্যবহারটাই মুখ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা ঠিক যে, ভক্তির সমক্ষে মানসিক বা বাহ্যিক প্রতীক বা 'ব্যক্তি-মূর্ত্তি' ব্যতীত ভক্তি দাঁড়ায় না; আবার, ঐরূপ প্রতীকে Faith ব্যতীত উপাসনাও দাঁড়ায় না। কিন্তু, ঈশ্বরের 'উপাসনা' দূরের কথা, প্রকৃত প্রস্তাবে বাইবেলের 'আপ্ত'ত্বে Faith ব্যতীত খ্রীষ্টানীর মূলভিত্তি, খ্রীষ্টের 'তারক'শক্তি প্রভৃতি কোনমতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। এ জন্যই ভারতীয় 'ভক্তি'কে ঠিক বিলাতী Faith রূপে অনুবাদ করা চলে না।

সকল সাহিত্যসেবককে বুঝিতে হয়, সকল 'ভক্তি' বা Faith ধর্ম্মের প্রধান বল 'আপ্ত'বাদ; কেতাব অথবা কেতাবোক্ত 'আপ্ত' পুরুষের উক্তিতে নির্ভরই ভক্তের একান্ত সম্বল। কোন 'আপ্ত' পুরুষ বলিয়াছেন—ঈশ্বর 'এরূপ', বা আমি তাঁহাকে জানিয়াছি এবং 'এই-এই' তাঁহার প্রিয়কার্য্য—উহাতে বিশ্বাসই ভক্তির ভিত্তি। সুতরাং ভক্তিতে প্রকৃত কারণতত্ত্ব কিংবা 'ঈশ্বর'তত্ত্বে 'জিজ্ঞাসা' নাই; 'ভজন' ক্রিয়ার মধ্যেও কোনরূপ 'দেখা-জানা-পাওয়ার' অর্থগতি নাই; বরং 'ভক্তি জিজ্ঞাসাই' আছে, অর্থাৎ বিশ্বজগতের কারণতত্ত্বকে একটা ব্যক্তি বা Person বলিয়া মানিয়া লইয়াই তাঁহাকে ভজনের প্রণালীটুকু জিজ্ঞাসা। যেমন, এতদ্দেশের 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব'গণের মধ্যেও 'কৃষ্ণ ভক্তি'ই 'সাধ্য'—কৃষ্ণতত্ত্ব সাধ্য হইয়া, বা জিজ্ঞাস্য হইয়া দাঁড়ান নাই। কেবল, "সেবা অধিকার মাগে গোবিন্দ দাস"। বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতির মধ্যেও তাই। কেতাবনির্দিষ্ট 'ব্যক্তি' ঈশ্বর এবং তাঁহার স্তুতি এবং কেতাবোক্ত প্রিয়কার্য্য

কেন্দ্রলক্ষ্যে চলিয়া আসিতেছে; পথিকগণের চলাচলে, তাঁহাদের পদবীমুদ্রা হইতেই যেন গুহাপ্রয়াণের পরিষ্কৃত 'ধুর' পড়িয়া গিয়াছে; একেবারে ইউক্লিডের জ্যামিতির মতই স্বতঃপ্রমাণশীল পদবীর পর পদবীর প্রথা, সিদ্ধান্তের পথ সিদ্ধান্ত এবং প্রাপ্তির পর প্রাপ্তির উদ্দেশবার্ত্তাই উক্ত বাতুলগণের হস্তে আছে! এদেশের এক পিতা অতি প্রাচীন কালে—যে কালে হয়ত পৃথিবীর অন্যত্র মনুষ্যের 'বুদ্ধি'টুকুও খোলে নাই—তাঁহার

সম্পাদন—ইহাই প্রকৃত প্রস্তাবে খ্রীষ্টীয়-মহম্মদীয় প্রভৃতি 'ধর্ম্ম'। ব্রহ্মবাদীগণের 'জিজ্ঞাসা' বা 'জানা—দেখা—পাওয়া' আদর্শ একেবারে নাই বলিলেও চলে। বরঞ্চ, ভক্তিধর্ম্ম মাত্রেই 'জিজ্ঞাসা' বাদের—বা জ্ঞান বাদের—একেবারে বিরোধী বলিলেই যথার্থ কথা বলা হয়।

ভারতবর্ষেও উন্নতস্তরের লোকগণই ব্রহ্মবিজ্ঞানবাদী। জনসাধারণের অধিকাংশই 'ভক্তি'র আদর্শে পূজা, উপাসনা, সেবা, স্তুতি, বা একেবারে 'নাম সঙ্কীর্ত্তন'ই অবলম্বন করিয়া চলে। ভক্তির শেষ অধ্যায় এ দেশে একেবারে 'নামবাদ' রূপেই দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

সাহিত্যের তৃতীয়তত্ত্ব জিজ্ঞাসু পাঠক মাত্রকেই,এ সকল 'Faith ধর্ম্ম' বা 'ভক্তি' বিষয়ে প্রকৃত দৃষ্টিস্থান লাভ না করিলে, পদে পদে অন্ধকার দেখিতে হইবে। ভাবের অবলম্বন স্বরূপ ঈশ্বরের মানবীকরণ (Anthropomorphism) ভক্তিধর্ম্মে অপরিহার্য্য; আপ্তের 'ভাল বা মন্দ' ধর্ম্মেও উহা ধর্ম্মিত না হইয়া পারে না। ফলতঃ, মানুষের মধ্যে যেমন ভাল বা মন্দ এবং সংকীর্ণচেতা ও মুক্তাত্মা ব্যক্তি আছেন, ভক্তের প্রাণমনচরিত্রের ছায়াধর্ম্মে ধর্ম্মিত হইয়া বিভিন্ন রিলিজন গুলির ঈশ্বর বা উপাস্য বস্তুর মধ্যেও সে ভেদ আসিয়া গিয়াছে। আবার, জাগতিক গুণাভিব্যক্ত এবং ভালমন্দ মানুষগুণলিঙ্গী উপাস্যের সম্পর্কে পড়িয়া উপাসকগণও 'ধর্ম্মিত' না হইয়া পারিতেছে না। এ ব্যাপার অনেক দিকে—জাগতিক, মানবিক, ও সামাজিক হিসাবে—ভয়াবহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একদিকে ঈর্ষী, ঘৃণী বা 'হিংসুক' ঈশ্বর যেমন গড়িয়া উঠিয়াছে, অন্যদিকে গোঁড়া বা উদারমতি জাতি, অধ্যাত্মপ্রিয় বা অনাত্মপ্রিয় জাতি, জড়বাদী বা আত্মবাদী জাতি, উৎসাহশীল ও নির্বৃতিশীল জাতি, দৈব সম্পত্তি বা আসুর সম্পত্তির উপাসক জাতি। যেমন জাতি, তেমনি ব্যক্তি! ভক্তিধর্ম্মের ফল বিষয়ে ইহা নিদারুণ সত্য। এরূপে, দেশে দেশে একএকটী 'আপ্ত' আদর্শের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া মনুষ্যজাতি অন্তশ্চরিত্রে এবং অন্তরাত্মাতেই বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মে ধর্ম্মিত হইয়াই দাঁড়ায়। 'মানুষ' বলিয়া কোন পদার্থকে কেহ কখনও

'বিশ্ববিদ্যাবান্' ও বিদ্যাভিমানী পুত্রকে বলিয়াছিলেন, পুত্র, দেখিতেছি, তুমি ইদানীং সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছ। কোন একজন মানুষ যাহা আয়ত্ত করিতে পারে না, সে জ্ঞানই উপার্জ্জন করিয়াছ। কিন্তু, দেখিতেছি—এবং স্পষ্টভাবেই বলিব—তোমার সমস্ত বিদ্যা 'অমূলক' ও নিষ্ফল! তুমি বিপুল বিদ্যালাভ করিয়াও পরম মূর্খ! তুমি সকল 'বিজ্ঞানের বিজ্ঞান

দেখে নাই। ফলে, মানবজগতে মনুষ্য বা 'বিশ্বমানব' বলিয়া কোন সাধারণ সংজ্ঞার আমল একেবারে নাই; সমস্ত পৃথিবী কেবল খ্রীষ্টান-মুসলমান-ইহুদী-হিন্দুর দ্বারাই পরিপূর্ণ! প্রত্যেক সংজ্ঞার মধ্যেই এক একটা প্রবল অদৃষ্ট বা বর্ণ আছে। মনুষ্য জাতি ওই বর্ণধর্ম্মে অপরিহার্য্য ভাবে ধর্ম্মিত; জন্মের পরমুহূর্ত্ত হইতে স্খলিত! মানুষের মধ্যে পরম শিক্ষা-কর্ষণার সৌভাগ্যবান ব্যক্তিগণই কচিৎ-কদাচিৎ এই প্রভাব উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হন—তাহাও সম্পূর্ণ পারেন কিনা সন্দেহ। ধর্ম্মগ্রন্থের এক একটী সামান্যমাত্র কুমতের দোষে অথবা উহার অর্থগ্রহণের দোষে একএকটা বিপুল জাতির হৃদয় এবং জীবনই নিদারুণ ভাবে কুণ্ঠিত হইয়া দাঁড়াইতেছে!

আবার, মানুষের অন্তরের ভাব বৃত্তির প্রাবল্যকেই মুখ্য করাতে এ সকল 'রিলিজন' যেমন পরম আত্মাভিমানী ও আত্ম-অভিজ্ঞতা-গর্ব্বী হইতে বাধ্য হইয়াছে, তেমন উহাদের মধ্যে পরধর্ম্মের হিংসা, পরমত বিদ্বেষ ও পরের আক্রমণই প্রবলতম লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; অধিকন্তু, স্বকীয়সমাজের মধ্যেও বিপক্ষমতের সঙ্গে বিরোধ, বিদ্রোহ এবং অসহিষ্ণুতাই প্রবল হইতে বাধ্য হইতেছে! উপাস্যে একান্ত বিশ্বাস ও ভাবুকতা হইতে উপাসকগণ প্রত্যেক ভক্তিধর্ম্মেই কিছু-না-কিছু শান্তি লাভ করেন, নিজ নিজ উপাস্য বা ইষ্টদেবতাকে 'দর্শন'ও করেন বলিয়া মনে করিতে পারা যায়। ধর্ম্মক্ষেত্রের গভীরতম Mystery এই যে, উপাসক 'ঐকান্তিক' হইতে পারিলেই অপূর্ব্ব অধ্যাত্ম শান্তি, সন্তোষ ও নির্বৃতি লাভ করে। গীতা এ রহস্য উচ্ছেদ করিয়াছেন, স্বয়ং ভগবান্ জীবের এই শান্তি দাতা। সকল ভক্তিধর্ম্মেই এরূপ 'ইষ্ট' দর্শনের প্রমাণ পাওয়া যায়। এরূপ অন্তর্বোধ হইতেই সঙ্কীর্ণ চারিত্র-বৈশিষ্টে উপাসকের মধ্যে আত্মাভিমান এবং গোঁড়ামীর উদ্ভব হইতে পারে। ভারতে "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" বলিয়া বিশ্বাসবাদ আদিকাল হইতেই প্ররূঢ় বলিয়া, সে পথে আর্য্যধর্ম্ম অগণিত উপাসনা প্রণালী ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে একটা সমন্বয় আনিয়াছে বলিয়া, এতদ্দেশে ধর্ম্মগোঁড়ামী, হিংসা ও Persecution তত প্রবল হইতে যে পারে নাই, ইহা ঐতিহাসিকগণ (যেমন Rhys Davids) বলিতেছেন; কিন্তু, জগতের অন্যান্য 'ভক্তিধর্ম্ম' গুলির ইতিবৃত্ত কি ভয়াবহ! পরধর্ম্ম হিংসা হইতে

সেই 'এক'বিজ্ঞান জানমা—তাহার খবরও রাখ না; সর্ব্বপ্রাপ্তির সেরা 'এক' প্রাপ্তি এবং কেন্দ্রপ্রাপ্তি তোমার ঘুচিয়াছে! তোমার অবস্থা দেখিয়া পিতা আমি—কোন মতেই সোয়াস্তি লাভ করিতে পারিতেছি না।

অথবা নিজেদের মধ্যেও সাংপ্রদায়িক সংকীর্ণতা হইতে কত Persecution ও Inquisition। জলন্ত আগুণে ফেলিয়াই জীবন্ত মনুষ্যকে ভস্মীভূত করা। জাতিতে জাতিতে, সমাজে সমাজে কত রক্তারক্তি ও নরহত্যা! পৃথিবীর বক্ষ 'স্বর্গস্থপিতা' ও ধর্ম্মেশ্বরের নামেই ভ্রাতৃরক্তে সিক্ত! মনুষ্য জাতির অর্দ্ধেক দুরদৃষ্ট ও দুঃখ এই 'ভক্তি' ধর্ম্মগুলির Mistake বা ভুল বা অন্ধ গোঁড়ামি হইতেই উদ্ভুত বলিলে অন্যায় হইবে না। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসুগণ মানব হিতৈষী (এবং ইয়োরোপের একজন পরম বিমুক্তবুদ্ধি ধর্ম্মচিন্তক ও Theist লেখক) বল্‌টেয়ারের গ্রন্থেই খ্রীষ্টধর্ম্মের রক্তাক্ত ইতিহাস প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম স্বয়ং হীব্রুজাতির ধর্ম্মগোঁড়ামী ও হিংসা প্রবৃত্তি হইতেই উপজাত হইয়া, কালেকালে অশেষ নির্য্যাতন সহ্য করিয়া এবং স্বয়ং পরকে নির্য্যাতন করিয়াই বর্দ্ধিত হইয়াছে; এখন নিজের 'আপ্ত' বিশ্বাসেই পরকে আক্রমণ পূর্ব্বক চলিতেছে। হীব্রুধর্ম্মের কেতাবে ঈশ্বর বলিয়া গিয়াছেন, "আমার কোন মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা' আমি ভাল বাসি না; আমি একটী Jealous God, একান্ত ভক্তিই চাই"। উহা হইতে হীব্রুশিষ্য খ্রীষ্টান, মুসলমানাদি ধর্ম্ম এবং উহাদের আধুনিকশিষ্য উপধর্ম্ম গুলিও উপাসনা বিষয়ে 'মূর্ত্তি হিংসা' উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছে। এরূপে Personal god অর্থাৎ মনুষ্যের 'মনোমূর্ত্ত পুত্তল' বাদীগণ 'বাহ্যমূর্ত্ত পুত্তল' উপাসকগণকে হিংসার ধার্ম্মিকি কর্ম্মে হতভাগ্য মানুষের অর্দ্ধেক দুঃখই গড়িয়া তুলিয়াছে!

ভারতে আসিয়া খ্রীষ্টান, ধর্ম্মপ্রচারকগণ বলিয়া উঠিলেন—দেখ, তোমাদের ধর্ম্মে ঈশ্বরের পক্ষপাত নাই, grace নাই। অমনি আমরা আছাড় বিছাড় খাইয়া, পুঁথিপত্র ঘাঁটিয়া বাহির করিয়া দিয়াছি, কোথায় ভক্তের প্রতি ঈশ্বরের 'বর' আছে, বৃমুতে আছে। তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন, তোমাদের 'ঈশ্বরের প্রতি প্রেম' কোথায়? অমনি আমরা পুঁথি খুলিয়া ধরিয়াছি: কোথায় ঈশ্বরকে "প্রিয়ঃ পুত্রাৎ, প্রিয়ো বিত্তাৎ" বলা হইয়াছে!

পৃথিবীকীট মনুষ্যের দুর্জ্জয় রক্তপিপাসা, আত্মান্ধতা ও আত্মাভিমান হইতে তাহার উচ্চতম মনোবৃত্তির লীলাক্ষেত্রে এই ক্ষুদ্রতা এবং নিদারুণ দুর্ব্বৃত্ততা। অনেকের পক্ষে ভগবানের নাম করা মাত্রই যেন অহম্মুখতা, পরবিদ্বেষ এবং আত্মম্ভরিতার নরকদ্বার খুলিয়া

তখন পিতাপুত্রের মধ্যে দীর্ঘ 'গুরুশিষ্য'তার ব্যাপার, পিতাকর্তৃক উপদেশের ব্যাপার চলিয়াছে; তাহাই ছান্দোগ্য উপনিষদের এক অধ্যায়। পিতা পরিশেষে দেখাইয়াছেন—আত্মজকে জীব-জন্মের শ্রেষ্ঠ ধন সেই 'অমৃতের বার্ত্তা' প্রদান করিয়া 'পথ দেখাইয়া' দিয়াছেন—সে বস্তু এবং সে পথ

যায়। ভক্তিধর্ম্ম সমূহে ঈশ্বরের কেতাবোক্ত 'স্বরূপ' ও কেতাবোক্ত 'আটঘাট' বদ্ধ আদর্শ বা প্রমূর্ত্তি হইতেই নরহৃদয়ের এই দৌর্ব্বল্য. এই গোঁড়ামী ও আত্মাভিমান, এই অসহিষ্ণুতা. পরহিংসা, এবং নরহিংসা! কোন 'ভক্ত' কখনও মনে করিবে না, উহা কখনও অনন্ত জগৎকারণের 'স্বরূপ' নহে, ক্ষুদ্র মনুষ্যের ক্ষুদ্র হৃদয়ের 'ইষ্ট' রূপ। ভক্তিধর্ম্মের নিরপেক্ষ গবেষক বলিতে পারে, ওই রূপে উপাস্য-দর্শনের পরেই সাধক সকল উপাসনাকর্ম্মের চরম সুফল অর্থাৎ শান্তি লাভ করে—তাহার সংশয়চ্ছেদ হয়—হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়। এ ক্ষেত্রে ভক্তিধর্ম্মের তত্ত্বদর্শন এবং উপাসনার রীতি-মীমাংসার চূড়ান্ত বার্ত্তাটুকুই গীতা দিয়াছেন—

তেষাং সততযুক্তানং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

'যথাভিমত' ইষ্টদেবে বা উপাস্যে প্রীতিপূর্ব্বক সততযুক্ত হওয়া—যাহা লক্ষ লক্ষের মধ্যে একজন পারিতে পারে—ইহাই প্রথম ও প্রধান কথা। তারপর গীতা যাহা বলিয়াছেন. ওই একটী পংক্তির মূল্যেই গীতা সকল ভক্তিতত্ত্ব ও ধর্ম্মবিজ্ঞানের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারে। উহা জানাইতেছে, মনুষ্যের ভজনাদর্শের যাবতীয় কেতাবী বিধিবিধান 'উপায়' মাত্র—কেবল মধ্যপথের উপায়। প্রকৃত সত্যের 'বুদ্ধিযোগ' উহাতে নাই, উহা যোগ্যপাত্রে ভগবৎকৃপায় পরেই আসে। যদিএই কথাগুলি মানুষ বুঝিত! এই সত্যদৃষ্টির ফলেই বর্ণাশ্রমী ভারতবর্ষ অগণ্যবিচিত্র উপাসনাপ্রণালীর মধ্যে সমন্বয় ও অহিংসা সাধন করিয়াছেন। জগতের অপর তাবৎ রিলিজনগুলি ভারতের এই দার্শনিক দৃষ্টিস্থান লাভ করে নাই। পরিমিতপ্রিয় ও সীমাসন্তুষ্ট মনুষ্যমনের ছায়ামলিন এবং কল্পনা-কলুষিত ভাষার কেতাবোক্তির উপর নির্ভর পূর্ব্বক অজ্ঞ ও অন্ধ জনসাধারণ ধর্ম্মের অছিলায় কেবল গোঁড়ামী ও অহমিকায় এবং পরহিংসায় রক্তারক্তি করিয়াই ধরণীবক্ষ কলঙ্কিত করিয়া চলিতেছে। অনেক সৎপ্রবৃত্তির লোকও কেতাবী কুপরামর্শে জিঘাংসু হইয়া পড়েন! সুতরাং, ভক্তিধর্ম্মে সাধারণ ভক্তেরা ঈশ্বরোপাসনা হইতে 'শান্তি' পায়, অনেকে স্বর্গনরকের লোভ-ভয়ে সমাজকেও শান্তিতে রাখে; কিন্তু, সে 'শান্তি'র সঙ্গে সঙ্গে এ লক্ষণগুলিও মনে জাগরূক হইয়া নিত্য সন্দেহ জন্মাইতে থাকে যে, এত

কি এবং কোথায়! পিতা উদ্দালক গুরুরূপে—কোন মনুষ্যের মুখে যাহা আসে নাই, যাহার অর্থ বুঝিতে অসাধারণ মণীষা এবং একান্ত চেষ্টার পক্ষেও অন্ততঃ দশ বৎসরের 'পাঠ' উপক্রমণিকা রূপেই নির্দ্দেশ করিতে পারি—সে কথাটিই উচ্চারণ করিয়াছেন—"তত্ত্বমসি"—তিনিই তুমি হইয়াছেন (বা হইয়াছ)! (১)

ভয়াবহ কুফল যে ক্ষেত্রে, তাহাতে প্রকৃত সত্য, মঙ্গল এবং সমর্থনার দাবী-স্থান কি পরিমাণে আছে! এ জন্যই কালে কালে মানবসমাজের অনেক হৃদয়বান্ এবং মনীষী ব্যক্তিও মনুষ্যের ধর্ম্মস্থানে একেবারে Necessity of Atheism প্রচার না করিয়াই যেন পারেন নাই! পণ্ডিত হেকেল মনুষ্যের প্রাথমিক শিক্ষা হইতে এই অপবুদ্ধি দূরনিরস্ত করিবার প্রস্তাবই করিতেছেন! ফলতঃ সাহিত্যসেবক বুঝিবেন, উপাস্য-উপাসকের এরূপ প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তির মধ্যে প্রকৃত মীষ্টিসিজমের জন্য কিছুমাত্র অবকাশ নাই।

(১) এ বিষয়ে একটা জ্ঞাতব্য কাহিনী আছে। আমাদের দেশের একজন 'দার্শনিক' ব্যক্তি (যিনি পাশ্চাত্যদর্শনে সুপণ্ডিত বলিয়া সুনাম উপার্জ্জন করিয়াছেন,) তিনিই একদিন উপহাস করিয়া বলিতেছিলেন "আমিই যখন ব্রহ্ম, তখন আর ধর্ম্ম কর্ম্ম জিজ্ঞাসা বা আলোচনার প্রয়োজন কি?" তাঁহার কথাগুলি হঠাৎ আমাদিগকে বিমূঢ় করিয়া দিল। জানিতে পারিলাম, তিনি 'বেদান্ত দর্শন' পড়েন নাই; বেদান্ত বিষয়ে কোন গ্রন্থ আলোচনা করাই প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই! আমরা বলিলাম, 'যাহা এত সহজ 'ঠাট্টার বিষয়' বলিয়া মনে করিতেছেন, এদেশে হাজারহাজার বৎসর ধরিয়া লক্ষ্য-হাজার বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ লোক তাহাই 'পরম জ্ঞান' বলিয়া ধারণা পূর্ব্বক চলিতেছে! এত শস্তা একটা অভিমান আপনার মনে কি করিয়া স্থান পাইল? "অহং ব্রহ্ম"বাক্যের 'অহং' পদটীর অর্থ, আপনি যাহা মনে করিতেছেন, তাহা ত নহে! Ego বা Empirial Self কে ছাড়াইয়া যেই 'চিদাত্মা' বা 'সাক্ষী পদার্থ প্রত্যেক জীবের মধ্যেই আছেন - তাঁহাকেই উক্ত বাক্যের 'অহম্' পদটী লক্ষ্য করিতেছে পঞ্চদশী। এই ভ্রমস্থানটী পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন—

অন্তঃকরণ সংত্যাগাদবশিষ্টে চিদাত্মনি।
অহং ব্রহ্মেতি বাক্যেন ব্রহ্মত্বং সাক্ষিণীয্যতে।

এই স্থানে অনেক উপহাসবাগীশের ভ্রমস্থান। কেবল ইহাই নহে। ইয়োরোপীয় সাহিত্য-সেবী ভারতীয় পাঠকমাত্রের প্রধান বিপত্তিস্থান এই যে, দ্বৈতবাদী খ্রীষ্টান লেখকগণ স্থানে-অস্থানে অদ্বৈত আদর্শ এবং বৈদিক দর্শনের অপবাদ করিয়া ও উহার দিকে সুযোগ

এ স্থলেই রহস্যবিজ্ঞানের এবং সকল জ্ঞান ও Mysticism এর বিশ্বাতিশায়ী 'একশৃঙ্গ'! আমিই সেই! এই ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আমি! সংসারে, জীবন পথে অর্দ্ধজাগ্রত, ভীতত্রস্ত, রোগ-শোক-দুঃখ-জরা-মৃত্যুর ভয়গ্রস্ত, অজ্ঞানের অন্ধকারে জগতন্ত্রে নিজের অপচ্ছায়াতেই নিত্যভীত আমি, জগতে একটী সামান্য বালুকাকণার 'তত্ত্ব' জানিনা এবং বুঝিনা এমন যে আমি— আমিই সেই! আমি অমৃত! অমৃতের পুত্র, নিত্য সত্যসনাতন আমি! ইহাপেক্ষা অদ্ভুত, অসম্ভব, অশ্রদ্ধেয় কথা কোন মানুষ বলিতে পারিয়াছে কি? তবু ভারতবর্ষে একজন পিতাই পুত্রকে "নিত্য সত্য ধ্রুব-বিজ্ঞান" রূপে, পরম (serious) তত্ত্বের ভাবে, ওই বার্ত্তা দিয়াছে! ভারতবর্ষ উহাকে 'মহাবাক্য'—মহাবিদ্যার উদ্দেশক সংক্ষিপ্ত বাক্য—বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং ঋষির পায়ে গললগ্নীকৃত বাসে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়াই উক্ত মহাবাক্য গ্রহণ করিয়াছে। তাহার সকল ধর্ম্ম ও কর্ম্ম চেষ্টা এবং ভাবচেষ্টায়, তাহার সকল দর্শন এবং বিজ্ঞানচেষ্টায়, সকল বেদপুরাণে ও কাব্যকবিতায় উক্ত একটিমাত্র কথার টীকা টীপ্পনী করিয়া বুঝিতেই যেন রত আছে। পিতা উদ্দালক যেই চরম লক্ষ্য

পাইলেই রসিকতার অপকটাক্ষ করিয়া চলিতেছেন! অনেকে কেবল সাহিত্যিক লেখক মাত্র, প্রকৃত দার্শনিক কর্ষণা, বুদ্ধিবিচার বা দৃষ্টিস্থান তাঁহাদের নাই। তথাপি পরস্পর দেখা দেখি এবং অতর্কিত সংস্কারের বশেই এ দুর্বৃত্তি অবলম্বন করেন। এমন কি, অনেক 'দার্শনিক' উপাধীধারী লেখকও বেদান্তকে কেবল সন্ন্যাসীগিরি ও Asceticism বলিয়া Repudiation of flesh ও Quietism বলিয়া উপহাস করিতে ছাড়েন নাই! জগতের কারণ বিষয়ে সত্য কি, তাহার নিরপেক্ষ অনুসন্ধান টাই অনেকের অধ্যাত্ম অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না; সত্যের অনুসরণ ত দূরের কথা। কেবল শারেস্তা রসিকতা! মীষ্টিসিজমের তথ্যানুসন্ধানী আর এক পণ্ডিত কবীরের গুরু মহাত্মা রামানন্দকে "Heritical Brahmin Philosopher of Bhakti" রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন! পাশ্চাত্যলেখকগণের এই সুবিপুল অপসংস্কার ও দুর্ব্যবহার হইতে প্রকৃত সত্যবোধ এবং আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া চলিবার উপযুক্ত জ্ঞানবুদ্ধি ও বিচারবিবেক অর্জ্জন ব্যতীত অধুনা সাহিত্যপাঠই বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাহিত্যের 'আর্ট'এর ক্ষেত্রেও, সৌন্দর্য্যের 'তৃতীয় বস্তু' বিষয়ে প্রকৃত দার্শনিক বিবেক সিদ্ধি ব্যতীত অধুনা সাহিত্যসেবাতেও সোয়াস্তি নাই!

নির্দ্দেশ পূর্ব্বক পুত্র শ্বেতকেতুকে 'পথ' দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহাই অন্যদিকে (জগতের দিক্ হইতে) ঘুরাইয়া গুরু বশিষ্ঠ শিষ্য রামচন্দ্রকে বলিয়াছেন—তুমিই সর্ব্ব! পৌরাণিক ভারতের হস্তে ঐ একটী 'গ্রন্থ' আছে—যোগ বাশিষ্ঠ! উহার রচয়িতা যিনিই হউন, তিনি যে ব্যাস বাল্মীকি হইতেও ছোট কবি নহেন এবং তিনি যে মানবজগতের একজন অনুত্তম 'দ্রষ্টা' ব্যক্তি তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। উক্ত গ্রন্থ নিজের অভ্রংলিহ মাহাত্ম্যশৃঙ্গ এবং মহাপ্রাণতার গতিকেই সাধারণ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেছে না। কিন্তু নিঁখুত ঋষিতন্ত্র বিষয়ে এতবড় মহার্থগভীর ও সারস্বত মাহাত্ম্যময় সাহিত্যচেষ্টার ফল মনুষ্যের হস্তে দ্বিতীয়টী নাই! জগতের অপর সমস্ত মীষ্টিসিজমের গ্রন্থ উহার তুলনায় হিমালয়সমক্ষে বালিয়াড়ীর মতই দেখায়। উহার প্রকাশের প্রাচীন রীতিটুকু 'সহিয়া সমঝিয়া' লইতে পারিলে, মানুষের অপর তাবৎ মীষ্টিক কাব্যকবিতাকে উহার সমক্ষে ভারতসমুদ্র তুলনায় গোষ্পদের মতই দেখাইবে। আনিবন্ধের 'বৈরাগ্য প্রকরণ' দেখিয়া, রামের 'চরমপন্থী বৈরাগ্য' দেখিয়া আধুনিক পাঠক যে অনেক স্থলে সদর দরজা হইতেই ভীত হইয়া ফিরিয়া যান, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু গ্রন্থটির প্রকরণের পর প্রকরণের পথে, গুরু বশিষ্ঠ সমস্ত অধর্ম্ম ও কুধর্ম্ম, অবিজ্ঞান ও কুবিজ্ঞান, কুবৈরাগ্য ও ভাক্তবৈরাগ্য নিরস্ত করিয়া শিষ্যকে পরিশেষে যে 'ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠায়' এবং যে 'ব্রাহ্মী স্থিতি'তে উত্তোলিত করিয়াছেন তাহার তুলনাও মনুষ্যের দার্শনিক সাহিত্যে নাই। পরিশেষে, 'নির্বাণ' প্রকরণে আসিয়া গুরু শিষ্যকে যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনুবৃত্তি-টুকুই কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব। "হে রঘুনন্দন আমি এতক্ষণ যে বাক্‌জাল বিস্তার করিলাম তুমি ইহাতে তোমার চিত্তবিহঙ্গকে ধরিয়া হৃদয়পিঞ্জরে পুষিয়া রাখ। ** আমার বাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে হইলে, সমস্ত লোক ব্যবহারই, কালনিয়মে যখন যাহা তোমার উপর আসিয়া পড়িবে, সানন্দ হৃদয়ে গ্রহণ করিবে। সুখ দুঃখ, শুভ অশুভ কিছুতেই কণামাত্র 'আসক্তি' রাখিবে না। ইহাই আমার বাক্যের অর্থ, এবং ইহাই সকল

শাস্ত্রের একমাত্র সিদ্ধান্ত। তুমি ইহা বুঝিয়া উদার হও; মহত্ত্বই উদারতা, সর্ব্বময়ত্বই মহত্ব, একত্বই অভিন্নতা, সংসার আমি, আমিই সংসার, ইহা বুঝিয়া হৃদয়ের উদ্বেগ দূর কর, নিশ্চিন্ত হও!" "আমিই সব—এ জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান, বশিষ্ঠদেবের উপদেশ এ জ্ঞানেরই জন্য। শাস্ত্রে বলে, স্বপ্নেও উহার উপলব্ধি অনন্ত সৌভাগ্যের ফল।" "আমিই সব" এ বুদ্ধি খোলানেত্রে, জাগ্রৎ চিত্তের ঋজুপথে নিত্যসিদ্ধি করিতে পারিলেই 'জীবনে' ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা ও 'ব্রাহ্মীস্থিতি' সিদ্ধ হয় কি না, ওই 'পাঠ' কিরূপে আয়ত্ত করিতে হয়, আত্মকেন্দ্রে গেলেই বিশ্বকেন্দ্রে 'গতি' হয় কিনা, তুমি এই মর্ত্ত্যজীবনের 'সংবিৎ'ক্ষেত্র হইতে আপনাকে যেই বিরাটের অন্তর্গত বুঝিতেছ, সে বিরাটই তোমার 'আত্মার' অন্তর্গত কিনা, নিজের চিত্তকে, Consciousness কে আত্মকেন্দ্রে স্থির করিতে পারিলেই তুমি চরমের কেন্দ্রপথে গেলে কিনা, 'জ্ঞান'ময় জগতে 'জ্ঞানী' হইতে পারিলেই 'আপ্তকাম' হইলে কিনা, তাহার সত্যপ্রমাণ (বিচারযুক্তি ব্যতিরিক্ত প্রমাণ) লাভ করিতে চাহিলেও, ভারতে এখনও বহু ব্যক্তি আছেন যাঁহারা তোমার 'চোখ ফুটাইয়া' দিতে পারেন। চিত্তস্থিরতার উপরে, চিত্তের সংযম (Concentration) শক্তির উপরে যেমন মানুষে-মানুষে সাংসারিক ব্যবধান, দুনিয়াদারীর ক্ষেত্রেও 'বড়লোক' বলিতে বস্তুগত্যা যেমন উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে স্থিতধী এবং সে শক্তিতে কৃতকৃত্য ব্যক্তিই বুঝায়, অধ্যাত্মক্ষেত্রেও চিৎ-লক্ষ্যে একান্ত, উৎসাহমতি ও স্থিতধীঃ হওয়া লইয়াই পরমার্থপথিক ব্যক্তিগণের মধ্যে ব্যবধান! আত্মবাদী মৌষ্টিক বলেন, চিত্ত আত্মসুস্থির হইতে পারিলেই অমানুষিক শক্তি ও অলৌকিক ঋদ্ধির ক্ষেত্রে প্রবেশ করে; লোকব্যবহারে যাহাদিগকে 'ঈশ্বরীয় শক্তি' বলা হয়, সে শক্তি সমূহের ক্রমবিকাশ হইতে থাকে; দূরদর্শন, দূরশ্রবণ প্রভৃতি দেখা দিতে থাকে! এ সমস্ত একেবারে জড়বিজ্ঞানের এবং গণিত ও জ্যামিতিশাস্ত্রের সত্যসমূহের মতই অধ্যাত্মবিজ্ঞানের প্রত্যক্ষীকৃত সত্য। অসংশয় 'প্রত্যক্ষ' ব্যতীত অধ্যাত্মপথে অপর কোন প্রমাণের খাতির নাই। "অনিমা লঘিমা ব্যাপ্তি প্রাকাম্য মহিমা তথা, ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বং

চ তথা কামাবসায়িতা" প্রভৃতিঐশ্বর্য্যের স্ফুরণ নিজের মধ্যে দেখিলেই বুঝিবে এবং নিঃসংশয় হইতে থাকিবে যে, তুমি 'আত্মা'র প্রাপ্তি পথেই চলিয়াছ। মনুষ্যবুদ্ধি যাহাকে 'ভগবৎশক্তি' (ক) বলিতেছে, সে সমস্ত ক্রমে-ক্রমে দর্শন দিয়াই বলিয়া দিবে যে, তুমি বিশ্বের আত্মস্বরূপের চরমপদবী এবং 'পরমধাম' পথেই চলিতেছ। এজন্য এতদ্দেশে আত্মার নাম 'এক' ও ব্রহ্মজ্ঞানের অপর নামই 'আত্মজ্ঞান' এবং 'আত্মবিদ্যাই' 'ব্রহ্মবিদ্যা'। এদেশের মৌষ্টিকগণ ঘোষণা করিয়াছেন, অধ্যাত্ম 'বিদ্যা' ব্যতীত অপর সমস্তই বাজে বিদ্যা! "অপরা ঋক্‌বেদো যজুর্ব্বেদো সামবেদো অথর্ব্ববেদো নাম—শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি"। জাগতিক অর্থ এবং কাম্য বিষয়ক যাবতীয় বিজ্ঞান ও দর্শনই নিম্নশ্রেণীর বিদ্যা। পরা বিদ্যা কি? ঐ "তত্ত্বমসি" কথাটুকুর অর্থকে মনেপ্রাণে এবং জীবনে বস্তুতঃ ও

(ক) ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নং ভগইতীঙ্গনা॥

এ সমস্ত আমাদের সমক্ষে 'ঈশরীয় শক্তি'। এজন্য কাহারও মধ্যে এ সমস্ত শক্তির বিকাশ দেখিলেই এতদ্দেশের লোক তাঁহাকে দেবসম্মান দান করে। মনে করে, ইনি প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ না হইলেও 'ব্রহ্মপথিক' ত বটে। আবার, ব্রহ্ম'সাধক'গণও এসমস্ত 'শক্তি'কে প্রকৃত প্রস্তাবে পরমার্থপ্রাপ্তির অন্তরায় বলিয়াই মনে করেন। এসমস্ত 'ঐশ্বর্য্য'ই সংসারে আত্ম প্রতিষ্ঠার সূত্রে তাঁহাদের অহমিকা ও জড়তালিপ্সা বৃদ্ধি করিয়া কেবল 'অর্দ্ধপথে'ই অবস্থান অথবা পতনের কারণ হইতে পারে। ব্রহ্ম-সাধক 'ঈশ্বরত্ব'ও চাহেন না। অনেকানেক 'সাধক' চরম লক্ষ্যে যাইতে যাইতেই যে বারংবার স্খলিত হইয়া নামিয়া গিয়াছেন, এ দেশের শাস্ত্রাদিতে এবং কিংবদন্তীতে উহার বহু বহু দৃষ্টান্তকাহিনী আছে। অন্যদিকে, নিরেট সাংসারিকতা এবং অসংযত ইন্দ্রিয়গ্রাম ও হিংসা-দ্বেষাদির 'বুদ্ধি' চরিত্রতন্ত্রে থাকিতে, ব্রহ্মলাভ ত দূরের কথা, এ সমস্ত 'শক্তি'র বিকাশও হয় না। এজন্য, ঐকান্তিক ও মৌষ্টিক সাধকের জীবনযাপনের আদর্শটাও লোক সাধারণ হইতে নানাদিকে স্বতন্ত্র। অধ্যাত্মতঃ 'শম' ও 'সমতা'ই তাঁহাদের লক্ষ্য। তাঁহাদের 'ব্রহ্মাচরণ' বা ব্রহ্মচর্য্যার এ স্বাতন্ত্র্য দেখিয়াই সংসারপ্রিয় লোকগণ বিরুদ্ধবুদ্ধির বশে তাঁহাদিগকে (Ascetic) 'সন্ন্যাসী' বলিয়া কটাক্ষ করিতে ভালবাসে।

তত্ত্বতঃ 'প্রাপ্ত' হওয়াই, Realise করাই পরা বিদ্যা। "অথ পরা' যেন তদক্ষর মধিগম্যতে"। Realisation বলিয়াই উহার নাম বিদ্যা—বিজ্ঞান—সাধনা—জীবজীবনের পরমাগতি—চরমপ্রাপ্তি; কেবল 'প্রার্থনা' কিংবা 'উপাসনা' নহে। নিয়ত মনে রাখিতে হইবে, শ্রুতি 'এক' এবং অদ্বৈতের দৃষ্টিস্থান হইতেই মানসিক বা বাহ্যিক ভাব-পুত্তলের-পূজারী মাত্রকে, পরিমিতের উপাসক মাত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "নেদং যদিদমুপাসতে"।

খ্রীষ্টান পণ্ডিত ম্যাক্সমূলরকে নাকি কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তুমি এই বাদরায়ণ ও পতঞ্জলিকে কি মনে কর? তিনি India what She Can Teach Us গ্রন্থের শেষভাগে বলিয়াছেন—আমি স্বয়ং গৌরীশঙ্কর যাত্রী নহি; কিন্তু যাঁহারা গৌরীশঙ্কর লক্ষ্যে যাত্রা করেন তাঁহাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে; অতএব, আমার পুরাণ ও বর্ষীয়ান্ বন্ধু বাদরায়ণ-পতঞ্জলিকে নমস্কার! পাশ্চাত্য পণ্ডিত এস্থানে ত ভারতের 'অধিকার' আদর্শটিই স্বীকার করিলেন! পরন্তু, ব্রহ্মবিদ্যার পর, জীবের 'অধিকার'তত্ত্ব অপেক্ষা সত্যবত্তর ও মহত্তর কোন তত্ত্বসন্দেশ ভারতের পুঁজিতে নাই। উহাই ত ঋষিভারতের এবং উহার 'বর্ণাশ্রম' আদর্শের আত্মা—যদিও অধিকার 'নিরূপণ' বা 'প্রয়োগ' ক্ষেত্রই নিদারুণ সঙ্কট সঙ্কুল হইয়া পড়িতে পারে! জীবের স্বধর্ম্মানুগত জীবনসাধনা বা ব্যক্তিগত বিশিষ্টতার পথে অধ্যাত্মকর্ষণার সমর্থন টুকুই ত এখানে! সর্ব্বজগতের চূড়ান্ত সত্য এবং সত্যগতির চূড়ান্ত সন্ধান কি, জীবমাত্রকে তাহা অবশ্যই জানিতে এবং বুঝিতে হইবে। কিন্তু, 'আমার সত্য' টুকু কি? কোন্ পথটি 'আমার পথ'? আমার শক্তিসাধ্য, আমার স্বভাবসিদ্ধ, আমার সহজাত ও আমার জীবনের অদৃষ্টানুগত কোন্ পথ? 'কর্ম্ম' বলিতে, কোন্ কর্ম্ম আমার 'কর্ত্তব্য'? 'ধর্ম্ম' বলিতে, কোন 'ধর্ম্ম' আমার 'ধর্ত্তব্য'? এই যে আমার—

জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তিঃ।
জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ॥

আমার 'অদৃষ্ট'বস্তুর সঙ্গে বাদরায়ণ-পতঞ্জলির বা বুদ্ধ-খ্রীষ্ট-শঙ্কর-চৈতন্যের অদৃষ্টের পার্থক্য নাই কি? আমার যে "Spirit is willing, but flesh is weak"! ফলতঃ, Equality বাদ (মানুষে মানুষে সাম্য-বাদ) অথবা সর্ব্বসামাঞ্জ 'ধর্ম্ম'বাদ টুকু একটা মস্ত 'ভোল'। উহার মধ্যে তাহা জড়বাদীর কর্ণমন্ত্র এবং কু-পরামর্শ। কেবল দুহাত-দুপায়ে সমান বলিয়াই মানুষে-মানুষে সমতা! ইয়োরোপের প্রাকৃত মানুষের গুপ্ত অহমিকার খোশামোদ করিয়াই 'সাম্যবাদ' সাধারণের মধ্যে পশার করিয়াছে; মিউনিসিপাল সমস্বত্ববাদের ক্ষেত্র হইতে পরিবার ক্ষেত্রে, 'ধর্ম্ম' এবং অধ্যাত্মক্ষেত্রেও 'অনধিকার প্রবেশ' পূর্ব্বক প্রতিপত্তি ঘোষণা করিয়াছে এবং সাধারণের লাঠির জোরেই সে দেশে টিকিয়া আছে। অধ্যাত্মবাদী মাত্রেই আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী না হইয়া পারেন না; নিজকে 'অমর' বলিয়া বিশ্বাস জন্মিলেই, জগতের বৈচিত্র্য ক্ষেত্রে, নিজের Pre-existence ও Existence after Death (জন্মগত অদৃষ্ট বা জন্মান্তরীয় অদৃষ্ট তত্ত্ব) চিন্তাশীল মাত্রের চিত্তে উদিত না হইয়া পারে না। বিশ্বজগতে জীবমাত্রের পক্ষে সর্ব্ববিজ্ঞানের 'এক বিজ্ঞান' যেমন আছে, সর্ব্বপথের শিরস্ক 'একগতি'র পন্থা যেমন আছে; তেমন, সেই চরম বিজ্ঞান এবং লক্ষ্যের দিকে, সর্ব্বসামঞ্জস্যে প্রত্যেক জীবেরই একটা 'স্বধর্ম্ম'পথ আছে। আবার, সেদিকে প্রত্যেকের স্বধর্ম্মের 'দাবী' যেমন আছে—তেমন উহার 'দায়িত্ব'ওত আছে! এই ব্যক্তিত্ব! ব্যক্তিগত স্বধর্ম্মসেবাই প্রত্যেক মনুষ্যের অধ্যাত্মজীবনের পরমতম দায়িত্ব। তবে, পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের দাবী তোমার 'স্বধর্ম্ম দাবী'র বিরোধী কিংবা বিপরীত হইতে পারে। উহাই ত সাহিত্যে সমাজে ধর্ম্মে নরজীবনের সকল Tragedyর মূল! সেরূপ দুরদৃষ্ট পক্ষে, উহাদের দাবী (পার ত) চুকাইতে হইবে; 'অপারৎ' পক্ষে, উহাকে তাচ্ছিল্য করিয়াও, তোমাকে 'আত্মার স্বধর্ম্ম' দাবীই রক্ষা করিতে হইবে—'মরিয়া' হইয়াই রক্ষা করিতে হইবে। ইহাই অধ্যাত্মক্ষেত্রে ভারতের 'স্বধর্ম্ম'বাদ এবং উহার 'প্রপত্তি' শাস্ত্র মহাভারতের একটা শ্লোকেই সংক্ষিপ্ত আছে—

ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ ॥

অন্যথা, মহাত্মা খ্রীষ্টের বাক্যানুসরণে বলিতে পারি, জীব সমগ্র পৃথিবী জয় করিলেও কি হইবে, যদি তাহার নিজের আত্মাটী হারাইয়া বসে! এই 'আত্মা'র দাবী ও দায়িত্বই ভারতের ভাষায়, স্বধর্ম্মের দাবী ও দায়িত্ব! এজন্য প্রত্যেক জীবের পক্ষে, স্বধর্ম্মপথ চিনিয়া লওয়ার মধ্যেই তাহার জীবনের সাফল্য বা নিষ্ফলতা; উহার মধ্যেই জীব-জীবনের প্রধান Education Problem—সাধন সমস্যা। অধ্যাত্মজীবনে 'গুরু' বলিয়া কোন পদার্থের কিছু প্রয়োজন বা গুরুর কোন কর্ত্তব্য থাকিলে, তাহাও এ'স্থানে। এজন্য, বলিতে পারি, গীতার 'অধ্যাত্ম সাধন'বার্ত্তার পরেই দ্বিতীয় মহাতত্ত্ব, এই 'অধ্যাত্ম অধিকার'। যোদ্ধ্ পুরুষ অর্জ্জুন ক্ষণিক বুদ্ধি-স্তম্ভন এবং 'শ্মশান বৈরাগ্যের' বশীভূত হইয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়াই বলিয়া বসিলেন, 'যুদ্ধ করিব না'। পরমদর্শী শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনের গুরু হইয়া দেখাইয়া দিলেন, "এ ত তোমার মর্কট বৈরাগ্য; ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে ক্লৈব্য—ভীরুতা—"অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যং অকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন"। তুমি যুদ্ধ-স্বধর্ম্মী বীর; চিরজীবন এ যুদ্ধের জন্যই নিজকে প্রস্তুত করিয়া আসিয়াছ; দ্বাদশ বৎসর—সংখ্যা করিলে নিজের জীবনের চব্বিশটি বৎসর—বনেজঙ্গলে, স্বর্গে-মর্ত্ত্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যুদ্ধতত্ত্ব শিক্ষা করিয়া আসিয়াছ; আজ তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা জীবনের কোন উচ্চতর আদর্শ ধারণায় ত নহে—আত্মান্ধতা—জড়তা! তোমার এ জীবনটি একেবারে 'পণ্ড' হইয়া যাইবে যে! আবার যে জীবনের এই 'পাঠ' পড়িতে হইবে! এস, যুদ্ধ কর! "হতশ্চেৎ লপ্স্যাসে স্বর্গং জিত্বাচেৎ ভোক্ষ্যসে মহীম্"! এই ক্ষাত্র কর্ম্মের যোগপথেই তুমি আত্মজীবনে 'পরাপর'তত্ত্বের লক্ষ্যে অগ্রসর হও। জ্ঞানীর ধর্ম্ম বা কর্ম্মত্যাগীর পদ্ধতি তোমার পক্ষে বর্ত্তমান জীবনক্ষেত্রে একেবারে অকর্ম্ম—পরধর্ম্ম—সুতরাং অধর্ম্ম—বিনাশের চেয়েও ভয়ঙ্কর। জীবমাত্রের পক্ষে এই "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহ"।" জীবনতন্ত্রে, ইহা অপেক্ষা সত্যকথা বা গভীর কথা কোন অধ্যাত্মশাস্ত্র কিংবা ধর্ম্ম

উপদেষ্টা বলিতে পারেন নাই। উহার নামই ত ইংরাজী মোটা কথায় Individualism! গীতাকার একেবারে একটা 'চরমপন্থী' দৃষ্টান্ত লইয়া, পরম তত্ত্ববেত্তার সাহসে, অবস্থাবিশেষে 'মারাকাটা' প্রভৃতিই 'ধর্ম্ম' বলিয়া ব্যবস্থা করিতেছেন। ক্ষাত্র প্রকৃতির ব্যক্তিগণ ভগবানের বিশ্বপ্রকট যেই গুণ বা 'রূপ'তত্ত্ব 'দর্শন' করিবে—স্বধর্ম্মের দৃষ্টিস্থান হইতেই দেখিবে—উহা ত ওই প্রকার ভৈরব রূপ! তেমন বশিষ্ঠও পূর্ব্বোক্তরূপে, জীবন প্রবেশে উদ্যত, ভারতের হৃদয়রাজা ও 'ধর্ম্ম' আদর্শভুত, বীরধর্ম্মা রামচন্দ্রকে অবলম্বন করিয়াই জীবজীবনের 'বেদান্তবিজ্ঞান' প্রচার করিতেছেন। জীবন সাধনার চরম চাবীটাই যোগ্য শিষ্যহস্তে অর্পণ করিতেছেন! এ সূত্রে 'সাহিত্যসেবীর' স্বধর্ম্মটুকুও বুঝিতে হয়। উহা কি? উহাও এই Individualism নহে কি? সাহিত্যসাধনায় ব্যক্তিত্বের দাবী এবং ব্যক্তিগত স্বধর্ম্মবিকাশের দায়িত্ব! অতএব, সাহিত্যসাধকও বলিতে পারে, হে বাদরায়ণ-পতঞ্জলি এবং ব্যাস-বশিষ্ঠ, ও শ্রুতির অনামিক ঋষিগণ, যাঁহারা পৃথিবীতে নিজের নামটুকু রাখিয়া যাওয়াও উচিত বা লোভনীয় মনে কর নাই সে-ঋষিগণ, যাঁহারা জীবের চরম 'এক'তত্ত্ব এবং 'এক প্রাপ্তি' বার্ত্তার সঙ্গে সঙ্গে মানব জগৎকে 'স্বধর্ম্মগতি'র উদ্দেশও দিয়া গিয়াছ, সেই-তোমাদিগকে শত শত নমস্কার! সাহিত্য-সেবক ও সাহিত্যসাধক আমি, যেমন ব্যাসপতঞ্জলি নহি, তেমন সেকস্‌পীয়র স্কট্ ও যে নহি, আমি যে 'আমি' এবং সে আমিত্বের পরিচয় ও পরিপূর্ণতা সাধন করাই যে আমার সাহিত্যসাধনা, তাহা বুঝিতে এবং জীবনপথে 'আত্মসাধন' করিয়া চলিতে যাঁহারা শিখাইয়া গিয়াছ, সে-তোমাদের চরণে শতসহস্র নমস্কার!

জগতের 'তৃতীয়'তত্ত্ব বিষয়ে ভারতীয় অদ্বৈতবাদীর এই যে সিদ্ধান্ত, সর্ব্বজগতের তত্ত্বজিজ্ঞাসু 'মীষ্টিক'গণ ইহার সমর্থন করিয়া 'সাক্ষ্য' দিতেছেন। 'বেদান্ত দর্শন' সর্ব্বধর্ম্মের চরম তত্ত্বকেই দার্শনিক ভিত্তিদান পূর্ব্বক বাক্যসূত্রে নিবদ্ধ করিতেছে। ব্যাবহারিক ধর্ম্মকর্ম্মে বিভিন্ন 'ইষ্টদেবতা'র

উপাসক ও দ্বৈতবাদী হইয়াও খ্রীষ্টান মৌষ্টিকগণ (ঘনিষ্ঠ তত্ত্ব গবেষক মাত্রেই) চরমের 'এক'তত্ত্বের কথাই বলিতেছেন ; পরমের সঙ্গে 'আত্মা'র অভিন্নতা বা Unitive state টুকুই 'চরম সত্য' বলিয়া শেষ করিতেছেন। সুফীতন্ত্রের ইসলামী সাধকগণ এবং মহাযান তন্ত্রের বৌদ্ধ যোগিগণও প্রকারান্তরে সেই 'এক'তত্ত্বের কথাই কহিতেছেন। যীশুখ্রীষ্টের একটা অমূল্য কথা—যাহার মর্ম্ম দ্বৈতবাদীগণ বুঝিতে চাহেন না—"I and my Father are one"। খ্রীষ্টানদর্শনের এই 'খ্রীষ্ট'বস্তুর নামই 'Word', যাহা "In the begining was with God and was God", যাহা সৃষ্টিক্ষেত্রে Divine Manifestation—যাহা সৃষ্টিরূপী Eternal Generation—যাহা আমাদের কথায় "মায়া-উপহিত ব্রহ্ম" বা 'ঈশ্বর' বা "শব্দব্রহ্ম"। অতএব খ্রীষ্টের মধ্যে নবজন্ম বা 'দ্বিতীয় জন্ম' সাধন করার পথে, খ্রীষ্টাত্মার সঙ্গে 'এক' হওয়ার পথে, বিশ্বের চরম কারণে অদ্বৈতত্ব লাভ করাই, ফলতঃ, খ্রীষ্টানীয় সাধনা। এই 'এক'তত্ত্বকে কোনরূপ 'ব্যক্তি'র হিসাবে দর্শন করাই নিম্নতর স্তরের কথা—ব্যাবহারিক ক্ষেত্রের কথা। উহা কদাপি সত্যের 'স্বরূপ কথন' নহে (১)। 'এক'এর অর্থ কি? "যিনি আমার ভিতরে

৫৫। সাহিত্যে সৌন্দর্য্যের তৃতীয়বস্তু-রসিক কবি ও তাঁহার 'এক' তত্ত্বের স্বরূপ।

(১) আণ্ডারহিল বলিতেছেন "The greatest mystics, however Ruysbroeck St john of the Cross and St Teresa herself in her later stages distinguish Clearly between the indicible Reality which they perceive and the image under which they discribe it. Again and again they tell us with Dionysious and Eckart that the object of their Contemplation "Hath no Image" : or with St John of the Cross that "the Soul Can never attain to the height of the divine union, so far as it is possible in this life, through the medium of any form or figures." Therefore, the attempt which has sometimes been made to identlfy Mysticism with such forms and figures—with visions, voices and supernatural favours—is clearly wrong"—খ্রীষ্টান মীষ্টিসিজমের জিজ্ঞাসুগণ এ বিষয়ে ইংরাজীতে

'আত্মা', 'দ্রষ্টা', 'সাক্ষী' বা 'তৎ'পদার্থ তিনি যে কেবল এই পার্থিব 'জীব' বা ভূতগ্রামের 'সাক্ষী' পদার্থ তাহা ত নহে, এই সর্ব্বগ্রহেশ্বর সূর্য্যের জগতের, এরূপ অনন্ত কোটী সৌর জগতের (মানুষ কেবল সাত কোটী সৌরজগৎ মাত্র জানিতে বা গণিতে পারিয়াছে) এবং এরূপ 'অনন্ত' জীবগ্রামের ও ভূতগ্রামের যুগপৎ 'সাক্ষী'পুরুষ ত তিনি! তাঁহার সঙ্গে Unitive state এর অর্থ যে কি, তাহার বহরটুকু তত্ত্বচিন্তক মাত্রকেই ঘনিষ্ঠ ভাবে বুঝিতে হয়। ক্ষুদ্র মনুষ্যমস্তিষ্কের পরিমিতপ্রিয় কল্পনায় উহা ধরে না। কিন্তু, দ্বৈতব্যবহারী 'ভক্ত' ও পূজক মাত্রকেই ত 'মর্ত্ত্য পুত্র'কে বা 'অবতার'কে 'স্বর্গস্থ পিতা' হইতে অভিন্ন মানিয়াই চলিতে হইবে! পুত্রের সঙ্গে একাত্মা হইলেই পুত্র তোমাকে পিতৃপদে লইয়া যাইবেন, ইহাই ভক্তের আশার কথা—Message of Hope। এ স্থলেই ত গীতার সেই "দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে"! এস্থানেই 'এক'ত্ব বা 'অভিন্নতা'র স্বীকার—দ্বৈতবাদী উপাসক যাহার নাম শুনিতে পারেন না। এ স্থলেই মানুষের সকল 'ধর্ম্ম'আদর্শের মিলনস্থান ও সমতা। আবার, এই 'একতা' এবং 'অভিন্নতা' বুদ্ধির মধ্যেই ত সকল সাহিত্যিক Mysticism এর গোড়া! উহাকে সঙ্কেতিত করিয়াই 'পঞ্চদশী' বলিতে-ছেন—"অদ্বৈতে ত্রিপুটী নাস্তি ভূমানন্দোঽত উচ্যতে"; (১) উহাকে উদ্দেশ্য করিয়াই ত পরমভক্ত ও উপাসিকা সেণ্ট্ ক্যাথেরীন (of Siena) বলিতেছেন—"Secrets are revealed to a friend who has become *one thing* with his friend and not to a servant"; অপর সেণ্ট্ ক্যাথেরীন (of Genoa) বলিতেছেন—"My Me is God; nor

শ্রেষ্ঠ সংগ্রহ গ্রন্থ আণ্ডারহিলের Mysticism দেখিতে পারেন। উহাতে ভারতীয় অদ্বৈততন্ত্রের কোন প্রকৃত ধারণা নাই, সুফীতন্ত্রের ও নাই; তবে, খ্রীষ্টান জগতের 'মিষ্টিক' সাধকগণের অনেক চমৎকারী বিবরণ আছে। দেশে ও কালে বিপরীত ব্যবহিত এবং বিভিন্ন পথিকের মুখে 'এক কথা' শুনিয়াই চমৎকৃত হইতে হইবে।

(১) জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতার সম্ভিন্নতার নামই ত্রিপুটী।

do I know my Selfhood save in Him". ইয়োরোপে অদ্বৈত আদর্শের প্রধান 'ঋষি' রিসিজাগ (Recejac) বলিতেছেন—"চূড়ান্তে গিয়া মানবাত্মা Finds itself Possessed by a Being at one and the same time greater than the self and identical with it: Great enough to be God, intimate enough to be Me." এরূপ 'একাত্মতা' বা অদ্বৈতত্ব ব্যতীত যে পরমার্থ নাই, ইসলাম জগতের যত ভক্ত এবং সাধক সকলেই ত সে সাক্ষ্য দিতেছেন! ঐকান্তিক প্রেমের চরম প্রাপ্তিই একাত্মতা ও অভিন্নতা। সুফি কবি জামীর কথা—

All that is not one, must ever
Suffer with the wounds of Absence;
And whoever in Love's city
Enters, finds but room for one
And but in one-ness, union.

চরম সত্যের ইহাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ প্রকাশ মানুষের ভাষায় আসে নাই। উহার পর, কথায় বলিতে গেলে, ভাষাতীতের ও ভাবাতীতের কথা—জীবত্বের অবসান ও ভূমাত্বে প্রবেশ! খ্রীষ্টান মীষ্টিকগণ যাহার সংজ্ঞা দিয়াছেন—Deification!— Self Consciousness হইতে World-consciusness এর পরম ধামে—'এক'এর ধামে! সাস্মিতার রাজ্য হইতে সানন্দ রাজ্যে; যোগদর্শনের ভাষায়, অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্ব্বিকল্প ধামে! 'কথা' আর নাই বা বলিলাম।

'আত্মতত্ত্ব' বিদ্যার পরিজ্ঞান ব্যতীত সাহিত্যিক মীষ্টিসিজমের বহস্য যেমন হৃদয়ঙ্গম হইবে না; 'অদ্বৈত' আদর্শের জ্ঞান ব্যতিরেকেও মীষ্টিক সাহিত্য বোধে যোগ্যতা হইবে না। তবে, খ্রীষ্টান জগতের এই Mystic 'ধর্ম্ম'সাহিত্যে প্রবেশেচ্ছু ভারতীয় মাত্রকে একটী বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিতে হয়। বিজাতীয় ধর্ম্ম কিংবা বিজাতীয় সাহিত্যের গবেষক মাত্রকে সর্ব্বসময় চিত্তের হঠকারিতা এবং হঠসিদ্ধান্ত বিষয়ে সাবধান

থাকিতে হয়। ইয়োরোপের অনেক লেখক ভারতীয় বিষয়ে অজ্ঞতার পরিচয় যেমন দিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমরাও তেমনি হঠসিদ্ধান্তের পরিচয় দিতে পারি। বৈদিক দর্শনের 'ঋষি' সর্ব্বজীবের আত্মভূমি এবং সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় স্থানে দাঁড়াইয়াই তাঁহাদের 'অধ্যাত্মবিদ্যা' প্রচার করিয়াছিলেন। সর্ব্বজীবের স্বপ্রত্যয় স্থানে যে চরম 'এক' পদার্থকে তাঁহারা চিনিয়াছিলেন উহারই চূড়ান্ত নাম দিয়াছিলেন—আত্মা বা ব্রহ্ম; প্রত্যেক জীবের Ego পদার্থের সাক্ষী রূপে যে তত্ত্ব থাকিয়া, নিজের 'ঈক্ষণেই' এ ভবসংসার সম্ভাবিত ও প্রসারিত করিয়া, উহার দ্রষ্টা বা ভোক্তা রূপে নিত্য আছেন, জগৎ কারণ, অনন্তশীর্ষ, অনন্তাক্ষ ও অনন্তপাদ সেই 'এক তত্ত্ব' এবং সত্যকেই তাঁহার স্বরূপস্থানে নাম দিয়াছিলেন 'ব্রহ্ম'! সুতরাং, বিকারী, পরিণামী ও সাবয়ব এই বিশ্ব সৃষ্টির সকল Realative সম্বন্ধের এবং 'ত্রিপুটী' বা Image এর অতীত যেই Absolute বা অবিকারী, অপরিণামী ও নিরবয়ব তত্ত্ব উহাই ত 'সর্ব্বকারণ ব্রহ্ম' 'এক', 'সত্য' বা 'আত্মা'! আত্মার এই অর্থ না বুঝিয়া, উহাকে কেবল 'Self' রূপে ধরিয়া স্বদেশের এবং বিদেশের অনেক বড় বড় পণ্ডিতেও ভুল করিয়াছেন। এ 'দৃষ্টি'-স্থান হইতে ঋষি সর্ব্বজীবের জন্যই 'অধ্যাত্মগতি'র যোগ বিজ্ঞান (Science) প্রচার করিয়াছেন। একান্তভাবে সততযুক্ত এবং 'Word' প্রেমিক খ্রীষ্টান মীষ্টিকগণের মধ্যেও, তাঁহাদের সিদ্ধিক্ষেত্রে, ঋষিপ্রোক্ত 'আত্মপ্রাপ্তি'র পরম প্রমাণই প্রত্যক্ষ করিবেন। সকল 'ভক্তি'ধর্ম্মের ন্যায়, সকল ভাবসাধকের ন্যায় তাঁহাদের মধ্যেও আদিবন্ধে কোন 'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা' নাই; তাঁহারা অকস্মাৎ নিজের 'অভ্যন্তর' হইতেই অন্তরতমের 'ডাক' শুনিয়া বা ইষ্ট দেবতার ক্ষণিক Vision দেখিয়া, প্রথম 'জাগরিত' হন; তাঁহাদের অধ্যাত্মজীবনের সুরু হয়। অন্যকথায়, 'বিভুকৃপা' হইতেই, বা নিত্যবস্তুর আহ্বানে জাগরিত হইলে পরেই, তাঁহাদের মধ্যে নিত্যপ্রেম এবং নিত্যানিত্য-বিবেক ও অনিত্য-বিতৃষ্ণা প্রবল হয়; উক্ত 'জাগরণ' হইতেই নিজের 'পাপবোধ' আসে এবং আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে তপস্যার

আরম্ভ হয়; তাঁহারা বৈরাগ্য ও সর্ব্বস্ব-ত্যাগের পথে সেই 'পরম-রসময়' এবং প্রেমসুন্দরের ও পুণ্যসুন্দরের সান্নিধ্য, সমতা এবং পুণ্যধাম লাভের জন্য অধ্যাত্মসাধনার মহাজীবন আরম্ভ করেন। এরূপ 'শুদ্ধি'র পথে জীবকে চরমের যোগ্য করিবার জন্য প্রেমময়ের অপরূপ 'লুকোচুরী' খেলার বার্ত্তাও তাঁহাদের মধ্যে পাওয়া যাইতেছে। সাধকগণ উহার নাম দিয়াছেন Love's Game। এইরূপে জাগরণ, তপস্যা, অর্দ্ধ'আলোক' ও মহাবিরহের (Dark night of the soul) পথে সাধক ক্রমে প্রেমময়ের পরম তৎপদ ও নিত্য স্বরূপের সঙ্গে চরম যোগ (Unitive state) পদবীতে উৎক্রামণ করেন। অনেক খ্রীষ্টান সাধক তাঁহাদের এই অধ্যাত্মজীবনের বিবরণ স্বতন্ত্রভাবে রাখিয়া গিয়াছেন—ভারতীয়গণ যাহা করিতে চাহেন না। ইয়োরোপের বিভিন্ন স্থানের অন্ততঃ বিংশতি ভক্তসাধকের জীবনীর মূল বার্ত্তা বুঝিলে স্তম্ভিত হইবেন। কি আশ্চর্য্য! সকলেই এক কথা কহিতেছেন! সত্যের এমন সমর্থনা, যাহা ঘনিষ্ঠ গবেষকমাত্রকে একটা অসংশয় স্থানে এবং বিশ্বাসপদবীতে লইয়া যায়। ইহা স্থির যে, এ সকল ভক্তের 'ডাক' প্রথমতঃ অভ্যন্তর হইতে আসে; অন্তরের Vision বা স্পর্শ হইতেই আসে—বাহির বিশ্বের ঐশ্বর্য্যাদি হইতে কদাপি নহে। উহাতেই সাধকের অন্তর্জীবনের আরম্ভ। তাহার পর, সকলে আপনার অন্তরপথেই 'পরম'কে খুঁজিতে থাকেন। এই 'আত্ম'-পথ যেমন অধ্যাত্মসাধক মাত্রের সাধারণ তত্ত্ব—তেমন আমাদের 'বৈরাগ্য'ও অধ্যাত্মসাধনার পথে একটা অপরিহার্য্য তত্ত্ব! Detachment, Mortification, পাপবোধ, পুণ্যপ্রেম! এ সকল 'পথে' প্রেম-পথিক মাত্রকেই চলিতে হয়। তারপর, চরমে উপনীত হইয়া মৌষ্টিক সাধক জাগতিক জীবনসম্বন্ধে কি লাভ করেন? তাঁহাদের সেই 'বৈরাগ্যজীবন' বা জগৎ-বিতৃষ্ণ জীবনের অবসান হয়—তাঁহারা পরিশেষে 'শান্তি' ও নিবৃত্তি পদ লাভ করেন। সর্ব্বত্যাগী হইয়া গিয়া, একেবারে self stripping করিয়াই তাঁহারা ব্রহ্মপদে যেন আবার সর্ব্বকে পুনঃপ্রাপ্ত হন! ব্রহ্মে নবজন্মের পর

সংসারেও দ্বিতীয় জন্ম ! ঠিক আমাদের 'জীবন্মুক্ত' অবস্থা ! সর্ব্বত্যাগী হইয়া পরমপদে যাইয়া তাঁহারা দেখেন বিশ্বসৃষ্টি কি ? দেখেন, 'আমিই ত সর্ব্ব'— যে কথা বেদপুরাণে সর্ব্বত্র মহাসিদ্ধান্ত রূপেই নির্ব্বচনা লাভ করিয়াছে ! 'জীবন্মুক্ত' যেমন বুঝিতেছেন, 'আমিই সেই'; তেমন দেখিতেছেন (বিশ্ব কারণ সেই 'এক' ও সত্যস্বরূপের সঙ্গে একতা ও সমতা বা Unitive state লাভ করিয়াই দেখিতেছেন) 'আমিই সর্ব্ব'। "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্ অথৈতেক রসাত্মকম্।" তাঁহার প্রাণ মন ও জীবন ভবসৃষ্টিরূপী Becoming এর সঙ্গে, এই বিশ্বসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গতি ও একতা লাভ করিয়াছে। অতঃপর, তাঁহার জীবনে Ego-সম্পর্কিত কিংবা অহংকার-জনিত সকল সুখদুঃখের অবসান। I-hoodএর অভিমানময় সকল দ্বৈতভাবের, সকল Relative ভাবের অবসান। জীবন্মুক্ত পরম সৎস্বরূপের, Absoluteএর বা বিশ্বদ্রষ্টার একাত্মতা লাভ করিয়া, যুগপৎ সেই বিশ্বাতীত ধামে উপনীত এবং বিশ্বগত ক্ষেত্রেও অবস্থিত। তিনি সর্ব্বাত্মা—"সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা"। গীতার ভাষায়, তিনি সুতরাং সর্ব্বাত্মায় সুস্থিত, সর্ব্বে স্থিতধীঃ বা 'সর্ব্বভূত হিতে রত' থাকিয়াই জীবন যাপন করেন। ইহাই ত জীব-জীবনে 'ব্রহ্ম-প্রতিষ্ঠা' ও 'ব্রাহ্মীস্থিতি' !

এই 'তৃতীয় তত্ত্ব' ! 'জীব' ও 'জগৎ' সঙ্গে উহার এই সম্বন্ধ ! সুতরাং, এ বিষয়ে সাহিত্যচিন্তার গ্রন্থে এত আলোচনা ও বাহুল্যের কারণ প্রত্যেক সাহিত্যসেবীকে প্রাণমর্ম্মে বুঝিতে হয়। আপাততঃ স্থূল-দর্শীর দৃষ্টিতে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে, সাহিত্যের তত্ত্ব বিচারে এপ্রসঙ্গ কেন ? এসকল ত ধর্ম্মের বা রিলিজন তরফের কথা—দর্শনের কথা। ইয়োরোপীয় 'সাহিত্যদর্শনে' ত এই প্রসঙ্গ অবলম্বিত হয়না ! ঘনিষ্ঠ গবেষক মাত্রেই বুঝিবেন, খৃষ্টান ইয়োরোপে বা অন্যদেশে 'তৃতীয়' তত্ত্বকে ধর্ম্ম ও দর্শনের কোঠায় 'কোণঠেসা' করিয়া রাখা হইয়াছে সত্য ; কিন্তু উহাপেক্ষা 'বড় ভুল' আর হইতে পারে না। এ ভুল হইতেই আধুনিক ধর্ম্ম-সমাজ-সাহিত্য সমস্তই সত্যের নৈকট্যস্থান ও সত্যপ্রতিষ্ঠা হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। এ ভুল হইতেই আধুনিক মানবজীবনে সর্ব্বত্র দুশ্ছেদ্য সমস্যা সমূহের উৎপত্তি

হইয়াছে। ভারতের দৃষ্টিতে, একত্ববাদীর দৃষ্টিতে এই তৃতীয়ের কথাই বিশ্বের আদি-অন্ত-মধ্যের নিত্যসত্যের কথা—মনুষ্যের ধর্ম্মদর্শন-সাহিত্য-সমাজ-পরিবার ও 'ব্যক্তি'র অদৃষ্ট এবং নিয়তির চরম 'সত্য'। যাহা বিশ্বের চরম সত্য, সকল সত্যের ভিত্তিভূত 'সত্য', সকল রস এবং সৌন্দর্য্যের নিদান রস এবং সৌন্দর্য্য তাহার যথোচিত ধারণা ব্যতীত কবি-সরস্বতীর মূলতত্ত্ব দাঁড়াইতে পারে না; বাণীমন্দিরে প্রবেশের অধিকারও হয় না। সত্যকে অখণ্ড দৃষ্টিতে এবং অখণ্ড স্বরূপেই দেখিতে এবং বুঝিতে হইবে; কোন দিকে খণ্ডিত করিতে গেলেই অর্দ্ধদৃষ্টি এবং ভুল। 'তৃতীয়' যে জীব ও নিসর্গ ব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্র পদার্থ তাহা ত নহে, যুগপদ্ উহাদের অন্তর্গত ও বহির্ভূত তত্ত্ব। বিশ্ব সৃষ্টির নিদান ও উপাদানভূত এবং যুগপৎ উহার অতিক্রামক ও অধিক্রামক তত্ত্ব বলিয়া এই 'তৃতীয়' গৌণ বা মুখ্যভাবে সাহিত্যেরও সর্ব্বস্ব। 'তৃতীয়' যেমন জীবজীবনের সকল জ্ঞানকর্ম্ম ভাবের চরম লক্ষ্য, তেমন সাহিত্যেরও চরম রসলক্ষ্য না হইয়া পারে না। "তৎসৎ" পদার্থই 'সর্ব্ব' হইয়াছেন; সুতরাং সাহিত্যের সকল সত্য-জ্ঞান-আনন্দ'বস্তু ও সৌন্দর্য্যবস্তু যাঁহা হইতে উপজাত হইতেছে, তদ্বিষয়ে বিশদ বুদ্ধি ব্যতীত সাহিত্যের 'সত্য সৌন্দর্য্য'ও দাঁড়ায় না। মানুষকে ধর্ম্মতন্ত্রী ও সত্যভিক্ষু জীব বলিলেই যথার্থ বলা হয়; মূলের সেই অপ্রাপ্ত 'এক'তত্ত্বের প্রেরণাই মানুষকে পূজাকর্ম্মী ও সত্যসন্ধ করিতেছে। এ বিষয়ে সকল সাংপ্রদায়িক 'ধর্ম্ম গোড়ামী' ও সঙ্কীর্ণতার মূলেই, বলিতে পারি, পরের দৃষ্টিস্থানটুকু বুঝিতে অনিচ্ছা—পরের মর্ম্মে সহানুভূতির অভাব। এ 'সত্য'দৃষ্টি ও সহানুভূতি ব্যতীত যেমন বহুপন্থী ভারতে শ্রেয়ঃ নাই—তেমন খ্রীষ্টান ইয়োরোপেও নাই—ইসলাম বা বৌদ্ধ জগতেও নাই। এক খ্রীষ্টধর্ম্মেই শত শত 'সত্য'সাধনার পন্থা, সত্য ধারণার শত মত বা শত শত যথাভিমত মনোমূর্ত্তির ও মনোরীতির উপাসক দাঁড়াইয়া গিয়াছে! মনুষ্যের এই 'ধর্ম্ম' প্রবৃত্তির সত্যনিদান বিষয়ে প্রকৃত তত্ত্বদর্শন লাভ না হইলে, জীবের চিত্তে এবং তাহার সকল জ্ঞানকর্ম্মভাবের গোমুখীতেই একটা বাধা ও সঙ্কীর্ণতার 'বাঁধ' পড়িয়া যায়।

'তৃতীয়'কে মানুষের স্থায় একটা 'ব্যক্তি' স্থির করিয়া, উহাকে একটা Personal God করিয়া ধর্মগ্রন্থে অবরোধ করা হইতে জাতিতে জাতিতে দেশকালপাত্র ভেদে উহার স্বরূপভেদ এবং উহা হইতেই সাম্প্রদায়িকতা ও 'গোঁড়ামী'র উৎপত্তি। উহা হইতেই শতসহস্র প্রকারের সঙ্কীর্ণতা মানবের জ্ঞান-কর্ম্ম-ভাবের সত্যস্ফূর্ত্তিকে সীমাবদ্ধ করিয়া তাহার মনোদৃষ্টি সমক্ষেই 'ঠুলি' আঁটিয়া দিয়াছে। সাহিত্যসেবীকে সর্ব্বাগ্রে এই 'ঠুলি' হইতেই আত্মমুক্তি সাধন করিতে হয়। এই বিশ্ব ভুবন ও বিশ্বের জীবজীবনের সকল বহুত্ব যে কবির দৃষ্টিতে একেরই পরিপ্রকাশ, যে কবির লেখণীতে ধর্ম্মমাত্রে একই 'সত্যতৃষ্ণা'রূপ 'বৃহৎ বন্ধণী'গত হইয়া পরিস্ফুট, তাহার মনোদৃষ্টিতে এবং লেখণীর সত্যসিদ্ধি ও রসানুভূতির পরিপ্রকাশে একটা পরম উদারতা, উদাত্ততা ও মুক্তির আবহাওয়া প্রবাহিত না থাকিয়াই পারে না। কবিকুলে এখানেই কৌলিন্য পদবী।

মানবের অধ্যাত্ম তরফে মোটামোটি চারিশ্রেণীর বা চারি প্রকৃতির জীব দেখা যায়। কতকগুলি সহজেই, অগম্যকারণে, জন্মস্বত্বে অথবা অবস্থা এবং শিক্ষার স্থকৃতিসৌভাগ্যেই পরম বিমুক্তাত্মা ব্যক্তি—তাঁহাদের জ্ঞানকর্ম্মে কিংবা ভাবে কোথাও কুবিজ্ঞানের, অসত্যের বা অধর্ম্মের আধিপত্য প্রভাবিত হইতে পারে না; তাঁহারা জীবজীবনের সহজ কৌলিন্যেই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা ও প্রাণের শান্তিস্থান লাভ করিয়া পরের দৃষ্টান্ত-পদবীতে স্থির হইতে পারেন। এরূপ লোকের সংখ্যাই জগতে 'কোটিকে গুটিক মিলে'। অন্যেরা, কেহকেহ শিক্ষাসাধনায় বা বিচারগবেষণায় মনের বিমুক্তি ও জীবনে অসংশয়স্থান লাভ করিয়াছেন; কেহ কেহ বা সংশয়িত ভাবেই খুঁজিয়া চলিয়াছেন—কিন্তু, তাঁহাদের প্রবৃত্তিও কুত্রাপি 'সত্য'তত্ত্বের বিদ্রোহী অথবা ব্যভিচারী নহে। বাকী সমস্ত অজ্ঞানতা অথবা বিদ্রোহের অন্ধকারে, আলস্যে, অনিচ্ছায় বা অসদিচ্ছায় কেবল ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ জগৎকে অথবা 'উপস্থিত'কেই সার করিয়া অথবা আত্মজীবনের 'তত্ত্ব' বিষয়ে একেবারে বে-পরোয়া হইয়াই চলিতেছে—

ইহারাই জনসাধারণ; ঋষিগণ যাহাদের নাম দিয়াছিলেন—'লোকায়তিক'। 'প্রাকৃত'চিত্ত বা 'সাধারণ' জীব প্রকৃতির উহাই প্রধান পরিচয় চিহ্ন। প্রথমোক্ত তিন শ্রেণীর জীবহইতেই জগতে সত্যজ্ঞান ও আনন্দের সাধকগণ আসিতেছেন; নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভাপথে, ধর্ম্ম-দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্পের নানামুখে এই 'তৃতীয়' তত্ত্বের সাধকগণই সংসারে প্রকৃত 'আলোকের বার্ত্তা' প্রচার করিতেছেন। সাহিত্যসেবক মাত্রের পক্ষে যেমন তাঁহার স্বকর্ম্মের ও সাহিত্যধর্ম্মের স্বরূপ জ্ঞান প্রয়োজন; তেমন এই "এক" বা তৃতীয় তত্ত্বের স্বরূপ জ্ঞান ব্যতীতও তাঁহার পক্ষে সত্যপ্রবেশ বা সত্যপ্রকাশ নাই। এই তৃতীয় তত্ত্ব বিষয়ে যে কবির 'সংশয়' আছে, তাঁহাকে বলিতে পারা যায়, তাঁহার আশু অপর কোন 'কর্ম্ম' বা কর্ত্তব্য নাই; ওই সংশয়ের এদিক-না-হয়-ওদিক একটা মীমাংসায় না আসিয়া, প্রাণের আনন্দকর্ম্মের নির্ভরযোগ্য ভিত্তিলাভ না করিয়া তাঁহার পক্ষে শিল্পক্ষেত্রে লেখনী ধারণ করাই একটা অকর্ম্ম এবং অনধিকার চর্চ্চা। জগৎ ও ভবজীবন বিষয়ে সত্য-জ্ঞান ও আনন্দ স্থানে স্থির হইতে না পারিলে, তাঁহার জগৎ-পাঠ বা শিল্পচেষ্টামাত্রেই অজ্ঞাতে বিকেন্দ্র হইয়া, অপ্রকৃত, অসত্যসন্ধ এবং বিষাক্ত হইয়া পড়িতে পারে। জাগ্রত জীবমাত্রের নেত্রে এ'জগৎ, সকল অংশে এবং সমগ্রে, একটা রহস্যময় ব্যাপার (Mystery)। যে কবি এই সমস্যা তত্ত্বে জাগরিত হইয়াছেন, তাঁহাকে, অন্ততঃ নিজের পথে, উহার একটা মীমাংসায় আসিতেই হইবে। কোন অটল-অচল সিদ্ধান্তে আসিতে না পারুন, সিদ্ধান্তের চেষ্টা হইতেই তাঁহার অধ্যাত্মজীবন ও মনোজীবনের আরম্ভ হইবে। এরূপ জাগরণ ও প্রযত্নব্যতীত, তাঁহার জীবনে ও শিল্পকর্ম্মে কিছু মাত্র সত্যের আহ্বান বা সত্য-প্রেরণা থাকিবেই না; তাঁহার শিল্পকর্ম্মের মধ্যেও জগতের বা জীবনের ব্রহ্মতালের সঙ্গে কিছুমাত্র সঙ্গতি, পৌর্ব্বাপর্য্য অথবা সত্যানন্দের 'সুরলয়' থাকিবে না। উচ্চশ্রেণীর শিল্পী মাত্রেই কোন-না-কোন দিকে জগতের এবং জীবনের সত্য-জাগরিত ও সমস্যা-চেতন শিল্পী। উচ্চশ্রেণীর কাব্য মাত্রেই মনুষ্যজীবনের কোন না কোন গভীর সত্যসমাচার

বা সমস্যাপূরণের ব্যাপার বলিলেই যথার্থ হয়—অবশ্য, 'রসাত্মক' ব্যাপার। অথচ, সকল সমস্যার সম্পূরণ সেই সর্ব্বাতীত ক্ষেত্রে—সেই 'পূর্ণ'তত্ত্বে—'এক'তত্ত্বে! উহাকে ধর্ম্মের কোঠায় ফেলাই ভুল। 'তৎ'কে সত্যবিজ্ঞানের কোঠায় এবং মনুষ্যমাত্রের জীবন ও শিক্ষাতন্ত্রের অপরিহার্য্য বস্তু রূপেই স্থান দিতে হইবে। উহাকে 'রিলিজন' অধিকারে খণ্ডিত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করাই ইয়োরোপীয় (১) দৃষ্টিরীতির ভুল। এস্থলেই আধুনিক দৃষ্টি ও আধুনিক সভ্যতার দুরারোগ্য হৃদ্‌রোগ। 'তৃতীয়'কে সাম্প্রদায়িক পূজা বা ভক্তিতন্ত্রের Personal God করা হইতে, জেহোভা-গড-খোদা বা শিব-বিষ্ণু প্রভৃতি মনোমূর্ত্তিবদ্ধ ও দেশ কালের সীমাবদ্ধ এবং মনুষ্যগুণ-লিপ্সিত 'ব্যক্তি' করা হইতেই উহা সার্ব্বজনীন সহানুভূতিপদবীর এবং সাহিত্য-ক্ষেত্রের বহির্ভূত হইয়া পড়িতেছে! কিন্তু সকল দেশের, সকল ধর্ম্মের তত্ত্বদর্শী বা মীষ্টিক গণের মধ্যেই দেখিবেন, উহা 'Without any Image'। দেশে দেশে ব্যবহারিক ধর্ম্মে মানুষ 'যথাভিমত' ভাবের বশে উহাকে একটা 'ব্যক্তি'ত্বের Garment বা আংরাখা পরাইয়া 'ইষ্ট'রূপে নিজ নিজ অভীষ্ট লাভের জন্য 'প্রার্থনা' করে বলিয়াই উহার 'ব্যক্তি'ত্ব ও স্বরূপের মধ্যে এত বিভিন্নতা ঘটিয়া পড়ে। এ পথেই যে সকল দেশের ভক্তিধর্ম্মগুলির সকল গোঁড়ামী ও পারস্পর বিবাদ বিসম্বাদের নিদান—যাহাকে 'মনুষ্যের অর্দ্ধেক দুঃখের নিদান' বলিয়া আসিয়াছি—তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই, মনুষ্যের সকল ধর্ম্ম-প্রেরণা ও ধর্ম্মচিন্তার মধ্যে অপরূপ একত্বদর্শী একটা সমন্বয় ঘটিয়া যায়। সাহিত্যসেবী অধ্যাত্মবিজ্ঞানের এই সমন্বয়-স্থান লাভ না করিলে তাঁহার মনোজীবন খণ্ড এবং সাহিত্য জীবনই পণ্ড বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। আরও বলিতে পারি যে, মানবজগতে 'ধর্ম্ম সমন্বয়' বলিয়া ব্যাপার

(১) ভারতের ভুল অন্যদিকে—অধীনতাজনিত মনোমূর্চ্ছা, প্রমাদ-আলস্য-জড়তা, ভণ্ডতা ও আত্ম বঞ্চনা প্রভৃতি

যদি কস্মিন কালে সম্ভবপর হয়, তবে তাহা কেবল সাহিত্যের পথে—এবং কেবল সাহিত্যিক সহানুভূতির ভূমিতে এবং 'তত্ত্ব প্রীতি'র সার্ব্বজনীন ক্ষেত্রেই সম্ভব হইবে। অধুনা, ধর্ম্ম সমূহের মধ্যে বাহ্যিক আচার ব্যবহারের নানা বে-মিল দেখিয়া, অথবা Comparative Religion এর ভূমি হইতে ও 'জড়বাদীর আদর্শে' ধর্ম্মকে কেবল মনুষ্যমনের কল্পনা-প্রসূত বলিয়া নির্দ্দেশ করার একটা বাতিক ইয়োরোপে পরিদৃষ্ট হইবে। উহা কেবল জড়বাদীর আত্মতত্ত্ববিস্মৃত ও অহং-মুখ গোঁড়ামী বা 'বৈজ্ঞানিক গোঁড়ামী' ব্যতীত আর কিছুই নহে। মনুষ্যের সমক্ষে সর্ব্বপ্রশ্নের চরম প্রশ্ন হইতেছে, এই 'তৃতীয়' ক্ষেত্রে সত্য কি? এই 'সত্য' বিষয়ে অসংশয় স্থান উপার্জ্জন করা জীবমাত্রের সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য। তদ্ব্যতীত জীবের সোয়াস্তি নাই; শান্তি নাই; কেননা উহাই তাহার অন্তরাত্মার—তাহার ভিতরের মানুষটীর এক-মাত্র 'খাদ্য'। কোন সংশয় থাকিলে, প্রাণপণে উহার নিরাসে চেষ্টা করা, অন্ততঃ অন্বেষণ আরম্ভ করা হইতেই মানুষের প্রকৃত মনোজীবন বা মনুষ্যত্বের আরম্ভ। উহা না করিলেই মহাপাতক। সাহিত্যসেবীর পক্ষে ত ছাড়াই নাই। কেননা, তৃতীয়কে সর্ব্ব উদ্দেশ্যের চরম উদ্দেশ্য, সকল তরণীর ধ্রুব লক্ষ্য ও ধ্রুবতারা-রূপে ধরিয়াই তাঁহাকে লেখনী চালাইতে হইবে। সেক্ষেত্রে 'সংশয়' হইতেই তাঁহার মধ্যে একদিকে যেমন সত্যভ্রষ্টতা, সত্যদ্রোহ ও অন্ধতা আসিতে পারে; তেমন বিজাতীয় গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতা আসিয়া তাঁহার জীবনধর্ম্ম ও শিল্পকর্ম্ম পণ্ড করিয়া দিতে পারে; তাঁহার মধ্যে অপদার্থতা এবং অপদার্থ-প্রীতিই বাড়াইয়া তুলিতে পারে। এই 'তৃতীয়' তত্ত্বেই সর্ব্বজগতের চরম 'সত্য'দৃষ্টি, চূড়ান্ত সৌন্দর্য্যদৃষ্টি। কবির পক্ষে কোন প্রথম 'কর্ত্তব্য' বা ঈপ্সিত থাকিলে, এ স্থানেই সকল ঈপ্সার চূড়ান্ত শুভস্থলী ও শিব-সাধনা। কবিকর্ম্মের প্রকৃত অধ্যাত্ম গতি এবং পরমার্থই হইতেছে যে তিনি অন্তরতঃ বিশ্বমধ্যে নিজকে, এবং নিজের মধ্যে বিশ্বকে দেখিতেছেন এবং উভয়কে তৃতীয়ে ওতপ্রোত এবং 'এক'তত্ত্বের অন্তর্গত ভাবেই দেখিতেছেন। সে বিষয়ে সচেতন হওয়ার অর্থই 'এক বিজ্ঞান' লাভ করা। তৃতীয়কে সর্ব্বগত 'এক'

অথবা সর্ব্বভাজন 'তত্ত্ব'রূপে উপলব্ধি ব্যতীত সাহিত্যের প্রকৃত 'আত্মা'কে, উহার প্রাণকেন্দ্রকে, শিল্পের অনুপ্রাণণী শক্তির মূল রহস্যকে তিনি কখনও পাইবেন না। এই 'কেন্দ্র' (Focus) অভাবে, তৃতীয় তত্ত্বে চিত্তের জাগরণ এবং যোগের অভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে কত কবি বিভ্রান্ত, বিড়ম্বিত ও ব্যর্থকাম হইয়া গিয়াছেন ; অসামান্য কবি-শক্তি সত্ত্বেও চলিতে চলিতে অতর্কিতে দিশাহারা হইয়া, পথ 'ভ্রষ্ট' হইয়া গিয়াছেন। সাহিত্যজগতে উহার অনেক দৃষ্টান্ত নিদারুণ প্রত্যক্ষ এবং সহৃদয় মাত্রের পরম বেদনা জনক। অনেকে অতুলনীয় নির্ম্মাণশক্তি এবং বাক্যশক্তি সত্ত্বেও, তাঁহাদের বিপুল শিল্পকৃতির সংখ্যামধ্যে, প্রথম শ্রেণীতে গণনীয় একটী রচনাও রাখিয়া যাইতে পারেন নাই! উহারা মূলেই ঘোলাইয়া, বিগড়াইয়া, পণ্ড হইয়া গিয়াছে! প্রথম শ্রেণীর সারস্বত শিল্প হইতে হইতেই, শিল্পীর অতর্কিতে, অজানিতে নামিয়া পড়িয়া কেবল চতুর্থশ্রেণীতে দাঁড়াইয়া গিয়াছে! আবার, 'তৃতীয়' তত্ত্বে অবিশ্বাস বা কুবিশ্বাস হইতেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে আসুরিক রীতি, মনুষ্যত্ব-ভ্রষ্ট বা দেবত্ববিস্মৃত শিল্পপদ্ধতির উৎপত্তি এবং পরিপুষ্টি। এরূপে, আসুরিক কবিত্ব, রাজসিক বা রজস্তমঃ প্রধান প্রকৃতির শিল্পিত্ব এবং তাদৃশ কবির স্থায়ীভাবের প্রকৃতিও রসসাধনী পদ্ধতি নিজের অন্তঃকরণে বুঝিয়া লওয়া যেমন সাহিত্যসাধকের, তেমন সাহিত্য-পাঠকের পক্ষেও অধুনা 'অপরিহার্য্য' হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জগতের কিংবা জগদুপজীবী সাহিত্যের ও উহার সৌন্দর্য্যের মূলীভূত এই তৃতীয় তত্ত্ব। ইহা সচেতন সাহিত্যসেবী মাত্রের সমক্ষে শিল্পরস-সাধনার তরফেও সর্ব্বপ্রধান 'বস্তু'। তৃতীয়ের অস্তিত্ববাদী সাহিত্যিক বা কবিকে বলিতে পারি, এ বিষয়ে বৈদিক ঋষির এই দৃষ্টিস্থান ব্যতীত জগতে প্রশস্যতর দার্শনিক স্থান আর নাই। উহা হইতে যেমন জগতের তেমন সাহিত্যের মূলতত্ত্বে, উহার সত্যসৌন্দর্য্য ও প্রকৃতি তত্ত্বে দৃষ্টি করিলে, প্রথম দৃষ্টিতেই, আধুনিক সাহিত্যের অনেক অন্ধকরী সমস্যার সমাধান হইতে পারে। এ উক্তির সারবত্তা এ গ্রন্থে সর্ব্বত্র অনুভূত হইবে। পাঠককে সে দৃষ্টি-পদবীতে, অন্ততঃ

বিচারযুক্তির পথে পরিচালন উদ্দেশ্যেই আমরা এ বাহুল্য করিয়া আসিলাম। যে কবির হৃদয় নিজের জ্ঞানভাব কর্ম্মকে এবং নিজের কর্ম্মফলরূপী সাহিত্যশিল্পকে জগতের ও জীবনের সঙ্গতিসূত্রে বুঝিতে লালায়িত, সাহিত্যের 'সৌন্দর্য্য', 'সত্য' অথবা 'শিব' আদর্শের ক্ষেত্রে আপাততঃ 'অনতিক্রম্য' কিংবা বড় বড় সংশয়-সমস্যা সমূহ যাঁহার চিত্তকে আলোড়িত করিতেছে, তাঁহাকে বৈদিকদর্শনের 'দৃষ্টি' লাভ করিতেই বলিব। জগৎ ও জীবনের চরম 'তত্ত্ব' বিষয়ে এ দেশের পরম দর্শন ও মহাবিজ্ঞানের নামই 'বেদান্ত'—যাঁহাকে এ দেশের আত্মাদিষ্ট এবং 'জাগরিত'গণ "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" ডাকিয়া উঠিয়া আদিকালেই "পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ"র সমক্ষে ধরিয়াছিলেন! এ মহাবিজ্ঞান বিষয়ে অনেকের একটা মহাভ্রান্তি—অনেক সময়ে বিরুদ্ধদর্শী সাম্প্রদায়িকতার কুপরামর্শ ও আলস্যের উপর নির্ভর হইতেই ভ্রান্তি। অনেক সময় অপ্রেম, অনধিকার এবং সহানুভূতি ও স্বাধীন মনোদৃষ্টির ক্রিয়ারাহিত্য হইতেই ভ্রান্তি। এ ভ্রান্তি বশেই বেদান্তকে অনেকে কেবল 'নাকটেপাটেপি' ও 'চোক বোজাবুজির' ব্যাপার রূপে, কেহ বা নির্ব্বিশেষ 'বিশ্বপলায়ন' ও 'বিশ্ব-ঘৃণা'রূপে বুঝিয়া ফেলেন। বেদান্তের ন্যায় জীবজীবনের প্রকৃত বীর্য্যবান্ বিজ্ঞান ত আর নাই! যেমন জীবের স্বকেন্দ্র হইতে, তেমন 'তৎ'কেন্দ্র হইতে জগতের ও জীবনের দিকে 'দৃষ্টি' এবং উভয়ের সমন্বয়ে 'এক' ও অদ্বৈতপ্রাপ্তির পরম সত্যপথদর্শী এই বিজ্ঞান! অপৌরুষেয় 'আগম' আদর্শ ছাড়িয়া দিলেও, জীবের সহজাত কার্য্যকারণ বুদ্ধি (Causality) বলে কি? বিশ্বসংসার যখন 'এক' হইতে আসিয়াছে তখন সেই 'এক' ব্যতীত জগতে দ্বিতীয় বস্তু আছে কি? 'এক' না দেখিয়া 'বহু' দেখাই ত আমাদের ভ্রম! এস্থানেই ত সৃষ্টির চরম রহস্য! বেদান্ত অপেক্ষা মহত্তর বীরাচারও ত আর নাই— জগতের 'সত্যশিবসুন্দর' তত্ত্বে পরম জাগরিত, অতন্দ্রিত ও আত্মসংস্থ এই বীরাচার! আত্মকেন্দ্রী এই বিশ্বসৃষ্টি—আমার ভিতরে যে আত্মা 'সাক্ষী'রূপে অবস্থিত,

সে আত্মাই পরমাত্মা—বিশ্বাত্মা (১)। ক্ষুদ্রাত্মা, ক্ষীণাত্মা বা সংকীর্ণাত্মা হওয়া ত বেদান্তের লক্ষ্য নহে—বিশ্বাত্মা হওয়া। অন্ন লাভে অন্নিত হওয়াও ত ঋষির পরামর্শ নহে; জীবকে "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি" দেখিবার জন্তই পরামর্শ ও পথপ্রদর্শন। যে ঋষি বলিয়াছেন, 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি", বলিয়াছেন 'রসো বৈ সঃ", বলিয়াছেন "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি", তিনি ত জগন্নিবাসী অথচ জগদ্বিজয়ী মহাবীর। বিশ্ব সংসারকে 'তৎ'কেন্দ্রে পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্ম, মানবকে প্রকৃত সংসাররাজত্বের সিংহাসনে উত্তোলিত করিবার জন্তই তাঁহার সাধনা। জীবনের বাহ্যিক সুখদুঃখে অচলঅটল এই রাজসিংহাসন। বিশ্ব জগতের 'স্বামী' এবং 'মহারাজ' তাঁহার উপাধি। বিশ্বসংসার তাঁহার সমক্ষে 'আত্মা'র কল্পলীলাময় মহাকাব্যরূপে, দেশকালের আসরে সুপরিগীত এবং লীলায়িত। তাঁহার জীবন সাধনার (Realisationএর) মন্ত্রটাও আথর্ব্বনিক একমাত্র কথায় সংগ্রহ করিয়াছেন, "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং সচ্চিদানন্দরূপম্' (২)। সমগ্র বিশ্বসংসার

(১) বিশ্বদর্শনের এই 'আত্মকেন্দ্র' বিষয়ে ইয়োরোপে প্রথম সূচনা করেন দে-কার্ত্তে। (Des cartes) সে বিষয়ে ইয়োরোপের একজন পরম মনীষী দার্শনিক যাহা বলিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি—"In laying down his "Cogito ergo sum" (I think therefore I exist) as the only Certainty and in considering the world's existence as problematical, Descartes found the essential departing point of all philosophy." Schopenhauer: The world as Idea. তবে বেদান্তের "আত্মবাদ" যে কেবল Egoism নহে বা Idealismও নহে; উহা যে এতদুভয় হইতেই উচ্চস্তরের কথা, জীবের পক্ষে উচ্চতম ও পরম সত্যের এবং তাহারই হারাধনের বার্ত্তা তাহাই জিজ্ঞাসুকে সর্ব্বপ্রযত্নে বুঝিতে হয়।

(২) দার্শনিক সিদ্ধান্ত এবং সত্যের সাধন (Realisation) মন্ত্র—এতদুভয়ের পার্থক্য না বুঝিয়াই অনেকে এ সমস্ত কথা বুঝিতে ভুল করেন। Realisation ব্যতীত কোন সিদ্ধান্তের কিছুমাত্র মূল্যও এদেশে নাই। সত্যে স্বপ্রতিষ্ঠার অভাব হইতেই জীবের সংসার গতি। সত্য হইতে 'বিচ্যুতি'ই সৃষ্টি'রূপ পতনের আদি রহস্য। ইহা 'এক'ত্বদৃষ্টির ও 'এক'রসের সাধনা—বহুত্বের নহে। ইহা Monism—Pantheism নহে।

তাঁহার বিবেকদৃষ্টি সমক্ষে 'সত্যজ্ঞান-আনন্দ' (১) মন্ত্রের 'নামরূপ'রসাত্ম মহাচিত্র রূপে প্রসারিত। পরম 'আত্মাই' উহার নিমিত্ত এবং উপাদান, কর্ত্তা, দ্রষ্টা বা ভোক্তা। সেই 'হারানিধি' আত্মপদবী লাভ করাই তাঁহার সাধনা। বিশ্বকবিতার সেই রসিক পদবী, বিশ্ব লীলার সেই দ্রষ্টৃ পদবী ও ভোক্তার পদবী, সেই পরমাত্মারূপী পুরাণ মহাকবির স্বধাম টুকু জীবনের জ্ঞান-প্রেম-কর্ম্ম সাধনায় লাভ করাই ত জীবমাত্রের মহাস্বত্ব ও দায়িত্ব! উহাই জগৎকর্ণে বৈদিক ঋষির Message। যে 'এক' হইতে এ সমস্ত আসিয়াছে, যাহা জানিলে আর কিছু জানিবার থাকে না, যাহা পাইলে আর কিছুই পাইবার থাকে না তাহারই Message. এই 'সুসমাচার' দিয়াই জীবনদার্শনিক ঋষি বলিতেছেন, "শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা—তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি।'

জগদ্বিচারের এই অদ্বৈত দৃষ্টিস্থান যদি বুঝিয়া থাকি, তা হইলে সাহিত্যিক Mysticism বুঝিবার এবং উচ্চসাহিত্যের কবিকৃত্য ও তাহার অধ্যাত্ম স্বরূপ বুঝিবার সময় হইয়াছে।

সত্যানুসন্ধানী সাহিত্যসেবী বুঝিবেন, মীষ্টিকের 'সত্যজ্ঞান-আনন্দ'-বিজ্ঞান কেবল বহিস্তন্ত্রী রিলিজন বা বাহ্যিক উপাসনাতন্ত্রীর গোঁড়ামী নহে; উহা চরম সত্যের ও 'এক' তত্ত্বের পরম দর্শনগভীর এষণা এবং জাগরিত জীবমাত্রের জন্য সেই 'একত্ব'মুখেই জীবন পরিচালনের বিজ্ঞান। উহা জড়াধিকারের 'বিজ্ঞান' নহে বলিয়াই জীবমাত্রকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিসিদ্ধি এবং যোগ্যতা লাভ পথেই এ বিজ্ঞান আয়ত্ত করিতে হয়। এ দিকে যেমন সত্যানুসন্ধানীকে,

৫৬। মনুষ্যের জীবন তন্ত্রে কবিকর্ম্মের স্থান ও স্বরূপ।

(১) সদ্রূপমারুণিঃ প্রাহ, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম বহ্বৃচঃ।
সনৎ কুমার'আনন্দ' মেবমত্র গম্যতাম্। পঞ্চদশী
"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" তৈত্তি। "যোবৈভূমা তৎসুখম্'—ছান্দোগ্য"।
'ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" সনৎকুমার-নারদসংবাদঃ।

তেমন কাব্যকর্ম্মী মাত্রকেই সকল প্রচলিত রিলিজনের প্রাকৃতদুষ্ট ধর্ম্ম-কর্ম্মার গোঁড়ামী পরিহার পূর্ব্বক সাম্যস্থান লাভ করিতে হইবে; সকল ধর্ম্মের (স্বীকৃত কিংবা সঙ্কেতিত) 'এক' তত্ত্বের অনুধাবন পথেই, 'তৃতীয়'বিজ্ঞানকে স্থির করিতে হইবে। এস্থলে গোঁড়ামী এবং অন্ধতা টুকুই মানুষের অধ্যাত্মতরণীর পরিচালন পক্ষে 'চোরা পাহার'। একটী লক্ষণ প্রধান পরিচায়ক রূপেই নির্দ্দেশ করিয়া যাইতে পারি যে, প্রকৃত মীষ্টিক মাত্রেই সর্ব্বত্র 'এক'তত্ত্বদর্শী বলিয়া, নিত্যনিয়ত সমন্বয়দর্শী এবং তিনি জীবনতন্ত্রে পরম কল্যাণবাদী ও আনন্দবাদী—Optimist। মনে পড়িতেছে, কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক বলিয়াছেন, "কেহ কদাপি 'দুঃখী মীষ্টিক' দেখে নাই"—তাঁহারা আনন্দবাদী। এজন্যই ত ভারতে অদ্বৈতবাদী মাত্রের আদর্শভূত 'আনন্দ' উপাধি! তাঁহারা জগতের চরম 'সত্য' এবং সর্ব্বত্র ওতপ্রোত আনন্দ, কল্যাণ ও প্রেমের তত্ত্ব চিনিয়াছেন—জীবের জীবনমাত্রের মূলে, তাহার 'প্রাণ' ধারণের মূলে, বিশ্বের বিকাশের মূলেই আনন্দ। সাধকের দিক হইতে এবং তাহার ভাবদৃষ্টিতে এ আনন্দের নামই 'প্রেম' বা সৌন্দর্য্য। সর্ব্বজীবনের জ্ঞানেকর্ম্মেভাবে আনন্দাত্মাকে লাভ করাই যেমন মীষ্টিকের লক্ষ্য, তেমন কবির সর্ব্ববিধ সাহিত্যচেষ্টারও লক্ষ্য, তেমন উহাই সকল দর্শনবিজ্ঞান ও ধর্ম্মপ্রযত্নের গৌণ কিংবা মুখ্য লক্ষ্য—সৃষ্টিগতির এই 'তত্ত্ব' অদ্বৈতবাদী দেখিতেছেন। কেবল কেহ বা ঋজুপথে, কেহ বা চক্রাবর্ত্ত কুটীল পথে 'হাতড়াইয়া' চলিতেছেন—এ স্থানেই জগৎ-বৈচিত্র্য। বিশ্বের যাবতীয় জীবনবৈচিত্র্যের ক্ষেত্রেও এই 'গৌণ বা মুখ্য' লক্ষ্য ও গতি লইয়াই সকল 'ভাল মন্দ' ও 'ছোট-বড়'র পার্থক্য। জীবন-তন্ত্রের দার্শনিক বলিবেন, একদিন না একদিন সকলকে—বিশ্বসংসারকেই—এই 'এক'পথে ও 'এক'চূড়ান্তে আসিতে হইবে; জগৎগতির উহাই গুপ্ত নিয়তি। 'জীবন'মাত্রেই, সৃষ্টিমাত্রেই সেই 'এক' তত্ত্ব হইতে, 'আনন্দ' হইতে স্খলন বলিয়াই 'অভাব'ময়; সেই পূর্ণ 'ভাব'তত্ত্বের 'বিরহ' বা 'অন্বেষণ'জনিত দুঃখেই

ওতপ্রোত। অন্যদিকে, জীবমাত্রের 'জীবন'স্থানে, পদার্থ মাত্রের হৃদয়ে অতর্কিত সেই আনন্দ-উৎস। যে এই 'আনন্দ'কে চিনিয়াছে ও একের বুদ্ধিসূত্র পাইয়াছে, সেই ত চরমের 'চাবী' পাইয়াছে! দ্বৈত বুদ্ধি, বহুত্ববুদ্ধি বা ভেদবুদ্ধিই ত সকল পাপ-তাপ-দুঃখের ও অজ্ঞানতার মূল—

যস্থ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূৎ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যত॥

অবিজ্ঞান এবং কুবিজ্ঞানই যে সকল পাপদুঃখের মূল—ইহাপেক্ষা বড় কথা কোন দার্শনিক বলিতে পারেন নাই। "তরতি শোকমাত্মবিৎ"। বিশ্বের সর্ব্ব পদার্থের 'সত্য'ভূত 'আনন্দ'আত্মায় যুক্ত হওয়া—সর্ব্বের সঙ্গে একাত্মা হওয়া—সর্ব্বাত্মা হওয়া—এস্থলে যেমন মানবজীবনের চরম ধাম, তেমন কবিত্ব শক্তিরও চরম রস স্থান। অতএব যিনি বা যে কবি

"যস্তু সর্ব্বানি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি"

অথবা "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং, সর্ব্বভূতানি চাত্মনি" দেখিয়াছেন, "সর্ব্বভূতাত্ম ভূতাত্মা" হইয়াছেন, তিনি যেমন জীবনের, তেমন জগতের 'মহারাজ' পদবীতে উঠিয়াছেন; তেমন সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রকৃত 'মহাকবি' পদ এবং চূড়ান্ত 'রসিক পদ' লাভের যোগ্য হইয়াছেন।

সাহিত্যে কবিকর্ম্ম কি? উহার গতি ও নিয়তি এবং অধ্যাত্ম স্বরূপ কি? প্রকৃত কবিমাত্রেই—জ্ঞানে বা অজ্ঞানে—কাহাকে 'পূজা' করিতেছেন? তাঁহার জীবনডালি কে গ্রহণ করিতেছে? তাঁহার জীবনগতি কাহার স্থানে পৌছিতেছে? হয়ত, তাঁহার অনিচ্ছাতেও অতর্কিতে পৌছিতেছে? আনন্দ ব্যতীত 'কাব্যের' প্রেরণা নাই—সকল প্রকাশের বা সৃষ্টিকর্ম্মের মূলেই আনন্দ। এ 'আনন্দ'কেই তত্ত্বদর্শীগণ ভবসংসারে বহুভাবে এবং বহুপথে প্রকটিত 'ব্রহ্মানন্দ', 'কামানন্দ' ও 'বিষয়ানন্দ' প্রভৃতির রূপে দর্শন করেন। অদ্বৈততন্ত্রের সাধকগণ সর্ব্ব আনন্দকে সচেতনভাবে একানন্দে পরিণত করিতে

চেষ্টা করেন বলিয়া, সকল কর্ম্মকে একাভিমুখ কর্ম্মে এবং সর্ব্বপ্রেমকে 'এক'প্রেমে নিমজ্জিত করিতেছেন বলিয়াই জীবজগতে তাঁহাদের পরম পূজ্য পদবী। কবিও সকল কামানন্দ ও বিষয়ানন্দকে 'চিৎ'জগতে লইয়া গিয়া, মাত্রাস্পর্শের অতীতক্ষেত্রে, চিন্ময়ী সরস্বতীর পুণ্যমন্দিরে প্রমূর্ত্তি দান করিতেই ত চেষ্টা করিতেছেন! আপাততঃ যাহাই প্রতীয়মান হউক, কবি চিৎ-জগতের অধিবাসী, চিন্ময়ীরই পূজারী। জড়তাক্ষেত্রের অতীত চিৎ-জীবন, চিদানন্দশীল ভাবুকতা, ভাবজীবন এবং সাত্ত্বিকতা ব্যতীত কোন প্রকার কবিত্বশক্তিই দাঁড়ায় না। সাহিত্যিক রসানন্দ সাধনার অর্থই হইতেছে—অন্ততঃ সাময়িক ভাবে—জড়তার নিরোধ। এজন্য এতদ্দেশের মৌষ্টিক গ্রন্থাদিতে সর্ব্বত্র কবিত্বের বহুমান। কবিত্বকে কেবল যে লৌকিক ভাবে 'সুদুর্লভ' বলা হইয়াছে তাহা নহে, উহাকে ঋষিত্বের প্রাগবস্থা রূপে, অধ্যাত্মজীবনের প্রধান গুণ ও ধর্ম্মরূপেই সম্মান দেওয়া হইয়াছে। বৈদিক ঋষিগণ প্রায় সকলেই কবিত্বের দাবী করিতেন; প্রাচীন ভারতের ব্যাস বাল্মীকি প্রভৃতি কবিত্বের পথেই ঋষিত্বে উপনীত হন। কেবল ইহাই নহে, দেখিবেন, মানব জগতের প্রাচীন বৈজ্ঞানিকদার্শনিক অধিকাংশই কবি ছিলেন; জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম গুরুগণের—বুদ্ধ খ্রীষ্ট মহম্মদ প্রভৃতির—সর্ব্বপ্রধান শক্তিই প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহাদের কবিত্ব শক্তি—অন্তর্দৃষ্টি, ভাবুককতা ও ভাষার মহামন্ত্রা ঋদ্ধি। ভারতের মৌষ্টিকগণ বলেন, কবিত্বই ঋষিত্বের দ্বার; ভগবান্ সৃষ্টির 'পুরাণ কবি'; কবিই অন্তর্মুখ ও 'তৃতীয়'তত্ত্বে ঐকান্তিক হইয়া ঋষি হন। কবির অন্তর্জীবন বর্দ্ধিত হইয়া এবং অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াই তাঁহাকে ঋষিপদে লইয়া আসে; তাঁহার Imagination, Vision ও Intuitionই চরমের যোগদৃষ্টি ও 'বোধি'তে পরিণতি লাভ করে। ঈদৃশ কবিকর্ম্মের 'আনন্দ'সাধনা ও 'রস'সাধনায় এবং রসের পরিমূর্ত্তনার গুহাতত্ত্ব জ্ঞানপূর্ব্বক না বুঝিয়া যে কবি কেবল বহিস্তন্ত্রী বিষয়ানন্দ দানকেই কবিত্বের চরমলক্ষ্য ধরিয়া চলিতেছেন অথবা কেবল অহমিকা-নির্ভরে আত্মপ্রসার এবং আত্মম্ভরত্বের অভিমানেই লেখনী

চালাইতেছেন, তাঁহার সাহিত্যিক কৃতিত্বপ্রতিষ্ঠা যে শ্রেণীরই হউক, আত্মশক্তি ও আপন অন্তরাত্মার গুপ্তমর্ম্ম বিষয়ে তাঁহাকে 'অজ্ঞ' বলিতে পারি; নিজের জীবনধর্ম্মও জীবনতরীর পরিচালন বিষয়েও তাহাকে 'অন্ধ' বলিতে পারি। তবে, সেরূপ 'অন্ধ'কবির আত্মবিস্মৃত লেখনীর 'অন্ধের নড়ি'টুকু নিজের অতর্কিতস্বভাবে তাঁহাকে চিদানন্দ পুরেই ত পরিভ্রামিত করিতেছে! এ স্থলেই বাণীমন্দিরের সহজসিদ্ধ কৌলীন্যভূমি। যে কবি সচেতন হইয়া নিজের সকল জ্ঞান কর্ম্ম ভাবকে, নিজের সকল কাব্যকবিতানাটকের অন্তঃকরণ এবং অন্তস্তত্ত্বকে চরমের 'সত্য-জ্ঞান-আনন্দ'-প্রেমিক, একতত্ত্ব পথিক এবং একত্বরসিক করিতে জানিতেছেন, তিনিই ভবজীবনকে এবং জীবনের সকল ব্যবসায়কে সুরে এবং তালে, মূর্ত্তিতে এবং স্ফূর্ত্তিতে প্রকৃতপ্রস্তাবে 'সুসঙ্গত' ও সত্যসঙ্গত করিতে পারিতেছেন। তিনি যেমন জীবন আসরের, তেমন সাহিত্যআসরের কলকণ্ঠগণের মধ্যেও প্রকৃত 'কালোয়াৎ'। তিনিই ভবপুরীতে প্রকৃত জীবনসঙ্গীত ও জীবনের প্রকৃত 'রস'সঙ্গীত গান করিতে জানিতেছেন। বলিতে পারি, কবি কুলে তিনিই শ্রেষ্ঠ কুলীন।

তবে, কবি যে অনেক সময় মুখ্যভাবেই নিত্যতত্ত্বের প্রেমিক বা সাধক নহেন, তাহা বুঝিয়া লইতে এবং স্বীকার করিতে হয়। দার্শনিকের পরিভাষায় সাহিত্যিক কর্ম্ম 'মায়িক' জগৎ লইয়া মুখ্যভাবে ব্যাপৃত। কবি স্বানুভূত 'সত্য' কিংবা ভাবের যেই 'প্রমূর্ত্তি' সৃষ্টি করেন তাহাও সুতরাং মায়িক পদার্থের আলম্বনে ও জাগতিক বস্তুর অনুরূপেই করেন। বলিয়াছি, কাব্য আত্মজগতের মনোবিম্বিত প্রতিমূর্ত্তি লইয়াই ব্যাপৃত। যে 'রস'-পরিব্যক্তিকে কবি লক্ষ্য করেন, উহা ত সুতরাং 'মায়িক' বা 'অনিত্য' জগৎ ছাড়িতেই পারেনা। কিন্তু, কবিসমক্ষে এই 'জগৎ' টুকু বস্তুতঃকি? উহাতে 'তৃতীয়'তত্ত্ব সর্ব্বত্র অবিশেষিত ভাবে ওতপ্রোত আছেন। সত্যস্বরূপ শুক্তি যে 'ভব' সৃষ্টির বহুরূপী 'রজত' আকারে দেখাইতে পারিতেছেন, উহাকেই বুঝিতে হইবে, এ স্থানে যেমন পার্থক্য, তেমন কোথাও ঐক্য

টুকুও আছে। অল্পকথায়, এ জগতে 'তৃতীয়' সর্ব্বত্র 'সৎ' রূপে, পদার্থের বিষয়াতীত সত্তা ও গুণাদির ভিত্তিরূপে আছেন; উহাই নিত্য ও অমৃত 'তত্ত্ব'। আবার তিনি 'ভান'রূপে সকল পদার্থের, সকল অনুভব-গ্রাহ্য প্রকাশের প্রাণীভূত 'প্রকাশ' স্বরূপেই আছেন। তৃতীয়তঃ, তিনি সকল প্রকাশের, সকল ভূতি বা অনুভূতির ভিত্তিভূত 'আনন্দ' রূপেই সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র আছেন। এরূপে 'তৎ'বস্তু এ জগতেই উহার ওতপ্রোত অধিষ্ঠান ও ভিত্তি রূপে আছেন, অথচ কুত্রাপি তাঁহাকে 'ব্যক্ত'স্বরূপে, পরিস্ফুট 'জ্ঞেয়'রূপে ধরা' যাইতেছে না! অপিচ, এই মায়িক জগৎ ব্যতীত সেই 'তৎ' বস্তুর দিকে গতি বা লক্ষ্য স্থির করার কিছু মাত্র উপায়ও জীবের হস্তে নাই। বিশ্বসংসার সর্ব্বত্র সে একেরই মায়িক নামরূপময়—সর্ব্বত্রই তিনি "সত্য জ্ঞান-আনন্দ" স্বরূপে অধৃত ও অধর অবস্থায় নিত্য আছেন। তাঁহার সৎ-তা হইতেই 'সত্য' ও 'ঋত' প্রভৃতি আদর্শবুদ্ধি জগতে আসিতেছে; আমরা যথা স্থানে দেখিব, উহা হইতেই জীব 'শিব', 'পুণ্য' ও 'ধর্ম্ম' বুদ্ধি লাভ করিতেছে। তাঁহার 'আনন্দ'স্বরূপ হইতেই এ জগতে প্রিয়তা—প্রেম ও সৌন্দর্য্য—প্রভৃতির যুক্তি সংজাত হইতেছে; অথচ এ সমস্তের তত্ত্বও আনন্দের মতই অব্যক্ত ও অধর পদার্থ। এখন, এই নামরূপময় জগতে প্রকটিত-গুপ্ত এই যে 'অস্তিভাতি প্রিয়ং' রূপী মহারহস্য, জীববুদ্ধিতে আভাসিত এই যে সৎ-চিৎ-আনন্দরূপী মহাপদার্থ, জীবমাত্রেই জীবনে সে মহারহস্যের সাধনে এবং অন্বেষণেই ত ঘুরিতেছে! উহাই জীবের অগ্রবুদ্ধিতে প্রকটিত সেই 'পরম এক' বস্তু; উহাই অনন্ত, নিত্য ও অমৃত—জাগ্রত অধ্যাত্মসাধক যাহার সঙ্গে যুক্ত হইতে লক্ষ্য করেন, যাহাকে জীবের 'আত্ম'তত্ত্বের ও স্বাভাবিক মুক্তদৃষ্টির একেবারে সহজ প্রাপ্তি বলিয়া দ্রষ্টাগণ নির্দ্দেশ করিতেছেন। অথচ, দেশে দেশে সাংপ্রদায়িকতা উহাকেই পরিমিত ও পরিচ্ছিন্ন করিয়া, শত সহস্র প্রকারে উহাকে ঢাকা' দিয়া আমাদের হৃদয়ের কত দূরবর্ত্তী করিয়া দিয়াছে! উহাকে প্রচলিত ধর্ম্মসমূহের কোন 'উপাস্য' নামে নামিত করিতে গেলেই বিপত্তি! কবিও উহাকেই ত

খুঁজিতেছেন! আমরা দেখিয়াছি, সাহিত্যের আত্মাই হইতেছে "সত্যজ্ঞান-আনন্দ" স্বরূপ রস। এজন্য বশিষ্ঠ বলিতেছেন, রসের রহস্যও তুরীয়স্থানে। কবি মায়িকজগৎকেই অবলম্বন পূর্ব্বক উহাকে চিন্ময় প্রকৃতি ও স্থিতি দান করিয়া, উহাকে বাণীমন্দিরের অজড় ও নিঃস্বার্থ নিয়তি দান করিয়া, সে 'রস' তত্ত্বকেই জীবের অন্তরিন্দ্রিয়ের অনুভব গ্রাহ্য করিতে চাহিতেছেন। যে কবি যত সচেতন ভাবে, চৈতন্যময় প্রণালীতে এবং স্ফুটনির্ম্মল ও অন্তরঙ্গ ভাবে 'রস'স্বরূপের সচ্চিদানন্দতত্ত্বকে আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য করিতে পারেন, ভাষায় ভাবে সঙ্কেতে সুরে তালে—যে রীতিতেই হোক—'রস'কে সাধন করিতে পারেন, কবিপংক্তিতে তিনি ততই উচ্চ পদবী লাভ করেন। আমাদের অন্তরাত্মাই আনন্দপ্রেরণায় অযাচিত এবং অনাহুত ভাবে কবিকে এই সম্মান পদবী, অমরপদবী দান করে। জীব-জীবনের যাহা চরম লক্ষ্য, কাব্যের অন্তরাত্মাতেও সেই 'সত্যজ্ঞান আনন্দ'ই উদ্দেশ্য বলিয়া জীব কাব্য চায়; আনন্দস্বরূপের আন্তর স্পর্শ লাভেই রঞ্জিত হয়। কবি এ জগতের রসাত্মারই উদ্গাতা; কাব্যরীতির রসানন্দপথে চরম রসতত্ত্বেরই অন্বেষ্টা—উপদেষ্টা। অনেক কবি হয়ত কেবল নিজের প্রাণের 'আনন্দটানে'ই কাব্যকর্ম্মী; হয়ত নিজের মহৎকর্ম্ম এবং জীব-পর্য্যায়ে নিজের সর্ব্বাতিগ কৌলিন্য না জানিয়াই অতর্কিতে উদ্গাতা ও উপদেষ্টা। হৃদয়ের আনন্দবন্ধু- এবং আনন্দসম্মিত নির্দ্দেশ বলিয়াই কাব্যের উপদেশ মধ্যে কোন জ্বালা থাকে না—উহা অজড়, পবিত্র, অনাময়, আনন্দময় ও সৌহার্দ্দময়। এজন্য কবিও জীবহৃদয়ের পরম প্রেমাশিষ ও সৌহার্দ্দসখ্যের অর্ঘ্য লাভ করিতে থাকেন। তবে কবির পক্ষে নিজের জীবনসাধনায় কেবল অন্ধভাবে চলা, অথবা সতর্কযোগী হইয়া সকল কর্ম্মকে জীবনের নিত্যলক্ষ্যে সার্থক করিয়া চলা—উভয়ের মধ্যে অপরিমেয় পার্থক্য। এ কথা বুঝিতে হইবে যে, প্রকৃত কবি মাত্রেই, অন্ততঃ অতর্কিতে, প্রাণের আনন্দকারণ এবং জগৎকারণ সেই 'সচ্চিদানন্দ' তত্ত্বে নির্ভরশীল ও বিশ্বাসী না হইয়া পারেন না। জগৎ তন্ত্রকে একটা নিঃসার ও চরমের 'শূন্যতা'রূপী একটী যোগহীন

এবং পাপাত্মা ব্যাপার বলিয়া তাঁহার অন্তরাত্মা কদাপি বিশ্বাস করিতে পারে না। জগতের জ্যোতিষ্কগণের প্রধান শক্তিস্থান তাঁহাদের জ্যোতিঃপ্রজ্ঞাময়, অনাকুল আত্মকেন্দ্রেই নিহিত। জগতের 'প্রেমজন্মতা', মঙ্গলগতি এবং আনন্দনিয়তি বিষয়ে সুগভীর অন্তঃপ্রজ্ঞা অপিচ স্বকীয় আত্মার অমৃতধর্ম্ম ও পুণ্যানন্দের মধ্যেই মহাকবিগণের শক্তিবীজ নিহিত। তাঁহাদের মহাপ্রাণতা ও প্রাণপ্রসারণী কবিত্বশক্তির ভিত্তিমূলেই বিশ্বাত্মার প্রাণতত্ত্বের আশ্রয়—যে 'প্রাণ'ই বিশ্বমধ্যে আসিয়া প্রেম-আনন্দ-সৌন্দর্য্য রূপে প্রকটিত। তৃতীয়ের প্রাণধানী হইতেই প্রত্যেকে প্রাণিত ও আলোকান্বিত হইয়া জগতে সেই প্রাণ এবং আলোক কবিত্বপথে বিকীর্ণ করিতেছেন—বিলাইতেছেন! এ সম্বন্ধে কবি ব্লেকের মহার্থগভীর উক্তিটাই পুনর্ব্বার উচ্চারিত হউক—

If the Sun and Moon could doubt
They would instantly go out!

আবার, সাহিত্যদার্শনিক বলিতে পারেন, সাহিত্য কবির আত্মকেন্দ্রী 'সৃষ্টি'; সাহিত্যের 'সত্যশিব সুন্দর'তত্ত্বের 'প্রমাণ' ও অবলম্বন কবির আত্মগৃহে। অতএব, যে কবির 'আত্মা' জাগরণ লাভ করে নাই, জীব-নিসর্গ ও তৃতীয়ে আত্মচৈতন্য এবং আত্মকেন্দ্রী সহানুভূতি যাহার জাগে নাই, কাব্যের অবলম্বিত বিষয়ের প্রতি জগন্মঙ্গল্য ভাবুকতার আনন্দস্থান হইতে দৃষ্টি করিতে যে শিখে নাই, সে কখনও উচ্চশ্রেণীর কবি নহে। সহানুভূতির সন্ধিযোগ না পাইয়াই কবি! সর্ব্বভূতকে আত্মায় এবং সর্ব্বভূত মধ্যে আত্মাকে সখ্যে এবং সৌহার্দ্দে গ্রহণ করার বেশীকম শক্তি লইয়াই সহানুভূতি; উহা জীবনিসর্গ ও তৃতীয়ের সঙ্গে কবির অন্তরঙ্গ ভাবসাম্য, সহযোগ ও সহপ্রাণতার অনুভূতি। আত্মকেন্দ্রে এই বিশ্বানুভূতি লাভ না করিতে পারিলে এ দেশের বিচারে যেমন জীবনসাধনা নিষ্ফল, তেমন কবির ব্যবসায়ও ত নিষ্ফল! বহির্জগতের ভূয়োদর্শন-জনিত জ্ঞান, লৌকিক ও সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতা কবি নিশ্চয় উপার্জ্জন করিবেন; উহাতেই 'উদ্যোগপর্ব্ব'—সমাজে ও সংসারে কবির শিক্ষাজীবনের

'গুরুগৃহবাস'। কিন্তু সমস্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য থাকিবে, বিশ্বকে নিজের বিজ্ঞানী আত্মায় প্রাপ্তি বা বিশ্বে আত্মার প্রতিষ্ঠা; অন্যদিক হইতে যাহার নাম দিতে পারি—আত্মবিস্তার বা আত্মপ্রসারণ। কবিকে বিশ্বের সত্যপ্রমাণ পাইতে হইবে নিজের মধ্যে—নিজের সর্ব্বসহানুভূতিসিদ্ধ আত্মার মধ্যে। তাঁহার 'আত্মা'য় আনিয়াই বিশ্ব-জগৎকে সাহিত্যিক পুনর্জীবন—বা পুনর্মূর্ত্তি দান করিবেন। বাহিরের কেবল 'ফটোগ্রাফ' লওয়াই সুতরাং কবির 'কর্ম্ম' নহে। জগতের সত্যজিজ্ঞাসা সত্যশিক্ষা, অন্যকথায় 'লোকশিক্ষা', নামক ব্যাপার এ'স্থলেই উপযোগী—কেবল কবির আত্মজাগরণ ও আত্ম-চৈতন্যের অনধিকৃত দেশের আবিষ্কারেই উহার উপযোগিতা। পরন্তু, কবির 'সৃষ্টি'র প্রণালীটাও প্রকৃতপ্রস্তাবে কেবল আত্মারাম 'লীলা' ও 'তপঃ-প্রণালী'। যে আদিকবি 'স তপোঽতপ্যত; স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত', মর্ত্ত্যকবির 'সৃষ্টি'ও বিশ্বস্রষ্টা সেই আদিম তপস্বীরই অনুগত। কবির 'সৃষ্টি'কর্ম্মও ভূতভাবনের 'ভূব' (Becoming) প্রণালীর মতই আত্মসম্ভূত ও 'অধ্যাত্ম' ব্যাপার এবং তাঁহারই দয়াদীপ্ত ও দয়াপ্রাণিত। তবে, বিভুর এই বিশ্বসৃষ্টি অচিন্ত্যশক্তির মহালীলা—এমন তত্ত্ব যে, বহির্দৃষ্টিতে দেখিলে আদ্যন্ত-বিহীন, ইন্দ্রিয়ানুভূতি সমক্ষে অপরূপ প্রত্যক্ষ এবং সংঘাতকঠিন; দেশকালের গুণবিস্তার এবং সংখ্যাব্যাপারের কোথাও সীমা নাই; যেদিকে দৃষ্টি করিবে, অর্জ্জুনের মতই মূর্চ্ছিত হইতে হইবে। অন্যদিকে, ভগবানের 'দয়া'পদ হইতে দেখিতে পারিলে, এই অনন্তমহতী সৃষ্টি কেবল তাঁহার ইচ্ছা-স্পন্দিতা ও ইচ্ছা-তরঙ্গিতা এবং ইচ্ছাজীবী 'মায়া' শক্তিরই লীলাব্যাপার। এ সৃষ্টি সেই দেশকালক্ষেত্রের অতীত 'ইচ্ছা'র বিন্দুগত, 'ইচ্ছা'র মুহূর্ত্তগত এবং বিশ্বকবির কল্পবিন্দুর মধ্যেই অবস্থিত। ভগবদ্দয়ায় যে কবির প্রকৃত কল্পশক্তি লাভ হইয়াছে, তিনি উহাকে ধরিয়াই চূড়ান্তে গিয়া 'আত্ম'স্থানে স্থিতিলাভ করিতে সাধনা করুন, তৃতীয়ের পদস্থান হইতেই বিশ্বসৃষ্টির দিকে দৃষ্টি করুন। তা' হইলেই, এতদ্দেশের আদর্শে, তাঁহার 'উভয়কর্ম্ম' হইবে;

নিত্যজীবনের কার্য্যও হইবে। আত্মার যে আনন্দপদ হইতে আনন্দময়ী এই সৃষ্টিগঙ্গা অনন্ত রূপ-প্রবাহে উচ্ছ্বাসিনী হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে, সে পদের সালোক্যবর্ত্তী হইলে এ সৃষ্টির প্রত্যেক বস্তুই ভাবের সুহৃদ্ ও প্রাণের আনন্দস্পন্দী আত্মীয় এবং 'আত্মার পরমাত্মীয়' হইয়া যায়; 'আমিই সর্ব্ব' এই বোধ ক্রমে উপচিত হইয়া কবিকে সর্ব্বসহানুভূতি ও সর্ব্বাত্মতার সামীপ্যবর্ত্তী করে; তাঁহার অন্তর ও বাহির মধুময় হইয়া যায়। জীব-নিসর্গ ও তুরীয়ের সেই একাত্ম-পদবী, মধুপদ এবং অভয়া ও অমৃতার পদ কবি লাভ করুণ! কবিকর্ম্মের ও কবিনিয়তির প্রকৃত অন্তর্দ্দর্শী সাহিত্যদার্শনিক মাত্রেই এরূপ 'প্রশস্তি' ও 'আশীর্ব্বাণী' উচ্চারণ করিতে পারেন।

ভারতের ঋষি তাঁহার ওই 'একত্ব'বাদকে এ জগতের 'সর্ব্বদিক্-ভদ্র' আদর্শ রূপেই জীব সমক্ষে উপস্থিত করিতেছেন। দৃষ্টি করিলেই বুঝিব যে, চূড়ান্ত 'অদ্বৈত' লক্ষ্যেই জীবের সংসার-সমাজ-পরিবার-রাষ্ট্র এবং ধর্ম্মের আদর্শকেও নির্দ্ধারিত এবং নিয়মিত করিয়া জীবের নিত্যসত্য 'সনাতন' ধর্ম্মরূপে উপস্থিত করিতেছেন। উহাকে যেমন জীবজীবনের, তেমন সকল অবস্থা-নির্ব্বিশেষে তাহার সাহিত্যেরও ধ্রুবনিত্য আদর্শরূপে ধরিতেছেন। সাহিত্য আদর্শকে সর্ব্বসমঞ্জসিত ভাবে বুঝিবার জন্যই আমরা কিঞ্চিৎ বিস্তারিত ভাবে বৈদিক দর্শনের 'সত্যজ্ঞান-আনন্দ'বাদ এবং উহার 'এক'মর্ম্মার্থ প্রসঙ্গিত করিয়াছি। তদ্ব্যতীত, অন্ততঃ ভারতের দৃষ্টিতে, সাহিত্যের আদর্শবিচার দাঁড়ায় না। জীব বুদ্ধিতে যে 'সত্য-জ্ঞান-আনন্দ' এ বিশ্বের চরমতত্ত্ব বলিয়া প্রতিভাত—তাহাই সাহিত্যে আসিয়া 'সত্যশিব সুন্দর' রূপে প্রকটিত। এ সিদ্ধান্তের বলবত্তা 'সাহিত্যে শিব'তত্ত্ব বিচার কালে আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে বুঝিতে পারিব। এ আদর্শ বুঝিয়া থাকিলেই দেখিব, কেন অদ্বৈতবুদ্ধি যেমন ধর্ম্মক্ষেত্রের সকল মীষ্টিসিজমের গোড়া, তেমন, সাহিত্যিক মীষ্টিসিজমেরও হেতু। অন্ততঃ বুদ্ধিযুক্তির স্থান হইতে (intellectually) এই 'তৎ'বস্তুর 'অর্থ' যদি বুঝিয়া থাকি, তবেই

বুঝিব, সাহিত্যের সত্য ও সৌন্দর্য্যবস্তুর ক্ষেত্রে এই 'তৃতীয়' তত্ত্ব কি? ঋষির 'এক' বা 'তৎ' কি? যাঁহার ঈক্ষণে দেশকাল সহ সৃষ্টির যাবতীয় ভববস্তু ভাবিত হইয়া এবং তাঁহার 'ভাবনা'ই বাস্তবিত হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে; পৃথিবী চন্দ্র সূর্য্য মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি আদি সহ এই সৌরমণ্ডল জমিয়া দাঁড়াইয়াছে; অনন্ত আকাশে কোটি কোটি সৌরমণ্ডল অনন্ত জীবপ্রবাহ সহ 'অসৎ' অবস্থা হইতেই সম্ভাবিত হইয়াছে, আবার যাঁহার ঈক্ষণে পলকেই বিশূন্য হইয়া মিলাইয়া যাইতে পারে; সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় যাঁহার নিত্যলীলা; এখনও অনন্ত আকাশের কুহরে যেরূপ সৌরজগৎ-সৃষ্টির ও ধ্বংসের খেলা অনির্ব্বাণ চলিতেছে—যাহার সংবাদ হাজার হাজার বৎসর পরেও আলোকতরঙ্গ আমাদের দৃষ্টি সমক্ষে লইয়া আসিতেছে—সে 'তৎ'পদার্থই ত সাহিত্যের সকল লক্ষ্যের এবং সত্যের আদিম ও চরম সত্য! জীবস্থান হইতে জ্ঞানদৃষ্টিতে 'অনন্তকাল' যেই স্থানে 'এক মুহূর্ত্ত', নিখিল সৃষ্টিসংসার যে স্থানে কল্পবিন্দুতে সংহৃত ও অবস্থিত, উহাই ত কবির I-hoodএর এবং তাঁহার সকল কল্পনার ভিত্তি ও সাক্ষী স্বরূপ সেই 'তৃতীয়' পদার্থ! সাহিত্যের সচ্চিদানন্দ 'রস'বস্তুর আদি মধ্যম চরমে, প্রত্যেক পদার্থের 'তত্ত্ব'স্থানেই যে 'তৎ' আছেন, প্রত্যেক প্রকাশেই যে 'তৎ' ওতপ্রোত আছেন, চাপিয়া ধরিতে জানিলে প্রত্যেক পদার্থই যে 'তৎ'পদে লইয়া যাইতে পারে—উহা ত সেই 'তৎ'! অথচ কোথায় যে 'ফাঁক' পড়িয়াছে, আবরণ পড়িয়াছে, বিষম 'ভোল' ঘটিয়াছে, জ্ঞান ও মিলনের সূত্র যেন কাটিয়া গিয়াছে—সে অবস্থা গতিকেই ত প্রত্যক্ষীভূত এই 'সৃষ্টি চক্র'! সে 'তৎ' কোথায়, আর আমি কোথায়! কোটিকোটি বৎসর জীবন ও জন্মান্তর চক্রে ঘুরিয়াও ত সে পর্দ্দাটার ফাঁক পাওয়া যাইতেছে না! এই ত ঋষিগণের 'এক'! সাহিত্যের সকল রসানন্দ সেই 'এক' আনন্দ-স্বরূপেরই মাত্রা। যে কবি সেই 'এক'যোগে (সেই অনন্ত সত্যসুন্দরের তত্ত্বে হৃদয় এবং বুদ্ধিযোগে) স্থির থাকিয়া কাব্য কল্পনা করিতে পারেন,

তিনি যেমন সাহিত্যের স্বার্থ এবং সদর্থ হইতে, তেমন জীবজীবনের পরমার্থ হইতেও বিচ্যুত হইতেছেন না।

সুতরাং সচেতন ভাবে 'রসানন্দ'সাধক কবিমাত্রকে বুঝিতে হয়, যেই জীবচরিত্র লইয়া তিনি সাহিত্য গড়িতেছেন সে জীবটী কে? যাহার প্রতি লোমকূপে সেই 'এক' বা 'তৃতীয়' বিদ্যমান, যে ভূমবৎ সত্তা হইতে অচ্ছিন্ন এবং অবিচ্ছেদ্য, যাহার প্রতিপরমাণুতে অনন্ত সত্যসুন্দর ও রসসুন্দর এবং ঐশ্বর্য্যসুন্দর লীলা করিতেছেন অথচ হতভাগ্য নিজের 'অজ্ঞানতা' গতিকেই জানে না—চিনে না—বরং প্রতি পদে তাহাকে অস্বীকার করিয়াই চলে, সাহিত্যরসের অবলম্বন 'মানুষ' ত সেই 'জীব'! নিসর্গই বা কি? যাহার প্রতি অনুপরমাণুতে সেই 'এক' পদার্থ—সেই সচ্চিদানন্দ হইতে যে আপনার স্থিতি, ব্যক্তি, সত্ত্ব ও শ্রী পাইয়াছে, যাহার প্রতিবিন্দু আনন্দসাগরের তরঙ্গেই পরিস্পন্দিত এবং লীলায়িত হইতেছে, সেই ত! সুতরাং, যেমন সাহিত্যসৃষ্টির, তেমন জীবনদৃষ্টির প্রকৃত 'রহস্যপাঠ' বা উপনিষৎ হইতেছে—সেই সত্যে 'স্বপ্রতিষ্ঠা'—একের কেন্দ্রজ্ঞান ও কেন্দ্রযোগ। সেই একত্ব-বিজ্ঞানের 'মধুপুরী' অভিমুখে নিজের জীবনকে স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠান্বিত করিতে পারিলেই কবির জীবনকর্ম্ম ও জীবন'ধর্ম্ম' একার্থক, সুসঙ্গত ও সার্থক হইতে পারে। এই 'একত্ব'দৃষ্টি ও 'এক'প্রাপ্তিই বিশ্ব-সাম; উহাই সর্ব্ব-সহানুভূতির পথ। যে জীব বা যে কবি এই সামসঙ্গীতের পরিচয় ও সম্প্রতিষ্ঠা পাইয়াছেন, তিনিই জীবনের ইহামূত্র সর্ব্বরহস্যের একার্থতা এবং সার্থকতার পন্থাপরিচয় পাইয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ে, সাহিত্যকর্ম্মে এবং জীবনে অনাকুল সামসিন্ধুর আবহাওয়া! অন্তকল্যের মধ্যে, জন্ম-জন্মান্তর এবং ইহপরকালের মধ্যে তিনি একতন্ত্রী গীতিকাই শুনিতেছেন; জগৎ-মন্দিরের অন্তরেবাহিরে তিনি বিশোকা ও জ্যোতিষ্মতীর পরিচয় লাভে আনন্দ সিন্ধুতে রমমান হইয়াই চলিয়াছেন! সে জীবই জীবনপুরীর প্রকৃত অধিবাসী (Citizen)। সে ব্যক্তিই

বিশ্বের প্রকৃত কবি ও প্রকৃত দ্রষ্টা হইবার এবং ভবতন্ত্রের প্রকৃত প্রেমিক ও প্রকৃত রসিক হওয়ার দাবী রাখে। উহাতেই সংসার-সমরাঙ্গনে কবির 'শিখরী স্থিতি' ও 'শিখরী দৃষ্টি'—উচ্চশিখরে আত্ম-সুস্থির হইয়া বসিয়া যুধ্যমান জীবপ্রবাহের প্রতি গড়ুরের দৃষ্টি। 'গাড়ুরী দৃষ্টি' ও ন্যূনাধিক নির্লিপ্ততা ব্যতীত প্রকৃত কবিস্থিতি বর্ত্তে না। আবার, সর্ব্বরসের প্রকৃত প্রমাণ ও উৎসস্থান সে কবি আত্মার মধ্যে এবং আত্মপ্রমাণেই পাইয়াছেন; আত্মসত্যই বিশ্বের সত্য বুঝিয়া, সর্ব্ব সঙ্গীতের অন্তরালে এবং স্বরূপে কেবল আত্মসঙ্গীতই গান করিতেছেন। বিষয়ে আত্মযুক্ত হওয়াই প্রধান কথা এবং ঐরূপ 'যুক্ত' ব্যক্তির আত্মসত্যই বিশ্বের সত্য। 'তৃতীয়' কবি—এ বিশ্বের 'পুরাণ কবি'—সৃষ্টির এই ত্রিতন্ত্রীসঙ্গীত গান করিতেছেন; তাঁহার কল্পবীণার সুররাগিণীই বিশ্বভাবিনী হইয়া, অনন্তায়ত জীব ও নিসর্গরূপী মহাকাব্য রচনা করিয়া চলিয়াছে! মর্ত্ত্যকবি সেই 'পুরাণ কবি'র পদতলে বসিয়া, সেই গুরুচরণের দয়াপ্রদীপ্ত উপনয়ন লাভ করিয়া, উহার অনুপদে এবং উহার পশ্চাতেই নিজের ক্ষুদ্রহৃদয়ের সুরযোগ করিতেছে—নিজকে সর্ব্বপ্রাণে ভবরূপী মহাসঙ্গীতের অংশী রূপে বুঝিয়াই আত্মযোগে 'সঙ্গৎ' করিতেছে! ইহাই কবির পক্ষে জীবনে ও কবিকর্ম্মে প্রকৃত স্থিতি, কৃতিবুদ্ধি ও যোগবুদ্ধি। অথচ, এই ক্ষুদ্র, 'পৃথিবীকীট' মনুষ্যকবি কতদূর করিতে পারে? কতটুকুই বা করিয়াছে? পৃথিবীর সকল সাহিত্যের, সকল ভাষায় সর্ব্বকবি অনন্তকাল গলা ফাটাইতে থাকিলেও, (জানা' কথায়) মহাকাল স্বয়ং মহাসমুদ্রকে মস্যাধার করিয়া সুমেরুকলমে অবিশ্রাম লিখিতে থাকিলেও, আত্মার এই ভবলীলায় (Becoming), আত্মার এই ভব-বিভূতির বিন্দুবর্ণনা শেষ হইবে না; কোটীকোটী শেকস্‌পীয়র অনিয়ত লিখিতে থাকিলেও, এই পার্থিব জীবতত্ত্বের ও জীবহৃদয়ের গুহাগভীর রহস্যের এক বিন্দুও পরিশেষ হইবে না; কোটিকোটি ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থ এই পার্থিব নিসর্গের মহিমাবিন্দুই আয়ত্ত করিতে

পারিবে না! মনুষ্যকবি, জাগো, জাগো, মহারসিকের সেই দৃষ্টিস্থানে!

অতএব সাহিত্যে এই তৃতীয়পথিক অনুভূতির নামই মীষ্টিসীজম—অধ্যাত্মবাদ। মনে রাখিতে হয়, ইয়োরোপক্ষেত্রে এ কথাটির মধ্যে একটা শ্লেষ আছে—সাধারণের দুর্ব্বোধ্য বা অবোধ্য একটা 'কায়দা বাগীশি' বা 'ঢং' মনে করিয়াই এ শ্লেষ। তেমন, এদেশেও 'তুরীয় ভাব' "তুরীয় প্রকৃতির লোক" 'মুরারে স্তৃতীয়ঃ পন্থা' প্রভৃতি কথার মধ্যেও একটা শ্লেষ। জড়তাগ্রস্ত সাধারণ জীবপ্রকৃতি ও সাংসারিক জীবের দুনিয়াদারী বুদ্ধি নিজের দুর্ব্বোধ্য পদার্থের প্রতি এরূপ বক্রদৃষ্টি না করিয়াই যেন পারে না। ইয়োরোপীয় সাহিত্যের কবি বা দার্শনিকগণ, প্রকৃত ভারতীয় রকমের 'তুরীয় দর্শন' হয়ত অনেকেই স্পষ্টতঃ জানেন না—বা মানেন না। এতদ্দেশে যে এ বিষয়ে সকল দিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটী মহাশাস্ত্র এবং দর্শন ও জীবনযাপনের শাস্ত্রই (Systematic Philosophy of Life) আছে, পরম প্রকাশ্যতার আড়ালে একটা গুপ্তবিজ্ঞানই যে আছে, সে খবরটাও অনেকেই হয়ত রাখেন না। প্লাটো, প্লোটিনস, স্পীনোজা প্রভৃতির মধ্যে যদ্রূপ মীষ্টিসিজম আছে বা সুইডেন্‌বার্গের মধ্যে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই ইয়োরোপীয় সাহিত্যের সাধারণ সম্পত্তিরূপে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ইয়োরোপীয় সাহিত্যিক স্বপক্ষে-পরোক্ষে উহার জ্ঞান লাভ করেন, এবং সহানুভূতির বশে অথবা জন্মগত অদৃষ্টবশেই Mystic প্রকৃতি লাভ করেন। এরূপে ব্লেক, ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থ, শেলী, গ্যাঠে, টেনীসন্‌ প্রভৃতি কবিগণের মীষ্টিক্ 'ধাৎ'। হয়ত অনেকের পক্ষে কেবল সাময়িক একটা দৃষ্টির রীতি। বলা যাইতে পারে, অনেকের পক্ষে সাহিত্যক্ষেত্রে উহা কেবল একটা মনোদৃষ্টির ভঙ্গী (Attitude), একটা ভাবুকতা এবং ভাবদৃষ্টির একটা বিশিষ্ট পদ্ধতি এবং চিত্তের সাময়িক একটা অবস্থান। কিন্তু, উহার প্রভাবেই

৫৭। সাহিত্যে তৃতীয় যোগী মীষ্টিকের 'নিসর্গ' 'প্রেম', 'রূপ' ও 'আনন্দ'র কবিতা।

ইয়োরোপীয় সাহিত্যে শ্রেষ্ঠশ্রেণীর কাব্যকবিতার জন্ম হইয়াছে। প্রোক্ত কবিদের কেহ স্বীকারতঃ 'অদ্বৈতবাদী' না হইলেও, কিংবা চূড়ান্তে জগৎ, জীবাত্মা ও তৃতীয়ের নৈদানিক অভিন্নতা স্বীকার না করিলেও, তাঁহাদের ওইরূপ সাময়িক চিত্তদীপ্তি হইতেই উৎকৃষ্ট কাব্যকবিতার জন্ম। তুরীয় স্থান হইতে, 'এক'তত্ত্বের দিক হইতে জাগতিক পদার্থ সমূহের একটা কেবল 'বোধায়নী' ধারণা। উহা হইতেই পদার্থের 'মহা পরিবর্ত্তন'—অপরূপ Transfiguration ঘটিয়া যায়। মহাসুন্দরের ভাবদীপ্তির ছায়ায় সমস্তই মহাসুন্দর ও দীপ্তসুন্দর হইয়া উঠে। কবির অন্তশ্চরিত্রে এবং অন্তর্দৃষ্টিতে (কেবল বোধায়ন ভাবে হইলেও) এরূপ আদর্শ এবং সিদ্ধান্ত-সম্পাতই 'মহাজন্ম' রূপে দাঁড়াইয়া যাইতে পারে। ফলতঃ, সাহিত্যে Sublimeএর নাম মহাসুন্দর বা তুরীয়সুন্দর। এরূপে, যেমন প্রকৃতির দিকে, তেমন জীবের দিকে, জীব হৃদয়ের 'প্রেম'-মুখ্য ভাব এবং ভবজীবনের 'আনন্দ'ধর্ম্মের দিকে অপিচ সাহিত্যক্ষেত্রের রসতত্ত্বের দিকেও তুরীয়প্রেমিকের দৃষ্টি; অন্তর কিংবা বাহিরের 'রূপ'-বস্তুর দিকেও প্রেমিকের তুরীয়দৃষ্টি। এ দৃষ্টিরীতি হইতেই সাহিত্যের রসক্ষেত্রে 'মহাপরিবর্ত্তন' ঘটিয়া যাইতে পারে। এই জগৎ এবং জীবন, এই জীব এবং নিসর্গ সমস্ত সচ্চিদানন্দের ভাবছায়ায় আসিয়াই সুন্দর; এরূপে, সত্যসুন্দর, ভাবসুন্দর ও ধর্ম্ম সুন্দর লইয়াই ত উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য।

কবি ওয়ার্ড্সওয়ার্থ ও ব্লেকের মধ্যে এ দৃষ্টি কেবল একটা Pose নহে, ঢং নহে; উহা তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধি এবং অভ্যাসসিদ্ধ দ্বিতীয় 'প্রকৃতি' রূপেই যেন দাঁড়াইয়া নিয়াছে। সাহিত্যক্ষেত্রে ওয়ার্ড্সোয়ার্থের সকল originalityর—নিসর্গকবিতার তরফে তাঁহার সকল মৌলিকতার—গুপ্ততত্ত্বই হইতেছে এই 'সর্ব্বকারণ-কারণ' তুরীয়স্থান হইতে জগতের প্রতি দৃষ্টি—একত্ববিজ্ঞানী দৃষ্টি। ওয়ার্ড্সোয়ার্থ যখন লিখিলেন—

> And I have felt
> A Presence that disturbs me with the joy
> Of elevated thought; a sense sublime

Of something far more deeply interfused,
Whose dwelling is the light of Setting suns
And the round ocean and the living air,
And the blue sky, and the mind of man,
A motion and a spirit that impels
All thinking things, all objects of all thought,
And rolls through all things.

তখন তিনি তুরীয়স্থান হইতেই বিশ্বসৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন। এই 'নামরূপ'ময় জগৎ যেই 'একংসৎ' তত্ত্ব হইতে প্রকটিত হইয়া আসিয়াছে সেই 'এক'কে, অন্ততঃ বোধায়ণী (intellectual) রীতিতে, তিনি অনুভব পথবর্ত্তী করিয়াছেন। এই অনুভূতি-পথ এমন একস্থানে লইয়া যায়, যে স্থানে—

That Serene and blessed mood
In which—the breath of this Corporeal frame
And even the motion of our human blood,
Almost Suspended—we are laid asleep
In body and become a living soul;
While with an eye made quiet by the power
Of harmony and the deep power of joy
We see into the life of things.

তখন তিনি সেস্থানেই দাঁড়াইয়াছেন যাহাকে এদেশের তৃতীয়বিজ্ঞানীগণ বলেন—'যোগ'। পতঞ্জলি যাহাকে বুঝাইয়াছেন, "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপে অবস্থানম্"। আমাদের এই ব্যাবহারিক জগতের দিকে উহার অর্থ হয়ত 'নিদ্রা'—we are laid asleep in body—কিন্তু, জগতের অন্তঃস্থিত সত্যের অনুভব সম্পর্কে উহার নাম 'জাগরণ'; গীতার ঋষি উহাকে বিশেষিত করিতে যাইয়াই বলিয়াছেন—এবং যাহার প্রকৃত অর্থ 'বাস্তবিক' ভাবে বুঝিতে দীর্ঘপাঠের প্রয়োজন—

যা নিশা সর্ব্ব ভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

উপরের কবিতা পংক্তি ওয়ার্ড্সোয়ার্থের কবিত্বের এবং ইংরাজি সাহিত্যের ভাবুকতার 'গৌরীশঙ্কর' রূপেই ইয়োরোপের সুধীসমাজে আদৃত। কিন্তু, এদেশের সাহিত্যে এবং বেদপুরাণে এরূপ ভাবেরই কতমতে, কতরূপে অজস্র প্রকাশ! এখনও এ দেশের লক্ষলক্ষ লোক এরূপ ভাবুকতার বস্তুতন্ত্র প্রত্যয় এবং অনুভূতিস্থান লক্ষ্য করিয়াই ত একেবারে সর্ব্বত্যাগী হইয়া ঘুরিতেছে!

এমার্শন এই অনুভূতিপদ উদ্দেশ্য করিয়াই ত বলিয়াছেন—

> Vision where all forms
> In one only form dissolve.

আবার, সে কথাই ত অন্যরূপে বলিয়াছেন—

> See, earth, air, sound, silence
> Plant, quadruped bird,
> By one music enchanted
> One Deity Stirred.

পুনশ্চ—

> Substances at base divided
> in their summits are united ;
> There the holy essence rolls,
> One through separated wholes.

এসমস্ত ত আমাদের সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" তত্ত্বেরই বার্ত্তা। এদেশের প্রত্যেক বেদপন্থী (উচ্চতম হইতে নিম্নতম সাধারণ উপাসক পর্য্যন্ত) প্রত্যহ যে বলিয়া প্রণাম করে, ঋষিগুরুর উপদেশ অনুসারে (হয়ত প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়াও) যে শিখরে চড়িতেই সমগ্র জীবনের লক্ষ্য রাখিয়া প্রত্যহ প্রার্থনা করে—"আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং পরমাত্ম স্বরূপকম্" অথবা "অচিন্ত্যাব্যক্ত রূপায় নির্গুনায় গুণাত্মনে"। ইহা ত 'একতত্ত্ব' উদ্দেশে 'পথিক' ব্যক্তিরই দৃষ্টি!

বলিতে হয়, 'প্রস্থান' ভেদে, বা 'অধিকার' অনুযায়ী দৃষ্টিস্থান ভেদে তুরীয়গতিক মীষ্টিসিজম নানা প্রকার হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত কবিতা গুলিতে ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থ বা এমার্সনকে প্রকৃতি-পথিক মীষ্টিক রূপে নির্দ্দেশ করা যায়। ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের পক্ষে 'নিসর্গ' একটা প্রবেশ-পথ; কিন্তু, কবি ব্লেকের পক্ষে সে 'নিসর্গই' তুরীয়পথে যেন একটা 'বাধা' বা 'অন্তরায়'। ব্লেক মুখ্যভাবে ধ্যানধারণার 'বিন্দু' পথেই যেন 'তৃতীয় তত্ত্বে উপনীত হইতেছেন। তাঁহার মতে বিশ্বপ্রকৃতি সুতরাং 'বিন্দু বাসিনী'—

> To see a world in a grain of sand
> And heaven in a wild flower
> Hold infinity in the palm of your hand
> And eternity in an hour.

'তৃতীয়' স্থান হইতে বিশ্বসৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি ব্যতীত এরূপ অনুভব সম্ভব পর নহে। এমার্সনের ভাষায় "summit" বা শিখরে স্থিতি ব্যতীত, গীতার ভাষায় "ব্রাহ্মীস্থিতি" ব্যতীত, এরূপ দৃষ্টিও সম্ভবপর নহে।

মানুষের আত্মতত্ত্বে তুরীয় দৃষ্টি এবং তাহার অন্তঃকরণের 'সাক্ষী পুরুষ' স্থানে গতির আদর্শই বেদ-উপনিষদের 'অদ্বৈতবাদ'। অতএব, উহাই যে ব্যক্তির কিংবা যে জাতির নিত্যনৈমিত্তিক 'ধর্ম্ম'রূপে উপযুক্ত হইয়াছে, তাহার পক্ষে এ সমস্ত কবিতার মর্ম্মার্থ বুঝিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না। ফলতঃ অস্পষ্ট রীতির বাক্য অথবা 'ঘোরালো পেঁচালো' রীতির কথার দ্বারা অর্থের চারিদিকে জঞ্জাল রচনা না করিলে, mystify না করিলে প্রকৃত মীষ্টিক ধাতের কোন রচনাই এদেশের লোকের নিকট দুর্ব্বোধ্য নহে। বরঞ্চ মীষ্টিক রচনাতেই এতদ্দেশের আনন্দ। তবে কোন্‌টী প্রকৃত মহাত্ম কবিতা, কোন্‌টী বা কেবল হেঁয়ালীগোছের কসরৎ কিংবা কেবল বাক্যরীতির ঢং তাহা বুঝিতেও বুদ্ধিমান্‌কে বেগ পাইতে হয় না। বেদের স্তোত্রাঙ্গ বা গানাঙ্গের মন্ত্রগুলিকে কাব্য হিসাবে দৃষ্টি করিলে উহাদের মধ্যে 'নিসর্গ কবির তুরীয় দৃষ্টি'র অভাব দেখিব না। বেদের মন্ত্রগুলির

অভ্যন্তরে যে প্রকৃত প্রস্তাবে তুরীয়ের 'শক্তি'বাদ, 'কর্ম্মকাণ্ড' যে 'ব্রহ্মাত্ম'-শক্তি এবং দেবাত্মশক্তির (১) আরাধনাতন্ত্র, অগ্নিসোমসবিতাবরুণ প্রভৃতি 'ব্যক্ত' দেবতার প্রত্যেকেরই যে একএকটা 'তুরীয়পদবী' ও 'অমৃত নাভি' আছে, সে 'নাভি'স্থানে গিয়াই যে ব্রহ্মাত্মবাদীগণ কাম্য-সিদ্ধি করিতেন তাহা প্রত্যেকটী মন্ত্রের মধ্যেই ন্যূনাধিক প্রত্যক্ষ। (২) ব্রহ্মাত্মবাদীগণের ভবসাধন যন্ত্র ও কাম্যসাধনার গুপ্ত মন্ত্র বলিয়াই বেদের মন্ত্রগুলি এত যত্নে এবং আদরে রক্ষিত হইয়াছিল; আর্য্য ভারতের নেত্রে মহা পূজ্যপদবী লাভ করিয়াছিল। কেবল মাত্র কতকগুলি Prayer হইলে উহাদের কিছুমাত্র মাহাত্ম্য বা অপরিহার্য্যতা থাকিত না। ফলতঃ, খ্রীস্টশিষ্য পণ্ডিতগণ Animism, Nature worship কিংবা Fetishism প্রভৃতি কথা দ্বারা উহাদের স্বরূপ এবং 'আত্মা'পদার্থকে 'চাপা দিতে' চাহিয়াছেন ব্যতীত আর কিছু নহে। কোন মননশীল মনুষ্য, কোন মনুষ্যনামধারী ও মানবাত্মাধারী জীব কি কখনও Fetish হইতে, বৃক্ষশিলা কিংবা জড়পদার্থের পূজারী হইতে পারে? আর Animism! যাহাকে তাঁহারা Animism বলিয়া নিন্দা করেন, তাহা ত জীবমাত্রের জন্মসিদ্ধ 'প্রাণবাদ'—জগতের ব্রহ্মাত্মতা বুদ্ধি! ভগবানের কোন সবিশেষ দয়া (Grace) জীবের প্রতি থাকিলে তাহার নিদর্শনটাই এস্থলে। মনুষ্যমাত্রেই প্রাণিত্বের ধর্ম্মে অতর্কিতে প্রাণবিজ্ঞানী, আত্মবাদী, বিশ্বাত্মজ্ঞানী—ব্রহ্মাত্মজ্ঞানী। তবে, অনেকে অজ্ঞানের ঘনান্ধকারে, নিজের তামসিক প্রকৃতিতেই মুহ্যমান—এস্থানেই ত উচ্চতম ব্রহ্মবিজ্ঞানী এবং অসভ্যতম মনুষ্যব্যক্তির মধ্যে আধ্যাত্মিক পার্থক্য! যাহা বীজ রূপে Animism, তাহাই প্রকটিত হইয়া 'মহাজ্ঞান' রূপে monism এবং

(১) তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।

শ্বেতাশ্বতর

(২) পণ্ডিত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী তাঁহার 'উপনিষদের উপদেশ' গ্রন্থের ভূমিকায় ঐরূপ শত শত ঋক্‌মন্ত্রের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

'একমেবাদ্বিতীয়ং'বুদ্ধির চূড়ান্ত'শিখরে' জীবকে লইয়া যাইতে পারে। এই অর্চিত 'প্রাণ'বুদ্ধিই ত সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে জাগ্রত জীবগণকে পথ দেখাইয়া চরমে লইয়া গিয়াছে! "যো দেবো অগ্নৌ, য অপ্সু, য ওষধীষু যো বনস্পতীষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ"রূপ দেবাত্মবুদ্ধির দীপ্তিপথে নিত্যকাল Animismই ত জীবের চরমের সখা এবং গুরুরূপে তাহাকে 'পথের খবর' দিতেছে। বেদের 'ঋষি'গণ প্রায় সকলেই নিসর্গের 'তুরীয় কবি'। (১)

আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, ভারতীয় অদ্বৈতবাদীর মতে এ জগতের যে-কোন বস্তুর পথেই, যে কোন পদার্থ অবলম্বনেই জীব 'তুরীয়'-স্থানে যাইতে পারে; একমাত্র প্রণালী হইতেছে জীবের ধর্ম্মগতি ও ব্রহ্মভাবনায় স্থিতি—Concentration—ব্রহ্মকেন্দ্রে চিত্তের যোগ—একচিত্ততা—একাগ্রতা! পদার্থ মাত্রেই 'চিৎ' হইতে আসিয়াছে বলিয়া, উহাকে চিৎপুরে লইয়া গিয়া উহার চিন্মূর্ত্তিতে চিত্তকে 'নিরুদ্ধ' করিতে পারিলেই, উহার 'একাত্ম'স্বরূপ ধরা' না দিয়া পারে না। এরূপে, 'যোগী' হইয়া জীব অন্তর্গতি লাভ করিতে পারিলে, "ব্যাবর্ত্ত দৃষ্টি"র পন্থায় বিশ্বের 'কারণ'স্বরূপের সন্নিহিত হইতে পারে এবং তাঁহার 'ধাম'পদবী পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে, ইহা ভারতীয় 'একতত্ত্ব'বাদীর এবং তদনুগামী পুরাণতন্ত্র ইতিহাসাদি সমস্তের বিশ্বসিত এবং স্বীকৃত এবং পুনঃপুনঃ প্রত্যক্ষিত সত্য। এ কথাটাই গত তিন প্রকরণে দেখাইতে চাহিয়াছি। ওয়ার্ড্সোয়ার্থ ও এমার্শন যে তত্ত্বকে তাঁহাদের 'বোধি'প্রাপ্ত সিদ্ধান্তরূপে উপস্থিত করিতেছেন, কিংবা ব্রাউনীং যে কথা পুনঃপুনঃ বলিয়া থাকেন—

> God is seen
> In the Star, in the Stone, in the flesh,
> in the Soul and the clod

(১) এ বিষয় মদীয় 'ভারতবাণী (অপ্রকাশিত) গ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছি। বেদে অনেক স্থলে আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ নিসর্গকবির কবিত্ব-প্রতিদ্বন্দ্বী কবিতাই আছে।

পতঞ্জলি তাহাকেই (কার্য্যকর ভাবে) পথ দেখাইয়া সংক্ষেপে বলিয়াছেন, "যথাভিমতধ্যানাদ্ বা"। এ কারণেই Personal God বাদীর 'উপাসনা' হইতে পৃথক্ এবং অনেক অগ্রগামী 'সাধনা' বলিয়া একটি আদর্শ এতদ্দেশে দাঁড়াইয়াছে। এরূপে 'এক'দৃষ্টির পথে 'একে গতি' সাধনাই ভারতীয় Practical মীষ্টিকের প্রধান লক্ষণ—অনন্য সাধারণ লক্ষণ। এরূপে 'এক'যোগের 'অধ্যাত্ম' পথই নাকি মনুষ্যের নবজীবনের ও অমৃত-জীবনের পথ; ক্ষুদ্র জীবের পক্ষেই অসীম শক্তি এবং অনন্ততা ও অমরতার 'অমৃত নাভি' লাভের পথ! এতদ্দেশের সাহিত্যসেবী মাত্রকে বুঝিতে হয়, এ মহাবিদ্যা ঋষি ভারতেরই আবিষ্কার (১) এবং উহাকে তুলনামূলক বিচার-যুক্তি-গবেষণার প্রণালীতে না বুঝিলে যেমন ভারতীয় 'কর্ষণা' (Culture) নামক পদার্থটী বুঝা যাইবে না, তেমন এতদ্দেশের—ধর্ম্ম সমাজপরিবার রাষ্ট্র কিংবা সাহিত্য—কোন প্রতিষ্ঠানের অন্তরাত্মাই প্রকৃতপ্রস্তাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে না। কারণ, গোড়ায় সেই বেদ এবং বৈদিকঋষির 'একত্ব'আদর্শের দ্বারাই এসমস্ত প্রকাশ্যভাবে অপিচ 'তলেতলে' শাসিত এবং নিয়ন্ত্রিত; সমস্তই শিরঃস্থিত সেই 'এক'বস্তুর লক্ষ্যে, অখণ্ডদৃষ্টিতে এবং অখণ্ড আদর্শেই পরিদৃষ্ট ও পরিচালিত। শ্রুতির সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্ বস্তু আবিষ্কারের পর হইতে ঋষির সকল লক্ষ্যের নিয়ন্ত্রনা এবং নিয়তিই দাঁড়াইয়াছে সেই

(১) বর্ত্তমান প্রসঙ্গের মুদ্রণ ব্যাপার চলিতেছে, এমন সময় একটি অপূর্ব্ব গ্রন্থের দিকেই ঘটনাক্রমে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল—শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মার 'ঋতম্ভরা'! লেখক মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় নাই। কিন্তু, গ্রন্থ পাঠে মনে হইল, প্রাচীন 'আর্যবিদ্যা' এখনো এতদ্দেশে 'সংপ্রদায়' ক্রমে অক্ষুন্ন আছে। ভারতীয় 'মীষ্টিক বিদ্যা' বিষয়ে উহা বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠগ্রন্থ। যতদূর ভাষায় আসে, লেখক তাহা অনুপম ভাবে বলিয়া গিয়াছেন। অগ্রে 'বেদান্ত দর্শন' এবং শ্রীমতি বেশান্তের Thought Power গ্রন্থটি পাঠ করিয়া 'ঋতম্ভরা' গ্রহণ করিলেই জিজ্ঞাসু পাঠক উপকৃত হইতে পারেন। যদিও গ্রন্থটী কার্য্যকর ভাবে বুঝিতে হইলেও অনেক স্থলে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে।

'এক'এর দিকে। সুতরাং, সংসারক্ষেত্রে মানুষে মানুষে প্রধান পার্থক্য যেমন চিত্তের ঐকান্তিকতা ও মনোযোগ লইয়া, যেমন অধ্যাত্মক্ষেত্রেও ক্ষুদ্র হইতে বৃহত্তম ও মহত্তম ব্যাপারে জীবের সকলশক্তির এবং কৃতার্থতার মূল রহস্য হইতেছে মনোযোগের মধ্যে, তেমন, বেদপন্থীর দৃষ্টিতে, মনুষ্যের সাহিত্যের বা মনুষ্যজীবনের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান মাত্রের সার্থকতা এবং মাহাত্ম্যের রহস্যও হইতেছে সেই 'এক'তত্ত্বে সুস্থির ধৃতি, স্থির আনুগত্য এবং প্রয়াণের নিয়তিমধ্যে! ঋষি মনুষ্যমাত্রের সকল অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানকেই যেন বলিতেছেন, সেই "একের তত্ত্বে সুস্থিত মনোযোগী এবং ধৃতিযোগী হও"। "তস্মাৎ যোগী ভবার্জ্জুন"।

কিন্তু, বুঝিতে হইবে, এই যে 'এক'বাদ বা 'এক'যোগ পদ্ধতি ইহা প্রধানতঃ 'রিলিজন' বা দর্শনক্ষেত্রের মীষ্টিসিজম; সুতরাং সাহিত্য ক্ষেত্রে উহার মুখ্য আমল নাই; শিল্পক্ষেত্রে উহার বাড়াবাড়ির জন্য অবসর নাই; উহার ভালমন্দতা বা যৌক্তিকতার বিচারেও সুতরাং সাহিত্যতত্ত্বের গ্রন্থে বিস্তারিত অবকাশ নাই। প্রোক্তরূপে ব্লেক ওয়ার্ডসোয়ার্থ প্রভৃতির হস্তে উহা শ্রেষ্ঠশ্রেণীর কাব্যকবিতার জনক হইয়া থাকিলেও, ইয়োরোপীয় সাহিত্যে উহা যে কবিশক্তিকে বিশেষভাবে উদ্দীপিত করিতে পারে নাই, তাহা স্বীকার করিতে হয়। ভারতের কিংবা পারস্যের সুফীতত্ত্বের বাহিরে, সাহিত্যের উহা উষরভূমি। 'রোমান্ কেথলিক' খ্রীষ্টানীর মধ্যে যে-কিছু তুরীয় ভাবুকতা ও ভাবসাধনায় অবকাশ ছিল, তাহা প্রোটেষ্টাণ্ট্ আদর্শের ছায়ায় পড়িয়া আরও শুখাইয়া গিয়াছে! এই ভবজীবনের এবং জীবনানন্দের "কারণ" পুরুষ তাঁহার স্বক্ষেত্রে (ধর্ম্মক্ষেত্রেই) 'ভক্ত'গণকে একেবারে যেন আনন্দদ্রোহী, তত্ত্ববিদ্বেষী এবং শুষ্কাত্মা করিয়াই তুলিতেছেন! ভারতীয় সাহিত্যের পৌরাণিক যুগে তুরীয়প্রীতি নানামুখে লীলায়িত হইয়া যে-একটা বিপুল সাহিত্যের জন্মদান করিয়াছিল, তাহাও নানাদিকে সংকীর্ণ। সার্ব্বজনীন সাহিত্যের রীতি, প্রমূর্ত্তি-পদ্ধতি বা রসস্থান উহাতে নানাদিকে সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। তবে, এই

অদ্বৈতানন্দ স্বয়ং 'অমৃত'; জীবের বুদ্ধির ক্ষেত্রে উহা পরম উচ্চছন্দের একটা মহাভাব। হৃদয়গিরির উচ্চতম শিখরে যাঁহারা পাদচারণ করেন, কেবল সে সকল সিংহধর্ম্মা জীবের 'আত্মা'ই এ'ক্ষেত্রে কবিত্বলীলায় নন্দিত এবং ছন্দিত হইতে পারে। যাঁহাদের চিত্ত—

"দূরঙ্গমং একচরং অশরীরং গুহাশয়ম"

অপিচ যাঁহারা 'লোকাতিগ' ভাববস্তুকে সর্ব্বজনের অনুভবযোগ্য প্রমূর্ত্তি এবং স্ফূর্ত্তি দান করিতে পারেন, সাহিত্যের এই 'ক্ষেত্র' তাঁহাদেরই নিজস্ব। উহা অসামান্য এবং লোকোত্তর চিত্তের রসানন্দ এবং আরতির ক্রীড়াভূমি। যোগবাশিষ্ট কিংবা শ্রীমদ্‌ভাগবতের, প্যারেডাইস্ লষ্ট্ বা ডিভাইন কমিডীর দেবচ্ছন্দা ও দেবাত্মা কবিগণের উহাই লীলাভূমি। কিন্তু, মনুষ্যমতি ত্রিপথগা; মনুষ্যের 'ধীঃ' ত্রিধারায় প্রেরিত এবং প্রচোদিত হইয়াই বহে। অতএব, জীবের ইচ্ছাশক্তির ও বিজ্ঞানাত্মার পথে (জ্ঞান ও কর্ম্ম) এমার্শনের কথিত 'শিখরে' চড়িয়া 'তৃতীয়' দৃষ্টি বা তুরীয়প্রাপ্তি সম্ভবপর হইলে, মনুষ্যের ভাবাত্মার বা Emotionতত্ত্বের পথেও চূড়ান্তে গিয়া এই 'তৃতীয় প্রাপ্তি' তেমনি 'সাধ্য' ও সম্ভবপর নহে কি? ফলতঃ, 'ভাবের পথ'টুকুই সর্ব্বসাধারণের পথ এবং উহাই সাহিত্যের খাসদখল। নিতান্ত পিচ্ছিল এবং "নিশিত ক্ষুরধার" হইলেও ভাবমার্গের প্রেম-সৌন্দর্য্য বা রসতত্ত্বের সাধন পথেই জীবগণ চরম 'সচ্চিদানন্দ'কে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে।

এই জগতের 'প্রেম', 'সৌন্দর্য্য' বা 'আনন্দতত্ত্ব' যে সাক্ষাৎভাবে এবং অন্তরঙ্গ ভাবে 'তুরীয়' হইতেই আসিতেছে উহা স্থির মানিয়া ও উহার ছায়ায় আনিয়াই তত্ত্বদর্শিগণ সাহিত্য-জগতের সকল শ্রেষ্ঠ 'ধর্ম্ম'প্রকাশ বা 'রস'প্রকাশকে দৃষ্টি করিয়া থাকেন। কবিগণ যে আত্মপ্রাণের সহজাত আনন্দধর্ম্মেই সাহিত্যে আনন্দতত্ত্বের সাধক, সে দিক হইতেই যে কবি-কৃত্যকে গ্রহণ করিতে হয়, তাহা দেখিয়া আসিয়াছি। বৈদান্তিকের দৃষ্টিতেই সাহিত্যের সকল কবিচেষ্টাকে (উহার নৈদানিক স্বরূপে ও

বিশ্বতন্ত্রের সহিত সমঞ্জসিত ভাবে) বুঝিতে পারা যায়। যেমন, শেকস্‌পীয়রের 'তত্ত্ব'ই ধারণা করুণ। শেকস্‌পীয়রের কাব্যসমূহের অভ্যন্তরে দৃষ্টি করিলেই বুঝিব যে, উহারা কবিহৃদয়ের সহজসিদ্ধ, মহাপ্রাণ, মহোদয় অথচ অতর্কিত আনন্দেরই প্রকাশ! শেক্‌সপীয়র সচেতনভাবে কোনরূপ মৌষ্টিক কিংবা কোনপ্রকার 'অধ্যাত্ম সাধক' নহেন। তথাপি, কবির আপন প্রাণের 'আনন্দ'টুকুই মনুষ্যচরিত্র অবলম্বনে, নাটকের পদ্ধতিতে, অপরূপ অবস্থা ও ঘটনার ধারণা পথে নবনব সৌন্দর্য্যসৃষ্টিতে এবং নরচরিত্রের সৌন্দর্য্যকল্পনী রসানন্দে উল্লাসী হইতেছে! মানুষের প্রতি, সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যচরিত্রের প্রতিই শেক্‌সপীয়রের অপরূপ প্রেম এবং সহানুভূতি। এত বড় মহানুভব হৃদয় মনুষ্যজগতে দ্বিতীয়টী জন্মে নাই। নিদারুণ কুৎসিত-কুরূপকে (অধার্ম্মিক এবং দুর্ব্বৃত্তকেও) কবি শেক্‌সপীয়র তাঁহার এই সৌন্দর্য্য-ভাবনায় ও রসানন্দসাধনার অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু, সকলের চরমে, সমস্তের ঐক্যতানে ফুটিয়া উঠিতেছে সেই চরম 'সৌন্দর্য্য'বস্তু —ভাবসুন্দর ও ধর্ম্মসুন্দর। ধর্ম্ম বলিতে ভারতবর্ষে আমরা বুঝি Law of Being; এই ধর্ম্মই জীবের অন্তর্জগতে আসিয়া দাঁড়ায়—Moral Law; এই 'ধর্ম্ম' আদর্শই শেক্‌সপীয়রের সকল শিল্পতরণীর ধ্রুবতারা; অধ্যাত্ম 'ঋত' বা ধর্ম্মতাই তাহার কাব্যতন্ত্রের কাণ্ডারী। ধর্ম্মই সুতরাং শেকস্‌পীয়রের অটলগভীর এবং সুস্থির অন্তঃপ্রজ্ঞা; অথচ উহা ত অতর্কিত বলিয়াই প্রতীয়মান! এস্থলেই কবি প্রকৃত 'স্রষ্টা'—মহোত্তম Artist; স্বয়ং প্রকৃতির মতই যেন তাঁহার অযত্নসিদ্ধ সৃষ্টি! আপাতদৃষ্টিতে অতর্কিত এবং যদৃচ্ছ অথচ অধ্যাত্ম ধর্ম্মতায় অবিচল এই সৃষ্টি 'লীলা'। তাঁহার কাব্যজগতের পাত্রগণের সকল জীবনচক্রে এবং উহাদের পাপপুণ্য কিংবা ভালমন্দের সকল দ্বন্দ্বের মধ্যে এ' নিমিত্ত 'ধর্ম্ম'ই জয়ী হইতেছে। সর্ব্ব পরিশেষে ওই অতর্কিত ও আপাততঃ নির্লিপ্ত 'ধর্ম্ম'ই জয়ী! জীবনেমরণে, ট্রাজিডী এবং কমিডীতে আপন মাহাত্ম্যশ্রীতে ধর্ম্মসুন্দরই বিজয়িনী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে!

সকল 'বড় কবি'র কাব্য-আত্মার মধ্যেও ইহাই নহে কি? উচ্চ-সাহিত্যের সকল 'রস'বস্তুর অন্তরঙ্গে সদ্ভাবসুন্দর ও ধর্ম্মসুন্দরের তত্ত্বকে বিজয়ী রূপে উপস্থিত করিয়া কবিগণের 'ধর্ম্মানন্দ'ই লীলায়িত হইতেছে। সুতরাং, এরূপ স্থলে, আত্মপ্রাণের 'ধর্ম্ম'বোধি কিংবা প্রাণের আনন্দ-বস্তুর বলবত্তা এবং ভাবুকতার প্রমূর্ত্তনী শক্তি লইয়াই কবিগণের মধ্যে ইতর বিশেষ। তাঁহাদের আত্মপ্রাণের হ্লাদিনীশক্তির 'ইতর বিশেষ' গুণধর্ম্ম হইতেই তাঁহাদের শিল্পসিদ্ধির রসবত্তার মধ্যে শক্তির 'ইতর বিশেষ'ত্ব এবং তুলনায় মাহাত্ম্য বর্ত্তিয়া যাইতেছে।

আনন্দ হইতে যেমন বিশ্ব-সৃষ্টি, তেমন আনন্দ হইতেই সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি। সৌন্দর্য্য হইতে প্রেম; আবার প্রেম হইতেও সৌন্দর্য্য —এরূপে পরস্পর সম্পর্কের উল্লাসে বিলাসে, বস্তুগত সৃষ্টিতে বা ভাবগত আত্মপ্রকাশে চরমের সেই 'আনন্দ' বস্তুই যেমন ভবজগতে, তেমন (কবিগণের ভিতর দিয়া) সাহিত্যজগতেও লীলায়িত হইতেছে! এই লীলাত্মার নামই সাহিত্যক্ষেত্রে 'রস'; সাহিত্যিক রসের হৃদয়টাও সুতরাং চরমের 'রস'স্বরূপের সঙ্গে ঐক্যতানেই চলিয়াছে। 'রস' স্বরূপ আত্মার বা চরম 'আনন্দ'পদার্থের সাজাত্যসম্বন্ধে আনিয়া ধারণা ব্যতীত, সাহিত্য অথবা বিজ্ঞানক্ষেত্রের কিংবা শিল্পক্ষেত্রের এই 'সৃষ্টি' নামক ব্যাপারটী প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝা যাইবেনা; অথবা, জীবের চিত্তক্ষেত্রে ওই সৃষ্টিরঙ্গিনী এবং "নবনব উন্মেষশালিনী প্রতিভা" নামক বস্তুটীর প্রকৃত অর্থও কদাপি হৃদয়ঙ্গম হইবে না।

আবার, চরমের 'আনন্দ'বস্তুই ত জীবজগতে 'প্রেম'রূপে লীলায়িত! প্রেমের এই আভ্যন্তরীণ স্বরূপ এবং চরমবস্তুর সঙ্গে উহার সাজাত্য সম্বন্ধটুকু যেন অতর্কিতে চিনিয়াই ইংরেজ কবি ডাকিয়া উঠিয়াছিলেন "Love is Heaven ; Heaven is love." কথাটা আপাততঃ একেবারে বিরূপ শুনায়। জীবের 'অবিদ্যা' গতিকে মর্ত্ত্যজগতে প্রেমতত্ত্ব নানা কদর্থে ও কুরূপে এবং অনভীষ্ট রূপেই ত প্রতীয়মান! প্রেমতত্ত্বকে উহার স্বরূপে ধারণা করার ক্ষমতাও অনেক জীবের নাই।

কিন্তু জীবহৃদয়ের এই 'প্রেম'বস্তুটী নিদানতঃ কি? মানুষের জীবন অধিকাংশে কেবল 'স্বার্থ' লইয়াই ব্যস্ত। জীব 'দেহধারী' বলিয়া, তাহার এই দেহটার রক্ষার্থে জন্মধর্ম্মেই কিছু না কিছু স্বার্থবন্ধ এবং স্বার্থ নিয়তি জীবমাত্রকে পাইতেছে। কিন্তু, এই ভবরাজ্যে, এই স্বার্থের রাজত্বে পরার্থপরতার সুর কে আনিল? নিজের স্বার্থছায়াকে ডিঙ্গাইতে, অহমিকা, অভিমান ও আত্মম্ভরতাকে ছাড়াইয়া জীবকে নিজের বাহিরে আনিতে চাহিতেছে 'প্রেম'। জীবজীবনে প্রেমের এই মহারহস্য কে বুঝিয়াছে? জড়তার জগতে, আত্মস্বার্থ ও আত্মম্ভরতার জগতে এই আত্মবিস্মৃতি এবং আত্মদানের 'ধাৎ' কোথা হইতে আসিল? জড়বাদী, বৈজ্ঞানিক হক্‌সলী নিজে স্বীকার করিয়াছেন 'ধর্ম্ম' (Morality) ব্যাপারটী Life Processএর বা জীবের জীবন-রক্ষণী বৃত্তির বিরোধী। আদিম জৈব প্রবৃত্তির বিরোধ ও নিরোধমূলক এই 'ধর্ম্ম' নামক ব্যাপারটী জীবনতন্ত্রে কি করিয়া প্ররূঢ় হইল? স্বার্থের জগতে আত্মোৎসর্গকারী 'প্রেম'ই বা কি করিয়া উপজাত হইল? নিজে না খাইয়াও পরকে খাওয়াইতে, নিজে না বাঁচিয়াও পরকে বাঁচাইতে, 'সুত-মিত-দারা'র জন্য আত্মসুখদান করিতে কে শিখাইল? হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে শ্রুতির 'দ্রষ্টা' ঋষি উত্তর দিয়া রাখিয়াছেন—'আত্মা'। "ন বা অরে, পুত্রকামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি"। জগতের যাবতীয় প্রিয় পদার্থের ওই 'প্রিয়তা' নামক গুণের 'কারণ'টুকু এবং এই "আত্মনস্তু কামায়" কথাটা জিজ্ঞাসু মাত্রকে বারংবার চিন্তা করিতে বলিব। উহাপেক্ষা বড় কথা কোন দার্শনিক বলিতে পারেন নাই। উহা আত্মোপাসক ঋষির চূড়ান্ত কথা। এই 'আত্মা'র অপর নামই "আনন্দ"; যে কারণে "আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ"। আত্মা আনন্দময় ও বিশ্বব্যাপ্ত পদার্থ এবং এ বিশ্বের 'কারণ'পদার্থ বলিয়া জীব স্বকীয় আত্মার স্বধর্ম্মেই অবিদ্যাজনিত ক্ষুদ্রতা ও স্বার্থপরতা উত্তীর্ণ হইয়া প্রেমের স্থিতি বা আত্মস্থিতি লাভ করিতে চাহিতেছে। জগৎতন্ত্রে

প্রেমের বা জড়দেহবাসী জীবের কোন বস্তুর প্রতি আকর্ষণের 'অর্থ'ই হইতেছে—প্রকারান্তরে সেই অপ্রাপ্ত প্রেমসুন্দরের ও রসসুন্দরের অন্বেষণ। প্রেমই জীবের সকল সঙ্কীর্ণতার 'বন্ধন' হইতে মুক্তিদাতা বন্ধু—মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত বিত্ত! আনন্দবাদী নারদ ও সনৎকুমার হইতে ভারতবর্ষে একটী বিশিষ্টশ্রেণীর ভাবুকতা এবং ভাবপ্রাণতা ও জীবনসাধনার ধারা সম্প্রদায়ক্রমে চলিয়া আসিয়াছে। প্রাচীন আর্য্যঋষি ছিলেন মহাপ্রাণ জীব, বীরকর্ম্মা এবং বীরাচার পুরুষ; তাঁহারা ছিলেন বিশ্বসিত আদর্শের সাধনায় অচল-অটল ও বীর্য্যবিভূতি-পেশল, মহাধর্ম্মা পুরুষ। তাঁহারা যেই 'সত্যজ্ঞান আনন্দ'তত্ত্বকে জগতের 'কারণ' রূপে দেখিয়াছিলেন, সমস্ত জীবনের জ্ঞানভাব-কর্ম্ম-পথে অস্খলিত এবং অবিচল মহাপ্রজ্ঞায় তাহার দিকেই একাগ্র হইয়া ছুটিয়া গিয়াছেন। ঋষিহৃদয়ের বীর্য্যবরিষ্ঠ, দেবাচারী এবং ব্রহ্মাচারী আনন্দ-বুদ্ধির পরিপ্রকাশ—ওই উপনিষদ্! প্রাচীন ঋষি ছিলেন 'পূর্ণ'তত্ত্বের অধ্যাত্ম সাধক; জীবের 'ত্রিপথ'বাহিনী চিত্তবৃত্তির কোন-একটীর দিকে তাঁহারা সবিশেষ প্রীতিপক্ষপাত দেখাইতে চাহেন নাই। কিন্তু, ঐ 'আনন্দ'বাদ হইতে ভারতবর্ষে একটা বিশেষপন্থী সাধক-সংঘের জন্ম। তাঁহারাই আনন্দের 'রূপ' দেখিয়া ছিলেন—"আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্বিভাতি"। বেদে তাঁহারাই বলিয়াছিলেন "বিষ্ণুর্মধুরূপঃ", "বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ", তাঁহারাই জীবনে 'রূপনারায়ণ' অপিচ 'সকল নারায়ণ' এর উপাসক। স্বয়ং ব্যাসবাল্মীকিকে এই "আনন্দপন্থী" ও "মধুপন্থী"গণের অন্যতম ও প্রধান বলিতে পারি। বলিতে গেলে, তাঁহারাই ভারতীয় সাহিত্যের স্রষ্টা; তাঁহাদেরই নাম দেওয়া যায়—"বৈষ্ণব"। মনুষ্যজীবনে এই 'বৈষ্ণবী রীতি' ও মুখ্যভাবে 'আনন্দ' সাধনার পদ্ধতি হইতেই ত দেশেদেশে সাহিত্যের জন্ম এবং বিকাশ! এই 'আনন্দ' তত্ত্বের সাধকগণই গলা বাড়াইয়া বলিয়াছেন, সেই তৎপদার্থ বা সেই 'আত্মা' আনন্দময়—প্রিয়—প্রেমময়—"প্রিয়ঃ পুত্রাৎ প্রিয়ো বিত্তাৎ," "অস্তি ভাতি প্রিয়ং ব্রহ্ম"।

জগতের তাবৎ 'প্রিয়তা বোধ' বা প্রেমধর্ম্ম, অপিচ 'ধর্ম্ম' নামক বস্তুই সুতরাং সেই পরম 'আনন্দ'ময় ও 'প্রেম'ময় হইতেই ত আসিতেছে। এই 'প্রেম'বস্তুকে অনুসরণ করিয়া প্রাচীন বৈষ্ণবগণ অনেক দূরে লইয়া গিয়াছেন; নারদশাণ্ডিল্যের সূত্রগ্রন্থে, পাঞ্চরাত্র ও ভাগবত গ্রন্থে উহারই প্রমাণ। বঙ্গদেশে 'বাঙ্গালী' নামক বিশিষ্ট জাতির চিত্ত ও অন্তঃপ্রজ্ঞার সম্পর্কে আসিয়া এই 'প্রেম' আদর্শ অনেক দূরে গড়াইয়াছে; নানামুখী ও নানারূপী ধর্ম্মসাম্প্রদায়িকতার এবং ভাবুকতার সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। বাঙ্গালীকে নানাদিকে আত্মবৈশিষ্ট্যময় একটী ভাবপ্রাণ জাতি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নারদ শাণ্ডিল্যের 'ঈশ্বর ভক্তি' বা "পরানুরক্তিরীশ্বরে" বস্তুটাই বাঙ্গালী জয়দেব প্রভৃতির মধ্যে আসিয়া কেবল 'সাহজিক অনুরক্তি' এবং "ঐশ্বর্য্য বিরহিত মাধুর্য্য"রূপে বা 'সহজ মানুষের প্রতি অনুরাগ' রূপে এবং 'রাগাত্মিকা ভক্তি'রূপে সম্পূর্ণ মানুষভাবেই দাঁড়াইয়া গিয়াছে। পরিশেষে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর শ্রীচৈতন্য এবং তাঁহার আসন্ন-শিষ্যগণের হস্তে আসিয়া ঋষিগণের সেই 'তৎ' এবং "সত্যজ্ঞান আনন্দ" ও 'আত্মা' বস্তুই দাঁড়াইয়াছে—"অখিল রসামৃতমূর্ত্তি", "সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ", 'প্রেমমূর্ত্তি'—প্রেমের 'বংশীবদন'মূর্ত্তি! তাঁহারা দেখিয়াছেন—ফলে প্রেম-বস্তুই ভগবান্; বা ভগবদ্‌বস্তুই সৃষ্টিপ্রকটিত 'প্রেম'! তত্ত্বদর্শীর দিক্ হইতে, একেবারে সেই ইংরেজ কবির কথাটিরই সমর্থনা—

"Love is Heaven; Heaven is Love"

আবার, তাঁহারা ছিলেন রূপবাদী—সুতরাং প্রেমের Symbol বা প্রতীক ওই 'বংশীবদন' মূর্ত্তি। প্রেমবংশীর রবই প্রণব! 'শব্দব্রহ্ম' বাদিগণের ধারণায় বিশ্বসংসার যেই প্রণব হইতে সম্ভাবিত হইয়া সৃষ্টিচক্রে বিবর্ত্তিত এবং ব্যাবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে, বৈষ্ণব কবিগণের 'বংশীধর' একদিকে উহারই 'প্রতীক' বা স্বরূপ মূর্ত্তি। এরূপে সৃষ্টিতত্ত্বের প্রেম-আনন্দ-সৌন্দর্য্যের দৃশ্য প্রতীকমূর্ত্তি হইতেছেন বংশীবদন—অখিল

বিশ্বকারণ সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি—জগদীশ্বরের মানুষীমূর্ত্তি। সুতরাং, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-'মৌষ্টিক'গণের নিকটে যে-কোন প্রকারে 'প্রেম সাধনা'ই ভগবৎ-সাধনা এবং 'শ্রীমূর্ত্তি' অবলম্বনে রসানন্দের সাধনাও 'ভাগবতী সাধনা'! এজন্য 'উজ্জ্বল নীলমণিঃ' নামক গ্রন্থে যেন একটা সাহিত্যিক রস-সাধনাই একেবারে ধর্ম্মসাধনার প্রকৃতি লাভ করিয়া দাঁড়াইয়াছে! 'প্রেমমূর্ত্তি' অবলম্বনে গৌড়ীয় মৌষ্টিকগণ নানাবিধ উপায়ে এরূপ 'রসসাধনা'ই করিয়া থাকেন। রাধিকা নামে নিজের একটী প্রতিনিধি বা প্রতিমা খাড়া করিয়া, 'বংশীবদন' প্রেমমূর্ত্তির সঙ্গে উহার 'পূর্ব্বরাগ' বৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া 'অভিসার' 'মান'ও 'মাথুর' প্রভৃতি নানা 'ভাব' অবলম্বনে নৃত্যগীতে এবং সংকীর্ত্তনে এই 'রসসাধনা' চলে। (১) [illegible]দেশ্য—প্রেমমূর্ত্তির প্রতি জৈবিকক্ষেত্র হইতে নিজের প্রেমভক্তির ঘনতাসমাধান। উহার নামই "উন্নতোজ্জ্বল রসা" ভক্তি-সাধনা। তাই, 'ভক্তি রসামৃতসিন্ধু' বলিতেছেন—

বিভাবৈরনু ভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ
স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানাং আনীতা শ্রবণাদিভিঃ
এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ীভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ॥

(১) বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যক্ষেত্রে প্রেমের এই 'বংশীবদন' আদর্শ এবং জীবের প্রেমের টানে প্রেমস্বরূপের জীবক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া রূপ 'অবতার' আদর্শ যতদূর গ্রহণ করিতে এবং উহাকে সাহিত্যিক প্রমূর্ত্তি দান করিতে পারা যায় বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, তাহাই মদীয় 'স্বর্গমর্ত্ত্যের প্রেমগাথা' কাব্যের শিল্পাত্মায় ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি; এবং মানুষপ্রেম বা স্বামীস্ত্রীর দাম্পত্য 'প্রেম'ও কিরূপে একান্ত হইলে স্ত্রীপুরুষ একে-অন্যের তাদাত্ম্য লাভ করিতে পারে এবং সে পথেই বিশ্বাত্মতা লাভ করিতে পারে, এমন কি এরূপ 'প্রেম'ই 'মহাশক্তি' রূপে পরিণতি লাভ করিয়া এই ভবজগতের মৃত্যুতন্ত্রকে পর্য্যন্ত পরাস্ত করিতে পারে; সে তত্ত্বটাই 'কবিরীতি' অবলম্বনে 'সাবিত্রী' কাব্যের শিল্পাত্মা মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছি। উভয় কাব্যে, অন্ততঃ একদিকে, 'ভারতীয় বীক্তির' অধ্যাত্মবাদ এবং প্রেমের মৌষ্টিক আদর্শকেই লক্ষ্য করা হইয়াছিল।

এরূপে রাধাকৃষ্ণের 'প্রেম লীলা'র বর্ণনাময় একটি বিপুল সাহিত্য বঙ্গদেশে প্রব্রূঢ় হইয়াছে। আর যাহা হউক, বৈষ্ণবের এই বিশেষত্ব যে একটা temperamentএর (মেজাজের) বিশিষ্টতা, মানবজাতিমধ্যে এরূপ মেজাজের ব্যক্তি যে অনেক আছেন, তাঁহাদের সংখ্যা যে মনুষ্যজাতির অর্দ্ধাংশ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না, তাহাই বুঝিতে হয়। Berger তাঁহার William Blake গ্রন্থে, প্রেমের বিশেষত্ব চিন্তা করিতে বসিয়া ইঁহাদের মনোরীতির কথাই যেন বলিয়াছেন—Love is in essence the concentration of all the forces of the soul upon a supernatural object conceived and loved as a living person. এরূপ মেজাজ হইতেই ত গৌড়ীয় মীষ্টিকগণের সেই 'অপ্রাকৃত' 'বংশীবদন'!

এ ব্যাপারের আধ্যাত্মিক যুক্তাযুক্ততার বিচারে আমাদের অবকাশ নাই। তবে সাহিত্যিকগণ বলিতে পারেন, ইহা নিবূ্র্ঢ় সাহিত্যরসের ব্যাপার। ফলে, সাহিত্যসেবিগণ বৈষ্ণবকবির সকল প্রেমকবিতা ও বাক্যব্যাপারকে সাহিত্যের হিসাবেই দৃষ্টি করেন। ভাবোন্মত্ত গান, গীতিপন্থী ভাবুকতা এবং ভাবগত কবিত্বই উৎকর্ষস্থলে বৈষ্ণব প্রেমকবিতার মাহাত্ম্যলক্ষণ। প্রেমকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চভাগে বিভক্ত করিয়া একই 'প্রেম'মূর্ত্তি অবলম্বনে এই 'রসসাধনা' অগ্রসর হইয়াছে।

প্রেম নামক মনোভাবকে একটা 'সাধ্য'তত্ত্বরূপে ও পরমার্থরূপে ধরিয়া, সাহিত্য এবং সঙ্গীতের ভাবুকতা-রীতিপথেই এরূপ একটা 'সাধনা'র ব্যাপার এবং সে ব্যাপারে আবার কবিত্বরস-শীল এত বিপুল বৈচিত্র্য! পরের দৃষ্টিতে যাহা কেবল ভাবুকতা ও কল্পনামত্ততা বই নহে, তাহাই জীবনের সত্যপ্রতুল একাবলম্বন! ইহাতে আর যাহাই হোক, সাহিত্যতন্ত্রিক 'রস' ও 'প্রেম'তত্ত্বের মাহাত্ম্য একদিকে বাড়িয়া যাইতেছে; একেবারে পরমার্থ গৌরবেই যেন দাঁড়াইয়া যাইতেছে। সাহিত্যকেও 'প্রেমের রাজ্য' বলিলে অত্যুক্তি হইবে

না—সাহিত্যের সকল রসসিদ্ধি, গৌণমুখ্যভাবে, প্রেমরসের বা আদি রসেরই বিকাশ। সাহিত্যের আত্মার নাম আনন্দ—সেই আনন্দের নামই 'রস'—রসানুভূতির মূলেও সহানুভূতি—সহানুভূতির মূলে আবার প্রেম। সাহিত্য নিখুঁত আনন্দের রাজ্য এবং এই আনন্দের বিকাশ-ক্ষেত্রেও প্রেম, রূপ বা সৌন্দর্য্য পরস্পর সহোদর বস্তু। সুতরাং, 'আনন্দ'বাদী বৈষ্ণব নৈষ্টিকগণ ভবব্যাপারে সর্ব্বপ্রকার প্রেম এবং সৌন্দর্য্যের বিকাশকেও সাক্ষাৎ 'আনন্দ'সৃষ্ট বলিয়াই নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মর্ম্ম এই যে, পরমাত্মা বিশ্বব্যাপক আনন্দতত্ত্ব বলিয়া জীবমাত্রে আপনার 'স্বধর্ম্ম'বশেই বিশ্বকে আপনার করিতে চায়; বিশ্বকে আত্মার মধ্যে আনিতে অথবা বিশ্বে আত্মপ্রসার করিতে চায়। আবার, আত্মার স্বধর্ম্মই প্রেম বলিয়া, প্রেমতত্ত্বই বিশ্বকে 'সুন্দর' করিতেছে অথবা সুন্দর করিয়া আত্মস্থ করিতেছে। অতএব, প্রেম-বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে, জীবের পক্ষে 'ভাব বৃত্তি'র পথে প্রেমতত্ত্বের সাধনাই চরম 'সৎ'বস্তুর সাধনা এবং 'প্রেম'ই জীবজীবনের চরম অধ্যাত্মস্বার্থ ও পরমার্থরূপে দাঁড়াইতেছে।

অন্যেরা যাহাই বলুন, সাহিত্য'রস'সাধক কবিগণের হৃদয়, অন্ততঃ জীবনের সমুন্নত 'ভাব ও কর্ম্ম ব্যবসায়'রূপে দৃষ্টি এবং বিচার পূর্ব্বক বৈষ্ণবের এ সিদ্ধান্তে 'সায়' দিতে পারে; এবং কবির ব্যবসায়কেও চরম রসবস্তুর অভিমুখী 'জীবন সাধনা'রূপে গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাদিগকে সকল সাহিত্যকর্ম্মে সেই চরম পথযাত্রী ও সার্থক-কর্ম্মা জানিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারে। সাহিত্যজগৎ অন্তরতঃ আনন্দ-রস-প্রেম-সৌন্দর্য্যের এবং 'মানসিক রূপ'তন্ত্রের জগৎ। জড়তামুগ্ধ জীবের এই 'আধিভৌতিক' জগতে, এই কামানন্দ ও বিষয়ানন্দের জগতে কবিগণই মানসপথে নির্ম্মল 'আনন্দ'বস্তুর অন্বেষণায় ঘুরিতেছেন—চরম আনন্দের সংবাদই শিল্পের পথে জীবকে দিতেছেন। এরূপ আনন্দপন্থী শিল্পসাধনার মাহাত্ম্য ও শিল্পরসের নির্ম্মলতা লইয়াই ত কবিগণের মধ্যে প্রবল 'উচ্চনীচ' ভেদ ও 'জাতিভেদ' উপজাত হইয়া থাকে।

ভারতের ভবভূতি গভীর প্রেমসাধক কবি; তাঁহার 'উত্তর রামচরিত' প্রেমতত্ত্বের মূর্ত্তিমান্ একটি Tragedy। একদিকে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত প্রেমকর্ত্তব্য, অন্যদিকে রাজকীয় কর্ত্তব্য এবং 'প্রজার ধর্ম্মাদর্শ-রক্ষা'রূপ প্রেমকর্ত্তব্যের মধ্যে মহাসমর! উভয়ের নিষ্পেষণমধ্যে পড়িয়া প্রেমময় মহাপুরুষ রামের হৃদয় যেই হাহাকার তুলিয়াছে, তাহা লইয়াই এ কাব্যের করুণ 'রসাত্মা'— যদিও সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের যন্ত্রনিষ্পিষ্ট কবি কাব্যটীকে বাহ্যতঃ পুরাপুরি ট্রাজিডীর আকৃতি দান করিতে পারেন নাই। এদিকেও আবার আর একটা Tragedy—আলঙ্কারিকের জাঁতি-নিষ্পেষিত কবিহৃদয়ের Tragedy! ভবভূতির দৃষ্টিতে প্রেম একটা অধ্যাত্ম পদার্থ—উহার মধ্যে "আন্তরঃ কোঽপি হেতুঃ" আছে। এজন্য প্রেমাস্পদের বাহ্যিক রূপাদির দিকে প্রেমিকের মোটেই দৃষ্টি নাই; বাহিরের দৃষ্টিতে অনেকের প্রেমপ্রবৃত্তির কোন হেতু অনেক সময়েই স্থির করা যায় না। "ব্যতিষজতি পদার্থানান্তরঃ কোঽপি হেতুঃ, ন খলু বহিরুপাধীন্ প্রীতয়ঃ সংশ্রয়ন্তে॥" ভবভূতি জীবের এরূপ প্রেম-ব্যাপারের মধ্যে "পুরাণো বা জন্মান্তরনিবিঢ়বন্ধঃ পরিচয়ঃ" দেখিয়াছেন। সুতরাং, প্রেমের হেতু চিন্তা করিতে গিয়া তিনি একজন মৌষ্টিক। ভবভূতি প্রেমকে জীবজীবনের একটা 'অদ্বৈতমুখী' গতি ও সিদ্ধিরূপেই বুঝিয়াছিলেন; জীবকে 'সুখদুঃখ'সম্বন্ধের অতীতক্ষেত্রে লইয়া যাইতে পারে এমত মহাশক্তিশালী একটা 'তত্ত্ব'রূপেই উহাকে চিনিয়াছিলেন—

> অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসু যৎ
> বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র, জরসা যস্মিন্নহার্য্যোরসঃ।
> কালেনা বরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারে স্থিতং
> ভদ্রং প্রেম সুভানুষস্য কথমপ্যেবং হি তৎ প্রাপ্যতে॥

দাম্পত্যপ্রেমের মধ্যে যে একটা জীবনমঙ্গল্য অধ্যাত্মশক্তির উৎস থাকিতে পারে, সে বার্ত্তা ইহাপেক্ষা ঘনিষ্ঠভাবে কোন কবি দিতে পারেন

নাই। কবি এস্থলে ইচ্ছা করিয়াই অদ্বৈততত্ত্বের ধ্বনি দিতেছেন। দাম্পত্যপ্রেম যে জীবজীবনের চরম কল্যাণময় পরম পদার্থ, কবির হৃদয় তাহা চিনিয়াছে। ভারতীয় ঋষি একব্রত্য প্রেমকে, বিশেষতঃ দাম্পত্যপ্রেমকে সংসারী জীবের পক্ষে 'পরম বস্তু' রূপেই নিরূপণ করিয়াছেন; স্বল্পমতি ও ভাবপ্রধান স্ত্রীযোনির পক্ষে একনিষ্ঠ স্বামী-প্রেমকেই 'সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্য' পরমার্থ রূপে এবং সংসারসাগরের তারক তত্ত্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এরূপ দাম্পত্যপ্রেমের পথেই 'পরমার্থ'সাধক একজন ইংরেজ কবি—কভেন্ট্রি পাট্‌মোর। তিনি যদি ভারতীয় ঋষির এই দাম্পত্যপ্রেম আদর্শটী জানিতেন! ভবভূতির রাম প্রেমবস্তুর এই 'তারকশক্তি'র প্রভাব অস্থিমজ্জায় অনুভব করিতেছেন। সীতাবিরহিত রাম 'প্রেম'কে বচনাতীত তত্ত্বরূপে প্রাণে প্রাণে অনুভব পূর্ব্বক যে বাক্য উচ্চারিত করিয়াছিলেন, তাহা ভবভূতির শ্রেষ্ঠ কবিতারূপেই পূজা লাভ করিয়াছে। রাম বলিতেছেন—

ত্বয়াসহ নিবৎস্যামি বনেষু মধুগন্ধিষু।
ইতি চারমতেবাসৌ স্নেহ স্তস্যাঃ স তাদৃশঃ॥
অকিঞ্চিদপি কুর্ব্বাণঃ সৌখ্যৈ দুঃখান্যপোহতি।
তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়ো জনঃ॥

প্রেমযোগী এই কবি যেমন প্রেমকে, তেমন 'রূপ'কেও বচনাতীত তত্ত্বরূপেই চিনিয়াছেন। উত্তরচরিতের প্রথম অঙ্ক ভবভূতির এই রূপাভিনিবেশ ও রূপযোগের ভাবুকতায় পূর্ণ। প্রিয়াকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাম বুঝিতেছেন, যেমন 'প্রেম' বাক্যমনের অগোচর, অধৃত ও 'অধর' তত্ত্ব, রূপও তাই। সীতাকে বলিতেছেন, "প্রিয়ে—

বিনিশ্চেতুং শক্যো কিমু সুখমিতি দুঃখমিতি বা
প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
বিকার শ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ!

রূপের মর্ম্মদেশে ইহাপেক্ষা গভীরতর অবগাহনের দৃষ্টান্ত সাহিত্য-জগতে নাই। রূপের এবং প্রেমের এই বাক্যাতীত ও ভাবাতীত পদবী! সংসারী জীব যাহার স্পর্শে নিজকে বাক্যাতীত ও অলৌকিক তত্ত্ব বলিয়াই অনুভব করিতেছে! প্রেমসাধক কবি বিদ্যাপতির হৃদয় এবম্বিধ প্রেমের বাণবিদ্ধ এবং রূপমুগ্ধ হইয়া বিরহানন্দে যে হাহাকার তুলিয়াছিল, তাহা বঙ্গীয় কাব্যসাহিত্যে বরেণ্য স্থানেই দাঁড়াইয়া আছে—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন ন তিরপিত ভেল
লাখ লাখ যুগ হিয়েহিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুরন ন গেল।

মর্ত্ত্যজগতে প্রেম একটী অমেয়, অসীম ও অমৃত তত্ত্ব বলিয়াই উহার মিলনের মধ্যেও যে পূর্ণমিলন, বা পূর্ণ তৃপ্তি নাই, এ মিলনের সুখের মধ্যেও একটী যেন দুঃখই যে আছে, উহা যে এক দিকে অপরূপ 'বিষামৃত' তত্ত্ব, এবং 'প্রেম' উক্ত ধর্ম্মবশেই যে 'প্রেমিক' মানুষকে উপস্থিতে অতৃপ্ত করিয়া অনন্তের যাত্রী করিতেছে, সে সূত্রেই যে উহা অনন্তের দয়াদান (Grace) গৌড়ীয় প্রেমসাধকগণের তাহাই মর্ম্ম। বিদ্যাপতির চিরকিশোরী রাধিকার হৃদয় রূপসুন্দরের মধ্যে সেই অনন্ততত্ত্ব দেখিতেছে; নিজকেও অনন্তভিক্ষুক, অমৃতপ্রাণ ও কালাতীত তত্ত্ব বলিয়াই অনুভব করিতেছে! ক্ষুদ্র জীব, যাহার বয়ঃক্রম পার্থিব কালবিচারে হয়ত পঁচিশটী বৎসরের বেশী নহে, সেই ত প্রেমবশে নিজকে একেবারে অনন্তজীবী ও কালাতীত তত্ত্ব বলিয়া প্রাণেপ্রাণে বুঝিতেছে! অতর্কিতে, এক নিমেষে দেশকালের সীমাপরিসর ডিঙ্গাইয়া নিজকে অনন্তপ্রেমিক এবং অনন্ত অতৃপ্তিপথিক অমৃত বস্তু বলিয়াই অনুভব! রক্তমাংসতন্ত্রী এই দেহের কামক্ষুধা-গ্রস্ত জীবের অদৃষ্টেও যে প্রেমপথে এরূপ একটা মহাপ্রাপ্তি ঘটিতে পারে, সকলের নিত্যনিয়ত শোনা' এবং জানা' 'প্রেম' কথাটীর মধ্যেই এরূপ মহার্থ এবং পরমার্থ যে আছে, প্রেমসাধক বৈষ্ণব কবিগণ সেই ভাবসমাচার জগৎকে দিয়াছেন।

কবি চণ্ডীদাসের মধ্যে প্রেমের এই তুরীয় আদর্শ আরও অগ্রসর—একেবারে চরমপন্থী। চণ্ডীদাস 'সহজ রস'পন্থী বৈষ্ণব। মানুষের মধ্যে সহজাত যে 'প্রেম'ভাব আছে, সাধিত হইলে উহাই পরমার্থে দাঁড়াইতে পারে, ইহাই সহজিয়াগণের ধর্ম্মমত। বিশেষত্ব এই যে, আপাততঃ ইহারা জড়ধর্ম্মী 'কাম'কেও যেন খারাপ চক্ষে দেখেন না—

'প্রেম কাম দোহাকার অনন্ত অন্তর।
কাম সে খদ্যোৎ প্রেম প্রচণ্ড ভাস্কর॥

ইহা এরূপ 'সহজ রসিক'শ্রেণীর বৈষ্ণবের কথা হইলেও, বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, তাঁহারা উভয়ের মধ্যে সজাতীয় ভেদই দেখিতেছেন; উভয়ের মধ্যে বরং (ভিকটর হুগোর কথায়) 'সুদূর ঐক্যই' যেন দেখিতেছেন। এ বিশ্বাসে চণ্ডীদাস এক মানুষীকে লইয়া প্রেমসাধনা আরম্ভ করিলেন; পরস্পর প্রেমদেবতা ও ইষ্টদেবতা হইয়া দাঁড়াইবেন, উভয়ে প্রেমপ্রাণ ও 'এক প্রাণ' হইবেন ইহাই লক্ষ্য। চণ্ডীদাস ও 'রজকিনী রামী'র কাহিনী এদেশে সুপরিচিত। ব্রাহ্মণ চণ্ডীদাস সেকালেই সমস্ত সামাজিক ভেদবিভেদ ও উচ্চনীচের ব্যবহারবন্ধনী ডিঙ্গাইয়া, আত্মপ্রাণের আনন্দমত্ততায় উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া ফেলিলেন—

শুন রজকিনি রামি,
ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি।
তুমি বেদবাদিনী, হরের ঘরণী,
তুমি হও মাতৃপিতৃ,
ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমারি ভজন
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী॥

ইহা ত প্রেমের দেশ-কাল-পাত্র ধর্ম্মাতীত সাম্যপদবী, এবং স্বাধীনতার অসামাজিক আনন্দপদবী! এরূপ 'সাধনা'র অধ্যাত্মমূল্য

কি, তাহা কে বলিবে? তবে, কিম্বদন্তী—চণ্ডীদাসের যখন মৃত্যু হয়, তখন রামী গিয়া তাঁহার গায়ের উপর ঝাপাইয়া পড়ে; সে সঙ্গে তাহারও প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায় এবং উভয়কে একত্র সমাধি দেওয়া হয়। সে সমাধিস্থান একশ্রেণীর বৈষ্ণবের নিকট এখন তীর্থ রূপেই পরিণত! প্রেমের মীষ্টিকমাহাত্ম্যের এস্থলে একেবারে চূড়ান্ত। এরূপ একটা সম্প্রদায় এখনো এতদ্দেশে আছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়াই আছে। 'সহজ রসিক' চণ্ডীদাস নিজের বিশ্বাসের কথাটাও একটা কবিতায় রাখিয়া গিয়াছেন—

মরিয়া হইবি রজক ঝি
দুয়ে এক হয়ে নিত্যেতে যাবি।

প্রেম মাত্রে, বিশেষতঃ 'সহজ প্রেম' মাত্রেই 'রূপ'বাদী; উহা 'অরূপ'কে ইষ্টরূপে পাইতে চায়। সহজিয়ার আদর্শে ভগবান্ সহজ মানুষ—ভগবানের মনুষ্য মূর্ত্তি (মীষ্টিক সুইডেন্‌বার্গ যেরূপ মানুষমূর্ত্তি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, বলেন) চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

শোন রে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই!

সুতরাং, এ আদর্শে 'ঈশ্বরবাদি'গণও ভগবান্‌কে মানুষমূর্ত্তিতে খাড়া করিয়া 'সহজ রাগাত্মিক'পথে এবং প্রেমিকা রাধিকার প্রণালীতে উহার প্রতি প্রেমসাধনা করেন! গভীর রূপাভিনিবেশ, রূপ-ভাবুকতা ও রূপ-উন্মত্ততাই সুতরাং এ প্রণালীর প্রবল লক্ষণ দাঁড়াইতেছে। উহা বঙ্গসাহিত্যকে অনেক রূপোন্মাদনিষ্ঠ কবিতার উপঢৌকন দিয়াছে—

"তোমারে হিয়ার ভিতর হতে
কে কৈল বাহির"!

"দেখিবারে আখি পাখী ধায়"
"চলে নীল সাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিতে মোর।"

"প্রতি অঙ্গ তরে কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর"
"সে অঙ্গ পরশে আমার এ অঙ্গ সোণা॥"

আত্মবিস্মৃত গভীর রূপাভিনিবেশ ব্যতীত এরূপ কবিতার জন্ম হয় না। প্রাচীন 'সহজরসিক'গণের এই 'প্রেম' আদর্শ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 'ভক্তি' আদর্শকে পুরাপুরি স্পর্শ করিয়াছে। শ্রীচৈতন্ত স্বয়ং "চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি, কর্ণামৃত শ্রীগীত গোবিন্দ" প্রভৃতির "রাগাত্মিক ভক্তিসাধনা"র পথে, আপনাকে 'রাধিকার' ভাবে ভাবিত করিয়াই সংকীর্ত্তনে ও 'ভাব আস্বাদনে' তাঁহার 'প্রেম সাধনা' করিতেন। উহা, ফলতঃ, একনিষ্ঠ প্রেমোন্মাদ এবং রূপোন্মাদকেই পরম পুরুষার্থ রূপে বরণ এবং জীবনের জ্ঞান-কর্ম্মভাবে তাহারই সাধন। সাহিত্যিকের নেত্রে সুতরাং উহা একেবারে 'রোমান্টিক হইতেও রোমান্টিক' রীতির ভাবুকতা। মনুষ্যের যুক্তিতর্ক এবং বিচার ও সংশয়ের বুদ্ধিকে ইচ্ছাপূর্ব্বক ঘুম পাড়াইয়াই এ সাধন ব্যাপার চলিয়াছিল। "কোন তর্ক বিচার করিবে না"; "জ্ঞানকর্ম্ম ছাড়ি কর ভাব আস্বাদন" প্রভৃতি ইঁহাদেরই পরামর্শ। অন্য দিকে যাহাই হউক, উহা বঙ্গসাহিত্যের প্রাচীন ভাণ্ডারে একটা নিত্যানন্দমধুর মধুচক্র রাখিয়া গিয়াছে।

কবি রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবী রীতির প্রেম বা আনন্দের 'সাধক' কবি নহেন—স্বীকারতঃ প্রেমমীষ্টিক বা রূপমীষ্টিক নহেন। তথাপি, আশৈশব বৈষ্ণবকবিতার অন্তরঙ্গ পরিচয় হইতে তিনি, যেন অতর্কিতেই, প্রেমের এবং রূপের মহার্থ-নিষ্ঠ কবি। অতর্কিতে প্রেমতত্ত্বে গভীর অন্তর্যোগ গতিকেই যেন বৈষ্ণবী আন্তরিকতা, বৈষ্ণবের রূপতন্ত্রী ভাবুকতা ও ভাবদীপ্তি বহুস্থানে তাঁহার কবিতাবলীর মধ্যে ফুটিয়া

ফুটিয়া উঠিতেছে! যেমন, পরিপূর্ণ বিদ্যাপতি-পথিক এবং মীষ্টিক-তন্ত্রের প্রেম-পথিক এই নিম্নোক্ত কবিতা—ইহা একদিকে বঙ্গসাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ প্রেমকবিতা। কবি তাঁহার প্রিয়তমার দিকে দৃষ্টি করিতেই অকস্মাৎ নিজকে এবং প্রিয়াকেও যেন একটা অনন্ত এবং অমৃত তত্ত্ব বলিয়া চিনিয়া ফেলিয়াছেন—

"তোমারেই যেন ভাল বাসিয়াছি
শতরূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধরে' মুগ্ধ হৃদয়
গাঁথিয়াছে গীত হার,
কতরূপ ধরে' পরেছ গলায়
নিয়েছ সে উপহার,
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।

* * *

আজি সেই চিরদিবসের প্রেম
অবসান লভিয়াছে
রাশি রাশি হয়ে তোমার পায়ের কাছে।
নিখিলের সুখ নিখিলের দুখ
নিখিল প্রাণের প্রীতি
একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে
সকল প্রেমের স্মৃতি
সকল কালের সকল কবির গীতি!

সেরূপ, কবির সৌন্দর্য্য-অভিনিবেশের আর একটি কবিতা—যাহাতে তিনি প্রিয়ার রূপকে "কায়মনে অনুভব" করিতেছেন—রূপকে সন্ধ্যার সুগভীর অন্তঃস্পর্শময়ী দীপ্তি এবং অন্তরারাম শান্তি রূপেই অনুভব করিতেছেন। ইহাও রবীন্দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ঠ প্রেমকবিতা—

ওগো তুমি, অমনি সন্ধ্যার মত হও!
সুদূর পশ্চিমাচলে কনক আকাশ তলে
অমনি নিস্তব্ধ চেয়ে রও!
অমনি সুন্দর শান্ত, অমনি করুণ কান্ত
অমনি নীরব উদাসিনী
ওই মত ধীরে ধীরে আমার জীবন তীরে
বারেক দাঁড়াও একাকিনী।
এস তুমি চুপে চুপে শ্রান্তি রূপে, নিদ্রা রূপে,
এস তুমি নয়ন আনত,
এস তুমি ম্লান হেসে দিবাদগ্ধ আয়ুঃশেষে
মরণের আশ্বাসের মত ;
আমি শুধু চেয়ে থাকি অশ্রুহীন শ্রান্ত আঁখি,
পড়ে থাকি পৃথিবীর পরে,
খুলে দাও কেশ ভার ঘন স্নিগ্ধ অন্ধকার
মোরে ঢেকে দিক্ স্তরে স্তরে!

একসঙ্গে, একযোগে প্রিয়ার সৌন্দর্য্যকে, সন্ধ্যার হৃদয়কে এবং নিজের অন্তঃপ্রজ্ঞাকে ওতপ্রোত ভাবে অনুভব! 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবির আর একটি উৎকৃষ্ট প্রেম কবিতা—বৈষ্ণবী রীতির প্রেমকবিতা। উহাতেও 'রূপ'ই অন্তর্দীপ্তি ও অধ্যাত্মিক মহাপ্রাপ্তি রূপে দাঁড়াইয়া যাইতেছে। রূপযোগী কবি, যেন ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্ধ হইয়াই প্রিয়ার রূপকে অধ্যাত্ম দীপ্তিময় মহা-প্রতিষ্ঠা এবং নিত্যপ্রাপ্তিরূপেই আত্মজীবনে সুসিদ্ধ করিতে চাহিতেছেন! অপরান্ধ এবং বিশ্বান্ধ কবি প্রিয়ার রূপধ্যানে নিমগ্ন হইয়া বলিয়া ফেলিয়াছেন—

তোমাতে দেখিব আমার দেবতা,
হেরিব আমার হরি!
তোমারি আলোকে জাগিয়া রহিব
অনন্ত বিভাবরী!

রবিকবির হৃদয় উষার মর্ম্মবাহী আনন্দের তত্ত্বে অন্তর্যোগ লাভে একীভূত হইয়া 'খেয়া'র একটী উৎকৃষ্ট কবিতার জন্ম দান করিয়াছে। জীবের অগ্রবুদ্ধিতে আভাসিত জগৎস্রষ্টার 'সচ্চিদানন্দ' তত্ত্ব প্রকৃত প্রস্তাবে "অবাঙ্ মনসো গোচর" বস্তু নহে কি? তথাপি, উষার আনন্দধমণীর মধ্যেই উহার যেন 'স্পর্শ' আছে। কবি নিজের গুপ্তপ্রাণের সেই আনন্দযোগটী অনুপম ভাবে, ভাষা ও ছন্দোবন্ধের পথে আমাদের অনুভববর্ত্তী করিয়া দিয়াছেন—

আমি কেমন করিয়া কহিব, আমার
জুড়ালো হৃদয় জুড়ালো—আমার
জুড়ালো হৃদয় প্রভাতে!
আমি কেমন করিয়া জানাব, আমার
পরাণ কি নিধি কুড়ালো—ডুবিয়া
নিবিড় নীরব শোভাতে!
আজ গিয়েছি সবার মাঝারে, সেথায়
দেখেছি একেলা আলোকে—দেখেছি
আমার হৃদয় রাজারে।
আমি দুয়েকটি কথা কয়েছি তা সনে
সে নীরব সভামাঝারে—দেখেছি
চির জনমের রাজারে।

* * * * *

আজ ত্রিভুবন জোড়া কাহার বক্ষে
দেহ মন মোর ফুরালো—যেন রে
নিঃশেষে আজি ফুরালো!
আজ যেখানে যা হেরি সকলেরি মাঝে
জুড়ালো জীবন জুড়ালো—আমার
আদি ও অন্ত জুড়ালো।

সাহিত্যে সৌন্দর্য্যের এই তুরীয় বস্তু যে 'আনন্দ', উহা ত একটা ভাবাতীত ও মনুষ্যের ভাষামুষ্টির অতীত তত্ত্ব! সাম্নাসাম্নি ধরিবার সাধ্য নাই। সংস্কৃতেও উহার কোন 'প্রতিশব্দ' নাই; ইংরাজী Joy বা Ecstasy প্রভৃতি উহার মর্ম্মাংশ স্পর্শ করিতে পারে না। উহা ফলতঃ একটা অনির্ব্বচনীয় পদার্থ। 'আনন্দ'বাদী ঋষিগণের সঙ্কেত বাক্যগুলি পুনঃপুনঃ চিন্তাপূর্ব্বক উক্ত পদের 'অর্থ' গ্রহণে চেষ্টা করিতে হয়। কবিগণের মহিমা এই যে, তাঁহারা অপূর্ব্ব উপায়ে, ভাষা ও ছন্দের অপরূপ মিলন ঘটনায়, সুরে-তালে-ইঙ্গিতে অনুরণনে সেই অবচনীয় তত্ত্বকে আমাদের বুদ্ধিযোগবর্ত্তী ও অনুভববর্ত্তী করিতে পারেন। সে দিক হইতে এই "মিলন" কবিতা রবিকবির শতচেষ্টার মধ্যে একটা পরম সার্থক ও সফলতম চেষ্টা। কবি আপাততঃ কেবল প্রকাশের অক্ষমতার 'বয়ান' পথেই অনুপম ভাবে উহার 'প্রকাশ' সুসিদ্ধ করিয়াছেন। মধ্যস্থলে "আমি দুয়েকটি কথা কয়েছি", 'সভা' প্রভৃতি বেসুরা বুলি ও চিত্তের 'বিকল্পবুদ্ধি'র 'বেতালা কথা' থাকিলেও ইহা গভীর আনন্দ-অনুভূতির কবিতা। সমগ্র কবিতাটি পুনঃপুনঃ পাঠপূর্ব্বক অন্তর্ম্মর্ম্মে উহার রসাস্বাদ টুকু গ্রহণ করিতে পারিলেই কবির সাফল্য এবং তাহার ওজন বুঝা যাইবে। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত Mystic কবি নহেন; তথাপি "ওগো তুমি অমনি সন্ধ্যার মত হও" কবিতায় রূপসম্ভোগ ও রূপাভিনিবেশ তাঁহাকে মৌষ্টিক যোগতন্ত্রের সান্নিধ্যবর্ত্তী করিতেছে; সেরূপ, নিসর্গের আনন্দাভিনিবেশও তাঁহাকে, এই 'মিলন' কবিতায়, 'আনন্দ'যোগী মৌষ্টিকগণের সন্নিকটে লইয়া আসিয়াছে!

এ সূত্রে বুঝিতে হয়, (১) রবীন্দ্রনাথ স্বীকারতঃ 'অদ্বৈত'সাধক নহেন; অধ্যাত্মতন্ত্রের 'মৌষ্টিক' কবিও নহেন। তিনি শ্রুতির সাচ্চা অদ্বৈত প্রতিবাদক শ্লোকগুলিকেও ব্যাবহারিকের বা ভক্তের 'দ্বৈত' আদর্শেই

(১) এ সূত্রে গ্রন্থের ৪১—৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ব্যাখ্যা করিতে ভালবাসেন। তবে, তিনি পরিমিতের উপাসকও নহেন—অন্ততঃ যাহা চক্ষুরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পরিমিত কিংবা সাকার। 'রাজা'কাব্য এরূপ 'দৃশ্য আকার' উপাসকগণের বিরুদ্ধেই ত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে! বিশেষতঃ তিনি, প্রকৃত কবির ন্যায়, নিত্যনিয়ত সীমার মধ্যে অসীমকে, রূপের মধ্যে অরূপকে আপন ভাবে খুঁজিতেছেন বলিয়াই "ব্যক্তি-ঈশ্বর' (Personal God) উপাসকগণের কিংবা Deist গণের নেত্রে উহা Mystic বলিয়া ঠেকে; সময় সময় ইয়োরোপীয় 'সিম্বোলিষ্ট্'গণের 'গোপনিকা রীতি' অবলম্বনেও কাব্য-কবিতা-নাটক লিখিতেছেন বলিয়া সেগুলাও মীষ্টিক বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছে। ইয়োরোপীয় পাঠকগণের মধ্যেও বর্ত্তমান যুগের 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি' বা 'জড়বাদীর ধাৎ' টুকুই প্রবল বলিয়া, যাহা-কিছুর মর্ম্ম জড়বস্তুর ওজনে সোজাসুজি পরিমাপ করা যায় না তাহাকেই উহারা 'মীষ্টিক' বলিয়া নামকরণ করে। এ ভ্রান্তিবশেই রবিকবি, অনভিজ্ঞের দৃষ্টিতে, 'মীষ্টিক' দাঁড়াইয়া যাইতেছেন। বাস্তবিক, এ কবি মীষ্টিক নহেন; বলিতে গেলে, 'রোমাণ্টিক'। 'রাজা'র রীতিমধ্যে কিছু মীষ্টিক ভাব আছে; হফট্‌মানের Assumption of Hannele নাটিকার পরবর্ত্তিতা সূত্রে ধরিলে তাঁহার 'ডাকঘরে'র মধ্যেও কিঞ্চিৎ মীষ্টিসিজম আছে, বলিতে পারা যায়। কেননা, 'রাজা' যেমন অরূপের রাজা; তেমনি, অরূপের সঙ্গে ভাবুকতার আদানপ্রদান করিবার জন্যও রূপের 'ডাকঘর'। কিন্তু, 'মুক্তধারা' বা 'রক্তকরবী' প্রভৃতির মধ্যে 'অরূপ'এর কোন অজুহাতই নাই। উহারা পুরা দমে, 'নাটুকে রীতি' এবং রোমাণ্টকের 'গোপনী রীতি'তেই সমাজ রাষ্ট্র অথবা অর্থনীতি আমলের সন্দর্ভ। নিজে যাহা সত্য বলিয়া মনে করেন তাহার জন্য যুদ্ধ করা, সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রেও সমাজসংস্কারক ও ধর্ম্মসংস্কারকের বর্ম্মচর্ম্ম পরিয়া লোকালুকি করা রবিকবির একটী প্রবল ঝোঁক। তিনি মধুসূদনের মত নিরপেক্ষ, নির্ম্মল 'শিল্পী' আদর্শের কবি নহেন; তবে কবি একজন উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ লেখক; তিনি ত তিনটী 'গল্প' পৃষ্ঠাতেই

এসব গ্রন্থের উদ্দিষ্ট 'সত্য' কিংবা তাঁহার মনোগত অর্থটুকু সামাজিকের প্রতীতিসিদ্ধ করিতে পারিতেন—এই 'নাট্যকে রীতি' অপেক্ষা সার্থকতর ভাবেই পারিতেন! বর্ত্তমান 'সিম্বোলিক' আকার প্রকারে উহাদের মধ্যে প্রকৃত নাটকের রস কিংবা Interest একেবারে জমে নাই; কোন Human Interestই ত জমে নাই! কবির উদ্দিষ্ট 'রস'টুকুর পরিব্যক্তির সাহায্যকল্পেই নাটকের পাত্রগণকে ব্যক্তিচরিত্রের বিশিষ্টতায় অঙ্কিত করিতে হয়। নাট্যকবি স্বয়ং মুখর হইয়া আত্মপ্রকাশ করিতে এবং 'ব্যাখ্যানা' করিতে পারেন না বলিয়াই নাটকের প্রয়োগতন্ত্রে চরিত্রাঙ্কন (Characterisation) অপরিহার্য্য। নাটকীয় অবস্থা ও ঘটনার উপস্থাপনে এবং পাত্রগণের উক্তিপ্রত্যুক্তি ও ব্যক্তিগত চরিত্রবৈশিষ্ট্যের সমাধান পথেই নাট্যকবিকে পাঠকের সহানুভূতি অর্জ্জন করিতে এবং নিজের মর্ম্মটুকু ব্যক্ত করিতে হয়। পরের মুখেই নাটকের মর্ম্মরস এবং কবির স্বীয় অন্তরের 'মহাভাব' টুকু ফুটাইতে হয় বলিয়াই নাটকে এই Characterisation কোনমতে বাদ দেওয়া যায় না। এখন, 'রক্তকরবী' নাটিকার নন্দিনী, রঞ্জন প্রভৃতি একটীও ত স্বাভাবিক 'মানুষ' নহে—কবির এক একটা ভাবের অস্পষ্ট 'রূপক' মাত্র। সুতরাং উহাদের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের ভাবগত কোন সহানুভূতি দাঁড়াইতে পারিতেছে না। উহা Epic, Lyric বা Dramatic কোন 'আকৃতি'রীতির শিল্পরূপেই দাঁড়ায় নাই। কেবল 'হেঁয়ালি'-গোছের একটা উপস্থাপনার পথে পাঠকের চিত্তদুর্গ আক্রমণ! উহার 'ধাৎ' সুতরাং Intellectual; অস্পষ্ট এবং 'এলোপাথারি' ভাবে ইশারা লাভকেই একটা 'সাহিত্যরস' বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারিলেই তুমি গেলে! পুতুলের ন্যায় এক একটা 'পাত্র' আমাদের চোখের সমক্ষে নাচিয়াকুঁদিয়া, কবির প্রযুক্ত বাক্য উদ্গার করিয়া যাইতেছে! উহাদের মধ্যে মনুষ্যের বিশিষ্টতাজ্ঞাপক কোনরূপ প্রকৃতি কিংবা 'চারিত্র পরিস্ফুট করিতে কবির কোন চেষ্টা একেবারে নাই। কেবল, উহারা

যাহা বক্তৃতা করে, তাহার অর্থ কি, কবির মর্ম্ম কি, এরূপ একটা বুদ্ধিতন্ত্রীয় (Intellectual) কুতূহলই আমাদের চিত্তে কার্য্য করিতে থাকে; অথচ, গোলেমালে এবং ভিড়ের মধ্যে সে "অর্থ"টুকুও কুত্রাপি পরিষ্কৃত এবং পরিচ্ছিন্ন হইয়া উঠে না। এরূপে নাটকের Intellectual প্রতিপাদ্যটাই ঘোলাইয়া গিয়া গ্রন্থটীর 'সন্দর্ভ' আদর্শকেও খাটো করিতে থাকে বহুকষ্টে কবির 'বক্তব্য' উদ্ধার করিতে পারিলে, উহা 'পাঠকের অর্থ', না 'কবির অর্থ' তাহা নিরূপণ করাও আবার এক সমস্যা। এক পণ্ডিত সমালোচক নিজে রক্তকরবীর একটা 'অর্থ চেষ্টা' করিয়া বলিয়াছেন, উহার নাকি আরও এক ডজন 'অর্থ' সম্ভবপর! আবার, এই অর্থসমস্যা পূরণ করিতে পারিলেও পাঠক হয়ত দেখিবে, এত পরিশ্রমেও ভাবুকতা কিংবা তত্ত্বের ক্ষেত্রে সবিশেষ কোন দুর্লভ প্রাপ্তিই ত ঘটে নাই। সমস্তই 'জানা' কথা, না হয় নিতান্তই বিরস কথা। হেঁয়ালীরীতির, বিশেষতঃ মেতর্লিঙ্গী Symbolic রীতির অনুসরণ এবং বিষয়ভূমির নির্ব্বাচন গতিকেই যে অদ্বিতীয় বাক্যশিল্পী রবিকবির বাক্যপ্রয়োগ এরূপে নিরর্থক এবং নীরস হইয়া পড়িতেছে—অর্থের 'অনির্ব্বচনীয়তা' হইতে বা উহার অধ্যাত্ম গভীরতার গতিকে নহে,—তাহাই সাহিত্যের সত্যানুসন্ধানী পাঠককে বুঝিয়া লইতে হয়। রক্তকরবীর ভাবগত 'আত্মা'টুকু বুঝিতে হইলে, উহা প্রাধান্যতঃ একটা 'প্রদূষক' শিল্প। সোণার তাল, বনাম, রক্তকরবী; Materialism, বনাম, Romanticism! ইয়োরোপ-আমেরিকার জড়বাদের বিরুদ্ধে কবির একটা ভাববাদ; আকৃতিহীন ও মেরুদণ্ডবিহীন ভাবুকতার এই রোমান্টিক ছায়ানাট্য! প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা উহাতে কিছু মাত্র নাই। 'ফাল্গুনি'র প্রবেশিকারূপে উপন্যস্ত মনোমদ কবিতাগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এই রোমান্টিকতার পরিপূর্ণ পরিচয়। রক্তকরবী যে Romanticism এরই Symbol, মেতরলিঙ্কের 'নীল পাখী'ই যে কায়া বদলাইয়াছে, জর্ম্মণ রোমান্টিকতার 'নীল ফুল'টাই যে 'রক্ত' হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাই বুঝিতে হয়। এখন, ভাষার ক্ষেত্রে

কাব্যশিল্পের দাবী কি? যেই ভাবটুকুন গদ্যের মুষ্টিসাধ্য নহে, তাহার জন্যই ত পদ্য! এবং যাহা বাক্যের সাক্ষাৎশক্তিতে 'অনির্ব্বচনীয়' তাহার জন্যই ত 'সঙ্কেত'! মনুষ্যের ভাষাব্যাপারে কাব্যশিল্পের পক্ষে এ স্থলেই দাঁড়াইবার অথবা বাঁচিবার দাবী। এ গ্রন্থে এমন কোন 'ভাব' নাই, যাহা কবি সন্দর্ভের প্রণালীতে ইহাপেক্ষা সুন্দর ভাবে বলিতে পারিতেন না, যাহার জন্য মীষ্টিসিজম্ বা সিম্বোলিজমের কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল। বলিতে কি, 'অধ্যাত্ম'বাদ ব্যতীত অপর কোন বাক্যশিল্পের পক্ষে ব্যাপকভাবে অস্পষ্ট কিংবা Symbolic হইবার দাবীই নাই। অনির্ব্বচনীয় ভাব কিংবা বিষয়াতীত আলম্বন ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে অস্পষ্ট হইতে গেলেই শিল্পের সাধুতা বিষয়ে সন্দেহ জন্মিতে থাকে। এই কথা কয়টীর মধ্যে আধুনিক যুগের 'সিম্বোলিক্' শিল্পের শক্তি এবং দাবী বিচারের প্রধান 'মাপ-কাঠি'টুকুই উপস্থিত করিতেছি। রবীন্দ্রনাথ স্বকীয় কবিত্বপ্রতিভার প্রকৃত সুবর্ণ যুগ, মোটামোটি বলিতে গেলে, পঞ্চাশের সঙ্গেই পার হইয়াছেন। হৃদয়ের ভাব যখন, প্রকাশিত হইতেই, আকৃতি-ঘনীভূত মূর্ত্তিতে এবং সুর-তাল-ছন্দের ওতপ্রোত স্ফূর্ত্তিতে 'প্রকাশ' লাভ করিতে থাকে, (যেমন পতিতা ও চিত্রাঙ্গদায়) তখনই কবিপ্রতিভার সুবর্ণযুগ। মানসী, সোনার তরী, চিত্রাঙ্গদা, চিত্রা, কথা, কাহিনী, নাট্য কথা, ক্ষণিকা এবং খেয়ার মধ্যে জগতের শ্রেষ্ঠশ্রেণীর একজন গীতিকবির পূর্ণযৌবনা প্রতিভার সৃষ্টিবিলাসের পরিচয় পাই। ভাব যখন প্রকটিত হইতে গেলেই অনুরূপ আকৃতি-প্রকৃতি ও চারিত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক রসের প্রমূর্ত্তিভূয়িষ্ঠ পরিব্যক্তিস্বরূপেই বাহির হইয়া আসে, তখনই কবিপ্রতিভার পূর্ণ যৌবন—কবির প্রকৃত সৃষ্টিশক্তির যুগ। উহার পর, অধ্যাত্মতঃ কবির পরিকল্পনী ও পরিমূর্ত্তনীশক্তির ক্ষয়—Decadence—কবিত্বের রসধাতুর ক্ষয়। দ্বিতীয় ভাগ 'ফাউষ্ট' কাব্যে প্রৌঢ় কবি গ্যাঠের মধ্যেও এরূপ রসিকতার ক্ষয় এবং দুর্ব্বোধ্য সিম্বোলিজম সাহায্যে

উহাকে ঢাকা দিবার এবং জবরদস্ত হইবার প্রয়াস লক্ষ্য করিব। হেঁয়ালিবদ্ধ ভাবুকতা বা দার্শনিকতা যে কবিত্ব নহে, তাহা ব্রাউনীংও বুঝিতে চাহেন নাই। কিন্তু, প্রৌঢ় বয়ঃক্রমে আসিয়াও নিজের জন্মসিদ্ধ ভাবুকতা পথে, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি প্রভৃতির দার্শনিকা ও গীতিকারীতি অনুসরণে রবিকবির হৃদয় যেই বৈশিষ্ট্যময় সঙ্গীতকবিতা চয়ন করিতেছে, তাহাই অন্যদিকে তাঁহার অসাধারণ সিদ্ধি। তবে সাহিত্য-রসিককে জানিতে হইবে, উহাদের মধ্যে সৃষ্টিরঙ্গিণী কল্পনাশক্তি অপেক্ষা বরং দর্শনরঙ্গী অভিনিবেশের অনুপাতই অধিক। আজন্ম সঙ্গীতসাধক ও তৃতীয়-উপাসক রবীন্দ্রনাথ এরূপ 'সঙ্গীত কবিতা'র মধ্যেই নিজের প্রৌঢ়বয়সের "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশ" সাহিত্যজগৎকে দিয়া যাইতেছেন। বিশেষভাবে ইহুদীয় গীতসংহিতা ও পারস্যের সূফী কবিগণ এবং ভারতের নানক, কবির, দাদু ও বৈষ্ণবকবিগণের সহপথিক এ সকল সংগীতকবিতা ও সঙ্গীত। ব্রহ্মপন্থীর সাংপ্রদায়িক বুদ্ধি অথবা খ্রীষ্টানের 'সারমণী'রীতি এবং 'উপাসনা'পদ্ধতির বেড়া ছাড়াইয়া উঠিয়া বিনির্ম্মল 'তৃতীয়'রসিক এবং 'আনন্দ'রসিক এরূপ পঞ্চাশৎ কবিতাই রবিকবিকে আপন বিশেষত্বে অনুপম ও অমর করিতেছে।

৫৮। এ সূত্রে ভারতীয় ও বিদেশী মীষ্টিকের সাধর্ম্ম্য।

বৈষ্ণবের ওই 'অখিলরসামৃতমূর্ত্তি' যে প্লাটোর সিম্পোসিয়ম্ ও ফিড্রসের Heavenly Beautyর অনুরূপ তাহা প্রথম দর্শনেই প্রতিভাত। উহাদের মধ্যে গ্রীক দার্শনিক বলিতে চাহিয়াছেন যে, পার্থিব সৌন্দর্য্যমাত্রেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যস্বরূপের ছায়া বলিয়া এবং সেই নিদানসৌন্দর্য্যের অংশভাক্ বলিয়াই আমাদের প্রেম উদ্দীপ্ত করে; জাগতিক সৌন্দর্য্য-প্রেমই চরমসৌন্দর্য্যে আরোহণের সিঁড়ি। সৌন্দর্য্যের জন্য জীবহৃদয়ের ওই যে ক্ষুধা, উহা সুতরাং অতর্কিতে সেই পরম সৌন্দর্য্যের জন্যই ক্ষুধা। এই 'সৌন্দর্য্য ক্ষুধা' ধরিয়াই আমরা দৈহিক সৌন্দর্য্য হইতে মানসিকে এবং মানসিক হইতে অধ্যাত্মসৌন্দর্য্যে প্রয়াণ করিতে পারি; উহা ধরিয়াই অনন্তসুন্দরের পদে উত্তীর্ণ হইতে

পারি। প্লাটোর এই 'বার্ত্তা' ইয়োরোপীয় সাহিত্যের 'সৌন্দর্য্যবাদী' গণের আদিম 'বেদ' রূপে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। স্পেন্সার, কীট্স্ ও শেলী প্রভৃতি প্লাটো-নির্দ্দিষ্ট সৌন্দর্য্যতন্ত্র পথেই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ কাব্যফসল চয়ন করিয়াছেন। কিন্তু ইয়োরোপের সর্ব্বপ্রকার মীষ্টিকের প্রধান গুরু ও প্রকৃত 'জনক' হইতেছেন প্লোটিনস্। তিনিই প্রকৃত দার্শনিকের ন্যায় এবং গুরুর ন্যায় মানুষকে অনন্তযাত্রার ভাব-পথ পরিষ্কৃত ভাবে দেখাইয়াছেন। প্লোটিনসের ঈণীয়াড (Ennead) এই 'পথের খবর' বিষয়ে জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক গ্রন্থসমূহের অন্যতম।

ইয়োরোপের 'মীষ্টিক' সাধকগণের যে কয়েকটি 'প্রয়াণ'পথের কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি সে সমস্ত সর্ব্বপ্রথম ঈনীয়াডের মধ্যেই ধারাবাহিক ভাবে নির্দ্দেশিত আছে। প্লোটিনস সেকালেই (২০৪-২৭০ খৃঃ অঃ) দেখাইয়া গিয়াছেন, কিরূপে পঞ্চ পথে জীব অসীমে প্রয়াণ করিতে বা Apprehension of the Infinite লাভ করিতে পারে। Love, Beauty, Nature Wisdom Devotion,—প্রয়াণের এই পঞ্চ পন্থা। খৃষ্টান মীষ্টিকগণকেও প্লোটিনসের শিষ্য বলিলে অসত্য কথা হইবে না এবং ঈনীয়দের পাঠ শেষ পূর্ব্বক, উহার প্রণালী এবং সিদ্ধান্ত বিচারে অবহিত হইতে পারিলে স্বয়ং প্লোটিনসকে বৈদান্তিক ঋষিগণের শিষ্য বলিতেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি মনে হইবে না। প্রাচীন আলেকজান্ড্রিয়া নগরবাসী এই প্লোটিনস ভারতীয় অধ্যাত্মবাদী মীষ্টিকগণের শিক্ষা দীক্ষা লাভে, তাঁহাদেরই 'যোগ' মার্গ অনুসরণে যে আপ্তকাম হইয়াছিলেন, তাহাতেও কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিবে না। (১) প্লোটিনসের

(১) প্লোটিনসের জীবনী লেখক পোরিফিরি বলিয়াছেন—তিনি ছয় বৎসরের মধ্যে প্লোটিনসকে চারিবার Union with the One লাভ করিতে দেখিয়াছেন। প্লোটিনসের কয়েকটি উক্তি—The first step of the Soul is to Know herself and so to know God; when the soul attains to this state the one suddenly

পর, ইয়োরোপের মীষ্টিকগণের গুরু—খ্রীষ্টান ইয়োরোপে 'প্রেম'তত্ত্বের প্রধান পুরোহিত—সুইডেন বার্গ। তাঁহার Conjugial Love, Heaven and Hell ও Wisdom of the Angels প্রভৃতি গ্রন্থের প্রধান তত্ত্ব বার্ত্তা—জীবের 'প্রেমই মহাশক্তি'। প্রেমই নাকি জীবপ্রকৃতির সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্রা এবং পাবনী বৃত্তি, অমৃতময়ী ও অমরত্ববিধায়িনী শক্তি এবং উহাই ইহলোক হইতে পরলোকে জীবের সঙ্গে যায়। সুতরাং সুইডেনবার্গের দৃষ্টিতে, জীবের এই 'প্রেম' আমাদের 'ধর্ম্ম' হইতে অভিন্ন—যাহাতে "ধর্ম্ম স্তমনুগচ্ছতি"। প্রেমভাব, প্রেমের চিন্তা, প্রেমের ক্রিয়া—ইহাতেই জীবের অমৃতত্ব; উহাই তাহার তারক ও রক্ষক তত্ত্ব। জীবের অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে আসিয়া প্রেমই সুতরাং তাহার 'ধর্ম্ম' এবং ধর্ম্মের নামই ফলতঃ "কর্ম্ম"—শ্রুতি তাঁহার 'সত্যজ্ঞান-আনন্দ'তত্ত্বের দিক হইতে যেই ভাব'গত 'ধর্ম্ম' বা 'কর্ম্ম'কেই 'জ্ঞান'রূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন। তবে, সুইডেনবার্গের সঙ্গে জগতের অপর মীষ্টিকগণের সবিশেষ পার্থক্য এই যে, তিনি বলেন, ভগবান্ মনুষ্যমূর্ত্তি। অধ্যাত্মপথিকগণের সমক্ষে, ঊর্দ্ধলোকচারী জীবাত্মাগণের নেত্রে ভগবানের এই 'মূর্ত্তি' নাকি জীবতত্ত্বের বহির্ভূতভাবে, পরম প্রভাভাস্বর সূর্য্যের মতই অন্তরাকাশে নিত্যপ্রদীপ্ত আছে; প্রেমই জগৎসবিতার প্রভা এবং উক্ত প্রভাই মর্ত্ত্যলোকে নামিয়া তাপরূপে এবং জীবজীবনের প্রাণশক্তিরূপে প্রকটিত; ভগবানের 'প্রেম' এবং 'জ্ঞান'ই মর্ত্ত্যজগতে তাপ ও আলোকরূপে প্রকট হইতেছে। সুতরাং ভগবান্ ত দেশে এবং কালে পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তিধারী একটি 'ব্যক্তি' বিশেষ! মীষ্টিক্ যে ঈশ্বরের এরূপ পরিমিত মূর্ত্তি নির্দ্দেশে তনয়েশ্বরের

appears with nothing between and they are no more two, but one". "A soul that knows itself must know that the proper direction of its energy is not outwords in a straight line, but round a centre which is within itself". "God is not in a certain place but wherein anything is able to come into contact with Him, there he is present". এসমস্ত বেদান্তশিক্ষের কথা নহে কি?

(God the Son) কথাই বলিতেছেন, বৈদিকঋষির 'সগুন ব্রহ্ম,' 'ঈশ্বর' বা সৃষ্টিকর্ত্তা Manifested God এর কথাই বলিতেছেন, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। ঈদৃশ সাকারবাদের জন্য ব্লেক সুইডেনবার্গকে নিন্দা করিতে, এবং গভীর বিরক্তি প্রকাশ করিতেও ছাড়েন নাই। আমাদিগকে বুঝিতে হয়, এ দিকে বরং পূর্ব্বোক্ত 'রূপ'বাদী গৌড়ীয় মীষ্টিকগণের সঙ্গেই সুইডেনবার্গের সাদৃশ্য—গৌড়ীয়বৈষ্ণবের 'প্রেম'মূর্ত্তিই প্রকৃত প্রস্তাবে সুইডেনবার্গের 'ঈশ্বর'। অধ্যাত্মপথিক ও 'দ্রষ্টা'গণের নেত্রে প্রেমের বর্ণই নাকি গভীর নীল—যে জন্য গৌড়ীয়গণের নিকট ভগবান্

"সুনীলনীরদ বপুঃ, গোপাল মুরলিধর"

উহা নাকি প্রেমেরই ঘনপরিব্যক্ত মূর্ত্তি! অন্ততঃ এই মূর্ত্তিমত্তা ও প্রেমের স্বরূপশক্তি বিষয়ে এবং জীবতত্ত্বের বহির্ভূত এই ঈশ্বর'ব্যক্তি'র বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সঙ্গে খ্রীষ্টান সুইডেনবার্গের সাদৃশ্যটুকু প্রথম দৃষ্টিতেই প্রতিভাত যাইতেছে। উভয় মতে প্রেমই ইহাপর জগতের নিত্য বস্তু; জীবের মধ্যে এই যে সহজাত প্রেমভাব, উহা সুতরাং অধ্যাত্মজগতের নিত্যসত্য প্রেমস্বরূপের ছায়াবহ! ইহজগতের সকল পদার্থই যে অধ্যাত্মক্ষেত্রীয় সত্যজগতের ছায়া—সুইডেনবার্গের 'ঐক্যবিজ্ঞান' (Science of Correspondences) এরূপ একটা আদর্শের উপরেই নির্ভর করিতেছে। সুতরাং এই 'প্রেম' আদর্শের সঙ্গে 'অবতার'বাদ যোগ করিলে—মানুষের অনুগ্রহার্থে ঈশ্বরের মনুষ্যমূর্ত্তিতে এবং মনুষ্যভাবে অবতরণের আদর্শ টুকু সমন্বিত করিলে—ভারতীয় বৈষ্ণবের 'প্রেমপুরুষ' ও 'অবতার'পুরুষ ইয়োরোপীয় প্রেমমীষ্টিকগণের হস্তে দার্শনিক ক্ষেত্রে পুরাপুরি সমর্থনা লাভ করিতেছে বলিয়াই ধারণা হইতে থাকে।

যাহোক, এই প্লাটো, প্লোটিনস ও সুইডেনবার্গের প্রভাব, কেবল ইংরাজী সাহিত্যের কেন, সমগ্র ইয়োরোপীয় সাহিত্যের প্রেমমীষ্টিক ও সৌন্দর্য্যমীষ্টিক কবিগণের উপরেই সুপরিস্ফুট। জর্ম্মণীর মীষ্টিক

দার্শনিক জেকব্ বোমের নামও এ সূত্রে উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না। এদিকে ইংরেজী সাহিত্যের কোলরীজ, এমার্সন, কার্লাইল, ব্রাউনীং, বার্ক, শেলী, ওয়ার্ডসোয়ার্থ, ব্লেক, এমিলীব্রন্টি, রসেটি, কীট্‌স্, কভেন্ট্রি প্যাট্‌মোর—বিশেষতঃ কবেন্ট্রি প্যাট্‌মোর! প্যাট্‌মোরকে যুগলতত্ত্বের কবি বলিলে অত্যুক্তি হয় না এবং এই দিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সংপ্রদায়বিশেষের সঙ্গে—"সহজ রসিক" সংপ্রদায়ের সঙ্গে—তাঁহার সৌসাদৃশ্য চিন্তা করিলেও আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া থাকা যায় না।

ইংরেজী সাহিত্যেও এককালে, 'কাম' এবং প্রেমকে ন্যূনাধিক সজাতীয় ভাবে দেখিয়াই, কবিগণের মধ্যে বিপুল কবিত্ব ব্যবসিত হইয়াছে। ডনী, হার্ব্বার্ট্, ক্রাশো, বোগান্, মার্ভেল, কাওলি উইদার্, ট্রাহারন্ প্রভৃতি কবিসংঘের মধ্যে ন্যূনাধিক শতবর্ষব্যাপী এই চেষ্টা। উহাদিগকেই জনসন্, একরূপ ভ্রমবশে, Metaphysical School of Poetry বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এসকল কবির প্রকৃত উদ্দেশ্য ও প্রণালী যাহা ছিল তাহা এক সমালোচক বলিয়া গিয়াছেন—উহা ছিল "Psychological explanation of the Passions"; অন্যকথায় "Application of the psychological method to the Passions". আমাদের দৃষ্টিতে, তাঁহাদের কাব্যকে বরং বলিতে পারা যায়-Intellectual poetry—সেই 'বোধায়নী' কবিতা। প্রকৃত আধ্যাত্মিক গভীরতা ইঁহাদের হস্তে—একমাত্র Donne ব্যতীত ইঁহাদের অন্য কাহারও হস্তে—সাহিত্যশিল্পের রীতিতে প্রকাশ লাভ করে নাই। স্বয়ং ডনীও এদিকে, প্রকৃত শিল্পঋদ্ধি বা কাব্যসিদ্ধির বিষয়ে ইংরেজী সাহিত্যের শেলী-ওয়ার্ডসোয়ার্থ প্রভৃতি প্রথমশ্রেণীর কবিগণের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। তাঁহারা কাব্যে প্রেমতত্ত্বের ব্যাখ্যায় অনেক বুদ্ধিব্যয় ও টানাহেঁচড়া করিয়াছেন; বিশেষতঃ, জীবহৃদয়ের প্রেমতত্ত্বের দিক হইতে তাঁহারা খ্রীষ্টানীর 'ভক্তি' বা ধার্ম্মিকতা (Piety) আদর্শকে পরম সামঞ্জস্যে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। এদিকে বরং তাঁহারা 'ভক্ত কবি'—

Religious Poets. মীষ্টিক কবির অধ্যাত্মতা ও 'এক'বুদ্ধি এবং সর্ব্বত্র একত্ব দর্শন তাঁহাদের নাই; তবে, তাঁহাদের হস্তে 'কাম', 'প্রেম' এবং 'ভক্তি' ফলতঃ একার্থক ব্যাপার রূপেই অনেক সময় প্রতীয়মান। প্রেমের কথা বলিতে গিয়া এ দলের কোন কবিই যখন বলেন—

> Love, thou art absolute Sole Lord
> of Life and Death.

তখন স্থির করা দুষ্কর হয় যে, উহা দেহধারী জীবের সহজাত 'বাসনা'র 'বৃত্তি', না ভগবানের প্রতি তাহার পরা ভক্তি! প্রেমকে লক্ষ্য করিয়া উঁহাদের একজনই গাহিয়াছেন—

> That endless height, which is
> Zenith to us and our Antipodes!

ইহা ত সাচ্চা বৈষ্ণবী রীতির উক্তি! যেমন ভগবানের মধ্যে, তেমন প্রেমের মধ্যে, এমন কি, ঐকান্তিকী হিংসার মধ্যেও যে সুমেরু-কুমেরু এবং Zenith ও Antipodes এক হইয়া যায়, উহা একটী বৈষ্ণবী বার্ত্তা। রবার্ট ব্রাউনীং তাঁহার Statue and the Bust কবিতায় এ ধরণের (এবং আপাতদৃষ্টিতে বিসদৃশ) একটী তত্ত্বের উপোদ্‌ঘাত করেন; উহাতে কবিকে যেন ব্যভিচারের সমর্থক বলিয়াই অনেকে স্থির করিয়াছেন। কিন্তু, কবি বলিতে চাহেন যে, প্রাণের তেজস্বিতাই মনুষ্যজীবনের বড় জিনিষ; যে পথেই হউক, ঐকান্তিকী তেজস্বিতার মধ্যেই 'ধর্ম্মবল' ও ধর্ম্মগতির মূল; নিস্তেজ, নির্জ্জীব ব্যক্তির কোন আশা নাই, সে জীবনপথের পতিত—সে তমঃপ্রধান জড়তা ও আলস্যের নিরয়নিবাসী। এ কথায় বৈষ্ণব সায় দিতে পারেন—যে বৈষ্ণব "হরি কর্ত্তৃক নিহত" প্রচণ্ডধর্ম্মা দৈত্যগণকেও স্বতন্ত্র স্বর্গে স্থান দিয়াছেন, রাবণ-হিরণ্যকশিপু এবং কংস প্রভৃতির একনিষ্ঠ এবং অটল ভগবদ্বিদ্বেষ ও ফলাকাঙ্খাবিহীন হিংসাকেও অধ্যাত্ম ওজনে প্রেমের সমকক্ষ এবং সমানমূল্য বস্তু বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন! বৈষ্ণব বলিবেন, বাল্মীকির মধ্যে 'রত্নাকর' হওয়ার প্রাণ এবং ওজঃটুকুন ছিল

বলিয়া, তিনি নিজের অনন্তচিত্ত তেজস্বিতার পথেই একদিন জীবনে 'ফিরিয়া দাঁড়াইতে' এবং ভারতের হৃদয়রাজা 'মহাকবি বাল্মীকি' হইতে পারিয়াছিলেন।

ইংরেজী সাহিত্যে যে সকল কবি 'প্রেম' লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তন্মধ্যে কভেন্ট্রি প্যাট্‌মোরকেই সর্ব্বাপেক্ষা গভীরগাহী বলিয়া ধারণা হইতে থাকে। জীবের যৌনপ্রেমের মধ্যেই যে একটা মহাশক্তির বীজ আছে, 'অনন্ত'যাত্রার পুঁজি আছে, দাম্পত্যপ্রেমের মধ্য দিয়াই যে আধ্যাত্মিক মহাপ্রাপ্তির গুপ্ত পন্থা আছে, তাহা প্রকাশ করাই যেন প্যাট্‌মোর কবির সকল কাব্যচেষ্টার প্রধান লক্ষ্য ছিল। কবি তাঁহার Angel in the Houso, Sponsa Deii প্রভৃতিতে শান্তশীল দাম্পত্য প্রেমকেই 'পরম পথ'রূপে লক্ষ্য করিয়াছিলেন—যদিও পরিপূর্ণ ভাবে নিজের বক্তব্যকে পরিমূর্ত্ত কিংবা হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিতে পারেন নাই। কবি একটি মধ্যবিত্ত ইংরেজদম্পতি এবং উহাদের ঘটনামাহাত্ম্যহীন ও বৈচিত্র্যবিহীন জীবনের ব্যাপারকেই কাব্যের 'আলম্বন' রূপে গ্রহণ করেন, মাটীঘেঁশা বিষয়টুকুর গতিকেই তাঁহার কাব্যের রসাত্মা নিস্তেজ এবং মেঠো হইয়া গিয়াছে। পারিবারিক প্রেমের মধ্যে বাহিরের কোন প্রকার অভিঘাত নাই বলিয়া, কোন Repression নাই বলিয়া, উহা সহজে এবং অতর্কিতেই কাব্যের রসপরিব্যক্তির ক্ষেত্রে নির্জীব হইয়া পড়িতে পারে। প্রতিপক্ষতার কোন উৎপাত কিংবা বহির্জগতের কোন আক্রমণ দাম্পত্য প্রেমে নাই; মান-অভিমান-সংশয়-বিদ্রোহ কিংবা বিরহের তেজস্করী কোন স্ফূর্ত্তি কিংবা বীর্য্যাবদান-বিপুল কোন পরিপন্থিতা উহাতে নাই; অতএব, প্রেম সে ক্ষেত্রে নিজের সকল দানমাহাত্ম্য ও ত্যাগপরাক্রম প্রদর্শনের ভূমি পায় না বলিয়া, নিজের পাখা খুলিতেই পারে না বলিয়া উহার তেজস্বিতা সহজেই 'ঢিলা' হইয়া পড়িতে পারে। বৈষ্ণবকবি অপিচ শিল্পশক্তিশালী কবিমাত্রেই পরকীয় (অ-স্বকীয়) প্রেমকে এবং মিলনপথে বাধাবিঘ্ন-সঙ্কুল প্রণয় ব্যাপারকেই কাব্যের রসসাধনার ক্ষেত্রে কেন এত প্রাধান্য

দিয়া থাকেন, তাহার অদ্ভুতত্বটুকু এ স্থলেই হয়ত লুকাইয়া আছে। 'আলম্বন'বস্তুর নির্জীবতার গতিকেই যে প্যাট্‌মোর কবির কাব্যসিদ্ধি ন্যূনাধিক নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে; সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রকার জীবন্মৃত ভাব ও কাহিল ভাবের এস্থলেই যে একটা প্রধান হেতু তাহাও এ সূত্রে বুঝিতে হয়।

প্যাটমোর 'যুগল'ভাবের পূজারী। বৈষ্ণব মীষ্টিকের ন্যায় তিনিও বিশ্বাস করিতেন যে, আধিভৌতিক পদার্থমাত্রের কিংবা আধ্যাত্মিক 'ভাব'মাত্রের প্রধান 'রহস্য'টাই যুগল হত্বে; প্রকৃতির সকল বস্তুই দ্বিদলসৃষ্টি—স্ত্রীপুরুষ তত্ত্বের সম্মিলিত রচনা; পদার্থমাত্রে দুটি-দুটি ভাগে বিভক্ত হইয়াই সংযুক্ত; এরূপে দুটি-দুটি জোড়া দিয়াই সৃষ্টি—বুকে-বুকে জোড়াইয়াই অখিলের সকল বিবর্ত্ত এবং বিকাশের ব্যাপার—

Nature with endless being rife
Parts each thing into him and her
And in the Arithmetic of life
The Smallest unit is a Pair.

'যুগল তত্ত্ব'ই জীবজীবনের ভূমিতে আসিয়া 'Sex' রূপে প্রকটিত হইয়াছে। প্যাটমোর নাকি তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর নিকট হইতে এই যুগলভাবের এবং একনিষ্ঠ প্রেমের শক্তিশিক্ষা লাভ করেন। অতএব, রামী যেমন চণ্ডীদাসের এবং পদ্মাবতী যেমন জয়দেবের 'গুরু' দাঁড়াইয়া ছিলেন বলিয়া কিম্বদন্তী আছে, তাঁহার পত্নীই যেন ছিলেন প্যাট্‌মোর কবির প্রেমশিক্ষার 'গুরু'। এরূপ 'প্রেমের পথ'ই নাকি মনুষ্যের পক্ষে পরমার্থ লাভের অতুলনীয় পথ; ভগবানকেও এরূপ 'যুগল'ভাবের প্রেমেই সহজতন্ত্রীয় আরাধনা—'উজ্জ্বলরসা' ভক্তিতেই ভগবৎ সাধনা। প্যাট্‌মোর বলেন—

"The relationship of soul to Christ as his bethrothed wife is the Key to the feeling with which Prayer and love and honour Should be offered to him"

ইহা যে নিছক গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কথা, তাহাতে সংশয় আছে কি? ভাবের মার্গই যে অসীমে প্রয়াণের শ্রেষ্ঠ পথ, মনুষ্যের জ্ঞানবুদ্ধিতন্ত্র (Reason) বা তর্কযুক্তির যন্ত্র যে ভগবৎসাধনার ক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল এবং পঙ্গু পদার্থ, ইহা ভক্তিপন্থী বৈষ্ণবের সিদ্ধান্ত। জীবের একনিষ্ঠ এবং অনন্যচিত্ত 'মহাভাব'টুকুই কেবল 'দর্পণ'রূপে ভগবৎমাধুরীর 'প্রতিবিম্ব' গ্রহণ করিতে পারে; এজন্যই হয়ত এক বিলাতী মীষ্টিক বলিয়াছিলেন—"It is the heart and never the reason that leads us to the Absolute". আবার, ভগবানকে কোন্ 'ভাব'টীর পথে সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকর ভাবে (Effectual) ও সোজাসুজি ভাবে 'সাধনা' করা যায়? গৌড়ীয় বৈষ্ণব এ প্রশ্নের উত্তর দিবেন—'কান্তা'র ভাবে। সাধক নিজকে স্ত্রীভাবে ভাবিত করিয়াই সর্ব্বপ্রাণে ভগবৎচরণে আত্মসমর্পণ করিবেন। গৌড়ীয় 'বৈষ্ণবের' প্রেমগুরু শ্রীচৈতন্য তাহাই ত কথায় এবং কার্য্যে দেখাইয়া গিয়াছেন! ঈদৃশ 'উজ্জ্বলভাব'-সাধকের সমক্ষে ভগবান্ই একমাত্র পুরুষ—জীবমাত্রেই স্ত্রী।

যাহোক, উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী সভ্যতা এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে, প্রেমের এই Symbolতন্ত্র ও পরমার্থ আদর্শের উপর দাঁড়াইয়াছিলেন প্যাট্‌মোর। কিন্তু, নিজের সমস্ত বক্তব্য বিলাতী সমাজের তাৎকালিক অবস্থায় খুলিয়া বলিতে যে পারিবেন না, বলিতে বসিলে উহা যে নিদারুণ বিসদৃশ শুনাইবে, তাহাও বুঝিয়াছিলেন। কবি উক্তরূপ 'প্রেমসাধনা' বিষয়ে নাকি Sponsa Deii নামে এক সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়া, পরিশেষে স্বহস্তেই উহার 'অগ্নি সৎকার' করিয়া গিয়াছেন। উহা নাকি দাঁড়াইয়াছিল—"Too much for a world not ready for it"। পণ্ডিত এডমণ্ড্ গস্ (যিনি উহার হস্তলিপি পাঠ করিয়াছিলেন,) সাক্ষ্য দিতেছেন—"It was a transcendental treatise on Divine desire, seen throgh the veil of human desire"

ভারতীয় 'সাধনা' পদটীর অর্থ—সকল Mystic সাধনার অর্থই—হইতেছে Practical Remaking of Being। অতএব বলিতে পারি যে 'প্রেম'তত্ত্বের এরূপ সাধনাঙ্গ ব্যাপারে সাহিত্যদর্শনের মুখ্য আমল নাই। কিন্তু, 'প্রেম' নামক চিত্তবৃত্তিটুকু, মুখ্য কিংবা অবান্তর ভাবে, সাহিত্যের 'সর্ব্বস্ব' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রসই সাহিত্যের আত্মা এবং সাহিত্যে প্রেমের 'পরিব্যক্তি'র নামই 'আদিরস'—ভারতীয় সাহিত্যদার্শনিকের এই সিদ্ধান্তটীর অভ্যন্তরে দৃষ্টি না করিলে, সাহিত্যের 'আত্মা'বস্তুর সর্ব্বাপেক্ষা 'প্রবল' ধর্ম্মটীর দিকেই আমাদের দৃষ্টি অচেতন থাকিয়া যাইতে পারে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে, সবিশেষ আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে, সাহিত্যিক রসের মূলধর্ম্ম এবং সাহিত্যে উহার 'সাধনা' বিষয়ে এত ভুল-ভ্রান্তি, এত অত্যাচার ও অনাচার ঘটিয়া যাইতেছে যে, লেখক এবং সমালোচক উভয়ে এক্ষেত্রে এত ব্যামোহের দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন যে, সাহিত্য-চিন্তার গ্রন্থে জীবহৃদয়ের 'প্রেম' বা উহার উপজীব্য 'রূপ'তত্ত্ব বিষয়ে কোন আলোচনাই 'বাহুল্য' বলিয়া ধর্ত্তব্য নহে। প্রেমের কিংবা আদিরসের অর্থধারণার উপরেই ত সাহিত্যসেবীর প্রায় সকল অর্থ, অনর্থ বা পরমার্থের মূল! অতএব এ বিষয়ে নিরাকুল 'বোধি' লাভ না করিয়া কেহই সাহিত্যের প্রকৃত পাঠক বা লেখকরূপে যে দাঁড়াইতে পারিবেন না, অধুনা তাহাই বুঝিয়া লইতে হয়। কেবল 'রিলিজন' ক্ষেত্রের 'সাধনা' হইতে নহে, সাহিত্যিক ক্রিয়াকর্ম্ম এবং সাহিত্যের 'পাঠ' হইতেও সাহিত্যসেবীর মনস্তত্ত্বে এবং অধ্যাত্মতন্ত্রে একটা "পুনঃসৃষ্টি" ও "নবসৃষ্টি" এবং নবজীবন ঘটিয়া যাইতে পারে। সরস্বতী যে জীবের জীবনতন্ত্রে কতবড় একটা শক্তি, বাণীসেবা হইতে যে আপাততঃ রসানন্দের পথে এবং জীবের সম্পূর্ণ অতর্কিতে একটা অপূর্ব্ব এবঞ্চ অপরূপ কার্য্যকরী সত্যসিদ্ধি ও Remaking of Being ঘটিয়া যাইতে পারে, ইহা যিনি না দেখিবেন,

৫৯। 'এক'ত্ববাদীর নেত্রে সাহিত্যিক 'প্রেম', 'রূপ' ও 'আনন্দ'।

তবে সেই সাহিত্যসেবককে 'আত্মান্ধ' ব্যক্তিরূপেই নির্দ্দেশ করা যায়।

সাহিত্যের রসতত্ত্বের দার্শনিক বলিতে পারেন, সৃষ্টিতন্ত্রে 'প্রেম' চরম তত্ত্বেরই পরিপ্রকাশ—প্রেমের 'নিদান'টাও বাক্যমনের অগোচর সেই 'তুরীয়'ক্ষেত্রেই রহিয়াছে; প্রেম হইতেই সংসারের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়; জড়তার ক্ষেত্রে প্রকট হইলেই প্রেমের নাম হয় 'আকর্ষণ'; উহাই শক্তি-রূপে, আকর্ষণ ও বিকর্ষণের 'নিত্যযুগল' ভাবে প্রকট হইয়া এই বিশ্বসৃষ্টি প্রকট করিতেছে; আবার, উহাই ফিরিয়া সমস্ত প্রকটভাব ও প্রকাশকে তাহার 'অব্যক্ত' নিদানে এবং 'তুরীয়'নিবাসে টানিতেছে। প্রেমই জগৎরূপিণী ও জগৎবিকাশিনী 'শক্তি'—যাহাকে এতদ্দেশের শাক্তগণ "আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা" রূপে ধারণা করেন এবং এই শক্তি-প্রকটিতা সৃষ্টিকেও "The World as Power" রূপেই নির্দ্দেশ করেন। শাক্তগণই মীষ্টিক সুইডেনবার্গের কথায় সায় দিয়া বলিতে পারেন—তুরীয়পদের 'প্রেম'ই জড়জগতে আসিয়া Electricity Heat, Light প্রভৃতি; উহাই আবার প্রাণীজগতে আসিয়া 'প্রাণ' বা শ্বাসপ্রসারের 'যুগল'; উহাই Hunger Impulse এবং Sex Impulse রূপে প্রাণিজগতে কার্য্য করিয়া জীবনতন্ত্র রক্ষা করিতেছে; আবার, জীবনকেও আত্মবিস্তার এবং সন্ততিরক্ষার পথে প্রসারিত করিয়া সৃষ্টিতন্ত্রকে রক্ষা করিতেছে; এক কথায় 'প্রেম'ই 'Life force'। নিম্নশ্রেণীর জীবযোনিতে যাহা 'কাম', মানবযোনিতে আসিয়া উহাই আবার 'প্রেম'রূপে জীবকে স্বার্থের এবং জড়তার কারাপ্রাচীর ডিঙ্গাইয়া নিজের 'ভূমা'স্বরূপের পদবীতে চড়িতে, বিশ্বাত্মার অখণ্ডস্বরূপ ও অমৃতপদ লাভ করিতে শিখাইতেছে। সৃষ্টিতন্ত্রে প্রেম বা আকর্ষণ রূপী ব্যাপারটীর মধ্যে ভুবনভাবিনী মায়াশক্তির এত বড় 'অর্থ'বীজই নিহিত আছে! এই 'অর্থ' টুকু বুঝিতে পারিলেই 'সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়'কে এক চক্ষে এবং একার্থে দেখা যায়।

প্রেমতত্ত্ব বুঝিতে পারিলেই মানবজগতের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম্মতন্ত্রের সকল নিয়ম, নিয়ন্ত্রনা, উন্নতি এবং গতির

নিগূঢ় রহস্যে দৃষ্টিপাত করিতে পারা যায়। অধুনা ইয়োরোপে এক শ্রেণীর লেখকের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, যাঁহারা মানুষের সকল 'ধর্ম্ম'-বৃত্তিকেই যৌনবৃত্তির বিবর্ত্তরূপে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন। ইঁহারাই যৌনবিজ্ঞানী, Sex-scientists ও Psycho-Annalysts প্রভৃতি নামে আত্মপরিচয় করিতেছেন; অনেকে সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রে নামিয়াই 'প্রচার' ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। দেখিতে হয়, শিল্পসৃষ্টি ইঁহাদের লক্ষ্য নহে—লক্ষ্য সমাজবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লব বা সমাজ-সংস্কার। ইহাঁরাই মানুষের সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে Sex Impulse ও Hunger Impulse নামে দু'টি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। Sex Repression হইতেই নাকি মনুষ্যসমাজের যত দুঃখকষ্ট! অতএব, ইঁহারা সমাজে 'যৌনধর্ম্ম'ই প্রচার করিতেছেন; মনুষ্যসমাজ হইতে সর্ব্বপ্রকার Sex Repression তুলিয়া দিয়া অবাধ কামতন্ত্র প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যেই 'প্রচার'। ইহাঁরা বৈজ্ঞানিকের 'ধুয়া' ধরিয়াছেন অথচ অকপট (bona fide) বৈজ্ঞানিক নহেন; শিল্পরীতিকে এই 'ধর্ম্ম'প্রচারের প্রকৃষ্ট 'যন্ত্র' রূপেই ব্যবহার করিতেছেন, সুতরাং এ দিকেও তাঁহারা ভণ্ড শিল্পী। ভণ্ডশিল্পের হাতছানি ও 'অবিতর্কিত হলাহলপ্রয়োগ হইতেই জীবন-পথিক ও সাহিত্যসেবিকে সতর্ক থাকিতে হয়। মনুষ্যের সমক্ষে মোটামোটি দুটি মাত্র আদর্শপথ—জড়বাদ ও আত্মবাদ। যে পথে চলিব, সচেতন ও সতর্কভাবে তাহাকে নির্ব্বাচন করিয়া ও বরণ করিয়াই চলিব; উভয় পথের লক্ষ্য মধ্যে সুমেরু-কুমেরুর ব্যবধান। এই নির্ব্বাচন ও বরণের মধ্যেই জীবমাত্রের সর্ব্বপ্রথম শিক্ষাকর্ত্তব্য; উহা 'দ্বিজন্মা' জীব-মাত্রের উপনয়ন এবং নবজীবনের পথ। যাঁহারা অধ্যাত্মবাদী তাঁহারা বলিবেন'—আত্মাই মূল; জীবের দেহ তাহার সূক্ষ্মশরীরের ধর্ম্ম হইতেই অনুসৃষ্ট এবং প্রকটিত; জীবের দেহধারণ সূক্ষ্মতর অবস্থা হইতে 'পতন' বই নহে। অতএব জীব ভূলোকে যেই 'অদৃষ্ট'গতিকে 'শরীর' গ্রহণ করে সেই শরীরগত অদৃষ্ট এবং উহার বস্তুধর্ম্মেই জীবের মধ্যে নিতান্ত বীজভাবে দুইটি প্রধান Impulse বা প্রবৃত্তি—ক্ষুৎবৃত্তি ও মৈথুন প্রবৃত্তি

প্রকটিত হইতে বাহ্যদৃষ্টিতে দেখা যাইতেছে। যাঁহারা শিশুর মাতৃস্তন্যপানের মধ্যেও Sex-Impulse এর 'বীজ' দেখিতে চাহেন, সেরূপ বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকের নিকট সুতরাং Sex কথাটীর মধ্যে লজ্জাজনক কিছুই ত নাই। এরূপে, যাহা বীজ রূপে অতি সূক্ষ্ম, পরাভিমুখীন 'বৃত্তি' মাত্র, তাহাই বিকাশ লাভ করিয়া পরিণামে প্রেমের আত্মবলি ও আত্মবিলির মহাভাবময়ী প্রবৃত্তি রূপে জীবকে চরম প্রেমপুরুষের পদপন্থা প্রদর্শন করিতেছে!

এসূত্রেই বুঝিতে হয়, কোনকোন আর্য্যদার্শনিকের দৃষ্টিস্থান—যাঁহার বশে তাঁহারাও বিশ্বের সৃষ্টিকে লিঙ্গ-যোনির প্রতীকপুত্তলিকায় ধারণা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সর্ব্ব দেশের অনেক প্রাচীন দার্শনিক যে সৃষ্টিতত্ত্বকে যোনিলিঙ্গের Symbol দ্বারে ধারণা করিয়াছিলেন, জীবের গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্ববিধ 'মিথুন'ধর্ম্মকে সৃষ্টির ভিত্তিভূত মহাধর্ম্মের অভিন্নতায় ধারণা পূর্ব্বক সে দিক হইতেই যে জীবের জীবন ও তাহার ধর্মসাধনার আদর্শকে নিয়ন্ত্রিত করিতে এবং জীবের চরমের অধ্যাত্ম প্রয়াণ সুসিদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, সেই ব্যাপারের সূক্ষ্মার্থ টুকুই বুঝিতে হয়। আবার, এদেশের এক বৈষ্ণব দার্শনিকই ত জীবের আনন্দ বা সৌন্দর্য্যের বুদ্ধিকে, পরম সাহসিক ভাবে, 'উপস্থ ধর্ম্ম' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই! জীবের দেহতন্ত্রের সূক্ষ্ম সত্যনিরূপণের বিষয়ে আধুনিক যুগের কোন বৈজ্ঞানিক অপেক্ষাই হয়ত তিনি পশ্চাদ্‌বর্ত্তী নহেন। তিনি একদিকে (আধুনিক যৌনবিজ্ঞানীর ন্যায়) একমাত্র Sex-instinct হইতেই মানুষের যাবতীয় রসবৃত্তির বিকাশ দেখাইয়া 'মদন-গোপাল'এর মাহাত্ম্যে যেমন জোর দিতে চাহিয়াছিলেন; আবার, অন্যদিকে, জীবাত্মার আধ্যাত্মিক 'স্বধর্ম্ম'গতি ও পরমার্থ প্রাপ্তির উপদেশ বিষয়ে তিনিই ত অগ্রণী; মানব জাতির কর্ণে শুভপরামর্শদাতা ও ধর্ম্মশাস্তা গণের অন্যতম।

অতএব, প্রেম, 'রূপ'বুদ্ধি বা 'আনন্দ'কে জীবের জড়দেহাশ্রয়ে প্রকটিত 'বৃত্তি'রূপে বুঝিতে গিয়া বৈজ্ঞানিকের পরিভাষায় উহাকে Sex-Instinct বলিতে চাও, আপত্তি নাই। কিন্তু, সে ক্ষেত্রে, তত্ত্বচিন্তক

এবং বৈজ্ঞানিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিস্থানেই স্থির থাক'। বৈজ্ঞানিকের এই 'Sex' ত কোন দিকে ঘৃণার বস্তু নহে! উহা পাপ-পুণ্য কিংবা ভাল-মন্দ উভয়কোটীর বহির্ভূত একটি 'সংজ্ঞা' মাত্র। ক্ষুধা যেমন জীবের আত্মরক্ষা-পর বা স্বার্থপর বৃত্তি, তেমন, যৌনবৃত্তিই জীবের পরার্থপরতার অপিচ পরমার্থ-পরতার বীজধারিণী বৃত্তি। এ কথাটার অর্থ বুঝিলেই চক্ষু ফুটিবে। তখন বুঝিব, জীবের দেহবস্তুরজ ভূতাধর্ম্মের আশ্রয়ে প্রকটিত এই যৌনভাব টুকুই যেমন একদিকে বিশ্বসৃষ্টির এবং উহার তন্তুরক্ষার নিদান হইয়া আছে; তেমন উহাই, অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়িয়া গিয়া, জীবকে নিম্ননিম্নতর পাপগুহায় পাতিত করিবার এবং মানুষকে 'পশু' করিবার সহায় হইতে পারে। আবার, উহাই ত জীবের 'আত্ম ধর্ম্ম'-শিক্ষার এবং আত্মার সংপ্রসারণ ও বিশ্বব্যাপ্তি রূপ সত্য-তত্ত্বের পথে জীবকে পরিচালনার একমাত্র গুরুরূপে দাঁড়াইতে পারে! উহাই উদ্ভিত্ত্ব হইতে পশুত্বে, পশুত্ব হইতে নরত্বে, নরত্ব হইতে দেহ-ধর্ম্মাতিশায়ী দেবত্বের ধর্ম্মে জীবকে লইয়া যাইবার কাণ্ডারী। আত্মদান এই বৃত্তিটার চরম ধর্ম্ম। উহাই উদ্ভিদের পুংকেশর ও স্ত্রীকেশরকে (সৃষ্টি মধ্যে সর্ব্বত্র নিসুপ্ত) 'আনন্দ'রূপী আকর্ষণ ধর্ম্মেই সংমিলিত করে—মেলন ও প্রজনন ব্যাপার সাধন করে; উহাই নিম্নতম জীবতন্ত্রে 'কাম'রূপে স্ত্রীপশু এবং পুরুষপশুকে স্ব স্ব ক্ষুধার স্বার্থ ও হিংসাধর্ম্ম ভুলাইয়া পরস্পরের প্রতি কোমল ও প্রিয়ব্রত হইতে শিক্ষা দেয়; সন্ততিসৃষ্টি এবং সন্ততির রক্ষাকল্পে অতর্কিতেই জীবমাত্রকে আত্মদানে পরিচালিত করে। এই 'কাম'বৃত্তিটাই নরত্বের ভূমিতে আসিয়া, জীবকে আত্মস্বার্থ একেবারে বিস্মারিত করিয়া দারাপত্যের জন্য, বন্ধু বা সখার জন্য আত্মবলি দিতে শিক্ষা দেয়; দশের ও দেশের জন্য, জন সমাজের জন্য আত্মোৎসর্গ শিক্ষা দেয়; উহাই আবার জীবকে ইহক্ষেত্রের সমস্ত ঐহিক সুখ ও স্বার্থের বাধাবিঘ্ন বা অন্তরায় তুচ্ছ করিয়া 'আত্ম' প্রাপ্তির পথে সর্ব্বস্ব-দানী দেবত্বায় পরিণত করে। এমত 'বৃত্তি'টাকে প্রাথমিক বীজভাবে জীবদেহের Sex Instinct বলিতে ইচ্ছা হয়, বল।

কিন্তু ওই বীজের মধ্যে বিশ্ব-সবিতার যে সুদূর উদ্দেশ্য, যে Divine purpose বা যে Divine Will প্রসুপ্ত আছে, 'আত্মপ্রাপ্তি'র লক্ষ্য রূপ পরমার্থই যে লুক্কায়িত আছে, তাহা না বুঝিলেই ভুল। কামের চূড়ান্ত পরিণতি হইতেছে প্রেমে; প্রেমের চূড়ান্ত প্রয়োজনা এবং অর্থ হইতেছে বিশ্বের আত্মাকে প্রাপ্তি। অধ্যাত্মক্ষেত্রে Sex বৃত্তিটার সকল 'অর্থ' মানুষ এখনও ধারণা করিতে পারে নাই।

অধ্যাত্মবাদী বলিতে পারেন, এই যে জীব প্রিয় বস্তুর সঙ্গে মিলিত হইতে চায়, প্রিয়ের সমীপস্থ হইতে এবং উহার সহিত সাযুজ্যে অভিন্ন এবং একাত্ম হইতে চায়, এই 'ধর্ম্ম' টুকুর মধ্যে যেমন আধিভৌতিক ক্ষেত্রের সমস্ত ব্যাপার অপিচ সৃষ্টিব্যাপার নিহিত, তেমন অধ্যাত্ম জগতের চরম প্রাপ্তি বা উদ্ধারের তত্ত্বটুকুও উহার মধ্যেই সংক্ষিপ্ত আছে। প্রেম যতই জঘন্য হউক, পরাভিমুখী এবং আত্মার ব্যাপ্তিমুখী বৃত্তি বলিয়াই উহা দেবতা। জীবকে নিজের বাহিরে টানিতে, (বৈষ্ণবী পরিভাষায়) তাহাকে আপনার গৃহগণ্ডীর বাহিরে আনিয়া পরাৎপরের 'কুঞ্জাভিসারী' করিতে এতাদৃশ 'বন্ধু' আর নাই। এই 'প্রেমধর্ম্ম'ই বিশ্বসংসারকে গড়িয়াছে; উহাই জীবকে চরম নিয়তি পথে টানিতেছে; উহাই চরমের উদ্ধারকর্ত্তা। এমন যে কাম বা দেহের ক্ষুধা, যাহা জীবাণুর মধ্যে, Monoplon এর মধ্যে Hunger Impulse এর সঙ্গেসঙ্গেই প্রকটিত, যাহাকে জঘন্য বলিতে পারি, তাহাই ত সৃষ্টিতন্ত্রে পরিণামে আসিয়া মানসিক আকর্ষণ ও আধ্যাত্মিক আকর্ষণ! দেহের জড়ধর্ম্মোপেত এবং জড়তা লিপ্সায় প্রকটিত এই যৌন-বৃত্তিই মানসিক সৌন্দর্য্যপ্রীতি (Intellectual Beauty) ও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যপ্রীতি রূপে পরিণত হয়; উহাই জীবকে পরিপূর্ণভাবে আত্মদানী ও আত্মবিস্মৃত করিয়া প্রেমময়ের ও পুণ্যময়ের চরণে উপনীত করিতে পারে। উহা লক্ষ্য করিয়াই কোন পাশ্চাত্য প্রেমমীষ্টিক বলিয়াছেন "only with the Annihilation of Self-hood comes the fulfilment of Love" এজন্য প্রেমের চূড়ান্ত পরিমাপ, বলিতে পারি, আত্মত্যাগে—সাংসারিক হিসাবে যাহার নাম হয় ত 'সর্ব্বনাশ' বা একেবারে মরণ!

প্রেমিকের মাহাত্ম্য ঐকান্তিকতায় এবং প্রেমাস্পদের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগে। সংসারে সকল মহত্বের এবং মাহাত্ম্যের ওজন দুঃখ এবং আত্মোৎসর্গের তুলাদণ্ডেই ত হইয়া থাকে।

আন্ত কামের মধ্যেও যে একটা অনন্ত অপরিতৃপ্তির 'ধাৎ' আছে, তাহাতেই সৃষ্টির সকল রহস্যের গোড়া। উহাই মনোজীবী জীবের অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে আসিয়া অতর্কিতে চরমসুন্দরের জন্য পিপাসা রূপে ও চূড়ান্তের জন্য ক্ষুধা রূপে আত্ম প্রকাশ করে। অধ্যাত্মজগতে উহার নামই মীষ্টিকের ভাষায়, Divine Unrest. এই 'অপরিতৃপ্তি' প্রকৃত প্রস্তাবে যে 'সুখের পিপাসা' তাহা নহে; উহা জীবের বীজধাতুর মধ্যেই সুনিহিত 'পরমের ইচ্ছা' রূপী একটী অপরিহার্য্য 'টান'। গৌড়ীয় প্রেমমীষ্টিকের ভাষায় বলিতে পারি, উহা 'বিষামৃত' উভয়। উহা জীবের স্বকীয়তত্ত্বের মধ্যেই তাহাকে আপনার বহির্দ্দেশে 'কুঞ্জাভিসারী' করিবার জন্য বংশীবদনের নিত্যবংশীর আহ্বান। পাশ্চাত্য প্রেমমীষ্টিকের ভাষায়, উহা "The Satisfaction of a craving by the spur of necessity". জীব ত এই অতৃপ্তির পথে না চলিয়া পারে না! উহা 'ভবরোগ' হইতে চূড়ান্ত আরোগ্য লাভের দিকে জীবের আত্মপ্রকৃতির প্রেরণা। "It is the healing of the human incompleteness which is the origin of our 'Divine Unrest", এই আহ্বান বা টানের গতিকে কেবল যে জীবের দৈহিক 'কামবৃত্তি' কিংবা মানসিক ও আধ্যাত্মিক 'প্রেম বৃত্তি'টুকুই 'অনন্ত অতৃপ্তিশীল' তাহাও ত নহে, সংসারবাসী জীবের জ্ঞান-কর্ম্ম-ভাবেন্দ্রিয় মাত্রেই 'অসীম-প্রত্যাশী'। চিত্তবৃত্তি মাত্রেই অসীম-পিপাসার হাহুতাসের মধ্য দিয়া জীবকে ছুটাইয়া চলিয়াছে! 'আরও' জানিতে, 'আরও' ভালবাসিতে, 'আরও' পাইতে, 'আরও' ধর্ম্মকর্ম্মা এবং সত্যকর্ম্মা হইতে লালায়িত ভাবে জীব ছুটিতেছে। এই অপরিতৃপ্ত 'আরও' তত্ত্বের মধ্যেই একদিকে যেমন পরমের পিপাসা, অন্যদিকে উহাই জীবের প্রতি পরমের টান বা জীবের 'অবিজ্ঞাত প্রিয়তমের 'ডাক'। এ সূত্রে মীষ্টিসিজম তত্ত্বানুসন্ধানী পণ্ডিত আণ্ডারহিল

যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ভারতীয় প্রেমমীষ্টিক কবিমাত্রের চূড়ান্ত কথা রূপে উপস্থিত করিতেছি—Love to the Mystic is the active and Conative expression of his will and desire for the Absolute, his innate tendency to that Absolute, his Spiritual Weight. অতএব Monoplonএর আপাতদৃষ্ট ওই Sex instinctএর মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্বে জীবের চূড়ান্ত-লক্ষী ওই Spiritual weightটুকুই ত বীজরূপে আছে !

অতএব, সাহিত্যিক প্রতিভার প্রধান কর্ম্মদ্বার, হইতেছে জগতের প্রেম-রূপ-আনন্দতত্ত্বে বা রসের রাজ্যে প্রবেশ। উহার নামই সত্য রাজ্য ; প্রেমই কল্পতঃ সৃষ্টির অন্তরস্থ Wonder Land। ওই দিব্যরাজ্যে প্রবেশ ব্যতীত কবি কিংবা পাঠক কখনও ভাবপ্রাণতা কিংবা সত্যসন্ধতা লাভ করিতে পারিবেন না। প্রবেশ করিতেই দেখিবেন—প্রেমই জগতের দর্শন ও বিজ্ঞানক্ষেত্রের সর্ব্বাপেক্ষা বড় রহস্য ; সমস্ত রসের হৃদয় প্রেমের মধ্যে। কেন জীব পরকে চায় ? পরকে আপনার করিতে—আপনাকে ছাড়াইতে চায় ? কেন নিজের প্রাণ ও হৃদয়রক্ত পরকে দিয়া আপনাকে বিস্তারিত করিতে চায় ? কেন নিজের জীবনকে অপত্যপথে সম্ভত করিতে চায় ? জীবনটা যেন কেবল নিজের জন্যই নহে ! এই স্বার্থের দেশে অন্যার্থ কোথা হইতে আসিল ? প্রেমের পরমার্থ কি ? বাস্তবিক জীবনের রহস্যক্ষেত্রে প্রেম স্বয়ংই পরমার্থ নহে কি ? প্রেমের এই অনন্ত অতৃপ্তি, এই পরায়ণতা, এই মিলন, এই একীকরণ ! এই আত্মপ্রসার, এই আত্মদান, এই আত্মীয়করণ, এই আত্মাশ্রন ! এ সমস্তের বহর এবং দূরগামী উদ্দেশ্য প্রাণেপ্রাণে অনুভব ব্যতীত জগতের হৃদয়ে প্রবেশ কিংবা কবিত্ব নাই ; বুঝি প্রকৃত পাঠকত্বও নাই।

সাহিত্যসেবিকে বুঝিতে হয়, যেমন অধ্যাত্মক্ষেত্রে তেমন বাণীমন্দিরেও প্রেম, সৌন্দর্য্য, রস বা আনন্দ পরস্পর 'স্থান বিনিময়' করে ; আবার, একই তত্ত্ব বিভিন্ন পরিপ্রকাশরূপে সৃষ্টিতত্ত্বে প্রকটিত হয়। এজন্য উহাদের কোনটাকে সৃষ্টি-প্রকটিত কোন বস্তুবিশেষের মূর্ত্তিমধ্যে সীমাবদ্ধভাবে

নিরূপণ করা জীবের সাধ্যাতীত—সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে গেলেই ভুল। এ ক্ষেত্রে মনুষ্যের ভুলের বহর আধুনিক Aesthetics শাস্ত্রের সংজ্ঞাপ্রকরণ দৃষ্টি করিলেই পরিস্ফুট হইতে থাকে। অতএব আমরা এ প্রসঙ্গে সৌন্দর্য্যকে কোন 'বাঁধাধরা' মূর্ত্তিবন্ধে কিংবা বাক্যবন্ধে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছি না। বলিয়া আসিয়াছি, ভারতীয় দার্শনিকগণ কি কারণে সৌন্দর্য্যকে কেবল 'রসাত্মক' 'আনন্দ জনক' প্রভৃতি বাক্যের পথেই উপলক্ষিত করিতে চেষ্টা করেন। সাহিত্যসেবীর পক্ষে এদিকের জ্ঞাতব্য কথাটুকু এক ইয়োরোপীয় পণ্ডিত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পণ্ডিত কারীট্ (Caritt) তাঁহার Theory of Beauty গ্রন্থে বলিয়াছেন—"In the History of Aesthetics we find a growing consensus of emphasis upon the doctrine that all Beauty is the expression of what may be generally called Emotion and that all such expression is Beautiful" ইহা ত হুবহু ভারতীয় আনন্দসাধক এবং 'রস'দার্শনিকেরই সমর্থন! তারপর, হেগেল যে কথা বলিয়াছেন—"The form of the beautiful is unity of the mainfold"—তাহা চিন্তা করিলেও দেখিব, অপরূপ সমন্বয়! যেই 'Unity in Diversity'র উপলব্ধি টুকু 'জ্ঞান-পন্থী সাধকের চরম লক্ষ্য, সেই Unity সৌন্দর্য্যরসিকেরও চরম প্রাপ্তি বলিয়াই ত ইয়োরোপের একজন অগ্রগণ্য দার্শনিকের সমর্থনা লাভ করিতেছি! সৌন্দর্য্যের চরম 'অর্থ' বিষয়ে গীতার সেই কথাটি নিত্যনিয়ত মনে রাখিতে হয়—

যৎ যৎ বিভূতিমৎ স্বত্ত্ব শ্রীমদূর্জ্জিতমেব্ বা
তত্তদে বৈবি কৌন্তেয় মম তেজোঽংশসম্ভবম্!

গীতার দার্শনিক সৃষ্টি-প্রকটিত সকল সৌন্দর্য্যকেই ভাগবত সৌন্দর্য্যের অংশ রূপে দেখিতেছেন। মার্কণ্ডের ঋষি সৌন্দর্য্যের সেই দিব্য ধর্ম্মকেই 'দেবী'রূপে দেখিয়াছেন; তাঁহাকেই "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু

কান্তি রূপেন সংস্থিতা" রূপে লক্ষ্য করিতেছেন। সৌন্দর্য্যের রহস্য যিনিই চিন্তা করিয়াছেন, জগতের সকল 'রূপ'পদার্থের 'বহিঃ প্রকাশে' এবং অন্তর্মর্ম্মে যাঁহারাই প্রকৃত দার্শনিকের ন্যায় দৃষ্টি করিয়াছেন এ ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকেই ত 'একমত' বলিতে পারি! রাস্‌কিন বলিতেছেন—"Beauty is the expression of the Creating Spirit of the universe". উহার মর্ম্মার্থ বুঝিতে গিয়াই নাইট্‌ বলিয়াছেন—"Art is to Ruskin not only moral but divine; morals are at their root, not only Good and True, but Beautiful" একথাটিই Ludwig Tieck অন্য আকারে বলিয়াছেন—"Beauty is a uniqe ray out of the celestial Brightness" সৌন্দর্য্যের 'তত্ত্ব'পদার্থ যখন জাগতিক বস্তুর 'রূপ'অবলম্বনে প্রকট হইয়া আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করে তখনও উহা স্বরূপতঃ 'অনির্ব্বচনীয়'ই থাকিয়া যায়; স্বরূপের রহস্যটী আমরা কোন মতেই মুষ্টিবদ্ধ করিতে পারি না; 'ইহাই তৎ' এরূপ নির্দ্দেশ করিতেও কদাপি পারি না। এদিকে মনুষ্যের সকল চেষ্টা নিস্ফল হইয়াছে; চিরকাল নিস্ফল থাকিতে বাধ্য। মানব কেবল ইহাই বুঝে যে "Beauty in its ultimate or metaphysical form is an expression, a shining forth or spirit in some particular shape" (Plotinus) কবি কোল্‌রিজ জগৎপ্রকটিত এই সৌন্দর্য্যের 'নিদান' খুঁজিতে যাইয়াই আর একটা বৈদান্তিকের কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন—'Beauty is harmony and exists only in composition; it results from pre-established harmony between man and nature" কিন্তু, এই তত্ত্বের মূল রহস্য মানুষ কখনও ধরিতে পারিবে না; কেবল এইমাত্র বলিবে—"The Infinite is made to blend itself with the finite to stand visible and as it were attainable there" (Carlyle) শেলীও একথাই বলিয়াছেন, "The Beautiful is the Infinite represented in a finite form" ইহাদের অনুযাত্রী

হইয়াই ত রবিকবি গাহিয়াছেন-"সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।" সৌন্দর্য্যের এই 'প্রকাশ' লক্ষ্য করিয়াই এক দার্শনিক বলিয়াছেন—"Beauty is the Ideal in the form of limited appearance" কবি কোল্‌রিজ এই 'প্রকাশের রীতি'টাই অন্যভাবে দেখিয়াছেন—"Beauty is subjection of matter to spirit so as to be transformed into a symbol and through which the spirit reveals ifself"এ সকল কথার উচ্ছ্বাস মধ্যে একটা পরম হতাশ্বাস আছে। সর্ব্বপ্রকার শিল্পের ক্ষেত্রে, কাব্য-সঙ্গীত-চিত্র-ভাস্কর্য্য-ও স্থাপত্য প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ললিতকলার বস্তুদেহে একই অনির্ব্বচনীয় 'রসাত্মা' এবং 'আনন্দ'আত্মার বিভিন্ন পথগতিক পরিপ্রকাশের অগম্য রহস্য'টাই ত আমাদের দৃষ্টিপথে উদিত হইতেছে! কার্লাইল তাঁহার Shooting Niagara নিবন্ধে সকল শিল্পসৌন্দর্য্যের মূলগত সেই অনির্ব্বাণ্য এবং রূপাতীত অথচ রূপমূর্ত্ত আত্মাটাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন—"All real art is disimprisoned soul of fact." অতএব, সৌন্দর্য্যের 'আত্মা' কি, তাহা কদাপি বাক্যমনের সম্যক্ মুষ্টিনিবদ্ধ করিতে পারিব না; অথচ জগতের সকল 'সুন্দর' পরিপ্রকাশের মধ্যে সেই অবিজ্ঞেয়ের 'স্পর্শ' অনুভব করিয়াই চলিতে থাকিব। কাব্য সঙ্গীত চিত্র প্রভৃতির 'লালিত্য' পদার্থ সেই অপ্রাপ্ত 'আত্মা'র 'তেজো অংশ সম্ভূত' বলিয়া ধারণার অনুক্রমেই চলিতে থাকিব—ইহাই ভবজীবনের এই পার্থিব গৃহে, অদৃষ্টের অর্দ্ধ-আলো-অর্দ্ধ-অন্ধকারময় এই'ভব'প্রকোষ্ঠে সর্ব্ববিধ মনুষ্যের নির্দ্ধারিত নিয়তি! এরূপেই ভবজীবনে চরম রূপসুন্দর ও রসসুন্দরের অভিমুখী গতি সাহিত্যের ক্ষেত্রে, সৌন্দর্য্যের রসগ্রাহী লেখক কিংবা পাঠকের পক্ষেও কেবল ওই 'অপ্রাপ্ত' আত্মার লক্ষ্যে 'পথিক' হওয়া চলাই সাধনা; এবং (অনেকে বলিতে ভাল বাসেন) ওই অপ্রাপ্তিই 'সিদ্ধি'।

আমাদের বেদান্ত বলিবেন,' জগৎ-প্রকটিত বহুরূপ ও বহুমুখ সৌন্দর্য্যের নিদান এই জগতের অতীতক্ষেত্রেই আছে; সৌন্দর্য্য প্রকৃত

স্বরূপে কোন 'বাহ্যিক' বস্তুতেই নাই। আমাদের অন্তঃকরণে একটা বিশেষ 'ভাব' উদ্রেকের ফল বা 'উদর্ক'কেই আমরা 'সৌন্দর্য্য' নাম দিতেছি। সৌন্দর্য্য প্রকৃতপ্রস্তাবে একটী বিজ্ঞান বা অনুভব; উহা অনুভব্য এবং অনুভাবকের মধ্যে একটা Preestablished harmony বা সমযোগ ব্যতীত আর কিছুই নহে;—জগদনুভবও তাই। যেই 'বিভু' একদিকে ভব বা জগৎ হইয়াছেন, অন্যদিকে অগণিত জ্ঞাতা রূপে এই 'জগৎ' অনুভব করিতেছেন তদুভয়ের মধ্যে একটা সমযোগ। অতএব ওই সমযোগ আগন্তুক; ভব এবং অনুভবের ধর্ম্মও বিভু হইতে আগন্তুক। ক্ষেত্র ও পাত্রভেদে এই সমযোগের ব্যতিক্রমও ত হইতে পারে! মানবক্ষেত্রের বহিশ্চর জীবপর্য্যায়ে এই Harmony একেবারে উলটপালট হইয়া যাইতে পারে; দেবতারা এই ভবসৌন্দর্য্যকে মানব হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত এবং বিভিন্ন ভাবে অনুভব করিতেও পারেন।

এস্থলে বুঝিতে হয় যে, সৌন্দর্য্য জীবের বাক্যমুষ্টির মধ্যে ধর্ত্তব্য হইলে, কিংবা সংজ্ঞাদ্বারে নিরূপণীয় হইলে সাহিত্যের সকল উন্নতি, গতি এবং অভিব্যক্তির শেষ হইত; এমন কি, এই সৃষ্টিসংসারের অভিব্যক্তি পর্য্যন্ত স্থগিত হইত; অকস্মাৎ দাঁড়ি পড়িয়া যাইত। তাহা নহে বলিয়াই 'জগৎ' আছে এবং চলিয়াছে। সুতরাং সৌন্দর্য্য এমন একটি পদার্থ যাহা সৃষ্টির মধ্যে ধরা পড়িবার নহে, অথচ 'আছে'। এই অনন্ততা এবং অপ্রাপ্যতার মধ্যে যেমন জগৎসৃষ্টির তেমন সাহিত্য-সৃষ্টিরও 'নিদান'; সকল প্রকাশের মূল 'তুরীয়' স্থানে। এজন্য, অধ্যাত্ম সাধকগণ বলেন, 'সৌন্দর্য্যস্বরূপ'কে প্রাপ্তির অন্য নামই ফলে 'সংসার নির্ব্বাণ'—সর্ব্ববিধ দ্বৈতব্যাপারের বা ভাব-ও-অভাবাত্মক ভবব্যাপারের বাহিরে "ত্রিপুটীবিহীন" ভূমানন্দে প্রবেশ। তত্ত্ববিদ্যার 'ন্যায়' এবং বিচার মার্গ সে সিদ্ধান্তেই লইয়া যায়। কিন্তু জীবনেত্রে সেই 'সত্য'ই ত বিভীষিকা! উহাও এই ভবসৃষ্টির প্রকৃতিগত একটী 'অদৃষ্ট'—যাহাতে জীবের দৃষ্টিতে (অষ্টাবক্রের ভাষায়) 'মোক্ষাদপি বিভীষিকা'। যাহা পরম সুন্দর, পরম আনন্দ পরম জ্ঞান ও পরম সত্য, তাহাই

সৃষ্টিসংসারের অধিবাসী জীবের নেত্রে "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্"। উহা 'সত্য' এবং সৃষ্টির মধ্যে ঐশী 'বেড়া'। এজন্যই দ্রষ্টাঋষি জীবকে আশ্বাস দিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন, "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন"। অতএব, জীবস্থান হইতে 'আনন্দস্বরূপ' বিষয়ে কিছু না বলাই সঙ্গত। এইস্থান হইতে 'পূর্ণ'র ধারণা অথবা উহার 'প্রবচনা'র সম্ভাবনাও নাই। পূর্ণ (Absolute) সত্য, পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ আনন্দ, বা পূর্ণ সৌন্দর্য্য কি ?—কেবল 'দিক্‌দর্শন' ব্যতীত অন্য চেষ্টা করাই ত ভুল। ইহা বুঝিতে পারিলেই যথেষ্ট যে, দ্রষ্টাগণের 'সত্যজ্ঞান আনন্দ'বাদ পূর্ণতত্ত্বেরই স্বপক্ষ এবং কোন দিকেই 'পূর্ণে'গতির বিরুদ্ধপথিক নহে।

জীবনে এই প্রেম-আনন্দ-সৌন্দর্য্যের সাধনা, প্রাপ্তি ও সম্প্রতিষ্ঠাই যেমন এতদ্দেশে সংপ্রদায়বিশেষের 'ধর্ম্ম' হইয়া দাঁড়াইয়াছে পারস্যেও তাই। পারস্যের সুফী সংপ্রদায়কে (প্লেটো, প্লোটিনস বা গেলেন অপেক্ষাও) বরং ভারতীয় অধ্যাত্মসাধকের শিষ্য বলিয়াই বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ নির্দ্দেশ না করিয়া পারিবেন না। পারস্যের দার্শনিকগণ অপেক্ষা বরং কবিগণকেই সুফীধর্ম্মের দ্রষ্টা, প্রবর্ত্তয়িতা এবং পৃষ্ঠপোষক রূপে নির্দ্দেশ করা যায়। বৈষ্ণবধর্ম্মের ন্যায় সুফীধর্ম্মও প্রকৃত প্রস্তাবে 'কবির ধর্ম্ম'; উহা ভাবের ধর্ম্ম এবং অনন্তমুখী ভাবুকতার পরিপোষক বলিয়াই উহা কবি-ধর্ম্ম। একথার অর্থ দু'দিকেই কাটে—প্রেম-রূপ-আনন্দের 'সাধক' মাত্রেই, তাঁহাদের চিত্তব্যবসায় গতিকে, কবি হইয়া পড়েন; অথবা, গভীরানন্দী কবিমাত্রেই অধ্যাত্মতঃ বৈষ্ণবতা অথবা সুফিত্বের সহরসিক হইয়া পড়েন।

আমাদের প্রেম-সৌন্দর্য্য-আনন্দই পারসিক কবিগণের ভাবুকতাতন্ত্রের প্রধান বস্তু—প্রেম, সৌন্দর্য্য ও সুরা। তাঁহাদের মধ্যে সুরাই ভাগবত 'আনন্দ'তত্ত্বের সিম্বোল। তৃতীয় তত্ত্বের সহিত ঐক্যলাভের জন্য এই ত্রিতত্ত্বের সাধনা। পারস্যে আব্বাসবংশীয় খলিফাগণের রাজত্ব-কালে সুফীধর্ম্মের প্রবর্ত্তন। জরথুস্ত্র-তন্ত্রী আর্য্যপারসিক জাতির হৃদয় কোরাণের সরলকঠোর ভক্তি এবং 'প্রপত্তি' তন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া

উহাকে ভাবুকতার নব প্রতিষ্ঠা দান করিতে চাহিতেছিল। কোরাণের 'সরা'ধর্ম্ম বে-সরা সূফী আদর্শকে(অনিচ্ছা সত্ত্বেও) স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। এস্থলে আরবিক ও পারসিক কর্ষণার সম্মিলন; অধিকন্তু উহাতে ভারতীয় 'প্রেমযোগী'র দীক্ষালক্ষণই পরিস্ফুট। কবি আবু সৈয়দের (৯৬৮-১০৪৯) মধ্যে এই প্রেম-রূপ-সুরাতন্ত্র সর্ব্বপ্রথম ব্যাখ্যাত দেখিতে পাই। পরবর্ত্তী সুফী কবিগণ তাঁহার পথে চলিয়াই সুফীতন্ত্রকে বিপুল অধ্যাত্মশক্তি ও সারস্বত প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছেন। পারস্যে দার্শনিক অপেক্ষা বরং কবিগণের মধ্যেই সুফীতন্ত্র 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ' লাভ করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে একটা পরম শক্তিশালী ও স্বাতন্ত্র্যশীল 'সারস্বত ব্যক্তি'রূপে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। পারস্যের প্রায় সকল বড় কবিই (ফার্দৌসী ব্যতীত) সুফীতন্ত্রের কবি—হাফেজ, জামী, নেজামী, জেলালুদ্দীন রুমী, ফরীদুদ্দীন আত্তার ও ওমর খায়েম। ভগবানই একমাত্র 'সত্য'; জীবমাত্রের মধ্যে তাঁহার সত্যাংশ আছে বলিয়াই সত্যপ্রেম জীবমাত্রের নিত্যসিদ্ধ। জীব সৃষ্টিতন্ত্রে স্বেচ্ছা এবং স্বাধীনতার 'ছাড়া' পাইয়া ভগবান্ হইতে দূরে দূরে ছুটিয়া যায়; দান্তের ভাষায়—নবজাত শিশুর ন্যায় হাসিয়াকাঁদিয়াই দূরে দূরে ছুটিয়া যায়। কিন্তু, 'সত্য'বস্তু প্রেম-রূপ-আনন্দের পথেই জীবকে পুনর্ম্মিলনে টানিতেছেন। অতএব, ভাবের আনন্দ বা Ecstasyই তাঁহাকে 'পাওয়ার' প্রধান 'সড়ক'। কিন্তু, দেহের জড়তাধর্ম্মকে সম্যক্ 'নিরোধ করা ব্যতীত সত্যস্বরূপের সঙ্গে পূর্ণ মিলন সম্ভবপর নহে—এ স্থলেই সুফীগণের মধ্যে বেদান্তসহোদর সাধনতন্ত্র এবং 'একত্ব' সাধনা। "মহর্ষি মনসুরের 'আনল হক' বা "আমিই সত্য"মন্ত্র টুকু বেদান্তের 'তত্ত্বমসি' বার্ত্তারই ছায়াবহ। পূর্ণতত্ত্বের দিকে এই প্রেম-আনন্দ-সুরার পথেই প্রয়াণ। ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অপর কথা না পাইয়া সুফীরাও, বৈষ্ণবকবির ন্যায়, মানুষভাবের 'প্রেমপ্রীতি'র সিম্বোলিজম অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ভাবকে মনোগম্য প্রমূর্ত্তি এবং বাস্তব (Concrete) রূপতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত করাতেই ত কবির মাহাত্ম্য! উহাতে বিপত্তি এবং বিপ্রতিপত্তিও যে ঘটে নাই, তাহা

নহে—বিশেষতঃ ওই 'সুরা' কথাটী লইয়া। তবে, সুফী কবির মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ন্যায় 'কান্তা'ভাব সাধনার রীতি প্রবল নহে; উহা ঘনিষ্ঠ 'সখ্য' বা দাস্যের পথেই একাত্মভাবের সাধনা। অনেক বৈষ্ণব কবিকে যেমন 'স্ত্রী-পুরুষ' ভাবের সিম্বোল ধরিয়া এবং পিরীতি ও বিরহের পথে ভাবুকতার ও জড়রসিকতার গহণ অরণ্যে পড়িয়া আত্মহারা হইতে দেখা যায়, আপনাদের জালেই স্বয়ংবদ্ধ হইয়া যাইতে দেখা যায়, সুফীগণের মধ্যে সে দুর্ঘটনা কদাচিৎ মিলিবে। তবে, গৌড়ীয় কবি (তাঁহার উৎকর্ষক্ষেত্রে) তাঁহার কান্তাভাবের সাহজিক ও রাগাত্মিক প্রণালীতে স্থানে স্থানে যেরূপ আনন্দাবেশ ও প্রেমাভিনিবেশের পরিচয় দিয়াছেন, সে ঘটনাও 'দাস্যপ্রেম'পথিক সুফীকবির মধ্যে কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হইবে। রসের ঘনতা ও অনুভূতির ঘনিষ্ঠতা লইয়া এবং বাণী-মন্দিরে উহার পরিমূর্ত্তনা ধরিয়াই ত সাহিত্যিক মাহাত্ম্যের ওজন!

বলা বাহুল্য, এই ভাব-তন্ত্র এবং কবিতা ও সঙ্গীত-সুলভ ভাবুকতার প্রণালী হইতে এবং ভাবের পথে চিত্তচালনা ও রসসাধনার 'ধাৎ' গতিকেই বৈষ্ণব পদাবলী ও সুফীকবিতা নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্মের আমল ছাপাইয়া উঠিয়া সাহিত্যের আমলে আসিয়া পড়িতেছে। ধর্ম্মের ও সাহিত্যের আনন্দাত্মা অভিন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সৌন্দর্য্যকে ভূতবস্তুর আকৃতি-প্রকৃতিতে ধারণা করিতে যাওয়ার পথে যে বিপত্তি সম্ভাবনা আছে, প্লোটিনস সে বিষয়ে সাধককে নানামতে সতর্ক ও সচেতন করিতে চাহিয়াছেন। সাধারণ জীবনপথিকের পক্ষে ত কথাই নাই—নিত্যনিয়ত নিদারুণ ভুল ও আত্মবিস্মৃতির ব্যাপারেই ত মনুষ্যের জীবনকাহিনী ভরপুর! এতদ্দেশেও, গৌড়ীয় মীষ্টিকগণের মধ্যে তাঁহাদের অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রেই বিপত্তির দৃষ্টান্ত অনেক মিলিবে। 'সত্য-জ্ঞান-আনন্দ' তত্ত্বকে 'সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ' রূপে ধারণা করিতে যাওয়াতেই অতর্কিতে, জৈব ধর্ম্মে, এরূপ ভ্রান্তিকূপে নিমজ্জিত হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। 'ভাব'পথের প্রপত্তিতন্ত্র বা Emotional Surrender হইতেও এই ভ্রান্তির সম্ভাবনা আসন্ন হইয়া আছে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দুইজন দিব্যধর্ম্মা বড় কবি (রসেটি ও শেলী) তাঁহাদের সৌন্দর্য্যসাধনার পথে যে বিপন্ন হইয়াছিলেন, তাহাই দেখিতেছি। রস-স্বরূপকে, আনন্দস্বরূপকে জড়মূর্ত্তিতে অন্বেষণ করিতে গিয়া অনেকেই সাচ্চা জড়রসিক এবং ভূতোন্মত্ত হইয়া পড়েন। এ ক্ষেত্রে, যেমন কবিচরিত্রের তেমন কবিব্যবসায়ের Emotional Surrender হইতেই কবিগণের (যেমন জীবনে তেমনি শিল্পসাধনায়) আত্মবিস্মৃতির সম্ভাবনা টুকু 'নিয়ত' হইয়া আছে। দান্তে গাব্রিয়েল রসেটি ছিলেন একজন সৌন্দর্য্যরসিক কবি ও শিল্পী; তথাপি, তাঁহার শিল্পসাধনার রীতি মধ্যে জড়নিষ্ঠা অতিরিক্ত হইয়াছিল, শিল্পের গুণ-দ্রব্য-ক্রিয়ার মধ্যেই বাহ্যিক ভূতসৌন্দর্য্য ও বাস্তবতা ধারণার 'ধাৎ'টুকু অতিমাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছিল; এ'জন্য বুকেনন (হয়ত কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত ভাবে) তাঁহার কবিতাকে Fleshly School Poetry দুর্ণামে আক্রমণ করেন। স্বয়ং শেলী তাঁহার Epipsychidion কাব্যের 'আলম্বন' বস্তুর বিষয়ে লিখিতে গিয়া, বন্ধুর নিকট এক পত্রে, নিজের জীবনের একটি অনভীষ্ট ভ্রমের কথাই স্বীকার করিয়াছেন—

"I think one is always in love with something or other The error—and I confess it is not easy for spirits cased in flesh and blood to avoid it—consists in seeking in a mortal image the likeness of what is perhaps eternal."

সৌন্দর্য্যের উপাসক, জগতের Spirit of Beautyর উপাসক, চক্ষুঃ-প্রীতি মুগ্ধ, উদারাত্মা শেলী নিজের জীবন পথে যে বহুবার এই ভ্রান্তি-গর্ত্তে নিপতিত হইয়াছিলেন, তাহা শেলী-ভক্তগণের অবিদিত নহে। যেই এমীলিয়া বিবিয়ানীকে অবলম্বন পূর্ব্বক এপিসাইকীডিয়নের মহাপ্রাণ, প্রেমানন্দী উচ্ছাস প্রসারিত হইয়া উক্ত কবিতাকে সাহিত্যের একটী বরিষ্ঠ প্রেমকবিতা রূপে খাড়া করিয়াছে, সেই 'নায়িকা'টী বাস্তবিক কবিহৃদয়ের এত উচ্চ-উচ্ছসিত প্রেমার্চ্চনার যোগ্য পাত্রী ছিলেন না; উত্তরকালে সত্য-আবিষ্কারের নিদারুণ বেদনা টুকুই কবির পত্রে ফুটিয়া উঠিতেছে।

প্রকৃত কবিমাত্রের হৃদয় সহজেই প্রেমবিজ্ঞানী এবং সৌন্দর্য্যদক্ষ। ইংরেজী ভাষায় যাহাকে Intuition বলে,—আমরা তাহাকে বলিব অন্তঃপ্রজ্ঞা। আপন আত্মার এই অন্তঃপ্রজ্ঞার শক্তিতেই কবিহৃদয়, ন্যূনাধিক 'অশিক্ষিত পটুতা'য়, জগৎতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ 'দার্শনিক'; জগতের সৌন্দর্য্য এবং আনন্দতত্ত্বেরও অনুত্তম 'রসিক'। কবি অনায়াসে, অন্তঃপ্রজ্ঞায় সহজাত সৌভাগ্যেই জগতের 'প্রেম'তত্ত্ব ও সৌন্দর্য্যের ক্ষেত্রে যাহা দৃষ্টিসিদ্ধ করেন, পুঁথিপণ্ডিত ব্যক্তিকে বিচার-বিতর্ক-সিদ্ধান্তের শম্বুকপ্রণালীতে অনেক 'গা ঘামাইয়া'ই উহার নিকটবর্ত্তী হইতে হয়। আবার, এত করিয়াও, অনেকে হয়ত কবির সিদ্ধিস্থান স্পর্শ করিতেই পারেন না। তথাপি, কবির ঈদৃশ দিব্যপ্রজ্ঞার ধারাও জীবনের দুরবস্থান ধর্ম্মে পড়িয়া ঘোলাইয়া যাইতে পারে। কবিও প্রকট জগতের ভূতমূর্ত্তি ও জড়তার শারীর ধর্ম্মে আত্মভোলা এবং দিশাহারা হইয়া গিয়া 'কাম'কেই 'প্রেম' বলিয়া ভুল করিতে পারেন; ইন্দ্রিয়ের ব্যামোহকেই 'সৌন্দর্য্য' বলিয়া গ্রহণে বিভ্রান্ত হইতে পারেন। জীবনে এবং শিল্পক্ষেত্রে উভয়তঃ এই ভ্রান্তির সম্ভাবনা কবির পক্ষে 'আসন্ন' হইয়া আছে—বিশেষতঃ আধুনিক কালের 'নবেল'সাহিত্যের ক্ষেত্রে। নবেলের মধ্যে, উহার 'ভূমি' গতিকেই, উচ্চশ্রেণীর পরিকল্পনা, উচ্চগ্রামের কণ্ঠরীতি ও কবিচিত্তের 'শিখরীস্থিতি'র জন্য কিংবা কোন 'গাডুরী দৃষ্টি'র জন্য অবকাশ অনেক সময়েই থাকে না। কেবল প্রাকৃতজীবনের নকশা বা Portrayal of Contemporary Social lifeই লক্ষ্য করে বলিয়া প্রাকৃত বস্তুই নবেলের প্রধান অবলম্বন। এ কারণে নবেলের শিল্পিকে সহজেই 'খাদের পর্দা'য় গলা 'ভাঁজিতে হয়; বিষয় বস্তুর অপ্রবল ভাব ও অনুচ্ছেদে নবেলের রসাত্মাকেও দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। প্রাচীনতন্ত্রের গন্ধ 'রম'ন্যাস কিংবা Field of high Romance টুকুও নবেল পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়া, উহাতে উন্নতভূমির রসভাবের সাধনা কিংবা মাহাত্ম্য-সিদ্ধির আদর্শটী অতি সহজেই ঢিলা হইয়া পড়ে, এবং শিল্পিকে অধ্যাত্মশিখরের উচ্চছন্দী আবহাওয়া টুকু একেবারে ভুলাইয়া নিরেট

মেঠো এবং মৃত্তিকারসিক করিয়া তোলে। এ বিষয়ে 'সাহিত্যে শিব' অধ্যায়ে আমরা আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে দৃষ্টি করিতে পারিব। নবেলের মধ্যে, উহার কর্ম্মভূমির গতিকেই, যেন উচ্চগ্রামের কাব্যশিল্প হইবার পক্ষে নিদারুণ অন্তরায় আছে। অনেক উচ্চশ্রেণীর কবিই ত নবেল ক্ষেত্রে নামিয়া একেবারে প্রাকৃতোন্মত্ত এবং জড়রসিক হইয়া পড়েন! এদিক হইতে দেখিলে, আধুনিক সাহিত্যে কাব্যের বিষয়ভূমি এবং নবেল বা Fiction এর রঙ্গভূমি ক্রমে পরস্পর হইতে পৃথক্‌ভূত এবং বিরুদ্ধস্বভাবের পার্থক্যেই দূরান্বিত হইয়া পড়িতেছে—উভয়ের মধ্যে ক্রমে গিরিশিখর অথবা অধিত্যকার সঙ্গে নিম্নের সমতলভূমির পার্থক্যটুকুই যেন ঘনীভূত হইতেছে!

তাঃপর, 'আনন্দ' বিষয়ে এ প্রসঙ্গে বিশেষ বাক্যব্যয়ের প্রয়োজনই নাই। সাহিত্যের 'রস'মাত্রেই যে 'আনন্দ'তত্ত্বের অংশপ্রকাশ, একথাটা বুঝিলে সকল সাহিত্যচেষ্টা—আমাদের এই প্রসঙ্গটাই—'আনন্দ'স্বরূপের ভাও-অনুগত ধারণা ও সাধনার চেষ্টা রূপে প্রতীয়মান হইবে। আবার, বুঝিতে হইবে, জগতের সকল প্রেম বা রসের মূলেও বৈদিক দর্শনের সেই 'আনন্দ'—"কহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ"? সকল বিজ্ঞানবাদের (Idealism) বা জ্ঞানমূলক অনুভবের ভিত্তিমূলে যেমন এই 'আনন্দ', সাহিত্যিক রসানুভূতির মূলেও সে একই 'আনন্দ'। রাস্‌কিন যখন "Beauty is ths creative Principle of the Universe" বলিয়াছিলেন, তখন তিনি যেমন বিশ্বসৌন্দর্য্যের ভিত্তীভূত 'আনন্দ'ধর্ম্মকেই লক্ষ্য করিয়াছেন; তেমন Poe যখন কাব্যের মূলতত্ত্বকে an elevating excitement of the soul বলিয়াছিলেন, তখনও তিনি সাহিত্যসৃষ্টির কিংবা সাহিত্য-উপভোগের মূলীভূত 'আনন্দে'র ধর্ম্মকেই উদ্দেশ্য করিয়াছেন। ঋষিশিষ্য এ কথাই বলিবেন। শ্রুতির ঋষিদৃষ্ট এই 'আনন্দ'তত্ত্ব এত বৃহদাত্মক, সহস্রশীর্ষ

৬০। সাহিত্যক্ষেত্রে ধর্ম্মতরফের 'আনন্দ'সুন্দর ও 'রসসুন্দর' এবং বৈষ্ণব কবির 'মহাজন' পদ লাভ।

এবং সহস্রাক্ষ পদার্থ যে, উহা ভারতীয় সভ্যতার, তাহার বর্ণাশ্রমী কর্ষণা এবং তাহার সাহিত্যের প্রত্যেক অস্থতন্তুতে অনুপ্রবিষ্ট এবং অনুদ্রাবিত হইয়া গিয়াছে। এমন কি, বৌদ্ধ আদর্শ যে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল তাহার প্রধাণ কারণটী নির্দ্দেশ করিতে গেলেই বলিতে হয়—উহার প্রবল সংপ্রদায়বিশেষের প্রবল দুঃখবাদ এবং শূন্যবাদ। অতএব, ভারতীয় সাহিত্যচিন্তকের সমক্ষে এই 'আনন্দ' অপেক্ষা বড় কথা আর হইতে পারে না। তাহার দৃষ্টিতে, 'আনন্দ' হইতেই যেমন জগতের সৃষ্টি- স্থিতি-প্রলয়, তেমন আনন্দ হইতেই জীবজগতের প্রেম ও সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি এবং রসবুদ্ধি! সুতরাং ধর্ম্ম ও দর্শনক্ষেত্রের এই 'আনন্দ'বস্তু যে কত সহজে সাহিত্যতন্ত্রের রসবস্তুর সঙ্গে স্থানবিনিময় করিতে পারে, তাহাই ধারণা করিতে হয়। এ দিকে অতি সহজে ধর্ম্মানন্দের পরমার্থসাধক এবং সাহিত্যের রসসাধক 'এক' হইয়া যাইতে পারেন। এতদ্দেশে চিরকাল তাহাই ঘটিয়া আসিয়াছে।

প্রেমের এবং রসের 'ধর্ম্ম' বলিয়াই, যেমন পারস্যের সুফীপন্থাকে, তেমন, ভারতের বৈষ্ণব পন্থাকেও তত্তদ্দেশের কবিগণই একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন। উভয় ধর্ম্মে কবিগণের হৃদয়োচ্ছ্বাস এবং অনুভূতির 'প্রকাশ' গুলিই ধর্ম্মগ্রন্থের স্থান অধিকার করিয়াছে; উভয় ধর্ম্মে কবিগণই এই 'প্রেম' এবং 'সাধন'তন্ত্রের ব্যাখ্যাতা এবং উদ্গাতা; উভয়েই জগদীশ্বরের 'ব্যক্তিত্ব'বাদী—তন্মধ্যে বৈষ্ণবের সংপ্রদায়বিশেষ আবার 'মূর্ত্তি'বাদী। 'জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি'পথের মূর্ত্তিবাদীগণের সমক্ষে ভগবান 'সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী' 'হিরন্ময় বপুঃ'—ব্লেক ও সুইডেন্‌বার্গের মধ্যে যেই মূর্ত্তি-আদর্শের পোষকতা মিলিতেছে। (১) আবার, 'সহজ প্রেমপন্থী' বৈষ্ণবগণের সমক্ষে ভগবান হইতেছেন শ্বেতদ্বীপের

(১) সুইডেন বার্গ বিষয়ে পূর্ব্বতন প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। মীষ্টিক সুইডেন্‌বার্গের ন্যায় ব্লেকও ভগবানকে একটী মূর্ত্তিধর ব্যক্তি এবং অধ্যাত্মলোকের 'সবিতৃ-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী পুরুষরূপে নিরূপণ করেন; ভগবানের ব্যক্তিত্ব, প্রেম এবং জ্ঞানই নাকি এই মর্ত্ত্যজগতে সৌর তাপ ও আলোকরূপে প্রকটিত হইতেছে। জগতে Mercy, Pity, Peace এবং

বা জ্যোতির্ম্ময় অধ্যাত্মবৃন্দাবনের নীলকান্ত দ্যুতিধর এবং বংশীধর। এরূপ 'ব্যক্তি'বাদ এবং 'মূর্ত্তি'-ভাবনা ভাবুকতা হইতেই মানব-জগতের সকল 'ভক্তি'পন্থী ধর্ম্মের সকল 'ভালমন্দ' এবং 'পাপপুণ্য' লক্ষণগুলির উদ্ভব। (১) উহা হইতেই যেমন একদিকে, ধর্ম্মক্ষেত্রে, পাত্রবিশেষে সর্ব্বপ্রকার গোঁড়ামী ও পরধর্ম্মের বিদ্বেষ এবং পরহিংসা ও নরহিংসার আগম হইতেছে, তেমন অন্যদিকে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে, কবিকল্পনাকর্ত্তৃক ওইরূপ ব্যক্তিসৃষ্টি এবং মূর্ত্তিসৃষ্টি হইতেই ত সর্ব্বপ্রকার শিল্পসিদ্ধি এবং রসসাধনার প্রধান মাহাত্ম্যটুকু আসিতেছে! ভাবুকতা জীবশক্তির মধ্যে বিভুশক্তির এবং ভূতভাবনের অংশ প্রকাশ। উহা অসতর্কের পক্ষে যেমন 'মহতী বিনষ্টি', যোগ্যপাত্রে তেমনি মহাপুণ্য ঋদ্ধি এবং সৌভাগ্যপুরস্কার। একেবারে আগুন লইয়াই খেলা! যে ব্যবহার জানে, এই আগুন তাহার পক্ষে তারয়িতা ও রক্ষিতা, অযোগ্যের হস্তে, একেবারে নিহন্তা! কবিগণ ভাবুকতার এ আগুন

Loveই নাকি ভগবানের ভাবময় বিগ্রহ। ব্লেক গাহিয়াছেন—

For Mercy, Pity, Peace and Love
Is God our father dear;
And Mercy, Pity, Peace and Love
Is man his child and care.
For mercy has a human heart;
Pity a human face;
And Love the human form Divine
And Peace the human dress.
Then every man in every clime
That Prays in his distress,
Prays to the Human Form Divine
Love, Mercy Pity, Peace.

(১) আমাদের দৃষ্টিতে ইহুদী, খ্রীষ্টান বা মহম্মদীয় ধর্ম্মও কেবল যে ভৃতীয়ের 'ব্যক্তিত্ব' বাদী তাহা নহে, প্রকৃতপ্রস্তাবে 'মূর্ত্তিবাদী'—ভগবানের মানুষী মূর্ত্তি ও মানুষ ব্যক্তিত্ব তাঁহারা স্বীকার করেন—যদিও এই 'মূর্ত্তি' নিত্যকাল মনুষ্যের অদৃশ্যভাবে বা অন্তরালে থাকে। খ্রীষ্টধর্ম্মের আদর্শে তনরেশ্বর জনকেশ্বরেরই অনুরূপ এবং আদমী মনুষ্যও জনকেশ্বরেরই মূর্ত্তি-অনুমতে সৃষ্ট হইয়াছে।

লইয়াই খেলা করেন ; অতএব হাত পোড়াইবার নিত্য সম্ভাবনা থাকে। সম্ভাবনা উভয়দিকে—যেমন অধ্যাত্ম জীবনে, তেমনি সাহিত্যে। (১)

বাঙ্গালী বৈষ্ণবের রসকবিতা সাহিত্যজগতের ভাণ্ডারে একটা স্বতন্ত্র কোঠা ; উহা নানাদিকে বাঙ্গালার নিজস্ব। জগতের সত্যদর্শন কিংবা ভাবুকতার ভাণ্ডারে জাতিবিশেষ কিংবা কবিবিশেষ কোন দিকে কোন অভিনব উপায়ন আনিয়া থাকিলে, তাহার নির্দ্ধারণ করাই সাহিত্য-সমালোচকের পক্ষে একটা মহার্থ। অতএব, এ সূত্রে আর কয়েকটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ আনন্দকে 'বিগ্রহ' দান করিয়া 'বংশী গোপাল' করিয়াছেন। উহার প্রভাব এতদ্দেশের

(১) ভক্তির ধর্ম্ম মাত্রের মধ্যে গোঁড়ামীর প্রধান হেতু এই যে, কেবল মুষা ইশা, মহম্মদ বা নারদ-সনৎ কুমার প্রভৃতির ত কথাই নাই, তাঁহাদের অনুগামী এবং ঘনিষ্ঠশ্রেণীর ভক্তগণও নাকি তাঁহাদের 'ভগবান'কে 'দেখিয়াছেন'। যিনি যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাহার 'একসত্য'তা বিষয়ে গোঁড়ামী হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বৈদিক ঋষি বলিবেন, কোনও জীব-পরিদৃষ্ট কোনও 'ব্যক্তি' বা 'মূর্ত্তি'ই ভগবানের 'স্বরূপ' নহে—কেবল ভক্তেরই 'ইষ্ট রূপ'। ভগবান জীবের বাঞ্ছিতরূপে দর্শন দিতেছেন, এই মাত্র। জীবের প্রত্যক্ষ ভূমিতেই অনন্তকোটী সৌরজগৎশালিনী এই বিশ্ব সৃষ্টির যাবতীয় 'রূপ' ও (চেতন-অচেতন-উদ্ভিদ্) বস্তুর যাবতীয় পরিব্যক্তি এবং মূর্ত্তি যেই 'এক' বস্তু হইতে আসিতেছে, ভবক্ষেত্রে জ্ঞানকর্ম্মভাবের অনন্তমুখী মূর্ত্তি এবং স্ফূর্ত্তি যাঁহা হইতে আসিতেছে, তিনি কেবল 'নরমূর্ত্তি' ও 'মানুষ্য ব্যক্তি' হইবেন কেন? কেবল একটী ভারতীয়, ইহুদী বা আরবী 'ব্যক্তি' হইতেই যাইবেন কেন? অতএব, ঋষির মতে, মূর্ত্তি নির্দ্দেশ করিতে হইলে, তিনি অনন্তশীর্ষ, অনন্তাক্ষ ও অনন্তপাদ অথচ 'এক'। এজন্যই ঋষি কোনও মূর্ত্তিবাদের একান্ত স্বপক্ষে যেমন নহেন, তেমন বিপক্ষতাও করেন না। কিন্তু, ঋষির দৃষ্টিস্থান লাভ ব্যতীত এ সকল ভক্তিধর্ম্মের এত সকল বহুধাবিভিন্ন মূর্ত্তি ও ব্যক্তির মধ্যে কোন ঐক্য এবং সামঞ্জস্য দেখা যেমন কঠিন, উহাদের সহানুভূতি লাভ করা তদপেক্ষাও শক্ত। সাহিত্যসেবী এরূপ দৃষ্টিস্থান ও সহানুভূতি লাভ করিতে না পারিলে, সরস্বতীর ভাণ্ডারে মানবহৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বঘনিষ্ঠ রসচেষ্টার ফলবত্তা ও সার্থকতা বিষয়েই তাঁহাকে অন্ধ থাকিতে হইবে। এ সূত্রে এই গ্রন্থের ৩৩৩ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

ধর্ম্মে এবং সাহিত্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে; কবি এবং ধর্ম্মসাধকের মধ্যে প্রতিমুহূর্ত্তেই স্থানবিনিময় ঘটিতেছে। কবিগণ এই 'রসানন্দ বিগ্রহ'কে অন্তরঙ্গ আগ্রহে বুকে চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। বৈদিক ঋষির নেত্রে যাহা 'আনন্দ' ভাব, সুফী কবিগণের নিকট যাহা 'সুরা', বৈষ্ণবের নিকট তাহাই 'বংশীরব'। অতএব, জীবের প্রত্যেক প্রেমভাব বা আনন্দভাবই আনন্দময়ের 'উপাসনা'। এ আদর্শ হইতে সাহিত্য ক্ষেত্রে অনেক উৎকৃষ্ট কাব্য কবিতার জন্ম। ভারতবর্ষে এমন সাহিত্য নাই, যাহাতে জীব-পরমের বা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা কোন ধর্ম্মপন্থী কিংবা বাণীপন্থী সাধক লাভ করে নাই। যেমন ধর্ম্মে, তেমন সাহিত্যে, উচ্চতম হইতে নিকৃষ্টতম জৈবপ্রকৃতির আত্মবিলাস এবং আত্মপ্রকাশের সুযোগ-সুবিধা উহাতে ঘটিয়াছে। এদেশে কথায় বলে, কানু ছাড়া আবার পিরীত! 'নিরাকার ব্রহ্ম'বাদী কবি, ইসলামধর্ম্মী এবং খ্রীষ্টানধর্ম্মী কবি পর্য্যন্ত 'কানুপ্রেমের কবিতা'য় নিজের হৃদয়োচ্ছ্বাস ছাড়িয়া দিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্বের মধ্যে ও 'বৃন্দাবন লীলা'র মধ্যে জীবাত্মা এবং অনন্তের সম্পর্কে অনন্তশীর্ষ একটি সিম্বোল আছে বলিয়াই উহা কোন-না-কোন দিকে মনুষ্যহৃদয়ের প্রীতিসহানুভূতি লাভ করিতেছে। বৈষ্ণব-পদাবলী ফলতঃ সসীমের সঙ্গে অসীমের প্রেম-আনন্দ-সৌন্দর্য্যের লীলাবিভূতি ধারণায় একটা স্বপ্নানন্দী উচ্ছ্বাস—জীবহৃদয়ের দিক হইতে অচিন্ত্যের সাহজিক প্রেমে একটা স্বপ্নবিলাস। বৈষ্ণবগণ ধর্ম্মকে শিল্পকলার রসান্তঃপুরে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন; আবার শিল্পকেও ধর্ম্মচরণে গন্ধপুষ্প রূপে নিবেদিত করিয়াছেন। মনুষ্যের ভাবুকতা ও সৌন্দর্য্যপিপাসী কল্পনাবৃত্তির মধ্যে, মনুষ্যের রসেন্দ্রিয় ও ভাবেন্দ্রিয়ের 'ললিত' প্রবৃত্তিগুলির মধ্যেই মনুষ্যের দিব্য অদৃষ্ট, দিব্যযোনিতা এবং 'অমৃতপুত্র'তার প্রমাণ। ফলতঃ, 'স্বর্গ-মর্ত্ত্যের প্রেম'স্বপ্নে লীলায়িত হইয়া 'বংশীবদন' অপেক্ষা শক্তিশালী একটা সিম্বোল এবং ভাব'পুত্তল' মনুষ্যের ধর্ম্মবোধি অথবা সাহিত্যবুদ্ধি এ যাবৎ দর্শন করিতে পারে নাই। বৈষ্ণবকবি তাঁহাদের "মানুষীং তনুমাশ্রিতঃ" আনন্দসুন্দরের

সৌন্দর্য্যকে লক্ষ্য করিয়াই গাহিয়াছেন—

মধুরং মধুরং রূপমস্য বিভোঃ
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদু স্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্।

আবার বলিয়াছেন—

শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং আদ্যএব পরোরসঃ॥

মনুষ্যের পক্ষে নাকি আদ্যরসে, নিত্যবিরহের মধুপুরী মধ্যস্থিত, নিত্যকিশোর ওই 'সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ' ধ্যান করিলেই সর্ব্বাপেক্ষা সহজে জীবনের পরমার্থ লাভ হয়!

অসীমকে মনুষ্য ভাবে টানিয়া 'বংশী গোপাল' রূপে 'মূর্ত্তিমান্' করা হইতে তন্মধ্যে জড়জগতের বৈষয়িক ধর্ম্ম এবং জৈবধর্ম্মের অনধিকার প্রবেশ যে সম্ভাবিত হইয়াছে, এ কবিতার পাঠককে তাহা ভুলিলে চলিবে না। এইরূপ ব্যক্তিত্ব ও মূর্ত্তির তরফেই দেশ-কাল-পাত্রগত রুচিভেদ এবং উহার গতিকেই আবার অগণ্য বিভেদ ও গুণ-দ্রব্য-ক্রিয়ার অনন্ত ইতরবিশেষ ঘটিবার জন্যই ত অবকাশ থাকিয়া গেল! অবশ্য, এমন নীরন্ধ্র উক্তি এবং 'আপ্ত'তার দাবীরও অভাব নাই যে, 'বংশীবদন কৃষ্ণ'মূর্ত্তিই অখিল বিশ্বেশ্বরের নিত্যসত্য 'স্বরূপ'। এসমস্তের গতিকেই হয়ত এই 'বংশীবদনের উপাসনা' ভারতের বাহিরে প্রচারিত হইতে অথবা সার্ব্বজনীন সহানুভূতিপদবী লাভ করিতে পারিতেছে না। সাহিত্যের বিচারপদ্ধতি অবশ্য স্বতন্ত্র। কবি রূপের পুত্তল ধরিয়াও 'অরূপ' আনন্দের যতই রসানুভূতি সিদ্ধি করিতে পারিবেন, ততই ত তাঁহার মাহাত্ম্য। তবে, এসমস্ত 'সাহিত্যরস' সাধক কবিই বৈষ্ণব 'ভক্তি'সাধকের এবং সাম্প্রদায়িকের নেত্রে যেই সম্মান লাভ করিয়াছেন তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ওই বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি 'কবি'কেই সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবগণ একেবারে

'মহাজন' বা Superman খ্যাতি দিয়াছেন : তাঁহাদের নাম করা মাত্র ভক্তগণ উদ্দেশে নতশির হন ; কবিগণের পদাবলীও ধর্ম্মগ্রন্থের মতই সম্মানপদবী লাভ করিয়াছে ! পূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি, যে-কোন রূপে কিংবা ভাবেই হউক, কৃষ্ণবিষয়িণী রসালোচনা মাত্রকেই বৈষ্ণব একটা 'ভক্তি সাধনা' বলিয়া জ্ঞান করেন। অতএব, কৃষ্ণবিষয়ে সর্ব্বপ্রকার কবিতা এবং নিরেট কাব্যভাবুকতাই একটা ভক্তি-প্রকার ও ধর্ম্মাচার ! কবির ভাগ্যেও এত বড় অর্চ্চনাপদবী জগতের অন্য কোন দেশে আধুনিক কালে ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ ! (১)

(১) বৃন্দাবনের 'শ্যামসুন্দর ও বংশীবদন' কৃষ্ণ যে মহাভারত নামক ইতিহাস কাব্যের 'পার্থসারথি' কৃষ্ণ হইতে ফলতঃ (উপাস্য হিসাবে ও অধ্যাত্মতঃ) পৃথক্ বস্তু তাহা নিয়ত মনে রাখিতে হয়। শ্যামসুন্দরের উপাসক বৈষ্ণবসম্প্রদায় একথা চিরকাল বলিয়া আসিয়াছেন। শ্যামসুন্দরের মৌষ্টিক উপাসনা ভারতে অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে এবং উহাকে উত্তরকালে মহাভারতের কৃষ্ণের সঙ্গে মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই আমাদের ধারণা। বিষ্ণু যে গোপবেশ ধারণ করিয়াছিলেন, একথা চতুর্থ শতাব্দীর কালিদাসের মধ্যেই পাইতেছি। কিরূপে যে উভয় আদর্শ একীভূত হইল, তাহা প্রত্নারণ্যবিহারী পণ্ডিতগণের সমক্ষে পরমান্ন রূপেই পরিবেশিত হইতে পারে। তারপর, মনে রাখিতে হইবে, বর্ণাশ্রমতন্ত্রের বৈষ্ণবগণের নেত্রে এই 'শ্যামসুন্দর' কেবল ঐকান্তিক অধ্যাত্মপন্থীর উপাস্য দেবতা। কাব কিংবা ভাবতন্ত্রীয় মৌষ্টিক সাধক, যিনি সংসার জীবনের চূড়ান্তে আসিয়া অসীমে দৃষ্টি ফেলিতেছেন অথবা চতুর্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন, কেবল তাঁহারই 'বংশীবদন' উপাসনায় 'অধিকার'। এই তন্ত্রের কোন বৈষ্ণবসন্ন্যাসীর মুখে শুনিয়াছি, সন্ন্যাসজীবনেও অন্ততঃ দ্বাদশ বৎসর অতিগত না হইলে কোন সাধককে ভাগবতের দশমমণ্ডল বিশেষতঃ রাসাধ্যায় পাঠ করিতেও দেওয়া হয় না। অতএব, বর্ণাশ্রমতন্ত্রিকের মতে, কোন 'সাংসারিক' জীবই ত শ্যামসুন্দর-সাধনা'র প্রকৃত 'অধিকারী' নহেন। যাঁহার জীবন অধ্যাত্মতঃ সংসারের চরমে গিয়া জগতের চরম আনন্দসুন্দরেই অহৈতুক প্রেমে ঐকান্তিক হইতে চাহিতেছে, গঙ্গাস্রোতের ন্যায় যাঁহার অন্তরাত্মা স্বভাবধর্ম্মেই চরম আনন্দসিন্ধুর অভিমুখে প্রবাহী হইতেছে, তাঁহার জন্যই ভবতমোবিলম্বী শ্বেতদ্বীপের নিত্যানন্দসুন্দর এই বংশীবদন ! অতএব এই 'অধিকার' আদর্শ অবহেলা করিলে অনেক 'পথিক' যে অধ্যাত্মতঃ বিপন্ন হইবেন, তাহাতে সন্দেহ কি ? আত্তপের

প্রেমের উপজীব্য 'ব্যক্তি'। ব্যক্তিত্ব ব্যতীত প্রেম মুঠি চাপিতে পারে না বলিয়াই মানবজগতে জনসাধারণের ধর্ম্মমাত্রেই 'ব্যক্তিগত ঈশ্বর'বাদী হইতে বাধ্য হইতেছে। উহা হইতে জগতে ভক্তি-উপাসনাত্মক ধর্ম্মগুলির মধ্যে যেই অনিষ্ট লক্ষণ আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা পূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি। এখন, ওই 'ব্যক্তি'কে আবার 'মূর্ত্তি' দান করিলে অনিষ্টসম্ভাবনা যে দ্বিগুণিত হইয়া পড়িবে এবং এরূপ কোন মূর্ত্তিই যে সার্ব্বমানবিক রুচিভূমি লাভ করিবে না, তাহাতে সন্দেহ কি? তাই, এরূপ 'ব্যক্তি'প্রিয়, এবং 'মূর্ত্তিবাদী' উপাসক মাত্রকে ঋষি 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ কল্পনম' প্রভৃতি কথা দ্বারা নিয়ত গোঁড়ামীর গর্ত্ত হইতে সতর্ক করিয়া আসিতেছেন। জীবের ব্যক্তিগত অশেষ রুচিভেদে এরূপ ব্যক্তসুন্দরের মূর্ত্তিও অশেষ বিভিন্নতা লাভ করিতে পারে; উহাতে আবার গোঁড়ামী ও অসহিষ্ণুতা আসিলে মানুষের সকল ধর্ম্ম ও সমাজ সম্পর্কিত নীতি এবং সত্যপ্রপত্তির লক্ষ্যকে একেবারে পণ্ড করিয়া দিতে পারে।

কবির পক্ষে, ধর্ম্মক্ষেত্রেও, কোনরূপ পরিমিত ও 'বাধা'ধরা মূর্ত্তির চরণে গোঁড়ামী শৃঙ্খলে আপনাকে আবদ্ধ করার মতন এখনতর দুর্ভাগ্য আর হইতে পারে না। উহাতেই তিনি অতর্কিতে, নিজের অন্তরাত্মাকে খণ্ডিত এবং কুণ্ঠিত করিতে পারেন এবং নিজের অধ্যাত্মদৃষ্টিকে সত্যদর্শনের ক্ষেত্রেই সংকীর্ণ, ঠুলিবদ্ধ এবং অবরুদ্ধ করিতে পারেন। তথাপি, আমাদিগকে দেখিতে হয়, ভারতের বৈষ্ণব কবিগণ (ভারতের নানক, কবীর, দাদু, তুলসীদাস, সুরদাস, বিদ্যাপতি, তুকারাম, রূপগোস্বামী প্রভৃতি) কিরূপে সীমাবদ্ধ মানসী 'ব্যক্তি' বা মূর্ত্তিপুত্তল

প্রতি 'লৌল্য' দেখাইয়াই বিপত্তি। আগুনও গিলিতে পারিলাম না, নিজের যোগ্য আহার্য্যও ছাড়িয়া আসিলাম! ক্রুশ স্কন্ধে লইলাম, অথচ ক্রুশাধীশ্বর দেবতার অনুসরণে প্রবৃত্তি নাই! বংশীবদনের উপাসক হওয়ার জন্য যোগ্যব্যক্তি কোটিকোটির মধ্যে দুটিকও মিলে না।

অবলম্বন করিয়াও আপনাদের প্রাণকে অসীমতত্ত্বের স্পর্শে নিত্য সচেতন রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের হস্তে ব্যক্তসুন্দরের 'প্রেম', 'মিলন' ও বংশীরবের কবিতা, সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বরাগ, বিরহ ও ভাবসম্মিলন প্রভৃতির কবিত্ব ভারতীয় সাহিত্যের চিরস্থায়ী অমৃতসম্পত্তি রূপেই দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ভাবসাধকের হৃদয় ব্যক্তি বা মূর্ত্তি যাহা ধরিয়াই হউক, যখনই উদ্দিষ্টে ঐকান্তিক ও ধ্যানস্থ হইতে পারিয়াছে, তখনই জড়তার সকল সীমা-সঙ্কীর্ণতা ছাড়াইয়া উঠিয়া অন্তর্যোগ পথে চিদাকাশে পরম বিষ্ণুপদবীতে বিগাহী হইয়াছে। এ ক্ষেত্রেই প্রকৃত প্রস্তাবে 'ফলেন পরিচীয়তে'। এই 'ফল'টুকুর জন্যই ত, ভারতীয় আদর্শে, জীবজীবনের সকল ধর্ম্ম 'সাধনা'!

কোনরূপ ধর্ম্মতত্ত্ব বা দার্শনিক তত্ত্বের বিচার আমরা এ আলোচনায় যথাসাধ্য পরিহার করিয়াই চলিতেছি। মীষ্টিসিজমের যাৎটুকু মনুষ্য-চিত্তের বিমানবিগাহী উচ্চতম শিখর এবং মীষ্টিককবিতা বলিতে বিশ্বের চরম রহস্যময়ের এবং রহস্যসুন্দরের ধ্যানাত্মিকা চিত্তচেষ্টাই বুঝায়; অতএব এ'দিকে, অন্ততঃ গৌনভাবে, সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম ও দর্শনের ভূমি পরামৃষ্ট করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। তবে, ভারতীয় সাহিত্যপাঠক মাত্রকে এদিকে মনে রাখিতে হয় যে, বৈদিক দর্শনের 'অদ্বৈত'তত্ত্ব মধ্যে এই 'ভক্তি'দৃষ্টির 'স্থান' হইতেই একটা বিশিষ্ট ভেদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ভক্তগণের ওই 'ব্যক্তি' এবং 'মূর্ত্তি' পাছে চরম আনন্দসুন্দরের অসীমতা বিষয়ে জীবকে অসতর্ক এবং অন্ধ করিয়া তোলে, সে আশঙ্কাতেই 'বিশিষ্টাদ্বৈত' নামক তত্ত্বধারণা ও সাধনার আদর্শ। উহার গতিকেই 'আনন্দ'বস্তুর সঙ্গে বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদীর 'পূর্ণমিলন' বা একত্বলাভের কোন আদর্শ 'ভক্ত'গণ স্বীকার করিতে চাহেন না— কেবল আংশিক মিলন বা নিত্যমিলনের মধ্যেও নিত্যবিরহ; কেবল ভাবসম্মিলন। এই ভাবসম্মিলনও সুতরাং অনন্ত পরিতৃপ্তির মধ্যে অনন্ত অপরিতৃপ্তি—কোনরূপ শান্তভাববিহীন আকুলতা এবং অশেষ 'গতি'। 'বিশিষ্টাদ্বৈত' আদর্শ ভক্ত ও কবিগণের সর্ব্ববিধ ব্যক্তিবাদ বা মূর্ত্তি

বাদ সত্ত্বেও তাঁহাদের অন্তরাত্মাকে নিত্যকাল অনন্তের বুদ্ধিতে অক্লান্তভাবে সচেতন রাখিয়া ভক্তিপন্থার এবং মূর্ত্তিবাদের সকল অনিষ্টতা নিবারিত করিতেছে। এ'জন্যই পূর্ণপরিতৃপ্ত শান্তি বা 'শান্তরস' বলিয়া অদ্বৈতমিলনের কোন আদর্শ ভক্তিপন্থায় পূজালাভ করিতে পারে নাই। কেবল, ভগবল্লক্ষ্যে অনন্ত গতিও আকুলতা।

বাঙ্গালী মিথিলার কবি বিদ্যাপতিকে রূপান্তরিত করিয়া সম্পূর্ণ নিজের করিয়া লইয়াছে। আমরা এখন বিদ্যাপতি বলিতে এই 'বাঙ্গালী বিদ্যাপতি'ই চিনি। এতদ্দেশের ভক্তিসাধনার ক্ষেত্রে অদ্বৈতআদর্শের 'ব্যক্তি'বাদী ও 'মূর্ত্তি'বাদীর মধ্যে এই বিদ্যাপতি একজন অতুলীয় কবি। ভাবের এমন উচ্ছ্বাসময় অথচ নিবিড় পরিমূর্ত্তণা, ভাষায় ও ছন্দের এমন ঐশ্বর্য্যময় ধ্বনি এবং পরিপ্রকাশ, ব্রহ্মানন্দসম্ভোগের এমন অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ পরিব্যক্তি, সাহজিক আদর্শে ভগবানের ব্যক্তিত্ব ধারণা এবং মূর্ত্তিসাধনার মধ্যেও আবার এমন 'অভিন্ন'মিলনের অদ্বৈততন্ত্র খুব কম কবির মধ্যেই মিলিবে! উহার গতিকেই বিদ্যাপতি গাহিতে পারিয়াছিলেন—"অনুখণ কানু কানু গুণ সোঙরিতে
সুন্দরী ভেল মাধাই।"

বিদ্যাপতির 'রাধিকা' ডাকিয়া উঠিয়াছেন—

শ্যাম পরশমণি কি দিব তুলনা—
সে অঙ্গ পরশে আমার এ অঙ্গ সোনা!
*   *   *   *
কি কহব রে সখি আনন্দ ওর—
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর!

এ গুলিই অসীমের সঙ্গে বিশিষ্টাদ্বৈততন্ত্রীয় ভাবসম্মিলনের প্রকৃত 'মিষ্টিক' কবিতা। যেই জীবপ্রকৃতি অসীমকে আপন সাধর্ম্ম্যে ব্যক্তিত্ব ও মূর্ত্তি দিয়াছে তাহারই অন্তরঙ্গীয় অনুভবটুকু প্রকাশের চেষ্টা। জীবপ্রকৃতি মহাভাবে আবিষ্ট হইয়া বলিতেছে—"তোমরা বুঝিতে চাও, সে বস্তু কি? কি করিয়া

বুঝাইব! একথা বলিতে পারি এবং পারো ত বুঝিয়া লও, আমি লোহা ছিলাম, সোনা হইয়াছি। আমার প্রত্যেক অস্থিতন্তু বলিতেছে, প্রাণের অন্তরতম প্রাণ বলিতেছে, আমি সে অঙ্গের স্পর্শ লাভ করিয়াছি; আমার দ্বিতীয় জন্ম—নবজন্ম ঘটিয়াছে; লোহা ছিলাম, সোনা হইয়াছি!" ইহা ত অন্তরাত্মার স্পর্শেন্দ্রিয় পথে সেই অনন্ত আনন্দসুন্দর স্পর্শমণির অনুভূতি! পুনশ্চ, "আমার এই আনন্দ তোমরা বুঝিতে চাও? তাও কি করিয়া বুঝাইব! এতকালে বুঝিয়াছি—হয় ত চিরকাল নিজের অজ্ঞাতেই বুঝিয়া আসিয়াছি—সে বস্তু ত নিত্যকাল আমার মন্দিরে! তাহার বিচ্ছেদ ভাবটাই বুঝি আমার চিরকালের ভুল! নিত্যকাল আছে। এই যে আমি বুঝিতেছি—সে আছে—আছে—আছে! নিত্যকাল আমার মন্দিরে আছে!"

মূর্তিপথেই ব্রহ্মসম্ভোগ সাধকগণের মধ্যে বাঙ্গালী শ্রীচৈতন্য অন্যতম—বলিতে পারি, তিনি উহাদের প্রধান। এ'দেশে অনেকে তাঁহাকে ভগবানের 'ভক্তি'অবতার রূপেই পূজা করেন। ভগবান্ "আপনি আচরি ভক্তি জগৎকে শিখাইবার জন্য" যে গৌরাঙ্গরূপে এ দেশে আসিয়াছিলেন, ইহা চৈতন্যের অবতারত্ব-বাদিগণ বিশ্বাস করেন ও প্রচার করেন। এই চৈতন্য স্বয়ং বৈষ্ণবকবিত্বের পদাবলীসিন্ধু ঘাঁটিয়াই যেন প্রোক্ত চারিটি মাত্র 'পদ' বাহির করিয়াছিলেন—আনন্দবস্তুর সঙ্গে ঘননিবিড় প্রেমের স্পর্শযোগের প্রকাশক অপিচ উহার পথপ্রদর্শক অনুত্তম পদমন্ত্র রূপেই যেন উক্ত চারিটী পদের আবিষ্কার করিয়াছিলেন! চরিতলেখক বলিতেছেন, পুনঃ পুনঃ ওই পদগুলিন গাহিয়া গাহিয়া চৈতন্য শ্রীবাসের আঙ্গিনায় পারশেষে নিজের 'ভাব সমাধি' প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহার উক্ত ভাবসম্মিলনের পথে এই পদযুগ্মক স্পর্শসুন্দরের আন্তরিক অনুভবের 'মন্ত্র' কিনা এবং ওইরূপ অনুভবে লইয়া যাইবার পথে ওই 'মন্ত্র' জীবের একটী শক্তিশালী 'গুরু' কিনা, গায়কের চিত্তকে অন্তর্মুখ করিয়া আনন্দবস্তুর অধ্যাত্মস্পর্শে বা 'বোধি'র অবস্থায় পরিচালিত করিতে ওই কয়টি

কথার মধ্যে একটা অতুলনীয় 'মন্ত্রশক্তি' আছে কি না, তাহা সাহিত্যরসিকমাত্রের পক্ষেও ন্যূনাধিক সুগম বলিয়াই মনে করি। উক্ত পদদ্বয়ের 'রস'কে এ আলোচনায়, পরম 'সাহিত্যরস' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেও আমরা দ্বিধাবোধ করি না। সাহিত্যজগতের ভাবুকতাভাণ্ডারে উহাদের সমানমূল্য পদার্থও হয়ত বেশী মিলিবে না। ভাষা ও ছন্দের এবং ভাবের অন্তর্ম্মুখী গতি এবং ঐ সমস্তের সম্মিলিত অন্তর্যোগিনী শক্তি লইয়াই উক্ত পদদ্বয়ের 'মন্ত্র'শক্তি ; অবিরত মনন এবং ভাবযোগে পুনঃপুনঃ উচ্চারণ হইতে এই মন্ত্রশক্তি যেন অপূর্ব্ব বিদ্যুচ্ছটায় মনোযোগীর অন্তরে উহার মর্ম্মপ্রকাশ করিতে থাকে! এ দু'টি পদমন্ত্র ত বিদ্যাপতির। বিদ্যাপতিকে 'সম্ভোগের কবি' বলিয়া তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ একস্থানে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহার দ্বারা বাঙ্গালার অনেক 'বৈষ্ণব' এবং 'রসিক' ব্যক্তিও শাসিত হইতেছেন বলিয়াই মনে হয়। অনেকে বিদ্যাপতিকে, তাঁহাদের চণ্ডীদাসের তুলনায়, 'ছোট কবি' বলিতেও যেন কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু এই 'সম্ভোগ'টুকু কি? উহা ত ব্যক্তিত্ববাদী এবং মূর্ত্তিবাদী বৈষ্ণবের বা বিশিষ্টাদ্বৈত সাধকের 'ব্রহ্মসম্ভোগ'—ব্রহ্মানন্দ! সাহিত্যের ক্ষেত্রে আনিয়া যাহার নাম দিতে পারি 'পরম আদিরস'। যাহা সকল সাধকচেষ্টার অপিচ কবিচেষ্টারও চরম রস লক্ষ্য, এ কবিতা ত তাহাই বাক্যসিদ্ধ করিতে চাহিয়াছে! চণ্ডীদাসের মাহাত্ম্য আছে—তিনি ইষ্টের উদ্দেশে পরম আকুলতার কবি। নিরাকার ব্রহ্মপন্থী হইলেও, অন্ততঃ একদিকে, তাঁহার উত্তরকালীন শিষ্য আমাদের ওই রবীন্দ্রনাথ। উভয়ের মধ্যে আনন্দসুন্দরের অভিমুখী একটী মিলনপিপাসা ও ভাবাকুল বেদনা এবং সেপ্রকার ভাবপ্রকাশের বহু চেষ্টাই তাঁহাদের কবিত্বকে বিশিষ্টতা দান করিতেছে। কিন্তু, বিদ্যাপতির এই পদ'মন্ত্র' অতুল! বিদ্যাপতির কবিতা প্রেম-ভাবুকতার অসাধারণ বাক্যবৈভবময়ী পরিবর্ণনা এবং একটা পরিপূর্ণ ও সচেতন অধ্যাত্মিক Cultureএর ফল—ভারতের অদ্বৈততন্ত্রীয় কর্ষণার অমূল্যফল! তিনি

অন্ততঃ চণ্ডীদাস হইতে 'খাটো' কবি নহেন। বুঝিতে হইবে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মধ্যে ওই 'ভাবসম্মিলন' আদর্শ এবং কবিত্বপথে উহার ধারণার ওই 'একটুকুন' পার্থক্য। কিন্তু, ওইরূপ একটুকুনির মধ্যেই ত কবিগণের 'সর্ব্বস্ব'। কবিতে কবিতে মাহাত্ম্য এবং বিশিষ্টতার উহাই ত প্রধান পরিচয়স্থান!

এরূপ ভাবসম্মিলনের তরফে বিদ্যাপতির আর একটি কবিতা তাঁহার গুপ্ত প্রাণের 'মিলন'রসোল্লাসমধুর উচ্ছ্বাসটুকুই বাহিরে প্রকাশ করিতেছে—

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু;
পেখনু পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মাননু;
দশদিশ ভেল নিরধন্দা॥

প্রেমিকা এমন কোন 'বস্তু' পাইয়াছে, যাহাতে তাহার জীবনযৌবন 'সার্থক' হইয়া গেল; তাহার নবজন্ম হইল এবং বিশ্বসংসারের সঙ্গে নবসম্বন্ধ ঘটিয়া গেল; জগতের সকল বহুত্ব একেবারে নির্দ্বন্দ্ব, নির্দ্বৈত আনন্দে হারাইয়া গেল! তাহার আর বিচ্ছেদভীতি নাই; সে অন্তরাত্মার নিত্যদৃষ্টিতে জাগিয়া থাকিয়া নিত্যানন্দসুন্দরের 'দর্শন'রসেই মজিয়া আছে।

সোহি কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা;
পাঁচ বান অব লাখ বাণ হউ,
মলয় পবন বহু মন্দা!

সে ত নিত্যমিলনের মধ্যে বাস করিতেছে—বিরহও যে তাহার নিকট মিলন হইয়া গিয়াছে!

এরূপই বৈষ্ণবকবির 'ভাবসম্মিলন'! অদ্বৈতবাদী 'জ্ঞান'পথে যে বস্তু পাইতেছেন, ভক্ত তাঁহার 'ব্যক্তি'প্রেম এবং 'মূর্ত্তি' প্রেম

পথেও সে তত্ত্বেই উপনীত হইতেছে! অধিকার ভেদে উভয় পথের যোগ্যতা ও সার্থকতা স্বীকার করাই ধর্মক্ষেত্রে ভারতীয় কর্ষণার প্রধান অঙ্গ। উহার বিপরীতই 'সঙ্কীর্ণতা'। দেখুন, পরিশেষে মূর্ত্তিটা কোথায় গেল? নিরাকারবাদী রবীন্দ্রনাথের প্রোল্লিখিত 'মিলন' কবিতাটীও নির্ব্বিশেষে বিদ্যাপতির সহপথিক আন্তরিকতা এবং রসানুভূতির প্রতিবিম্বই বহন করিতেছে না কি? একই প্রকৃতির রসানুভব ও মিলনপদ্ধতি এবং প্রকাশের 'রীতি'!

এই ত যেমন অরূপবাদীর, তেমন রূপবাদীর মর্ম্মগত আনন্দসুন্দর ও রসসুন্দরের বার্ত্তা! জগতের সকল আনন্দ, বিশেষতঃ কবিগণের কবিত্বানন্দ এবং সাহিত্যিক রসানন্দও যে চরম আনন্দসুন্দরের ঔরস পুত্র, উহা যে "ব্রহ্মানন্দ সহোদর", তাহা 'অদ্বৈত আনন্দ'বাদীর দৃষ্টিস্থান ব্যতীত হৃদয়ঙ্গম হইবে না। আনন্দকে এ ভাবে উপলব্ধি আধুনিক জগতের Theist কিংবা Deistগণের ভাবাদর্শে, দর্শনে কিংবা সাহিত্যের ধাতে যেন সহ্য হয় না। তাই 'পৃথগীশ্বর'বাদী খ্রীষ্টানের অসহন দৃষ্টিতে, জগতের আনন্দমর্ম্মযোগী এবং "Blessedness and Joy" এর উপাসক ওয়ার্ডসোয়ার্থ একজন Pantheist; "Spirit of Beauty of the Universe"এর পূজারি শেলীও একটা 'নাস্তিক'; যিনি Truth is Beauty, Beauty is Truth" বিশ্বাস করিতেন এবং হাইপিরীয়ন কাব্যে "First in Beanty is First in Might" আদর্শ যিনি প্রচার করিয়াছেন সেই কীট্সও একজন Pagan; ইয়োরোপ খণ্ডে এই সৌন্দর্য্য, প্রেম বা আনন্দের আদিঋষি এবং প্রাচ্য ঋষির ভাব-পুত্র সেই প্লাতোই সুতরাং একজন Pagan! এ যুগের দুনিয়া মধ্যে দ্বৈতবাদী এবং 'ঈশ্বর পুত্র'বিশ্বাসী মানবসংঘেরই জয়। অতএব তাঁহারা কাব্যে, সাহিত্যে, দর্শনে ও সমালোচনায় 'স্বর্গস্থপিতা' আদর্শের পৃথগীশ্বর বাদের সাপক্ষ্যেই কোলাহল তুলিতে পারিতেছেন। কিন্তু, যাঁহারা তর্কযুক্তি, বিচার বা অধ্যাত্ম অনুভব এবং বোধির পথেই সত্যকে অন্বেষণ করিবেন, তাঁহারাই হয় ত বলিবেন যে, ওই

Pantheism অপিচ ওই অদ্বৈতবাদের প্রচারক ঋষিই জগৎবিজ্ঞানের একমাত্র সত্যপথ এবং তত্ত্ববস্তু দর্শন করিয়াছেন। অন্ততঃ, এমন একটা দৃষ্টিস্থানও আছে, যে স্থান হইতে দেখিলে আধুনিক 'খ্রীষ্টান' শব্দও বহু-নিন্দিত Pagan এর একটা 'পাল্টা জবাব' রূপেই দাঁড়াইয়া যাইতে পারে।

তার পর, বংশীরব। তৃতীয়ের সেই আনন্দবংশী বা প্রেমবংশী হইতেই অনন্ত রসময় এই সৃষ্টিলীলা! আবার, বংশীরব একদিকে প্রেমময়ের আহ্বান, অন্যদিকে অখিল পদার্থের অন্তর্মর্ম্মবাহী প্রণবগান। বলিতে পারি, সাধক বা প্রকৃত কবিমাত্রের 'হৃদয়' এই বংশীরব 'শ্রবণ' করে; কবির অন্তরাত্মা নিজের আনন্দতত্ত্বের মধ্যে সজ্ঞানে বা অতর্কিতে, পরিস্ফুটভাবে কিংবা তন্দ্রাভিভূত ভাবে, জগতের মর্ম্মপ্রকটিত এই বংশীগীতি শুনিয়া থাকেন এবং উহার সঙ্গেই নিজ নিজ কবিত্বকালোয়াতী সুসঙ্গত করিতে লক্ষ্য রাখেন। জগতের মর্ম্মগত ওই বংশীধ্বনির শ্রুতিদীক্ষা এবং প্রেমানন্দের কিছু-না-কিছু মর্ম্মশিক্ষা ব্যতীত কবিশক্তি দাঁড়ায় না বলিলেই যথার্থ কথা বলা হয়। তাই, বিভিন্ন দেশের প্রাচীন কিংবা আধুনিক বহু কবির মধ্যে এদিকে একটা 'মিল' আছে। উহা অনুকরণের 'মিল' নহে; অধ্যাত্মপথের যাত্রীমাত্রের অন্তরাত্মা কর্ত্তৃক 'ঐক্য' শ্রবণের এবং একই সত্যসঙ্গীতের অনুশ্রবণের মিল! গ্রীকদেশের আদি বৈজ্ঞানিক ও কবি পীথাগোরসের অন্তরাত্মা এই বংশীরব শুনিয়াই উহাকে জগৎব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত Music of the Spheres আখ্যা দিয়াছেন। তদনুসরণে ড্রাইডেন কবির সেই—

৬১। সাহিত্যক্ষেত্রে আনন্দস্বরূপের বংশীরব ও রসতত্ত্ব।

From Harmony, Heavenly Harmony
The Universal frame began!

প্রভৃতি ইংরেজী কাব্যের পাঠক মাত্রের জানা কথা। বৈদিক ভারতের সেই 'প্রণব' বাদী বা 'শব্দ ব্রহ্ম'বাদীগণের সৃষ্টি-বিজ্ঞান, যাহার

ভিত্তিতে বেদবাদ এবং বেদের মন্ত্রবাদ টুকুই দাঁড়াইয়া আছে ও ভারতীয় আর্য্যধর্ম্মের সাধনাঙ্গ অন্ততঃ একদিকে নির্ভর করিতেছে, তাহার কথা সাহিত্যচিন্তার গ্রন্থে আর নাই বা বলিলাম। মন্ত্রবাদী মীষ্টিকগণের সেই ভাব-ক্রিয়া ও শব্দের অভিন্নতা'বিজ্ঞান', 'স্ফোট' বাদ এবং সৃষ্টিপ্রত্যয়ের সেই—

"শব্দ শ্চাবিরভূত্তদা প্রণব ইত্যোঙ্কার রূপঃ শিবঃ" প্রভৃতি বার্ত্তা এবং সেই ওঙ্কার হইতেই শব্দময়ী, ভাবময়ী ও শক্তিময়ী এই বিশ্বসৃষ্টির অনুধারণা—এ সকল কথা এতদ্দেশের অনভিজ্ঞগণের শ্রবণেও নূতন শুনাইবে না। পীথাগোরস স্বয়ং বৈদিক ভারতের দীক্ষাপথেই তাঁহার 'বিশ্বসঙ্গীত'তত্ত্ব দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতেও একমত হইতে পারিতেছেন। তারপর, এদিকে এতদ্দেশের প্রাচীন বৈষ্ণব দার্শনিক বা কবিগণের ত কথাই নাই। তাঁহারা 'তত্ত্ব'কে বা তদ্বিষয়ে প্রাণের আদর্শকে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিক প্রকাশ দিতে পারুন বা নাই পারুন, আনন্দস্বরূপকে যে 'নিত্যবৃন্দাবনের বংশীধর' রূপে ধারণা করিয়াছিলেন, সকল কাব্যকবিতায় ও ভাষ্যচেষ্টায় এবং 'রাধাকৃষ্ণের পিরীতি' লীলার বর্ণনা পথে আনন্দবংশীধারী সেই অনন্ত রসময়ের চরণে নিজের প্রেমাকুলতার নৈবেদ্যই যে নিবেদন করিতেছিলেন তাহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। বংশীমুগ্ধ বিদ্যাপতি ডাকিয়া উঠিয়াছেন—

ঐ বুঝি বাঁশী বাজে!
বন মাঝে—কি মন মাঝে!

বংশী বিশ্বসৃষ্টির দিকে প্রেমময় চরমতত্ত্বের নিত্যকালের গুপ্ত বা প্রকাশ্য আহ্বান! তাই, উহাকে "কেহ শোনে, কেহ না শোনে"। মানবজগতের শ্রুতিধরগণ উহা শুনিতেছেন। তবে, ওই আহ্বানের কার্য্য-কারণ তত্ত্ব এবং সংসারভূমিতে উহার প্রবর্ত্তনার রহস্য কেহ স্থির করিতে পারে নাই আপাততঃ, যেন যোগ্যাযোগ্য বিচারই নাই; কালাকাল

বিচারও নাই ; কাহাকে বাঁশী কখন ডাকে—কে কখন উহা শোনে—বাঁশী কাহাকেই বা ডাক শোনার উপযুক্ত মনে করে—ইহজীবনের ঋতবিজ্ঞান কিংবা হেতুবাদ উহার রহস্য উদ্ঘাটিত করিতে পারে নাই। ধ্রুবপ্রহ্লাদ কেন শুনিয়াছিল, অন্যেই বা কেন শুনিতেছে না, ইহজীবনের দর্শনশাস্ত্র তাহার ঠিক পায় নাই। ডাক শুনিলে আর স্থির থাকার সাধ্য নাই ; যে বাঁশী শুনিয়াছে, সেই সংসারে মরিয়াছে ; তাহাকে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিতেই হইবে—কুঞ্জাভিসারী হইতেই হইবে। জীবাত্মার পক্ষে এই যে প্রিয়তমের ডাক, উহা অন্যদিকে পরম দয়ালের নির্দ্দয় ডাক। চোখে না দেখিয়াও কেবল ওই 'ডাক' শুনিয়াই আত্মহারা এবং ঘরছাড়া হওয়ার নামই 'পূর্ব্বরাগ'। উহা নিদারুণ অথচ পরম আনন্দময় awakening এর ব্যাপার—খ্রীষ্টান মীষ্টিকগণও যাহার সাক্ষ্য দিতেছেন। উহা এমন Vision বা Auditionএর ব্যাপার যাহা শুনিলে ইহজীবন উলটপালট হইয়া যায় ; যাহা বিষামৃত উভয় ; যে অবস্থায় নিদারুণ বেদনা ও পরম আনন্দ একাধারে। উহার 'চার' বুঝিয়াই বংশীমুগ্ধ জীব বলিতেছে—

> কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান
> অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন !
> ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর,
> পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর,
> রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি
> বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি !
> বধু তুমি যদি মোরে নিদারুণ হও
> মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও !

প্রিয়তমের সমক্ষে দাঁড়াইয়াও পূর্ণমিলনকামিনী প্রেমিকার এই অনন্ত বিরহতৃষ্ণার হাহাকার ! বুকে ধরিয়াও অনন্ত বিরহ !

উহাতেই—"দুঁহু কোলে দুঁহু কান্দে বিচ্ছেদ ভাবিয়া"।

উহাতেই—"কোলেতে লইয়া করে বসনের বা,
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা"!

উহাতেই—"নিমিখে মানয়ে যুগ, কোরে দূর মানি"।

যাহার গতিকে, বৈষ্ণব বলেন—

"এই প্রেম আস্বাদন—
তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ!"

প্রেমময়ের চরণে, নৃত্যবৃন্দাবনে এরূপ অনন্ত অতৃপ্তিশীল ভাবে অনন্ত আত্মদান! অনন্ত আনন্দের মধ্যে অনন্ত দুঃখ। উহাতেই জীবাত্মার অনন্তমিলন তৃষ্ণায়, একাত্মতা বা অদ্বৈতমিলনের পিপাসায় নিত্য হাহাকার—

কেবা নিরমিল প্রেম সরোবর
নিরমল তার জল,
দুখের মকর ফেরে নিরন্তর,
প্রাণ করে টলমল!

বলিয়া আসিয়াছি, প্রেমের 'পুত্তল'বাদী এবং মূর্ত্তিবাদী বৈষ্ণবকে এই অনন্তবিরহ এবং অতৃপ্তির আদর্শই মূর্ত্তিবাদের পরিমেয়তা হইতে রক্ষা করিতেছে। জ্ঞানপথিক মীষ্টিক নিজের পূর্ণ পরিশুদ্ধি (Purgation) করিয়া, সংসারবন্ধ হইতে নিজের বিমুক্তি সিদ্ধি করিয়া যেই অনন্তের লক্ষ্যে চলেন, ভক্তিপথিক মীষ্টিক সংসারকে ইচ্ছাপূর্ব্বক অগ্রাহ্য না করিয়া কিংবা কোনরূপ বৈরাগ্যতন্ত্র অবলম্বন না করিয়াও কেবল একনিষ্ঠ প্রেমায়ণ পথে সেই অনন্তের লক্ষ্যেই চলিতেছেন। তাঁহাদের মতে, জীবাত্মা সংসারের গৃহিণী হইয়া নিজের অনাদি-সিদ্ধ প্রিয়তমকে এবং আনন্দসুন্দরকে ভুলিয়াছে—দেহধর্ম্ম নিত্য তাহাকে পরমের বিষয়ে আত্মবিস্মৃত ও দিক্‌বিস্মৃত করিয়া রাখিতেছে। অতএব জীবমাত্রেই দ্বিচারিণী—তাহার প্রাণ উভয়চর। অথচ, প্রিয়তম নিত্য তাহাকে বাহিরকুঞ্জ হইতে প্রেমের বংশীরবে 'রাধা' 'রাধা' ডাকে

ডাকিতেছেন! এ স্থলেই একশ্রেণীর বৈষ্ণবের বহুজুগুপ্সিত সেই 'পরকীয়' তত্ত্ব। দুনিয়ার ধর্ম্মগৃহিণীর কর্ণে সংসারযমুনার পার হইতে তাহার নিত্যস্বামীর ঐ সর্ব্বনাশী বাঁশীর প্রণয়াহ্বানের কথায় এবং নিদারুণ প্রেমাকুলতার ব্যথায় বৈষ্ণব কবিতা ভরপুর। কোন মুসলমান বৈষ্ণবকবিই গাহিয়াছেন—

ও'পার হতে বাজাও বাঁশী এ'পার হতে শুনি—
অভাগিয়া নারী আমি সাঁতার না'হি জানি!

প্রিয় ভক্তের প্রতি, চিহ্নিতের প্রতি ঘরের বাহির হইবার জন্য অনন্তপ্রেমময়ের এই নির্দ্দয় ডাক! কি করিয়া 'চি'হ্নিত' হওয়া যায় কে বলিবে? হৃদয়ে ওই বাঁশীর নির্দ্দয় আঘাত লাভ করিবার জন্য, ওই বিষামৃত পানে দিব্যোন্মাদে ছটফট করিবার জন্যই বৈষ্ণব মীষ্টিকের চরম লক্ষ্য। ইহজীবনে, এই দেহধারী অবস্থাতেই ওই দিব্যোন্মাদ টুকু স্থিরসিদ্ধ করিতে পারিলে, দেহান্তরেও এরূপ নিত্যপ্রেমের অনন্ত মিলনানন্দে প্রেমময়ের অনন্তরসে মজিয়া চলিতে ও 'অমৃত' হইতে পারিবে! এজন্য বৈষ্ণব কবিতা নিখুঁত মানুষ ছাঁদের প্রেমের কবিতা। যেরূপেই হোক, নিরেট সাংসারিক ভাবুকতাপথ অবলম্বন করিয়াই হোক, হৃদয়ের প্রেমাকুলতা স্থিরসিদ্ধ করিতে পারিলে, প্রাণকে স্বার্থে মৃত এবং আত্মবিস্মৃত করিতে পারিলেই জীবের হৃদয় যমুনাপুলিনের কুঞ্জনিবাসী 'কালিয়া'র বংশীরব শ্রবণের যোগ্যতা লাভ করিতে পারে; প্রাণকে 'আদিরসে' ভরপুর করিতে পারিলেই উহাতে পরমের প্রেমকমল বিকশিত হইতে ও নিত্যপ্রফুল্ল থাকিতে পারে—ইহাই বৈষ্ণব প্রেমসাধকের মর্ম্ম। এজন্য বৈষ্ণব 'সাধক'মাত্রেই কিছু না কিছু কবি, প্রেমিক, গায়ক; কিছু না কিছু নৃত্যরসিক ও প্রেমোন্মাদ রসিক। পরমের প্রতি প্রপত্তি বা Emotional Surrender টুকুই তাহার লক্ষ্য বলিয়া 'He is of imagination all compact; এজন্য বৈষ্ণবের ধর্ম্মশাস্ত্র বলিতেছেন—

এবং বদন্ স্বপ্রিয় নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো প্রলপন্ সমুর্চ্চৈঃ।

হসত্যসৌ রোদিতি রৌতি গায়ত্যু
ন্মত্তবৎ রোদিতি লোকবাহ্যঃ ॥

ফলতঃ এই তন্ত্রের প্রেমিক মাত্রেই চরমে দিব্যোন্মাদে যেন 'লোকবাহ্য' হইয়া যান। জ্ঞানপন্থী যেমন চরমে সর্ব্বসন্ন্যাসী হইয়া 'লোকবাহ্য' হইতে লক্ষ্য রাখে, বৈষ্ণবও চরমে একানুরাগে 'লোকবাহ্য' হইয়া যায়। এরূপে অনুরাগ ও বৈরাগ্য, Zenith ও Antipodes এক হইয়া যায়। আবার, এজন্যই 'কালিয়া'তন্ত্রী 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থ একদিকে নিরেট সাহিত্যিকভূমির অলঙ্কার ও রসশাস্ত্র, অন্যদিকে প্রেমসাধকের ও পরমের প্রতি 'আদিরস'সাধকের ধর্ম্মগ্রন্থ। সাহিত্যরস ও ধর্ম্মরস গিয়া চরমে একতত্ত্ব! ভগবানের প্রতি কান্তাভাবের সাধক কভেণ্ট্রী প্যাট্‌মোরের আদর্শের সঙ্গেও এ স্থলেই বৈষ্ণবের পুরাপুরি মিল। ধর্ম্মসাধনাও দাঁড়াইয়া গিয়াছে—রসসাধনা। কেননা, "রসো বৈ সঃ"।

পারস্যে বংশীতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ কবি জেলালুদ্দিন রুমী। রুমীর মসনবীর প্রথম কতিপয় কবিতা বংশীমাহাত্ম্যে ভরপুর। কবি একস্থলে নিজেকেই বংশী বলিয়া অনুভব করিতেছেন। এই বংশী অন্তর্দ্দিক্ হইতে ভগবান বাজাইতেছেন, তাই উহা বহির্ম্মুখে শব্দ করিতেছে; ভগবানের ইচ্ছামারুতে পূর্ণ হইয়াই ফাঁকা বংশী বিশ্ববিমোহন ধ্বনি উদীরিত করিতেছে! ভগবৎস্পর্শের আনন্দপরিস্পন্দে নিজের প্রত্যেক অনুপরমানুতে উল্লাসিত হইয়াই ভক্তের প্রাণবংশী ছন্দিত এবং মুখরিত হইতেছে—এতদূর ঘনিষ্ঠতা এবং অন্তরঙ্গ স্পর্শানুভব! এরূপ অনুভবতন্ত্রের সহপথিক হইয়াই কি রবিকবি গাহিয়া উঠেন নাই—

আমারে করো তোমারি বীণা
লহ গো লহ তুলে।
উঠিবে বাজি তন্ত্রী রাজী
মোহন অঙ্গুলে।

ইহা স্পর্শযোগের কবিতা এবং স্পর্শ-ঝঙ্কারিত আত্মার আন্তরিক আনন্দস্পন্দযোগের কবিতা—যদিও মোহন অঙ্গুলে কথাটি আমাদিগকে আপাততঃ একটা দোটানায় ফেলিয়া চিত্তের স্পন্দযোগটি নিবারিত এবং কিঞ্চিৎ বিক্ষিপ্ত করিতেছে বলিয়াই মনে হইবে। টেনিসনের সেই—

Love took up the harp of life and smote on all the chords with might;

Smote the chord of self, that, trembling passed in music out of sight.

কথাগুলি, টেনিসনের অনেক কবিতার ন্যায় অতিমার্জ্জিত ও অলঙ্কার-ভারে কিঞ্চিৎ উৎপীড়িত হইলেও, প্রেমবংশীর আত্মবিস্মারী স্পন্দনটুকুর স্পর্শানুভাবে সচেতন ভাবেই লিখিত নহে কি?

পারস্যসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতা নাকি জেলালুদ্দিনের একটি বংশীরবের কবিতা! প্রবাদ আছে, সিরাজের অধিপতি কাব্যানুরাগী সামসুদ্দীন কবিবর সাদ্রীকে পারস্যসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতাটি নির্ব্বাচন করিতে অনুরোধ করেন। কবি সাদী যাহা পারস্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা বলিয়া নিজে সার্টিফিকেট দিয়াছেন, তাহা একটা বংশীগানের বর্ণনা। পাঠক বুঝিয়া লউন, ইহা কোন বাঁশী—

ঐ বাজে গো ঐ বাজে! (১)

আকাশ বেয়ে বাতাস ছেয়ে কি যেন এক আহ্বানগীতি
ঐ আসে গো ঐ বাজে!
কাজ হতে মন ছিনিয়ে দেয়, দুনিয়াদারী গুলিয়ে দেয়,
সে নিছনি আবার ঘেরি ঐ বাজে গো ঐ বাজে!
ও বুঝেছি নওরোজা আজ, ভেস্তোবাগে খোসরোজা!
ভেদ বিচার সব মুলতুবী আজ, গোস্থাখীছে নেইকো লাজ,
আমজিয়াফৎ খাশ কারো নয় সবার তরে পথ সোজা!

(১) মৌলভী বর্কতোল্লার অনুবাদই উদ্ধৃত হইল।

সবাই যাব ! বাঃ কি মজা, কি বিরাট যে মিছিল হবে !
শূন্য হবে জাহানকারা, আজ যে পথে নেই পাহারা !
কি যে হবে খুশী বাহার, তাই ভেবে গো দুঃখ আমার,
এই সুষমা দেখিয়ে যাব বিশ্বে এমন কেউ না রবে !

ইহা ত নিঁখুত বৈষ্ণব আদর্শের বাঁশী ! প্রেমময়ের নিত্যবংশী অখিল বিশ্বসংসারকে চূড়ান্তের মুক্তি বা প্রাপ্তির পথে আহ্বান করিতেছে। সকলের সকল গোস্তাখী মাপ। বিশ্ববাসী জীবের জন্য পরম আশার বাণী। টমসন কবির (francis) সেই বিখ্যাত Hound of Heaven এর ন্যায় প্রেমময়ের সেই final grace, সেই পরম দয়ার শীকারী কুকুর বিশ্বসংসার তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতেছে—মুক্তির অযোগ্য বা অনিচ্ছুক ব্যক্তিও কেহ কোথায় ঝোপেঝাড়ে লুকাইয়া রহিল কিনা। এমনি প্রেমবংশীর নির্দ্দয় আহ্বান ! জোড় করিয়াই অমৃত গেলাইবে ! বিশ্ববাসী সর্ব্বজীবের জন্য চরমপ্রাপ্তি ও পরম আনন্দের এই বাণী কবি জেলালুদ্দীন অনুপম ভাবেই দিয়াছেন (১)

সকল কাব্যপ্রকাশের মূল উৎস কবি-হৃদয়ের প্রেম—জীবনিসর্গের সর্ব্ববিধ প্রকাশের ভিত্তিভূত পরম 'আনন্দ'তত্ত্বের প্রতি প্রেম। কবির প্রেমই বিশ্বকাব্যের মূলীভূত আনন্দবস্তুকে সৌন্দর্য্যরূপে দর্শন করিয়া, উহাকে সকল কাব্যের আত্মাভূত 'রস'রূপে বুঝিয়া লয় ;

(১) যখন এসমস্তের সঙ্গে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রেমের আদর্শের সঙ্গে কিছুমাত্র পরিচয় ছিল না, অথবা বংশীর অর্থ বা theory ও জানিতাম না, তখনই দেশপ্রচলিত বংশীবদনের ভাবপুত্তল হইতেই আত্মপ্রাণে যাহা ধারণা করিয়াছিলাম, তাহাই 'স্বর্গমর্ত্ত্যের প্রেমগাথা' কাব্যের নানাস্থনে আছে। নিজের কোন রচনা ব্যাখ্যা করা আধুনিক সাহিত্যসমাজের শিষ্টাচার সম্মত নহে। এ দেশের প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ অবশ্য অনেকে স্বরচিত কবিতাই দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক ব্যবহারই যুগসঙ্গত মনে করিয়া আমরা সর্ব্বত্র স্বরচনার দৃষ্টান্ত পরিহার করিয়াই চলিতেছি।

সহানুভূতির পথে নবরসের বিচিত্র উচ্ছ্বাসমধুর মূর্ত্তিতে এবং স্ফুর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া কবির 'প্রেমই' মানবজগতে সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছে। প্রেম ব্যতীত কোন সৃষ্টি নাই। এ কারণে প্রেমই যেমন বিশ্বসৃষ্টির, তেমন, কবির কাব্যসৃষ্টির 'আদিরস'। যেই আনন্দের পরিস্পন্দে এই ভবসৃষ্টি ভাব-ক্রিয়া ও শব্দের প্রকাশরূপে, প্রাণ ও রশ্মির প্রকাশরূপে প্রকটিত হইতেছে, কবি নিজের প্রাণতন্ত্রীতে সহানুভূতিপথে সেই আনন্দস্পন্দনে ঝঙ্কৃত হইতে পারিলেই পাঠকের প্রাণতন্ত্রীতে স্পন্দন জাগ্রত করিতে পারেন। কবির আত্মানন্দই পাঠকের হৃদয়াভিমুখে প্রচারিত হইয়া (বৈষ্ণবী পরিভাষায় ব্যভিচারী হইয়া) উহাকে ভাবাবিষ্ট করিতে পারে। সুতরাং প্রধান কথাই হইতেছে, বিশ্বের আনন্দময়ী প্রকৃতির সঙ্গে কবিহৃদয়ের যোগ। আবার, কবির হৃদয়ে এই আনন্দযোগ ও রসাবেশের শক্তি স্বয়ং যথোচিত প্রাবল্য লাভ না করিলে কদাপি পাঠকের হৃদয়ে ভাষাপথে প্রচারিত হইতে বা উহাকে রসাবিষ্ট করিতে পারে না। এরূপ রসায়ণের অভাবেই কাব্য মৃতপুত্রবৎ ভূমিষ্ঠ হইতে বা জীবন্মৃত ভাবেই আত্মপ্রকাশ করিতে বাধ্য হয়। প্রকৃত রসাবেশ নাই, বাহ্যিক ছলাকলায় ও অছিলায় এবং সাজপোষাকে রসাবিষ্টের ধরণধারণ অনুকরণে চলিলেই উহার নাম হয় Sentimentality; উহাই ভাবপথের প্রধান সঙ্কট। কবির হৃদয়জাত ভাবানন্দের প্রাবল্যটুকুই ভাষায় ব্যভিচারিত হইয়া কাব্যের 'রস'রূপে পরিণত হয়। উহার তত্ত্বই ওয়ার্ডসোয়ার্থের কথায়—"Poetry is the impassioned expession set in the countenance of all science" কবির হৃদয়স্থ ভাবের এই excessকে লক্ষ্য করিয়াই সামুয়েল পামার লিখিয়াছেন—"Excess is the vivifying Principle of all art and we must always seek to make excess more abundantly excessive." অতএব কাব্যের রসাত্মকতার মূল কবির আত্মার মধ্যে। প্রকৃত কবিমাত্রের হৃদয় বিশ্বের আনন্দাত্মার বংশীরব মুগ্ধ গোপী। শেলী তাঁহার অনুপম Sensitive

Plant কবিতায় কবিহৃদয়ের এই আনন্দমুগ্ধতার ধর্ম্মকেই 'স্পর্শবোধি'রূপে লক্ষ্য করিয়াছেন। হৃদয় Sensitive Plant না হইলে কদাপি বিশ্বের আনন্দ-সুন্দরের সূক্ষ্ম স্পর্শে সচেতন হইতে পারে না; Sensitive না হইয়া কাব্য-চেষ্টা করিতে গেলেই উহার নাম হয় Sentimental. তাই, কবির হৃদয় সচেতন ভাবে প্রেম-আনন্দ-বংশীর তত্ত্বজিজ্ঞাসায় মুখর হইয়া উঠে। জ্ঞানদাস বিশ্বের আনন্দসুন্দরের প্রতি সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালের কবি-হৃদয়ের বংশীজিজ্ঞাসার আকুলতা টুকুই যেন একদিকে নিম্নের কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন—

মুরলী করাও উপদেশ

যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানাহ বিশেষ!
কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশি অতি অনুপাম
কোন রন্ধ্রে 'রাধা' বলে ডাকে আমার নাম!
কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশি সুললিত ধ্বনি;
কোন রন্ধ্রে কেকারবে নাচে ময়ূরিণী।
কোন রন্ধ্রে রসালে ফুটয় পরিজাত,
কোন রন্ধ্রে কদম্ব ফুটে হে প্রাণনাথ!
কোন রন্ধ্রে ষড় ঋতু হয় এক কালে,
কোন রন্ধ্রে নিধুবন ভরে ফুল ফলে!
কোন রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যামরায়।

জগতের জড়তন্ত্র মধ্যে প্রেম, আনন্দ, রস, সৌন্দর্য্য এক একটি Miracle; কবি অতর্কিতে প্রাণের স্বভাবতন্তুর পথেই উহাতে আবেশ লাভ করেন, অপরকেও আবিষ্ট করেন। উহা কবিত্বের রসায়ণী শক্তির নিত্যকালের রহস্য। যেমন বলিয়াছি ভাবুকের দৃষ্টিতে, এই বিশ্বসংসার নবরসতন্ত্রী আনন্দবংশীর পরিস্পন্দ হইতেই জমাট বাধিয়াছে, সে আনন্দেই জীবিত থাকিয়া, সেই আনন্দেই প্রবেশ করিতেছে। কবি এই বংশীবিদ্—তাহার হৃদয় বংশাশ্রবাঃ। জ্ঞানদাসের হৃদয় উক্ত কবিতায় যেন বিশ্বের

বংশীধরকে সাম্নাসাম্নি বিশ্বের রঞ্জনীশক্তির মূল রহস্য জিজ্ঞাসা করিতেছে! বংশীর রসরন্ধ্র বা রহস্যটুকু বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-নিদান সেই 'অদ্বয়' আনন্দতত্ত্বেই যে নিহিত আছে, কবির হৃদয় তাহা চিনিয়াছে।

৬২। সকল রসের মূলে একই 'আনন্দ'। ভীম এবং কান্তও মূলতঃ 'এক'।

সর্ব্বরসের উৎপত্তি স্থান একই 'আনন্দ'। কেবল করুণ, মধুর বা শান্ত পদার্থের মধ্যে নহে—জগতের যাবতীয় জুগুপ্সাকর, বিস্ময়কর বা রুদ্র-বীর-ভয়ঙ্কর বস্তুর মূলতত্ত্বেও যে 'আনন্দ' আছে, তাহা হৃদয় দিয়া বুঝিতে পারেন কবি-গণ; নিজের অন্তরপ্রকোষ্ঠে অনুভব করিয়া সাধারণ জীবপ্রকৃতির সমক্ষে উহাকে অনুভবযোগ্য ভাবে ধরিতে পারেন কবিগণ। ফলতঃ, সাহিত্যক্ষেত্রের রুদ্রবীর-ভয়ানক রসের অন্তর্মর্ম্ম অনুভব করিতে পারিলেই এ কথার রহস্যটি ধরা পড়িবে।

একই বস্তু বিভিন্ন দ্রষ্টার ভাবস্থান হইতে দৃষ্টির সমক্ষে কেমন বিচিত্র ও বিভিন্ন রস-ভাবে প্রকটিত হইতে পারে, তাহা বর্ণনা করিতে ভারতীয় কবিগণ অতুল আনন্দ লাভ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে দৈবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ, ন্যূনাধিক একাদশ বর্ষীয় বালকের অবস্থায়, যখন কংসসভায় প্রবেশ করিলেন, তখন একই কৃষ্ণবস্তু তাঁহার বিভুশক্তিতে সভায় বিভিন্ন অনুভাবকগণের হৃদয়ে কি বিচিত্র রস উদ্দীপিত করিতেছিলেন তাহা পৌরাণিক কবি অনুপম ভাবে বর্ণিত করিয়াছেন—

মল্লানামশনি, নৃ´ণাং নরবরঃ, স্ত্রীণাং স্মরো মুর্ত্তিমান্।
গোপানাং স্বজনো, হসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা, স্বপিত্রোঃ শিশুঃ॥
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাডবিদুষাং, তত্ত্বংপরং যোগিনাং।
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গংগতঃ সাগ্রজঃ॥

সেরূপ, ত্রিপুরদহন সময়ে ধূর্জ্জটির একই রুদ্র মুর্ত্তি কিভাবে বিভিন্ন দ্রষ্টাদের মনে বিভিন্ন রসাবেশে দেদীপ্যমান হইয়াছিল, কবি ভট্টনারায়ণ

বেণীসংহার কাব্যের মঙ্গলাচরণে তাহা অতুল্য তুলিকায় অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন—

দেব্যা সপ্রেম, কিমিদমিতি ভয়াৎ সম্ভ্রমাৎ চাসুরীভিঃ।
শান্তান্ত স্তত্ত্বসারৈঃ সকরুণ মৃষিভি, বিষ্ণুনা সস্মিতেন॥
আকৃষ্যাস্ত্রং সগর্ব্বৈরুপশমিত বধূসম্ভ্রমৈ দৈ ত্যবীরৈঃ।
সানন্দং দেবতাভির্ময় পুর দহনে ধূর্জ্জটিঃ পাতু যুষ্মান্॥

চণ্ডী ও বিষ্ণু উভয়েই ঈশ্বরস্থানে আছেন; তাঁহারা জীবের সুখদুঃখ উভয়কেই শিশুমতির অজ্ঞানজনিত বা অবিদ্যাকল্পিত বলিয়াই দেখিতেছেন, তাই তাঁহার পাগলনাথের চণ্ডমূর্ত্তি দেখিয়া দেবীর 'সপ্রেম' দৃষ্টি। আর, "দেখ দেখ, পাগলটা আমার সৃষ্টির একাংশই ধ্বংস করে ফেল্লে" ভাবিয়া বিষ্ণুর 'সস্মিত' দৃষ্টি। তত্ত্বসার ও শান্তচিত্ত ঋষিগণ জীবের দুষ্কর্ম্মফল দর্শনে 'সকরুণ' দৃষ্টি করিতেছেন স্বার্থসিদ্ধি ও শত্রুবিনাশ হেতু দেবতাগণের 'সানন্দ' দৃষ্টি। প্রলয়োন্মত্ত মহাবহ্নির ভীষণ উৎপাতদর্শনে অসুর সুন্দরীগণের, তাঁহাদের অবলাধর্ম্ম গতিকেই, ভীত ও সম্ভ্রমচকিত দৃষ্টি। অন্যদিকে, দৈত্যবীরগণ তাঁহাদের বীরধর্ম্ম বশেই ত ভয় কাহাকে বলে জানেন না; "ভয় কি? এ কিছু নয়! দেখ দেখ, এখনই কি করে তুল্‌ছি আমরা" এই বলিয়া দৈত্যগণ শৌর্য্যগর্ব্বিত দেহভঙ্গীতে ধনু আকর্ষণ করিয়া সকোপদৃষ্টিতে একই ধূর্জ্জটিকে লক্ষ্য করিতেছেন!

একই বস্তু, অথচ, পাত্রভেদে বিভিন্ন 'রস'। বৈষ্ণব ও শৈব উভয়েরই 'রস' বস্তু বিষয়ে এরূপ এককথা। এস্থানে লক্ষ্য করিতে পারি, পাত্রভেদে একই কাব্য বিভিন্ন রসজনক হইতে পারে বলিয়াই হয় ত কবিগণ নিজের কাব্য ব্যাখ্যা করিয়া উহার রসবত্তাকে সীমাবদ্ধ করিতে চাহেন না। টেনিসন বলিয়াছেন "Poetry is shot silk"—দৃষ্টিস্থান ভেদে উহা বিভিন্ন পাত্রে বিচিত্রবিভিন্ন 'রস' উদ্দীপনেই চমৎকারী হইতে পারে।

আবার, মূর্ত্তিবাদী ভক্তগণের অন্তর্লোকে রুদ্রবীরভয়ানক মূর্ত্তিগুলি কত 'আনন্দময়ী' ও উহারা ধ্যাননিষ্ঠের নিকট কত সহজে 'সিদ্ধি'দাত্রী হয়

তাহার সাক্ষ্য দিবে 'ভক্তি'পথের নৃসিংহ ও 'মহাবীর'-উপাসক বৈষ্ণবের হৃদয় এবং 'দশমহাবিদ্যা'র সাধক শাক্তগণের অন্তরাত্মা। যেখানে ভাবের কথা, ভাবের পথ এবং ভাবের রাজ্য, সেখানে 'প্রমাণ' সমবেত ভাবুক-মণ্ডলীর একমর্ম্মী হৃদয়।

ব্যাসবাল্মীকির যুদ্ধবর্ণনা বা বাল্মীকিরামায়ণের 'সুন্দর' কাণ্ডের শেষে কপিকটক সমক্ষে অকস্মাৎ প্রকাশমান মহাসমুদ্রের বর্ণনা এবং মহাবীরের সমুদ্রলঙ্ঘনে অভিযান, প্যারেডাইস্-লষ্ট্ কাব্যে অব্যাকৃত ভূতার্ণববক্ষে লুসিফারের অভিযান, ওয়ার্ডসোয়ার্থের Preludeএর West Wind বর্ণনার অনুযাত্রী শেলীর West Wind ও রবীন্দ্রনাথের বৈশাখী ঝড় প্রভৃতি সাহিত্যক্ষেত্রেই রুদ্রবীরভয়ঙ্করের অন্তর্মর্ম্মবাহী আনন্দের তত্ত্বে পাঠকের হৃদয়কে পরিচিত ও মুগ্ধ করিতেছে। শাক্তকবির সেই দানবদৈত্যদলনী, "শবারূঢ়া, মুক্তকেশী ও দিগম্বরী মহাকালী"র মূর্ত্তি মাতৃভক্ত বালকের কত হৃদয়ানন্দকরী, শিশুভূত ও মাতৃসমক্ষে শৈশবানন্দে উল্লসিত ভক্তের আত্ম-প্রকৃতির এবং অবারিত হৃদয়ের কত আদর-আব্দারের নির্ঝরী, তাহার প্রমাণ এতদ্দেশের রামপ্রসাদ ও নীলকণ্ঠের সঙ্গীত সমূহ। রাবণের নামকর্ত্তৃত্বে প্রচলিত 'রুদ্রতাণ্ডব'স্তোত্রটী আমাদের হৃদয়ের কোন্ মর্ম্ম স্পর্শপূর্ব্বক উহাকে আবিষ্ট করে? বিশ্বরঙ্গের 'নটরাজ' নাচিতেছেন—তাঁহার সেই নৃত্যচ্ছন্দে পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া হিমালয় পর্য্যন্ত নাচিতেছে; ক্ষুদ্র কুসুমকন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া তেজস্তত্ত্বের প্রচণ্ডপিণ্ড ওই সূর্য্য-চন্দ্র, সলিলতত্ত্বের শিশিরবিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া প্রচণ্ডানন্দের তরঙ্গ-রঙ্গী ওই মহাসিন্ধু, মৃদু আনন্দহিল্লোলের মলয়মারুত হইতে আরম্ভ করিয়া কালবৈশাখীর ওই রণচণ্ডী ঝঞ্ঝাতরঙ্গ—সমস্তই গুপ্ত কিংবা প্রকাশ্য ছন্দে তাঁহারই ছন্দতালে নাচিতেছে! কবিকল্পনার যেই রাবণ কৈলাস পর্ব্বতকে উপড়াইয়া মাথায় তুলিয়া নিজগুরুর তাণ্ডবতালে নাচিতে পারিয়াছিল, সেই প্রচণ্ডানন্দী রাবণের মহাপ্রাণ যেন নিজের ইষ্টদেবতার মহা-তাণ্ডবকে অন্তর্নেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াই উক্ত স্তোত্রে অনুপম পঞ্চচামর

ছন্দের ধ্রুপদনৃত্যতালে ধারণা করিতে পারিয়াছে! সেরূপই ত পুষ্পদন্ত-কৃত 'মহিম্ন স্তোত্র' ও শঙ্করস্বামীকৃত 'আনন্দ লহরী'; আবার শীলারের 'Dance'এর পথে রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বনৃত্য'। এসমস্ত কবিতা ভাব-ক্রিয়া ও শাব্দচ্ছন্দের পরম সহযোগের দৃষ্টান্ত। সংস্কৃতসাহিত্য ঈদৃশ 'যোগ'শক্তি-শালী কবিতার অনুপম ভাণ্ডার। স্তোত্ররচয়িতা ভক্তকবি ও ঋষিগণের হৃদয় বৈদিকযুগ হইতে সারস্বততন্ত্রীর আনন্দপরিস্পন্দে হৃদয়কে মন্ত্রিত এবং স্পন্দিত করিয়াই ভাবাতীত ও শব্দাতীতের অমৃতলোকে প্রয়াণ করিতে চাহিয়াছে। বেদের 'নাসদীয়' সূক্ত, 'হিরণ্যগর্ত্ত' সূক্ত ও 'পুরুষ সূক্ত', 'দেবী সূক্ত' ও 'পবমান সূক্ত' প্রভৃতির দীক্ষাপথেই রামায়ণের 'আদিত্য হৃদয়স্তোত্র' ও মহাভারতের 'বিশ্বরূপ' হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিংশদধিক স্তুতিগাথা। এরূপে পুরাণতন্ত্রাদির এবং অর্ব্বাচীন কবিগণের অগণিত-সংখ্যক 'দেবস্তোত্র' একই আনন্দতত্ত্বকে রসস্বরূপের অনন্তভাববৈচিত্র্যময় ও বহুধাবিভিন্ন দিব্যমূর্ত্তিতে ধারণা পূর্ব্বক একই 'অমৃতনাভি'র উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছে।

ভক্তের হৃদয়ে "ভয়ানা ভয়ং, ভীষণং ভীষণানাং' রুদ্রদেবই আনন্দময় ও 'আশুতোষ' কেন?" শৈবগণের 'নটরাজ' বা 'মহাকাল'মূর্ত্তি, বৈষ্ণবগণের 'নৃসিংহ' বা শাক্তগণের 'মহাকালী' প্রভৃতি ভক্ত উপাসকের এত প্রাণারাম কেন? ভক্তগণের উক্ত সকল 'স্তোত্র' অন্তরের আনন্দাত্মার সহিত শান্ত-স্তিমিত অথবা উল্লসিত ছন্দতালের বিবাহ ঘটাইয়াই হৃষ্ট হইয়াছে। এক্ষেত্রে ভক্তির একটী অন্তরঙ্গ বার্ত্তা এই যে, দেবতার ভীষণ মূর্ত্তিগুলিই নাকি 'আশুতোষ' এবং ভক্তগণের আশু 'ইষ্টদাত্রী'। উঁহারা নাকি বংশীবদন অথবা ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি শান্তসুন্দর দেবতা অপেক্ষাও সহজে 'হাজির' হন। কবি "এ'ই" (Russel) এরূপ "ভীষণং ভীষণানাং" রুদ্রতত্ত্বের 'আশুতোষ' ধর্ম্মটুকুই তাঁহার এক কবিতায় অনুপম ভাবে চিনিয়া ফেলিয়াছেন (১)

(১) ভারতীয় সাহিত্যসেবীর পক্ষে ভারতের এই দেবতাবাদ এবং দেবতার ব্যক্তিত্ব বা মূর্ত্তিকল্পনা কিংবা দেবস্তোত্র ও মূর্ত্তিপূজার অর্থটুকু, অন্ততঃপক্ষে উহার Theoryটুকু বুঝিয়া লওয়া অপরিহার্য্য। ভারতীয় সাহিত্যপাঠককে সর্ব্বত্র এ ব্যাপারের সম্মুখীন হইতে

সর্ব্বপ্রকার 'রস' যে একই 'আনন্দ' হইতে আসিতেছে, আনন্দের সেই তত্ত্বার্থ হয়ত সাহিত্যরসিকগণই সহজে বুঝিতে পারিবেন। কবি মাজ-ফিল্ডের Dauber কাব্যে আটলান্টিক মহাসাগরের তুফান বর্ণনা দেখুন! জোসাফ কনরডের Mirror of the Sea অথবা Nigger of the

হইবে। এই মূর্ত্তিপূজা সম্পূর্ণ মৌষ্টিক। প্রচলিত কথায় যাহাকে Idolatry বলে, ভারতীয় মূর্ত্তিপূজাকে সেই Idolatry বলা যায় কিনা সে বিষয়ে জিজ্ঞাসুমাত্রকে একটা সিদ্ধান্তে আসাও নিতান্ত প্রয়োজন; যেহেতু, খ্রীষ্টান মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মতন্ত্রে উহা একটী 'পাতক' রূপেই নিন্দিত। মীমাংসা শাস্ত্র বলিতেছেন, দেবতার কোন 'রূপ' নাই; ভক্তহৃদয়ের শ্রদ্ধা এবং শ্রদ্ধাশ্রিত 'মন্ত্র'ই দেবতার 'রূপ'। সে স্থলে আবার 'বাহ্য'রূপ কল্পনায় এবং 'মূর্ত্তি' খাড়া করিয়া যে 'পূজা' হয় সেই মূর্ত্তিও সুতরাং দেবতার 'স্বরূপ' নহে; ভক্তেরই 'ইষ্টরূপ'। ভক্ত বলিবেন, 'ভগবান, তুমি অরূপ; কিন্তু, তুমি অনন্ত শক্তিময় এবং তুমিত বিশ্বরূপে প্রকট হইয়াছ; তোমার অনন্ত দয়ায় আমার এই 'ইষ্ট'রূপে হাজির হও; আমার ইষ্টমূর্ত্তিতে জাগ্রৎ হও।" এ স্থলেই ভারতীয় সকল 'ইষ্ট'পূজার বা 'মূর্ত্তি' পূজার রহস্য। ওইরূপে দেবতাকে 'ইষ্ট'রূপে জাগ্রৎ না করিয়া কেবল কর্ত্তব্যবোধে বা ধর্ম্মগ্রন্থের উপদেশের অনুরোধে 'Father who art in Heaven" বা 'আল্লাহু আকবর' ইত্যাদি মতে স্তুতি করিয়া ভক্তের অন্তরাত্মা প্রকৃত প্রস্তাবে কোনরূপ 'প্রাপ্তি'র বুদ্ধিতেই উপনীত কিংবা 'সন্তুষ্ট' হয় না; কোন প্রকার Audition বা Vision দেখিয়া বা 'প্রার্থিত লাভ' করিয়াও নিজকে 'আপ্তকাম' মনে করে না; সময়ান্তরে সমস্তই Hallucination বা 'কাকতালীয়' ব্যাপার বলিয়াই সংশয়িত হইতে পারে। ঋষি বলেন, ভগবানকে 'পাইতে' হইবে। আবার, ঐরূপে 'ইষ্টমূর্ত্তিতে জাগ্রৎ'ভাবে না পাইয়া যদি শতবৎসর 'উপাসনা' করিয়া চলা যায়, অথবা "পত্র পুষ্পফলে দেখি যে সব রেখা, রেখা নহে তোমার দয়াল নামটী লেখা" ইত্যাদিমতে ভগবানের মহিমা চিন্তা করিয়াও চলা যায়, তা' হইলেও ভক্তের হৃদয় প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহার 'অস্তিত্ব' বিষয়েই নিঃসংশয় হয় না; তাহার সংশয় বা 'হৃদয়গ্রন্থি' ছিন্ন হয় না; একদা ঐ সমস্ত কেবল 'ভাবুকতার ব্যারাম' রূপে ও আত্মপ্রতারনা রূপেই ভক্তের নিকটে দাঁড়াইয়া যাইতে পারে। দয়াময় ভগবান্ যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে 'থাকেন', তবে তাঁহাকে প্রত্যক্ ভাবে ও নিঃসংশয় ভাবে 'পাইতে' হইবে; সে ক্ষেত্রে 'ইষ্টমূর্ত্তিতে জাগ্রদ্ভাবে পাওয়া'ই নিঃসংশয় এবং ঘনিষ্ঠভাবে পাওয়া। আর যদি না-ই পাওয়া যায় তবে ধর্ম্মপ্রবক্তাদের পরামর্শে উপাসনা চালাইয়া যাওয়াটাও কেবল অন্ধবিশ্বাস এবং আত্মবঞ্চনা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? অতএব ভারতে

Narcissus নবেলেও সামুদ্রিক তুফানের একএকটী খাঁটি 'ভুক্তভোগী'র বিবরণই আছে—কন্‌রড স্বয়ং একজন সমুদ্রনাবিক ও জাহাজের 'কাপ্তান' ছিলেন। শরৎ চন্দ্রের 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাহিনী' নবেলেও বঙ্গোপসাগরে সেরূপ সাইক্লোনের একটী চমৎকারী বর্ণনা এবং ঝড়ের আনন্দে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বৃত্তান্তই যেন আছে। লেখক যেন স্বয়ং ঝটিকানন্দে উন্মত্ত হইয়া গিয়াছেন! এসকল বর্ণনা মানুষের কোন্ নাড়ী স্পর্শ করিয়া আনন্দ দান করে? যিনিই সামুদ্রিক ঝটিকাবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া উহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ই সাক্ষ্য দিবে যে, প্রাণ একদিকে ভীত-স্তম্ভিত হইয়া এবং মূর্চ্ছিতের কাছাকাছি উপস্থিত হইয়া মুখে অবিরাম পরিত্রাহি রব বাহির করিতে থাকিলেও, আমাদের

'ইষ্টমূর্ত্তিতে দেবতা জাগরণের' পদ্ধতি ঋষিকর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। 'সিদ্ধি'র পর ঐরূপ মূর্ত্তিটাকে জড়বস্তুজ্ঞানে অম্লান মুখে বিসর্জ্জন দেওয়ার রীতিও আছে। এজন্য, দেখিবেন, পুরাণাদিতে সর্ব্বত্র ভক্তগণ ভগবানকে 'ইষ্ট' মূর্ত্তিতেই দর্শন চাহিতেছেন; অপর কোন মূর্ত্তি বা প্রকাশ কিংবা অনুগ্রহ লাভই ভক্তকে তৃপ্তি দিতে পারিতেছে না। এরূপ অনেক 'সিদ্ধ' ব্যক্তি এখনও নাকি এ'দেশে আছেন।

বলা বাহুল্য, এরূপ 'ব্যক্তি'পূজার কিংবা মূর্ত্তিপূজার একজন 'গুরু' ও 'পূর্ব্ব সূরি' চাই, যিনি বলিবেন—'আমি দেবতাকে এই-এই মূর্ত্তিতে জাগাইয়াছি'। তাঁহার পথেই পরবর্ত্তী 'সাধক'গণ চলিতে পারেন। অতএব, পুরাণাদিতে দেখা যাইবে যে প্রত্যেক মূর্ত্তি উপাসনার এক একজন 'আদি প্রবর্ত্তয়িতা' আছেন। এইরূপ মূর্ত্তিপূজা ও সিদ্ধিলাভ যে নিরাকার ঈশ্বরস্তুতি কিংবা 'উপাসনা করিয়া যাওয়া' হইতে ও অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার এবং উহা যে পুরাপুরি 'মৌষ্টিক' ব্যাপার তাহাও বুঝিতে হয়; অথচ, আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত সোজা এবং একেবারে বিরূপ বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে!

সাধকের মহাপ্রাণতা বা অধ্যাত্মশক্তি সিদ্ধি ব্যতীত, আত্মার ইচ্ছাশক্তির সর্ব্বাধিকারী বল-সাধনা ব্যতীত কোন মূর্ত্তিসাধনায় সিদ্ধ হওয়া যায় না; আবার, মানসিক, নৈতিক ও আত্মিক উন্নতি বা 'ধর্ম্ম'শক্তি ব্যতীত এই 'অধ্যাত্মশক্তি'ও দাঁড়ায় না। তারপর, মূর্ত্তি জাগিলেই যে তুমি চূড়ান্তকে পাইলে, তাহাও নহে; তুমি 'প্রাপ্তি'পথে বহুপরিমাণে অগ্রসর হইলে, এইমাত্র। অতঃপর সেই 'মূর্ত্তিদেবতা'ই তোমাকে 'বুদ্ধিযোগ' দানে ব্রহ্মস্বরূপে লইয়া যাইবেন—"দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।"

অন্তরাত্মা ভীমকান্তের এবং পূর্ণানন্দভয়ঙ্করের নিকটস্পর্শেই যেন অভূত-পূর্ব্ব ভাবে রম্যমান হইতে থাকে! আত্মার এই রহস্য না বুঝিলে কখনও ঋষির 'আনন্দ' বার্ত্তা প্রকৃত প্রস্তাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে না। মহাযুদ্ধের তুমুল ক্ষেত্রে (কতক স্বেচ্ছায় কতক বা ঘটনাচক্রে) ঘন-সংলিপ্ত ও উন্মত্তবৎ পরিব্যস্ত যোদ্ধবর্গও হয়ত এই ভৈরবসুন্দরের স্পর্শানুভবেই অকুতোভয়ে কামানের গোলা আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়া যায়! যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাকৃত ভয়সঙ্কোচের সমস্ত বাধাবিচার পদদলিত করিয়া যোদ্ধগণ যেন অজানিত-পূর্ব্ব ভৈরবানন্দেই যে ছুটিয়া চলে—গান করিতে করিতেই যে যুদ্ধ করে, স্বয়ং-যোদ্ধা টলষ্টয় তাঁহার War and Peace নবেলের একস্থলে সেই সত্য-চিত্র পরম শিল্পিতুলিকায় অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন।

যাঁহারা শিক্ষিত মনুষ্যের (পরলোকের অস্তিত্ব বিষয়ে যাঁহাদের কোন রূপ চিত্তকর্ষণা ঘটিয়াছে এমন মনুষ্যের) সজ্ঞান মৃত্যু দেখিয়াছেন, যে-কোন 'ধর্ম্ম'আদর্শের 'জ্ঞানী' বা 'ভক্ত' জীবের ঐরূপ মৃত্যু দেখিয়াছেন, তাঁহাদের অভিজ্ঞতাকে লক্ষ্য করিয়াই একটা কথা বলিতে পারি যে, মৃত্যু জীবমাত্রের নেত্রে 'ভীষণ হইতেও ভীষণ' বলিয়া প্রতিভাত হইলেও, মৃত্যু আসন্ন জানিতে পারিলে জীব কেমন শান্তভাবে মৃত্যুকে গ্রহণ করে! যেন প্রেমালিঙ্গনেই বরণ করে! হিন্দু 'গঙ্গাযাত্রী'র বা যে-কোন পরলোকবাদী ধর্ম্মের 'বিশ্বাসী'গণের মৃত্যু যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনিই বলিবেন, তখন আর মুমূর্ষু ব্যক্তির ভয় বলিয়া পদার্থটা যেন থাকে না, প্রিয়জনের আসন্ন বিরহের বেদনাটুকুও যেন প্রবল থাকে না, সংসারের প্রতি নির্ব্বিকারে ও নির্ব্বিচার ভাবে 'পিছু দিয়া'ই জীব যেন সাগ্রহে মৃত্যুকে গ্রহণ করে! মৃত্যুর ভয়টুকু সৃষ্টিসংসারবাসী জীবের পক্ষে যেন 'অবিদ্যা'জনিত একটা আগন্তুক পদার্থ।

এস্থলেই ঋষি বলিবেন—আনন্দ—সমস্তই পরমানন্দের বিকাশ। যেমন দার্শনিকের, তেমন কবি কিংবা সাধকের হৃদয় জগতের অন্তরঙ্গে

অবগাহনকারী জীবমাত্রের অন্তরাত্মা সাক্ষ্য দিবে—জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তার নাম 'আনন্দ'।

দূর হইতে দৃষ্টিপাত করিলে কথাটুকু ঈষৎ কেবল কল্পনামত্ততা ও রোমাণ্টিক ভাবুকতা; কিন্তু, যাঁহারা জাগ্রত্ভাবে জগৎতত্ত্ব চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারাই ঐকথা বলিবেন। মহাভারতের 'দ্রষ্টা' কবি ক্ষাত্রধর্ম্মী বীরপুরুষ অর্জ্জুনকে 'দিব্যদৃষ্টি' দান করিয়া বিশ্বরহস্যের যেই ভৈরবরূপ তাঁহার চরিত্রানুমতেই দর্শন করাইয়াছিলেন, তাহাতে সৌভাগ্যবান্ অর্জ্জুন যুগপৎ ভীত, মূর্চ্ছিত ও হর্ষিত হইলেন কেন?

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।

এই রুদ্রানন্দের নামই Sublime—মহাসুন্দর। মহাসুন্দরের মধ্যে ভীম ও কান্ত, প্রিয়ঙ্কর ও ভয়ঙ্কর উভয়ের সম্মিলন; এবং উভয়েই মূলে গিয়া বস্তুতঃ 'এক'।

বিশ্বসৃষ্টির মহাতত্ত্বের প্রকট মূর্ত্তি জীবের চর্ম্মচক্ষুতে সহ্য হইবে না বলিয়াই যেন পার্থিবপ্রকৃতি পরমদয়ায় আমাদের চক্ষুতে একটা 'ঠুলি' নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন; অথবা, জীবের চক্ষু স্বয়ং নিজের দৃষ্টির একটা সীমা গড়িয়া তুলিয়াছে। তাই, অনন্ত আকাশের ওই 'উল্‌টেপড়া' বৃহৎ কটাহের ন্যায় সসীম মূর্ত্তি; ওই নেত্রানন্দকৌমুদী সুরভিপথ; তন্মধ্যে দুগ্ধবিন্দুর ন্যায় পরিকীর্ণ নক্ষত্রপুঞ্জ! নচেৎ একএকটী নক্ষত্রই ত একএকটী মহাসূর্য্য! আমাদের ওই সূর্য্য, এই সৌরজগৎ-কর্ত্তা সূর্য্য এবং মহাব্যোমে আমাদের এই সৌরজগতের নিকটতম প্রতিবেশী ওই 'ধ্রুব নক্ষত্র'! উহাদের মধ্যে কি প্রলয়ঙ্করী লীলাই একএকটী সৌর-জগতের সৃষ্টিস্থিতিকল্পে অভিনীত হইতেছে! আকাশে কোটিকোটি সবিতার এই মহাগ্নিলীলা আমাদের চর্ম্মচক্ষু সমক্ষে প্রকৃতি কী অপরূপ শান্তসুন্দর ভাবে মোলায়েম করিয়া, তাঁহার 'বাসর রজনীর দীপমালা' রূপেই প্রকট করিতেছেন! সৃষ্টির মধ্যে সীমা ও অসীম, প্রিয়ঙ্কর ও ভয়ঙ্কর, চঞ্চল ও অচল এমন নিগূঢ়ভাবে সম্মিলিত এবং ওতপ্রোত যে

উহা জীবের হৃদয়মন কিংবা দৃষ্টিকে কোন রূপে নির্জ্জিত কিংবা অভিভূত করে না। যে জাগিতে চায় তাহাকে প্রতি পদে খোঁচাইয়াই জাগাইয়া রাখে; আবার, যে ঘুমাইতে চায় তাহাকেও নির্ভাবনায় ঘুমপাড়াইয়া রাখে। ফল কথা, ওই কোমলসুন্দর এবং রুদ্রসুন্দরে কোথাও অপরূপ ঐক্য আছে। কোথাও হয়ত উভয় গিয়াই 'এক'; Zenith ও Antipodes উভয়েই সম্মিলিত হইয়া 'এক'—'আনন্দঃ—পরমানন্দঃ'! ভারতের অদ্বৈতবাদী যোগী বলিবেন, দুঃখও 'আনন্দমূলক'। দুঃখ এবং বেদনাকেও আনন্দস্বরূপে অনুভব করেন বলিয়াই তাঁহাদের উপাধি 'আনন্দ'। জীবন ও জগৎকে আনন্দীভূত করাই ত উচ্চশ্রেণীর জীবমাত্রের 'সাধনা'!

সাহিত্যক্ষেত্রে কবিগণ সৌন্দর্য্যপ্রিয় এবং সৌন্দর্য্যের পূজারী। কবিগণের এই সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার মূলে জগন্ময় আনন্দবস্তুরই অতর্কিত অনুভূতি। এই 'আনন্দ' কবিগণের হৃদয়ভাণ্ডে আসিয়াই বিভিন্ন বর্ণধর্ম্মে ও নামরূপে, নবনব মূর্ত্তিতে এবং বাণীপন্থায় আত্মপ্রকাশের স্ফূর্ত্তিতে লীলায়িত হইতেছে। অতএব, সেই অদ্বৈত ও নিরঞ্জন 'আনন্দ' বস্তুই যেমন সৃষ্টিজগতের তেমন সাহিত্যজগতের নবনব বৈচিত্র্যময় নামরূপে বিবর্ত্তিত হইতেছে। আনন্দের মূলধর্ম্মই প্রকাশলীলা—অতএব আনন্দ-লীলাময় বিশ্বজগৎ ও সাহিত্যজগৎ। ব্রহ্মানন্দ না বুঝিলে জৈব ক্ষেত্রের বিষয়ানন্দ, কামানন্দ বা সাহিত্যানন্দ কিংবা অদ্বৈতানন্দের কোন লীলা-প্রকাশই বুঝা যাইবে না।

কবি ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের Prelude ও Excursion কাব্য এইরূপ 'আনন্দ'-বাদী এক পরিব্রাজকের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন অঙ্কিত করাই লক্ষ্য করিয়াছিল। কেবল আনন্দস্বরূপকে উপলব্ধি করার জন্যই প্রব্রজ্যা—যেমন অন্তর্জগতে তেমন বহির্জগতে। এরূপ একটি জীবের মহাজীবন লইয়া, Prelude ও Excursion উভয়কে বেড়িয়া এবং একাত্মতায় অন্তর্ভুক্ত করিয়াই ওয়ার্ডসোয়ার্থের সঙ্কল্পিত মহাকাব্য

৬৩। বিশ্বসৃষ্টির জীব ও নিসর্গের সকল প্রকাশই যে 'এক'মূলক ও আনন্দমূলক সে বিষয়ে পাশ্চাত্য কবি ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থ।

Recluse দাঁড়াইতে চাহিয়াছিল। কবি উক্ত লক্ষ্য সমাধা করিতে পারেন নাই। অধ্যাত্মজগতের অদ্বৈতসিদ্ধি লক্ষ্যে কোনরূপ প্রব্রজ্যার জন্ত ইয়োরোপীয় সভ্যতার মধ্যে হয়ত এখনও কোন অবকাশ নাই বলিয়াই পারেন নাই। কবি পদার্থমাত্রকে আনন্দের পরিপ্রকাশ রূপেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন; কিন্তু, কাব্যে পদার্থের অন্তরস্থ ওই আনন্দতত্ত্বকে চিহ্নিত করিয়া এবং 'মুটি চাপিয়া' ধরিতে কিংবা উহাকে ভাষাপথে পরের অনুভবযোগ্য ভাবে পরিপ্রকাশ দান করিতে সকল স্থলে যে পারেন নাই, তাহা স্বীকার করিতে হয়। তথাপি, যে টুকু পারিয়াছেন উহাতেই জগতের সাহিত্যে তাঁহাকে একজন মৌলিক প্রতিভাসম্পন্ন কবিরূপে প্রতিষ্ঠা দিতেছে। তাঁহার অনেক কবিতার রসতত্ত্ব সকল পাঠকের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া তাঁহার সঙ্গে সহানুভূতিতে সংযুক্ত করিতে পারিতেছে না। কবি পারেন নাই, কখন বা তাঁহার নিজের অপূর্ণ ও অসমর্থ অনুভূতির দোষে; কখন বা ইংরাজী ভাষার ভাণ্ড-দোষে—হয়ত মনুষ্যের বাণী-ব্যাপার মাত্রের প্রকৃতিগত দোষে; পারিয়াও পারিতেছেন না, অনেক স্থলে বরং পাঠকেরই অচৈতন্ত এবং অনবধানতার দোষে। ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থ ছিলেন জীবহৃদয়ের এবং নিসর্গের শান্তসৌন্দর্য্য ও আনন্দধর্ম্মের অনুভবরসিক কবি। তিনি অনেক সময় নিতান্ত 'ঘরোয়া' এবং 'মেঠো' বিষয় ধরিয়াই তাঁহার 'আনন্দ'কে আকারিত করিতে এবং বুঝাইতে গিয়াছেন; ফলে, অনেক সময় তাঁহার নিজের 'আনন্দ বোধি'ই প্রবল হইয়া এবং "পূরোৎপীড় হইয়া পরীবাহ" লাভ করিতে পারিতেছে না; পাঠকের চিত্তে তাঁহার বাক্যশর সমুচিত প্রবলভাবে পৌঁছাইতে পারিতেছে না; তাহার রীতি এবং আলম্বনবস্তুর মৃদুত্ব গতিকেই উহা দুর্ব্বল কলায় পতিত হইতেছে। অতএব, যেখানেই কবি আপাতদৃষ্টিতে নিষ্ফল হইয়াছেন, সেখানেই তাঁহার নিষ্ফলতার এই 'রহস্যাংশ' না বুঝিলে আমরা কবির প্রতি অবিচার করিব। ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থ ছিলেন অত্যন্ত Serious মর্জ্জির কবি; সর্ব্বত্র একটা 'তত্ত্বভাবনা'ই তাঁহার 'কবিদৃষ্টি'র প্রধান লক্ষণ। কোনরূপ Humour, চিত্তের কোনরূপ নর্ম্মকৌতুক কিংবা

Fancy নামক মনোভাবের কোন প্রকার তারল্যলীলা তাঁহার মধ্যে কদাচিৎ দেখা যাইবে। তাঁহার আদর্শ ছিল—"Poetry is Emotion recollected in Tranquillity." উহার গতিকে, যে স্থানেই তিনি 'নিষ্ফল' হইয়াছেন, সে নিষ্ফলতার রহস্যকেও (সমালোচক পেটারের ভাষায়) কবির 'Solemn owlishness' রূপেই ব্যক্ত করা সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু, বুঝিতে হইবে, কবি 'আনন্দ'বাদী—যে আনন্দকে তিনি "Joy in widest Commonality Spread" রূপে এবং জগতের অন্তস্তত্ত্ব রূপেই নির্দ্দেশ করেন। এ কবির অনেক উৎকৃষ্ট কবিতাই জীবদুঃখের কবিতা; পরন্তু, তিনি জীবের দুঃখের মধ্যেও এই 'আনন্দ'কে দেখিয়াছেন। আনন্দ-অনুভবে তদপেক্ষা সচেতন এবং স্থিতধীঃ কবি ইয়োরোপের সাহিত্যজগতে আর নাই। উহার গতিকেই জন্ মর্লির ভাষায় সেই অতুলনীয় "Healing Power of Wordsworth's Poetry"—দার্শনিক মিল্ ওয়ার্ডসোয়ার্থের যে গুণ প্রাণেপ্রাণে বুঝিয়াই সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। তবে, স্বয়ং সমালোচক মর্লিও ওয়ার্ডসোয়ার্থকে পূরাপূরি বুঝিতে পারেন নাই। জগৎতত্ত্বের এই 'আনন্দ'বস্তু এবং উহার 'বোধি' যে মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মশিক্ষক ও পথপ্রদর্শক হইতে পারে, ওয়ার্ডসোয়ার্থকবির সেই মস্তবড় কথাটার অর্থই উক্ত সমালোচক যেন বুঝিতে পারেন নাই। উহা না বুঝিলে ওয়ার্ডসোয়ার্থের কবিতার অতুলনীয় Penetrating Power কিংবা Healing Power এর প্রধান রহস্যটাই ত অজ্ঞাত থাকিবে। বৈদিক দর্শনের 'দৃষ্টি' ব্যতীত এ রহস্য বুঝা যাইবে না।

ধ্যানী কবি (Meditative Poet) ওয়ার্ডসোয়ার্থ তাঁহার Prelude ও Excursion কাব্যে নিজের অন্তর্জীবনী জগৎকে দিয়া গিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কবি প্রথমতঃ প্রকৃতির অভ্যন্তরে এই 'আনন্দ'তত্ত্বকে চিনিয়াছিলেন; জীব-নিসর্গের সকল পদার্থ যদ্দ্বারা ওতপ্রোত এমন এক পদার্থকেই যেন অন্তর্দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন; উহার বার্ত্তাই কবির সকল কবিতার প্রধান মাহাত্ম্য। এই

'রস'টুকুই কবিকে জগতের সাহিত্যমধ্যে একটা বিশিষ্টতা দিতেছে। ওই 'তত্ত্ব' অনুভব করার প্রধান পথটুকুও কবি দেখাইয়াছেন—উহা "Pensive Idleness," "Wise Passiveness," "Happy Stillness of the Mind"—যাহার অন্য নাম, ভারতীয় ঋষির পরিভাষায়, একোদ্দিষ্ট চিত্তনিরোধ বা যোগ। চিত্তকে পদার্থে 'তন্ময়' করিতে পারিলেই অন্তরাত্মা দেখিবে সেই 'এক' বস্তু—

> "Spirit, that knows no insulated spot,
> No chasm, no Solitude, from link to link,
> It circulates the Soul of all the worlds."

এ'রূপ অভিনিবেশপথেই প্রাণ বুঝিতে পারে, "There is a spirit in the woods" এবং জীব-নিসর্গের প্রত্যেক পদার্থ ওই 'এক' Spirit দ্বারাই ওতপ্রোত। আরও বুঝিতে পারে—

> "An Impulse from the Vernal wood
> Can teach you more of man
> Of moral evil and of good
> Than all the sages Can."

ইহা জগতের মহাধর্ম্মতত্ত্বে গতির পথ এবং জীবের মহাপ্রয়াণের শিক্ষা ও দীক্ষার পথ। সমালোচক মর্লি ওয়ার্ডসোয়ার্থের এ শ্রেণীর কথাগুলিকে 'Poet's fun' বলিয়াই উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু, ভারতের ঋষি আরও অগ্রসর হইয়াই বলিতেন, ওই বস্তুটি কেবল 'এক' নহে, উহার নামই 'আনন্দ'। আরও বলিতেন, সেই "আনন্দাদেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি"। এই আনন্দ-উপলব্ধি হইতে কেবল যে জীব-জীবনের মহাজ্ঞান লাভ হইবে তাহা নহে, তাহার মহাধর্ম্মও সুসিদ্ধ হইবে; সকল শিক্ষার চূড়ান্ত শিক্ষা, "which no Books or Sages can," কেবল ওইরূপ উপলব্ধি হইতেই সমাপন্ন হইবে। উহাতেই জীবের হৃদয় বিশ্বতন্ত্রের সমধর্ম্মতা লাভ করিয়া বিশ্বের ধর্ম্মসুরে ও ব্রহ্মতালে

বাজিতে শিখিবে। পেটার যতই উহাকে Solemn owlishness বলুন, কিংবা জন্ মর্লি যতই উহাকে Poet's fun বলুন, ঋষি বলিবেন, এরূপ আনন্দ-যোগই জীবজীবনে পরমার্থরূপে, পরম ধর্ম্মশক্তি বা Ethical Power রূপে দাঁড়াইতে পারে। এজন্যই গীতা জীবমাত্রের পক্ষে "বিবিক্ত দেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি"কে অধ্যাত্ম-ধর্ম্মতা লাভের শ্রেষ্ঠপথ রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আবার, জগতের পদার্থকে, প্রকাশ মাত্রকে অন্তর্যোগে ও উহার সত্যযোগে ধরিবার প্রচেষ্টা এবং উহাকে নিরলঙ্কার ভাষায় সামনাসামি ধরিবার জন্য একটা স্থির লক্ষ্য কবি ওয়ার্ড্সোয়ার্থের মধ্যে অসামান্য-ভাবে দেখা যায়। জীব ও নিসর্গ উভয়ের আত্মায় যুক্ত হইয়া উহাদের অন্তঃস্থিত 'সত্য প্রেম আনন্দ' তত্ত্বের ধারণা এবং সাহিত্যে উহার পরিপ্রকাশের সচেতন সাধক এই ওয়ার্ড্সোয়ার্থ। প্রথম হইতেই জাগ্রত হইয়া ও উত্থান করিয়া সে দিকেই আত্ম-পরিচালনার প্রধান ও মৌলিক কবি ওয়ার্ড্সোয়ার্থ। এ কবির সম্পূর্ণ মাহাত্ম্য খ্রীষ্টান সাহিত্য-জগৎ এখনও ধারণা করিতে পারে নাই। কবি বুঝিতেন, পদার্থ মাত্রেই 'আনন্দময়'; তাই, Michael ও Affliction of Margaret প্রভৃতি অতুল্য কবিতায় তিনি দুঃখের অন্তরঙ্গীয় আনন্দের স্বরূপটিই ধরিতে চাহিয়াছেন। জীবের পক্ষে প্রেম যে স্বয়ং একটি ধ্রুব সম্পত্তি ও অমৃতের শক্তি, প্রেমের দুঃখ এবং বেদনার মধ্যেও যে আনন্দ আছে, সে আনন্দই যে হাজার দুঃখদুর্দ্দশার মধ্যেও প্রেমিকের জীবনকে ধারণ করে, ওদু'টি কবিতা তাহাই দেখাইতেছে। প্রেমের দুঃখসহিষ্ণুতা ও সহ্যতাশক্তির তলে তলে ভাগবতী আনন্দধারাই যে নিত্যদয়ায় জাগ্রত থাকিয়া জীবকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়, ওয়ার্ড্সোয়ার্থের অনেক কবিতা তাহাই দেখাইতেছে। আর, Lines written in early Spring, Expostulation and Reply, Tables Turned, Tintern Abbey প্রভৃতি কবিতা প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সেই আনন্দাত্মার সমাচারই মানবকে দিতেছে। এ সকল স্থলেই ওয়ার্ডসোয়ার্থ জগতের একজন মৌলিক

কবি এবং বড় কবি। এ কবির অন্তঃপ্রজ্ঞা তাঁহার wise Passiveness হইতে কি অসামান্য ভাবেই চেতনা লাভ করিয়াছিল তাহার মূল্য ভারতের বেদান্তশিষ্য ব্যতীত অপরের হৃদয়ঙ্গম হইবে না। ঋষির 'আনন্দ'কেই কবি অন্যভাবে বলিয়াছেন—"Grand elementary Principle of Pleasure by which man knows and feels, lives and moves"; উহার প্রেরিতই "Impulse from the vernal wood". এ'জগতে দুঃখ ও বেদনার অবস্থানেও (ঋষি যাহাকে অবিদ্যা বা Spirit of Negation-জনিত বলিয়া নির্দেশ করেন) কবির মূল বিশ্বাসকে নাড়িতে পারে নাই। প্রেম-আনন্দ-আত্মদান—ইহা যেমন ভূতভাবনের তেমন প্রত্যেক ভূতের অন্তর্নিহিত 'সত্য'। এ সত্যই অমৃত এবং অমৃতপুত্র গণের খাদ্য।

Prelude জীব ও নিসর্গের আনন্দাত্মার মন্দিরে প্রয়াণকামী কবির 'আত্মশিক্ষার' ইতিহাস; Excursion কাব্যের পরিব্রাজক (Wanderer) Prelude কাব্যের মূল ভাবসূত্রটি ধরিয়াই বিস্তারিতভাবে জগতে পরিভ্রমণ করিতেছে। নিসর্গই পরিব্রাজকের সর্ব্বোত্তম শিক্ষক; নিসর্গ-শিক্ষায় জীবের হৃদয় যেই শান্ততা এবং অধ্যাত্মতা লাভ করে, সর্ব্বভূতে যেই মৈত্রী, করুণা ও মুদিতাদৃষ্টি এবং যেই স্থিরচিত্ততা লাভ করে, ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের সহপথিক হইতে পারিলেই পাঠক তাহার অংশভাগী হইবেন। Excursion কাব্যের প্রথম সর্গে কবি পরিব্রাজকের সেই আত্মকর্ষণা এবং মনোজীবনে সিদ্ধিলাভের চিত্রটি অনুপম ভাবেই অঙ্কিত করিয়াছেন। গিরিশিখরে সমাসীন পরিব্রাজকের সেই নিসর্গনিবেশী দৃষ্টি তাহাকে কোথায় লইয়া গিয়াছে?

> His spirit drank
> The spectacle; sensation, soul and form
> All melted into him ... ...
> His mind was thanksgiving to the Power
> That made him, it was Blessedness and Joy.

রূপের ভিতর দিয়া এই অরূপের অনুভব, ক্ষুদ্রের ভিতর দিয়া এই অনন্ত-যাত্রার পথ! জগতের নন্দপুরী-যাত্রার পথে কবি ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের কবিতা (উহাদের উৎকর্ষ-বলে) আমাদের 'প্রাণ'-বস্তুর অপরূপ ধ্যানসঙ্গী ও মহাভাব-বিরঙ্গী সুহৃদ্ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; আনন্দের উপলব্ধিপথে দিগ্‌দিগন্তবিসারী জ্যোতির্লীলায় উর্জ্জস্বলতা লাভ করিয়াছে! শেলীর কবিতা যেমন হৃদয়কে প্রবল বায়বীয় ধর্ম্মে ঊর্দ্ধ আকাশে, সময় সময় মহাশূন্যেই উড্ডীন করিয়া দেয়, রবীন্দ্রনাথের কবিতা যেমন উহাকে নাচারী আনন্দের সলীল ধর্ম্মে ও আকুলতায় নাচাইতে থাকে, কীট্‌সের কবিতা যেমন উহাকে সম্ভোগমত্ততায় আবিষ্ট করিতে চায় ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের কবিতা তেমনি হৃদয়কে অন্তরঙ্গীয় পথে গভীরগাহী করিয়া তোলে; প্রাণের 'গুরু' সাজিয়া প্রশান্ত চিদানন্দের পথেই যেন (কবি রামপ্রসাদের ভাষায়) পাঠকের হৃদয়কে বলিতে থাকে "ডুব্, ডুব্, ডুব্ রূপ সাগরে"! ডুবিবার সূত্রে ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থ যেই 'ভাব'টুকু, যেই 'ভার'টুকু যোগ করিয়া দিতে পারেন, সাহিত্য-রসিক সহৃদয়গণের অন্তরাত্মাই কেবল তাহা বুঝিতে পারে; আর জানে, এ গুণটি কেবল ইয়োরোপীয় সাহিত্যপ্রকোষ্ঠে কেন, জগতের সাহিত্যদরবারেই অতুলনীয়। ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের কবিতার প্রধান শক্তি এই ধ্যাননিষ্ঠা এবং কবির একটা সুস্থ, সবল ও আত্মারাম দৃঢ়তা, যাহার গতিকে দশটী পঙ্‌ক্তি পাঠ মাত্র পাঠক বুঝিতে থাকে—এ ত একটি অনুপম জীবনযাত্রীর দেখা পাইয়াছি! এ কবিতা কেবল ছন্দ-বিলাসিনী এবং শব্দরঙ্গিণী গীতিকা মাত্র নহে; কেবল ভাবুকতাবিলাসী (Sentimental) অহংমত্ততার রীতিও ইহার নহে; জীবজীবনের সকল জাজ্বল্যমান দুঃখদুস্থতা স্বীকার করিয়াও অচল ও শাশ্বত 'আনন্দ'-তত্ত্বের উপরে এবং জীবনিসর্গের আন্তরিক অধ্যাত্ম'সত্য' ও 'ধর্ম্ম'তত্ত্বের উপরেই ইহার ভিত্তি; জগৎস্রোতে আত্মস্থৈর্য্য এবং আত্মোপলব্ধিই উহার 'প্রকৃতি'। ভারতবর্ষের বাহিরে, ভারতের অদ্বৈতসাধক, বীর্য্যবান্ আর্য্যঋষির গাত্রগন্ধ একা ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন কবির

মধ্যে মিলিবে না—যাহার দরুণ দ্বৈতবাদী খ্রীষ্টান সমাজে Pantheist বলিয়াই তাঁহার নিন্দা। কবির ওই পরিব্রাজকটি (Wanderer) প্রকৃতির অন্তর্মর্ম্মগত এবং ওতপ্রোত সেই 'আনন্দ'বস্তুর অনুভবচৈতন্যে জাগ্রত থাকিয়াই ত তাহার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছে—যাহার নাম দিতে পারি, আনন্দবস্তুর সঙ্গে সেই 'ভাবসম্মিলন' লক্ষ্যেই 'প্রয়াণ'! ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের পরবর্ত্তী সকল কবি—শেলী কীট্‌স টেনিসন প্রভৃতি এদিকে তাঁহারই অনুযাত্রী হইয়াছেন; তাঁহারই শিষ্যতার পরিচয় দিতেছেন। শেলীর সকল কাব্যের মর্ম্ম আলোচনা করিয়া দেখাইতে পারা যায় যে, শেলীও ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের 'আনন্দ'বস্তুকেই ভিন্নরূপে তাহার Spirit of Beauty of the Universe অথবা Spirit of Love রূপে বুঝিয়াছিলেন; মানুষ উক্ত তত্ত্বের সাধনায় 'পূর্ণতা' লাভ করুক ইহাই তাঁহার আদর্শ ছিল। এই Perfectionism আদর্শ ভারতীয় 'অধ্যাত্ম সাধনা'র নামান্তর বই নহে। কীট্‌সও অন্যদিক হইতে এই সৌন্দর্য্যতত্ত্ব (বেশীভাগে বাহ্য সৌন্দর্য্য) এবং "first in Beauty is first in Might" আদর্শই তাঁহার কাব্যাদির মর্ম্মে অনুসরণ করিয়াছেন। শেলী ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থ উভয়ের নিকট বহিঃপ্রকৃতি একটি সজীব 'ব্যক্তি' এবং এ ব্যক্তিটি আবার ওই সূক্ষ্ম Spirit দ্বারাই ওতপ্রোত। এ দিকেই উভয় কবি সমগ্র ইয়োরোপীয় সাহিত্যে স্বতন্ত্র মাহাত্ম্যেও বিশিষ্টতায় দাঁড়াইয়া আছেন; তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টির এ বৈশিষ্ট্য ব্রাউনীং-টেনীসন বা আর্ণল্ড-রসেটি-সুইন্‌বার্ণ্‌ কিংবা প্যাট্‌মোর কাহারও মধ্যে ফোটে নাই।

কাব্যক্ষেত্রে ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের এই একটি স্বাতন্ত্র্যময় ও মৌলিক পদ্ধতি যাহাতে পাঠকের চিত্তে সংসর্গপথেই Joy, Peace, Strength ও Exaltation লইয়া আসে। ইংরাজী কথাগুলির বিশিষ্টার্থের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করায় উদ্দেশ্যেই এ উক্তি করিতেছি। আর্ণল্ড কবি ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের এ শক্তিকেই যেন Penetrating power, এবং জন্ মর্লি Healing power বলিয়াছেন। এ শক্তির প্রধান রহস্যটাই হইতেছে Intensity—অনু-

ভূতির গভীরতা বা ঘনতা। পাঠক স্বয়ং মনোযোগী হইয়া উহার স্বানুভব লাভ করিতে না পারিলে এ কবির সদর দরজা হইতেই তাঁহাকে ফিরিতে হইবে। এজন্য, ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের এমন অনেক কবিতা আছে যাহাকে কোন অনুরক্ত সমালোচক হয়ত প্রাণ খুলিয়া ধন্যবাদ দিয়াছেন; অপর কেহ একেবারে নির্ব্বাসন-দণ্ড জারী করিয়াছেন! জগতে এমন কবি বিরল যাহার নিন্দা বা প্রশংসা এত চরমপন্থী হইতে পারে। কিন্তু সকল নিন্দারই মূলে দেখিবেন—অধিকস্থলে পাঠকেরই যোগ্যতার অভাব, কবির প্রতি সহানুভূতির অভাব। সুন্দর কবিতা মাত্রেই কবির একটা বিশেষ ভাবানুভূতির প্রকাশ; সহানুভূতি ব্যতীত উহাতে 'প্রবেশ' নাই, প্রকৃত 'রসিকতা' নাই, 'সহৃদয়তা'ও নাই। সহানুভূতির অভাবে সকল কবিতাই হাস্যকর প্রতিপন্ন হইতে পারে। কবিতা ভাবজগতের বস্তু; এমন কবিতা নাই যাহাকে বিপরীত-বিতণ্ডারবুদ্ধিতে বিদ্রূপ করিতে পারা যায় না এবং একেবারে বেকুবীর ব্যাপার সাব্যস্ত করিয়া আণ্ডামানে দেওয়া যায় না। ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের কবিতা বা কোন মৌলিক প্রতিভার কাব্যব্যাপার মাত্রেই পাঠকগণ হইতে প্রথমেই গুরুদক্ষিণার দাবী করে, শক্ত প্রবেশমূল্যের দাবী করে—পাঠকের যোগ্যতা।

মনে পড়িতেছে কোন ইংরেজ সমালোচক দেখাইয়াছেন যে, শেলীর সঙ্গে ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের প্রতিভার পার্থক্য উভয়ের Skylark আদর্শের মধ্যেই গুপ্ত আছে। শেলীর আদর্শ, কেবল Soring higher and higher, আর ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থ "True to the kindred point of Heaven and home." উহা উড়া'র কবিতা নহে, ডুব দেওয়ার—"Sinking Deep." এ'কবির প্রকাশরীতিও এমন যে উহাকে প্রথমদৃষ্টিতে কেবল Intellectuality বা দার্শনিকতা বলিয়াই ভ্রম হয়; কিন্তু ঘনিষ্ঠতা এবং হৃদ্যতা জন্মিলেই দেখা যায়—এ' যে অপূর্ব্ব! ইহার তলে যে 'রস'—একেবারে অমৃতসাগর। এ মৌলিকতা অপর কোন কবি দেখাইতে পারেন নাই। ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের কবিতার বাক্য-রহস্যও, বলিয়া আসিয়াছি, "Expression of Emotion recollected in

Tranquility." কবির বাক্যসিদ্ধি বিষয়ে পেটার ঠিকই বলিয়াছেন, যেখানে জমিতে পারিয়াছে, উহা একেবারে Perfect Expression—নিখুঁত। আপাততঃ একেবারে 'মন-মরা' এবং নির্জীব-নিষ্ক্রিয় ও শান্ত পথে চলিতে চলিতেই পাঠক যেন হঠাৎ পাইয়া বসে এ'রূপ এক একটী নিখুঁত বাক্য—চিত্তের 'স্মিতিবন্ধনী' ও অতুলনীয় রীতির এক একটা কথা—স্থায়ী শক্তির প্রমূর্ত্তিময় বাক্যনির্ম্মিতি ও ভাবের ঘনীভূত ধারণায় সরস্বতীর ভাণ্ডারে স্বাতন্ত্র্যোজ্জ্বল এক একটী হীরকখণ্ড এবং কালস্রোতের আঘাতসমক্ষে হীরকের মতই সহিষ্ণু পদার্থ! তাঁহার মধ্যে সাধারণ শ্রেণীর রোমাণ্টিকতা কিংবা অদ্ভুতসুন্দরের ধারণা নাই বলিলেই চলে। তিনি নিজের 'কবিকর্ম্ম' লইয়াছিলেন—"To open out the soul of little and familiar things' এবং উহাতেই পরিপূর্ণ সাফল্য দেখাইয়া গিয়াছেন। উহাতেই বুঝিতে পারি, কবির ভাবকর্ম্মের রঙ্গভূমি খুব বিস্তৃত কিংবা বৈচিত্র্যে সুবিশাল নহে; অমায়িকতা এবং 'ডুব দেওয়া'র ক্ষমতা লইয়াই ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের কবিত্বশক্তির মাহাত্ম্য এবং পূজ্যপদবী। জাব ও নিসর্গের হৃদয়ের সঙ্গে আপন প্রাণের যোগসাধনা এবং শান্তস্বাস্থ্যর নির্বৃতিময় আনন্দধারণা! আমাদের দেশের যোগানন্দ ও অদ্বৈতানন্দের এত নিকটবর্ত্তী অপর কোন ইয়োরোপীয় কবি হইতে পারেন নাই—শেলীও নহেন। জীবের জীবনপ্রসঙ্গে কোন রূপ যুদ্ধাযুদ্ধির মত্ততায় ও রক্তারক্তির উদ্দীপনায় গা চালিয়া না দিয়া এবং সম্পূর্ণ 'শান্ত নাড়ী' লইয়াও যে সারস্বত লোকের চূড়ান্ত 'আনন্দ' লাভ ও রসসাধন করিতে পারা যায় ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের কবিতা উহার নিদর্শন। য সময় স্কটের রোমাণ্টিক কথা ও কথাসমূহের মনোন্মাদিনী ভাবুকতা অথবা বায়রণী প্রতিভার জ্বলন্ত চুল্লীর ধক্‌ধক্ জ্বালাদীপ্তি ইয়োরোপের দৃষ্টি ঝলসাইয়া দিতেছিল, সে সময়েই নিসর্গের হৃদয়সেবী, প্রশান্ত আনন্দরসিক ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থ সাহিত্যজগতে একটা অভিনব ভাবুকতা ও কবিত্বের অজানিত বাণীপন্থা খুলিয়া গিয়াছেন; রসিকতার নূতন একটী ইন্দ্রিয়দ্বার আবিষ্কৃত ও অবারিত করিয়া গিয়াছেন!

কবির এই নবশক্তির মূলতত্ত্ব রসক্ষেত্রে কোনরূপ তীব্রতা বা তরঙ্গোচ্ছ্বাস নহে, গভীরতা—ঘনতা ; Sublimity নহে Intensity. জড়বাদী বলিতে পারেন, উহা একটা Mystic Sense ও Visionary Power. বুঝিতে হয়, এইরূপ Mystic Senseই ওয়ার্ড্সোয়ার্থ কবির প্রধান শক্তি এবং উহাই সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার সর্ব্বস্ব। এরূপ মীষ্টিক বুদ্ধিবশেই এ' কবি যেমন পদার্থের সৌন্দর্য্যের মূল রহস্যটী ধরিয়া উহাকে পাঠকের বুদ্ধিস্পর্শে আনিয়া দিতেন, তেমনি, উহার বশেই বুঝিতেন যে বিশ্বজগতের সকল পদার্থ 'এক'তত্ত্বেরই অনুপ্রকাশ—

> Were all workings of one Mind
> The features of the same face, blossoms upon one tree,
> Character of the great Apocalypse,
> The types and symbols of Eternity
> Of first and last and middle and without end.

আমাদের ভাষায় এই ত 'অদ্বৈত' দৃষ্টি। মীষ্টিক দর্শন ও সর্ব্বপ্রকার মীষ্টিসিজমের মূল এরূপ 'একতত্ত্ব' দর্শনেই নিহিত। সাহিত্য-ক্ষেত্রে এস্থলেই ওয়ার্ড্সোয়ার্থের সর্ব্বপরমা সিদ্ধি। আবার, এ'জন্যই হয়ত ওয়ার্ড্সোয়ার্থ Pre-minently Poet of solitude ; তিনি বিবিক্তসেবী ; তাঁহার সমস্ত কবিতার প্রধান সিদ্ধিভূমি টুকুও Solitude।

কীট্সও সৌন্দর্য্যের পূজারী ; তবে তিনি শেলীর ন্যায় Intellectual Beautyর, কিংবা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় 'মানসী সুন্দরী'র উপাসক নহেন।

৬৪। প্রেম ও সৌন্দর্য্য আদর্শে কীট্স ও শেলী।

কেবল মানসী সৌন্দর্য্যমূর্ত্তি নহে, সৌন্দর্য্যকে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (দৃশ্য, শ্রব্য ও স্পৃশ্য) রূপে প্রমূর্ত্ত করিতে হইবে। "Oh for a life of Sensations rather than of thought"—ইহা কীট্স কবির প্রাণের কথা। উহাতেই কীট্স পরিপূর্ণ প্রতিমাবাদী ও সাকারপ্রিয় শিল্পী—সাহিত্যক্ষেত্রে একেবারে শ্রেষ্ঠজাতীয় শিল্পী। কেবল সৌন্দর্য্যের সঙ্কেত করিয়া বা ঈষারা-ইঙ্গিত দিয়াই কীট্স

সন্তুষ্ট নহেন, সৌন্দর্য্যকে একেবারে প্রমূর্ত্ত করিয়া, মনোমূর্ত্ত করিয়া, "বিষয়বতী ও মনের স্থিতিবন্ধনী" প্রমূর্ত্তিতে ধরাইয়া দিয়াই উৎকর্ষ-ক্ষেত্রে শিল্পী কীট্‌স্ ক্ষান্ত হইয়াছেন। কবি অল্পায়ু এবং তাঁহার কাব্যকৃতি স্বল্প হইলেও উক্তরূপ শিল্পগুণ ও মহাত্ম্য বিচার করিয়াই সহৃদয়জগৎ কীট্‌সকে একজন শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর কবি বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতেছেন। পদার্থের রসতত্ত্বে তাদাত্ম্য ভাবে যুক্ত হইয়া উহাকে অব্যাকুল ভাষা ও ছন্দের মধ্যে প্রমূর্ত্ত করার শক্তিতে এবং অপরূপ রসায়নী প্রকাশপদ্ধতির গৌরবেই এই অল্পায়ু কবি সাহিত্য জগতে শ্রেষ্ঠশ্রেণীর কবিজাতি মধ্যে পরিগণিত হইয়া যাইতেছেন।

শেলীর আলেষ্টার, কীট্‌সের এণ্ডীমীয়ন্, কালিদাসের মেঘদূত তিনটীই সাহিত্যক্ষেত্রে কবিহৃদয় কর্ত্তৃক আদর্শ সৌন্দর্য্যরাণীর অন্বেষণ। এণ্ডিমীয়নের সীন্থিয়াই (Cynthia—the Moon) কীট্‌সের সৌন্দর্য্যতত্ত্বের সিম্বোল বা প্রতিমা। আবার, যেমন শেলীর Sky-lark, তেমন কীট্‌সের Ode to Nigthingable কবিতাও উভয় কবির আন্তরিক রীতি ও 'আদর্শ সৌন্দর্য্য' প্রাপ্তির জন্য দীর্ঘনিশ্বাসই অনুপম ভাবে প্রমাণিত করিতেছে। কীট্‌সও তাঁহার Spirit of Beautyকে 'এক' বলিয়াই মনে করিতেন; সকল সৌন্দর্য্যতৃষ্ণা ও অন্বেষণার মধ্যে কীট্‌স সেই 'এক'কেই খুঁজিয়াছেন। এণ্ডীমীয়নে সেই 'চন্দ্রা'ই (Cynthia) সকল সাধনা ও অন্বেষণার পরিণামে Indian Maid রূপে, পরিমূর্ত্ত বিগ্রহপথে নায়ক এণ্ডীমীয়নকে দেখা দিয়াছেন ও ধরা দিয়াছেন। সাধনপথে এই 'যোগ্যতা'লাভের পূর্ব্বে এণ্ডীমীয়ন 'চন্দ্রা'কে দেখিয়াও চিনিতে পারেন নাই। কবি বলিতে চাহেন, সেই 'এক'সুন্দরীই জগতে বহুরূপে লুক্কায়িত আছেন; তাঁহাকে মূর্ত্তিপথে এবং ধ্যানপথেও ধারণা করিতে হয়; যেমন উন্নততর মনোজীবনের মধ্য দিয়া, তেমনি প্রাকৃতজীবনের জড়তাধর্ম্ম এবং দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়াও খুঁজিতে হয়; এক কথায়, সমস্তজীবনের অন্তস্তলবাসিনী 'নায়িকা' রূপে এই 'এক'সুন্দরীকে বুঝিতে হয়। এদিকে কীট্‌স যেন

আমাদের শাক্তগণের 'মহাবিদ্যা' ও 'নায়িকা সুন্দরী' আদর্শেরই নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন। এণ্ডীমীয়ন নিজের গুহাবাস পরিত্যাগ করিয়া পরম তৃষ্ণায় বা একনিষ্ঠ সাধনার অতৃপ্ত আগ্রহে উঁহাকেই জগতে খুঁজিয়াছেন ও পরিশেষে লাভ করিয়াছেন। শাক্ত আদর্শের মর্ম্মবিৎ কালিদাসও সেরূপ নিজের 'বিদ্যা প্রকৃতি' ও জীবনের 'নায়িকা সুন্দরী'কে মেঘের মুখে, হৃদয়ের মহাতৃষ্ণাময় অন্বেষণার দীর্ঘায়িত অভিযান-পথে, দূরান্তরিত অলকাপুরীর অনশ্বর সৌন্দর্য্যলোকেই পরিশেষে লাভ করিয়াছেন। এই সমস্ত ত কেবল "Thirst of the Moth for the Star!" শেলী, কীট্স, কালিদাস প্রত্যেকের পক্ষেই আদর্শীভূত 'সৌন্দর্য্য রাণী' পরম অন্বেষণা ও সাধনার ধন; অতএব, জীবনের তপঃখেদ ও বিরহবোধের মধ্য দিয়া এবং দীর্ঘ অন্বেষণার ফলস্বরূপে যে সৌন্দর্য্যকে পাওয়া যায় তাহাই প্রকৃত সৌন্দর্য্যসিদ্ধি ও প্রাপ্তি—ইহাই যেন কীট্সের সৌন্দর্য্যতত্ত্ব। কালিদাসেরও তাহাই নহে কি?

শেলীর নিকট জগতে দুঃখ একটা ভয়ঙ্কর পদার্থ; দুঃখকে তিনি মনুষ্যের পাপকৃত বলিয়াই মনে করেন। তবে শেলী চরমোন্নতিবাদী, Perfectionism তত্ত্বে বিশ্বাসী। তাই, প্রমীথীয়সে জগতে দুঃখপাপের ধ্বংস করিয়া চরমে পুণ্যতত্ত্বেরই বিজয় ঘোষণা করিয়াছেন। শেলীর আদর্শ প্রকৃত প্রস্তাবে Beauty নহে; উহার অনেক নাম আছে, কিন্তু, প্রকৃত নাম Love (১). কবি এবং শিল্পী কীট্সও সৌন্দর্য্য-তত্ত্বকেই চরমজয়ী বলিয়া তাঁহার হাইপীরীয়ন কাব্যে প্রবল করিতে চাহিয়াছিলেন; যাঁহারা অধিকতর 'সুন্দর' সেই 'দেবতা'গণের হস্তেই টাইটান্‌গণের পরাজয়; কারণ—

"The first in Beauty is first in Might." কালিদাসের কুমার-সম্ভবে, পার্ব্বতীর তপস্যাজাত 'কুমার'ই সেরূপ সৌন্দর্য্য ও ব্রহ্মচর্য্যের বীর্য্য-বত্তায় পরম 'শক্তিধর' এবং দৈত্যদানববিজয়িরূপে বিঘোষিত হইয়াছেন

(১) শেলী বিষয়ে এই গ্রন্থের ৫২-৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কীট্‌স যেন আমাদের এই 'কুমার' আদর্শের কাছাকাছিই আসিয়াছিলেন তারপর, কীট্‌স যেন বলিতে চাহিয়াছেন, জীবনের সকল দুঃখকষ্টকে অন্তরঙ্গভাবে কেবল 'রস'তত্ত্বের বহির্ব্বাস রূপে বা রসের স্থূলশরীর রূপে গ্রহণ করিতে পারিলে জীবজীবনের সমস্তই সুতরাং কেবল Beautyতে পর্য্যবসিত হইবে। ইহা যে এতদ্দেশের 'আনন্দ'বাদিগণের কথা তাহ পূর্ব্বে পূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি। অতএব, বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, শিল্পী কীট্‌স কেবল 'রস'কেই Beauty বলিয়া মনে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন তাঁহার Isabella ও St. Agnes Eve একটী দুঃখান্ত ও অপরটী সুখান্ত হইয়াছে। কীট্‌সের আদর্শে উভয়েই ত Beautiful। ইহাও ভারতের 'আনন্দ'বাদিগণেরই মর্ম্মকথা। উহার সঙ্গে তাঁহার "Oh for a life of Sensation" সংযোগ পূর্ব্বক দেখিলেই কীট্‌সকে একেবারে এতদ্দেশের 'সহজরসিক' বৈষ্ণব সম্প্রদায়বিশেষের কাছাকাছি আনিয়া দেয়—যাহার গতিকে তাঁহারা একেবারে জড়রসিক হওয়াও যেন দোষের মনে করেন নাই। অবশ্য, এই Sensationটুকু শিল্পী কীট্‌সের পক্ষে কেবল Imaginative experience ব্যতীত অপর কিছুই নহে। ভাব, চিন্তা, দার্শনিকতা—এ সমস্ত কবির পক্ষে কেবল আদর্শ সৌন্দর্য্যের অলকাপুরীর প্রবেশপথেই সহায়। শিল্পী কীট্‌স্, নিজের কথায়, Application, Study, Thought পথে এরূপ সৌন্দর্য্যসিদ্ধিই লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

এ সূত্রে এই সৌন্দর্য্যপূজারী কবির পরম শিল্পিলক্ষণ এবং শ্রেষ্ঠশ্রেণীর কবিলক্ষণ টুকুও বুঝিয়া যাইতে হয়—যাহাতে তিনি একদিকে শেক্স-পীয়রের সমধর্ম্মা এবং সহোদর। 'রস'সাধক কবির জীবনাদর্শ কি হইবে? কীট্‌স বলেন, "He will interest himself in everything whether it is good, bad or indifferent." কবির 'ব্যক্তিত্ব' কিরূপ হইবে? কীট্‌স বলিবেন, "It has no Self, it is every thing or nothing; because it has no Identity. He is as much delighted in conceiving an Iago, as an Imogen". ইহা

পুরাপুরি শেক্স্‌পীয়র নহে কি? আবার, এস্থলে, সর্ব্বপ্রকার রসানুভূতির মূলগত সেই 'আনন্দ'তত্ত্বের সাধক কবির হৃদয়মর্ম্মও অবারিত হয় নাই কি? বৈদিক ঋষির 'আনন্দ' অপেক্ষা বড় কথা যেমন জগৎ-দর্শনের, তেমন সাহিত্যদর্শনের পুঁজিতেও মিলিবে না।

ইংলণ্ডের এ তিনজন উচ্চশ্রেণীর কবির মধ্যে আমরা ভারতের 'আনন্দ' 'প্রেম' 'রস' বা 'রূপ'তত্ত্বের সাধক কবি ও মীষ্টিকের অতর্কিত সমর্থনা এবং একমর্ম্মতাই যেন লাভ করিতেছি। এ সকল কবিই প্রাণের অন্তগুর্হা হইতে বলিয়া উঠিতে পারেন—"Truth is Beauty, Beauty is Truth"; "God is Heaven, Heaven is Love". এরূপ মিল এবং একাত্মতা ও একার্থকতার আবিষ্কারস্থলেই সাহিত্যচিন্তার আনন্দ—তীর্থসেবার পুণ্যানন্দ। আনাতোল ফ্রান্সে বলিয়াছেন—সাহিত্যপাঠ হইতেছে "Pilgrimage of the soul in the field of masterpieces." জগতের সত্যদর্শী 'Master Mind'গণ সকলে যেন এক কথাই বলিতেছেন! শেলীর দৃষ্টি-সমক্ষে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ একটা দ্বৈত বা দ্বন্দ্বব্যাপারের বিকাশ—আলো ও অন্ধকার, প্রেম ও বিদ্বেষ, সুখ ও দুঃখ, মৃত্যু ও অমৃতের দ্বন্দ্ব! সুতরাং এ জগৎ, শেলীর দৃষ্টিতে, 'A Dim Vale of Tears.' বলা বাহুল্য, ইহা সবিশেষ খ্রীষ্টানী দৃষ্টি—যে দৃষ্টিতে শয়তান তত্ত্ব ও দেবতত্ত্বের বিরোধ হইতেই সৃষ্টি বিকাশ; জগতে তাই সর্ব্বত্র অন্ধকারেই আলোক, পাপের মধ্যে পুণ্য, বিষের মধ্যেই অমৃত দুশ্চেছদ্য ভাবে মিশ্রিত হইয়া আছে। এ দৃষ্টিতে জগতে যাহা কিছু সত্য ও সুন্দর, পুণ্য ও মহৎ সমস্তই দেবতত্ত্বের বা অমৃতের বিকাশ। এই 'অমৃত'কে শেলী নানা কবিতায় বিভিন্ন নামে, Intellectul Beauty, Spirit of Love ইত্যাদি নামেও, লক্ষ্য করিয়াছেন। শেলী তাঁহার কাব্যাদিতে সমুচ্চ পরিকল্পনা ও রসযোগ পথে এরূপ অমৃতের অনুভূতি জাগাইয়াই ত কবিসিদ্ধি লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন! উহার 'ফল'টুকুও এ সূত্রে বুঝিয়া যাইতে হয়। ওইরূপ রসানুভব এবং অন্তর্দৃষ্টির উন্মীলনাই শেলীর প্রধান লক্ষ্য বলিয়া

শেলী কোন প্রকার বাঁধা গৎ বা 'রীতি'র উপর জোর দিতে চাহেন নাই। কীট্‌সের ন্যায় 'Looking upon fine Phrases with the eye of a lover' শেলীর নহে—যদিও শেলী ইংরেজী সাহিত্যের একেবারে শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর বাণীসিদ্ধগণেরই অন্যতম। এজন্য শেলী বাক্যপ্রণালীর বা ভাবপ্রকাশের কোন বিশেষ পদ্ধতিকেই কাব্যের একমাত্র 'রীতি' বলিয়া অবলম্বন করেন নাই; তিনি কাব্যপ্রকাশে কোন কৌশলই যেন মানিতেন না। উহাতেই শেলীর রচনায় অনেক সময় বিস্পষ্ট অর্থদোষ বা অলংকারদোষও আছে। শেলীর প্রধান লক্ষ্য, তাঁহার অন্তরস্মভূত ওই 'অমৃত' বোধের উদ্দীপনা—ভাষা, ছন্দ, বোলচাল, ঈষারা, ইঙ্গিত—যাহাতেই হোক! উদ্দীপনার আন্তরিকতায় জগতের কোন কবিই শেলীকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। শেলীর চক্ষে কবিতা হইবে, ভাবময় অসীমের উদ্দীপনা, উজ্জীবনা, ভাবতত্ত্বে প্রেমাভিনিবেশ ও রসাভিনিবেশ—অনুভূতিকে ভাঙ্গিয়া, উহার উপদানগুলি 'বিভক্ত' করিয়া দৃষ্টি করিতে তিনি চাহেন না। কবির Imagination শক্তি শেলীর সমক্ষে 'অখণ্ড' শক্তি; অতএব নিজের ভাবানুভূতির অখণ্ড 'একসত্তা'কে জীবের অনুভব পথে সঙ্কেতিত বা পরিমূর্ত্ত করাই শেলীর 'লক্ষ্য'। কবি নিজের অনুভূতিকে সতর্ক ভাষার সবিতর্ক মুষ্টিমধ্যে ধরিতে গেলেই মনের Reason বা বিচারের কার্য্য আরম্ভ হয় এবং কবির 'অভিনিবেশ' খণ্ডিত হইয়া যায়; কবি নিজের ভাবযোগ ও সৌন্দর্য্যযোগ হইতে পরিভ্রষ্ট হন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার 'কবিত্ব'ও খোয়াইয়া যায়। এ'জন্য শেলীর 'প্রণালী' ছিল—প্রাণের ভাবাবেশকে প্রথমাগত, অবিচারিত ও নির্ব্বিতর্ক বাক্যপুটেই সর্ব্বপ্রথম ধরিবার চেষ্টা। ইহার পরেই তিনি রচনাকে 'চাঁচাছিলা' করিয়া ও উহাকে সমাজে প্রকাশযোগ্য করিয়া তুলিতেন। কিন্তু, সর্ব্বপ্রথমে—একেবারে প্রলাপবৎ হইলেও—প্রথম অভিনিবেশটিই যে ভাষার পথে ধরিতে চেষ্টা করিতেন, শেলীর 'রীতি'রহস্য বুঝিতে গিয়া এ সত্যটুকুই আমাদের ধারণা হইয়াছে। এ জন্যই শেলীর অনেক কবিতা কেবল Rapture of the Mystic—

প্রাণকে আনন্দতত্ত্বে ডুবাইয়া প্রথমোদ্দীপ্ত ভাবকে প্রথমাগত ভাষাতেই ধারণা! এ' জন্যই হয়ত সমালোচক রসেটি শেলীকে 'Divinest of the Demigods' বলিয়াছেন। সাহিত্যজগতের উচ্চশ্রেণীর কবিগণের, বিশেষতঃ গীতিকবিগণের হয়ত উহাই 'রীতি'। আমাদের গীতিকবিকুলেরও এরূপ শেলী'রীতি' নহে কি? উচ্চশ্রেণীর 'গীতিকবি', শিক্ষা ও সাধনায়, সর্ব্বপ্রথম নিজের হৃদয়কে ভাষার নির্ব্বিতর্ক ভূমিতে, সরস্বতীর সিদ্ধ শক্তির ঋজুপন্থা ও অনায়াস প্রকাশলোকেই উত্তীর্ণ করিতে লক্ষ্য রাখেন; নিজের হৃদয়কে সুসজ্জিত বীণাযন্ত্রের মতই বিশ্বের আনন্দাত্মার সূক্ষ্মস্পন্দ এবং পরিস্পর্শ সমক্ষে উন্মত এবং আগ্রহী করিয়া রাখেন। হৃদয়কে ভাবের সূক্ষ্মলোকের স্পন্দরসিক, আনন্দগ্রাহী এবং সত্যাগ্রহী করা লইয়াই গীতিকবিগণের 'শক্তি'! ইহারা জগতের আনন্দাত্মার ও রসাত্মার একনিষ্ঠ রসিক; অমৃতময়ী ও আলোকসুন্দরী বিশ্বভাবিনীর পরম স্তনন্ধয় শিশু।

বলিতে হইবে, বঙ্গের বৈষ্ণব কবিগণ আনন্দকে মূর্ত্তিবদ্ধ করিয়া পরিমিত করার দরুণেই হয়ত (সাধনাঙ্গে উহার ফল যাহাই হউক) সাহিত্যের ক্ষেত্রে জীবনিসর্গের অন্তরঙ্গীভূত আনন্দের তত্ত্বে দৃষ্টি ও আনন্দযোগের বিষয়ে কবি ওয়ার্ডসোয়ার্থের কিংবা শেলীর ন্যায় গভীরগাহিতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। একথায় অর্থ এই যে, যেই আনন্দবস্তু অনন্ত রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-সঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, বংশীবদনের বহিরঙ্গ প্রতিমানিষ্ঠ সাধনাতেই চিত্তকে নিবদ্ধ করিতে যাওয়ায় বিরাট্ রূপনারায়ণের জগন্ময় প্রকাশের আনন্দপরিচয় তাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে লাভ করিতে পারেন নাই; তাঁহাদের হৃদয় অনন্তসুন্দরের প্রকৃত রসায়ন লাভ করিয়া শেলী-ওয়ার্ড্সোয়ার্থের ন্যায় কবিত্বানন্দে উল্লাসী হইতে জানিলে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের মধুচক্রভাণ্ডার হয়ত আরও বৈচিত্র্যে ও প্রাচুর্য্যে ভরপূর এবং বিভিন্ন বিভাগে

৬৫। অনন্তসুন্দরের বাহ্য প্রতিমাধারণার পথে অসতর্ক ব্যক্তির পক্ষে নিদারুণ দোষসম্ভাবনা।

পরিবর্দ্ধিত হইয়া পড়িত। ভাবের জগতেই যে গুরু-দীক্ষা এবং চক্ষুরুন্মীলন বলিয়া একটা সত্যব্যাপার আছে, উহার অভাবে আমাদের হৃদয় যে সত্যসৌন্দর্য্যের কাছাকাছি আসিয়াও অনেক সময় অন্ধ দুর্ভাগ্যে উহার 'পাশ কাটিয়া' চলিয়া যাইতে পারে, সুধাসমুদ্রের তীরে আসিয়াও অচেতনভাবে ফিরিয়া যাইতে পারে, সাহিত্যজগতে তাহার প্রমাণ সর্ব্বত্র মিলিবে। আবার, সর্ব্বপ্রকার সীমাপ্রিয়তা ও মূর্ত্তিবাদের হয়ত এ স্থানেই একটা দোষ; চূড়ান্তে পৌঁছিতে না পারিলে উহা জীবকে আত্মকৃত জালেই আবদ্ধ এবং আত্মান্ধ ও বিশ্বান্ধ করিয়া রাখিতে পারে। অন্যথা, কবির হৃদয় স্বধর্ম্মেই ত ঋজুদর্শী; সাহজিক সৌভাগ্যেই প্রত্যক্‌দর্শী! বিশ্বময় সর্ব্বত্র অনন্ত রসসুন্দরের আত্মপ্রত্যক্ষ প্রকাশ-পরিচয় হইতেই ত দেশে দেশে আনন্দযোগী কবিহৃদয় অপ্রমিত ও আনন্দমুখরিত ভাবচ্ছন্দে লীলায়িত হইয়া নব নব প্রতিমাসুন্দর রসসাহিত্যের সৃষ্টি পূর্ব্বক সেই সচ্চিদানন্দেরই সহানুভূতি এবং স্তুতি করিতেছে।

ভারতে বিশ্বের আনন্দসঙ্গীত শ্রবণের ও আনন্দযোগের যেই মীষ্টিক সাধনা-প্রণালী আছে, প্রেম ও সৌন্দর্য্যের মর্ম্মদর্শন এবং মর্ম্মে গতির যেই সাংপ্রদায়িক পদ্ধতি আছে, উহা যেমন জীবজীবনের ধন্যতা বা Perfectionism আদর্শ হইতে অভিন্ন, তেমন বাণীমন্দিরের কবিত্বসাধনা এবং সাহিত্যিক রসসাধনা হইতেও বিরুদ্ধপন্থী নহে। এই প্রেম-রস-সৌন্দর্য্য-আনন্দের তত্ত্বসিদ্ধ জীবের সেই ধন্যতা ও 'পূর্ণতা'র মর্ম্মস্থান পঞ্চদশী 'বিদ্যানন্দ' প্রকরণে অনুপমভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন; উহা উদ্ধৃত না করিলে এই সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য ও রসচিন্তার প্রসঙ্গ যেন অপূর্ণ থাকে। এক্ষেত্রে কথার ত শেষ নাই; কারণ, উহা 'অশেষের পাঠ'। মীষ্টিক বলিবেন, যাহার আত্মবোধি এবং আত্মদৃষ্টি জাগিয়াছে, সে এক পলকেই সকল কথার পারে গিয়াছে। বিশ্বের নীরব কেন্দ্রের অনন্ত

৬৬। ভারতে অনন্তসুন্দরের মীষ্টিক সাধনা-প্রণালী ও ধন্যতার আদর্শ।

মধু-ভাণ্ডারে আত্মযুক্ত সেই কৃতকৃত্য, সেই আত্মধন্য ও আত্মতৃপ্ত নীরব মধুব্রতের মর্ম্মগত আনন্দবার্ত্তাই ঋষিবাণী এরূপে ধারণা করিতে চাহিয়াছে—

কৃতকৃত্যতয়া তৃপ্তঃ প্রাপ্যপ্রাপ্ততয়া পুনঃ।
তৃপ্যন্নেবং স্বমনসা মন্যতেঽসৌ নিরন্তরম্॥
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং নিত্যং স্বাত্মানমঞ্জসা বেদ্মি।
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং ব্রহ্মানন্দো বিভাতি মে স্পষ্টম্॥
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং দুঃখং সাংসারিকং ন বীক্ষেঽদ্য।
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং স্বস্যাজ্ঞানং পলায়িতং কাপি॥
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং কর্ত্তব্যং মে ন বিদ্যতে কিঞ্চিৎ।
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং প্রাপ্তব্যং সর্ব্বমদ্য সম্পন্নম্॥
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং তৃপ্তের্মে কোপমা ভবেল্লোকে।
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং ধন্যোধন্য পুনঃ পুনর্ধন্যঃ॥
অহো পুণ্যং অহো পুণ্যং ফলিতং ফলিতং দৃঢ়ম্।
অস্য পুণ্যস্য সম্পত্তেরহো বয়মহো বয়ম্॥

এ স্থলেই অদ্বৈতবাদী ঋষি বা সাধকের চরম অধ্যাত্ম সম্পত্তি, আত্মধন্যতা ও পূর্ণতার আদর্শ। যোগবাশিষ্ট এবং অষ্টাবক্রসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে নানাদিক্ হইতে এই আদর্শীভূত অবস্থার উপর আলোকপাত করা হইয়াছে। সাহিত্যের সঙ্গে ইহার মুখ্য সম্বন্ধ না থাকিলেও ভারতের সাহিত্য, সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্রের সকল গতি ও নিয়তি চূড়ান্তে স্থিত এই ঋষি-আদর্শের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

সাহিত্যে সৌন্দর্য্যের এই তৃতীয় বস্তু, 'একং সৎ' বস্তু, সেই 'সৎ-চিৎ-আনন্দ' কত রূপে, কত ভাবে, সাহিত্যক্ষেত্রের আনন্দ-প্রেম-সৌন্দর্য্যের আকারপ্রকারে পরিলক্ষিত, সাধিত বা সমুপনীত হইতে পারে, একই 'রস' কত রূপে, কত আকারে পরিদৃষ্ট ও প্রসজ্জিত হইতে পারে! কেবল সচেতন ভাবে 'রসিক' হওয়া লইয়াই কথা।

রস, আনন্দ, প্রেম ও নামরূপ লইয়াই ত সাহিত্যজগৎ! 'এই তিনে-এক' এবং একে-তিন বস্তুরই বিশ্বসাহিত্যময় কোটিরূপ এবং কোটিমুখ বিকাশ। এই পথে কবির সাহিত্যসাধনাও অধ্যাত্ম-ফল হিসাবে স্বজীবনের পরমার্থসাধনার সহিত অভিন্ন হইতে পারে—যাহা অপেক্ষা বড় কথা সাহিত্য-চিন্তকের পক্ষে কিংবা জীবনদার্শনিকের পক্ষে আর হইতে পারে না। এই সচ্চিদানন্দই যে 'তৎ' বস্তু, এই 'তৎ'ই যে বিশ্বের সকল সত্যের চরম সত্য এবং এই সত্যের বার্ত্তাই যে জগৎ ও জীবন বিষয়ে জীবের চূড়ান্ত Philosophy, আবার, এই সত্যদর্শনই যে সাহিত্যের চরম অবলম্বন এবং পরম প্রাপ্তি, উহাকে Religion তরফে 'কোণ-ঠেসা' করিয়া রাখাই যে দ্বৈতবাদী ইউরোপের এবং সকল দ্বৈতবাদী ধর্ম্মের পরম ভ্রম তাহাই সাহিত্যসেবী মাত্রকে প্রাণপণে বুঝিতে হয়। এই 'সচ্চিদানন্দ'কে সৃষ্টিকর্ত্তা বা Manifested God অপিচ Personal God রূপে দৃষ্টি করিতে গিয়াই অতর্কিতে জীবকে অসম্ভব গোঁড়ামী এবং সঙ্কীর্ণতা পাইয়া বসে এবং উহাতে জীবের প্রাণমনবুদ্ধি নিদারুণ কলুষাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। আমরা উহা ঘনিষ্ঠভাবে বুঝিবার জন্য এবং ঋষিদৃষ্টিতে বিশ্বদর্শন ও আর্যধর্ম্মের সাহিত্যসাধনার আদর্শকে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত ভাবে বুঝিবার জন্য এ কয়টি প্রসঙ্গে চেষ্টা করিলাম। ভারতের বাহিরে এবং (অশিক্ষা ও কুশিক্ষার গতিকে) এতদ্দেশেও সম্পূর্ণ দুর্গম এই তত্ত্ব! বিষয়টি সাহিত্যদর্শনের দিক্ হইতে একেবারে আলোচিত হয় নাই বলিলেই চলে। বিপুল সাহিত্যজগতে অনেক কবিই আত্মকর্ম্মের 'আত্মা' বিষয়ে অচেতন ভাবে কাব্য রচনা করিয়া চলিয়াছেন, অনেক পাঠকও ঐরূপ অচেতন ভাবেই কাব্যরসের উপভোগ করিয়া চলিয়াছেন; কিন্তু সাহিত্য বা শিল্পের মূলেও যে একটা Philosophy আছে, সকল কাব্যব্যাপারের যে একটা 'আত্মা' আছে, সাহিত্যের 'রস'

৬৭। সাহিত্যে সৌন্দর্য্যের এই সচ্চিদানন্দ 'তৎ'বস্তু চিনিতে পারিলে কবি ও শিল্পীর পক্ষে অনন্ত শক্তি-সম্ভাবনা ও নবনব শিল্প উপার্জ্জনার অবকাশ।

মধ্যেও যে একটা 'তত্ত্ব' আছে এবং উহা যে বিশ্বের চরম তত্ত্ব এবং পরমাত্মা হইতে অভিন্ন তাহা 'অদ্বৈত' দৃষ্টিস্থান ব্যতীত ধরা পড়িবে না। বুঝিতে হইবে, পাশ্চাত্য জগতের শ্রেষ্ঠশ্রেণীর কবি, ওই ওয়ার্ডসোয়ার্থ, শেলী এবং কীট্‌স প্রভৃতি, ন্যূনাধিক অতর্কিতে যে তত্ত্বের আভাস মাত্র পাইয়া তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ কবিত্বফল চয়ন করিয়া গিয়াছেন তাহা ভারতবর্ষের দৃষ্টিতে জীবনসাধকের পক্ষে নিত্যসিদ্ধ, সনাতন, অখণ্ড ও অদ্বৈত 'ধর্ম্ম'। ভারতের আত্মজাগ্রত মনুষ্যমাত্রেই উহার মধ্যে "Lives, Moves and has his being" অতএব, এদিকে সত্যজাগ্রত কবি ও শিল্পী মাত্রের জন্যই অনন্ত শক্তিসম্ভাবনার ও শিল্পউপার্জ্জনার অবকাশ রহিয়াছে। অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে বিশ্বদর্শন এবং অধ্যাত্মজাগরিত ভাবে এবং বিশ্বাত্মায় সুস্থিত থাকিয়াই সাহিত্য-সাধনা! সর্ব্বভূতে এক ও অদ্বয় ভাবের দৃষ্টি ব্যতীত, বিশ্বের সমস্তকে একসূত্রে সংগ্রথিতভাবে দৃষ্টি করা এবং একায়ন দৃষ্টি সিদ্ধি করার আদর্শ ব্যতীত যেমন প্রকৃত ভারতীয় কর্ষণা (culture) দাঁড়ায় না, তেমন সাহিত্যিক কর্ষণাও যে দাঁড়ায় না, এ কথাটা সকল দিক্ হইতে বুঝিতে পারিলে সেই 'বোধ'টুকুই সাহিত্যসেবীর জীবনে একটা নবজন্ম ও চক্ষুরুন্মীলনের ব্যাপার রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। তখন আর সাহিত্যসেবা কেবল একটা 'কলম পেশা'য় কিংবা কেবল অর্থসাধনার একটা ব্যবসায় রূপেই পরিণতি লাভ করে না; সাহিত্যসেবার অর্থও পরমার্থ হইতে অভিন্ন হইয়া দাঁড়ায়। জনসাধারণের নিম্নবৃত্তি বা জীবহৃদয়ের পাশব প্রবৃত্তির খোশামোদ করিয়া শিল্পরচনা করাকে কিংবা সে পথে সাময়িক বাহবা লাভকে শিল্পিজীবনের চরম লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিতেও মতি হয় না। জীবনের সকল ভাবনাচিন্তা এবং কায়মনের সকল কর্ম্মব্যবসায়কে চরমতত্ত্বের সহিত সমঞ্জসিতভাবে হৃদ্‌বোধ করা—ইহাপেক্ষা বড় শিক্ষা ও বড় প্রাপ্তি জীবের পক্ষে আর হইতে পারে না। সাহিত্যসেবীর পক্ষে ত কথাই নাই।

অপরের সঙ্গে অদ্বৈতবাদী মৌষ্টিককবির দৃষ্টিস্থানের পার্থক্য এবং সাহিত্যক্ষেত্রে এরূপ মৌষ্টিক কবির স্বাতন্ত্র্যটুকু রবীন্দ্রনাথের একটী আধুনিক কবিতার সাহায্যে সুস্পষ্ট হইতে পারে। দেখিয়া আসিয়াছি, কবি মাত্রেই প্রাণে প্রাণে আনন্দবাদী এবং (সজ্ঞানে বা অতর্কিতে) সৌন্দর্য্য রসিক; জগতের সৌন্দর্য্যবোধ ব্যতীত কবিত্ব শক্তি দাঁড়ায় না।

৬৮। অন্যের সঙ্গে অদ্বৈতবাদী মৌষ্টিক কবির দৃষ্টিস্থানের পার্থক্য এবং সাহিত্যে ও জীবনে উহার ফল।

কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকে ভালবাসেন; বিশ্বের সুন্দর বস্তুসমূহে কবির হৃদয় সহরসে এবং সহানুভবে অনুরসিত ও অনুকম্পিত হইতেছে; জগতের বস্তুসমূহ নব নব মূর্ত্তিতে ও স্ফূর্ত্তিতে এবং ব্যক্তিত্বে কবির ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহার প্রাণকে মুগ্ধ করিতেছে—

আমি বেসেছিলাম ভালো
সকল দেহে মনে
এই ধরণীর ছায়া আলো
আমার এ জীবনে। ইত্যাদি

এ পৃথিবীর অনেক অনেক পদার্থকে কবি 'ভালবাসিয়া' তাঁহার কাব্যের 'আলম্বন' করিয়াছেন; কবির ভালবাসার সেই পাত্রগুলি এমন এক একটী 'ব্যক্তি' যে, এ পৃথিবী হইতে তাঁহার চলিয়া যাওয়ার পরেও উহারা তাঁহার সেই 'ভালবাসা'র সাক্ষ্য দিবে; অন্য কথায়, তাঁহার কবিতাই তাঁহার সেই প্রেমজীবনের প্রমাণ বহন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে। বলিতে হইবে না যে, ইহা একদিকে কবিমাত্রের 'প্রাণের কথা'। প্রকৃত কবিমাত্রেই পদার্থকে প্রাণে প্রাণে ভালবাসিয়া, উহার সঙ্গে প্রেমের পথে একীভূত হইয়াই কাব্য রচনা রচনা করেন; এরূপ ঘনিষ্ঠ প্রেম, বুদ্ধি ও প্রেমসৃষ্টির বিশ্বাস ব্যতীত কবির হৃদ্গত 'আনন্দ' কদাপি কাব্যে গিয়া 'রস'রূপে পরিণতি লাভ করিতে পারে না। কবির আন্তরিকতা, সহানুভূতি ও প্রেমের গাঢ়তা এবং প্রেমের বলে বিষয়ের সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভের শক্তি ব্যতীত যেমন পদার্থের মর্ম্মপরিচয় হয় না, তেমন রসের

ঘনতাও ঘটে না ; রসের গাঢ়তা ব্যতীত কাব্যশিল্পের চমৎকারিতাও সিদ্ধ হয় না। কাব্যের অবলম্বিত পদার্থ মাত্রের প্রতি কবির একটা রসমধুর 'ব্যক্তিত্ব'বুদ্ধি এবং ওই 'ভালবাসা'—এখানেই সকল 'চমৎকারিতা'র রহস্যস্থান। কবিত্ব বিষয়ে এরূপ সর্ব্বসামান্যতার ক্ষেত্রেই আবার অদ্বৈতবাদী কবির সবিশেষ কথাটুকু এই যে, তিনি জগতের সকল বস্তুগত বা ভাবগত সৌন্দর্য্যকেই ভালবাসিয়া সেই অদ্বয় 'তৎ' বস্তুর, সেই সৎ-চিৎ-আনন্দ বস্তুর পরিপ্রকাশ রূপেই প্রাণমনে অনুভব করিতেছেন ; 'বহু'র ইন্দ্রিয়ানুভূতি তাঁহার অন্তরে আসিয়া 'এক' তত্ত্বেরই বিজ্ঞান বা বোধি রূপে পর্য্যাপ্ত হইতেছে। "যৎ যৎ বিভূতিমৎ সত্ত্ব শ্রীমদূর্জ্জিত মেব বা"—সমস্তকে সেই সচ্চিদানন্দের অংশমূর্ত্তি রূপে বুঝিয়া সর্ব্বের অনুভবপথে অদ্বৈতবাদী সেই 'এক' বস্তুতেই 'যুক্ত' হইতেছেন ; কালিদাসের ভাষায়, অদ্বৈতবাদী কবি বিশ্বের সকল প্রকাশকে সেই অব্যক্তের প্রত্যক্ষমূর্ত্তি রূপে চিনিয়া তাঁহার সকল কাব্যচেষ্টায় সেই একের অভিমুখী গতি এবং লক্ষ্যেই সচেষ্ট থাকিতেছেন ; ব্যাসের ভাষায়, কবি তাঁহার কাব্যের সকল পরিচিন্তায় সেই সর্ব্বগত 'এক' বস্তুর পরিচিন্তনে এবং সাধনেই স্থির থাকিতেছেন। এরূপে অদ্বৈতবাদী কবির সকল সৌন্দর্য্য অনুভূতি এবং কাব্যকৃতি প্রতিপদে সেই এক এবং অখণ্ড সুন্দরের ধারণা ও অনুভবসাধনা রূপে পরিণত হইয়া তাঁহার "পরমার্থ সাধনা"র সঙ্গেই অভিন্ন হইয়া দাঁড়াইতেছে ! এই পার্থক্যটুকু না বুঝিলে ভারতীয় আদর্শের 'কবি ব্যবসায়' এবং সাহিত্যসাধনার বিশেষত্ব টুকুই অনধিগম্য থাকিবে। পরিপকতা লাভ করিলে, সাহিত্য-ক্ষেত্রেই উহা যেমন একটা স্বাতন্ত্র্যময় রসসিদ্ধি ; জীবের জীবন পক্ষেও উহা নিশ্চয়ই চরম সত্যের দৃষ্টিসিদ্ধি এবং প্রাপ্তি। উহা জীবজীবনের পরমার্থ সিদ্ধি—যাহাতে ইন্দ্রিয়পথে ব্যাবহারিক ক্ষেত্রের বহুত্ব-উপস্থিতি সত্ত্বেও জীবের অন্তরের অনুভবকর্ত্তা দেখিবে 'এক' ; অন্তরাত্মা তাহার বলিবে—"ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং সচ্চিদানন্দরূপম্"। যেই অমৃতপদবীতে দাঁড়াইয়া জীব বলিতে থাকিবে—"ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং ব্রহ্মানন্দো বিভাতি

যে স্পষ্টম্” ; আবার, যাহাতে তাহার অন্তরাত্মাপুরুষ অখণ্ড সত্যের অনুভবে সচেতন থাকিয়া বুঝিতে পারিবে—

'সচ্চিদানন্দ রূপোঽহম্ নিত্যমুক্তস্বভাব বান্।”

অতএব, কাব্যের আত্মার নাম যেমন রস ; তেমন কবিত্বের আত্মার নামও রস-প্রেম—সৌন্দর্য্যপ্রেম। সৌন্দর্য্য বলিতে যেমন নিসর্গসৌন্দর্য্য, তেমন জীবের দেহ-মন-প্রাণের সৌন্দর্য্য, আন্তর প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় প্রকটগুপ্ত সেই অখণ্ড ঋত বা ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য। এই ঋত ও 'ধর্ম্ম' তত্ত্ব যে জানে না, ভবতন্ত্রে দেব, বীর ও পশুর ধর্ম্মপার্থক্য মানে না, জীবের মনোবৃত্তির শান্ত, ঘোর ও মূঢ়ভাবের দূরতাও যে বুঝে না ভারতের দৃষ্টিতে তাহার নামই 'নাস্তিক'। ঋতপায়ী, ঋতবিশ্বাসী এবং ঋতবিলাসী হওয়ার নামই অমৃতপায়ী হওয়া ; এরূপ কবির নামই 'অমৃতস্য পুত্র'। সে অদিতির গর্ভপুত্র—অসীমের দায়ভাগী। দিতি, নির্ঋতি, সীমা এবং পরিমিতার ভক্তগণের সঙ্গে কিংবা 'অনৃত'পুত্রগণের সঙ্গে তাহার জাতিজন্মগত নিত্যব্যবধান—অমুল্লঙ্ঘ্য দূরতা এবং পার্থক্য! কবি সাহিত্যপথে অনন্ত ও অমৃত তত্ত্বেরই পূজারী। আনন্দসুন্দরকে নামরূপের পরিব্যক্তি দান করিয়া, জীবের মনোরমা এবং হৃদয়ঙ্গমা রসমূর্ত্তি দান করিয়া কবি অখণ্ড রসময় ও অদ্বৈত জগদাত্মার সংস্পর্শেই জীবকে আনিতে চাহিতেছেন। এক্ষেত্রে ইহার্থ এবং পরমার্থ অনন্য হইয়া গিয়াছে ; ধর্ম্মার্থ এবং সাহিত্যার্থ অভিন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলতঃ, অখণ্ড রসবস্তুর সংস্পর্শকে স্থায়ীভাবে পরিস্ফুট ও ঘনিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যেই ত কাব্যের সকল সৌন্দর্য্যপরিব্যক্তি এবং রসের প্রমূর্ত্তি। বিশ্বজগতের রসাত্মাই কাব্যের রসাত্মা—“রসো বৈ সঃ”।

সাহিত্যে সৌন্দর্য্যের 'প্রকাশ' কিরূপ হইবে? সাহিত্যের ইতিহাস শিক্ষা দিতেছে, এ প্রশ্নের কোন 'বাঁধাধরা' জবাব নাই ; জবাব হইতে পারে না। তথাপি পণ্ডিতগণ গুরু সাজিয়া জবাব দিতে চাহিয়াছেন ; কবিগণ উহা মানেন নাই ; ইতিহাস বলিতেছে, না মানিয়া ভালই করিয়াছেন। অনেক বড় বড় সাহিত্যপণ্ডিত কবির

মুরব্বি সাজিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিয়াছেন, "This will never do"—এরূপ কাব্য কদাপি দাঁড়াইবে না। সাহিত্যের ইতিহাস সাক্ষী—তাহাই অনেক সময় দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কোন রসিক ব্যক্তি Scott's Universal Library নামক গ্রন্থমালায় Early Reviews of Great Writers নামে এক সংগ্রহগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন; উহাতে দেখা যাইবে, ইংরাজী ভাষার অনেক স্বনামপ্রসিদ্ধ কবি ও সাহিত্যরথ এরূপ মুরব্বি সাহিত্যপণ্ডিতগণের হস্তে প্রথমপ্রথম কি ব্যবহার লাভ করিয়াছেন। সাহিত্যপণ্ডিত জেফ্রী ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থ্‌কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, এ লোকটাকে পঁচিশ বৎসর ধরিয়া পরামর্শ দিতেছি; আমাদের কথায় কাণই দিলে না। জেফ্রীর পরামর্শে কাণ দিলে কবি ওয়ার্ডসোয়ার্থের নাম সাহিত্যজগতের প্রথম শ্রেণীর কবি-তালিকা হইতে আজ হয়ত মুছিয়া যাইত। আসল কথা, যিনি 'বড় কবি', তিনি নিজের কবিদৃষ্টির অথবা সৃষ্টির কোন মহার্ঘ এবং দুর্লভ মাহাত্ম্যেই 'বড় কবি'। উচ্চশ্রেণীর কবিত্ব মাত্রেই কোন 'সাধারণ' পদার্থ যেমন নহে, তেমন উহা কোন গতানুগতিক ভাবুকতার অথবা পুঁথিপাণ্ডিত্যের আমলেও আসে না। মৌলিকতা মাত্রেই একটা অসাধারণ বস্তু এবং উহা পূর্ব্বানুগত পদ্ধতি ও পুঁথিপাণ্ডিত্যের পরম শত্রু। উহাকে আপাততঃ সাধারণ সামাজিকের মুখে, চারিদিক হইতে বারংবার শুনিতে হইবে—This will never do. এ স্থলেই সারস্বত জীবনের এবং স্বাতন্ত্র্যনিষ্ঠ জীবমাত্রের নিত্যকালের দুরদৃষ্ট অথবা সৌভাগ্য। দুরদৃষ্টের এই নির্মথন হইতেই জগতের দেবধর্ম্মী পুরুষগণ নিজের অমৃত লাভ করেন। আবার, অতীত এবং বর্ত্তমানের মধ্যেও প্রাণান্তকর যুদ্ধ এ স্থলে। সরস্বতীপুরীর প্রবেশ পথেই নিদারুণ অগ্নিপরীক্ষা। যে অমর তত্ত্ব, সে এই অগ্নিপরীক্ষায় অক্ষত ভাবে উত্তীর্ণ হইয়াই অমর। "হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা।"

৬৮। সাহিত্যে সৌন্দর্য্যের 'প্রকাশ'।

কবির প্রতি সাহিত্যজগতের প্রথম জিজ্ঞাসা, 'জীবন ও জগতের দিকে তোমার নিজের দৃষ্টি আছে কি? নিজস্ব রসানুভূতি আছে কি?' বাণীমন্দিরের সদর দ্বারেই এ জিজ্ঞাসা। উহার পরেই ভালমন্দ বিচারের বা প্রকাশের রীতি ও শিল্পের আকৃতিপ্রকৃতি বিচারের অবকাশ। সাহিত্যজগৎ কবিগণের অহংকেন্দ্রী জগৎ—ব্যক্তিগত সত্যদৃষ্টি, নিজস্ব রসানুভূতি ও নিজস্ব ভাবা এবং প্রকাশরীতির জগৎ। আপাততঃ বহুকেন্দ্রী হইয়াও পরম ঐক্যকেন্দ্রী এই জগৎ—স্বপ্রধান কবিগণের হৃদয়তন্ত্রীর বহুঝঙ্কারে মুখরিত হইলেও সচ্চিদানন্দরূপিণী সরস্বতীর একমাত্র মহাবীণাই বিশ্বসাহিত্যময় বাজিতেছে! বহুত্বের মধ্যেই ঐক্য এবং বিভিন্নতার মধ্যে অভিন্নতা আছে।

সকল প্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকিবে সৌন্দর্য্যের দিকে, রসাত্মকতার দিকে—এ স্থলেই কাব্যের প্রধান মাপকাঠি; রসাত্মক না হইলে, উহা হাজার দার্শনিক তত্ত্বে অথবা ইতিহাস-বিজ্ঞানের তথ্যে যতই পরিপূর্ণ হউক না কেন সে রচনার কর্ত্তা কখনও কবি নহেন। কবি উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক, কিন্তু তাই বলিয়া দার্শনিক মাত্রেই কবি নহেন। যে শক্তি হইতে মনুষ্যের জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পত্তি উপার্জ্জিত কিংবা বর্দ্ধিত হইতেছে, কবিত্বশক্তি তাহাকে লইয়া, আবার তাহাকে ছাড়াইয়াই অপর একটা শক্তি। তর্কযুক্তিবিচারের প্রণালী কাব্যের বহির্ভূত; অথচ শ্রেষ্ঠ কাব্যের মধ্যে উহাদের শ্রেষ্ঠ সুফলটুকুই আছে। সত্য ব্যতীত কাব্য নাই; কিন্তু বিচার ও সিদ্ধান্তরীতির কাঁটাটুকু সেখানে নাই। এ জন্যই কোন ইংরেজ লেখক বলিয়াছেন, "The Poet is Divinely Wise". নিখিল সৃষ্টির সকল সত্যের 'কারণ' সত্যের নাম যে 'আনন্দ', যাহার দ্বারা এই দ্যাবাপৃথিবী ও অন্তরীক্ষ বিধৃত আছে, কবি তাহারই প্রেমিক। কবি সৃষ্টিতন্ত্রে সেই এক সত্যেরই নব নব ভাবময় প্রতিমার স্রষ্টা। কবি বিশ্বসৃষ্টির সেই 'প্রেম'-তত্ত্বেরই প্রেমিক যাহাতে এমার্সন কবিত্বকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

Dowered with the Hate of hate
And Scorn of scorn
And Love of love.

আবার, কেবল নিজের ইন্দ্রিয়পরিতোষ বা সাংসারিক স্বার্থবুদ্ধির বাহিরে চিত্তের একটা অধ্যাত্ম তৃপ্তির খুঁটি ব্যতীত কবিশক্তি কিংবা কবিবৃত্তি দাঁড়ায় না; জীব, নিসর্গ বা পরমের প্রতি রস-আনন্দ-প্রেম ও সৌন্দর্য্যবুদ্ধি ব্যতীতও কবিত্ব দাঁড়ায় না। অতএব, কবিত্বশক্তি অধ্যাত্মতঃ জীবাত্মার একটা আত্মপ্রকাশ ও আনন্দবিলাস—ভাষার ভিতর দিয়া আত্মারামের প্রকাশ। ইহাতেই বুঝিতে হইবে, কবিত্ব-শক্তি জীবের পক্ষে অহমিকাগণ্ডীর বাহিরে একটা আত্মবিলি ও প্রয়াণ এবং ওইরূপ প্রয়াণেই একটা আত্মস্থিতির আনন্দবুদ্ধি। আনন্দস্বরূপের এই বিশ্বসৃষ্টি যেমন একটা আনন্দপ্রকাশ, সেরূপ তাঁহারই আনন্দপ্রেরিত ও আনন্দদীক্ষিত কবির কাব্যসৃষ্টিও মূলতঃ আত্মপ্রাণের 'আনন্দের জন্যই আনন্দ প্রকাশ'। সৃষ্টিতত্ত্বে এই 'আনন্দ' একটা আত্মদানী ও স্বয়ংদানী তত্ত্ব।

আত্মারাম অবস্থা হইতে স্খলিত হইয়া ও সাংসারিক সম্বন্ধে আসিয়া কবির এই আনন্দ এবং প্রকাশের ধারা আবিল হইয়া পড়িতে পারে—প্রায়ই পড়ে; জীবাত্মার অন্তরানন্দের সেই নিঃস্বার্থ ও নিষ্কলুষ প্রকাশেচ্ছা সাংসারিক অর্থসম্বন্ধে এবং সুবিধাবাদের ফেরে পড়িয়াই আবিল হইয়া দাঁড়ায়। কবির অন্তরে মধ্যমাধম পুরুষের জ্ঞান ও সামাজিক পরিবেষবুদ্ধি এবং দেশকালধর্ম্মের ছায়াপাত হইতেই অশেষ বিশিষ্টতা এবং কবিতে কবিতে অশেষ বিভিন্নতা ঘটিয়া যায়। কিন্তু নিদানের সে 'আনন্দ'ই সর্ব্ব কবিচেষ্টার কারণ।

অতএব, সাহিত্যে সকল কবিত্বের মূল শক্তি কবির আত্মানন্দ এবং প্রকাশের সরলতা ও অমায়িকতা। শেষের দু'টিও কঠিনতত্ত্ব! কারণ, সমাজ ও ভাষা উভয়েই ত কৃত্রিম ও মায়িক সৃষ্টি। কবিকে এ সমস্তের তত্ত্ব শিক্ষাপথে আয়ত্ত করিতে হয়। অনেক কবির মনোভাব তাঁহাদের শিক্ষাদোষে ভাষাপথে আসিতে আসিতেই

আধাআধি বিরূপ হইয়া যায়। শব্দশক্তিজ্ঞানের অভাবই অনেক সাহিত্যিক নৌকাডুবীর পক্ষে চোরা পাহাড়। কবির আত্মা যেমন সত্যকে ঋজুভাবে, উহার নির্জ্ঞাল ও অনাবিল স্বরূপে দেখিবে, তেমন কবির বাণীকেও উহার সাক্ষাৎসঙ্কেতী শক্তি অথবা ব্যঞ্জনার শক্তিতে সরলগামী এবং সরলভেদী হইতে হইবে। ভাবকে ভাষার সাক্ষাৎ-শক্তিতে যে যত চমৎকারী উপায়ে আয়ত্ত করিতে পারে সারস্বত ক্ষেত্রে তাহারই জয়। স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর আকর্ষণ বা 'প্রেম' নামক ব্যাপারটী ত সর্ব্বজীবের পক্ষে ন্যূনাধিক সাধারণ; উহাপেক্ষা প্রবলতর কোন রসাত্মিকা বৃত্তিও জীবের নাই। উহার বিকাশেই মনুষ্যের সমাজ ও সভ্যতার নানামুখীন বিকাশ—মনুষ্যের অধিকাংশ সুকুমারবৃত্তির বিকাশ। তথাপি মানুষের 'প্রেমের কবিতা'ই পড়'! উচ্চশ্রেণীর কবি ব্যতীত প্রেমের কবিতারচনায় অপর কেহ সাধুবাদ অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। জীবের পক্ষে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ এবং প্রবল অথচ 'সাধারণ' বৃত্তি তাহার বাক্যাভিব্যক্তিই অকবির হস্তে একেবারে নির্জ্জীব, লজ্জাকর ও হাস্যকর এবং নীরস হইয়া দাঁড়ায়! প্রধান কারণ, অনুভবে সরলতার অভাব; শব্দশক্তিতেও sincerityর অভাব। এ অভাব হইতেই আমাদের অধিকাংশ 'প্রেম কবিতা' পরের হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে না। সাধারণ কবির শত শত প্রেম-কবিতা পড়', আর ব্যারেট ব্রাউনীং এর Sonnets From the Portuguese পড়'—বুঝিবে, সত্যসৌন্দর্য্যের প্রকাশে ভাষার অমায়িকতা ও সরলভেদী শক্তি কি! আবার, 'কড়ি ও কোমল'এর পূর্ব্বগত রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় 'প্রেম কবিতা' পড়'। কবি তখনও স্ত্রী-বস্তুর প্রকৃত পরিচয় লাভ করেন নাই; তাই, ঐ সকল কবিতা একজন ডাহা সেণ্টিমেণ্টাল ব্যক্তির স্বপ্নবিলাস এবং নিজের অজানিত লোকে স্বপ্নসঞ্চরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। কড়ি ও কোমলেই প্রকৃত কবি রবীন্দ্রনাথের জন্ম। কবি ও অকবির মধ্যে এ স্থানেই ভেদ। অকপট অনুভব ও অমায়িক প্রকাশ কেবল উচ্চশ্রেণীর কবিগণই জানেন।

সত্যের গুহায় হৃদয়দ্বারে প্রবেশ ও স্থিতি ব্যতীত সে'রূপ প্রকাশই সুসিদ্ধ হয় না। তা হইলে মনুষ্যমাত্রেই অন্ততঃ প্রেমের কবি হইতে পারিত। হৃদয় সত্যযোগী এবং আনন্দস্পন্দী না হইতে পারিলে কবিত্ব নাই।

অতএব, কবির প্রকাশের প্রধান শক্তিস্থান এবং সরল ও অমায়িক বাক্যশক্তির প্রধান রহস্যপদ প্রকৃতপ্রস্তাবে কোন বাক্‌বৈভবের মধ্যে নহে, উহা অবলম্বিত পদার্থের সঙ্গে কবির আত্মযোগ—পদার্থের প্রকৃতিযোগ—বিষয়ের সঙ্গে আন্তরিক 'সহানুভূতি'। ইহার অভাবে সকল বাক্যব্যাপারই শক্তিহীন হইয়া পড়িতে পারে। এরূপ অধ্যাত্মযোগ হইতেই বাক্যরীতির মধ্যে প্রকৃত প্রকাশশক্তি আসিতে পারে। নচেৎ, কেবল ভাষার 'বর্ণিমা'শক্তি (Colour) ও ছন্দের ঝঙ্কার প্রভৃতির মধ্যেও প্রকাশরহস্যের খোঁজ মিলিবে না। অতুলনীয় বাক্যবৈভবময় অনেক রচনা কেবল ভাবকে অযুক্ত অলঙ্কারে, অতিরিক্ত পরিমার্জ্জনা এবং প্রসাধনায় আবৃত করে মাত্র ; 'প্রকাশ' মোটেই করে না। বিষয়ের সঙ্গে হৃদয়ের আনন্দযোগ হইতে কবির প্রাণে স্বপ্রকাশের জন্য যে পরিস্পন্দ জাগিয়া উঠে, সামুয়েল পামারের ভাষায়, উহার নামই "Excess, the vivifying Principle of all Art"; ভবভূতি উহাকেই হৃদয়ের "পূরোৎপীড় পরীবাহ" বলিয়াছেন। কবির হৃদয় নিজের আনন্দপূর্ণতায় কূল ছাপাইয়া প্রবাহিত হইতেছে—এ স্থলেই কাব্যের শক্তি ও প্রকাশ রহস্য। কবির রসানুভূতির এই 'পরীবাহ'টুকুই তাঁহার ভাষা ও ভাব-তন্ত্রকে পরিচালিত করিতে এবং ভাষার মধ্যে পরিস্পন্দন জাগরিত করিতে পারে। অতএব, সত্যের প্রকাশ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সত্যের রসানন্দে কবির হৃদয় পূরোৎপীড় হওয়া চাই ; উহার পরেই ত তাঁহার ভাষায় পরীবাহ উৎপন্ন হইবে এবং সংসার সেই পরীবাহের ফলভাগী হইবে। পূর্ব্বে দেখিয়াছি, ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের মধ্যেই এরূপ পরীবাহের বলবত্তা ও দুর্ব্বলতা উভয়ই প্রত্যক্ষ। সত্যের এমন ঘনিষ্ঠ সহানুভূতিময় প্রকাশ অপর কোন কবির মধ্যে মিলিবে না। আবার, Idiot Boy

প্রভৃতি কবিতা ইহাও দেখাইতেছে যে, ঐ সমস্ত কবিতায় বিষয়ের সঙ্গে কবির হৃদয়ের রসানন্দযোগ যথোচিত প্রবল হইয়া পরীবাহ উৎপন্ন করিতে পারে নাই; কবির ভাবুকতা ভাষায়, ছন্দে এবং ভাবের প্রতিমায় আপনাকে অনুস্যুত করিয়া উদগ্র হইতে পারে নাই। ওয়ার্ডসোয়ার্থ সত্যকে বা প্রাণের রসানুভূতিকে নিরলঙ্কার ভাবে এবং হুবহু ঋজু ও অমায়িক ভাবে প্রকাশ করিতেই লক্ষ্য রাখিতেন; সে ক্ষেত্রে রসযোগ দুর্ব্বল হইলেই তাঁহার কবিতা একেবারে নির্জ্জীব হইয়া পড়া ব্যতীত ছাড়া ছিল না। আত্মানন্দের পরীবাহটুকুই ত কবিত্বের রসশক্তিরূপে স্বপ্রকাশী হইতে পারে!

শেকস্‌পীয়রই সাহিত্যজগতে এরূপ হৃদয়-পরীবাহের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্তস্থলী। বিষয়ের সহিত হৃদয়ের অকৃত্রিম সহানুভূতি ও আত্মযোগজনিত ঋজুতা এবং অমায়িকতায় এমন কবি সাহিত্যে আর মিলিবে না। যুবক শেকস্‌পীয়র জীবনসিন্ধুবক্ষে প্রীতিসহানুভূতির আনন্দ লীলা বিহারী তিমিঙ্গিল! আত্মযোগশক্তির প্রসারলীলায় এবং প্রকাশানন্দে কবিহৃদয় ভাবসমুদ্রে কতরূপে, কতমতে "আচামত্যবগাহতে হৃত্তিরমতে মজ্জত্যথোন্মজ্জতি" করিতে পারে তাহার প্রমাণ শেকস্‌পীয়রের 'হ্যামলেট' যুগের নাটকসমূহ। শেকস্‌পীয়র যে কত বিরাট্‌প্রাণ ও কত বহুশীর্ষ একটি 'ব্যক্তি', তাঁহার বিষয়সহানুভূতির প্রসার কত বিপুল, তাঁহার ভাবুকতার আনন্দসম্পত্তি কত বিশাল, উহার প্রকাশ কত পরিনাহী, পরীবাহী এবং অজস্র তাহার প্রমাণও একদিকে হ্যামলেট, অন্যদিকে ফলষ্টাপ্ চরিত্র। উভয়েই আত্মভাবোন্মত্ত এবং আত্মপ্রসারের আনন্দোন্মত্ত চরিত্র। উভয় চরিত্রকে একক ভাবে ধারণা করাই অনেকের মাথায় আসিবে না; সংযুক্তভাবে, একত্বসমন্বয়ী ব্যক্তি'র রূপে ধারণা ত দূরের কথা! কিন্তু হ্যামলেট ও ফলষ্টাপের সংযুক্ত 'এক ব্যক্তিতা'ই শেকস্‌পীয়র; উহাদের মনস্বিতার ওই প্রাচুর্য্য এবং ভাবুকতার ওই পরীবাহ (excess) টুকু লইয়াই শেকস্‌পীয়রের ব্যক্তিত্ব এবং কবিত্বশক্তির ওজন। এ দুইটা বাতুল চরিত্র না থাকিলে কবি শেকস্‌পীয়রের শক্তির মাত্রা-টুকু,

তাঁহার ভাবুকতা ও মনস্বিতার বহরটুকু অনুমান করিতে পারিতাম না। কবির হৃদয় উত্তরচরিত্রে একেবারে পূরোৎপীড় প্রবাহে এবং আত্মপ্রকাশের দুর্দ্দমনীয় আনন্দে আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছে! উহার পরেই একদিকে ম্যাক্‌বেথ, অথেলো, লীয়র ও অন্যদিকে উইণ্টার্স টেল ও টেম্পেষ্ট প্রভৃতিতে কবির পক্ষে শান্তহৃদয় ও সচেতন 'আর্টিষ্ট' হইবার জন্য অবকাশ ঘটিয়াছে। Antony and Cleopatraও শেকস্‌পীয়রী ভাবুকতা শক্তির ওইরূপ অজস্রতার দৃষ্টান্ত। আত্মভাণ্ডারে ভাবুকতার এরূপ অবারিত এবং অবিরল পুঁজি থাকিলেই উহা পরে পরে কবির কৌশলযন্ত্র অথবা মাজাঘষার নিয়ন্ত্রণাতেও নিজের রসশক্তি অটুট রাখিতে পারে; ভাষার পথেও অপরের হৃদয়জয়ী এবং হৃদয়গ্রাহী ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে।

সাহিত্যে সৌন্দর্য্যপ্রকাশের এই সরলতা ও অমায়িকতা এমন বস্তু যে উহা কেবল "ফলেন পরিচীয়তে"। বাছিয়া বাছিয়া সুন্দর সুন্দর উপমা-দৃষ্টান্ত-তুলনা কিংবা অনুপ্রাসের ঐশ্বর্য্যে পাঠককে একেবারে আড়ষ্ট করিয়া দিলেও প্রকৃত 'ভাব প্রকাশ' না হইতে পারে; বরঞ্চ প্রকৃত রসজ্ঞের নিকট ঐ সমস্ত কেবল লেখকের ভাবান্ধতা এবং প্রকৃতিস্থতার অভাব বিষয়েই সন্দেহের জনক হইতে পারে; অন্যদিকে, একটীমাত্র নিরলঙ্কার কথাই অনেক সময় অর্থবত্তায় এবং ব্যঞ্জনায় 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ' রূপে দাঁড়াইয়া যাইতে পারে। এরূপ সার্থক বাক্যের দৃষ্টান্তও শেকস্‌পীয়রের মধ্যেই সমধিক মিলিবে। শেকস্‌পীয়র এত বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনার বৈচিত্র্য-পথে এবং ভাবুকতার সঙ্কটসঙ্কুল স্রোতোবক্ষে কাব্যসরস্বতীর তরণীকে সুনিপুণ নাবিকের ন্যায় পরিচালিত করিয়াছেন যে তত্তুল্য দৃষ্টান্ত সাহিত্যজগতের অপর কোন-একটী কবির মধ্যে নাই; অতএব, সরস্বতীর শ্রেষ্ঠ-প্রকাশের বৈচিত্র্যও তাঁহার মধ্যেই অধিক। ম্যাথ্যু আর্নল্ড যদিও "uncertain though bewitching touches of a Shakespere" বলুন, আমরা বুঝিতে পারি যে ওই uncertainty বা আপাততঃ অস্থির বাক্যশক্তি

এবং অসতর্কতার প্রতীতিই কবি শেকস্‌পীয়রের পক্ষে একটা পরমা প্রকাশশক্তি রূপে সহায় হইয়াছে; স্বয়ত, দোষটাই গুণরূপে দাঁড়াইতেছে। শেকস্‌পীয়র যেন অনায়াসে, হেলায়-খেলায় এক-একটা ভাবজটীল অবস্থার সম্মুখীন হন, আর দু'টী কথাতেই উহার অন্তর্বোধ জন্মাইয়া দিয়া রাখিয়া যান! ভাষার এরূপ আপাততঃ নিশ্চিন্ত এবং নিরায়াস ও নিরাকুল লীলাব্যাপার—এ স্থানেই শেকস্‌পীয়র! প্রত্যেক পদে সচেতন, সতর্ক ও মাজাঘষা' বাক্যজালের 'মুনশীয়ানা' করিয়া অগ্রসর হওয়া শেকস্‌-পীয়রের ধাৎ নহে। এ সূত্রে ব্যুঁফোর একটা সার্থক কথাই মনে পড়িতেছে—" Nothing is more harmful to the warmth of style than the desire to put striking touches at every point." একালের 'রোমাণ্টিক' লেখকগণ অনেকেই ত ঐরূপ ভুল করিয়া আপনাদের শিল্পরচনাকে একেবারে অলঙ্কারভারে অচল এবং কাহিল করিয়া তোলেন! যাহাতে কেবল অলঙ্কারগুলিই দেখা যায়—তাঁহাদের মনের 'ভাব'টুকু কোথাও ধরা' দেয় না! অমাত্মিকতার এমনতর অপলাপ সাহিত্যে আর ঘটে নাই। শেকস্‌পীয়রের প্রত্যেক নাটকেই অন্ততঃ বিংশতিসংখ্যক স্থান মিলিবে, যাহাতে বাঁকে বাঁকে ভাবুকতানদীর এই মহানাবিকের নিপুণ হস্তপরিচালনার পরিচয় পাওয়া যায়; যে সকল স্থানে, যেন অবলীলা ক্রমেই, শব্দশক্তির চূড়ান্ত রসাবেগ সংযমের সঙ্গে বিবাহিত হইয়া মণিকাঞ্চন যোগ প্রমাণিত করিতেছে!

শব্দশক্তি ও ছন্দশক্তির একেবারে চূড়ান্ত ঐশ্বর্য্য সত্বেও কাব্যের 'আত্মা' কিরূপে উহা দ্বারাই চাপা পড়িতে পারে তাহার অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত কবি সুইন্‌বারণ। তাঁহার কাব্য-সুন্দরীর এত অলঙ্কার যে উহার গতিকে সুন্দরীর প্রাণ বা দেহটুকুই অনুভবগম্য হইতেছে না! এত অতিভূষিতা বাণী প্রায়ই দেখা যায় না। ছন্দের ঋদ্ধি বিষয়ে ইনি নিঃসন্দেহে ইংরাজী ভাষার শ্রেষ্ঠ কবিপদ লাভের যোগ্য। ইংরাজী সাহিত্যের গীতিকবিগণের নাম করিতে গেলে শেলী ও

সুইন্‌বারণের নামই সর্ব্বপ্রথম মনে আসে। কিন্তু, পরম ভাবযোগী শেলী দু'টিমাত্র পংক্তিতে যে'স্থলে আন্তরিকতা ও রসসিদ্ধিতে উপনীত হ'ন, সে'স্থলে সুইন্‌বারণ অলঙ্করণবহুল পঞ্চাশৎ পংক্তির বাক্যকৌশলে এবং চাতুর্য্যে কেবল মনের ভাবকে ঢাকা'দিতে চেষ্টা করেন বলিয়াই ধারণা জন্মিতে থাকে! ইংরাজী সাহিত্যের Pre-Raphælite শিল্পিগণের বিবরণ-বাহুল্য ও অতিরিক্ত প্রসাধনকলা সুইন্‌বারণের মধ্যে আসিয়া বেয়াড়া পরিণতির চূড়ান্তে উঠিয়াছে! সুইন্‌বারণের গীতি-কালোয়াতী শেলী অপেক্ষাও শক্তিশালী এবং বিস্তারবিপুল; গীতিকবিতার Technique সম্বন্ধে তিনি অসাধারণ বিন্যাসকৌশল এবং বাক্যপটুতার পরিচয় দিয়াছেন। তথাপি, কাব্যের আত্মাস্বরূপ 'রস'বস্তুর সিদ্ধি বিষয়ে তিনি শেলীর উদগ্র শক্তির এবং উদার আন্তরিকতার সমকক্ষায় উপনীত হইতে পারেন নাই। অনেক স্থলে অত্যন্ত নৈপুণ্য এবং অলঙ্কারেই রসাত্মতার হানি করিতেছে!

আবার, অন্যদিকে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যেই একটা অদ্ভুত সাহিত্যকর্ম্মীর দৃষ্টান্ত আছে। অবস্থা ও ঘটনাসৃষ্টি এবং চরিত্রদৃষ্টির বিপুল-বিস্তারিত লীলাময় শতপরিমিত নাট্যগ্রন্থ! তথাপি রচনাকর্ত্তাকে উচ্চ শ্রেণীতে গণনীয় কবির খ্যাতি দান করিতেই সাহিত্যরসিকগণের মন ইতস্ততঃ করে। গিরিশচন্দ্র ঘোষের পাখা ছিল না, তাই তিনি ভাবের আকাশে উড়িতে চেষ্টাই করেন নাই; আস্ত সমতল মাটীর উপর দিয়া পায়চারি করিয়াই গিয়াছেন। কালিদাস যে মেঘদূত কাব্যের মহাভাবোদ্ধত হইয়া নিজের প্রাণকেই যেন বলিয়া উঠিয়াছিলেন—

স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলা দুৎপতোদঙ্মুখঃ খং,

গিরিশচন্দ্র আপন প্রাণের মধ্যে সেরূপ খেচরধর্ম্মে গগনবিহারী হইবার জন্য কোন আনন্দপ্রেরণা কদাপি যেন অনুভব করেন নাই! কবিত্ব বলিতে যাহা বুঝায়, তাঁহার বিপুল নাট্যরাজী হইতে কতিপয় সঙ্গীত ব্যতীত তদনুরূপ দশটী পংক্তি পরিচিহ্নিত করাই দুষ্কর! অথচ গিরিশচন্দ্রের অসাধারণ মনীষা; সহানুভূতির শক্তিও বিপুল; পাণ্ডিত্য—অন্ততঃ

এলিজাবেথযুগের ইংরাজী নাট্যসাহিত্যের পুঁথিবিদ্যাও সামান্য নহে। সে যুগের বিলাতী নাট্যকারগণকে ইনি যেন ছেঁচিয়া-পুড়িয়া-খাইয়া হজম করিয়া বসিয়াছেন; পদে পদে তাঁহাদের শিল্পকৌশল, ঘটনা ও অবস্থার সংস্থান এবং সংযোজনা তাঁহার লেখনীতে আসিয়া পড়িয়াছে। তথাপি, আমাদের হৃদয় ডাকিয়া উঠে, কোনরূপ সাহিত্যরচনায় তিনি যেন লক্ষ্যই করেন নাই। তাঁহার একটি নাটকও যেন 'কাব্য' নহে; গদ্যও নহে, সুন্দর পদ্যও নহে—তাঁহার নিজের কথায় 'গৈরিশী'ছন্দে রচিত হইলেও পদ্য নহে। মধুসূদন বা হেমনবীনের সমকক্ষ ভাবুকতা ত দূরের কথা, তুলনাযোগ্য বাক্যশক্তি, বিবরণী কিংবা বর্ণনী শক্তির পরিচয়ও গিরিশচন্দ্রে পাওয়া যায় না। প্রকৃত বাণীপুত্রের কথার মধ্যেই যে একটা 'সাধনা'র গন্ধ থাকে, একটা 'সাধা গলা'র আমেজ এবং বৈশিষ্ট্য থাকে এই বিপুলকর্ম্মা লেখকের মধ্যে তাহারই অভাব! ভাষা এত সাধারণ এবং ভাবুকতা এত দুর্ব্বল যে, কথার বাঁধুনি এত শিথিল ও শব্দশক্তি এত বৈশিষ্ট্যহীন এবং কাহিল যে কোথাও উচ্চ সাহিত্যের উপযোগী মনস্বিতা কিংবা তেজস্বিতা লাভ করিতে পারিতেছে না। সাহিত্যের প্রথম বস্তু যে ভাষা, তাহার দিকে দৃষ্টি একেবারেই নাই। মনুষ্যজীবনের কোন গভীর সমস্যার ধারণা, জীবনের আলেখ্যরচনাতে উচ্চসাহিত্যের উপযোগী কোনরূপ সূক্ষ্মতা কি গভীরতার পরিচয় কিংবা কোন প্রকার মনোমত্তা ও উচ্চশ্রেণীর মনোজীবনের প্রমাণ গিরিশচন্দ্রের মধ্যে উদগ্র হইতে পারিতেছে না! সাধারণ তাঁহার শ্রোতা; সাধারণ বিষয়; বক্তাও কোনদিকে অসাধারণ নহেন। বাঙ্গালার রঙ্গালয়ের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্রের পূজনীয় পদবী—বঙ্গদেশের সাধারণ সামাজিকের শিক্ষাব্যাপারেও সুতরাং তাহার গৌরবময় স্থান। কিন্তু বিপুল-বিস্তারিত সারস্বতশক্তির লীলাব্যাপার সত্ত্বেও উহাতে যে সমুচ্চ 'সাহিত্য'-আদর্শের সৌন্দর্য্যপ্রকাশ কিঞ্চিন্মাত্র না ঘটিতে পারে, উহা যে 'কাব্য'আদর্শের একেবারে পাশ কাটিয়া চলিয়া যাইতে পারে, তাহার

দৃষ্টান্তস্থান গিরিশচন্দ্র। অথচ গিরিশচন্দ্র পল্লবগ্রাহী নহেন; পাতলা মতি বা অস্থিরচরিত্রের ব্যক্তি নিশ্চয়ই নহেন; সাহিত্যক্ষেত্রে কোনরূপ দুর্বৃত্ততা কিংবা দৌরাত্ম্যও তাঁহার নাই। তথাপি, শতসংখ্যক কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াও, বাণীমন্দিরের অন্তরঙ্গ সাধকরূপে তিনি আত্মপরিচয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছেন না! এ ব্যাপারের হেতুযোগ কোথায়, এ অনর্থের মূল কোথায় সাহিত্যসেবক তদনুসন্ধানে কোন সময় ব্যয় করিলে তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে অপব্যয় হইবে না।

গিরিশচন্দ্র যাহাই লেখেন তাঁহার হৃদয়ের সঙ্গে যেন উহার প্রকৃত যোগ নাই। নিজের বহির্ব্বাটীর 'বৈঠকখানা'য় বসিয়া গিরিশচন্দ্র যেন কেবল বুদ্ধিসংযোগে অভিনয় করিয়া যাইতেছেন; অপর কোন এক ব্যক্তি উহা লিখিয়া চলিয়াছে! এই সাময়িকতা, সময়-সেবা ও তন্মুহূর্ত্তে লিপিবদ্ধ করার অপিচ dictate করার গন্ধ গিরিশচন্দ্রের প্রত্যেক রচনাতেই সহৃদয়বেদ্য হইয়া আছে! তাঁহার সঙ্গে 'বাঙ্গালার গ্রাম্যকবি' গোবিন্দ দাসের তুলনা কর। গিরিশচন্দ্র গোবিন্দ দাস অপেক্ষা শতাধিক গুণে শিক্ষিত; তাঁহার সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বপদবী, মনস্বিতা এবং মনুষ্যজীবনের বিচিত্রবিধ অবস্থার সঙ্গে সহানুভূতির বহরও গোবিন্দ দাস অপেক্ষা শতাধিক গুণে বিস্তৃত। নিজের নিতান্ত সাধারণ সুখদুঃখের ঐকান্তিক এবং আসন্ন সম্পর্ক ব্যতীত গোবিন্দ দাসের সরস্বতী কখনও বীণা ধারণ করেন নাই—এমন সীমাসংকীর্ণ এবং আত্মশৃঙ্খলিত সরস্বতী সাহিত্যজগতে প্রায়ই দেখা যায় না। তথাপি গোবিন্দ দাস যাহাই লেখেন, উহার প্রত্যেকটী পংক্তি যেন তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তম তল হইতেই বহির্গত হইয়া আসিতেছে; প্রত্যেক পদেই তাঁহার হৃদয়রক্তের উত্তাপ এবং আবেগজ্বালাময় প্রাণের তাজা গন্ধ পাওয়া যাইতেছে! অগভীর হইলেও স্বভাবকবির তাজা প্রাণগন্ধী এবং অমায়িক প্রাণময় শব্দশক্তি! গোবিন্দ দাসের মধ্যে অনেক সময় নিদারুণ গ্রাম্যতা এবং বর্ব্বরতা আছে; সহরে ভব্যতা এবং লেপাবাদোরস্তির আদর্শ আদবেই নাই; কিন্তু, তবু তাঁহার ভাষাই চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। নিজের প্রাণটাকে নিরাকুল,

ঋজু ও অমায়িক প্রকাশ দান করিবার গুণেই তাঁহার ভাষার এই শক্তি। আত্মপ্রকাশের এ'রূপ শক্তি সাহিত্যসংসারে সুলভ নহে বলিয়াই হয়ত গোবিন্দ দাসের গৌরব উত্তরোত্তর বাড়িবে ব্যতীত কমিবে না।

ইহার পর সৌন্দর্য্যের প্রকাশরীতি লইয়াই বিচারপ্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। সাহিত্যের Epic, Lyric, Dramatic আকৃতি এবং উহাদের মধ্যেই আবার শত সহস্র প্রকারের ভেদ, বিভিন্ন ছন্দ ও সুরতালের বিভেদ এই 'রীতি' লইয়াই দাঁড়াইতেছে। সে সব আলোচনা বর্ত্তমান প্রসঙ্গের আয়ত্তে নহে। তবে, প্রকাশের সরল ও অমায়িক রীতি বলিতে অনেকে কেবল কথাবার্ত্তার ভাষারীতি মনে করিয়াই ভুল করিতে পারেন। মনুষ্যের প্রাত্যহিক জীবনের হুবহু আলাপী ভাষাকেই কাব্যের বা সাহিত্যের ভাষা করা উচিত—এ'রূপ 'থিওরী' কবি ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থ প্রচার করেন বলিয়া দুর্নাম আছে। তা' হইলেও তিনি থিওরী টুকুর জনক মাত্র; কবিকর্ম্মে উহাকে সবিশেষ অবলম্বন করেন নাই। উহাকে প্রকৃত 'প্রয়োগ' এবং ক্রিয়াব্যবহারে অনুসরণ করেন, বলিতে পারি, ব্রাউনীং। 'নাটুকে' প্রণালীতে কাব্যের ক্ষেত্রেই প্রাকৃতজনের ভাষায় 'প্রাকৃতবাদ' ও সত্যবাদের অনুসরণ বিষয়ে ব্রাউনীং আধুনিক নবেলের Realist এবং Naturalistগণেরও অগ্রগামী। বহু বৎসর ধরিয়া, নিজের দীর্ঘজীবন জুড়িয়া কাব্যেই Monodramaর আলাপী ভাষায় মানবচরিত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং মনস্তত্ত্বের বিবরণ প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলেন এই ব্রাউনীং; এখন সে 'রীতি'ই নবেলের ক্ষেত্রে বিস্তারিত ভাবে পশার জমাইয়াছে। 'প্রাকৃতবাদ', 'সত্যবাদ' ও Psychology—এ সকল 'রীতি'কথা শ্রবণ মাত্র বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে 'সৌন্দর্য্য' উহাদের প্রধান লক্ষ্য নহে; 'সত্য'ই উদগ্র। নিজের 'নাটুকে' রীতি এবং Monodramaর 'একোক্তি' রীতির ফল বিষয়ে ব্রাউনীং স্বয়ং ভাবী পত্নী ব্যারেট্‌কে লিখিয়াছিলেন, "You have spoken out; I have made men and women speak for themselves." প্রাকৃত কথাবার্ত্তার একটা বিশেষত্ব

৭০। সাহিত্যে সৌন্দর্য্যের প্রকাশ-ক্ষেত্রে ব্রাউনীং।

থাকিলেও উহার মধ্যে যে ভাবুকতার কৌলিন্য ও উচ্চাঙ্গের কাব্যমাহাত্ম্য-সাধনার অবকাশ অত্যন্ত কম, তাহা ব্রাউনীং যেন বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাহা সত্ত্বেও নিরতিশয় বুদ্ধিকৌশল এবং লিপিচাতুর্য্য দেখাইয়া ব্রাউনীং একোক্তি এবং 'স্বগত উক্তি'র পথেই এরূপ চরিত্রবিশ্লেষণ ও মনস্তত্ত্ব দেখাইতে গিয়াছেন। উহাতেই ব্রাউনীংয়ের মধ্যে কাব্যরসের অনুপাত মন্দীভূত করিয়া কেবল Realism ও Naturalism এর তত্ত্বগরিমাই চড়াইয়া দিয়াছে; তাঁহার কবিতা হ্লাদিনীবৃত্তি অপেক্ষা বরং পাঠকের বৈজ্ঞানিক কুতূহল এবং গবেষণার তৃপ্তিকেই উগ্র উদ্দেশ্যরূপে বরণ করিয়াছে। Andrea del-serto অথবা Bishop orders প্রভৃতি কবিতা এবং ঐ জাতীয় বহু কবিতা পাঠ করিতে বসিলে পাঠকের কেবলই মনে হইতে থাকে—"এ সমস্ত ত পদ্যে না হইয়া গদ্যে হইলেই যেন ভাল হইত।" এ'জন্য বুকেনন যে বলিয়াছেন, "ব্রাউনীংয়ের মধ্যে "Little matter with more art" অথবা যে জুড়ি মিলাইয়া দিয়াছেন "Browning and commonplace" তাহা সুপ্রযুক্ত বলিয়াই ধারণা হইতে থাকে। ফলতঃ কাব্যের ছন্দেই অনেক সময় কথাবার্ত্তার একটা Dignity ও Distinction-বিহীন রীতি—উহাই ব্রাউনীংয়ের। মানবচরিত্রে অন্তর্দৃষ্টি ও দার্শনিক প্রবেশের ক্ষমতায়, তত্ত্বানুজীবী চারিত্র ধারণায় এবং সেই দিকে নিজের অভিনিবেশশক্তির মৌলিকতায় ব্রাউনীং সাহিত্যজগতে অতুলনীয়। কোন সমালোচক দেখাইয়াছেন ব্রাউনীংয়ের "দ্বাদশ তত্ত্ব" ("Twelve messages of Robert Browning") তাঁহাকে কেমন কবিকৌলিন্যে ও কবিগণের বরেণ্য পদবীতে অভিষিক্ত করিয়াছে। কিন্তু কাব্যে ত তত্ত্বের পদবী গৌণ। চমৎকারকারী কাব্যরসের সাধনায় Dramatic Monologue এর উপযোগিতা কত? কর্ম্মহীন কোন চরিত কথা, কোন স্বগত উক্তি কিংবা কেবল Character in soliloquy আমাদিগকে কতদূর চমৎকারাপন্ন অথবা ভাবাবিষ্ট করিতে পারে? পাঠকের হৃদয় বলিবে কবিতার ভাবগত রসাবেশ টুকুতেই আমাদের প্রয়োজন। ব্রাউনীংয়ের পূর্ব্বোক্ত কবিতা হইতে উহাদের অন্তর্ম্মর্ম্মবাহী, সুবিরল কাব্যরসের শুধু

ধারাটুকু উদ্ধার করার সমস্তাভার পাঠকের স্কন্ধে দেওয়া হইয়াছে। এ সকল Scientific আদর্শের কবিতা আমাদিগকে যেন যথেষ্ট মতে গরম করিয়া তুলিতে পারে না—সুন্দর তত্ত্বটাও নহে। তত্ত্বটুকুন কোনমতে জানা' হইয়া গেলেই পাঠকের কৌতূহল (Curiosity) ঢিলা হইয়া পড়ে। তখন মনে হইতে থাকে, উহার ভিতরের 'রস'বস্তুটুকু "Is a grain of wheat in a bushel of chaff." কেবল পাঠকের সত্যজিজ্ঞাসা ও জ্ঞানকুতূহলের উপরেই কাব্যের প্রাণ প্রাধাণ্যতঃ নির্ভর করিলে উহা কদাপি অনবদ্য আদর্শের কাব্য নহে। এ'দিকে সেক্‌স্‌পীয়র হইতে ব্রাউনীংয়ের পার্থক্য এই যে, সেক্‌স্‌পীয়র নাট্যকবি—তিনি কেবল Character in Situation নহে, Character in Action দেখাইয়া, মনুষ্যজীবনের পরিপূর্ণ ছবি দেখাইয়াই কাব্যের তত্ত্ব-সত্য-ভাব ও রস সিদ্ধি করিয়াছেন। পাঠকের হৃদয়-মন-বুদ্ধি সেক্‌স্‌পীয়রের প্রত্যেক কথায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে। উহার তুলনায় ব্রাউনীংয়ের সহযাত্রী ব্যক্তির মধ্যে বরং দার্শনিকতার ও হেঁয়ালীচিন্তার কণ্টকজ্বালা টুকুই বাড়িয়া চলে। সত্য যে কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, সৌন্দর্য্য বা 'সুন্দর সত্য'ই যে কাব্যে প্রধান, সে কথা যেন ব্রাউনীং বুঝিতে বা অনুসরণ করিতে চাহেন নাই। প্যারাসেল্‌সের সময়েই ব্রাউনীংয়ের 'দ্বাদশতত্ত্বের' প্রায় সকলগুলি তাঁহার কাব্য মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে; পরে পরে সে সমস্ত 'তত্ত্ব' কেবল বিভিন্ন মূর্ত্তিতে ও সাজ-পোষাকে ব্রাউনীংয়ের বিভিন্ন কবিতার পথে নিজের পুনরাবৃত্তি করিয়াছে ব্যতীত আর কিছুই নহে। বয়োবৃদ্ধি এবং প্রৌঢ়তার সঙ্গে সঙ্গে কবি তাঁহার Dramatic Monologueএর সত্যবাদ এবং প্রাকৃতবাদকে পুনঃপুনঃ বর্দ্ধিত জেদেই যেন আঁকড়িয়া ধরিতে চাহিয়াছেন!

ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের মধ্যেও যে সময় সময় কবিপ্রতিভার নিদ্রাবস্থা, শস্তা কথা ও বিরসতার দুর্ঘটনা আছে, উহার প্রধান হেতুটাও তাঁহার অতর্কিত Realism ও Naturalism ব্যতীত আর কিছুই নহে। বিশেষত্ববিহীন প্রাকৃত বিষয় এবং প্রকাশের প্রাকৃতবাদী 'নক্‌সা'র রীতিই

তাঁহাকে পাখা মেলিতে দেয় নাই। মোটাকথায় সত্যের চিন্ময় রূপ ও চিত্তচমৎকারী প্রতিমাতত্ত্বকে মুষ্টিগত করিতে না পারাতেই স্থলবিশেষে তাঁহার Dulness. সৌন্দর্য্য কিংবা রসপ্রকাশের রীতি ও দার্শনিক সত্য প্রকাশের রীতি যে সর্ব্বথা 'এক' নহে তাহাই সাহিত্যসেবীকে এ'দু'জন বড় কবির বিফল ও দুর্ব্বল স্থলগুলির দৃষ্টান্তসাহায্যে বুঝিতে হয়। আবার, ব্রাউনীংয়ের মধ্যে, নানাস্থানে অস্পষ্টতা ও অবোধ্যবস্তু আছে; তেমন রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও অনেক স্থলে আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অস্পষ্টতার অধিকাংশ তাহার "সঙ্গীতধর্ম্ম" গতিকেই উপজাত—ব্রাউনীং কদাচিৎ সঙ্গীতধর্ম্মী অস্পষ্টতায় আক্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহার কাব্যের বিচিত্র পাত্র সমূহের ব্যক্তিবিচিত্র 'আলাপী রীতি'ই (Colloquiel) ব্রাউনীংয়ের অস্পষ্টতার কারণ—ভাবের কোনরূপ আবেশ-ধর্ম্মে, কি দার্শনিক দৃষ্টির গভীরতা অথবা তত্ত্বপদার্থের গহনতার গতিকেও নহে। এক একটা সবিশেষ পাত্রচরিত্র খাড়া করিয়া ব্রাউনীং একোক্তি এবং স্বগত উক্তির পথে তাঁহার 'সত্য' প্রকাশ করিতে গিয়াছেন; উহারা অনেক সময় একেবারে প্রাকৃত এবং আপ্‌খেয়ালী 'আলাপী' ভাষার পথে, (কবির ব্যক্তিচরিত্র-অঙ্কনের আদর্শ এবং Local colouring প্রভৃতির বাধ্য হইয়া), কখন বা খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কখন বা লাফাইয়া লাফাইয়া, ন্যায়যুক্তির তিন-চারিটা ধাপ এক এক লম্ফে ডিঙ্গাইয়াই চলিতে থাকে। এই অস্পষ্টতা সুতরাং অনেক স্থলেই অতিরিক্তগোছের 'ঘরোয়া রীতি' বা 'ইয়ারী রীতির' অস্পষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নহে; 'গভীর ভাব' বলিয়াই যে অস্পষ্ট তাহা একেবারেই নহে। ব্রাউনীংয়ের বিরুদ্ধে পাঠকের দিক্ হইতে নিয়ত অভিযোগ এই যে, পাঠক কবির কপোলকল্পিত পাত্রগুলার এতাদৃশ খামখেয়ালী ও 'চার ইয়ারী' রীতির ভাষা আয়ত্ত করিবার জন্য এত ক্লিষ্টতা স্বীকার কেন করিবে? এতটুকু 'ছাই পাশ' ঘাঁটিয়া পরিশেষে যে টুকুন তত্ত্ব, সত্য বা রসের 'রত্ন' মিলিতেছে তাহাতে যে পরিশ্রমের মূল্যটাও পোষায় না! কবি কিন্তু এ অভিযোগে কোন কালেই কর্ণপাত করেন নাই।

উহাতে ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, ব্রাউনীংয়ের তত্ত্বগুলি সাহিত্যের স্থায়ী বিত্তরূপে সর্ব্বত্র বহুসম্মানে গৃহীত এবং সমুদ্ধৃত হইতেছে; সাহিত্যপাঠকের মুখেমুখেই সুপ্রচলিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু ব্রাউনীংয়ের ভাষা কিংবা শিল্পপ্রতিমা ও ভাবের উপস্থাপনা (যাহার উপরেই কবিগণের বিশিষ্ঠতা ও গৌরব সে সমস্ত) কদাচিৎ আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছে। অধিকাংশই যথেষ্ট মতে কাব্যরসাত্মক হয় নাই। কবি সত্যকে কাব্যের বিভাব-অনুভাবাদির দ্বারা প্রমূর্ত্ত রূপে নির্ব্বণিত করেন ও মানুষের সহানুভূতিযোগ্য আকারেই রসাত্মক এবং হৃদয়গ্রাহী করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন, তাই বলিয়া দার্শনিক হইতে কবির বিশেষত্ব। কাব্য ও দর্শনের প্রকাশরীতি সুতরাং বিভিন্ন না হইয়া পারে না। মনে পড়িতেছে, কোন বিলাতী সমালোচক বলিয়াছেন, "সত্যের যেই প্রকাশের দিক্ হইতে প্লাতোকে কবি বলা যাইতে পারে, সেই সত্যের দিক্ হইতে ব্রাউনীংকেও দার্শনিক বলা যায়।" প্লাতোর প্রকাশরীতি ভাবময়; ব্রাউনীংয়ের প্রকাশরীতি নিরেট দার্শনিকতায় পূর্ণ। ফলতঃ এই দার্শনিকতা যে অতিরিক্ত হইয়াছে, ব্রাউনীং সকল সত্যকে কাব্যের রসপরিব্যক্তি যে দিতে পারেন নাই, সে কথা তাঁহার ভক্ত সমালোচক ডাওডেন ও ষ্টপ্‌ফোর্ড্ ব্রূক উভয়ে স্বীকার করিয়াছেন। ব্রাউনীংয়ের অনেক তত্ত্ব ও তথ্য রবীন্দ্রনাথ গীতিকবিতা ও সঙ্গীতে বিভিন্ন আকারে আত্মস্থ করিয়াছেন। রবীন্দ্রের মধ্যে আসিয়া ঐ সমস্ত ভাবুকতারীতির আশমানী ধর্ম্মে অথবা সঙ্গীতকবির সুর, তাল ও 'বোলচাল' বশেই অস্পষ্ট। ব্রাউনীং যেরূপ অত্যন্ত গা ঘেঁসিয়া 'চুপি কথা' কহিতে অথবা কর্ণমন্ত্র দিতে চেষ্টা করেন, রবীন্দ্রনাথ তদনুরূপেই অনেক সময় সুরতালের অঘোরে তুলিয়া কেবল ঈষারা-ইঙ্গিতেই একটা 'রস'পরিব্যক্তি লক্ষ্য করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রৌঢ় বয়সের অনেক কবিতাতেও কেবল নিরাকার দার্শনিকতার অনুপাতই অধিক। তবে, পার্থক্য এই যে রবীন্দ্রনাথ জন্মসিদ্ধ গায়ক ও গীতিকবি। তিনি সত্যের অনুভূতিকে মুখামুখী গ্রহণে ভাবোজ্জ্বল করিয়া প্রকাশ

করেন। এজন্য তাঁহার কবিতামধ্যে অনেক সময় সত্যের 'প্রমূর্ত্তি' হয়ত নাই, কিন্তু ভাবময় ঈষারা বা প্রকাশ আছে—যাহা হয়ত উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীত কবিতা।

একদিকে দার্শনিকতা হইতে, অন্যদিকে সঙ্গীত হইতেও কাব্যের ভাব-পরিব্যক্তির প্রণালীগত পার্থক্যটুকুও হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। সত্যের প্রকাশে সৌন্দর্য্যময় প্রতিমার সংঘটনা কবির পক্ষে পরম সৌভাগ্যসংযোগের পরিচয়। পরিণত বয়সের রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতায় কেবল সত্যের বস্তুরূপহীন ভাবগত প্রকাশই মিলিতেছে। যেমন "সুদূরের পিয়াসী" 'সব পেয়েছির দেশ' প্রভৃতি শত শত কবিতা। কিন্তু টেনিসনকে লক্ষ কর—টেনিসন কাব্যের ক্ষেত্রে প্রকৃত Artist; এক একটী ভাবকে 'আত্মা' করিয়া তিনি এক একটী সৃষ্টি করেন; ভাবকে রসসুন্দর ব্যক্তিত্ব ও মূর্ত্তি দান করিতেই চেষ্টা করেন। ব্রাউনীংও সে চেষ্টাই করিয়াছেন; তবে ব্রাউনীংএর অনেক প্রমূর্ত্তি তাহা Realism ও Nasturalismএর অনুচ্চভূমি ও বিরস আবহাওয়ার গতিকেই রসিক ব্যক্তির মনকে ব্যাহত করিতে থাকে। টেনিসন দার্শনিক মনস্বিতার হিসাবে ব্রাউনীং হইতে হয়ত অনেক খাটো; কিন্তু কাব্যশিল্পের ক্ষেত্রে টেনিসন শেলী, কীট্‌স্ ও ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের পরবর্ত্তী এবং তাঁহাদের বিভাবনা ও প্রকাশপদ্ধতির সুযোগ্য উত্তরাধিকার স্বত্বেই দাঁড়াইয়াছেন। টেনিসনের ভাবপ্রকাশ মাত্রেই অনুরূপ প্রতিমা অবলম্বনে উপস্থিত হয়। এজন্য, দার্শনিক হিসাবে ব্রাউনীং হইতে হয়ত হীন হইয়াও, কবি হিসাবে টেনিসন (অনেকের মতেই) বড় কবি।

যে রূপেই হোক, আমাদিগকে বুঝিতে হয় যে, কেবল প্রাদেশিকতা গ্রাম্যতা বা আলাপের রীতিই ভাবপ্রকাশে অমায়িক হইবার অথবা পাঠকের অন্তরঙ্গতা লাভ করিবার পথ নহে। বরঞ্চ আলাপী পথেই যতটা অস্পষ্ট ও দুর্ব্বোধ্য হইবার অবকাশ আছে, ফকিরী ঢংয়ের বোল-চালের সাহায্যে নিতান্ত সাধারণ ও বৈশিষ্ট্যহীন ভাবকেই জবরদস্ত ও গভীর

৭০। সৌন্দর্য্যের বিচিত্র প্রতিমানিষ্ঠ প্রকাশ।

দেখাইয়া লোকের চক্ষে ধূলা দেওয়ার সুবিধা আছে, তেমন আর কুত্রাপি নাই। কি করিয়া শ্রেষ্ঠ কবিগণ সৌন্দর্য্যকে দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া অমায়িক ও প্রাণস্পর্শী আকারে প্রকাশ দান করেন, কোন্ শক্তিতে তাঁহাদের ভাষা মরমভেদী হয় তাহা সাহিত্যরসিকের পরম গবেষণার সামগ্রী। তবে, ইহা নিশ্চিত যে, উহার রহস্য অনেক সময় স্বয়ং কবিরও সতর্ক চেষ্টার বহির্ভূত। ভাবযোগের ঘনিষ্টতা হইতেই ভাষায়, অর্থে, ছন্দে ও সুরতালে অপরূপ 'মন্ত্রশক্তি' সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রাণবান্ হইয়া সারস্বত ক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ 'প্রকাশ'গুলি আবির্ভূত হয়। প্রাণই প্রাণ দান করিতে এবং প্রাণি-পদার্থের সৃষ্টি করিতে পারে। অতএব, সর্ব্ব অবস্থায় নিজের ও পদার্থের হৃদয়গুহায় প্রবেশ এবং প্রাণক্ষেত্রে যাওয়াই প্রধান কথা। সৌভাগ্যযোগে কবিগণ উহা কচিৎ কখন পারিয়া থাকেন। যখন পারেন, তখনই তাঁহাদের কথা প্রাণী হইয়া বাহির হয়, তখনই উহা তাঁহাদের ভাষা ও শিল্পপ্রতিমাকে প্রাণী করিতে এবং সহৃদয় মাত্রের প্রাণারাম হইতে পারে।

সৌন্দর্য্যের প্রকাশে যথাযোগ্য প্রমূর্ত্তি সংঘটন করিতে পারাই কবিগণের পক্ষে পরম সৌভাগ্যযোগ। নচেৎ কাব্য কেবল নির্ব্বিশেষ ভাবুকতা অথবা কেবল সঙ্গীততন্ত্রীয় বোলচাল ও 'ভাবের ফেনা' মাত্রে পর্য্যবসিত হইতে পারে। এজন্য, সকল দেশের সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যেই দেখিব, শ্রেষ্ঠশ্রেণীর কবিগণ ভাবকে সার্থক ভাষায় বিমূর্ত্ত প্রতিমায় ধারণা করিয়াই পরস্পর হইতে বিশিষ্ট পদবীতে ও বিজয়ী স্বরূপে দাঁড়াইয়া আছেন। অনেক সময় হয়ত একই সত্যের বা সৌন্দর্য্যের কেবল বিভিন্নআদর্শী এবং বিভিন্নমূর্ত্তি প্রকাশ। একই তত্ত্বকে বিভিন্ন কবি স্ব স্ব প্রকৃতিবশে কিরূপে ব্যক্তিবিচিত্র ভাব, ভাষা ও রীতিতে এবং আকৃতিপ্রকৃতিতে প্রকাশ করিয়াছেন, কখন বা একে অন্যের অনুবাদ, বিবাদ অথবা প্রতিবাদেই চলিয়াছেন, তাহা চিন্তা করা সাহিত্যসেবার একটা পরম আনন্দস্থলী। একই ভাব বা তত্ত্ব কত বিভিন্ন আকারে মিলিতেছে! যেই 'আদর্শের অন্বেষণ' সাহিত্যে রোমান্টিক রীতির আদিশক্তি, জর্ম্মনীর

রোমান্টিকগণ যাহার নাম দিয়াছিলেন—'নীলফুলের অন্বেষণ', তাহাই ত আধুনিক কালে মেতর্লিঙ্কের মধ্যে আসিয়া হইয়াছে Blue Bird; রবীন্দ্রনাথের মধ্যে রং বদলাইয়া উহাই ত দাঁড়াইয়াছে—'রক্তকরবী'! 'আদর্শ' বলিতে আদর্শসৌন্দর্য্য ও আদর্শজ্ঞান—যাহার দিকে মানবাত্মার নিত্যক্ষুধা। দার্শনিক বলিবেন, তাহার নাম 'সচ্চিদানন্দ'; 'রসিক' ভক্ত বলিবেন, 'অখিল রসামৃত মূর্ত্তি'। আদর্শভূত সেই চরম অপ্রাপ্ত বস্তুর অভিমুখে জীবহৃদয়ের এই যে আবেগ ইহাই ত জগতের সকল 'গতি'র নিদান—"The thirst of the moth for the star"! আমরা দেখিয়াছি, আদর্শসৌন্দর্য্যের এই অন্বেষণার মহাতত্ত্বে একদিকে সমুদ্ধ হইয়া এবং কবিত্বের মহাপ্রাণী ভাবে সচেতন থাকিয়াই কালিদাস লিখিয়াছিলেন 'মেঘদূত'; কীট্‌স্ লিখিয়াছেন Endymion; আবার, জুদারম্যান ওই অপ্রাপ্ত-সুদূর আদর্শের জীবনপরিচালনী শক্তিবার্ত্তা ঘোষণা করিয়াই লিখিয়াছেন তাঁহার 'Far Off Princess'। অন্যদিকে, আদর্শজ্ঞানের অন্বেষণা, যাহার 'পুর' যত অগ্রসর হই ততই দূরগামী হইতে থাকে, যাহার স্থিতি নিত্যকাল 'সুদূরে', তাহার তত্ত্বভাবে জাগ্রত হইয়াই টেনিসন লিখিয়াছেন তাঁহার 'ইউলিসিস'; ওই অন্বেষণ-ব্যাপারকেই প্রশংসিত করিয়া আবার লিখিয়াছেন 'Merlin and the Gleam'! রবীন্দ্রনাথ কোনরূপ প্রতিমা বা symbol সৃষ্টি বিনা, নির্ব্বিশেষ 'তত্ত্ব'প্রিয় সঙ্গীত-কবির ভাবোদ্দীপ্ত হইয়া, কেবল মানবহৃদয়ে ওইরূপ একটা 'তৃষ্ণা'তত্ত্ব যে আছে তাহা অবলম্বন করিয়াই একটা সঙ্গীত-কবিতায় নিজের হৃদয় অবারিত করিলেন—যাহাতে কিঞ্চিৎ বেখাপ্পা শুনাইতেছে, কেননা কেবল 'সুদূর' বলিয়াই কেহ ত কোন বস্তুর 'পিয়াসী' হয় না—

"হে সুদূর—আমি সুদূরের পিয়াসী।"

সেরূপ, গ্রীক দার্শনিকের শিষ্য ও ন্যূনাধিক বহিঃসৌন্দর্য্যের পূজারী কীট্‌স্ যেই ভাবতত্ত্বকে (The first in beauty, is first in might) অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন তাঁহার 'Fragment of Hyperion',

বেদপন্থী ঋষির শিষ্য কালিদাস সেই সৌন্দর্য্য বা কুমারত্ব আদর্শের সঙ্গে অধ্যাত্মশক্তিময় ব্রহ্মচর্য্যের বিশ্ববিজয়ী বীর্য্যবত্তা সমাযুক্ত করিয়াই লিখিয়াছিলেন তাঁহার Fragment (?) of কুমারসম্ভব। উভয় কবি, পরস্পরের অজ্ঞাতসারে জগৎতত্ত্বে সৌকুমার্য্যকেই যে দানবিক বলশক্তি বা 'আসুর সম্পত্তি' অপেক্ষা সমধিক বীর্য্যবান্ স্বরূপে দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ হয় কি? সেরূপ, আধুনিক রোমাণ্টিকতার একটা প্রবল লক্ষণ যেই 'পৃথিবী পূজা' তাহার অনুসরণে প্রাচীন 'স্বর্গ' আদর্শের বিদ্বেষী ভাবের ভাবুক হইয়া ষ্টীফেন্ ফিলিপস্ লিখিয়াছেন তাঁহার অতুলনীয় 'Marpassa'; সে পথেই রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন তাঁহার 'স্বর্গ হইতে বিদায়' ও 'বসুন্ধরা'। একই 'মৃন্ময়ী' প্রীতি ও পার্থিবতায় নানাদিকে চেলা হইয়াই রসেটী (Dante Gabriel) লিখিয়াছিলেন তাঁহার 'Blessed Damozel'; অগাষ্টা ওয়েবষ্টার লিখিয়াছেন তাঁহার 'কালীপ্সো'। আবার, কবি শীলার (হয়ত কবিবুদ্ধির ক্ষণিক বিভ্রান্তি-বশে) মনে করিয়াছিলেন যে, খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভাবে এবং যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশকাষ্ঠে প্রাণদানের পরেই প্রাচীন জগতের Pan বা প্রকৃতি-দেবতার চিরতরে মৃত্যু ঘটিয়াছে; সে বিশ্বাসেই লিখিয়াছিলেন তাঁহার "Pan is Dead"। ব্যারেট ব্রাউনীংএর 'কবিপ্রাণে' উহা বড়ই লাগিল; তিনি নিসর্গদেবতার অনশ্বর সৌন্দর্য্যের পুনর্ণবা শক্তি ও নিত্য মাহাত্ম্যের কীর্ত্তন করিয়া লিখিলেন "Pan is not Dead"। কবি রোদন নোলও গ্রীক 'বনদেবতা'র অমরমাহাত্ম্য সমর্থন করিয়াই লিখিয়াছেন তাঁহার "Pan"। স্পষ্টতঃ খ্রীষ্টান কবি শীলারের ভাবসূত্র অনুসরণেই রবীন্দ্র-নাথ 'সাধনা'য় প্রথম লিখিয়াছিলেন তাঁহার 'উর্ব্বশী' এবঞ্চ উহার অন্তিম শ্লোকের সেই আপশোষ—"ফিরিবে না ফিরিবে না, অস্ত গেছে সে গৌরবশশী—অস্তাচলবাসিনী উর্ব্বশী" ইত্যাদি। ইদানীং ভারতীয় কবি অবশ্য নিজের ভাবদৃষ্টির ভুলটা যেন বুঝিতে পারিয়াছেন এবং ওই নিদারুণ পাশ্চাত্যভাবগন্ধী শ্লোকটুকু একেবারে ঝাড়িয়া ফেলিয়া 'উর্ব্বশী'কে নিত্যমাহাত্ম্যময়ী দেবসুন্দরীর পদেই কায়েম করিয়া দিয়াছেন।

শীলার ও ব্যারেটের বিদেশী ভাবুকতার সহযাত্রা পথেই রবীন্দ্রনাথের অপর একটী ভাবসুন্দর কবিতা "প্রকাশ"।

জীব কিরূপে বিশ্বেশ্বরের পরম অনুগ্রহপুষ্ট দিব্যপদবী হইতেই অহঙ্কার-বশে অধঃপাতে যাইতে পারে, অভিমানের 'অতিপাতক' ফলেই ক্রমে ধর্ম্মদ্রোহী, বিশ্ববিদ্রোহী ও বিশ্বের শত্রু হইয়া অনন্তনিরয়ে এবং অধঃপাতে যাইতে পারে, ওই অহঙ্কার বৃক্ষের ফল (Fruit of the Tree of Knowledge) ভক্ষণেই কিরূপে সর্ব্ব সৌভাগ্য হইতে ভ্রষ্ট হইতে পারে, সে তত্ত্ব মিল্‌টনের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াই তাঁহাকে দিয়া লিখাইল 'প্যারেডাইস্ লষ্ট্'। অতিগর্ব্ব কিরূপে সর্ব্বসৌভাগ্যনাশী ও 'মহতী বিনষ্টি' রূপে পরিণত হইতে পারে, উহা কিরূপে আপাতদৃষ্টিতে নিতান্ত সামান্ত ও নগণ্য ব্যক্তির হস্তেই ধ্বংস লাভ করিতে পারে, মহারাজের মুকুটগর্ব্ব কিরূপে ভিখারীর পদাঘাতেই একেবারে ধূলিলুণ্ঠিত হইতে পারে, তাহা দেখাইতে গিয়া বাল্মীকি লিখিলেন 'রামায়ণ'। অভিমানের ফল কতদূর গড়াইতে পারে, যেমন ব্যক্তির পক্ষে, তেমন একটী সুবৃহৎ পরিবারের পক্ষে এবঞ্চ সম্পর্কে পড়িয়া জাতিকে জাতির পক্ষেই সর্ব্বস্ববিনাশী হইতে পারে, সে মহাভাবে আবিষ্ট হইয়াই ব্যাস লিখিলেন তাঁহার 'মহাভারত'। তিন কবিই ত বিভিন্ন দিক্ হইতে মানবত্বের মহা 'ট্রেজেডী' গান করিয়াছেন! অহঙ্কার, গর্ব্ব, অভিমান! তিনটাই যে মানুষের স্বপ্রকৃতির ক্ষেত্রে অত্যাহিত ও অতিসম্ভব মহাপাপ—এই সূক্ষ্ম অতিপাতকের বীজাণু হইতেই যে জীবের অপর সকল পাপ ও অধর্ম্মের জন্ম, এস্থলেই যে জীবের সর্ব্ববিনাশের সূক্ষ্ম-নিদান, ব্যাস, বাল্মীকি ও মিলটন—তিন মহাকবিই ত সে মহাতত্ত্বের ভাবুক! তিন কবিরাজই ত জীবের অধ্যাত্ম মহারোগের নিদান-দ্রষ্টা! এরূপে হয়ত একই সাধারণ ভাব, যুগপ্রচলিত বা সর্ব্বজনপরিজ্ঞাত সত্য; কিন্তু কবিগণের হৃদয় ও প্রেক্ষণা ভেদে এবং প্রকাশের রীতি ও অবলম্বিত প্রমূর্ত্তি ভেদে একমাত্র ভাবই বিচিত্র আকৃতিপ্রকৃতির কাব্যরসে 'পরিব্যক্ত' হইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে কোথাও বা আকৃতিতে, কোথাও বা

প্রকৃতিতে, কোথাও বা কেবল সঙ্গীতভাবময় বাক্যপ্রয়োগের শক্তিতেই প্রাণময়ী রসমূর্ত্তি রূপে দাঁড়াইয়া যাইতেছে!

ঈদৃশ প্রমূর্ত্তি বা Symbol সংঘটনার মধ্যে যে একটী রীতি-পার্থক্য আছে, এ স্থলে তাহারই সঙ্কেত করিয়া যাইতে হয়। ভাবের এরূপ সিম্বোল-সৃষ্টির ক্ষেত্রেই যেমন সাহিত্যে, তেমন চিত্র ও ভাস্কর্য্য প্রভৃতি অপরাপর কলাশিল্পের ক্ষেত্রেও ক্লাসিক ও রোমান্টিক রীতির ভেদ এবং বিশিষ্টতা ইয়োরোপক্ষেত্রে উপজাত হইয়াছে। ভারতীয় ক্ষেত্রেও সাহিত্যের বস্তূত্তমা ও ভাবোত্তমা পদ্ধতিরূপে সেরূপ একটা রীতি-ভেদ প্রবল আছে বলিলেই অনেক দিকে সত্য কথা বলা হয়। ভারতীয় সাহিত্যেও এই রীতিভেদ গতিকেই যেমন ব্যাসের মধ্যে বাস্তবতার, তেমন বাল্মীকির মধ্যে ভাবুকতার প্রাধান্য। ব্যাসশিষ্য মাঘ-ভারবি ও বাল্মীকিশিষ্য কালিদাস-ভবভূতির মধ্যে স্ব স্ব গুরুচিত্তে আন্তরিক সহানুভূতির লক্ষণ গুলাই নানাদিকে ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে! ভারতীয় শিল্পমতি এরূপ ভাবোত্তমা রীতি গতিকেই যেমন বাক্যশিল্পের ক্ষেত্রে কুমারসম্ভব ও মেঘদূত রচনা করিয়াছে, তেমন দৃষ্টিশিল্পের তরফেও লক্ষ্মী-স্বরসতী, হর-গৌরী ও বংশীধারী প্রভৃতি দেবমূর্ত্তিকে অধ্যাত্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে দৃক্‌বিষয়ীভূত করিয়া ভাবপ্রধান রীতিতেই আকৃতি দান করিয়াছে। বিশেষত্ব এই যে, ভারতীয় কবি কিংবা দ্রষ্টা প্রায়স্থলে যাহাকে Symbolরূপে বিস্পষ্ট প্রতিমায় প্রকাশ করেন, ইয়োরোপীয় রোমান্টিকগণ তাহাকে অস্পষ্ট রেখায় কেবল আভাসিত করিয়াই সন্তুষ্ট। চূড়ান্ততত্ত্ব বিষয়েও এই Vagueness ও উহার দিকে একটা আকুলতাই রোমান্টিকগণের প্রধান পরিচিহ্ন। ভারতীয় কবি যে স্থলে চূড়ান্তলক্ষ্যকে ছাড়িয়া অন্য কথা বলিতেই চাহিবেন না, ইয়োরোপীয় রোমান্টিকগণ সে স্থলে কেবল অস্পষ্ট ভাবে মধ্যপথের এবং অর্দ্ধপথের খবর দিয়াই সন্তুষ্ট। রোমান্টিক ধাতের কবি রবীন্দ্রনাথের 'সিম্বোল' গুলিই লক্ষ্য কর—তরী, পাড়ী, খেয়া, পথের ডাক, ডাকঘর ও সুদূর প্রভৃতি সিম্বোল অবলম্বনে একটা 'আকুলতা' প্রকাশ করিয়াই

তাঁহার কবিতা ও সঙ্গীত অনবরত উৎসারিত হইতেছে ! এই আকুলতা ও এ সমস্ত সিম্বোল কাহাকে লক্ষ্য করে, তাহার স্বরূপ কি, তাহাকে পাওয়ার পথ কি, সে বিষয়ে বাঙ্‌নিষ্পত্তি নাই ! অতএব এ দেশের দৃষ্টি এরূপ কাব্যের আত্মাকে দেখে উহা 'রস' নহে—'রসাভাস'। পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি, সচেতন পাঠকমাত্রকে উভয় রীতির মধ্যে যে বিশেষত্ব এবং উপস্থিত উপযোগ্যতা আছে তাহাই বুঝিতে হয়। পূর্ব্বে দেখিয়াছি, কবিত্বের ক্রিয়াপদ্ধতি মুখ্যভাবে কবিমর্ম্মস্থ সত্যের প্রমূর্ত্তিকেই লক্ষ্য করে। সাহিত্যে প্রমূর্ত্তির অর্থ, ভাষার পথে সত্যের প্রতিমা সৃষ্টি—সীমা-সঙ্কীর্ণ ভাষাবস্তুর সাহায্যেই হয়ত ভাষাতীত ও অসীম পদার্থের সঙ্কেত। প্রমূর্ত্তির দর্শনে কিংবা প্রকাশে কবির ভাবাবিষ্ট হৃদয় টুকুই কর্ত্তা—হৃদয়ের অন্তর্যোগ অর্থাৎ সত্যযোগ এবং ভাবযোগের সামর্থ্য লইয়াই সুতরাং কবিত্বের মাহাত্ম্য। মীষ্টিকগণ বলেন, জাগতিক সত্যসমূহও নাকি অধ্যাত্মক্ষেত্রে, দ্রষ্টাগণের নেত্রে Symbol রূপেই প্রকাশ পায়—অধ্যাত্মজগতের 'ভাষা'রীতিও নাকি Symbolism; সুতরাং 'প্রতিমা'দর্শনের শক্তিতে বা 'প্রতিমা'সৃষ্টির মধ্যেই ত কবি-মাহাত্ম্যের প্রমাণ! কবি যে স্থলেই সৌন্দর্য্য, আনন্দ বা রসের তত্ত্বে আত্মসংযোগী হইয়াছেন, কবিতায় সে স্থলেই প্রকৃতপ্রস্তাবে রসোপলব্ধি হইতেছে। রসতন্ত্রের মীষ্টিক বলিবেন, সে-সে স্থলেই কবি অনন্ত রসসুন্দরের তত্ত্বে 'ভাবসমাধি' লাভ করিতেছেন এবং চরমবস্তুর স্পর্শ লাভেই অনুরসিত, পুলকিত এবং ধন্য হইতেছেন; উহা পরম তত্ত্বের অস্পষ্ট, হয়ত অবিতর্কিত স্পর্শ এবং উপলব্ধি ব্যতীত আর কিছুই নহে। নিসর্গযোগী ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থ উহাকেই "That Sublime and Blessed Mood" বলিয়াছেন এবং এতদ্দেশের সাহিত্যরসিকগণ উহাকেই বলেন "ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ"। এরূপ রসানন্দ-উপলব্ধিকে অনন্ত এবং অখণ্ড ভাবে বিশ্বব্যাপ্ত ও অবারিত করিতে এবং সচেতন ভাবে বুদ্ধিসংস্থ ও বুদ্ধি-সুস্থির করিতেই এতদ্দেশের মীষ্টিক যোগতন্ত্রের লক্ষ্য। এজন্য

৭১। কাব্যের প্রকাশে কবিপ্রতিভার বালকধর্ম্ম।

এতদ্দেশের যোগশাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, চিত্ত অধ্যাত্মপথে স্থিরতা লাভ করিতে আরম্ভ করিলেই কবিত্বের বিকাশ হইতে থাকে; চিত্তের Concentration ব্যতীত কবিত্ব নাই এবং অধ্যাত্মপথে কবিত্বের ঘনীভূত ও উন্নমিত অবস্থাটাই 'যোগীর অবস্থা'। অতএব কবির 'সৃষ্টি'-চেষ্টা মাত্রই নিদানতঃ জগতের চরম 'আনন্দ'পদার্থের নূনাধিক ধারণা, সাধনা বা উপলব্ধি। যে কবি জাগ্রৎ ভাবে আপনার সকল কবিত্ব-ব্যবসায়কে ঐরূপ 'সাধনা' রূপে দেখিতে এবং পরিণামিত করিতে পারেন, তিনি নিজের শিল্পিজীবনকে চরমের অখণ্ড আনন্দ এবং অমৃত-পথের যাত্রিরূপেই পরিচালিত করিতেছেন।

পদার্থে আত্মসংযোগপূর্ব্বক অন্তঃপ্রজ্ঞায় উহার প্রকটীভাবের মূলীভূত সত্যটুকু গ্রহণ করার নামই কবিত্বের Concentration; উহাই সাত্ত্বিক দর্শন, উহাই 'প্রাতিভ দৃষ্টি'—জীবনে ও জগৎতন্ত্রে বাণীপন্থী মহাকবির দৃষ্টি। উহার ক্রমবিকাশে জগতের বহুতার মধ্যে ঐক্যদর্শন, ও সমতার উপলব্ধি এবং অদ্বৈততত্ত্বের অপরোক্ষ অনুভূতি সম্ভবপর হইতে পারে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবির 'সুদূর ঐক্য'দর্শন, উপমাদৃষ্টি ও তুলনাদৃষ্টি প্রভৃতির মধ্যে এবং ভাবের অনুগত মূর্ত্তিসৃষ্টির মধ্যে এই 'প্রাতিভ দৃষ্টি'র শক্তিই প্রকট হইতেছে। উহার পরিণত বিকাশেই বিশ্বপদার্থের মধ্যে সাম্য, অখণ্ড একত্ব ও 'ভূমা'-তত্ত্বের (১) উপলব্ধি—ইহা কবিত্বের চরম লাভ। কোন দর্শনবিজ্ঞান বা পাণ্ডিত্য যাহা দিতে পারে না কবি নিজের হৃদয়যোগে, হৃদয়ের অন্তঃপ্রজ্ঞা ও Fine Frenzyর প্রথে তাহাই চকিতে দেখিয়া ল'ন! এ জন্যই কবিত্বশক্তি জীবের পক্ষে দেশকালের সীমাবিলজ্ঘী পরা স্থিতি ও অমৃততত্ত্বে স্থিতি রূপে চরমে প্রকাশ পাইতে পারে। এ দেহের বিনাশ হইলেও, সেই সিদ্ধ সংবিৎ এবং অমৃতস্থিতির ব্যতিক্রম হয় না। আপনাকে দেহবন্ধন, দেহস্থিতি এবং দেশকালস্থিতির বন্ধনবিজয়ী অমৃততত্ত্ব রূপে উপলব্ধি—এই Art-

(১) সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষ্যতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্‌॥ গীতা।

সেবার মধ্যে এবং কবিকৃত্যের মধ্যে বিশ্বনিয়তি এত বড় শক্তিসম্ভাব্যতার বীজই অনুস্যূত রাখিয়াছেন।

অধ্যাত্মবাদী মীষ্টিকগণের শাস্ত্র বেদান্ত যে অবস্থাকে 'জীবনে বালকত্ব' লাভ রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, জীবনক্ষেত্রে অপাপবিদ্ধ শিশুত্ব রূপেই বর্ণনা করিয়াছেন, 'বৃদ্ধেনাপি বালকভাবাৎ চরিতব্যম্' রূপে জীবন-সাধকের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন—তাহাই প্রকৃত প্রস্তাবে জগৎতন্ত্রে মহাকবিত্ব লাভের পথ। আত্মার বালকধর্ম্মে প্রতিষ্ঠা ব্যতীত কবিত্বে প্রতিষ্ঠা নাই। জীবের প্রধান চিত্তখিল আত্মম্ভরতা। স্বার্থবন্ধ উত্তীর্ণ হইয়া চিত্ত যখন জগতের সত্যশিবসৌন্দর্য্য বোধে আনন্দনিবেশী বুদ্ধি ও আনন্দের লীলাধর্ম্মতা লাভ করে, নিষ্কলুষ দর্শনী, সৃজনী ও প্রকাশনী বুদ্ধি লাভ করে এবং উক্ত ধর্ম্মে স্থিতধীঃ হইয়া যায়, তখনই জীবের নাম হইতে পারে 'বালক'। উহাই 'কবিত্ব'; উন্নত ভাবধর্ম্মে অবিচল মতি ও ফলনিরপেক্ষ লীলাবুদ্ধির নামই কবিপ্রতিভার বালকত্ব। মানবজগতের উচ্চশ্রেণীর কবিপ্রতিভা মাত্রের মধ্যেই এরূপ বালকগন্ধ পাইবে। উহা আত্মারাম ভাবানন্দ ও ফলাফলবিস্মৃত প্রকাশলীলার আনন্দ। সাহিত্যের ব্যাস, বাল্মীকি, হুগো বা শেক্স্পীয়র গণের মধ্যে—তাঁহাদের উৎকর্ষ স্থলে—লোকাতিশায়ী মনস্বিতার সঙ্গে সঙ্গে এই বালকটীর আভাস পাইয়াই মুগ্ধ হইবে! ঈদৃশ বালধর্ম্ম হইতেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভাবুকতা, নিত্যনূতন লীলাবিলাসী সৃষ্টি ও আত্মানন্দের প্রকাশে ঋজুতা এবং অমায়িকতা! বালকধর্ম্মের বশেই কবিগণের সর্ব্বভূতে জীববুদ্ধি, জীবনবুদ্ধি, সুদূর ঐক্যদর্শন ও সাম্যবুদ্ধি—বিশ্বের সঙ্গে আত্মার আত্মীয়তা বোধ। বালকের ধর্ম্মেই কবিগণের মধ্যে সর্ব্বত্র মূর্ত্তিজীবী ও ব্যক্তিত্বজীবী আনন্দের ঋজু দৃষ্টি এবং সৌন্দর্য্যানন্দের প্রকাশ-লীলাময় সৃষ্টি। সকল জ্ঞানগবেষণা, পুঁথিপাণ্ডিত্য ও মনস্বিতার এবং বিচারবুদ্ধির চূড়ান্তে গিয়া এরূপ আনন্দজীবী বালকের ঋজু বুদ্ধিতে এবং বালকপ্রাণে স্থিতি—ইহা যেমন বাণীপন্থার, তেমন জীবনপন্থারও চূড়ান্ত প্রাপ্তি।

সাহিত্যের দুইটী প্রধান উপাদান সত্য ও সৌন্দর্য্য বিষয়ে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত এই আলোচনা আমরা করিয়া আসিলাম। এ আলোচনায় মুখ্য বা অবান্তর ভাবে আমাদিগকে বহু স্থলেই অপর একটী তত্ত্বের সম্মুখীন লইতে হইয়াছে—উহা অপরিহার্য্য ভাবেই আমাদের সমক্ষে উদিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহা এই যে, সকল সত্যই সাহিত্যে গ্রহণযোগ্য নহে।

৭২। সত্য ও সৌন্দর্য্যের ক্ষেত্রেই আবার ভালমন্দ বিচার হইতে সাহিত্যের উপাদান আলোচনায় তৃতীয় তত্ত্বের উদয়।

সত্যের ক্ষেত্রে বা রসের ক্ষেত্রে, প্রেম-আনন্দ-সৌন্দর্য্যের ক্ষেত্রে আবার "ভাল মন্দ" বলিয়া একটি জাতিবিচার! উহাদের মধ্যেই আবার উচ্চনীচ বা 'দুয়ো সুয়ো' বলিয়া একটী সোপানগ্রাম এবং সিঁড়ি! মানব জীবনে এবং সাহিত্যে এই বিচার অপরিহার্য্য। উহাই আমাদিগকে এ আলোচনার তৃতীয় বস্তুটীর মুখামুখি উপস্থিত করিতেছে।

(ঘ)

সাহিত্যের আদর্শ আলোচনা করিতে বসিয়া সময় সময় অনেক বুদ্ধিমান্ জিজ্ঞাসু হইতেই প্রশ্ন শুনিতে ও সহিতে হইয়াছে "শিব কেন?" সাহিত্যের সত্য ও সৌন্দর্য্য আদর্শ বুঝিলাম; কিন্তু 'শিব' আদর্শ না মানিলে কি হয়?"

বলিতে হইবে না যে, ইহা আধুনিক যুগধর্ম্মের উপযোগী এবং মর্ম্মানুযায়ী প্রশ্ন; এ বিষয়ে ইয়োরোপীয় সাহিত্যে স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক গলাবাজী হইয়াছে; অনেক উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যসেবী এবং পণ্ডিতব্যক্তিও লেখনী ধারণ করিয়াছেন। উহা শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা দুরন্ত সমস্যা। উহার যথোচিত সমাধান ব্যতীত, জীবনের সকল আদর্শ ও ক্রিয়াধর্ম্মের সঙ্গে শিল্পসাহিত্যের আদর্শকেও সামঞ্জস্যে ধারণা এবং গ্রহণ ব্যতীত কেহ কদাপি প্রাজ্ঞ কিংবা সচেতন সাহিত্যসেবকরূপে পরিগণিত হইতে পারিবেন না—তিনি জীবনপথে অর্দ্ধ-নিদ্রিত ভাবেই

৭৩। শিব কেন?

চলিয়াছেন। কিন্তু, ইয়োরোপীয় সাহিত্যের সমালোচনা ক্ষেত্রে উহার কোন সন্তোষকর মীমাংসা পাইয়াছি বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছি না। সাহিত্যশিল্পের আদর্শ বিষয়ে কোন তত্ত্বশাস্ত্র সম্ভবপর হইলে, কোন ধারাবাহিক যুক্তিবিচার এবং সিদ্ধান্তপ্রণালী সম্ভব পর হইলে তবে সে দর্শন বা সিদ্ধান্তশাস্ত্রকে মানবিক মনোবিজ্ঞানের (Psychology) একাংশরূপেই দাঁড়াইতে হইবে। কোনরূপ শাস্তা (Authority) বা বিশেষজ্ঞের মতামতের একান্ত প্রভুতার উপর নির্ভর করিলেও তাহার চলিবে না। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ন্যায় এবং নীতিবিজ্ঞানের ন্যায় কেবল সর্ব্বমানবিক অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার ভিত্তি-নির্ভরেই এরূপ সাহিত্যশাস্ত্রকে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

ইয়োরোপীয় সাহিত্যে 'শিব'তত্ত্বের যাহা আলোচনা আমাদের চোখে ঠেকিয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য একটী কথা—প্রফেসর শার্পের একটী মন্ত্রবৎ সরল ও সার্থক কথা—"Humanity is a moral thing". ইহা সম্পূর্ণ বেদান্তসম্মত বার্ত্তা এবং ইহাপেক্ষা গভীরতর সত্য কথা সাহিত্যের আদর্শবিচার ক্ষেত্রে অপর একটী পাইয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

৭৪। 'শিব' মানবত্বের ক্ষেত্রে অপরিহার্য্য তত্ত্ব।

যাঁহারা মনুষ্যের মনস্তত্ত্বকে ব্যাপক দৃষ্টিতে চিন্তা করিবেন, তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথম দেখিবেন যে 'শিব'চিন্তা মনুষ্যের স্বভাবগতিকে, তাহার 'মানবত্ব' গতিকেই মনুষ্যের পক্ষে অপরিহার্য্য। ভালমন্দের বোধ-বিচার লইয়াই সৃষ্টিতন্ত্রে 'মনুষ্যত্ব'—'ভালমন্দ'জ্ঞান ও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিই মনুষ্যের ইচ্ছাশক্তির নিয়ামক; এরূপ বিচারবুদ্ধিই জীবপর্য্যায়ে উচ্চজীব মনুষ্যের প্রধান পরিচিহ্ন।

মনুষ্যের জ্ঞাননেত্রে প্রতীত 'ভাল'র নাম যেমন 'সত্য', ভাবনেত্রে প্রতিভাত 'ভাল'র নাম তেমন 'সুন্দর'; 'ইচ্ছা' বা কর্ম্মনিরূপক নেত্রে নির্দ্ধারিত 'ভাল'র নাম তেমন 'ধর্ম্ম'—Goodness বা 'শিব'। ইচ্ছাকৃতিশীল মনুষ্যের পক্ষে এই 'ধর্ম্ম'দাসত্ব বা শিবের দাসত্ব ছাড়াইবার যো নাই।

তাহার অন্তঃকরণের 'গঠন' ও অধ্যাত্মপ্রকৃতি এই 'শিব'দাসত্বের ভিত্তিতেই দাঁড়াইয়াছে, "Because Humanity is a moral thing." মানুষ আপন মনোবৃত্তির বশে যেমন জ্ঞান ও ভাবক্ষেত্রে 'সত্যসুন্দর' স্থির করিতে ও চিনিয়া লইতে বাধ্য হইতেছে, তেমন ইচ্ছা বা কর্ম্ম-বৃত্তির ক্ষেত্রেও 'সত্যসুন্দর'কে চিনিয়া লওয়া ব্যতীত তাহার পক্ষে ছাড়া' নাই। জ্ঞান-ভাব-কর্ম্মের ক্ষেত্রে 'ভাল'র আদর্শ-নিরূপণাই নরের ধর্ম্ম—যাহাতে মনুষ্যত্বকে ধারণ করিতেছে—যাহা তাহার Law of Being.

মানুষের জ্ঞান ও ভাববৃত্তি চেনাইয়া দেয় ব্যক্তিগত জীবনের এবং পরিবার ও সমাজগত জীবনের সত্যসুন্দর কি? উহার ফলে তাহার 'ধর্ম্ম'আদর্শ। সাহিত্য মনুষ্যের ইচ্ছাকৃতি বা কর্ম্মবৃত্তির ক্ষেত্র; উহা সমাজবদ্ধ মনুষ্যের ক্রিয়াসৃষ্টি—মানসী সৃষ্টি। সাহিত্য নামক মানসিক ক্রিয়াবস্তুও মনুষ্যের ব্যক্তি-পরিবার ও সমাজগত জীবন লইযাই ব্যাপৃত। অতএব সাহিত্যের আদর্শও মনুষ্যের জীবনাদর্শ হইতে, অপিচ 'ধর্ম্ম'আদর্শ হইতে বিরুদ্ধগামী নহে, পরন্তু অভিন্ন। সাহিত্যক্ষেত্রে আসিয়া এই 'ধর্ম্ম'-আদর্শের নামই, সাহিত্যশাস্ত্রের পরিভাষায়, 'শিব'।

ধর্ম্মকে না মানিয়া যেমন মনুষ্যত্ব দাঁড়ায় না, তেমন শিবকে না মানিয়াও সাহিত্য দাঁড়ায় না। যিনি বলিবেন "শিব মানি না", তিনিও নিজের মনগড়া, বা অতর্কিত একটা 'শিব'ই পূজা করিতেছেন। শিবের কোনরূপ 'আটঘাট বাঁধা' মূর্ত্তি খাড়া করিতে গেলেই বিবাদের সূত্রপাত; তাহা উত্থাপিত করিতে এ স্থানে আমাদের প্রবৃত্তি নাই। প্রথম কল্পে, জীবের ক্রিয়ানিয়ামক 'ভাল'র আদর্শের নামই 'শিব'। শিবরহিত কোন কর্ম্মযজ্ঞ নাই। এরূপে, ভালমন্দের নিরূপক দৃষ্টিরীতির এবং বিচার-আদর্শের উপরেই সাহিত্যের সত্যসৌন্দর্য্যের মধ্যে ভাল-মন্দ বা উচ্চনীচ ভেদ দাঁড়াইতেছে।

বেদের ঋষিগণ পরম প্রত্যাবেশ বশে, জীবস্থান হইতে জগতের আদি-মধ্যান্তের সর্ব্বকারণ-কারণকে যে 'সচ্চিদানন্দ'রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,

তদপেক্ষা বড় কথা মনুষ্যের ধর্ম্ম কিংবা দর্শনক্ষেত্রে এ যাবৎ কোন মনুষ্যমুখে বাহির হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। উহা বেদের সমবেত ঋষিবিজ্ঞানের সারসত্য, চূড়ান্ত বিগাহী ঋষিমস্তিষ্কের চরম প্রাপ্তি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শত শত অধ্যাত্মপথিক বিভিন্ন দিক্ হইতে একই তত্ত্বের খবর দিতেছেন! কিন্তু তাই বলিয়া, ঋষিবাণী বলিয়া, অপৌরুষেয় অথবা প্রত্যাবেশ-প্রাপ্ত তত্ত্ব হওয়ার দাবীতেই উপস্থত হইয়াছে বলিয়া ভারতীয় আর্য্যজাতি উহাকে অন্ধভাবে গ্রহণ করে নাই। বিনা বিচারে কোন কিছু গ্রহণ করা এ'দেশের ধাৎই নহে। তর্কযুক্তি-বিচারের পথে উক্ত একটী কথার অর্থনিরূপণের উদ্দেশ্যেই 'বেদান্ত' নামক দর্শনের উৎপত্তি এবং উহার অসংখ্য ভাষ্য ও টীকাটীপ্পনী এবং তৎক্রমেই সীমাহীন পুরাণ ও তন্ত্রাদির ব্যাপার! ফলে অবশ্য উহাই ধ্রুব সত্যরূপে নির্ণীত হইয়াছে। সে নির্ণয়ের ফলে এ দেশের শতপথ ধর্ম্ম ও কোটিকোটি নরনারীর ব্যক্তিত্ব-পরিবার-সমাজ ও রাষ্ট্রের তরণী সেই ধ্রুবলক্ষ্যে এবঞ্চ সেই নির্ণীত সত্যকে কর্ণধার করিয়াই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইতেছে। এতদ্দেশে যুগেযুগে যে সকল চিন্তাশীল ব্যক্তি জন্মিয়াছেন, সমাজের শাস্তা অথবা শিক্ষক রূপে দাঁড়াইয়া যাঁহারা স্মৃত্যাদি 'শাস্ত্র' রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলে বেদের সেই 'এক' তত্ত্ব এবং তদনুগত 'ধর্ম্ম'কেই জীবজীবন ও জগদ্গতির ধ্রুব লক্ষ্য রূপে ধরিয়াই দাঁড়াইয়াছেন; মনুষ্যজীবনকে প্রভাত হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত, সূতিকাগৃহ হইতে শ্মশান পর্য্যন্ত সকল জ্ঞানকর্ম্মে ও ভাবে সেই দৃঢ়নিশ্চিত 'এক' লক্ষ্যেই যেন চালাইতে চাহিয়াছেন! 'সচ্চিদানন্দই' সত্য এবং তদভিমুখে সর্ব্বজীবন পরিচালনাই 'শিব'—উহা অপেক্ষা সুনিশ্চিত তত্ত্ব এবং অটল সত্য যেন আর কিছুই হইতে পারে না! প্রাচীন ভারতের এ লক্ষণটুকু চিন্তা করিলে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না! উহার সমতুল্য ঘটনা মানবের ইতিহাসে দ্বিতীয়টী আছে বলিয়াও মনে হয় না।

৭৫। বেদের 'সচ্চিদানন্দ' তত্ত্ব এবং মানুষের শিল্প ও সাহিত্যের আত্মাভূত 'রস'-পদার্থে উহার ব্যাপকতা।

অগ্নিহোত্রী প্রাচীন ঋষি-হৃদয়ের অগ্ন্যাধার হইতে যাহা স্বতোদীপ্ত এবং স্বয়ম্ভূত অগ্নিকণার ন্যায় বাহির হইয়া আসিয়াছিল, তাহাকে পরে পরে ধারাবাহিক দর্শনশাস্ত্রে, সংশয়-বাদ-বিতণ্ডা এবং যুক্তিবিচারসিদ্ধান্তের প্রণালীতে বাজাইতেও যখন অক্ষত থাকিয়া গেল, তখন উহার সাপক্ষ্যে অপৌরুষেয় বিদ্যা ও দিব্য প্রত্যাবেশের দাবী প্রাচীন ভারতবর্ষের অনেকের নিকটেই হয়ত অশ্রদ্ধেয় হয় নাই। কিন্তু সাহিত্যের দর্শনক্ষেত্রে কিংবা উহার আদর্শবিচারে কোনরূপ প্রভুত্ব-বাদ বা অন্ধনির্ভর কদাপি বাঞ্ছনীয় নহে। সর্ব্বজীবের স্বানুভবই সাহিত্যসত্যের প্রমাণস্থান। যাঁহারা একবার ভারতীয় বেদপন্থীর এই 'সচ্চিদানন্দ'তত্ত্ব ও 'ধর্ম্ম'বাদটুকু বুঝিয়া এবং বাজাইয়া লইতে পারিবেন তাঁহাদিগকে সাহিত্যের বা জীবজীবনের কোন ক্রিয়াতন্ত্রে বেদান্তানুগত আদর্শ বুঝিতে কিঞ্চিৎমাত্র বাধা কিংবা দ্বিধাও অনুভব করিতে হইবে না। অতএব, শক্ত কিছু থাকিলে, এ ক্ষেত্রে প্রধান শক্ত কথাই হইতেছে—এই 'সচ্চিদানন্দ আত্মা' এবং তদনুগতিক 'ধর্ম্ম'তত্ত্বকে হৃদয়ঙ্গম করা'। উহার পর, জীবন ও জগতের প্রত্যেক কর্ম্মকোঠায় উহাকে অনুসরণ করিয়া, সকল প্রশ্নমীমাংসা ও সমস্যাছেদনের 'ব্রহ্মাস্ত্র'টুকু আয়ত্ত করাও হয় ত কিছুমাত্র কঠিন হইবে না।

আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, সৃষ্টিস্থান হইতে বা জীবস্থান হইতে, জ্ঞান-ইচ্ছা-ভাব-বৃত্তিমুখী জীববুদ্ধির পক্ষে জগৎকারণকে 'সত্য-জ্ঞান আনন্দ' স্বরূপ ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। যাহা অসন্দিগ্ধ ভাবে বলিতে পারা যায়, যাহার অধিক মর্ত্ত্য জীবের মনস্তত্ত্বের ক্ষমতায়ত্ত নহে গতিকে তাহার বলিবার সাধ্যও নাই, তাহা এই 'সচ্চিদানন্দ আত্মা'। আদিতে যাহা, অন্তেও তাহা—মধ্যপ্রদেশেও তাহাই নিশ্চয়—বাহ্যদৃষ্টিতে সুপ্রতীত না হইলেও নিশ্চিত তাহাই। অতএব মানুষের সাহিত্যনামক ক্রিয়াব্যাপারের আদি-মধ্যম-চরমের তত্ত্ব বা আত্মাও 'সৎ-চিৎ-আনন্দ' ব্যতিরিক্ত আর কি হইতে পারে? ফলতঃ—আমরা দেখিয়া আসিয়াছি—সাহিত্যদার্শনিকগণ সাহিত্যের

'আত্মা' নিরূপণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন উহা সচ্চিদানন্দ 'রস'। শ্রুতিও জগদাত্মাকে দেখিয়াছেন "রসো বৈ সঃ"। সুতরাং বেদপন্থী ভারতবর্ষে সাহিত্যের রসসাধক কবি ও জগদাত্মায় প্রয়াণ-কামী জীবনসাধকের আদর্শ ফলতঃ এক এবং অভিন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সচ্চিদানন্দ রসবস্তুকে বিশ্লেষিত করিতে গিয়াই আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে সত্য ও সৌন্দর্য্যই—প্রত্যুত সুন্দর সত্যই—সাহিত্যের উপজীব্য। এখন, এই 'চিৎ' পদার্থকে চিন্তা করিতে গেলেই বুঝিব যে, কেবল তাহা নহে, 'চিন্ময় রসসুন্দর' সত্যই সাহিত্যের প্রকৃত উপজীব্য।

ফলতঃ এস্থলে, এই 'চিৎ' উপাদানকে লইয়াই, সাহিত্যক্ষেত্রের 'তব্য', 'অনীয়' 'য' বা 'ভালমন্দ' আদর্শবাদটুকু আসিতেছে। সত্য ও সৌন্দর্য্য যেমন সাহিত্যের উপাদান নির্ণয় করে, এই তৃতীয় বস্তু তেমনি উপাদান অপিচ সাহিত্যস্রষ্টার কর্ত্তব্যও নির্দ্দেশ করিতেছে। সাহিত্য জড়রসিক নহে—চিন্ময় রসের সাধক।

৭৬। রসের চিৎ উপাদান হইতেই সাহিত্যক্ষেত্রে 'শিব' আদর্শ ও সাহিত্যিক 'কর্ত্তব্য' বাদ।

মিষ্টান্ন হইতে মানুষ যে সুখ পায় সাহিত্য সেরূপ জড়সুখ লক্ষ্য করে না। অন্যদিকে, যৌনমিলন যেই 'সুখ' দেয়, সেরূপ স্নায়বিক ব্যাপারও সাহিত্যের উদ্দেশ্য নহে। সাহিত্যের 'চিন্ময় সত্য' বা 'চিন্ময় সৌন্দর্য্য' বলিতে এ কথাটা ভুলিলে কদাপি চলিবে না। যে সাহিত্য ব্যাপার চিত্তের জড়রসিক বৃত্তি অথবা স্নায়ুরসিক বৃত্তির পোষকতাই লক্ষ্য রাখে তাহা কদাপি শিবংকর সাহিত্য কিংবা উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য নহে।

সুতরাং সাহিত্যিকের একটা 'কর্ত্তব্য' নির্দ্দেশ করিতে হইলেই বলিতে হয়—সাহিত্যিক চিন্ময় আনন্দকেই লক্ষ্য করিবেন। এই 'চিন্ময়' রসের সাধনার নামই সাহিত্যক্ষেত্রে শিবসুন্দরের আদর্শ—কেবল সত্যসুন্দর নহে, শিবসুন্দর। সাহিত্য সমাজবদ্ধ মনুষ্যের মানসী সৃষ্টি, চিন্ময়ী আনন্দসৃষ্টি, শিবংকরী সৃষ্টি।

অতএব সাহিত্যের উপাদান মধ্যে প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় এবং গৌণমুখ্য পদবী নিরূপণে একটা পর্য্যায় নির্দ্দেশ করিতে হইলে, কি বলিতে হয় ? সৌন্দর্য্য-সত্য-শিব। সত্য-শিব-সুন্দর বলিলে উক্ত পর্য্যায় যথাযথ হয় না। সাহিত্যের সৌন্দর্য্য হইবে সত্যসন্ধ এবং শিবংকর সৌন্দর্য্য; সাহিত্যের সত্য হইবে সুন্দর ও শিবংকর সত্য। বৈদিক ঋষির সেই 'সচ্চিদানন্দ রস'বস্তু হইতেই ভারতীয় সাহিত্যের এই আদর্শ সমাগত হইতেছে। এরূপে সাহিত্যসেবাও ফলতঃ ধর্ম্মসেবা হইতে অভিন্ন হইয়া দাঁড়াইতেছে। সাহিত্যের উপকরণে শিব বা সত্য কদাপি মুখ্য নহে। 'কেবল সত্য' উপস্থাপিত হইলে সাহিত্য হইবে না; সত্যকে 'সুন্দর' হইতে হইবে; আবার, কেবল 'সত্যসুন্দর' হইলেই যথেষ্ট হইবে না; প্রশ্ন উঠিবে, উহা অন্ততঃ শিবতত্ত্বের অদ্রোহী কি না? সাহিত্যতন্ত্রে শিব অমুখ্য হইলেও এক্ষেত্রে চূড়ান্তের বিচারটী অতএব তাহার হস্তেই আছে। শিবসুন্দরের অপর নামই 'ধর্ম্মসুন্দর'।

৭৭। সাহিত্যের উপাদান গুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ-কনিষ্ঠ নির্দ্দেশে পর্য্যায় নিরূপণ করিতে হইলে, উহা সৌন্দর্য্য-সত্য-শিব।

এখন, ধর্ম্ম কি ? কেন না, উহাই ত 'শিব' আদর্শের নিরূপক! বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রেই ভারতীয় বেদান্তের একটী সবিশেষ বার্ত্তা ও সবিশেষ দৃষ্টি। এই 'ধর্ম্ম'ধারণার উপরেই যে বেদপন্থীর সর্ব্বস্ব ও সর্ব্ববিশেষত্ব নির্ভর করিতেছে, একথা নির্ভয়ে বলিতে পারি। ব্রহ্মস্থিতি এবং ব্রহ্মজ্ঞান জীবমাত্রের স্বয়ংসিদ্ধ, নিত্যতত্ত্ব। জীবমাত্রেই সচ্চিদানন্দে স্বস্থিত ছিল; উহা হইতে স্খলিত হইয়াছে। পরম স্থিতি হইতে স্বেচ্ছায় এবং স্বাধীনতার অপব্যবহারে স্খলিত হওয়ার নামই 'ভব' বা 'সৃষ্টি'—জীবের সংসারচক্রে ভ্রাম্যমান্ গতির অবস্থা। কোন হেগেলশিষ্য বিলাতী দার্শনিকের ভাষায় বলিতে পারি "The individual was world-conscious before it became self-conscious". জীব self-conscious হইয়া, অন্ত কথায়, নিজের অহঙ্কারবশেই বিশ্বাত্মজ্ঞান বা

৭৮। সাহিত্যক্ষেত্রে 'শিব' বা 'ধর্ম্ম' কি ?

ব্রহ্মাত্মস্থিতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। অতএব, মোটামোটি বলিতে গেলে, ওই সচ্চিদানন্দের তত্ত্বে আত্মধৃতিই জীবমাত্রের 'ধর্ম্ম'আদর্শের মূল লক্ষ্য। জীব যে অবস্থাতেই থাকুক, যে কর্ম্মজীবনই অবলম্বন করুক, সচ্চিদানন্দ তত্ত্বে 'ধৃতি'কেই সুদূর লক্ষ্যরূপে রাখিয়া তাহাকে চলিতে হইবে। এস্থলে বলিতে পারি, ইহা বেদপন্থীর Absolute জ্ঞান ও Absolute Moralityর বা ধর্ম্মের আদর্শ। এই 'ধর্ম্ম'তত্ত্ব সম্মুখে রাখিয়াই সর্ব্বজীবের জন্য 'সনাতন ধর্ম্ম' আদর্শ ঋষিগণ নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। অবস্থাভেদে এই লক্ষ্য কোন কোন জীবের পক্ষে সুদূর অথবা সন্নিকট হইতে পারে—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্রপ্রকৃতির ভেদে 'ধর্ম্মাচার'ও পৃথক্ হইতে পারে। আচার বিষয়ে এরূপে 'অধিকারী ভেদ' স্বীকার করে বলিয়াই ভারতীয় আর্য্যঋষির 'সনাতন ধর্ম্ম' ফলতঃ 'বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম' নামে আত্মখ্যাপন করিয়াছে। 'সচ্চিদানন্দ'তত্ত্বের পর ঋষিদৃষ্টির সর্ব্বাপেক্ষা বড় আবিষ্কার এই 'ধর্ম্ম'। এ ক্ষেত্রে আর জটিলতায় অগ্রসর হইব না। এজন্যই 'সনাতন ধর্ম্ম'স্রষ্টা মনু প্রথমতঃ সর্ব্বজীবের জন্য তাঁহার 'ধর্ম্ম' লক্ষণ প্রকৃত Scientific ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াই, পরে 'ধর্ম্মাচার' নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মনু সর্ব্বজীবের জন্য ধর্ম্মের নিত্য লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

ধৃতি ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥

ব্রহ্মতত্ত্বে বা 'তৎসৎ' পদার্থে ধারণার নামই ধৃতি। বলা বাহুল্য, উহা 'ধর্ম্ম' শব্দের প্রকৃতিগত অর্থের নামান্তর; ধর্ম্মের মূল লক্ষণটী এ ভাবে উল্লেখ না করিয়া পারা যায় নাই। লক্ষ্য করিতে হয় যে, ব্রহ্মতত্ত্বে জীবতত্ত্বের ধৃতিই প্রথম কথা—বাকী সমস্ত লক্ষণ উক্ত ধৃতির পরিপোষক ব্যতীত আর কিছুই নহে। তৃতীয় বা 'তৎসৎ' মায়াশক্তির বশে ভবরূপে আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছেন এবং সর্ব্বত্র ধর্ম্ম বা 'ঋত'রূপে ওতপ্রোত থাকিয়া এই ভবব্যাপারকে ধারণ করিতেছেন। জীবের দিক্ হইতে অতএব ধর্ম্মে যুক্ত থাকার নামই ধৃতি—জগতের ভূমি হইতে অতিজাগতিক সেই মূল

সচ্চিদানন্দ তত্ত্বে যুক্ত থাকা'র নামই ধৃতি। অতএব জীবচরিত্রের গুণভেদে সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী ধৃতিভেদ স্বীকার করিতে হইয়াছে।

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়া।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ইত্যাদি।

এই 'ধর্ম্ম' বা 'ঋত'ই ক্ষেত্রভেদে Cosmic Law, Moral Law, Natural Law প্রভৃতি। স্মরণাতীত কাল হইতে, বৈদিক ঋষিনেত্রে অদ্বৈততত্ত্বের দৃষ্টি হইতে, এই 'ধর্ম্ম' শব্দ এবং ধর্ম্মের রূপ ও গুণভেদ ভারতবর্ষে পরিদৃষ্ট এবং প্রচলিত; Natural Law বা Moral Law প্রভৃতির জন্যও একই 'ধর্ম্ম' ব্যতীত কোন স্বতন্ত্র পরিভাষা ঋষিগণ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। জীবমাত্রকে জীবনের Natural ও Moral ধর্ম্মতত্ত্বে স্থির থাকিতে হইবে; না থাকিলেই উহার নাম 'ধর্ম্মহত্যা'; অন্য নাম—আত্মহত্যা। এস্থানে বলিয়া যাইতে পারি যে, জীবের পক্ষে এই 'ধর্ম্ম' পরিদৃষ্ট ও উহার বার্ত্তা প্রচারিত হইতেছে তিন পথে—আপ্ত বাক্য (Revelation); বিচার বুদ্ধি (Reason) ও অন্তঃপ্রজ্ঞা বা বোধি (Intuition); মোটামোটি এ তিনটী পথেই 'ধর্ম্ম' এ জগতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। (১)

জীবমাত্রেই মূলতঃ সেই "সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্ত স্বভাববান্‌" বলিয়া, তৃতীয়ই মায়াবশে জীব হইয়াছেন বলিয়া, 'ধর্ম্ম'ই জীবের স্বভাব।

(১) বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, বৈদিক দর্শন যে স্থানে "মুক্তিস্তু ব্রহ্মতত্ত্বস্য জ্ঞানাদেব ন চান্যথা" বলিয়া চরম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, মনুপ্রভৃতি ঋষিগণ সেই মুক্তিপথের সহকারী রূপে 'ধর্ম্ম'কেই উপদেশ করিতেছেন; অপিচ দেখাইতেছেন যে, সংসারে জীবের ধর্ম্মগতিই ব্রাহ্মী গতি—ব্রহ্মমুখী যাত্রার কর্ম্মপদ্ধতি। সর্ব্বজীবের জন্য সর্ব্ব অবস্থায় 'সনাতন ধর্ম্ম'তত্ত্ব অসাম্প্রদায়িকভাবে নির্দ্দেশ করিয়াই, পরে দেশকাল সম্পর্কে আনিয়া, ধর্ম্মস্রষ্ঠা ঋষিগণ উহাকে আচারতন্ত্রে নিরূপিত করিতেছেন। দেশকালপাত্র সম্পর্কে ধর্ম্মাচার বিভিন্ন হইতে পারে বলিয়াই সনাতনধর্ম্মে কোনও আচারের নিত্যতা নাই। স্মর্ত্তার মতে দেশকালজ্ঞ 'পঞ্চ বিদ্বান্‌' বা পণ্ডিত পঞ্চায়েতের উপরেই সন্দেহস্থলে আচারের প্রমাণতত্ত্ব নির্ভর করিতেছে।

তথাপি সৃষ্টিমূলের সেই মায়া ও জীবের স্বাধীনতাগত অবিদ্যা (Spirit of Negation) হইতেই সৃষ্টিসংসারে অনন্ত বহুত্বের এবং বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, অতএব ভগবান্‌কেই ধর্ম্মেশ্বর এবং "অব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা' বলিয়া ঋষিগণ প্রণাম করিতেছেন। ভবসংসারে জীবের জীবন এরূপে আত্মধর্ম্ম ও সৃষ্টিকারিণী 'শুদ্ধসত্ত্বা' মায়া অপিচ জীবের অবিদ্যা—এ তিনটী প্রভাবে ওতঃপ্রোত। তন্মধ্যে যে সমস্ত ভগবদ্ভাব, বা যে ভাবনিবহ স্বয়ং 'ধর্ম্মেশ্বর' হইতে আঁসিতেছে এবং জীবের 'স্বধর্ম্ম'গতির পথনির্দ্দেশ করিতেছে, তাহাদিগকে গীতা এরূপে ধারণা করিয়াছেন—

বুদ্ধিঃ জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখ দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয় মেবচ॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপোদানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ॥

এ সমস্ত 'ধর্ম্ম' বা ভগবদ্ভাব অনুসরণেই জীব ভগবদ্গতি এবং ভব সংসারের বন্ধমোক্ষ বা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে; এজন্য উহাদের নাম "দৈবী সম্পৎ"।

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা॥ ইত্যাদি।

স্বয়ং 'তৎসৎ' বা ধর্ম্মেশ্বর হইতেই এ সমস্ত 'দৈবী সম্পৎ' আসিতেছে। জীবের পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রের (তথা সাহিত্যেরও) উপজীব্য মূল 'দৈবী ধর্ম্মসম্পত্তি' গুলি গীতা বক্ষ্যমান রূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন—

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধি র্জ্ঞানযোগ ব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষলোলুপ্তং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥

মনুষ্যের সমক্ষে অসাম্প্রদায়িক এবং সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের ইহাপেক্ষা স্পষ্টতর নির্দ্দেশ আর হইতে পারে না। অতএব আর বাহুল্যে প্রয়োজন নাই ; যেমন অভিজাত জীবের পক্ষে তেমন অভিজাত সাহিত্যের পক্ষেও এ সমস্ত দিব্যধর্ম্মের পরিপোষণে স্থিতধীঃ থাকাই ত চরম আদর্শরূপে দাঁড়াইতেছে। 'সত্য শিব সুন্দর' আদর্শজীবী সাহিত্য এ সকল ধর্ম্মভাবকে অবলম্বন এবং পরিপোষণ করিয়াই দাঁড়াইতে পারে। সাহিত্যজগতের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ সমূহ এ সকল দিব্য ধর্ম্মকে কদাপি অতিক্রম করে না—উচ্চকাব্যের রসাত্মা এ সকল ভাব সংসিদ্ধ করিয়াই উচ্চাঙ্গ ও মহৎ শ্রেণীর (Noble) সাহিত্য স্বরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে। কাব্যের প্রয়োগবিজ্ঞানে, উহার বস্তুসামগ্রীতে এবং পাঠের 'উদর্ক' মধ্যে এ সকল ভাবের পরিপোষণ এবং ভাবুকতার দিব্য রসায়ন সমাধান করিয়াই 'শিবসুন্দর' সাহিত্য দাঁড়াইতে পারে। ফলতঃ মহাকবিগণ কাব্যে মনুষ্যত্বের এই দৈবী সম্পত্তি এবং মানবাত্মার দিব্যধর্ম্মানুগত চরমগতির সহায়কারী 'রসাত্মা' সুসিদ্ধ করিয়াই মানব জগতের পূজার্হ হইতেছেন।

সাহিত্যের শিব-জিজ্ঞাসুর পক্ষে নিয়তভাবে স্মরণ রাখিতে হয় যে, এ সমস্ত 'দিব্য ধর্ম্ম' জীবের সংযম তত্ত্বের উপরেই নির্ভর করিতেছে ; এবং এরূপ 'ধর্ম্মতা'র উপরেই মনুষ্যত্ব আদর্শের ভিত্তি। সবিশেষে বুঝিতে হয় যে, ইহা কেবল সমাজবদ্ধ মানুষের ধর্ম্ম বা Social Morality এবং Social Convention এর আদর্শও নহে। সম্পূর্ণ সমাজসম্পর্কবিহীন, একক মনুষ্যের জন্যও, তাহারই অধ্যাত্মস্থিতি এবং নিত্যতত্ত্ব-সম্পৃক্ত অপিচ অপরিহার্য্য এই Absolute Morality ! একটী বৃক্ষের প্রতি ক্রোধ হইলেও তুমি সংযমচ্যুত হইলে ; সে পরিমাণেই সৎস্বরূপে ধৃতি হইতে ভ্রষ্ট হইলে—ধর্ম্মচ্যুত হইলে। সচ্চিদানন্দই আদিম বাসপত্তন, অপিচ সর্ব্বজীবের অস্তিমের লক্ষ্য। এজন্য বেদশাস্ত্রীর আদর্শ—প্রথম জীবনেই ব্রহ্মচর্য্য এবং পরিশেষে ব্রহ্মসন্ন্যাস এবং ব্রাহ্মী মুক্তি। জীবনে ব্রহ্ম তোমার পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ বা আসন্নসিদ্ধ

কি না, তুমি ব্রহ্মনৈষ্ঠিক হইতে পার কি না, ব্রহ্মচর্য্যেই সে সম্পর্কে প্রথম শিক্ষা ও আত্মনির্ব্বাচনী পরীক্ষা সমাধা করিতে হয়। তারপর, ন্যূনাধিকারীর পক্ষে, সমুচিত গার্হস্থ্যাদি যাবতীয় আশ্রমিক অবস্থা এবং আচারকর্ম্মও চরমের একান্ত উদ্দেশ্যেই সমর্থিত ও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ফল কথা এই যে, চরম সচ্চিদানন্দ লক্ষ্যে জীবনের ধৃতি এবং পারিবারিক ও সামাজিক জীবনেও সবিশেষ ব্যক্তিত্বতন্ত্রী ও অধ্যাত্মপথ-তন্ত্রী 'জ্ঞানকর্ম্মভাব'সাধনার আদর্শই জীবমাত্রের 'ধর্ম্ম'। সুতরাং সাহিত্যে অপিচ সকল শিল্পচেষ্টায় এবং রসচর্চ্চায় এই অধ্যাত্মধর্ম্মের আনুগত্য বর্ত্তাইয়া চলাই যেমন শিল্পক্ষেত্রের তেমন সাহিত্যক্ষেত্রের 'শিব'! যাঁহারা জীবনের ব্যাপারকে মূলের সহিত 'সাম্যেন' দৃষ্টি করিতে এবং সামঞ্জস্যে চলিতে চাহেন, তাঁহারাই দেখিবেন যে, জীবনরহস্যের দ্রষ্টা ঋষিগণ যাহাকে 'ধর্ম্ম' বা সচ্চিদানন্দে সংযমযোগমূলক 'ধৃতি' বলিতেছেন, সাহিত্যদার্শনিকগণ সাহিত্যের 'রস'সাধনায় সে আদর্শ পরিপোষণ করাকেই বলেন "শিব"। জীবনসাধকের পক্ষে যাহা 'চিন্ময় রস'স্বরূপ, উচ্চসাহিত্য জড়তার অতীতক্ষেত্রে চিত্তকে লইয়া গিয়া সেরূপ রসোপলব্ধি লক্ষ্য করে বলিয়াই তাহার আদর্শ 'শিব'। দেশকালের নিয়তিজালবদ্ধ মনুষ্যের পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র বা ধর্ম্মের ক্ষেত্রে, সুতরাং তৎসম্পর্কিত সকল বাক্যব্যাপারেও, এরূপে জড়তা-অতিরেকী 'ভাব'বাদও রসবাদের দ্বারে চিন্ময় রসাত্মতাই লক্ষ্য করিতেছে বলিয়া সাহিত্যের আদর্শ 'শিব'। সাহিত্যের চরম রসলক্ষ্যও সুতরাং "শান্তং শিবমদ্বৈতম্"।

বলিতে হইবে না যে, সাহিত্যের এই 'শিব' অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের ও Vedantic Ethicsএর আনুগত্যে দাঁড়াইতেছে এবং সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের মানব সমক্ষেই একমাত্র সত্যবিজ্ঞান রূপে আত্মখ্যাপন করিতেছে; মনুষ্যের সমগ্রজীবনের জ্ঞান ও কর্ম্মব্যবসায়কে সেই এক সচ্চিদানন্দ লক্ষ্যে বিধারিত, সংযত বা পরিচালিত করাকেই জীবের স্বধর্ম্ম ও 'শিব' রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। 'তৎ'বস্তু অধ্যাত্মতঃ বিশ্বের

নিদান ও চরমভূত 'সত্য-জ্ঞান-আনন্দ' তত্ত্ব বলিয়াই জগতের 'ধর্ম্মেশ্বর'। অতএব কোনদিকে তদ্বিপরীত চলাই জীবের পক্ষে আত্মহত্যারূপে দাঁড়াইয়া যাইতেছে। আমাদের যতদূর ধারণা, ইয়োরোপের সমালোচনাক্ষেত্রে এইভাবে জৈবধর্ম্মের বা মানবের সাহিত্যের কোন বস্তু, তত্ত্ব কিংবা উপাদানের সন্দর্শন ও বিচার হয় নাই। জগৎকারণকে 'সচ্চিদানন্দ'-রূপে, কিংবা অদ্বৈত আদর্শে জীবের 'আত্মা'-রূপে, মনস্তত্ত্ব ও মনোভূমির দিক্ হইতে ধারণা করার কোন চেষ্টাই যেন সে দেশে হয় নাই। ইয়োরোপে খ্রীষ্টানীয় দৃষ্টিস্থান কিংবা বিচার প্রণালীও সেরূপ নহে। উহার সমক্ষে বাইবেলই জগদীশ্বরের প্রমাণ এবং বাইবেলধৃত জগদীশ্বরের আদেশ বা Commandmentই 'ধর্ম্ম'বস্তুর প্রমাণ। সৃষ্টিপতির Command বলিয়াই বাইবেলী 'ধর্ম্ম'আদর্শের অপরিহার্য্যতা ; উহার অন্যথা করিলে চিরকালের জন্যই নরকস্থ বা মহামৃত্যুর অধীন হইতে হইবে। আবার, উহার সমক্ষে জগদীশ্বর ত একটা 'ব্যক্তি'—মানুষের মতই ব্যক্তি—যদিও তিনি অন্তরালে থাকেন। বুঝিতে হইবে, এরূপ 'ব্যক্তি'বাদ একবার মানিয়া লইলে জীবের দার্শনিক দৃষ্টিসমক্ষেই যেন একটা ঠুলি পড়িয়া যায় ; অধ্যাত্ম আদর্শে কিংবা জীবের মনস্তত্ত্বের দিক্ হইতে কোন বিচারের প্রবৃত্তিসমক্ষেও একটা আবরণ পড়িয়া যায়। জগৎকারণকে 'ব্যক্তি'-ঈশ্বরবাদী ভক্তগণ Omnipotent, Omniscient ও Omnipresent ব্যক্তি রূপে চিনিয়াছেন সত্য ; কিন্তু তিনি যে বিশ্বাতীত অথচ বিশ্বগত "সত্যজ্ঞান আনন্দ" তত্ত্ব, জীবের সকল ক্রিয়াপরিচালনার দৃষ্টিসমক্ষে অপরিহার্য্য 'ধর্ম্ম'ও শিব তত্ত্ব, এই 'ধর্ম্ম'র বিরোধী হওয়াই যে জীবের পক্ষে আত্মহত্যা—সে বুদ্ধিই যেন উক্ত দৃষ্টিস্থান গতিকে নিদ্রিত হইয়া পড়ে। খ্রীষ্টান বলিবেন, জগৎস্রষ্টা একজন ব্যক্তির ন্যায়, কুম্ভকার যেরূপে আপন হইতে পৃথক্‌ভূত ঘট সৃষ্টি করে সে রূপেই, এ জগতের সৃষ্টি করিয়া

৭৭। বেদপন্থীর দৃষ্টি-স্থান হইতেই জীবের ধর্ম্ম আদর্শের ও তাহার সাহিত্যের 'শিব' আদর্শের তত্ত্ববিচার ও প্রতিষ্ঠা সম্ভব পর।

স্বর্গে অবস্থিত আছেন। এ সিদ্ধান্তে মন বসিয়া গেলে, উহার পর, 'তৎ'বস্তু হইতে জগতের 'ভেদ'দর্শিনী বুদ্ধিই উত্তরোত্তর কার্য্য করিতে থাকে। তারপর যদি আবার জগদীশ্বরের 'প্রিয় পুত্র' অথবা 'প্রেরিত' বলিয়া কেহ দাঁড়াইয়া যা'ন, তাঁহার স্বরচিত বা আদেশরচিত কেতাব ও কেতাবী প্রার্থনা এবং ভজন, অধিকন্তু আদেশপালনই 'ধর্ম্ম'রূপে দাঁড়াইয়া যায়, তবে আর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বা ধর্ম্মজিজ্ঞাসা, দর্শন, 'আলোচনা' 'তত্ত্বচিন্তা' কিংবা 'অধ্যাত্ম' বলিয়া কোন ব্যাপারের কিছুমাত্র অর্থ অথবা উহার জন্য কিছুমাত্র ঠাঁই থাকে না। Prayer ও Commandment-বাদীর সমক্ষে দার্শনিক তত্ত্ববিচার বা 'অধ্যাত্ম সাধনা' বলিয়া কোন ব্যাপারেরও কিছুমাত্র প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োজন থাকে না। যাবতীয় ব্যক্তি-ঈশ্বরবাদী বা বিগ্রহবাদীর দৃষ্টিস্থানের এই ধাৎ গতিকে তাঁহাদের সমক্ষে কেবল ঈশ্বরাদেশের প্রভুতা ব্যতিরিক্ত সাহিত্যের স্বাত্মনিষ্ঠ কোন স্বতন্ত্র তত্ত্ববিজ্ঞানই দাঁড়াইতে পারে না।

ভারতীয় বেদপন্থীর দৃষ্টিতে জগতের নিদানের নাম "ওঁ তৎসৎ" এবং উহা বিশ্বকারণ সৎ-চিৎ-আনন্দ-তত্ত্ব; ইহাই বদান্তিক তত্ত্ব বিজ্ঞানের প্রথম ও চূড়ান্তের কথা এবং উহা জীবের মনোবিজ্ঞানের ভূমিতেই দাঁড়াইতেছে। উহার পর তুমি সৃষ্টিক্ষেত্রে প্রকটিত সেই তত্ত্বকে 'ব্যক্তি'ই কর' বা 'বিগ্রহী'ই দেখ', শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব-সৌর বা গাণপত্য আদর্শের যে 'ব্যক্তি'বাদ ও প্রয়াণপন্থাই অবলম্বন কর', নিদানের সেই 'তৎ' ও 'সত্য-জ্ঞান-আনন্দ' বস্তুর তত্ত্বকে বিস্মৃত হইলেই ভুল করিবে। ঋষি সুতরাং সেই 'তৎ' সত্যে দৃষ্টি স্থির রাখিয়াই, উহার কার্য্যভূত এই জগতের ও জগদন্তর্গত জীবের ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র-ধর্ম্ম (অপিচ সাহিত্যের) তাবৎ বিষয়বস্তু, ধর্ম্ম কিংবা ধর্ম্মাচারের প্রকৃতি এবং স্বরূপ নির্ণয় করিয়া থাকেন। ইহাই বেদপন্থীর দৃষ্টি—অনাকুল সত্যদর্শীর দৃষ্টি। অপিচ উহাকেই জগত্তন্ত্রে (তথা সাহিত্যতন্ত্রে) প্রকৃত সত্যবৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের দৃষ্টিস্থান রূপে নির্দ্দেশ করিতেছি। ভারতীয় 'বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের'

বা তথাকথিত 'হিন্দু'র কোন তত্ত্ববিচার-প্রণালী কিংবা সিদ্ধান্ত এই দৃষ্টিস্থান পরিত্যাগ করে না। যে স্থলে এই সত্যের 'ব্যভিচার', সে স্থানেই ধরিয়া লইতে পারি যে উহা অবৈদিক—উহা বেদপন্থীয় বা সনাতনধর্ম্মীয় বিচারপ্রণালী নহে।

৭৮। এই 'ধর্ম্ম' দৃষ্টিই বিশ্বের প্রকৃতিবিজ্ঞান; উহার নির্ভর কোন Authority বা Commandment এর উপরে নহে।

জৈব ক্ষেত্র হইতে, জীবের মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্র হইতে আদি কারণকে যে সৎ-চিৎ-আনন্দ (১) ব্যতীত অন্য আখ্যা দেওয়া যায় না, ইহা দ্বৈতবাদী কোন Theism আদর্শের সহজে ধারণায় আসে না। ভারতের সত্য-জ্ঞান-আনন্দ ও ধর্ম্ম কিংবা শিবস্বরূপের আদর্শ জৈব ক্ষেত্রের ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ প্রভৃতির যাবতীয় বস্তুকে একেবারে মূলে লইয়া গিয়াই আলোকপাত করিতেছে। কোনরূপ বহিরাগত Sanction, Commandment কিংবা বহিঃস্থিত Authoriy দ্বারা জীবের ধর্ম্ম, Ethics বা Moralityর প্রতিষ্ঠা প্রকৃত প্রস্তাবে হয় না—উহাদের ব্যাখ্যাও হয় না। Seven Deadly Sinsএর কোন দার্শনিক ব্যাখ্যা থাকিলে তাহা বেদান্তপন্থীয় দৃষ্টিস্থান হইতেই আছে। তাহার দৃষ্টিতে 'ধর্ম্ম' বিশ্বের প্রকৃতিগত একটা স্বতঃপ্রমাণ এবং স্বতঃপ্রধান বস্তু। এমন কি, কোনরূপ ঈশ্বরভক্তি বা ঈশ্বরবাদের উপরে,

(১) বেদান্তপঞ্চদশী সচ্চিদানন্দ 'শিব' সংজ্ঞার বেদার্থমর্ম্ম বক্ষ্যমাণরূপে, অতুলনীয় ভাবেই সংক্ষেপিত করিয়াছেন—

অসত্যালম্বনত্বেন সত্যঃ, সর্ব্বজড়স্তু তু।
সাধকত্বেন চিদ্রূপঃ, সদা প্রেমাস্পদত্বতঃ॥
আনন্দরূপঃ, সর্ব্বার্থসাধকত্বেন হেতুনা।
সর্ব্বসম্বন্ধবত্বেন সম্পূর্ণঃ শিবসংজ্ঞিতঃ॥

সংক্ষিপ্ত ও সার্থক কথায় বেদান্তমীমাংসাকে একেবারে হস্তামলক রূপেই ধরাইয়া দিতেছে।

বহির্দেশাগত কোন প্রভুতার উপরে উহার শক্তি কিংবা অস্তিত্ব নির্ভর করে না। এই 'ধর্ম্ম' কোনরূপ Social morality কিংবা Social Convention-ও নহে। বুদ্ধ ঈশ্বর বিষয়ে তুষ্ণীংভাব ও অ-জিজ্ঞাসা অবলম্বন করেন; কিন্তু স্বতঃপ্রামাণ্যময় 'ধর্ম্মকে' মানিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি এ'দেশে ঋষিসম্মান রক্ষা করিতে পারেন। এতদ্দেশে 'ধর্ম্ম' মানিলেই প্রকৃত প্রস্তাবে 'আস্তিক'; কেন না, ধর্ম্মের আড়ালেই 'ধর্ম্মেশ্বর' আছেন। ধর্ম্মের উপাসক অনিচ্ছাসত্ত্বেও জগতের ধর্ম্মেশ্বরেরই উপাসক। এরূপ দৃষ্টিই ভারতীয় বেদপন্থীকে পরম উদারত্ব দান করিতেছে। বলা বাহুল্য, এই 'ধর্ম্ম'ই বেদমন্ত্রের 'ঋত'—Cosmic Law; উহাই Physical, Moral ও Spiritual Law রূপে, নানা মূর্ত্তিতে বিশ্বের বিকাশ, ধারণ এবং বিলয় ঘটনা করিতেছে। এই তত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়াই প্রাচীন ঋষি বলিয়াছেন—"ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং মধু"। ধর্ম্মকে কোনরূপ বহিরাগত এবং পদার্থের বহির্ভাগ হইতে কাহারও প্রভুত্ব-প্রভাবিত তত্ত্বরূপে ধরিলেই ভ্রম। ফলতঃ যাহা জগতের "সচ্চিদানন্দ শিবঃ", যাহা "রসো বৈ সঃ", যাহা "সর্ব্বেষাং মধু" তাহা এবং ধর্ম্ম, সত্য ও ঋত একই বস্তু—যেই 'ঋত' বেদের ঋষিদৃষ্টির একটি প্রধান প্রাপ্তি, যাহাকে অবলম্বন করিয়া বেদের সেই অতুলনীয় 'ঋতসূক্ত' এবং কবি বাল্মীকি যাহার ধারণা পথে রামায়ণের সুপ্রসিদ্ধ সত্যপ্রশস্তি গান করিয়াছেন—

সত্যেনার্কঃ প্রতপতি সত্যেনাপ্যায়তে শশী।
দ্যাবন্তরীক্ষং পৃথিবী সত্যেনৈব ধৃতান্যত॥ ইত্যাদি।

এ সূত্রে বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, জগৎবৈজ্ঞানিক ঋষি জগৎব্যাপারের মূলে যেই 'ধর্ম্ম' বা 'ঋত'তত্ত্ব দর্শন করিয়াছিলেন, 'সনাতন ধর্ম্ম'স্মর্ত্তা মনু সেকালে তাহাকেই মানবের ব্যক্তিজীবনে এবং সমাজ-পরিবার ও রাষ্ট্রতন্ত্রে নিরূপণ করিয়া, যাহাতে "স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরণ্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ" সে উদ্দেশ্যেই, তাঁহার 'ধর্ম্মসূত্র' লিপি বদ্ধ করিলেন। সেই 'ধর্ম্ম'রূপী মহাভাবে আবিষ্ট হইয়া

এবং 'যতোধর্মস্ততোজয়ঃ' প্রদর্শনে সমুদ্দীপ্ত হইয়াই ব্যাস তাঁহার মহাভারতকাব্যের রসাত্মার ভাবুক হইয়াছিলেন; বাল্মীকিও মানুষের দেবধর্ম্মতা ও দিব্যতারূপী মহাভাবের ভাবুক হইয়া, স্বর্গমর্ত্ত্য তন্ন তন্ন করিয়া অবশেষে দিব্যসুন্দর রামগাথা অবলম্বনেই হৃদয় ঢালিয়া দিয়াছিলেন। ভারতীয় 'ধর্ম্ম'শব্দের ভাবিতার্থ বুঝিতে গেলে ভারতের প্রাচীনতম ধর্ম্ম-ভাবুকতা গুলির অর্থ চিন্তা না করিলেও চলিবে না।

অতঃপর মনুষ্যত্ব ক্ষেত্রের 'ধর্ম্ম'কে উহার বহুরূপী আকৃতিতে সবিশেষে নিরূপণ করিতে আমরা আর সময় ব্যয় করিব না; উহাকে আধুনিক কালের অসাম্প্রদায়িক Moral Scienceএর হস্তে সমর্পণ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারি। যাহা একক জীবের স্বধর্ম্ম, যাহা সমাজবদ্ধ জীবের স্বধর্ম্ম, তাহা তাহার সাহিত্যের রসবস্তুরও স্বধর্ম্ম; উহা রক্ষা করাই সাহিত্যের 'শিব'। এই 'ধর্ম্ম' মানুষকে রক্ষা করিতে হইবে; কেন না "ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ"। ধর্ম্মই সাহিত্যে রসের ধারণ, পোষণ ও বৃংহন করে; উহাই "সর্ব্বেষাং মধু"। অনেকে ত সাক্ষাৎ 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' তত্ত্বলক্ষিণী রসনিষ্পত্তিকেই সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র রস রূপে নির্দ্দেশ করেন—মম্মটভট্ট বলেন, "নির্ব্বেদঃ স্থায়িভাবোঽস্তি শান্তোঽপি নবমো রসঃ"!

৭৯। সাহিত্যের তত্ত্ববিষয়ে প্লাটোও ফিক্‌টে।

এস্থানে বুঝিতে পারি, গ্রীক দার্শনিক প্লাটো, সাহিত্যের আদর্শ নিরূপণ করিতে গিয়া কেন বলিয়াছিলেন উহা "Application of Moral ideas to life." উহার কাছাকাছি গিয়াই ত জর্ম্মণ দার্শনিক ফিক্‌টে বলিয়াছেন—"Poetry is expression of a religious idea!" এই Morality এবং Religionকে বৈদিক ঋষির 'ঋত' বা 'ধর্ম্ম' অর্থে গ্রহণ করিতে পারিলেই এ সকল দার্শনিকের উদ্দিষ্ট আদর্শটি হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। তাঁহারা উচ্চ সাহিত্যের 'জাতি' এবং প্রকৃতি নিরূপণ করিতে গিয়াই এ আদর্শ খ্যাপন করিয়াছেন।

অতএব, সাহিত্যে কবিবিশেষের কবিত্বের স্বরূপ ও উহার গৌরব-প্রতিপত্তি কিংবা পদবী চিন্তা করিতে হইলে কোন্ প্রশ্নের উত্তর চিন্তা করিতে হয়? তুমি সত্যশিবসুন্দরকে কোন্ দিক্ হইতে, কি ভাবে বুঝিয়াছ? উহার জাগতিক অভিব্যক্তিকে কোন্ দিক্ হইতে, কোন্ দৃষ্টিতে, কোন্ প্রায়ে দেখিয়াছ এবং তোমার দৃষ্টিফল কোন্ রীতিতে, কোন্ মাত্রায়, কি আকার-প্রকারে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছ? খণ্ড-কাব্য মহাকাব্য, নাটক, গীতিকবিতা, উপন্যাস—সমস্তের মাহাত্ম্য এবং আকৃতিপ্রকৃতি বিচারের ক্ষেত্রে এ সকল প্রশ্নের উত্তর চিন্তাই প্রধান কথা। এ স্থানে দাঁড়াইয়া বলিতে পারি যে, মানবমনের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মে প্রত্যেক সাধারণশিক্ষা-প্রাপ্ত ও প্রকৃতিস্থ পাঠকের চিত্তেই রসবোধের ক্ষেত্রে এই 'শিবাশিব' প্রশ্নের উদয় এবং মীমাংসা হয়ত অতর্কিতেই ঘটে। কেন না, 'ধর্ম্মাধর্ম্ম'বুদ্ধি জীবের 'সুখ দুঃখ' বোধের নিত্যসহচরী। কেবল সাম্প্রদায়িক শিক্ষাদীক্ষা ও মতলবী আদর্শপ্রবর্ত্তনার বিভিন্নতা হইতেই বিচারের ফলাফলবিষয়ে তারতম্য ঘটে। উহার নামই ত জীবের 'রুচিভেদ'! সাম্প্রদায়িকতায় সংকীর্ণ রুচিতত্ত্বের গতিকে পাঠকগণ কেহ বা সত্যকে, কেহ বা সৌন্দর্য্যকে, কেহ বা শিবকেই সতর্ক কিংবা অতর্কিতভাবে অথবা অপরান্ধভাবে গ্রহণ এবং সমর্থন করে বলিয়া অনেক স্থলে রুচিভেদ। নচেৎ ধর্ম্মবিদ্রোহী রচনার অর্থপ্রতীতিমাত্র সচেতন পাঠকের চিত্ত স্বধর্ম্মবশে অতর্কিতেই 'আই ঢাই' করিয়া উঠে। জীবের হৃদয় স্বতঃই মহৎ ভাবের মধুব্রত এবং মাহাত্ম্যের মধুজীবী; তাহার ধর্ম্ম'বোধি'ই সাহিত্যের মধ্যে ভাবের উচ্চতা ও 'দৈবী সম্পত্তি' পাইবার জন্য পিপাসিত। জীবের অন্তরাত্মাই ত সাহিত্যের অন্তরাত্মার মধ্যে রসের 'মাহাত্ম্য' ও মহনীয়তা দেখিবার জন্য লালায়িত হইয়া আছে!

এই যে সত্য এবং সৌন্দর্য্যের মধ্যেই আবার একটা জাতিভেদ আসিতেছে, জীবচিত্তের সর্ব্বসামান্য আনন্দের মধ্যেই আবার একটা 'ভালমন্দ' ও 'উচ্চনীচ' ভেদ দাঁড়াইতেছে, তাহার মূলে কি?

মনুষ্যের অধ্যাত্ম 'ধর্ম্ম'—মানুষ যে কেবল জড়পদার্থ বা পশুধর্ম্মা জীব নহে সেই বোধ, অন্তঃপ্রজ্ঞা ও অন্তর্ব্বিচার। উহা হইতে যেমন মনুষ্যের সামাজিক নীতিবাদের সূচনা, তেমন, সমাজ বহির্ভূত কোন মনুষ্যের বেলাতেও, উক্ত অধ্যাত্ম স্বভাব হইতেই একটা 'ধর্ম্ম', 'নীতি' বা 'সংযম' আদর্শের উদ্ভব এবং প্রবর্ত্তনা। মানুষের

৮০। সাহিত্যে সত্য ও সৌন্দর্য্যের জাতিভেদ ও শিবাশিব আদর্শেই সাহিত্যের চরম জাতি বিচার।

আত্মজজ্ঞা এই 'নীতি' এবং আত্মার্থিনী এই 'নীতি'। যে আত্মস্থিতি ও আত্মগৃহ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আসিয়াছি তাহাতে ফিরিবার জন্য ন্যূনাধিক অতর্কিত পিপাসা হইতে মনুষ্যের যেই একটা 'প্রবৃত্তি' সৃষ্টিধর্ম্মে গজিয়া উঠিয়াছে, এই নীতিবুদ্ধি বা শিববুদ্ধি তাহাই। উহাকে কেবল Ethical law বা সামাজিক সদাচারবাদ কিংবা Conventional Morality বলিলেই সঙ্কীর্ণতা এবং অব্যাপ্ততা ঘটিবে; প্রকৃত সত্যেরও অপলাপ ঘটিবে। এই আত্মার্থসাধনের প্রণালীটুকুর নামই 'ধৃতি' বা 'সংযম'; অপিচ উহা, যেমন সামাজিক জীবনে, তেমন একক মনুষ্যের জীবনেও অপরিহার্য্য এবং অনুল্লঙ্ঘ্য 'ধর্ম্ম'। এজন্য সাম্প্রদায়িক জঞ্জাল হইতে জীবের ধর্ম্মবুদ্ধির দর্পণকে নির্ম্মল ও উজ্জ্বল করাই অধ্যাত্মপথিকের সর্ব্বপ্রধান 'সাধনা'। সত্যদর্শী মাত্রের দৃষ্টি দেখিবে, একক মনুষ্যের পক্ষে, বনবাসী মনুষ্যের পক্ষেও, তাহার এই অধ্যাত্ম 'ধর্ম্মনীতি' হইতে নিষ্কৃতি নাই। 'বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাম্'—একটি পাষাণের প্রতি তোমার ক্রোধোদ্গম হইলে অথবা বিজন অরণ্যেও মনেমনে কামী, লোভী, মোহাবিষ্ট বা মাৎসর্য্যপর হইলেই তুমি অসংযত এবং আত্মভ্রষ্ট হইলে, অধ্যাত্মগতি হারাইলে এবং তোমার আত্মগতি-সাধনা বাধা প্রাপ্ত হইল। অতএব সামাজিক Ethics বা সামাজিক Convention হইতে এই 'ধর্ম্ম', 'শিব' ও 'সংযম' কত পৃথক্ পদার্থ! এই সংযমের 'গতি' জগৎনিদানে এবং চিৎস্বরূপের অভিমুখেই চলিয়াছে। গৃহে, বনে, সর্ব্বজীবনে মনুষ্যের হৃতস্বর্গের অভিমুখী, সকল অবস্থায় সেই চিন্ময় নিকেতনের অভিমুখী যে চিন্মার্গানুযায়ী ও সূক্ষ্ম অধ্যাত্মগতি, তাহার নামই

দাঁড়াইতেছে 'সংযম' বা 'ধৃতি'। সাহিত্যের ক্ষেত্রে আসিয়া, সাহিত্যের 'রস'-সাধনায়, মানবজীবনের সাহিত্যিক ধারণায় এই 'ধৃতি' এবং দৈবী সম্পত্তির উপলব্ধি ও নিষ্পত্তির আদর্শ অনুসরণের নামই "শিব"। অপিচ, এস্থলেই সাহিত্যের 'কৃতিত্ব'আদর্শের মধ্যে একটা Oughtness প্ররূঢ় হইতেছে। আমরা অগ্রে আরও দেখিতে পাইব "How all Art inculcates an Oughtness." এ' সুযোগে ইহাও সঙ্কেত করিয়া যাওয়া উচিত যে, বেদপন্থীর 'সনাতন ধর্ম্ম' নামক কথার অর্থটাও তাহার এই 'ধর্ম্ম' তত্ত্বের নিত্যতার মধ্যেই খুঁজিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত ইয়োরোপীয় Religion, Ethics বা সামাজিক Convention হইতে উহার পার্থক্যটুকুন পরিদৃষ্ট হইবে না, সে পর্য্যন্ত ভারতের'ধর্ম্ম' সংজ্ঞার মর্ম্মার্থও বোধগম্য হইবে না; এবং জীবের প্রত্যগাত্মমুখী স্বধর্ম্মগতি বা 'আত্মগতি' আদর্শের সম্যক্ জ্ঞান ব্যতীত কদাপি সাহিত্যের "সত্য শিব সুন্দর" আদর্শের অর্থও সম্যক্ পরিস্ফুট হইবে না।

সাহিত্যযজ্ঞে এই 'শিব'পদবী এবং শিবের যজ্ঞভাগ কোনদিকে ব্যতিক্রম করা যায় না। এস্থলেও আমাদের মনে রাখা উচিত যে, 'শিব' নির্ব্বিশেষ ও একান্ত হইয়া, অথবা রসের চিদানন্দসাধিনী 'শক্তি'কে ছাড়িয়া কোন সাহিত্যসৃষ্টি করিতে পারে না। কেবল 'শিব'কে মুখ্যভাবে লক্ষ্য করিয়া রাশি রাশি পুঁথি রচিত হইলেও উহাতে সাহিত্য দাঁড়ায় না—Didactics, Ethics, মনুসংহিতা বা 'বিনয় পিটক' হইয়া যায়। কেবলই ভাবের 'শিব'দৃষ্টি কাহাকেও কবি করিতে পারে না। অথচ 'শিব'ই সাহিত্যের চূড়ান্ত মাহাত্ম্যের পরীক্ষক এবং প্রমাপক; শিবতত্ত্বের ব্যভিচারী হইয়া কোন রচনা কদাপি উচ্চ সাহিত্যের স্থান লাভ করিতে পারে না। যেমন সাহিত্যের সকল সৌন্দর্য্যের, তেমন উহার সকল সত্যপ্রকাশের চরম পরীক্ষাস্থান এই শিবের চরণে। শিবক্ষেত্রের কোন আপত্তি উঠিলেই বুঝিতে হইবে যে শিল্পের সমাধানে কোথাও নিদারুণ একটা গলদ আছে এবং সে গলদ উপেক্ষার নহে; কবি অন্ততঃ বিষয়নির্ব্বাচনে এবং প্রয়োগবিজ্ঞানে বা

রসার্থের সমাধানে অনবদ্য হইতে পারেন নাই। সাহিত্যের ইতিহাস বলিবে, সাহিত্যে আদিকাল হইতে যাহাই ব্যাপকভাবে পূজা লাভ করিয়া আসিয়াছে তাহার কিছুই অধর্মের জনক ও অশিবের সাহায্যকারী নহে; তাহা কখনও Sensual ও Mean নহে; অথবা সত্য ও ধর্মতত্ত্বের বিরোধী নহে—মানুষ যাহার অনুধ্যানে লজ্জা কিংবা জুগুপ্সা বোধ করিতে পারে, এমন পদার্থ নহে। ইহা হইতেই সাহিত্যের আদর্শক্ষেত্রে 'শিব'মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিব। এই 'শিব'আদর্শের ব্যভিচারও ঘটিতেছে আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে—'কেবল সত্য' ও 'কেবল সৌন্দর্য্য'বাদী শিল্পিগণের হস্তে; বিশেষতঃ "Art for Art's Sake", Realism এবং Naturalism আদর্শের অনুসরণকারী নবেল লেখকগণের হস্তে। উহাদের অন্ধ অনুকরণে 'আত্মধর্ম্ম' ও 'সাহিত্যের স্বধর্ম্ম'বিস্মৃত এবং বিকৃত-মস্তিষ্ক আমরা আধুনিক সাহিত্যসেবিগণ এ ব্যাপারকেই একটা অভিনব ও মৌলিক সাহিত্যপন্থা এবং স্বাতন্ত্র্যপন্থা বলিয়াই চাপিয়া ধরিতেছি! বলিয়াছি, এরূপ 'দোষ' আলোচনায় কোন আনন্দ নাই। তথাপি এ বিষয়ে চুপ করিয়া গেলে, কেবল যে সাহিত্যের আদর্শ-আলোচনায় অঙ্গহানি হয়, তাহা নহে; সাহিত্যের তত্ত্ব-আলোচনায় ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রধান সমস্যাস্থল এবং বিবাদের স্থলেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে হয়! সাহিত্যের আদর্শকে জীবনাদর্শের সম্বন্ধসূত্রে আনিয়া ধারণা এবং দার্শনিকপ্রণালীতে হৃদয়ঙ্গম করা অনেকেরই ক্ষমতায়ত্ত নহে; অথচ, সাহিত্যপাঠ এবং সাহিত্যসেবা সভ্যসমাজের মনুষ্যমাত্রের পক্ষে একেবারে অপরিহার্য্য আকারেই ত দাঁড়াইয়া গিয়াছে! সাহিত্য মনুষ্যের বিনির্ম্মল, চিন্ময় আনন্দের ভাণ্ডার। 'সুখ সুখ' করিয়া ঘূর্ণ্যমান জীবাদৃষ্টে ইহাপেক্ষা বিশুদ্ধ এবং অপাপবিদ্ধ আনন্দ-সম্ভাবনা সংসারে আছে কি? আবার, যেমন প্রাচীনকালে, তেমন একালেও নরসমাজে শিক্ষার প্রধান বাহনটাই সাহিত্য—মনুষ্যের সমুন্নত ক্ষুধার ও অধ্যাত্মকর্ষণার প্রধান

৮১। আধুনিক সাহিত্যে শিব আদর্শের ব্যভিচার—মানুষের যৌনবৃত্তির স্নায়বিক উত্তেজনা।

উপজীব্যটাই সাহিত্য। জগতে মানুষের হৃদয়মন-প্রাণের চূড়ান্ত সুধাসমৃদ্ধি ও অমৃতপ্রাপ্তির কোন নিদর্শন থাকিলে তাহাকেও মনুষ্যের সঞ্চিত বাণীবিত্তভাণ্ডারে, এই সাহিত্যের প্রকোষ্ঠেই ত খুঁজিতে হয়! ঈদৃশ সাহিত্যের 'আত্মা' পদার্থ এবং রসাদর্শের মূলধর্ম্ম সম্পর্কেই একালে নানা অবিচার ও অত্যাচার! সাহিত্যই শিক্ষিত মনুষ্যের প্রধান আনন্দসঙ্গী; অথচ, এ সঙ্গীটাই অধুনা মানুষের ভয়ানক কুসঙ্গী হইয়া এবং কুপ্রবৃত্তির অগ্রচর ও সহায় হইয়া দাঁড়াইয়াছেন! অশিব, অভদ্র, দুর্গন্ধ, কুৎসিত এবং জঘন্যকে পরম 'পুণ্যসুন্দর' বলিয়া প্রমাণ করিতেই অধুনা এই বন্ধুবরের প্রধান লক্ষ্য! কেবল মৌলিকতার আস্পর্দ্ধা এবং আত্মখ্যাপনের অভিমানে নহে, আর্থিক বাজারপড়তা এবং ব্যবসাদারী উদ্দেশ্যেও তিনি এ ব্যবসায়ে লাগিয়া গিয়াছেন। অনেকের নিকট কুসঙ্গী এবং কুপথের পরামর্শমন্ত্রী ঈদৃশ ইয়ারের মূল্যই ত বেশী! ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল দেখাইতে পারিলে, বিশেষতঃ সুপরিব্যক্ত দৃষ্টান্তের সাহায্যে উহার পথ 'বাৎলাইতে' পারিলে, তাদৃশ ইয়ারের প্রতি আমাদের গুণানুভূতি ও সাধুবাদের সীমা থাকে না। এ পৃথিবীতে জীবের জন্মাদৃষ্ট বশেই, প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যে ন্যূনাধিক উগ্র অথবা অপ্রবুদ্ধ এক একটি পশু আছে। মনুষ্যের সামাজিক জীবন, এবং তাহার শিক্ষা ও ধর্ম্মকর্ষণা এই পশুটাকে 'মৃতবৎ' করিতে বা অকর্ম্মণ্য করিতেই চাহিতেছে। টেনিসনের ভাষায়—

> Move upword, Working out the beast,
> And let the ape and tiger die.

ইহাই ত মনুষ্যত্ব সাধনা—Because humanity is a Moral thing! এখন, মোটামোটি বলিতে গেলে, আধুনিক সাহিত্যের উক্ত অভিনব 'আর্ট' আদর্শ এই 'পশু'টাকে বাড়াইয়া মানুষটাকেই মারিতে, অপিচ পশুটাকে সুখী করিয়া সাধুবাদ লাভ করিতে ও স্বার্থসিদ্ধি করিতেই ত উদ্দেশ্য করিয়াছে! যৌনবৃত্তি মনুষ্যের দেহে একটি পশুসাধারণ বৃত্তি; উহাকে

'মনুষ্যত্ব' আদর্শে শৃঙ্খলিত করাই মনুষ্যের যাবতীয় সমাজতন্ত্র ও ধর্ম্মশিক্ষা এবং সাহিত্যশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। উহার যথাযথ নিয়ন্ত্রণার উপরেই, যেমন একদিকে মনুষ্যের সভ্যতার উন্নতি ও সভ্য মনুষ্যের যাবতীয় সদ্‌গুণ-বিকাশের ভিত্তি, তেমন অন্যদিকে, মনুষ্যের অধোগতি এবং পাশবনিয়তির জন্যও উহাই সহজতম ও ঋজুতম সদরদ্বার। আধুনিক সাহিত্যের এই অভিনব 'আর্ট্' আদর্শের সমস্ত কারিকরী, তাহার সকল বিভাবনা ও ভাবুকতা এবং কর্ম্মচেতনা কেবল মনুষ্যের যৌন বৃত্তিটারই খোশামোদ এবং উদ্দীপনা উদ্দেশ্য করিয়াই ত চলিয়াছে! উহা জীবের দেহতন্ত্রে স্নায়বিক ও জড়রসিক সৌখ্যবৃত্তি এবং উহার অতিরিক্ত উত্তেজনায় মানুষ অতর্কিতেই আত্মবিস্মৃত, বিশ্ববিস্মৃত ও হিতাহিতবিস্মৃত হইয়া পড়ে। এই অর্ব্বাচীন সাহিত্য-আদর্শের Beauty, Realism, Naturalism, Art for Art's Sake, Sex Psychology ও Sex Analysis প্রভৃতি যাবতীয় ক্রিয়াপদ্ধতির মুখ্য লক্ষ্য কেবল এই Sex—এই কাম! দেহস্থ যৌনবৃত্তির স্নায়ুগুলাকে কথা দ্বারা উত্তেজিত করিয়া এবং পাঠককে আত্মবিস্মৃত করিয়া, সে উত্তেজনা হইতেই তাহাকে একটা 'সুখ' দেওয়া! ফলে মানুষকে নিরেট পশু করা—Brutalise করা! এ ব্যাপার হইতেই ত অভিনব এই 'আর্ট্' আদর্শের বাজারপড়তা! মানুষের প্রকাশ্য কিংবা গুপ্ত সহানুভূতি হইতেই যে উহা প্রতিপত্তি লাভ করিয়া চলিয়াছে, ইহা সত্য কথা; এই নব আদর্শের প্রতিষ্ঠা বিষয়েও ইহাই চূড়ান্ত কথা।

এই বিদ্রোহী সাহিত্যআদর্শের প্রধান মন্ত্র টুকুর নামই "Art for Art's Sake!" উহা একটা পরম 'চারু বাক্য'—ঋষিগণ যে-জাতীয় কথাকে 'চার্ব্বাক' বাক্য বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আপাততঃ শুনিতেই মনে হয়, এ ত অতি সুন্দর কথা—সাহিত্যের বা শিল্পের আদর্শ নির্ণয়ে পরম মনোরম কথা! 'স্বয়ংপ্রয়োজন শিল্পকলা—সৌন্দর্য্যসাধনই ত আর্ট্!

কিন্তু কথাটাকে একটু তলাইয়া দেখিতে গেলেই গলদ বাহির হইয়া পড়িবে। আর্টের অর্থ যাহাই ধরা যাউক—জগতে কোন

পদার্থই স্বয়ংপ্রয়োজন হইতে পারে কি? এমন কিছু জগতে আছে কি? 'খাওয়ার জন্য খাওয়া—চলার জন্য চলা' বলিয়াও কিছু দাঁড়াইতে পারে কি? প্রত্যেক ক্রিয়াবস্তুর এবং কর্ম্মগতিমাত্রেরই নিজের বাহিরে একটা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকে। "প্রয়োজন মনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে"—বেকুব লোকেরাও বাহিরের একটা প্রয়োজন ব্যতীত কোন কাজেই হাত বাড়ায় না। আর্টের যাহাই অর্থ কর, উহার নিজের মধ্যে কোন Sake নাই। ম্যাথু আর্ণল্ড্ বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন "As if Art has a sake!"

৮২। সাহিত্যের আধুনিক 'Art for Art's sake' আদর্শ দাঁড়াইতে পারে না।

আর্টকে 'সৌন্দর্য্যসাধন' বলিয়া ধরিলে, সৌন্দর্য্যও ত একটা স্বয়ং-প্রয়োজন বস্তু নহে! আনন্দবোধ বা 'ভালমন্দ লাগা' লইয়াই সৌন্দর্য্যের মাপকাটি। ফলতঃ এই 'আর্ট'বাদ মূল কথাটাকেই চাপা দিতে চাহিতেছে। অসুন্দর, জঘন্য বা কুৎসিতকেও আপাততঃ 'সুন্দর' রূপে উপস্থিত করিলে তাহার মধ্যে 'ভালমন্দ' বিনিশ্চয় করে কে? অতএব খাওয়ার জন্য খাওয়া বলিলে যেমন কোন অর্থ হয় না, "সৌন্দর্য্যের জন্য সৌন্দর্য্য-সাধন" ও তদ্রূপ। এ সকল কথা কোন অর্থকেই অগ্রসর করে না।

টলষ্টয় কথাটাকে কাটিয়া, নিজে বলিতে চাহিয়াছেন—"Art is for Life's sake." উহাতে অনেকদূর অগ্রসর হইলাম বটে, কিন্তু তত্ত্বদর্শী বলিবেন, Lifeএর যাহাই অর্থ করা যাউক, উহাও ত একটা 'স্বয়ংপ্রয়োজন' পদার্থ নহে; উহাও একটা বিপথিক ও অর্দ্ধপথিকের কথা—যে ব্যক্তি মূল সত্য ও জীবনের চরম লক্ষ্যকে বিস্মৃত হইয়াছে তাহার কথা। তত্ত্বদর্শী গলা বাড়াইয়া বলিয়া উঠিবেন—"Life is for Sat-Chit-Ananda Atman's Sake" জগতের সকল কারণের যাহা 'কারণ', সকল প্রয়োজনের যাহা 'প্রয়োজন', জীবনের সকল জ্ঞানকর্ম্মের যাহা চরম লক্ষ্য তাহার নামই 'আত্মা'—এক এবং অদ্বিতীয় এবং পরম ও চরম 'সৎ'বস্তু; আত্মাই সকল কামের ও কামনার এবং সকল Sakeএর লক্ষ্যবস্তু; সেই

পরমাত্মাই ত জীবের ঘটে ঘটে আসিয়া তাহাদের সকল Sakeএর চরম Sakeরূপে দাঁড়াইয়াছেন! আত্মদর্শীর দৃষ্টিস্থান বিস্মৃত হইলে সেই পরম প্রেমময় ও প্রিয়তাভাজন ও ঘনিষ্ঠতম 'আত্মা' বস্তুকেই এড়াইয়া, প্রকৃত তত্ত্বের পাশ কাটিয়াই যাইতে হয়। ইয়োরোপের প্রায় সকল মনীষী সাহিত্যের আদর্শবিচারের ক্ষেত্রে তাহাই ত করিয়াছেন! সকল সৌন্দর্য্যবোধের 'কারণ'বস্তুকে এবং শিল্পচেষ্টার পথে সকল 'সৌন্দর্য্য'-সাধনার অতর্কিত কিংবা গুপ্ত ও 'চূড়ান্ত লক্ষ্য'রূপী এই 'আত্মা'বস্তুকে God বলিতে তাঁহারা নারাজ। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে 'নিত্যভেদ'-বাদী খ্রীষ্টান ইয়োরোপের দৃষ্টিতে God বলিতে কোন সর্ব্বময় ও 'চরম কারণ'-বস্তু যেমন সহজে আসে না, 'সচ্চিদানন্দ আত্মা'ও কোনমতে মুখ্যভাবে আসে না। আসে না বলিয়াই হয়ত তাঁহারা নারাজ। আবার, বাইবেলের 'স্বর্গস্থ পিতা'কে সাহিত্যব্যাপারের রসার্থমধ্যে টানিয়া আনিতে গেলেও হয়ত অত্যন্ত বেখাপ্পা শুনায়; শিল্পকলার ক্ষেত্রটাও যেন পরিশেষে সর্ব্বত্র পাপদর্শী ও পুণ্যোপদেষ্টা পাদরীসাহেবের খুঁতখুঁতকারী কুঞ্চিত নাসিকার রাজত্বভুক্ত হইয়া দাঁড়ায়! কিন্তু স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে চরমের 'একত্ব'বিজ্ঞানী ঋষির দীর্ঘ দৃষ্টি প্রথম হইতেই সর্ব্বপ্রকার 'ব্যক্তি'গুণসমাশ্রিত সঙ্কীর্ণতার ঊর্দ্ধে উঠিয়া ও অনন্তনরক-সন্ত্রস্ত ধার্ম্মিকতার আদর্শ ডিঙ্গাইয়া, 'সচ্চিদানন্দ আত্মা'র তত্ত্বেই জীবজীবন ও জগতের সর্ব্বকারণের এবং সর্ব্ব ক্রিয়ার অপিচ সকল আনন্দ ও সৌন্দর্য্য-চেষ্টার (জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত) লক্ষ্য পত্তন করিয়াছে! অতএব শিল্পকলার রসার্থকেও "ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর" বলিতে তাঁহার ইতস্ততঃ ভাব নাই—চরম সত্যকে 'আত্মা'রূপে নির্দ্দেশ করিতে লজ্জাও নাই।

ফলতঃ Art for Art's sake একটা পরম নাস্তিক্য উক্তি। উহা জড়বাদীর উক্তি—যাঁহারা জগৎকারণ 'Spirit'কে মানিতে চাহেন না, তাঁহাদেরই উক্তি। অনেক প্রকৃত আস্তিক্যবাদীকেই অতর্কিতে এইরূপ নাস্তিক্য পাইয়া বসে। যাহারা শিল্পের উক্ত আদর্শ খ্যাপন করে, তাহারা দৃষ্টতঃ জীবনের কোন 'অধ্যাত্ম' লক্ষ্য বা উচ্চ লক্ষ্যও মানে না।

জীবের এই জীবন এবং এই জড়জগৎ, এই Life ও Energy, এই 'প্রাণ ও রয়ী' উভয় তত্ত্বই যে এক 'আত্মা' হইতে আসিয়াছে এবং আত্মাতেই 'সুদূর লক্ষ্য'রূপে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে, অতএব আত্মিক জীবনকে এবং আত্মতত্ত্বকে লাভ করাই যে মানবজীবনের সকল জ্ঞান-কর্ম্ম-ভাবের চরম লক্ষ্য, অধ্যাত্মবাদী তাহাই 'বিজ্ঞান' বলিয়া ধারণা করে এবং তাহাই জীবের 'স্বধর্ম্ম' বলিয়া বিশ্বাস করে। অতএব অধ্যাত্মবাদী মাত্রই বলিবেন, "Art is for Spirit's sake"; কোন দিকে, মানবজীবনের কোন আদর্শধারণায় 'অধ্যাত্ম' আদর্শকে খণ্ডিত কিংবা কুণ্ঠিত করিতে তাঁহারা কদাপি পারিবেন না। ইয়োরোপের আধুনিক জড়বাদী কিংবা সংশয়ী জীবনের এই Spirit-আদর্শ মানেন না; খ্রীষ্টধর্ম্ম বা দ্বৈতবাদী কোন 'ভক্তি ধর্ম্ম'ও প্রকৃত প্রস্তাবে কোন Spirit-আদর্শকে মুখ্য করে না; কোন Spiritual Philosophyর উপরেও আত্মনির্ভর করে না। যেমন বলিয়াছি, বাইবেলের আপ্ততা ও খ্রীষ্টানীর মূলীভূত ন্যূনাধিক দ্বাদশ বৃত্তান্তকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া নিরাশঙ্ক বিশ্বাস এবং বাইবেল-ধৃত ঈশ্বরাদেশের প্রভুতার উপরেই খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রধান ভিত্তি। এ সমস্ত 'বিশ্বাস' লইয়াই উহার faith-আধুনিকের বৈজ্ঞানিক 'ধাৎ', সংশয়বাদ এবং ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে ইয়োরোপে খ্রীষ্টানের 'ধর্ম্ম'আদর্শের এই 'ঐতিহাসিক প্রামাণ্য' এবং ঈশ্বরাদেশের শক্তি বহু পরিমাণে বিচলিত হইয়াছে। বলিতে কি, এই Art for Art-আদর্শ প্রকৃত প্রস্তাবে বাইবেলের 'ঈশ্বরাদেশের' বিরুদ্ধে একটা প্রকাণ্ড বিদ্রোহ! মানুষের আত্মপ্রত্যয় ও সাধনা-নির্ভর প্রত্যক্ষপ্রতীতির উপরেই যে ধর্ম্মের প্রামাণ্যকে চরমে দাঁড়াইতে হয়, উহা সে দেশে অজ্ঞাত। কেবল খ্রীষ্টধর্ম্ম কেন, হীব্রুশিষ্য মহম্মদীয় ধর্ম্ম বা একান্ত 'কেতাব'বাদী 'ভক্তির ধর্ম্ম' মাত্রেই কতকগুলি ইতিবৃত্তঘটনা বা factএর উপরেই নির্ভর করে। ঐ সকল ঘটনার সত্যাসত্যতা জিজ্ঞাসা করাই বরং নাস্তিক্য এবং শয়তানী ব্যাপাররূপে এ সকল ধর্ম্মে দাঁড়াইয়া গিয়াছে! 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' বা 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' পূর্ব্বক তর্কযুক্তি এবং ভালমন্দ

বিচারের ও গবেষণার পথে ধর্মগ্রন্থের সিদ্ধান্তকে বা আপ্তবাক্যকেও বাজাইয়া লওয়াই ত 'মনুষ্যতা'! এইরূপে, 'কার্য্যকারণ'-বিচারলব্ধ সিদ্ধান্তের উপরে যে বিশ্বাস দাঁড়াইতে পারে তাহাই প্রকৃত ধর্মবিশ্বাস। বিচারনিরপেক্ষ কোনরূপ অন্ধবিশ্বাস আমাদের ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। সভ্য নরসমাজের বুদ্ধিধারা যুগধর্ম্মে এখন কেবল চরপন্থিতার এককূল-না-এককূল চাপিয়াই চলিয়াছে; ঈহুদী জাতি হইতে রিক্থসূত্রে প্রাপ্ত গোঁড়ামীই ধর্মজগতের আবহাওয়া শাসন করিতেছে; অধ্যাত্মপথে, তপঃখেদ অবলম্বনেই সত্যকে প্রত্যক্ষ করিতে কিংবা প্রতিপন্ন করিতে জীবের প্রবৃত্তি শিথিল হইয়া গিয়াছে। অতএব ইয়োরোপের পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র-ধর্ম্ম এবং সাহিত্যের আদর্শও এখন হয়ত বা কেবল পরবাক্যনির্ভর ও অধ্যাত্মদৃষ্টি-বিধুর ধর্মগোঁড়ামীতে অথবা কেবল সর্ব্ব-অস্বীকারী 'বৈজ্ঞানিক গোঁড়ামী'র দ্বারা একেবারে অভিভূত হইয়াই চলিতেছে।

উহার ফলেই উক্ত ভূখণ্ডে নানা দিকে নানারূপ উৎকেন্দ্রিক এবং কেন্দ্রচিন্তাবিধুর 'স্বাধীন মতবাদ' মাথা তুলিতেছে; অধিকন্তু প্রচণ্ডত-ধর্ম্মা জড়বাদীর আদর্শই প্রবল হইতে পারিতেছে। যেমন বলিয়াছি, এই 'Art for Art's sake' কথাও জড়বাদেরই আস্পর্দ্ধার ফল—মানবজীবনকে এবং জীবনের লক্ষ্যকেও খণ্ডভাবে দেখার ফল। সর্ব্বাগ্রে বুঝিতে হইবে, জীবনের লক্ষ্য কি? Art এর কোন একটা sake ত নাই! যাহা 'নিত্য', স্বসিদ্ধ বা স্বয়ংলক্ষ্য বস্তু নহে, যাহা মানুষের জীবনের বা সমাজের কিংবা ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য হইতে পারে না, তাহা কি করিয়া মানুষের কোন ক্রিয়াচেষ্টার লক্ষ্য হইবে? ঈদৃশ খণ্ডদৃষ্টির ফলে মনুষ্যের সমাজে, সাহিত্যে সর্ব্বত্র আত্মবিস্মৃতি, প্রকৃত বিস্মৃতি এবং কেন্দ্রবিস্মৃতি না আসিয়া পারে না। খণ্ডদৃষ্টি মনুষ্যত্বের একটা দুরারোগ্য রোগ—চিত্তের আলস্য ও জড়বুদ্ধির ফল—এবং মনুষ্যের পক্ষে উহা পরম ছোঁয়াছে। জড়বাদ খণ্ডদৃষ্টি রোগেরই একটা আসন্ন সহচর। ইয়োরোপের অনেক মনীষী ও পণ্ডিত ব্যক্তি—

আর্ণল্ড, রাস্কিন, টল্‌ষ্টয় প্রভৃতি—এই Art for Art's sake আদর্শের বিরুদ্ধবাদী হইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে এবং অধ্যাত্মবাদী তত্ত্বজ্ঞের দৃষ্টিস্থান হইতে বিষয়টাকে দেখেন নাই বলিয়া, তাঁহাদের নেত্রসমক্ষে উক্ত Art for Art's sake আদর্শের প্রবল খণ্ডতাধর্ম্ম এবং উহার অনাত্মলক্ষণ পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। দ্বৈতবাদ ও Authorityবাদ খ্রীষ্টান ইয়োরোপের তত্ত্ব-দর্শন এবং বিচারগবেষণার প্রণালীকেও যেন অংশদর্শী ও খণ্ডদর্শী এবং সংকীর্ণ করিয়া তোলে; এ ক্ষেত্রেও অতর্কিতে তুলিয়াছে। অধ্যাত্মবাদীর দৃষ্টিতে যাহা ভীষণ নাস্তিক্য, নিদারুণ অনাচারিতা, অপিচ জীবের ধর্ম্মধারণার ক্ষেত্রে যাহা আত্মহত্যা বলিয়াই প্রতীয়মান হইত, সে দিক্‌টা তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে; তাঁহারা উচিত মতে স্বপক্ষ সমর্থন করিতে পারেন নাই। কেবল সমাজতন্ত্রী Moralityর প্রভুতা ও বাইবেলের 'আদেশ'রক্ষার দোহাই দিয়াই কেহ কেহ থামিয়া গিয়াছেন; সাহিত্যের আদর্শবিচার ক্ষেত্রেও Authority *v.s.* Authorityই যেন উপন্যস্ত করিয়াছেন। ফলতঃ দ্বৈতবাদীর বিচারতন্ত্রে, স্বপক্ষ প্রতিপক্ষ উভয়েরই প্রধান অবলম্বন যেন কেবল প্রভুতা বনাম প্রভুতা; গোড়ামী বনাম গোঁড়ামী! প্রকৃত কার্য্যকারণ-তত্ত্বজ্ঞের দৃষ্টিস্থানকে উহা যেন অতর্কিতেই এড়াইয়া চলে! শিল্প বা সাহিত্যের পক্ষে আত্মনিষ্ঠ দর্শনভূমিতে দাঁড়াইয়াই 'স্বধর্ম্ম'নিরূপণ ব্যতীত শিল্প-সাহিত্যের কোন আদর্শ কিংবা সিদ্ধান্তব্যাপার শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। আধুনিক ইয়োরোপের জড়বাদ হইতেই তাহার সমাজতন্ত্রে 'সাম্য মৈত্রী' ও 'স্বাধীনতা'আদর্শের উৎপত্তি; তাহা হইতেই আবার উহার সাধারণতন্ত্রের (Democracy) অভ্যুদয়। মানুষ পার্থিব রাজার প্রভুত্ব অস্বীকার করিয়াছে, এখন 'স্বর্গরাজা'র প্রভুত্বটুকুও অস্বীকার করিতে বসিয়াছে।

আমরা বলিব, সংশয়ীর পক্ষে একবার বিচারযুক্তি ও প্রত্যক্ষতন্ত্রী অনুসন্ধানের পথে নরজীবনের চূড়ান্ত আদর্শ বুঝিয়া ও মানিয়া লওয়া

ব্যতীত এ ক্ষেত্রে নিষ্কৃতি নাই। সকল জিজ্ঞাসা ও বিচিকিৎসার পক্ষে, সচেতন মনুষ্যমাত্রের পক্ষে, 'নিত্যানিত্য বিচার'পথে জগতের নিত্যতত্ত্বের স্বরূপ ও জীবনের লক্ষ্যধারণাই প্রথম এবং প্রধান কথা—মনুষ্যমাত্রের প্রধান দায়িত্ব। (১) সেই পথে জীবনাদর্শ নিরূপণের উদ্দেশ্যেই আমরা 'সাহিত্যের স্বধর্ম্ম' দর্শনের ক্ষেত্রেও অদ্বৈত-বাদীর অধ্যাত্মদর্শন ও সিদ্ধান্তের বিষয় আলোচনা করিয়া শিল্পসাহিত্যের 'সৎ-চিৎ-আনন্দ রসাত্মা'র লক্ষ্য সমর্থন করিয়া আসিয়াছি। একবার অধ্যাত্মবাদ বুঝিয়া, মানিয়া লইতে পারিলেই সকল সংশয় ও বিচিকিৎসার পার পাওয়া যায়; জীবনের যে-কোন বিভাগের যে-কোন আদর্শ বিচারের ক্ষেত্রেও সকল ঘোরাঘুরি, বিভ্রান্তি, গোঁড়ামী অথবা বহিরাগত Authorityর অবসান হইয়া যায়; পরম পরিতৃপ্তি, শান্তি ও Serenity মানুষের হৃদয়মনকে পরম ধন্যতাবোধের সিংহাসনে অভিষিক্ত

(১) জীবতত্ত্ব নিত্যবস্তু কি না তাহা কে নিঃসন্দেহ প্রত্যক্ষে প্রমাণ করিতে পারে? 'নিত্য'ব্যতীত কে নিত্যতার সাক্ষ্য দিবে বা প্রমাণ করিবে? সেরূপ জন্মান্তর বা অদ্বৈতবাদও সত্য কি না, সে প্রশ্নমীমাংসার প্রয়োজনও হয়ত সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিহার্য্য নহে। কিন্তু মানুষ যে Spirit, অন্ততঃ এ'দেহের ব্যত্যয় বা বিনাশেও যে উহার ব্যতিক্রম হয় না, তাহা ত এই ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানপীঠেই ভূয়োদর্শন এবং পরীক্ষণের প্রণালীতে, সহস্র সহস্র প্রমাণ সাহায্যে, নিঃসন্দেহ নির্ণয়ক্ষেত্রে আনীত হইয়াছে। সে'দিকে অকপট জিজ্ঞাসা যাঁহার জাগিয়াছে তিনি, জীবনের অন্ততঃ পক্ষে বৎসরেক কাল তপঃশ্রম স্বীকার করিলেই একটা শান্তি ও স্থিরতা লাভ করিতে পারেন। ব্যক্তিগত তপঃশ্রম, পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা ব্যতীত অধ্যাত্মক্ষেত্রে অপর কোন সোজা পথ নাই—অথচ জীবসাধারণের অদৃষ্ট এবং অভিরুচিই উহার বিপরীতগামী। অতএব, এদিকে উপেক্ষা ও উপহাসের সোজা সুর ধরিয়া আত্মবঞ্চনার শয্যামন্দিরে নিরাশঙ্কা নিদ্রার ভান করাই জীবের সহজ ঝোঁক। নিজকে Spirit বলিয়া জানিলে যে জীবনের এ-যাবৎপ্রচলিত যাবতীয় ধর্ম্মধারণা এবং কর্ম্মব্যবহারের আদর্শ নানাদিকেই একেবারে উলট-পালট হইয়া যায়! মনুষ্যের সকল ইহসর্ব্বস্ব 'কর্ম্ম'-পদ্ধতিকেই ন্যূনাধিক সামলাইতে এবং 'ঢালিয়া সাজিতে' হয়!

করে। যথোচিত অনুসন্ধান করিয়াও অধ্যাত্মবাদ না মানিতে পারিলে কিংবা সংশয়ের নিরাস না হইলে সে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা, কেন না জীবকে আত্মবোধ নির্ভরেই ত চলিতে হইবে! কিন্তু পরিতাপের স্থল এই যে, প্রকৃত আস্তিক্যবাদী হইয়া এবং নিজের একটা অনাকুল বিশ্বাসভূমিতে স্থির থাকিয়াও অনেকে, সাহিত্যের আদর্শ চিন্তা করিতে গিয়া, খণ্ডদৃষ্টির গতিকেই দিক্‌ভ্রান্ত এবং বেয়াড়া হইয়া পড়েন।

অধ্যাত্মবাদী ফলতঃ 'নিত্যানিত্য'বিচার এবং 'কার্য্যকারণ'জিজ্ঞাসার (causality) পথেই, মনুষ্যের মনোবৃত্তির 'জ্ঞান-ভাব' ও কর্ম্ম-তত্ত্বের সামঞ্জস্যশীল এবং সমঞ্জসিত আদর্শে যেমন এই জগদ্বিবর্ত্ত ও উহার যাবতীয় 'তত্ত্ব'কে ধারণা করেন, তেমন, মনুষ্যজীবনের তাবৎ গণনীয় পদার্থকে উহার ছায়াতেই বিচার করেন—সমাজ, ধর্ম্ম ও সাহিত্য প্রভৃতির আদর্শকেও উহার ছায়াতেই নিরূপণ করিয়া, অধিকারভেদে সর্ব্বজীবের গ্রহণীয় একমাত্র 'তত্ত্ব'রূপেই উপস্থাপিত করেন। মূল আদর্শের এই খুঁটি একবার স্থির হইয়া গেলে, উহার পর কোন বিষয়ে কুত্রাপি দিক্‌ভ্রান্তি অথবা লক্ষ্যভ্রান্তি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। জীবের আত্মতত্ত্বের উপাদান, গতি ও নিয়তি এবং উহার লক্ষ্য যদি 'সৎ-চিৎ-আনন্দ' হয়, জীবের জীবনের আদর্শও ত হইবে, গৌন বা মুখ্যভাবে, 'সচ্চিদানন্দ'! জীবনের জ্ঞান-কর্ম্ম-ভাবের সর্ব্বগতি 'সচ্চিদানন্দ'আদর্শের সঙ্গতেই নিরূপণ করে বলিয়া, এতদ্দেশের ধর্ম্ম, সাহিত্য ও সমাজতন্ত্র প্রভৃতি সমস্তের লক্ষ্য এক এবং অভিন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেবল, ক্ষেত্রভেদে বা দেশকালপাত্র ভেদেই উহার 'আকৃতি'র ভেদ! উহার ফলেই ত আর্য্যভারতে বর্ণাশ্রমের 'অধিকার'তন্ত্রী ধর্ম্ম ও 'অধ্যাত্ম কর্ষণা'র আদর্শ দাঁড়াইয়াছে! জীবের জীবনের যাহা 'স্বধর্ম্ম', তাহার সমাজ এবং সাহিত্যেরও তাহাই স্বধর্ম্ম। ইয়োরোপীয় আস্তিক্যবাদীর মধ্যে অধ্যাত্ম-পথিকের এই মূলতত্ত্বিক এবং মনস্তত্ত্বিক দৃষ্টিটুকু প্রবল নহে বলিয়াই! সাহিত্যের 'সত্য শিব সুন্দর'আদর্শ দর্শন করিতে তাঁহাদিগকে অনেক ঘোরাঘুরি, অনেক Beating about the bush করিতে হইয়াছে।

কোন অধ্যাত্মবাদী, কোন Spiritবাদী বা কোন খ্রীষ্টিকেই 'Art for Art's sake মানিতে পারেন কি ? অধ্যাত্মবাদিগণ যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষাতেই বলিবেন—"ন বা অরে শিল্পকামায় শিল্পং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় শিল্পং প্রিয়ং ভবতি।" সকল 'প্রিয়তা'ধর্ম্মের মূলেই ত এ কথা; জীবের সকল 'ইষ্টতা'র পক্ষেও এই কথা। এরূপে, সাহিত্যের আদর্শচিন্তার ক্ষেত্রে সৌখ্যবাদ, সৌন্দর্য্যবাদ, প্রাকৃতবাদ ও প্রকৃতবাদ প্রভৃতি সমস্তকে যাজ্ঞবল্ক্যের রীতিতেই অধ্যাত্মবাদী নিরস্ত করিয়া তাঁহার 'সচ্চিদানন্দ আত্মা'র 'রস'তত্ত্ব উপন্যস্ত করিতে পারেন। ফলতঃ, জগতের সকল বস্তু এবং ক্রিয়াচর্য্যার আদর্শনির্দ্ধারণের চূড়ান্ত বিচারপ্রণালী এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই শ্রুতির যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদে অতুলনীয় ভাবে বিশদীকৃত হইয়াছে। "All Art is for Atman's sake !"

যাঁহারা 'Art for Art' আদর্শ সমর্থন করেন, তাঁহাদের একটা প্রকাশ্য বা গুপ্ত উদ্দেশ্যও আছে। 'আর্ট' বলিতে ইঁহারা বুঝেন—'সৌন্দর্য্য সাধন' বা 'সৌন্দর্য্যের অনুকরণ'। অতএব Realism ও Naturalism ও Sex-psychology প্রভৃতি 'রীতি'র দাবী এবং উদ্দেশ্যও উক্ত কথাটার কুক্ষি মধ্যেই লুক্কায়িত আছে। আমরা দেখিয়াছি, সাহিত্যের ক্ষেত্রে রসাত্মকের নামই 'সুন্দর'; অতএব, এ ক্ষেত্রে বিবাদের সম্ভাবনা অল্পই ছিল। কিন্তু 'চিন্ময়'রসাদর্শ গতিকে সাহিত্যে ভাবরসের বা সৌন্দর্য্যের প্রকাশমাত্রকেই 'উচ্চমহৎ' গুণে এবং 'সত্ত্বোদ্রেক' গুণে বরিষ্ঠ হইতে হয়—যাহা-তাহা রচনা করিতে পারা যায় না। করিতে গেলেই, জীবের পূর্ব্বাপর ধর্ম্মের ও সমাজজীবনের শিবাদর্শের তরফ হইতে তদ্বিরুদ্ধে, উহা একটা দুরাচার চেষ্টা এবং দুর্নীতি বলিয়া, অপবাদ ও অভিযোগ উঠে; শিল্পীকে সমাজ-শক্তি এবং রাজশক্তির লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। এজন্যই বিদ্রোহীদের ওই 'Art for Art' আদর্শ! মানুষের যাহা ভাল লাগে, ভালমন্দ বা ধর্ম্মাধর্ম্ম যাহাই হউক, তাহা উপস্থিত করাই হউক আর্টের আদর্শ।

৮৩। Art for Art's sake-বাদিগণের গুপ্ত উদ্দেশ্য এবং রসোদ্রেকের প্রণালী।

উহাই তাঁহারা উপস্থিত করিবেন; তাঁহাদের সম্মুখে সমাজ এবং রাজশক্তির এতসকল বিঘ্নবাধা ও বিরক্তিকর অন্তরায় কেন? Art for Art ঘোষণার তলে তলে এই গুপ্ত অভিসন্ধিটুকু কার্য্য করিতেছে! ফলতঃ মানুষের 'অধ্যাত্মতা', 'ধর্ম্ম' ও 'শিব' বা 'সাত্ত্বিকতা' আদর্শের বিরুদ্ধেই এ অভিসন্ধি। উচ্চতা, মহাত্মতা, মহত্ত্ব, Nobility, Dignity ও Distinction, প্রেম, সদাচার প্রভৃতি চারিত্রনীতি ও কর্ম্মনিয়ন্ত্রনার আদর্শ, সমাজে এবং সাহিত্যক্ষেত্রে, তাঁহাদিগকে নিতান্ত বেজার করিয়াদিয়াছে! Revolutionist's Hand Book' প্রণেতা বার্ণার্ডশ'য়ের মতে এ গুলি মানুষের পরম বেকুবি; অতএব তদ্বিরুদ্ধেই এ বিদ্রোহ!. এ সকল 'আর্টিষ্ট' চাহেন যে, বিশ্বসংসারে ধর্ম্ম বা Law and order বলিয়া তাবৎ পদার্থ প্রলয়বিপ্লবে ধ্বংস লাভ করুক; কেবল আপনাদের 'আর্টিষ্ট' কর্ম্মটা নির্ব্বিঘ্নে চলিবার স্থান টুকুই বর্ত্তিয়া থাকুক!

তাঁহারা বুঝিতে পারেন না কিংবা বুঝিতেই চাহেন না যে 'Art for Art' কথাটার মধ্যে একটা আত্মবঞ্চনা আছে; কূটকৌশলে (Artfully) প্রকৃত সত্যের গোপনচেষ্টাও যেন আছে। সাহিত্যের উপস্থাপনা মাত্রের মধ্যেই একটা উদ্দেশ্য—একটা ভালমন্দ বুঝাইবার প্রচেষ্টা—আছে; Criticism of Life বা ধর্ম্মচেষ্টাই গুপ্ত আছে। যখন ধর্ম্মই 'মনুষ্যত্ব' আদর্শের ভিত্তি, যখন ধর্ম্মই মানুষের নিয়ামক এবং মনুষ্যত্ব আদর্শের স্রষ্টা, তখন কোন উপস্থাপনার ব্যাপারেই ধর্ম্মকে এড়াইবার সাধ্য মনুষ্যের নাই। মানুষের জড়দেহের সৌন্দর্য্য, উহার সৌম্যতা, সুষমা, কমনীয়তা প্রভৃতিও, বলিতে গেলে, ধর্ম্মাদর্শ দ্বারাই শাসিত; মানুষের মনের কিংবা চরিত্রের সৌন্দর্য্য, তাহার স্নেহ-প্রেম-কারুণ্য ও মমতা প্রভৃতি ভাব-বৃত্তিগত সৌন্দর্য্য, এমন কি, মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, চলাফেরা, অশনবসন ও পোষাকপরিচ্ছদ পর্য্যন্ত তাহার ধর্ম্ম বা শিব আদর্শের দ্বারাই সাক্ষাৎ অথবা পরোক্ষ ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। উহাদের কিছুই For its own sake নহে।

Naturalism ও Realism প্রভৃতিও যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে আপন স্বত্বে ও সামর্থ্যে দাঁড়াইতে পারে না তাহা আমরা যথাস্থানে দেখিব। এখন, এই বিদ্রোহের আভ্যন্তরীন আরও কয়েকটি অভিসন্ধির উপর আলোকপাত করিয়া যাইতে হয়. 'ভাল লাগা' বা 'সৌন্দর্য্য'আদর্শ বলিতে যদি কেবল নিসর্গের সৌন্দর্য্য অথবা জীবহৃদয়ের কারুণ্য, হাস্য, বীর, বীভৎস, ভয়ানক, জুগুপ্সা, বৎসল বা শান্ত প্রভৃতি ভাব-বৃত্তির সম্পর্কজনিত সৌন্দর্য্য বুঝাইত, অন্ততঃ মানুষের intellctual ক্ষেত্রের একটা সৌখ্যঘটনা অথবা সৌন্দর্য্যধারণা বুঝাইত, তা'হইলেও হয়ত (উহার ফলাফল বিবেচনায়) সবিশেষ আপত্তিজনক কিছুই ছিল না। কিন্তু এসকল আর্টিষ্ট্ 'সৌন্দর্য্য' বলিতে বুঝিতে চাহেন (এবং বিশেষভাবেই চাপিয়া ধরেন) কেবল জীবের 'যৌনবৃত্তির যাহা ভাল লাগে'। স্ত্রী ও পুরুষ যে সমস্ত দৈহিক ধর্ম্ম ও প্রবৃত্তির গুণে পরস্পর আকৃষ্ট হয়, যাহাতে তাহাদের পরস্পরকে খাদ্যখাদক রূপেই ভাল লাগে, ফলতঃ তাহাই ইঁহাদের দৃষ্টিতে 'সৌন্দর্য্য' এবং উহা লইয়াই তাঁহাদের 'আর্ট'এর সমস্ত বাড়াবাড়ি। কামপ্রবৃত্তি মনুষ্যের দেহমনের প্রবলতম বৃত্তি; উহা মানুষের মধ্যে পশুসাধারণ সৌখ্যবৃত্তি। এই প্রবল স্রোতস্বতীর এক তীরের নাম 'পশু'; অন্য তীরের নাম 'দেবতা'। পদ্মানদীর ন্যায় উহা চিরকাল জীবের এক তীর ভাঙ্গিয়া অন্য তীর বাড়াইতে থাকে। মনুষ্যের সকল 'ধর্ম্ম'আদর্শ চিরকাল উহার স্রোতঃপ্রকোপ পরিহার করিতে, উহাকে নিগৃহীত এবং সংযত করিতেই লক্ষ্য রাখিয়াছে। বিশেষ কিছু ভাবুকতা এবং কলাকৌশলের প্রয়োজন মাত্র নাই, অতি সামান্য কথার দ্বারাই কামকে সহজে উত্তেজিত করিয়া মানুষকে একটা 'সুখ' দেওয়া যাইতে পারে। দেহের কামবৃত্তি এমন পদার্থ যে, কেবল একজোড়া স্ত্রীপুরুষ খাড়া করিয়া এবং তাহাদিগকে পরস্পর কামোন্মত্ত করিয়া তাহাদের গুহ্যগোপনীয় আলাপব্যবহার বর্ণনা করিতে গেলে, বিশেষ কোন কবিত্ব বিনাই, মানুষের দৈহিক স্নায়ুগুলি উত্তেজিত হয়। এইরূপে, ফলে, মানুষের কামবৃত্তির স্নায়বিক উত্তেজনা সাধন করাকেই

এসমস্ত আর্টিষ্ট্ ধরিয়াছেন 'সাহিত্যে সৌন্দর্য্যসাধন'। তাহার উপর, লেখকের ক্ষমতা থাকিলে, বিচিত্র প্রয়োগকৌশলে কখন বা চাপা দিয়া, কখন বা আস্কারা দিয়া এরূপ স্নায়ু-উত্তেজনার মাত্রা বাড়াইয়া তুলিয়া অসতর্ক ব্যক্তিকে একেবারে উন্মত্ত করিয়া দিতেও বাধা নাই। এরূপে, পরস্পর ক্ষুধার্ত্ত স্ত্রীপুরুষের পুঙ্খানুপুঙ্খ মশারিদৃশ্য অথবা অভিসারদৃশ্যের বর্ণন, তাহাদের কামক্ষুধার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিলাসলীলার উদ্ঘাটন—উহার নামই সাহিত্যে Sex-psychology ; এবং এইরূপে কল্পিত স্ত্রীপুরুষের হাবভাবভঙ্গী ও আকার-ইঙ্গিতের 'অনুবীক্ষণী' বিবরণ, উহাই হইল আধুনিক সাহিত্যের Realism ও Naturalism—অন্য কথায় সাহিত্যে 'বৈজ্ঞানিক রীতি'। এত সমস্ত অভিসন্ধি এবং প্রয়োগপ্রণালীকে যেই আদর্শবাদ আপনার পক্ষপুটে ঢাকিয়া, সাহিত্যক্ষেত্রে আসিয়া উচ্চগলায় আপনাকে জাহির করিতেছে, তাহার নামই 'Art for Art's sake'. আস্ত কামোদ্রেককেই 'সাহিত্যিক রসোদ্রেক' বলিয়া চালাইয়া দেওয়ার নামই Art for Art's sake ; মানুষের ধর্ম্ম, পবিত্রতা, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও বিনীতির আদর্শ এবং 'দৈবী সম্পত্তি' যে মতবাদের সমক্ষে ফলতঃ নিদারুণ দুষ্মন পদার্থ, তাহার নামই Art for Art's sake ; যাঁহারা Free Loveএর ধ্বজা তুলিয়া, 'নারীত্বের দাবী' বা 'পুরুষত্বের দাবী' ঘোষণা করিয়া, বিবাহ প্রথা তুলিয়া দিয়া, অপ্রতিহত উপস্থতন্ত্রের প্রবর্ত্তন করিতে এবং মানুষের সমাজ ও ধর্ম্মের আমূল প্রলয় সাধন করিতে চাহিতেছেন, সেরূপ Revolutionistগণের অভিসন্ধিগত আদর্শ এই Art for Art's sake.

এ আদর্শের জনক নির্দ্দেশ করিতে হইলে বলিতে হয়—ফরাসী নবেল সাহিত্য। ফরাসী জাতি ইয়োরোপের সমাজে ও সাহিত্যে অনেক নব নব আদর্শের আবিষ্কর্ত্তা। ফ্রান্স্ দুই-দুই বার সমগ্র ইয়োরোপীয় সাহিত্যের গুরু এবং অভিনব পথপ্রদর্শকের কার্য্য করিয়াছে। ভাল মন্দ উভয় পক্ষেই তাহার গুরুতা। ইয়োরোপীয় আধুনিক সভ্যতা ও ও সমাজতন্ত্র বলিতে যাহা বুঝায়, তন্মধ্যে ফরাসীর কর্ত্তৃত্ব কেহ

অস্বীকার করিতে পারিবে না। ফরাসী বিপ্লবের Liberty ও Equality আদর্শের উদর্কই এখন ইয়োরোপের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম্মতন্ত্র ও সাহিত্যে, ভালমন্দ উভয় দিকে থাকিতেছে। Art for Art's sake প্রভৃতিও সাহিত্যে Liberty আদর্শেরই সন্ততি।

৮৩। Art for Art's sake আদর্শে ব্যভিচারাত্মক প্রেম ও আধুনিক কথা সাহিত্যের রসতন্ত্র।

একেবারে 'স্বয়ংপ্রয়োজন' শিল্প আদর্শের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলিই গ্রহণ করিব—থিওফাইল্ গঁতিয়ের 'মাদামইসেল্ দি মফীন্', ফ্লোবেয়ারের 'মাদাম্ বোভারী', আনাতোল ফ্রান্সের Red Lily এবং জুদারম্যানের Song of Songs প্রভৃতি। উহাদের আদর্শপন্থক রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়', 'চোখের বালি' ও 'ঘরে বাহিরে' গল্পও ব্যভিচারাত্মক কামকেই প্রাধান্যতঃ আশ্রয় করিয়া আর্টের 'সৌন্দর্য্য'চয়ন ও রসসিদ্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যে ফরাসী শিল্পীর 'সত্যবাদ' ও Art for Art আদর্শে উৎসাহী এবং সাহসী হইয়াই এতাদৃশ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমাদের অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি নবেলী শিল্পশক্তির অনেকগুলি বলবান্ লক্ষণ ইংরেজী অপেক্ষা বরং ফরাসী আবহাওয়াতেই সুসিদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু, সাহিত্যের একজন জন্মসিদ্ধ অমরযোনি কিরূপে আধুনিক ইয়োরোপের নবেলক্ষেত্রের আপাতরম্য 'আসুর সম্পত্তি'র কুসংসর্গে বিপথগামী হইতে পারে, এ স্থলে তাহার নিদারুণ দৃষ্টান্তটুকুই আমাদিগকে সতর্ক করিতেছে! রবীন্দ্রনাথ কাব্যক্ষেত্রে স্বোপার্জ্জনের গুণে এবং কৃতিত্বের ওজনে যে সাহিত্যজগতের একজন শ্রেষ্ঠশ্রেণীর গীতিকবি বলিয়া পরিগণিত হইবেন এবং অনেকের নিকটে একজন Light Giver বলিয়াই পূজা লাভ করিবেন তাহাতে সন্দেহ হয় না। কালিদাসের পর এমন সৌন্দর্য্যতন্ত্রী এবং আদিরসের এমন একাগ্র উপাসক কবি ভারতে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার রচনায়, সত্য ও সৌন্দর্য্যসাধনায় যে প্রশান্ত ও নিবিড় দৃষ্টির ঘনফল উপচিত এবং প্রৌঢ় হইয়াছে, সাহিত্যজগতে তাহার তুলনা নাই। কিন্তু বিস্তারিত উপন্যাসের ক্ষেত্রে

নামিয়া স্বধর্ম্মবিস্মৃত কবি ফরাসী আদর্শের আওতায় পড়িয়া কি বিড়ম্বনাই না ভোগ করিয়াছেন! ইহা নিশ্চয় যে, আশৈশব বিদেশী শিক্ষাদীক্ষার গুণে মধুসূদন, হেম, নবীন বা রবীন্দ্রনাথ কাহারও মধ্যে ভারতীয় 'অধ্যাত্মবাদ' কিংবা 'ভারতীয় কর্ষণা' নামক পদার্থটী সচেতন ও বলীয়ান্ হইতে পারে নাই। ভারতীয় আবহাওয়া ন্যূনাধিক অতর্কিতেই তাঁহাদিগকে নিয়মিত করিয়া আসিয়াছে। ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথও ফরাসী আদর্শে একেবারে মনে প্রাণে গা ঢালিয়া দিতে পারেন নাই। গঁতিয়ে কি ফ্লোবেয়ার 'স্বাধীনতা'র তাণ্ডবোন্মত্ত হইয়া সাহিত্যের রসতন্ত্রের 'শিব'কে এবং মনুষ্যের ধর্ম্ম আদর্শকে কেবল 'বেকুবী' ধরিয়া কত নির্ভয়ে পদদলিত করিতে পারিয়াছেন! তাঁহারা আদ্যোপান্ত কামেন্দ্রিয় বিলাস, ব্যভিচার এবং কামুকের যথেচ্ছাচারকেই 'স্বয়ং প্রয়োজন সৌন্দর্য্য'আদর্শে তাঁহাদের এ সকল 'সত্যবাদী গল্পের' প্রধান উপাদানরূপে অনুসরণ করিয়াছেন! রবীন্দ্রনাথ ততদূর করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু কাম ও ব্যভিচারের পূতিগন্ধ কি করিয়া এই সৌন্দর্য্যতন্ত্রী কবির নাসিকায় এবং অন্তরাত্মায় এত সহ্য হইয়া গিয়াছে! তিনি উহা লইয়া শিল্পীর রসোল্লাসে এবং পরম শিল্পিচেতনায় এত নাড়াচাড়া করিতে পারিয়াছেন; উপর্য্যুপরি তিনতিনটী গল্পে কেবল ব্যভিচারের অনুচিন্তন করিয়াই চলিতে পারিয়াছেন! কোন 'কাব্য' রচনা করিতে বসিলে যাহা কদাপি পারিতেন না, তাহাই করিয়া বসিয়াছেন! পরিশেষে কেবল সবুদ্ধির দিকে এক একট মোচড় দিয়াই যেন তাড়াতাড়ি গ্রন্থের শেষ করিয়াছেন! অথচ তাঁহার এতাদৃশ সাধু উপসংহারের ফলশ্রুতি কি দাঁড়াইয়াছে? উহা সমগ্র গ্রন্থে পুঞ্জীকৃত কামবিলাসের আধিপত্য গুণে, গ্রন্থের স্ফুটপ্রতীয়মান অতি প্রবল কামকলা ও ব্যভিচারের আবহাওয়ার প্রকৃতি গুণে একেবারে মামুলি এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেও ছাড়ে নাই। তাঁহার প্রকাশিত সদিচ্ছা সত্ত্বেও পাঠকের মনে ব্যভিচারী কামকলার আকর্ষণটাই রমণীয় ও প্রবলতর হইয়া, সমগ্র গ্রন্থের স্থায়িভাবরূপে মুখর ও মুখ্যতর হইয়া তাঁহার সমস্ত সাধুবুদ্ধিকে এবং গ্রন্থের সাধু পরিশিষ্টকে গ্রাস করিয়াছে!

শিল্পের রসসিদ্ধির ক্ষেত্রে ইহাপেক্ষা বিপত্তির কথা আর কি হইতে পারে? আবার, কবি ত আমাদিগকে 'সুখ' দান করিতে ও কৃতিত্ব দেখাইতে এ তিনটী গ্রন্থের অবস্থা, ঘটনা এবং রসপ্রয়োগ অবলম্বন করিয়াছেন! মহেন্দ্র-বিনোদিনী অথবা বিমলা-সন্দীপের নানাবিধ শৃঙ্গার চেষ্টার সূক্ষ্মোজ্জ্বল পরিবর্ণনা আমাদের যতই সুখ দিতে থাকে, স্নায়ুতন্ত্বকে উত্তেজিত করিয়া যতই 'বাহবা' লাভ করিতে থাকে, ততই সঙ্গে সঙ্গে অন্তরাত্মার নিভৃত প্রকোষ্ঠ হইতে যেন আর একটী কণ্ঠের সৌম্যসূক্ষ্ম ধ্বনিও শোনা যায়, যাহাকে কবির প্রতি শ্রদ্ধা অথবা সাধুবাদের 'উদ্গিরণ' বলিয়া কোনমতেই মনে করিতে পারি না।

এ বিপত্তির কারণ কোথায়? প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্য, গ্রীকসাহিত্য অথবা যে-কোন উন্নত জাতির প্রাচীন সাহিত্য গ্রহণ করিলে একটা অপরূপ সত্য দেখিয়াই বিস্মিত হইতে হয়! তাহা এই যে, প্রাচীন শিল্পিগণ কদাচ ব্যভিচারকে আশ্রয় করিয়া 'আদিরস' ঘটনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এমন কি, উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যের যে সমস্ত 'আদিরস'স্থান জড়ধর্ম্মের বীভৎসতায় আধুনিকের হেয় হইয়াছে, সে সকল স্থানেও দেখিব যে, কবিগণ অপরিণীত স্ত্রীপুরুষকে অথবা ভবিষ্যতে যাহাদের পরিণয় সম্ভাবনা নাই এমন স্ত্রীপুরুষকে তৃষান্বিত হইয়া পরস্পর মুখামুখি করিতে একেবারেই দেন নাই; দিলেও ভীষণ পরিণাম বা একটা ট্রাজিডী দেখাইবার জন্যই দিয়াছেন। কালিদাসাদি কবির মধ্যে দুই এক স্থানে অভিসারিকা অথবা ব্যভিচারিণী অভিসারিকার সঙ্কেত মাত্র পাওয়া যায়—তাহাও আবার দেশ বা কালবিশেষের নক্‌সা প্রসঙ্গে। প্রাচীন শিল্পীর হৃদয় ব্যভিচারের প্রতি এতই জাতবিদ্বেষ ছিল যে, উহাকে শিল্পের ক্ষেত্রে কদর্য্য বলিয়া এতই স্বাভাবিক ঘৃণা অনুভব করিত যে, প্রাচীন সাহিত্যশিষ্টাচার ব্যভিচারী আদিরসকে সাহিত্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

৮৫। ব্যভিচারী কামকে আদিরস বলিয়া ভ্রম: চিরন্তন শিল্পশিষ্টাচারের বিদ্রোহ।

কেবল ব্যভিচার কেন, চিন্তা করিতে গেলেই দেখিব যে, প্রাচীন গ্রীকগণ বরং যেন স্ত্রীপুরুষের প্রেমকেই কোন একটা দুর্লভ বা উচ্চমহৎ ভাব-জাতিরূপে, কোন মহতী কাব্যচেষ্টা বা ট্রাজিডীর উপজীব্যরূপে গ্রহণ করিতেই চাহেন নাই। এস্‌কাইলাস ও সফোক্লিসের ট্রাজিডীগুলি সাহিত্যজগতের গরীয়সী ভাবজাতির দৃষ্টান্তস্থলী; উহাদের একটীও স্ত্রীপুরুষের প্রেমকে কোন মহাভাবনিষ্পত্তির উপজীব্যরূপে ধরে নাই।

প্রাচীন শিল্পিগণ সহজেই জানিতেন যে, স্ত্রীপুরুষের সংসর্গকে মনোমদ ক'রতে কোন কবিগুণধর ব্যক্তিকেই বেগ পাইতে হয় না। মনুষ্যের দেহপিণ্ডটিই এমন যে, যে-কোন স্ত্রীপুরুষকে পরস্পরের ভোগ্যরূপে যেমন-তেমন করিয়া উপস্থিত করিলেই পাঠকের ওই দেহপিণ্ডটী আমোদ লাভ করিবে; পাঠকের স্নায়ুতন্ত্রকে উত্তেজিত করিয়াই তাহাকে একটা আমোদ দান করিতে বিশেষ কোন শিল্পকারিগরীর প্রয়োজনই হইবে না। তাঁহারা আরও বুঝিতেন যে, মনুষ্য মননজীবী হইলেও তাহার দেহের গতিকেই পশুধর্ম্মা জীব; তাহার সমক্ষে কামাভিনয়ের দৃশ্য খুলিলে উহাই সর্ব্ববলীয়ান্ হইয়া কাব্যের অপর তাবৎ রসভাবকে, গ্রন্থের শিবাত্মা ও প্রাণতত্ত্বকেই গ্রাস করিবে এবং এমন ভাবেই নিগৃহীত এবং ধ্বংস করিবে যে কোন মতেই সাধু উপসংহারের রাশ টানিতে পারা যাইবে না। উহা আদিরস না হইয়া দুর্দ্দমনীয় ও জঘন্য 'কাম'রূপেই দাঁড়াইবে। ফরাসী গল্পলেখক-গণ দুর্দ্দান্ত অহঙ্কার এবং সাহিত্যের 'শিব'তন্ত্রের প্রতি অতি-প্রচণ্ড বিদ্রোহের বশেই সর্ব্বশিল্পতার সংহারকারী এই কদর্য্য 'কাম'কে সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'সৌন্দর্য্য' এবং রসসিদ্ধিরূপে আশ্রয় করিয়াছেন। পাঠকগণ এ সমস্ত ক্ষমতাশালী শিল্পীর প্রয়োগগুণে এবং উপস্থিতের আপাতমিষ্ট হলাহলে মুগ্ধ হইয়াই উহা পান করিতে থাকে; কিন্তু পরক্ষণে, সদ্ভাব উদিত হওয়া মাত্র, সকল শ্রদ্ধা হারাইয়া পরম ঘৃণাভরে একেবারে 'রামরাম' না ডাকিয়াও পারে না। কেবল, এ যুগের বাজার-পড়তার কুসংসর্গ এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় পরতন্ত্রতার ফেরে

পড়িয়া ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই নিদারুণ এবং বদ্‌রসিক দুর্ঘটনা ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে! যে দেশের ধর্মবুদ্ধি স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধকে পর্য্যন্ত মনুষ্যজন্মের পাপাত্মক অদৃষ্টরূপে দৃষ্টি না করিয়া পারে না, যে দেশের বিচারবুদ্ধি শৃঙ্গারকলার ক্ষেত্রে সঙ্কল্প, শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্পর্শন এবং গুহ্যভাষণকে পর্য্যন্ত সঙ্গমেরই প্রকারভেদ বলিয়া মনে করে, সে দেশে ব্যভিচারকেই প্রাধান্যতঃ উপজীব্য করিয়া রসঘটনার চেষ্টা হইতেছে; এবং কেবল যেন 'ক্রিয়ানিষ্পত্তি' ঘটে নাই বলিয়া সঙ্কেত করত অপরাধীকে সর্ব্বদোষ-মুক্ত বলিয়া ধরা' হইতেছে; এবং তাহাদের কাহিনীকথাও ভদ্রলোকের শ্রবণযোগ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে!

রসাদর্শের অপলাপ বিষয়নির্ব্বাচনের ঈদৃশ দুর্ঘটনা এবং শিল্পীর এরূপ আত্মবিস্মৃতি অবশ্য আধুনিক ইয়োরোপের সর্ব্বজাতির সাহিত্যেই ন্যূনাধিক মিলিবে। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ভাবুক এবং অন্তরাকাশবিহারী পক্ষীই যেখানে বিষয়বস্তুর কদর্য্য মৃত্তিকাধর্ম্মে পঙ্ককলঙ্কিত হইয়াছেন, তখন অন্যে পরে কা কথা! সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রে এই দুর্ঘটনার ফল কি হইয়াছে? তথাকথিত 'সৌন্দর্য্যবাদী' শিল্পের গুরুস্থানীয় গঁতিয়ে কিংবা ফ্লোবেয়ার প্রভৃতিই বা কি করিয়াছেন? পাঠককে শিল্পসাহিত্যের অতিথি-শালার রসনৈবেদ্যে নিমন্ত্রিত করিয়া, তাহার মিষ্টান্নের থালায় গুপ্তভাবে একেবারে পূযশোণিত ঢালিয়া দিলে, অথবা আতরগোলাপ মিশ্রিত করিয়া অভক্ষ্য পদার্থ পরিবেশন করিলে কেমন হয়? প্রকৃত বনিয়াদী অথবা প্রথিতযশা ও অমৃতপায়ী, অমর কবির সদাব্রতে আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে বলিয়া পাঠক হয়ত নির্ব্বিতর্কে উহা গলাধঃ করিবে, কিন্তু একবার প্রকৃত সদ্‌বুদ্ধি-সমুদিত এবং সচেতন হইলেই তাহার শ্রদ্ধা বিকল হইয়া পড়িবে; চিরকালের জন্য একটা বিদ্বেষ এবং ঘৃণাই উহার স্থান গ্রহণ করিবে। গঁতিয়ে বলিতে চাহেন, 'সৌন্দর্য্যসিদ্ধি এবং সৌন্দর্য্যের উপভোগই আসল কথা; এরূপে সৌন্দর্য্যের সঙ্গে "নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ" গোছের সম্পর্ক রক্ষা করিয়া, প্রত্যহ নব নব সৌন্দর্য্য উপভোগ করাই লক্ষ্য। দ্বিতীয়বার একের সম্মুখীন

হইবে না, কেননা উহাতে মনে পরিতৃপ্তি বা অবসাদ উপস্থিত করিয়া তোমার সৌন্দর্য্যবুদ্ধিকে এবং সৌন্দর্য্য উপভোগের স্মৃতিকেও কাহিল করিয়া দিতে পারে। ফ্লোবেয়ারও তেমনি, কোন স্ত্রীলোক একজনকে পরিণয় করিয়া কিরূপে, অপরের সহিত 'বিনাইয়া নানাছাঁদে' অবৈধ সংসর্গ করিয়া চলিয়াছিল এবং পরিশেষে, উহার জন্য কোন অনুতাপ কিম্বা শাস্তিভোগ বিনা 'উৎরাইয়া' গেল সে তত্ত্ব অনুপম সূক্ষ্মতুলিকায়, মনোমদভাবে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। আনাতোল ফ্রান্সের Red Lily অথবা জুদারম্যানের Soug of Sougsও এ' পথে ব্যভিচারকে সৌন্দর্য্যতন্ত্রের একটা পরম Culture রূপে উপন্যস্ত করিয়াই চলিয়াছে! এরূপে জীবন চালাইয়া, আবশ্যক হইলে বিষ খাইয়া মরিয়া পড়িতে পারিলেও ভাল! ব্যভিচার-তন্ত্রের ঈদৃশ 'কাল্চার'আদর্শ ইয়োরোপীয় সাহিত্যে অজস্র ঢলাঢলি করিতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আত্মদ্রোহী এবং বিশ্ববিদ্রোহী স্বাধীনমতের এত অত্যাচার মনুষ্যের সাহিত্যতন্ত্রে আর কখনও ঘটে নাই। অপবিত্র কদর্য্য এবং জঘন্যের প্রতি মনুষ্যের ঘৃণা বিলুপ্ত করিয়া, বরঞ্চ সহানুভূতি ও প্রেমভক্তি উদ্রিক্ত করার চেষ্টাই চলিতেছে। ইহারই নাম আধুনিক কথাসাহিত্যের 'সৌন্দর্য্যশিল্প'। এ কালের ভারতীয় কবি এতদূর করিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু, হিন্দুর পরিবারে দেবরের সহিত ভ্রাতৃজায়ার অবৈধ সহানুভূতি ঘটিয়া কিরূপে ঘর ভাঙ্গিবার সুবিধা আছে, ভদ্রলোকের ঘরের স্ত্রী কি করিয়া বিশ্বসিত প্রিয়বন্ধুর সঙ্গে বাহির হইয়া যাইতে লোফালুফি করিতে পারে, 'প্রাণসই' কি করিয়া সখীত্বের পথে গৃহতন্ত্রে প্রবেশলাভ পূর্ব্বক স্বামীটির সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হইবার সুবিধা পাইতে পারে; তারপরে নায়কনায়িকা কি করিয়া ফিরিয়া বসে (কোন ধর্ম্মভাবের বশে অথবা লোকলজ্জাভয়ে ফিরিয়া আসে কিনা তাহারও কিছুমাত্র প্রমাণ নাই) কেবল নিজে যে টুকু চাহিয়াছিল, দয়িতের মধ্যে তাহা না পাইয়া রুচি-পরিবর্ত্তনেই ফিরিয়া আসে; ভোগের তৃষ্ণাটুকু অতৃপ্তই থাকিয়া যায় (সুতরাং পরকালে যোগাস্থানে পুনরাবৃত্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনাই থাকে);

এমন সব তত্ত্ববিষয়েই রবীন্দ্রনাথের নবেলগুলি অনুপমভাবে সুথময় পন্থা প্রদর্শন করিতেছে। পাছে ধর্ম্ম অথবা নীতিকথা উপস্থিত করিলে গ্রন্থের শিল্পত্ব নষ্ট হইয়া যায়, সে ভয়ে 'ধর্ম্মনীতির কচকচি' করিতেও কবি সাহসী হন নাই। অথচ তুর্দ্দম্য পাপের উপযুক্ত কোনরূপ Poetic Justice করিয়া উপসংহার করিতেও পারা গেল না; কবি একরূপ 'ধীরে দাঁড়ি' টানিয়া, তাঁহার 'ইচ্ছা'মতে, নায়কনায়িকাকে তফাৎ করিয়া দিলেন। কিন্তু অকালে নিদ্রাভঙ্গের অপরিতৃপ্ত ব্যাঘ্র-বাসনায় গুমরিয়া গুমরিয়া মরিতে লাগিল কেবল হতভাগ্য পাঠকের অন্তরাত্মা। সে পথ চিনিয়াছে, পথের 'মিষ্টি'টুকুও 'হরদম' বুঝিয়াছে; এখন সুযোগ ঘটাইতে পারিলেই জীবনে স্বয়ং 'কাল্‌চার' করিতে পারে। এরূপ গ্রন্থের ইহাই পাঠফল। শরতের মেঘের মত এই যে গ্রন্থমেঘ কিছুকাল গুরু গুরু গর্জ্জন করিয়া বিনা বজ্রপাতে, বিনা বর্ষণেই কাটিয়া যায়, সাহিত্যের 'স্থায়ী ভাব'তন্ত্রে উহার কোন স্ফুটপ্রতীত বর্ষণ হইল না সত্য, কিন্তু এরূপ মেঘব্যাপার হইতেই ত লোকের অধ্যাত্মধাতু অযথা প্রকুপিত হইয়া ক্ষয়রোগের উৎপত্তি করে! এতাদৃশ সংঘটনা স্থলে বরং পরিষ্কারভাবে বর্ষণ হইয়া, একেবারে বজ্রবিদ্যুৎঝঞ্ঝায় প্রপাত, অধঃপাত বা বিনিপাত ঘটিয়া—একটা ট্রাজেডী হইয়াই তুর্মেঘের উপদ্রবটি কাটিয়া যাওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু শিল্পী রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সেরূপ কোন প্রচণ্ডতা এত অসম্ভব যে, এবং তাঁহার শিল্পতুলিকার ভীরুতাও এত প্রবল যে, তিনি একরূপ ছুঁই-না-ছুঁই ভাবেই সর্ব্বত্র চলিতে চাহেন। অতএব তিনি শিল্পতন্ত্রে একটা প্রচণ্ড পাপই গ্রহণ করিবেন, উহাকে পরম লোভনীয় করিয়া অঙ্কিত করিবেন—আর মধ্যপথে হাত গুটাইয়া লইবেন! গীতশিল্পী এবং স্বক্ষেত্রের অনুপম ছোট গল্পশিল্পী রবীন্দ্রনাথের মোলায়েম ভাবুকতার গুণটিই বিস্তারিত নবেলক্ষেত্রে দোষে পরিণত! নবেলশিল্পী রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থের মধ্যে কোন কঠিন তুর্ঘটনা কিংবা তুঃখের আমদানী করিতেই যেন ভয় পা'ন; তাঁহার তুঃখদোষানভিজ্ঞ জীবনের আশৈশব শিক্ষা এবং কর্ষণাই যেন এরূপ কোন প্রচণ্ডতার বিরোধী। অথচ

ফরাসী 'সত্যবাদী'র আদর্শে আত্মবিস্মৃত হইয়া, তিনি একটা উগ্রচণ্ড পাপ লইয়াই নাড়াচাড়া করিবেন! কদর্য্যের প্রতি ঘৃণা বিস্মৃত হইয়া, উহাকে প্রতিপদে খুব 'মিষ্টি' মধুর এবং মোলায়েম করিয়াই তাঁহার সৌষ্ঠবসিদ্ধ লেখনী আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিবে; কিন্তু চূড়ান্তের সত্যদর্শন ও যথাযুক্ত উপসংহার ব্যতীত (পাপের পরিণামকে কেবল ছুঁই-না-ছুঁই ভাবে ছাড়িয়া দেওয়ার ফলে) পাপের ওই স্নিগ্ধমধুর ছবিটাই আমাদের চিরমনোরম এবং মুগ্ধচিত্তের প্রবল আকর্ষণরূপেই থাকিয়া যাইবে! ইহা শিল্পের প্রয়োগ ও সমাধানের ক্ষেত্রে কত বড় অবিচার—হতভাগ্য পাঠকের আত্মার প্রতি কত বড় অত্যাচার! তাহার অধ্যাত্মদেহে কি মিষ্টমোলায়েম বিষপ্রয়োগ! অথচ প্রবলতর অস্ত্রাঘাতে রক্তমোক্ষণ করা ব্যতীত এই বিষ নামাইবার উপায়ান্তর নাই; সে উপায়ও কবির হাতে নাই—প্রবৃত্তিও নাই। এজন্যই তিনি নবেল ক্ষেত্রে বা জীবনদর্শনের ক্ষেত্রেও হুগো অথবা টলষ্টয়ের ন্যায় সুধন্য শিল্পী হইতে পারেন নাই।

ব্যভিচারী প্রেম বলিতে আমরা কেবল অধ্যাত্মস্থান বা বাইবেলের ঈশ্বরাদেশ স্থান হইতেই যে উহার দিকে দেখিতেছি তাহা নহে। ব্যভিচার সমাজতন্ত্রেও ঘৃণিত কপটতা, অভদ্রতা ও অসভ্যতা; উহা ভীরুতা, জুয়াচুরী ও মিথ্যার কাঁড়ী; উহা অসরল, আধমনী ও আধপ্রাণী পদার্থ। উহার পাত্রগণের ব্যাপার ভদ্রলোকের কদাপি শ্রবণ ও মননযোগ্য নহে; ব্যভিচারের সূক্ষ্ম পরিবর্ণনা ও দীর্ঘায়িত আলোচনা ভদ্রলোকের পক্ষে পরম ঘৃণাসহকারেই পরিহারের যোগ্য। উহা কেবল মনুষ্যত্বের কুৎসা। সাহিত্যে যাদৃশ প্রেমের মান আছে তাহার নাম ঐকান্তিক প্রেম—উহাতে অবশ্য কোন জাতিবিচার নাই, পাত্রাপাত্রবিচারও নাই। তুমি প্রেমে সর্ব্ববিস্মৃত, আত্মদানী ও সর্ব্বস্বদানী কি না? তা হইলেই, তোমার 'প্রেম' সমাজের আপাত-দৃষ্টিতে পাপীই হউক বা পুণ্যবান্ বস্তুই হোক, আমরা তোমার

ষ্টর কথা পরম আগ্রহসহকারে শুনিব। সাহিত্য হৃদয়ের দিকেই

দৃষ্টি করে। ব্যভিচারী প্রেম আলোকভীত, দিবাভীত, নীচাশয় ও স্বার্থপর প্রেম। উহা প্রেমাস্পদকে নিজের নাম, যশ, অর্থ, মান, প্রাণ—কিছুই দিতে চায় না; নিজের কড়াগণ্ডা কোন দিকে বিপন্ন করিতে, সমাজের সমক্ষে আপন স্বার্থের কেশাগ্রটুকুও ছাড়িতে চায় না। সমাজের মধ্যে এরূপ ঘৃণ্য তস্কর অনেকানেক থাকিতে পারে; কিন্তু, তাহাদের বিষয়-কথা সাহিত্যজগৎ পূর্ব্বাপর পরম ঘৃণাসহকারেই পরিহার করিয়া আসিয়াছে। তুমি তোমার বহির্দৃষ্টির দিক্ হইতে পাপ বা পুণ্য, ভাল বা মন্দ যা' ইচ্ছা বলিতে পার, সাহিত্য শুনিতে পারে এবং পূজা করে আত্মোৎসর্গী প্রেম—যেমন, রিজিয়ার প্রেম। যে রিজিয়া সুলতান আলতামাসের সুন্দরী, বিদুষী ও পরমা বুদ্ধিমতী কন্যারূপে ভারতসাম্রাজ্যের শিরোমুকুট এবং সিংহাসনযোগ্যা বলিয়াই নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন; দুনিয়ার অনেক বাদসা'জাদা যাঁহার করস্পর্শ করিতে পারিলে নিজকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিত। কিন্তু যে রিজিয়া প্রাণের অজের এবং অবধ্য ওই "বাচামগোচরচরিত্র" মদনদেবতার ফেরে পড়িয়া, ধন মান প্রাণ সমস্তকে অম্লানবদনে পণ করিয়া, নিজের নিউবীয় ক্রীতদাসকেই আত্মদান করিয়াছিল এবং সজ্ঞানে, জাগ্রৎনেত্রে নিজের ভবিষ্যৎ দেখিয়া ও বুঝিয়াই অকপটে, আত্মপ্রাণের ওই অবধ্য দেবতার পায়ে সর্ব্বস্ব বলি দিয়াই কবরের নিম্নে তলাইয়া গেল! সাহিত্য হৃদয়ের রাজ্য। অকপটভাবের সর্ব্বস্ব দান এবং মৃত্যুর তুলাদণ্ডেই সাহিত্যে সকল ভাব এবং রসমাহাত্ম্যের ওজন হইয়া থাকে। সাহিত্য পাত্রপাত্রী হইতে, কুমারসম্ভবের উমার ভাষায়, শুনিতে চায়—"মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতম্"। সে মনঃস্থিতি সমাজ ও ধর্ম্মবিরোধী হইলে অথবা বহিঃশক্তিতে ব্যাহত হইলেই সাহিত্যে ট্রাজিডীর আমল হয়। সাহিত্য এজন্য ঈদৃশ ক্ষেত্রে মানবজীবনের ট্রাজিডীই পসন্দ করে। কোনরূপ প্রবল প্রদাহ এবং মৃত্যুস্বামী ভাবস্থান ও জীবনসমস্যার স্থান এড়াইয়া কেবল ভাবুকতা ও Sentimentalityর মিষ্টমোলায়েম সৌখ্যরীতি যতই 'মিষ্টি' হউক উহাকে পাঠকের আত্মাপুরুষ সবিশেষ দুর্লভ বলিয়া কদাপি গ্রহণ

করে না। এ অবস্থায় যেমন 'প্রেম'ক্ষেত্রে, তেমন জীবনতন্ত্রেও কমিডী অপেক্ষা ট্রাজিডীরই মাহাত্ম্য। সাহিত্য এরূপ প্রেমিকপ্রেমিকার অশ্রুধারাই পরম আদরে অমর করিয়া রাখিতে চায়—চায় লোক শিক্ষার্থে, ধর্ম্মার্থে; বরং একপ প্রেমের কেবল ট্রাজিডীই চায়। এজন্য প্রেমের দুলালী ও আলালী ভাব অপেক্ষা এবং 'সাধের তরণীর সুখের প্রেমপাড়ী' অপেক্ষা প্রেমের ট্রাজিক মাহাত্ম্যই সাহিত্যে মহার্ঘ বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। এজন্য প্রেমসাহিত্যেও ট্রাজিডীরই পূজা। আধুনিক নবেলসাহিত্য মানবজীবনের সঙ্কটস্থান বা নৌকাডুবী এড়াইয়া, ব্যাপকভাবে কেবল 'সুখসায়রের পাড়ী' দিয়া ও সৌখীন সারীগান গাহিয়াই চলিয়াছে! কোনরূপ গুরুত্ব, বিষয়ের আবহাওয়া বা রসসিদ্ধির কোনরূপ মাহাত্ম্য আধুনিক নবেলে প্রায়ই নাই। সমাজদ্রোহী কিংবা ধর্ম্মবিদ্রোহী কোনরূপ 'সুখান্ত' প্রেমের প্রতিও মানুষের আন্তরিক কোন সহানুভূতি নাই। শেক্সপীয়র এ সূত্রে এণ্টনী-ক্লিওপেট্রার এবং রোমিও-জুলিয়েতের অশ্রুধারাকে গোলকুণ্ডাহীরকের চিরস্থায়ী হারযষ্টি করিয়াই ত নিত্যকালের গলায় পরাইয়া রাখিয়াছেন!

এরূপ ব্যভিচার আলোচনা সমাজে সকল ভদ্রবর্ণের পক্ষেই ত অশ্রাব্য হইয়া আছে! এক্ষেত্রে লেখক এবং পাঠক উভয়ের সদ্বুদ্ধির বিলোপ কতদূর গড়াইতে পারে তাহা একটু তলাইয়া দেখিলে সকলেই বিস্মিত হইবেন। যদি কোন ভদ্র বন্ধুসভায় বলিতে যাই "শুনেছ, শুনেছ—আমাদের বন্ধুপত্নী বিধবা অমুক—অমুক বাবুর সঙ্গে"—তা' হইলে তৎক্ষণাৎ সুশ্রাব্য শুনিয়া এবং অর্দ্ধচন্দ্র খাইয়াই সে স্থান হইতে ফিরিতে হয়। আর যখন হাতেকলমে লিখিয়া অথবা ছাপা বই করিয়া, উহা হাতে লইয়াই উপস্থিত হই, অমনি পরম আদরের ব্যাসাসন পড়িয়া যায়, আর তাকিদ হইতে থাকে "তাইত হে—তার পর!"—এই ত প্রকৃত অবস্থা! কোন ভদ্রমহিলা পরপুরুষের সঙ্গে ব্যভিচার-আমোদে লিপ্ত আছেন, উৎসাহাতিশয্যে তাহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা করা' দূরে থাকুক সঙ্কেতমাত্র করিতেও আমাদের

ভদ্রতাবুদ্ধি বাধা প্রদান করে; ভদ্রসমাজের শ্রোতা মাত্রে উহাতে বরং নিজকেই অপমানিত মনে করিয়া রুষ্ট হইয়া থাকেন। ভদ্রসমাজে যাহা এতই বিগর্হিত, সরস্বতীমাতার পবিত্র মন্দিরে প্রবেশমাত্র তাহা কিরূপে, আমাদের চোখে ধুলা দিয়া, এতই মনোরম্য এবং প্রকাম্য হইয়া দাঁড়াইতে পারে? মুখে বলিতে গেলে যাহা এতই কুৎসিত এবং হেয় লেখনীর ক্ষেত্রে আসিয়া তাহা কিসে এতই সুধাবিনিন্দী এবং সুগন্ধি স্বরূপে ধাঁধা লাগাইতে পারে? "There must be something rotten in this state of Denmark!"

ফলতঃ মাদাম বোভারী, Red Lily, জুদারম্যানের Song of Songs-এর Lily, মহেন্দ্রবিনোদিনী ও 'নষ্ট নীড়'এর বউদিদি—ইহাদের প্রত্যেকেই ত ঘোর অভদ্র, বিশ্বাসঘাতক, জুয়াচোর এবং মিথ্যাবাদী! কামের উদ্রেকে যতই স্নায়ুসুখ জন্মিতে থাকে, মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণে যতই কুতূহল চরিতার্থ হইতে থাকে, ততই পাত্রপাত্রীর এতসমস্ত অভদ্র ও জুগুপ্সিত আচরণে আমাদের আত্মাপুরুষ লেখকের প্রতি অপরিসীম বিরুদ্ধ বুদ্ধি ও বিতৃষ্ণায় তিক্তবিরক্ত হইতে থাকে। এ সকল কথায় ভদ্রলোকের কাণ দেওয়া অনুচিত বলিয়াই যেন নিজের প্রাণের মধ্যে একটা আকাশবাণী নিত্য উত্থিত হইতে থাকে!

অথচ এ'জাতীয় শিল্পীর প্রকাশিত আদর্শ কি? তাঁহারা 'সত্য কথা'ই কহিতেছেন, এবং এ সকল 'সত্য কথা' মানুষের জানা উচিত—ঈদৃশ উদ্দেশ্যই এসকল শিল্পী ঘোষণা করেন। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, সকল সত্যই সাহিত্যে প্রবেশের অধিকারী নহে। এই অধিকারবাদের অস্বীকার, এবং প্রচণ্ড 'আমার ইচ্ছা' নামক বিশ্বদ্রোহী স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের বশবর্ত্তিতা হইতে সকল আধুনিক সাহিত্যে পাঠকের অন্তরাত্মার উপর নানা অবিচার এবং অত্যাচার চলিতেছে। কেবল অধ্যাত্মক্ষেত্রের সূক্ষ্ম কুসঙ্গী বলিয়া নহে, সত্যবাদ এবং সৌন্দর্য্যবাদের অছিলায় অনেক নির্লজ্জ, কুশ্রী এবং কদাচার পদার্থের দ্বারাই আধুনিক

৮৬। শিবদ্রোহী সত্য-বাদ ও সৌন্দর্য্য আদর্শ।

সাহিত্যজগৎ ভরপুর হইতে চলিয়াছে! আমরা দেখিয়াছি, কালিদাসও ত নির্ব্বিশেষ সৌন্দর্য্যজীবী কবি—এই কালিদাস যুদ্ধব্যাপারকেও মধুর এবং মোলায়েম করিয়াই উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁহার সতর্কতা এবং শিব-চৈতন্য এত অতন্দ্রিত এবং সূক্ষ্মদর্শী ছিল যে উহা তাঁহাকে কিছুতেই মূল বিষয়ে ভ্রান্ত হইতে দেয় নাই। শিল্পী কালিদাস যেমন কদাপি পাপ অথবা ব্যভিচারের ক্ষেত্রে পদার্পণ করেন নাই; তেমন দাম্পত্যসামার মধ্যেই নিজের শিল্পতত্ত্বকে আবদ্ধ রাখিয়া প্রেমের ভুলভ্রান্তি, বিরহ, দুঃখ, প্রায়শ্চিত্ত এবং পরিশেষে জয়পরিণামের সঙ্গীত গান করিয়াই তিনি সৌন্দর্য্যবাদী শিল্পীর পরম উৎকর্ষপদবী অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে কালিদাস পাপের উৎকটতা এবং প্রচণ্ডতাকে পরিহার করিয়াও শিল্পসিদ্ধি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অনেক দিকে কালিদাসের মত কেবল একটা বিশেষসৌন্দর্য্যতন্ত্রের কবি বলিয়াই তাঁহার বর্ণতুলিকা পাপের স্বরূপবোধে, অথবা স্বরূপ অঙ্কনে কিংবা উহার শাস্তি এবং প্রায়শ্চিত্ত বিধানে একটা দারুণ কার্পণ্য এবং সঙ্কোচ যেন প্রতিপদে অনুভব করিয়াছে বলিয়াই ধারণা হইবে। পাপের উৎকটতা কিম্বা উহার প্রায়শ্চিত্তদণ্ডের কোনরূপ তীব্রতা তাঁহার শিক্ষা, প্রকৃতি এবং স্বানুভূতির বিরোধী বলিয়াই যেন তিনি বিনোদিনী বা বিমলাকে মৃদুভাবে পাপোন্মুখ করিয়া ভয়ে ভয়ে রাশ টানিয়াছেন; শিল্পের ক্ষেত্রে 'ভোগা' এবং 'লোভা' অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সেক্সপীয়র কিম্বা এলিজাবেথযুগের নাট্যশিল্পিগণের ন্যায় কিংবা উপন্যাসের ক্ষেত্রেই টলষ্টয়ের ন্যায় পরিস্ফুট, তীব্র, নিরপেক্ষ এবং পরিণাম প্রদর্শনেও নাছোড়বান্দা হইতে পারেন নাই। এরূপ মৃদুতার গতিকেই ব্যভিচার বর্ণনা কমনীয় এবং লোভনীয় হইয়া উহার প্রায়শ্চিত্তটুকুনও মৃদুমধুর হইয়া ব্যভিচারজীবী শিল্পের অন্তঃপ্রকৃতিকে নিদারুণ ভাবে অব্যবস্থিত এবং হেয় করিয়া দিয়াছে। ইহা কত নিদারুণ একটা দুরদৃষ্ট! উহার গতিকেই ত 'চোখের বালি' এবং 'ঘরে বাহিরে' উচ্চসাহিত্যের

শিবাত্মকতার ক্ষেত্রে দুর্ব্বল হইতে বাধ্য হইয়াছে! কিন্তু পাঠক অথবা সাহিত্যসেবীর পক্ষে ব্যভিচারশিল্পের বর্ণনাতত্ত্ব এবং উহার অন্তরাত্মা বিচারের এমন দৃষ্টান্ত ক্ষেত্র আর দ্বিতীয়টী আছে বলিয়াও মনে হয় না।

বঙ্গসাহিত্যে, শিবতত্ত্বের ক্ষেত্রেই বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষাকৃত (Sanity) প্রকৃতিস্থতা বিশেষভাবেই লক্ষ্য করিতে পারা যায়। কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণী-গোবিন্দলালের ব্যভিচার এমনভাবে সঙ্কেতিত এবং অঙ্কিত হইয়াছে যে চিত্তাকর্ষক হইয়া উহার সঙ্গে পাঠকের প্রীতিসহানুভূতি ঘটিবার অবকাশ ঘটে না। এই ব্যভিচারের পর্য্যবসান এবং গোবিন্দলাল কর্ত্তৃক রোহিণীর হত্যাব্যাপারটি শিল্পের হিসাবে খুব নিপুণ বা নিভুঁল ভাবে অঙ্কিত না হইয়া থাকিলেও শিবতত্ত্বের তরফ হইতে তদ্বিরুদ্ধে কোন বলবতী আপত্তি দাঁড়াইবার অবকাশ ঘটে নাই।

কামবর্ণনার অন্যদিকেও দৃষ্টি করিতে হয়। ভবভূতির উত্তর চরিতের প্রথম অঙ্ক স্ত্রীপুরুষের একেবারে বাসরশয্যা উজ্জ্বলকমনীয় ভাবে বর্ণনা করিয়াও কেন কামোদ্রেক করে না? অথচ গঁতিয়ের 'মাদেমইসেল দি মফীন' শেষ করিয়া একেবারে প্রতিভার বিষাক্ত কুণ্ডে স্নান করিয়া উঠিলাম ভাবিয়া আমাদের চিত্ত কেন নির্ম্মল জলে অবগাহনের জন্যই লালায়িত হইয়া উঠে? উহার প্রধান রহস্য—ভবভূতি রামচরিত্রের আত্মত্যাগ দেখাইবার জন্যই নাটকে তাদৃশ অপরূপ অবস্থা কল্পনা করিয়াছিলেন। রাম যে রাজধর্ম্মের ভৃত্যভাবের বাধ্য হইয়া, লোকস্থিতির আদর্শরক্ষার্থে নিষ্কলুষ প্রিয়তমার নির্ব্বাসন স্বরূপে আত্মোৎসর্গ করেন, সেই মহাযজ্ঞের গুরুত্ব দেখাইবার জন্যই ভবভূতি রামসীতার উক্ত প্রেমশয্যা রচনা করেন। সকল প্রেমানন্দ এবং বাসরানন্দের চূড়ান্তেই দুর্ম্মুখের বজ্রপাত হইয়াছে—"কিমস্যা ন প্রেয়ো যদি পুনরসহ্যো ন বিরহঃ?"—"দেব, উপস্থিতঃ"। এস্থলে কবি-প্রতিভা একটা প্রসহ্যসমুৎপাত (Anticlimax) ঘটনা করিয়া আপনার বৈজয়ন্তী পতাকাই উড্ডীন করিয়াছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে

এইরূপ পতাকার দৃষ্টান্ত স্বল্পই আছে! সেইরূপ, মহাভারতে দ্রৌপদীকে সর্ব্বজন-সমক্ষে উলঙ্গ করিবার চেষ্টা করিয়াও ব্যাসকবি কেন যে অশ্রদ্ধার পাত্র হন না তাহারও বিচার করিতে হয়। ব্যাস কুরুবংশের প্রতি সামাজিকের বিদ্বেষ উদ্রেক করার উদ্দেশ্যেই ত উক্ত অভাবনীয় ঘটনার অবতারণা করিয়াছিলেন এবং অতুলনীয় ভাবেই সে উদ্দেশ্য সমাধা করিয়াছেন! সুন্দরী সভাসমক্ষে বিবসনা হইতেছেন! কিন্তু কবির প্রয়োগকৌশলে তাঁহার প্রকাশোন্মুখ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে সামাজিকবর্গের মোটেই দৃষ্টি নাই। এ'দৃশ্যে কামোদ্রেক করা দূরে থাকুক বরং ঘনগম্ভীর জুগুপ্সায়, মস্তকের অবনতিকারী ধিক্কারভাবে এবং বাক্যাতীত বিদ্বেষেই ত পাঠকের মন উত্তরোত্তর পরিপূর্ণ হইতে থাকে! এ সমস্তের সমক্ষে গঁতিয়ে প্রভৃতির চিত্র কেবল প্রাকৃতবাদী কামকলাব্যতীত আর কিছুই নহে। ফলতঃ, বলিতে হয় যে, শিল্পী যখনই কোন পাপদৃশ্য বা পাপচিত্রকে কাব্যে অবলম্বন করিবেন তখন তাঁহার মর্ম্মে থাকিবে Irony অথবা Hatred; ভাবে, ভঙ্গীতে অথবা সমাধানে পাপের প্রতি কবির মর্ম্মগত ঘৃণা কিংবা জুগুপ্সা পাঠকের হৃদ্‌বোধ না হইলে তিনি পাপের সমর্থক বলিয়াই প্রতীত হইতে থাকিবেন। কথিত নবেল-গুলির চালচরিত্রে গঁতিয়ে, ফ্লোবেয়ার, আনাতোল ফ্রান্সে, জুদারম্যান কিংবা রবীন্দ্রনাথের কোন প্রকার ঘৃণা অথবা জুগুপ্সা পাঠকের অনুভবসিদ্ধ হওয়া দূরের কথা বরং প্রতি পদেই মনে হইতে থাকে যে, তাঁহারা পরম সহানুভূতি এবং পরিতুষ্টি সহকারে অপিচ অপরূপ 'সৌন্দর্য্য'সৃষ্টির শ্লাঘানন্দেই ঐ সমস্ত গুপ্ত পাপ-চিত্র অঙ্কিত করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহাদিগকে গুপ্ত পাপামোদের ইয়ার বলিয়া প্রীতি হয়ত জন্মিতে পারে, কিন্তু শ্রদ্ধা কদাপি জন্মিবে না। দেখিতে হয়, Ghosts নাটকে ব্যভিচার অবলম্বন করিলেও ironyর সঙ্গে সঙ্গে tragic পরিণামের সমন্বয় করিয়াই ইবসেন সে বিপত্তি এড়াইতেছেন।

অথচ এই কামকলা কি প্রকৃত সত্যবাদ? ঘোরতর রোমান্স। মহেন্দ্র-বিনোদিনী কিংবা বিমলা-সন্দীপ এত করিলেও, পরস্পর মাখামাখিতে অসম্ভব ভাবে সাধুতা এবং ভব্যতার সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়া আসিলেও, কবির ইচ্ছা এই যে আমরা তাহাদিগকে অক্ষুণ্ণ-চরিত্র বলিয়াই গ্রহণ করি। এইরূপ প্রচণ্ড রোমান্সের দৃষ্টান্ত এ' যুগের আর একজন ক্ষমতাশালী গল্পলেখক শরচ্চন্দ্রের মধ্যে যথেষ্ট মিলিবে। মানুষ দুশ্চরিত্রের সঙ্গে অতিবড় বিমিশ্র ভাবে অসম্ভব রকমের মাখামাখি করিয়া এবং সহানুভূতিশীল পাঠককে একেবারে আত্মবিস্মৃত করিয়াও নিজেরা, কবির মতলব মতে, সাধু এবং অক্ষতচরিত্রই থাকিয়া যাইবে! এই প্রকারে পাঠককে 'ভোগা' দিয়া, তাহাকে পাপজীবনের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ করিবার গুপ্ত উদ্দেশ্যে কত মৌলিক গবেষণা এবং বাক্যচেষ্টাই আধুনিক সাহিত্যে সর্ব্বত্র আত্ম-প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে! শিল্পের অন্তরাত্মা এবং প্রকৃতি-তত্ত্বের দিক্ হইতে উহারা যে নিদারুণ ভাবেই অব্যবস্থিত এবং অশিবাত্মক, অপিচ মনুষ্য-আত্মার প্রবল কুসঙ্গী তাহাই আমাদিগের হৃদয় ডাকিয়া উঠিতে থাকে। আশার প্রতি ঈর্ষ্যাবশেই বিনোদিনী মহেন্দ্রের দিকে আসক্তি দেখাইয়া তাহাকে ঘরের বাহির করিল; উহার অনুকরণে, 'চরিত্রহীন' গল্পে উপেন্দ্রের প্রতি নিষ্ফল প্রেমের ক্রোধবশেই কিরণময়ী দিবাকর নামক সুরূপ পরপুরুষকে ঐরূপে ঘরের বাহির করিয়া মায় এক শয্যায় শয়ন করিয়াও চলিতে লাগিল! ইহাদের এই অসত্য প্রেমবিলাস এত বড় Insincere এবং অসম্ভব রকমের কপট পদার্থ যে, উহা প্রতি পদেই পাঠকের হৃদয়ে বেদনার শূল বিদ্ধ করিতে থাকে। পাঠকের পশুধর্ম্মকেও প্রবল জড়তাতন্ত্রী উত্তেজনায় নিদারুণ ভাবে উদ্বেজিত করিতে থাকে। অথচ পাঠকের মধ্যে উপস্থিত মতে দেহের তীব্র কামক্ষুধা উদ্রেক করিয়াও এবং এতদিকে আপনাদের এতসমস্ত প্রবল কুপ্রবৃত্তির পরিচয় দিয়াও উহাদের

৮৭। রিয়ালিষ্ট্ শিল্পিগণের মধ্যে রোমান্টিক্ ধাতুর কামকলা।

ওই 'ঈর্ষ্যা' এবং 'ক্রোধ' নামক দুইটি পদার্থ কি করিয়া আপনাদের দেহধাতুর উচ্ছ্রিত কামনা এবং উত্তেজিত কামক্ষুধার সমক্ষে বিজয়ী থাকিবে? ঐ দু'টি ঈর্ষ্যা ও অসূয়াপরবশ নারী, সুতরাং দুর্ব্বলচিত্তা রমণী কোন্ দৈবগুণে স্বয়ং এত অধ্যাত্মশক্তিশালিনী এবং জিতেন্দ্রিয়া হইলেন? ইহাদের অধ্যাত্মশক্তি কি করিয়া এত অলৌকিকভাবে বলবতী হইল যে, পাঠককে শিরায় উপশিরায় কামানলে উদ্দীপ্ত করিয়াও তাঁহাদের দেহপিণ্ডটি স্বয়ং আসন্ন ভোগ্যসমক্ষে পাষাণের মতই শীতল থাকিবে এবং তাঁহাদিগকে ভদ্রসমাজের সংসর্গ ও ব্যবহারোপযোগী 'সাধু' রাখিয়া যাইবে? সাহিত্যের ক্ষেত্রে Realism এর নামে ইহাপেক্ষা ঘোরতর রোমান্স্ এবং মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে এতবড় একটা আত্মমতলবী চাল এবং অসম্ভব অজুহাত কোন স্কট্ কিম্বা ডুমা গলাধঃ করাইতে পারিয়াছেন কি? ইতিপূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, আধুনিকের রিয়ালিজম্ ও মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ প্রভৃতিও অনেকস্থলে অসম্ভব ধরণের রোমান্স্ চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই হইতেছে না। কেবল যৌনভাবের বিশ্লেষণ-আনন্দেই যেমন উহার ঐকান্তিক ঝোঁক, যৌন আনন্দ ব্যতীত যেমন এই 'মনস্তাত্ত্বিক'গণের কিছুতেই মন বসে না; তেমন, উপস্থিত মতে এক একটা মতলবীচালের অজুহাত উপন্যস্ত করিয়া তাঁহারা অনেক অভাবনীয় রোমান্টিক্ 'কারসাজি'কেই কথাশিল্পের ক্ষেত্রে রিয়ালিষ্টিক্ বলিয়া চালাইয়া দিতেছেন। ফলে, Realism, Naturalism প্রভৃতি নাম সাহায্যে সেই প্রাচীন রোমান্স্‌টাই আধুনিক কালে আসিয়া বহুরূপী খেলা আরম্ভ করিয়াছে।

যদি কোন অধ্যাত্মবাদী শিল্প কিংবা কাব্যের মধ্যে অতর্কিতে ইন্দ্রিয়-পরতা প্রবল হইয়া পড়ে, মনুষ্যের ব্যাঘ্রধর্ম্মী ইন্দ্রিয়ক্ষুধা কিরূপে সংসর্গ-গতিকে পাষাণকেও ক্ষুধিত করিয়া তুলিতে পারে সেই ইন্দ্রিয়তন্ত্রতার পরম লোভনীয় একটা শিল্পছবি অঙ্কিত করিয়া কবি উপসংহারে প্রাণপণে মনুষ্যকে 'তফাৎ যাও—তফাৎ যাও' বলিয়া চেঁচাইতে থাকিলেও,

৮৮। সাহিত্যের প্রকৃতি-জ্ঞানে সূক্ষ্ম অন্তর্বিবেকের কার্য্য।

যদি উত্তেজিত পাঠকের হৃদয় মদভাণ্ডের চারিদিকে লুব্ধ ভৃঙ্গের মতই ঘুরিতে থাকে, তবে উহার কারণ অনুসন্ধান করা পাঠকের গভীর অন্তর্দৃষ্টির অপেক্ষা করিবে। চিত্রাঙ্গদা কাব্যের যৌবন-সুলভ লালসা-বিলাসের পরিণামে সন্ততি-রক্ষার বার্ত্তালাভ করিয়া অর্জ্জুন 'আজ ধন্য আমি' প্রভৃতি আওড়াইতে থাকিলেও, যদি কোন পাঠকের হৃদয় গঙ্গাস্নান করিয়া উঠিল বলিয়া মনে না করে, বিনোদিনী সমস্ত বিলাসজীবন সঙ্কুচিত করিয়া পরিশেষে সন্ন্যাসিনী হইল দেখিয়াও যদি উত্তেজিত পাঠকের হৃদয় কিছুমাত্র তিতিক্ষা অনুভব না করে, তবে তাহার কারণ খুঁজিতে হইলে কবির আদর্শ এবং নির্ব্বাচিত বিষয়বস্তুর প্রবৃত্তি এবং তাঁহার প্রয়োগরীতির অভ্যন্তরেই দৃষ্টি করিতে হইবে। এই দুর্ঘটনার হেতু কি? কি করিয়া, কবির অপ্রতিজ্ঞাত, হয়ত অনিচ্ছিত রসার্থটিই গ্রন্থের চূড়ান্ত 'ফলশ্রুতি'রূপে পাঠকের চিত্তে স্বাধিকার প্রকাশপূর্ব্বক দাঁড়াইয়া গিয়াছে? পাপের প্রতিই পাঠকের সহানুভূতি প্রবল থাকিয়া যাইতেছে? এস্থলেই শিল্পের প্রকৃতিতত্ত্ব ও বিষয়নির্ব্বাচন এবং কবির প্রয়োগবিজ্ঞানের রহস্য। 'মাদামইসেল দি মফীন' শেষ করিয়া ক্ষমতাবান্ ও 'সৌন্দর্য্য'বাদী শিল্পী গঁতিয়ের, বা 'মাদাম বোভারী' শেষ করিয়া ফোব্রেয়ারের প্রতিও যদি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা কিংবা সাধুবাদ না আসে, তবে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ব্যতীত উক্ত ব্যাপারের রহস্য ধরা দিবে না। শিল্পের স্ফুটফলিত রসাত্মা লইয়াই শিল্পের চরম বিচার। হৃদয়কে নির্ম্মল করিয়া শিল্পবিশেষের অন্তরাত্মার স্পর্শ গ্রহণপূর্ব্বক উহার ভালমন্দ সংসর্গে সদ্বুদ্ধি লাভ করা, শিল্পের আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োগের যোগ্যতা এবং ফলবত্তার বিচার করা, উহার শিবাশিব লক্ষণ অভ্রান্তভাবে হৃদয়ঙ্গম করা, এসমস্ত শ্রেষ্ঠ সমালোচকের বা সচেতন পাঠকের চূড়ান্ত সাহিত্যবিবেকের কার্য্য। শিল্পের রসাত্মা বিষয়ে সূক্ষ্ম দৃষ্টি, সম্যক্ দৃষ্টি এবং অনাকুল দর্শনী প্রতিভা ব্যতীত বর্ত্তমানকালের গ্রন্থারণ্যে অপর কিছুতেই আমাদের পথ প্রদর্শন করিতে পারিবে না। এরূপ শিল্পবিবেক ব্যতীত আধুনিক সাহিত্যগ্রন্থের

চূড়ান্ত বিচার বা তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ-কনিষ্ঠ নির্দ্ধারণটাও কদাপি সম্ভবপর হইবে না। কারণ, কবিশক্তিশালী শিল্পীর কৃতিমাত্রেই সত্য কিংবা সৌন্দর্য্যসম্পদের আপাতিক উজ্জ্বলতায় ধাঁধা লাগাইতে পারে; সাধারণে চিরকাল উক্তরূপ ধাঁধাতেই ভ্রান্ত হইতেছে। অনেক বিষাক্ত পদার্থই আপাতরম্য হইয়া ছলনা-ভাস্বর সত্যসৌন্দর্য্যের সম্ভারমাহাত্ম্যে সাধারণের সাহিত্যবিবেককে বিমুগ্ধ করিয়া, শ্রেষ্ঠশ্রেণীর শিল্প বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। টলষ্টয়ের আনা কারনানের সঙ্গে 'মাদাম বোভারী' বা Red Lily প্রভৃতির পাঠফল তুলনা করুন। কামগন্ধী ও যৌনতন্ত্রী সৌন্দর্য্যঘটনা কিংবা উহার মনোমুগ্ধকর বর্ণনা বিষয়ে টলষ্টয়, গঁতিয়ে কিংবা রবীন্দ্রনাথের হয়ত অনেক নিম্নে, কিন্তু তাঁহার সত্যদৃষ্টি এবং শিববুদ্ধিও শক্তিমত্তায় ও বৈচিত্র্যে ব্যাপকতর—তুলনায়উভয়ই গভীরতর। টলষ্টয়ের শিবদৃষ্টি বিশ্বনীতির সত্যচৈতন্যে এত অভ্রান্ত এবং উহার সহায়তাও এত সুস্থির এবং সুসঙ্গতা যে উহা তাঁহাকে কদাপি পরিত্যাগ করে নাই, যেন রসাতলের কিনারা দিয়া চলিতে চলিতে এবং পড়িতে পড়িতেও টলষ্টয়কে রক্ষা করিয়া আসিয়া পরিশেষে, পরম শিবার্থসিদ্ধির লোকেই তাঁহাকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে! অসতর্কভাবে এই টলষ্টয়ের অনুকরণে কামাগুন ও ব্যভিচার নাড়াচাড়া করিতে গিয়া অনেক আধুনিক শিল্পীই ত হাত পোড়াইয়াছেন! আনা কারনীনকে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া উহার প্রতিপাদ্যতত্ত্বে খণ্ডদৃষ্টি এবং ভ্রান্তদৃষ্টি করিয়া অধুনা অনেক গল্পগ্রন্থ রচিত হইতেছে। টলষ্টয় যেস্থলে ব্যভিচারের আদ্যন্তসম্পূর্ণ চিত্রটি অতুলনীয় শিল্পিকৌশলেই উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, Red Lily ও 'চোখের বালি' প্রভৃতি সেস্থলে কেবল প্রথমাংশের 'অর্দ্ধচিত্র'টি মাত্র অঙ্কিত করিয়াই যেন অকস্মাৎ দাঁড়ী টানিয়াছে। দাম্পত্যপ্রেমাদর্শের মধ্যে যে 'সত্য-শিব-সুন্দর' আছেন, তাঁহাকে পদাঘাত করিলে ফলটা কি হয় টলষ্টয় 'ব্যতিরেকী ও অন্বয়ী' উভয়ভাবে উহার অতুলনীয় চিত্রটাই আনা কার্‌নীনে দিয়াছেন; ইয়োরোপের শত শত 'সত্যবাদী' নবেলিষ্ট্ তাহাই ভুলিয়া, কেবল পাপালোচনা ও

Sex Psychology চিন্তার মনানন্দে, খণ্ডদৃষ্টির শতসহস্র গ্রন্থেই সাহিত্য ভরপূর করিতেছেন! ব্যভিচারবর্ণনী কথাশিল্পের রসাত্মামধ্যে সত্য-শিবসুন্দরের সুসিদ্ধ সামঞ্জস্যগুণে এবং গল্পশিল্পীর পরিপূর্ণ কারিকরীর হিসাবে আনা কারনীনের স্থান অত্যুচ্চে; হয়ত আধুনিক ইয়োরোপের কামকলাবিজ্ঞানী এবং বিশ্লেষণ-অভিমানী নবেল-সাহিত্যের সর্ব্বোচ্চে। একেবারে গ্রীক অদৃষ্টবাদীর মতই নিরপেক্ষ ও নির্ভীক অদৃষ্টদর্শন! মানবতন্ত্রে অতিরিক্ত কামাচার এবং ব্যভিচার যে একটা নিদারুণ আত্মঘাতী ব্যাপার—তাহারই পরম সত্যসন্ধ ও নির্ভুল নিয়তিদর্শন।

শিল্পী কালিদাস ও টলষ্টয় উভয়ই ত শিল্পে ভোগতন্ত্র অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু মাঝামাঝি আসিয়াই হাল ছাড়িয়া দেন নাই; কেবল 'অর্দ্ধ সত্যে'র দার্শনিক হইতেও চাহেন নাই। উভয়েই Psychologyর সত্যকে যেমন 'সত্য' ধরিয়াছেন, তেমন Ethics এর সত্যগুলিকেও 'সত্য' মানিয়া লইয়া ভোগতন্ত্রকে উহার অপরিহার্য্য অদৃষ্ট-নিয়তিতে উত্তীর্ণ করিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছেন। আনাকারনীনের শিল্পী টলষ্টয়ের মত এমন শিল্পিসাহস, এমন তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও অকুতোভয়তা এবং সত্যসন্ধ নির্ম্মমতা কোন প্রাকৃতবাদী আধুনিক শিল্পীর নাই। আনাকারনীন্ এ দিকেই আধুনিক কামকলাবিজ্ঞানী উপন্যাস সমূহের রাণী—ম্যাথু আর্ণল্ডের মতে "The mountain peak of European fiction".

আদর্শের মাহাত্ম্য বিচার করিতে বসিলে বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্রেই আর একটি অপরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না। রবীন্দ্রনাথ অথবা শরচ্চন্দ্র অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালিনী না হইয়াও, বরঞ্চ পরবর্ত্তীর স্বত্বে কোন কোন দিকে তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াও কিরূপে মহত্তর শিল্পগ্রন্থ রচনা করিতে পারা যায়, তাহার দৃষ্টান্তস্থল আমাদের দুইজন মহিলা—অনুরূপা ও নিরূপমা দেবী। রবীন্দ্রের বা শরচ্চন্দ্রের পরবর্ত্তী না হইলে ইঁহাদের শিল্পবুদ্ধি হয়ত বঙ্গবাণীর মন্দিরে আসন লাভ করিতে বা দাঁড়াইতেও পারিত না; হয়ত পথ খুঁজিয়াও

পাইত না। কিন্তু, ইঁহারা যে অভ্রান্ত এবং "সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্য" হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহাকে কোনরূপ বহিঃসংসর্গে বিপথগামী করার সম্ভাবনাও হয়ত ছিল না। সংস্কৃতসাহিত্যে একটা উদ্ভট শ্লোকের সিদ্ধান্ত—ক্রমোন্নতি বাদীর সিদ্ধান্ত—"ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ"। এক্ষেত্রে উহার অতুলনীয় সমর্থনাই মিলিতেছে! ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষে এবং অবস্থা ও ঘটনার যুদ্ধবিরোধে ফেলিয়া স্ত্রীপুরুষের মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ করিবার উদ্দেশ্যেই ত রবীন্দ্র প্রভৃতি একদিকে সমাজধর্ম্মবিদ্রোহী সস্ত্রীক পুরুষ অন্যদিকে বিধবা অথবা সধবা স্ত্রীলোকের সংঘটনা করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। উহাতে যেমন ভারতবর্ষের তেমন সকল দেশের উন্নতধর্ম্মী সাহিত্যের শিষ্টাচারই পদদলিত হইতে বাধ্য হইয়াছিল। এ দুইজন মহিলা কিন্তু তদ্রূপ অবস্থা-সংঘটনে কদাপি আকৃষ্ট হন নাই; তাঁহারা শিল্পের রসাত্মায় ভারতীয় 'শিবসুন্দর সত্য'বাদীর বিশেষত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় মহিলা বলিয়া প্রকৃতিতে অপরূপ ধর্ম্মভীরুতা বা শিবনিষ্ঠা ওতপ্রোত থাকাতেই বিষয়নির্ব্বাচনে অথবা সাহিত্যের শিষ্টাচারক্ষেত্রে কোনরূপ প্রচণ্ড বিদ্রোহ, জেদ অথবা অহংতন্ত্রী ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে যাওয়া তাঁহাদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব ছিল। সে অবস্থায় জন্মসিদ্ধ সুতীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি এবং বিশ্লেষণশক্তি সুসঙ্গত হইলে নবেল শিল্পের ক্ষেত্রে কোন্ ফল ফলিত হইতে পারে? আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্যের সত্যবাদ, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ও মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ প্রভৃতির পূরা মাত্রায় মালীক হইয়াও ইঁহারা হৃদয়কে আসুরিক সাহিত্য-আদর্শের দ্বারা নির্জ্জিত হইতে দেন নাই; অন্তরাত্মাই যেন তাঁহাদিগকে সাহিত্যক্ষেত্রে কোনরূপ অভব্য কিংবা শ্রেয়োদ্রোহী বস্তু গ্রহণে আর্টশক্তি প্রকটিত করিতে উৎসাহী করে নাই। ভারতবর্ষের সমাজবক্ষে উপজাত হইয়া, উহার ধর্ম্মগত এবং সাহিত্যিক শিষ্টাচার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, অধিকন্তু অন্তরঙ্গ ভাবে বাঙ্গালী হিন্দুজীবনের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা "দিদি", "শ্যামলী", "মন্ত্রশক্তি", "মহানিশা" প্রভৃতি গ্রন্থরচনায় সাহিত্যে,

অন্ততঃ শিবসুন্দর আদর্শসাধনায় ক্ষেত্রে, সমধিক সাধুবাদের দাবী করিতেছেন।

ফলতঃ এক নৌকাডুবি ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের বিস্তারিত নবেলগুলি—নষ্টনীড়, চোখের বালি, ঘরে বাহিরে—পড়িতে বসিলে প্রতিপদে মনে হইতে থাকে যে, একজন পরম যৌনসৌন্দর্য্যরসিক কথাশিল্পীর, বিশেষতঃ যিনি কোন নীরস বাক্য উচ্চারণ করিতেই জানেন না এমন শিল্পীর রচনামধুই পান করিয়া চলিতেছি! কিন্তু পান করিতেছি প্রকৃত-প্রস্তাবে কোন্ বস্তু? মানুষের একটা কদর্য্যকুৎসিত অধঃপতনের মনোরম বর্ণনা। কেবল তথাকথিত Realism বা Representation of Life ব্যতীত ইহার অপর কোন মহত্তর উদ্দেশ্যও পরিস্ফুট নহে। রীতির দিক্ হইতেই বলিতে হয় উহাদের প্রকৃতি একপ্রকার Ideal Realism—কোন মহৎ ভাবাত্মা বা সত্যশিবাত্মা উহাদের কুৎসাময় বিষয়বস্তুর প্রাবল্যধর্ম্মেই যেন মাথা তুলিতে পারিতেছে না। আবার, বহুর মধ্যে ঐক্যদৃষ্টি ও ব্যাপকদৃষ্টি অপেক্ষা বরং যেন খণ্ডদৃষ্টি এবং সূক্ষ্মানুভূতিতেই রবিকবির শক্তি। জনতাসঙ্কুল বৃহৎ বিষয়কে ঐক্যনিয়ন্ত্রিত করা যেন কবির সাধ্য নহে। রবীন্দ্রের এক একটি ক্ষুদ্র গানের ভাবাত্মার যে মূল্য অনুভব করি, উহাদের মধ্যে তৃতীয়ের বিষয়ে (ধৃতবুদ্ধির দিক্ হইতে হইলেও) ভাবময় বিরাট্ তত্ত্বের যে ধ্বনি আছে, এ সমস্ত দীর্ঘবিস্তারিত নবেল নিজের অভ্যন্তরে তাহা সংসিদ্ধ করিতে পারে নাই। বিষয়-নির্ব্বাচনে ও স্থায়ী ভাবের ধারণায় এমন তালকাণা—ব্রহ্মতাল ও ধ্রুবপদ-কাণা—পদার্থ কবি আর লেখেন নাই। নৌকাডুবির কমলার মধ্যে যেই সত্যপ্রাণতা ও সহজাত ধর্ম্মবোধির পরিচয় পাই তাহাও আর যেন পুনরাবৃত্ত হইতে পারে নাই। এ সকল গ্রন্থ কেবল শ্রেষ্ঠ কবিধর্ম্মী লেখকের রচনা বলিয়া প্রকাশের লিপিচাতুর্য্যেই মনোমদ হইতেছে। উহাদের উদ্দেশ্য ছিল যেন কেবল Art for Art's Sake আদর্শে ব্যভিচারের 'সত্যদর্শন'। উপসংহারে অবশ্য ধর্ম্মগত অভ্যুন্নতির একটা 'মোচড়' ও

ধর্ম্মবুদ্ধির একটা খোঁচা পাঠককে দান করিতে উঁহারা ভুলে নাই। কিন্তু গ্রন্থের মর্ম্মতলে কুণ্ডলিত বিষয়ের রসোৎসাহ টুকুই প্রবলোত্তম স্থায়িভাবস্বরূপে অচলপ্রতিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কবিধর্ম্মী ভিক্টর হুগোর নবেলগুলির (Les Miserable, Toilers of the Sea, Hunch-back of Notredame, Ninety-three) বৈচিত্র্যময়ী সৌন্দর্য্যপ্রাণতা এবং মহাপ্রাণ ভাবুকতার সহিত উঁহাদের কোনদিকে তুলনা করিতেই মন যেন অগ্রসর হয় না। এ'জাতীয় কিছু রচনা করা হুগোর পক্ষে একেবারে অসম্ভব ছিল বলিয়াই ধারণা হইতে থাকে। কেবল ফরাসী রিয়ালিষ্ট্ রীতির যৌনানন্দী নবেলের প্রকৃতি ও মর্ম্মচরিত্রের স্বাত্মবিস্মৃত অনুসরণ গতিকেই যে একজন পরম Idealist কবির গল্পরচনা মধ্যে এ দুর্ঘটনা আসিয়া গিয়াছে তাহাই সাহিত্যরসিককে নিবিষ্টভাবে বুঝিতে হয়।

আধুনিক সাহিত্যে মানবজীবন ও মনুষ্যত্ব বিষয়ে আর একটি মনোরম দার্শনিক তত্ত্ব মাথা তুলিয়াছে—নারীত্বের দাবী; কাজেকাজে বিপরীত দিক্ হইতেও দাঁড়াইতেছে 'পুরুষত্বের দাবী'! এই অমূল্য কথা দু'টির অর্থবত্তার বহর কত দিকে কত দূরগামী, এ দু'টি কথার মধ্যে কত বিনিদ্ররজনীর মৌলিক চিন্তাশীলতা মাথা ঘামাইতেছে, তাহা আধুনিক সাহিত্যের সহৃদয় মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। মানুষের হাতে এ দু'টি বহুমূল্য কথা তুলিয়া দিবার মৌলিকতার স্বত্বটুকু কোন্ লোকহিতপ্রিয় মনীষীর ভাগ্যে পড়িয়াছে সে খোঁজে কাজ নাই। পোলিটিকেল বা পারিবারিক ক্ষেত্রের Woman's Rightsএর মধ্যে এই 'দাবী' কথাটির দূরান্বিত অর্থ টুকু যে চিন্তিত হয় নাই তাহা নির্ভয়ে বলিতে পারি। ফলতঃ 'নারীত্বের দাবী' ও 'পুরুষত্বের দাবী'র খোরাক যোগাইবার জন্যই যেন সাহিত্যের ক্ষেত্রে Art for Art's sake প্রভৃতি আদর্শের প্রচার। এই কথাটাকে কেবল বৈজ্ঞানিকের বোলচালে 'যৌন নির্ব্বাচন' বলিলেও চলিবে না; উঁহার মধ্যে বার্ণার্ডশ'এর 'Spider Woman'এর বিশিষ্ট দাবীটাই উঁকি দিতেছে। আধুনিক নবেলের

প্রবল ঝোঁক চিন্তা করিলে কি পাই ? আমরা দেখিয়াছি পাঠককে কেবল যৌনসুখ দান ও যৌনভাবের উদ্দীপনাকর ঘটনা ও বর্ণনা উপস্থিত করাই উহাদের প্রধান লক্ষ্য। যৌন উদ্দীপনার বাহিরে যে কোনপ্রকার 'সৌন্দর্য্য'সংঘটনা, শিল্প'রস' বা সাহিত্যিক ভাবুকতা যে হইতে পারে উহা যেন আধুনিক নবেলের ধারণারও অগোচর হইয়া দাঁড়াইয়াছে! উহা হইতে নারী এবং পুরুষের পরস্পর যৌনস্বত্ব বিষয়ে একটা মৌলিক আদর্শই অতিরিক্ত আস্পর্দ্ধায় মাথা তুলিয়াছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষকে কেবল পরস্পরের খাদ্য এবং ভোগ্যরূপেই উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছে এই আদর্শ। কাদম্বরীর দুর্ভাগ্য প্রাচীনকবি বাণভট্টের চন্দ্রাপীড় উক্ত আদর্শ সমক্ষে সভ্যসমাজ হইতে নির্ব্বাসনদণ্ডযোগ্য একটা বেকুবি এবং ভুল করিয়াছিলেন বলিয়াই প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। এই চন্দ্রাপীড় নাকি চিত্রলেখার 'নারীত্বের দাবী' উপেক্ষা করিয়াছিলেন! চন্দ্রাপীড়ের মাতা পুত্রের সমক্ষে পূর্ণযৌবনা সুন্দরী চিত্রলেখাকে লইয়া আসিয়া এই বলিয়া Introduce করিয়া দেন যে, "ইহাকে অদ্য হইতে] নিজের সহোদরা ভগিনী বলিয়াই মনে করিও।" বেকুব চন্দ্রাপীড় ভগ্নীত্বই স্থির ধরিয়া (এবং প্রাচীন ভারতীয় নিয়মে "জন্ম হতে ধর্ম্ম বড়" নীতি সার করিয়া) চিত্রলেখার প্রতি নিজের ধর্ম্মভগ্নীর মতই ব্যবহার করিয়াছিলেন। কবি বাণ মনে করিয়াছিলেন, তিনি ওইরূপে সাহিত্যক্ষেত্রে একটি অতুলনীয়, ভাবপ্রাণ (Idealist) এবং মহোদার সৌভ্রাত্ররসের দৃষ্টান্তই সৃষ্টি করিলেন; স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বিবাহ ব্যতীত Friendship বলিয়া যে একটা সম্বন্ধ ঘটিতে পারে তাহার মহোচ্চ ভাবাদর্শ দেখাইয়া কবিলোকে পরম পূজ্যপদবীর দাবীই তিনি যেন উপস্থিত করিয়াছিলেন। আধুনিক কালের Realistএর দৃষ্টিতে চন্দ্রাপীড়ের ওই ধর্ম্মবুদ্ধি এবং 'ভালমানুষী' চিত্রলেখার প্রতি একটা অস্বাভাবিক বেয়াদবি বলিয়াই স্থির হইয়া গিয়াছে; উহাতেই আধুনিক কালের 'নারীত্বের দাবী' আদর্শের তরফ হইতে বাণভট্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হইয়াছে, "কবি অন্ধ"—

একেবারে বেরসিক! কোন বুদ্ধিমান্ ভদ্রপুরুষ কিংবা নারী কি এমত অবস্থায় একেবারে নিরামিষ ভাবে বসিয়া থাকিতে পারে? বাণভট্টকে ধিক্!

প্রাচীন ভারতেও ঈদৃশ 'নারীত্বের দাবী' যে একেবারে উঠে নাই তাহা বলা যায় না। মহাভারতের উর্ব্বশী দেবী অর্জ্জুনের সমক্ষে পুরাদমে আধুনিকসম্মত 'নারীত্বের দাবী'তেই ত দাঁড়াইয়াছিলেন! একেবারে প্রভুত্বভাবেই দাঁড়াইয়াছিলেন। কোন "মহারাণী রাজরাজেশ্বরী"র সমক্ষে কোন 'সেবকে'র পক্ষে কেবল তাঁহার "মালঞ্চের মালাকর" হইবার মত একটি দূরান্বিত অভিসন্ধিযুক্ত, ভদ্রোচিত প্রার্থনা হয়ত চলিতে পারে। কিন্তু এস্থলে স্বয়ং 'মহারাণী'ই ত সেবককে একেবারে নগদ কর প্রদানের হুকুম করিয়াই দাঁড়াইয়াছিলেন! তবে বুদ্ধিহীন অর্জ্জুনকে, উর্ব্বশীর হুকুম উপেক্ষা করায়, যে কঠোর শাস্তিভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহাও ত মহাভারতের কবি অকুতোলজ্জায় ঢোলপিটি করিয়াছেন। এতদ্দেশের প্রাচীনতাজীর্ণ আদর্শের বীরপুরুষ ফাল্গুনি উর্ব্বশীনাম্নী মহিলার 'নারীত্বের সম্মান' উপেক্ষা করিয়া যে সবিশেষ অপকর্ম্ম করিয়াছিলেন, সে ভাবও মহাভারত হইতে উদ্ধার করা যায় না। সেরূপ, রামায়ণেও মহাত্মপুরুষ রাবণ রম্ভাসুন্দরীর সমক্ষে একেবারে আধুনিকসম্মত 'পুরুষের দাবী' উপস্থিত করিয়াই ত সংরক্তী হইয়াছিলেন! তদ্বিপরীতে রম্ভাও সুপরিস্ফুট ভাষায় নিজের 'নারী স্বাধীনতা' ও দৈনিক নির্ব্বাচন-স্বাতন্ত্র্যের (Freedom of choice) দাবীতে প্রতিবাদিনী হইয়াছিলেন বলিয়াও ত দেখা যায়! এই দাবীযুদ্ধের ফলাফল কৃত্তিবাসী (বৈষ্ণব সহজিয়া কর্ত্তৃক সংশোধিত) উত্তরকাণ্ডের পাঠকগণের সমক্ষে পরম Realistic ও Art for Art's sake ভাবেই উদ্ঘাটিত আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আধুনিক সভ্যসমাজের অনেকানেক মৌলিক গবেষণার পূর্ব্ব প্রতিধ্বনিই ভারতের প্রাচীন রাণীভাণ্ডার রামায়ণ ও মহাভারতে হয়ত মিলিবে। সমস্যা অনেকই উঠিয়াছিল; তবে, উহাদের সমাধান একালের ভদ্রসম্মতভাবে হয়ত ঘটে নাই।

মানুষ যে কেবল রক্তমাংসময় এবং পশুধর্ম্মী একটা দেহপিণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে; আত্মা এবং ধর্ম্ম বলিয়া কতকগুলি কথা যে নিরেট বেকুবের প্রাচীনপন্থী ভাবুকতা ব্যতীত আর কিছুই নহে; ঐ সমস্তকে সভ্য সাহিত্যের রিয়ালিজম কিংবা আইডিয়ালিজমের রস-আদর্শ হইতে যে একেবারে নির্ব্বাসিত করিতে হয়, উহাই 'নারীত্বের দাবী'র মর্ম্ম। কুক্ষণেই রবীন্দ্রনাথ ফরাসীপন্থী মৌলিকতা এবং বার্ণাড্‌শ'পন্থী ভাবুকতার বশে, তাঁহার 'কাব্যের উপেক্ষিতা'য় 'নারীত্বের দাবী' কথাটার চারা গাছটি বঙ্গসাহিত্যে রোপণ করেন; উহাই ডালপালায় বাড়িয়া উঠিয়া ইদানীং এ সাহিত্যে নানাদিকে ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পুরুষমাত্রের প্রতিই নাকি স্ত্রীমাত্রের একটা অকথিত ও স্বীকার্য্য 'নারীত্বের দাবী' আছে —নারী প্রকাশ না করিলেও নাকি উহা আছে! পুরুষের পক্ষে কি শোভন এবং সুবিধাজনক এই নারী তত্ত্ব! এরূপ 'স্ত্রী স্বাধীনতা', 'নারী সম্মান' ও 'নারীত্বের দাবী' ইত্যাদি আধুনিক কথা কাহারা নিঃস্বার্থভাবে আমদানী করিয়াছে ও সাহিত্যে স্ত্রীপুরুষের পরস্পর ভোগতত্ত্বকেই Art for Art আদর্শে প্রচার করিয়া চলিয়াছে তাহা একেবারে ভুলিলে চলিবে না।

Art for Art's sakeএর ছায়ায় আর দুইটি প্রগল্ভ শিল্প-আদর্শও আধুনিক সাহিত্যে মাথা তুলিয়াছে। একালে লেখক ও পাঠক অতর্কিতেই উহাদের বশীভূত হইয়া চলিয়াছেন; অনেকে উহাদিগকে বাজাইয়াও দেখেন না। 'শিব' আদর্শের দিক্ হইতে যখনি কোন আপত্তি উঠে, তখনি শিবদ্রোহী আধুনিক শিল্পী বলিয়া উঠেন "আমি কি করিব? আমি সত্য কথা কহিতেছি" বা "আমি আর্ট্ করিতেছি।" বলিয়া উঠেন, "আমি প্রকৃতের বা সত্যের অনুসরণ করিতেছি; সত্য কথা শুনিতেই তোমার এত আপত্তি কেন?" ফলতঃ এরূপ কথার মধ্যে আধুনিক 'আর্ট্' আদর্শের আর একটা বড় দাবী লুক্কায়িত আছে—ঐ 'সত্য'! উহা হইতেই দু'টি জবরদস্ত কথা—Realism ও Naturalism। সংজ্ঞা গুলিন তলাইয়া

৮৯। Art for Art's sake তত্ত্বেরই ছায়াপুষ্ট দুইটি আদর্শবাদ Realism ও Naturalism.

না বুঝিয়া কোন সাহিত্যসেবকের পক্ষে আধুনিক সাহিত্যে, 'বিশেষতঃ' নবেলনামক সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করাই একটা ভয়াবহ 'পাতক' রূপে নির্দ্দেশ করিতে পারি। তিনি গহন মহারণ্যে অসহায়ভাবে প্রবেশ করিয়াছেন—যেমন হিংস্র শ্বাপদকুল ও সরীসৃপসঙ্কুল এই অরণ্য, তেমন বন্ধুর বর্ত্মে, ভীষণ গুহাগর্ত্তে ও বিল-পল্বল-ডোবায় পরিপূর্ণ অন্ধকার এই মহারণ্য! আদর্শের সুস্থির আলোকবর্ত্তি এবং রক্ষাযষ্টি না লইয়া উহার মধ্যে পায়চারি করাই আত্মহত্যা।

এ দুইটি আদর্শের প্রধান পরিপোষক বলিতে পারি প্রথমটির ফ্লোবেয়ার; দ্বিতীয়টির এমীলি জোলা—উভয়েই ফরাসী। উভয় আদর্শের কর্ম্মভূমিও গদ্য—আধুনিক গদ্য নবেল।

নবেল আধুনিক যুগের লোকায়ত সাহিত্য। সকল দেশে, বলিতে গেলে, উচ্চশ্রেণীর কবিগণই সাহিত্যাকাশের স্থিরনক্ষত্র; তাঁহারাই ন্যূনাধিক ঋণ-হীন, স্বতন্ত্র জ্যোতিঃপ্রভায় এক একটি ভাবজগতের সৌরকেন্দ্র রূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। উচ্চশ্রেণীর কবিগণের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে যে সকল পাঠকের ক্ষমতা নাই, এ সাহিত্য তাহারাই উপভোগ করিতেছে। বলিতে কি, সমগ্র ইংরেজী সাহিত্য ঘাঁটিয়া আসিলেও এমন দ্বাদশটি নবেল হয়ত মিলিবে না, যাহারা শেকস্-পীয়র-মিল্‌টন, শেলী-কীট্‌স্ ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থ বা ব্রাউনীং-টেনীসনের শ্রেষ্ঠ উপার্জ্জন গুলির ভাবসমৃদ্ধির সমকক্ষতায় উঠিয়াছে, অথবা উচ্চশ্রেণীর সত্যদৃষ্টি, সৌন্দর্য্যসৃষ্টি ও রসভাবের চমৎকারকারী অভ্যুন্নতির দিক্ হইতে কিংবা প্রাণবত্তা ও মিতাচার আদর্শের দিক্ হইতে তাঁহাদের প্রতিস্পর্দ্ধী হইতে পারিয়াছে। প্রাণরক্ষণী এবং প্রাণসংঘটনী আবহাওয়ারই পার্থক্য—দার্জ্জিলীংএর সঙ্গে নিম্নবঙ্গের জলাজঙ্গল ভূমির আবহাওয়ার যেমন একটা পার্থক্য! হয়ত গদ্য ও পদ্যরূপ জাতিভেদের মধ্যেই উহার প্রধান রহস্য। আপাত অনুভবে সে পার্থক্যটুকু হয়ত অনেকেরই হৃদ্‌বোধ হইবে না; কিন্তু দু'টি দিন সংসর্গের পর তোমার শরীর মন প্রাণই বলিয়া দিবে—পার্থক্য কোথায়!

উভয় আদর্শের পশ্চাতেই একটা 'সত্য' অজুহাতের খুঁটি আছে। ফ্লোবেয়ার বলিতে চাহিয়াছিলেন—"আমি সত্য কহিতেছি, জীবনের সত্য ভাব ও বস্তু উপস্থিত করিতেছি; অপক্ষপাতে ও নিঃসম্পর্ক ভাবে, নিরপেক্ষ ও নিরাকুলভাবে, অচঞ্চল তটস্থচিত্তে কেবল মনুষ্যজীবনের প্রকৃতবৃত্তান্ত টুকুই পাঠকসমক্ষে উপস্থিত করিতেছি; ব্যক্তিগত 'ভালমন্দ' আদর্শের কোন ঝোঁক আকারে-ইঙ্গিতে গ্রন্থমধ্যে কোনমতে প্রকাশ না করিয়া, নিজকে কোনমতে পাঠকের উপর চড়াও না করিয়া আমি কেবল একটা ইতিবৃত্তশ্রেণীর শিল্পই রচনা করিতেছি।" জোলাও বলিতে চাহিয়াছিলেন—"আমি মানবজীবনের একটি (Science) প্রাকৃত বিজ্ঞান লিখিতেছি। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কি আবার শ্লীল-অশ্লীল আছে? সত্যশিক্ষার খাতিরে সবই করিতে ও সহিতে হয়। আমি গ্রন্থমধ্যে পাত্রপাত্রীর ভালমন্দবিষয়ে সহানুভূতিহীন নিঃসম্পর্ক ভাবে ও নির্ব্বিকারচিত্তে কেবল মনুষ্যজীবনের সত্য ও তথ্যানুসন্ধান এবং নির্ণয় করিতেছি; ফটোগ্রাফ্কারীর মতই জীবন ও সমাজের হুবহু প্রতিকৃতি গ্রহণ করিতেছি; একেবারে রোগ-বৈজ্ঞানিকের রীতিতেই ভূয়োদর্শনে ও পরীক্ষণে এবং অনুবীক্ষণে রোগ নির্ণয় করিতেছি।" বলা বাহুল্য, উভয়ের 'থিওরী'ই মূলে একার্থক এবং একোদ্দিষ্ট ভাবে 'সত্য'কেই লক্ষ্য করিতেছে। সাহিত্যের 'প্রকাশ' ক্ষেত্রে উভয়েরই কেবল একটা 'রীতি'গত বিশেষত্ব ব্যতীত আর কিছুই নহে। উভয় মতবাদ ইয়োরোপক্ষেত্রে দশবৎসরের অধিক প্রভুত্ব করিতে পারে নাই, পরন্তু ফরাসীক্ষেত্রেই সমূলে বিধ্বস্ত হইয়াছে বলিলে সত্যকথাই বলা হয়। তথাপি, অনভিজ্ঞগণের নিকটে উহাদের একটা নেশা আছে এবং নবেলের জীবনচিত্রনের ক্ষেত্রে ঐ 'সত্যবাদ' ও 'বৈজ্ঞানিক রীতি' এবং 'সত্যচরিত্রাঙ্কন' প্রভৃতি কথা এতদ্দেশেও অনেকের মুখে শুনা যায়। শিবের তরফ হইতে আপত্তি উঠিলে এদেশেও অনেক শিল্পীকে অজুহাত দিতে দেখা গিয়াছে—"আমি আর্টের বাধ্য হইয়া লিখিয়াছি।" এরূপ কথা যে একএকটা ফাঁকি ও

ধাঁধা অপিচ আত্মবঞ্চনা বই নহে তাহা ঘনিষ্ঠ দৃষ্টি করিলেই খোলসা হইতে পারে।

জোলা যে তাঁহার নবেলগুলিতে পরিকল্পনা ও ভাবুকতা অপেক্ষা বরং ভূয়োদর্শনের এবং তথ্যনির্ব্বর্ণনের রীতিই সমধিক অনুসরণ করিতেছিলেন, মানবজীবনে একমাত্র (Law of Heredity) 'বংশানুক্রম তত্ত্ব' সপ্রমাণ করিতে গিয়াই যে প্রায় দুই ডজন নবেল লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা সত্য; কিন্তু, নিজের খেয়ালী একটা 'রীতি'কেই সাহিত্যের শাশ্বত আদর্শ রূপে খাড়া করিতে গিয়াই নানা রকম স্বতোবিরোধী এবং হাস্যকর সিদ্ধান্তবার্ত্তার জনক হইয়াছেন। আনাতোল ফ্রান্সে মিষ্টহাস্যে লিখিয়াছেন, "কিছুকাল ফরাসী সাহিত্যে জোলার এবং তাঁহার 'বৈজ্ঞানিক আর্ট্' আদর্শের রাজত্ব ছিল। এ রাজত্বের যে কদাপি অকস্মাৎ একটা অবসান ঘটিবে তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই। "Naturalism or Death" এ কথা যেন সকল শিল্প-আদর্শের শিরোনামা রূপেই জাজ্বল্যমান ছিল। এমন সময় হঠাৎ থার্মিডরের ৯ই তারিখ একটা অভাবিত ঘটনা! জোলার পাঁচজন সাহিত্যশিষ্য ইস্তাহার ঘোষণায় ঐ 'বৈজ্ঞানিক আর্ট্' আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া বসিলেন! "The ninth Thermidor which overthrew the of tyranny of M. Zola was the work of the five; they published their manifesto and Zola fell to the ground struck down by those who had obeyed him the day before."

প্রথম দৃষ্টিতেই দেখিতে পারি যে এই 'সত্যবাদী আর্ট্' ও 'বৈজ্ঞানিক আর্ট্' প্রভৃতি কাল্পনিক কথা; উভয়েই সাহিত্যশিল্পের মূল আদর্শটাকে পদদলিত করিতেছে। সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য হইল পাঠকচিত্তে ভাবের (emotionalised thought) উদ্রেক —অন্য কথায় 'সৌন্দর্য্য'। সুন্দর না হইলে, রসাত্মক ও চমৎকারী না হইলে, অথবা কেবল বিরস বৃত্তান্তস্তূপ ও সত্যতথ্যের সমুচ্চয় মাত্র হইলেই ত

সাহিত্য হইবে না! সাহিত্যশিল্পী তাঁহার রচনা-বিষয়ে কখনও অপক্ষপাতী বা তটস্থ থাকিতে পারেন কি? সাহিত্যের প্রধান শক্তি হইতেছে শিল্পীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক (Personal note) যাহার অন্য নাম Style. ভাবকে স্বয়ং অনুভব করিয়া পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করার নামই 'সাহিত্যচেষ্টা'। শিল্পীর নিজের 'ভাবানুভূতি'ই পাঠক-চিত্তে 'সঞ্চারী' হয়; উহাই রসরূপে পরিব্যক্তি লাভ করে। এ ক্ষেত্রে 'ভাবের ঘরে চুরি' করিবার কোন সামর্থ্যই শিল্পীর নাই। অতএব ভাবোদ্রেকের মতলবেই লেখক জগৎ ও জীবনের বহমান সত্যসমূহের মধ্যে নিজের 'নির্ব্বাচন' চালাইয়া, গ্রহণ ও বর্জ্জন করিয়া, উপস্থিত কোনটার উপর জোর দিয়া, কোনটাকে ছায়ায় ফেলিয়া, সমাহরণ, সমীকরণ ও সমীক্ষন করিয়াই ত সত্যকে উপস্থিত করেন! ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিকের নিরপেক্ষতা ও নিঃসম্পর্কতা কিংবা ঔদাসীন্য সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রে কোথায়? সাহিত্য ব্যক্তিগত ভাব-দৃষ্টির রাজ্য। মহাভাবে আবিষ্ট হইয়া সাহিত্যিক উহার 'প্রমূর্ত্তি' সৃষ্টি করিতে যান, মানবজীবনের চরিত্রচিত্র ভাবের পরিমূর্ত্তনার উপায়-স্বরূপেই 'প্রয়োগ' করেন। তন্মধ্যে বৈজ্ঞানিকের ভূয়োদর্শন বা পরীক্ষণের ক্রিয়াব্যাপার নিতান্তই অমুখ্য, অপিচ 'গৌণ' নহে কি?

সাহিত্যের 'তথ্য' বা বৃত্তান্তকে 'বৈজ্ঞানিক সত্য' স্থির করিয়া কোন পাঠকেই ত ভুল করে না! আর, এই 'তথ্য' কিংবা 'বিজ্ঞান'! বৈজ্ঞা-নিকের 'তথ্য'ও, উপস্থিতমতে, কেবল তাহার 'থিওরী'টুকু প্রচারের উপায় ব্যতীত আর কিছু কি? মানুষ কোন্ 'সত্য'টাই জানে—কতদূর জানে? একটি বালুকাকণার অথবা এক বিন্দু রক্তের সম্পূর্ণ 'সত্য' বিষয়েই মানুষ 'বিজ্ঞান' লাভ করিয়াছে কি? তাহা হইলে ত ঐ সমস্তের সৃষ্টি করিতে পারিত—জগৎতন্ত্রে 'একবিন্দু রক্ত' ও 'একটি বালুকণা' বাড়িয়া যাইত! জীবের মনস্তত্ব দেখিতে ও জীবনচিত্র উপস্থাপিত করিতে মানুষ যায়। কাহারও মনের বা জীবনের সমস্তটা—তাহার সমগ্র 'অদৃষ্ট'—কি মানুষ দেখিতে পারে যে সে বিষয়ে 'সত্য বাদী' বা 'বিজ্ঞানী' হইবে? অপরের

'মনের কথা' দূরে থাকুক, নিজের মনের সকল কথা, আত্মচিত্তের সকল প্রকোষ্ঠ কি জানিতে পারে? কোন মনুষ্যজীবনের বা কোন জাতি-অদৃষ্টের সামান্যতম ভগ্নাংশও কি কোন 'ঐতিহাসিক' বা 'বৈজ্ঞানিক' জানিতে পারিয়াছেন যে তিনি অনাকুল 'সত্যবাদী আর্ট' করিবেন বা 'বৈজ্ঞানিক আর্ট' করিবেন? পাঠক জানে যে, কাব্যের সকল বৃত্তান্ত কেবল কবির আত্মদৃষ্ট সত্যসিদ্ধান্তের বা আত্মানুভূত ভাবের 'প্রমূর্ত্তি' উদ্দেশ্যেই উপস্থাপিত। সমস্তই ত কবির নিজের দৃষ্টিতে—অনেক সময় হয়ত ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ দৃষ্টিতে—নির্ব্বাচিত তথ্যের একটা মতলবী উপস্থাপনা।

১০। কাব্যের সত্য ও ইতিহাস-বিজ্ঞানের সত্য-উপস্থাপনার 'রীতি'ভেদ।

অতএব এরূপ 'উপস্থাপনা' হইতে কোন কবি কিংবা পাঠক কোন একটা বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক 'তথ্য' পাইলাম ভাবিয়া কদাপি ভুল করে না। ফলে, কাব্যের এবং ইতিহাস-বিজ্ঞানের সত্যদর্শনের মধ্যে যে একটা 'ভেদ' আছে, উহাদের সঙ্গে কাব্যের সত্য-উপস্থাপনার মধ্যেও যে একটা প্রবল রীতিভেদ আছে, সাধারণের পক্ষে তাহা জাগ্রত্তাবে হৃদয়ঙ্গম করার অক্ষমতা সূত্রেই 'সত্যবাদ' ও 'বিজ্ঞানবাদ' প্রভৃতি মিথ্যা কথা সাহিত্যমন্দিরে 'পাতা পাইতেছে'। কবি সত্যকে 'দর্শন' করেন, অনেক সময়, তাঁহার 'অন্তঃপ্রজ্ঞা' বা Intuitionএর শক্তিতে, উহা বৈজ্ঞানিকের ভূয়োদর্শন ও পরীক্ষা প্রণালীতে না হইতেও পারে। উহার পর, কবি মনুষ্যের সৌন্দর্য্যবোধ এবং ভাবোদ্দীপনাকেই লক্ষ্য করিয়া, সম্পূর্ণ কাল্পনিক পাত্রপাত্রী এবং উপাদান সাহায্যে উক্ত সত্যকে প্রমূর্ত্তি দান করিতে পারেন। মানুষের জ্ঞান-বৃত্তিকে নহে, ভাববৃত্তিকেই কবি মুখ্যভাবে লক্ষ্য করেন বলিয়া সাহিত্যে সত্যের পদবী সৌন্দর্য্য অপেক্ষা অমুখ্য হইতেই বাধ্য। ইতিহাস ও বিজ্ঞান কবিদৃষ্ট সত্যকে তর্কযুক্তিবিচারে বা ভূয়োদর্শন এবং পরীক্ষা-দ্বারে 'সমর্থন' করিতে পারে; কিন্তু ইতিহাস-বিজ্ঞানের 'প্রকাশরীতি' কাব্যের নহে। "The Poet is Divinely wise"! ইতিহাস-বিজ্ঞানের 'গজ কাঠি' যে জলে একেবারে 'ঠাঁই পায় না', কবির 'Fine Frenzy' বা

'Wildly Wise' দৃষ্টি সে জন্যেই ডুব দিয়া ইতিহাস-বিজ্ঞানের স্বপ্নাতীত সত্যবস্তু তুলিয়া আনিতে পারে, তাই বলিয়া কবি অচিন্ত্য-অনির্ব্বচনীয়ের 'ডুবারী' রূপে পূজা লাভ করেন। Realism ও Naturalism প্রভৃতি বিজ্ঞানের 'কোঠা'য় সত্যকে সপ্রমাণ করার রীতি হইতে পারে; কিন্তু এই রীতি ভাবোদ্রেককেই মুখ্য বলিয়া স্বীকার করিতেছে না; অথচ কার্য্যতঃ তথ্যকেও নিজের মতলবী রীতিতে এবং চালবাজীতেই উপস্থিত করিতেছে। অতএব সাহিত্যিক Realism বা সাহিত্যিক Naturalism বলিলে বুঝিতে হয় যে, প্রকৃতপ্রস্তাবে উহা না-সাহিত্য, না-ইতিহাস, না-বিজ্ঞান।

সাহিত্যে 'সামান্য'কে উদ্দেশ্য করিয়াই বিশেষের উপস্থাপনা। ব্যক্তি-বিশেষের কোন সবিশেষ জ্ঞানকর্ম্মভাবের উপর সাহিত্যরসের ভিত্তি নহে। অরিষ্টোটল সে কালেই ইহা রমনীয় ভাবে সমুজ্জ্বল করিয়াছেন—"Poetry aims at a higher truth than History. Poetry aims at the universal; History at the particular." অপিচ সাহিত্যিক সত্য বা তথ্য কেবল সম্ভাব্যতার উপরেই নির্ভর করে; জগতে বা জীবনে ঐ সমস্ত কেবল 'সম্ভবপর' হইলেই হইল। বিশেষের ব্যাপার ইতিবৃত্তকথা বা Chronicleএর লক্ষ্য। রোমিও-জুলিয়েতের ভাগ্যকথা যদি এমন ভাবে বর্ণিত হয় যে, তন্মধ্যে কেবল ঐ একজোড়া স্ত্রীপুরুষের সবিশেষ জীবনব্যাপারই লক্ষিত থাকে, মানবজীবন বিষয়ে কবি-পরিদৃষ্ট কোন 'সামান্য' ভাবের ধ্বনি কিংবা ব্যঞ্জনা উহাতে না থাকে, তবেই উহা হইল ইতিবৃত্তশ্রেণীর Realism; অথবা কেবল একজোড়া স্ত্রীপুরুষের জীবনবৃত্ত। সাহিত্য এরূপ সবিশেষ জীবনবৃত্ত-দর্শন কোনরূপে ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করে না; বরং সাহিত্য মুখ্যভাবেই চায় জীবনার্থ দর্শন—জীবনের ভাবার্থদর্শন।

কবি যখনই জীবনের কোন সত্যবস্তু বা তথ্যবিশেষ উপস্থিত করেন, তখন পাঠকের দিক্ হইতে বরং একমাত্র প্রশ্ন এরূপে দাঁড়ায় যে, 'তুমি কোন্ 'জীবনার্থ' দর্শন করিয়াছ?' বৃত্তান্তবস্তু Real কিংবা Natural কি না

তাহা লইয়া কোন কথাই নাই। কবি-পরিদৃষ্ট 'জীবনার্থ' লইয়াই সাহিত্যের 'আত্মা'; উহার উপরেই কাব্যরসের ভিত্তি; উহাকেই কাব্যের 'মহাভাব' বলিয়া ইতঃপূর্ব্বে উদ্দেশ করা হইয়াছে।

পরন্তু এস্থলে আমাদিগকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে বুঝিতে হয় যে, 'সত্যবাদ' বলিয়া কোন পদার্থ প্রকৃত প্রস্তাবে শিল্পসাহিত্যে নাই। মানুষ একটা মতলবী জীব; লেখকগণও তাই। সাহিত্যক্ষেত্রে কবিগণ যাহা চিন্তা করেন এবং পাঠকের সমক্ষে সাহিত্যরূপে উপস্থিত করেন, তন্মধ্যে তাঁহাদের নিজের 'সহানুভূতি এবং প্রীতি' বলিয়া একটা মর্ম্মভাব যেমন জড়িত থাকে, তেমন সাহিত্যের প্রকাশব্যাপারেও পাঠকের 'প্রীতি এবং সহানুভূতি লাভ' বলিয়া একটা পদার্থও উদ্দিষ্ট থাকে। এরূপ 'উদ্দেশ্য' এবং 'সহানুভূতি'র সম্পর্কজড়িত 'আকাঙ্ক্ষা' ব্যতিরিক্ত কোন গ্রন্থই রচিত ও প্রকাশিত হইতে পারে না। আবার, কোন ঘটনাবিশেষ বা কোন ভাববিশেষকে গ্রন্থের উপজীব্যরূপে গ্রহণ করার মধ্যেও, লেখকের দিক্ হইতে, একটা অধ্যাত্মকারণ নাই কি? তিনি সম্মুখস্থিত সহস্র বিষয়ের মধ্য হইতে কেবল 'এই বিষয়টা' কেন গ্রহণ করিলেন? তিনি এ বিষয়ে পরের মনস্তত্ত্ব বা পরের আচরণ চিন্তা করিতেছেন কেন? এ ক্ষেত্রে তাঁহার উদ্দেশ্য কি? তিনি মানুষকে কোন্ দিকে বুঝাইতে চা'ন? কেন চা'ন? এরূপ প্রশ্নের একমাত্র 'উত্তর' এই নহে কি, যে তাঁহার নিজের একটা সবিশেষ 'ভাবানুভূতি'ত আছেই; পরন্তু তিনি পাঠকের 'প্রীতি' উৎপাদন করিয়া তাহার সৌন্দর্য্যবুদ্ধিকে আকৃষ্ট করিতে, অপিচ তাহার 'ইচ্ছা'শক্তিকে একটা বিশেষ দিকে পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত করিতেও চাহিতেছেন?

৯১। সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রে 'সত্যবাদী আর্ট', 'বৈজ্ঞানিক আর্ট' ও 'জীবনের নক্শা' প্রভৃতিও দাঁড়াইতে পারে না।

এ দৃষ্টিস্থানে দাঁড়াইলেই বুঝিব যে, গ্রন্থ মাত্রেই, সাহিত্যকর্ম্ম মাত্রেই সূক্ষ্মভাবে স্বয়ং লেখকের Purposeful বা 'মতলবী' না হইয়া পারে না। 'হুবহু সত্যচিত্রণ' বলিয়া কোন পদার্থ সাহিত্যলেখকের Psychologyতে

নাই; তিনি একটা 'পরিচালনা' উদ্দেশ্যে ঐ 'চিত্রাঙ্কন' ব্যাপারে উদ্যুক্ত না হইয়া পারেন না। 'নকল নবীশি' কিংবা Photography হইতেও সাহিত্যচেষ্টার পরম পার্থক্য এইখানে। Imitation of Life অথবা Photography of Life বলিয়া প্রকৃত কোন পদার্থ সাহিত্যে হইতে পারে না; সাহিত্যে জীবনচিত্র মাত্রেই কেবল লেখকের নিজের রুচি-নির্ব্বাচিত এবং নিজের মনোনীত 'জীবনচিত্র'—Ideal Representation। সাহিত্যপাঠের বা উহার বিচারের সময়ে লেখকের এই 'ভাব'গতি ও বস্তু নির্ব্বাচনা এবং পরের সহানুভূতি ও প্রীতি-সাধনা, অপিচ 'পরিচালনা'র গূঢ় উদ্দেশ্যটুকুই আমাদিগকে সচেতনভাবে ধরিয়া লইতে হয়। ইহা বুঝিতে পারিলে সাহিত্যের শিবাদর্শ পরিজ্ঞানে আর কোন ভ্রান্তি ঘটিতে পারে না।

বুঝিতে হয় যে, শিল্পগ্রন্থ মাত্রেই যেমন মনুষ্যের মনোবৃত্তির 'জ্ঞান ও ভাব'অধিকারের একটা 'ক্রিয়া'চেষ্টা, তেমন উহা পাঠকের 'ইচ্ছাবৃত্তি'র ও একটা 'পরিচালন' বা 'বিনয়ন' চেষ্টা; ফলতঃ, সেদিকে একটা 'নৈতিক চেষ্টা'। এই 'তত্ত্ব' বুঝিতে পারিলেই গোঁড়া 'সত্যবাদী আর্ট' অথবা 'সৌন্দর্য্যকর' কিংবা 'জীবন চিত্রকর' আর্টের গুপ্ত উদ্দেশ্য হইতে আপনাকে সতর্ক রাখিতে পারা যায়। লেখক বা শিল্পী মাত্রেই 'পরিচালক'; তিনি স্বয়ং ইচ্ছা না করিলেও, শিল্প-প্রকাশের ফলে (তাঁহার স্বকীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইলেও) তিনি লোকনিয়ামক ও লোকশিক্ষক। সৌন্দর্য্যের সমাধান ব্যতীত 'আর্ট' নাই; অপিচ, আর্টের 'সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি' মাত্রের মধ্যে, রসাত্মক সমাধান মাত্রের মধ্যে (মানুষের মনোবৃত্তির অপরিহার্য্য ধর্ম্মেই) অপরিত্যাজ্যভাবে পাঠকের 'হওয়া-করা-বা পাওয়া'র অভিমুখে একটা-না-একটা ব্যঞ্জনা আছেই আছে। এস্থানে দাঁড়াইলেই বুঝিতে পারা যায় কোন বিলাতী দার্শনিকের সেই কথা—"All art inculcates an oughtness"এর দিক্ হইতে দেখিলেই সকল ভ্রান্তি-কুজ্ঝটিকা চকিতে অপসারিত করিয়া দেদীপ্যমান হয় যে, ললিতকলার 'শিল্পী' মাত্রেই, সাহিত্যের লেখক এবং কবি মাত্রেই যেমন দ্রষ্টা, যেমন স্রষ্টা, তেমনি নিয়ন্তা। তিনি অস্বীকার করিলেই,

তাঁহার কর্ম্মকৃতির 'নিয়ন্তৃত্ব' কিংবা উহার শক্তিমত্তা এবং ক্রিয়াফল অদৃশ্য হয় না। 'সত্যবাদী' বা 'সৌন্দর্য্যবাদী' শিল্পকলা, 'স্বয়ংপ্রয়োজন শিল্প', 'মানবজীবনের প্রতিকৃতি' বা 'নকশার' শিল্প প্রভৃতি এই 'নিয়ন্তৃত্ব'কে ঢাকা দিবার চেষ্টা করিয়াই মিথ্যাচরণ করে, আত্মবঞ্চনা করে এবং বিশ্ববঞ্চনারই চেষ্টা করে।

শিল্পে" এই 'নিয়ন্তৃত্ব' ধর্ম্ম বুঝিলেই দেখা যাইবে যে, শিল্পের ক্ষেত্রে কামালোচনা বা কামজ কোন পাপের চারিত্রচিত্রণের ন্যায় এমনতর কঠিন ব্যাপারও আর নাই। ঈদৃশ শিল্পের পথও "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া"। 'কোটির মধ্যে গুটিক' লেখকেও কামজ পাপ নাড়াচাড়া করিয়া স্বয়ং অক্ষুণ্ণভাবে উত্তীর্ণ হইয়া আসিতে পারেন না। উহার রহস্য কোথায়? পাঠকের 'সহানুভূতি' সিদ্ধি ব্যতীত কোন রচনাই ত 'সত্য'প্রতীতি লাভ করিতে বা আনন্দ দান করিতে পারে না। কাব্যের সৃষ্টিকার্য্যে স্বয়ং কর্ত্তার পক্ষে অপরিহার্য্য যে 'রসানুভূতি', উহা দ্বারাই পাঠকের মনে 'সহানুভূতি' সংক্রামিত বা উদ্রিক্ত হইতে পারে। রসানুভূতি ব্যতীত যেমন শিল্পসৃষ্টি দাঁড়াইতে পারে না, তেমন সহানুভূতির উদ্রেক ব্যতীত পাঠকের পক্ষেও উহা হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে না। অতএব শিল্পে কামজ পাপকেই রসের উপজীব্য করিলে, অতর্কিতে, একরূপ অপরিহার্য্য ভাবেই 'কী' ঘটিয়া যায়?—অতি সহজেই পাঠকের মনে দাঁড়াইয়া যাইতে পারে পাপের প্রতিই 'সহানুভূতি ও প্রীতি'। সমস্যা ও সঙ্কট দেখুন—পাপবর্ণনা চিত্তাকর্ষক না হইলে গ্রন্থের শিল্পত্ব-হানি; আবার চিত্তাকর্ষক হইলেও পাপের প্রতিই সহানুভূতি! এ স্থলেই পাপ-অবলম্বনকারী লেখকের উভয় সঙ্কট। এই সঙ্কটস্থানে যেমন নবেলসাহিত্যের সৌন্দর্য্যানন্দ বা সত্যানন্দ কেবল নিছক কামানন্দ এবং পাপানন্দেই দাঁড়াইয়া যাইতেছে, তেমন জড়বাদিতার এবং ইন্দ্রিয়োপাসনার প্রচার স্বরূপেও পরিণতি লাভ করিতেছে। শিল্পী কিংবা 'সাধু উদ্দেশ্য'শালী কবি এবং লেখকগণও, শিল্পের বিষয়বৈগুণ্যে, হয়ত অনিচ্ছাতেই 'পাপের প্রচারক' হইয়াই চলিয়াছেন।

সাহিত্যশিল্পের দিক্ হইতে নব্য ইয়োরোপের এই Realism ও Naturalismবাদী 'নবেল' নামক সাহিত্য এবং উহার বহুবিঘোষিত 'সত্য' এবং 'সৌন্দর্য্য'বস্তুর মূল্য কতটুকু ? এই নব সাহিত্য অবশ্য নব্য ইয়োরোপীয় সমাজের সম্পত্তি এবং উহারই হৃদয়জাত এবং হৃদয়ঙ্গম পদার্থ। শিল্পকলার ক্ষেত্রে এ সাহিত্যের অপর যাহা মূল্য থাকুক বা না থাকুক, উহা যে নব্য ইয়োরোপের রক্তমাংস হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, নানাদিকে যে উহার অন্তঃপ্রকৃতির ছায়াবহ হইয়াছে, আধুনিক ইয়োরোপের সুখদুঃখের আদর্শ, আকাঙ্ক্ষা এবং অধ্যাত্ম অভাব-অভিযোগের ইতিহাস অনেক দিকে যে ঈদৃশ নবেলের মধ্যেই, হয়ত অতর্কিতে লিখিত হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ইয়োরোপীয় সমাজের আন্তর ও বাহ্য 'প্রকৃতি' টুকুর ইতিহাস-হিসাবে উহার অসামান্য মাহাত্ম্য আছে—সাহিত্যের আদর্শে না হইলেও, অন্ততঃ ইতিহাসের দৃষ্টিসমক্ষে একটা মাহাত্ম্য।

তবে ইয়োরোপের 'নবেল' সাহিত্যের মধ্যে যেমন মনুষ্যত্বের এবং মনুষ্যজীবনের বিরুদ্ধে, তেমন সকল শিল্প-আদর্শের বিরুদ্ধে যে নিদারুণ বিদ্রোহ, অহংমুখ আস্পর্দ্ধা এবং বিদ্বেষ লুক্কায়িত আছে, তাহাই আমাদিগকে বুঝিতে হয়। শিল্পের রসতত্ত্বের এমন ব্যভিচারও কুত্রাপি ঘটে নাই। অথচ শিল্পতত্ত্বের স্বার্থে এই নব আদর্শের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে বলিয়া দাবী করা হয়। বাস্তবিক উহা যেমন মনুষ্যের মনোনীতির, সুতরাং তাহার সাহিত্যনীতির বিদ্রোহী, তেমন বিশ্বনীতিরও বিদ্রোহী। উহার প্রধান অভিমান এবং একেবারে মিথ্যা'দাবী' এই যে, শিল্পী 'সত্য'রূপ দান করিতেছেন, 'ইতিবৃত্ত' আদর্শের সেবা বা 'বিজ্ঞান সেবা'ই করিতেছেন। মনুষ্যের চরিত্রমধ্যে সত্যকার যেই 'পশু' রহিয়াছে তদ্বিষয়ক সত্যগুলি কি আলোচনাযোগ্য নহে ? বিজ্ঞানের সমক্ষে আবার শ্লীল-অশ্লীল কি ? ঈদৃশ ঘোষণা এবং প্রশ্নোক্তি অনেক বালকের মুখেই শুনিয়া আসিতেছি। বলিতে কি, এতদ্দেশের আধুনিক সাহিত্যরসিক যুবকগণের মুখ হইতে ঈদৃশ প্রশ্ন

ব্যাপার আমাদিগকে প্রতিনিয়ত আঘাত করিয়া আসিতেছে। ব্যাপারটি একালের উচ্চশ্রেণীর শিল্পী ও শিল্পরসিকগণের মধ্যেও শিল্পের আদর্শ বিষয়ে একটা বহুবিস্তৃত ভ্রান্ত ধারণাই প্রমাণিত করে। রোগ-বৈজ্ঞানিক যে আদর্শে কদর্য্য কুৎসিত রোগের 'নিদান'ও আলোচনা করেন, অনুবীক্ষণ দিয়া রোগস্থান পরীক্ষা করেন, এমন কি, উহার প্রতিকৃতিও উপস্থিত করেন, এই শিল্পিগণ নাকি সে আদর্শেই মানুষের 'যৌন'ভাব ও ব্যভিচার প্রভৃতির আলোচনা এবং 'বিশ্লেষণ' করিতেছেন! ইহা সত্য হইলে, খুব একটা বড় কথা; এবং সত্য হইলে উহাতে বিবাদীকে একেবারে নির্ব্বাক্ এবং 'মাৎ' করিয়াও দিতে পারে। কিন্তু, ইহা একটা গভীর আত্মবঞ্চনা অপিচ বিশ্ববঞ্চনা নহে কি? যদি 'বিজ্ঞানালোচনা'ই হইবে, তবে তাঁহারা রোগটাকে 'মনোরম' করিয়া, উহাকে মনোমদ এবং চিত্তাকর্ষকরূপে উপস্থিত করিয়াই 'সংক্রামিত' করিতে চাহেন কেন? আর্টের পক্ষে অপরিহার্য্য ঐ 'সুন্দর উপস্থাপনা'র পথে রোগটাকে মধুর, মোলায়েম এবং 'সুন্দর' করিয়া প্রদর্শন পূর্ব্বক উহার প্রতি পাঠকের 'সহানুভূতি' উপার্জ্জন করিতেই চাহেন কেন? ইহা কোন্ ভৈষজ্যবিজ্ঞানের আদর্শ! এ সকল 'সত্যবাদী' ব্যক্তির এস্থলেই পরম অন্ধতা অথবা কপটতা। তাহারা কেবল 'সত্য' দিতে চায় না, সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে 'খুশী' করিতে চায়; খুশী করিয়া মানুষকে 'রোগী' হইবার পথে সুতরাং উৎসাহিত করিতেই চায়। মানুষ যাহাতে খুশী হয়, কার্য্যে তাহাই ত করিতে ভালবাসে! মনুষ্যমনের স্বধর্ম্মবশে মনোরম শিল্পমাত্রেই এরূপে 'ক্রিয়া-যোজক' না হইয়া পারে কি? যাহা ভাবের ক্ষেত্রে আনন্দ দান করে, তাহাই ত প্রবলভাবে কর্ম্মসঙ্কল্পের সহায় হইয়া দাঁড়ায়। 'সুখজনক' শিল্পমাত্রেই 'ক্রিয়াজনক' না হইয়া পারে না।

ফলতঃ, শিল্প-বিচারের ক্ষেত্রে এ সকল মানস্তত্ত্বিকের নিজের 'ঘরের কথাটা'ই মনে থাকে না। মনুষ্যমনে জ্ঞান-ভাব ও কর্ম্মবৃত্তি পরস্পর এমন ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত যে, উহাদিগকে মনের কোন কার্য্যেই

একেবারে পৃথক্ করা যায় না—মনোবিজ্ঞান এ কথা বলিতেছেন'। 'ইহা জ্ঞান' বা 'ইহা সুন্দর বলিয়া বোঝ'ভাবের সঙ্গে সঙ্গে 'অতএব ইহা কর' বা 'অতএব ইহা লাভ কর' ভাবটাও নিত্যসংযুক্ত। মানুষ যাহা সত্য ও সুন্দর বলিয়া বুঝে, কর্ম্মক্ষেত্রে তাহাই লাভ করিতে চাহিবে। এ সত্যটি মানিয়া লইলে আর ধর্ম্মনিরপেক্ষ 'বৈজ্ঞানিক আর্ট্' বা 'ঐতিহাসিক রীতির আর্ট' বলিয়া কোন বস্তু দাঁড়ায় না। সাহিত্যসেবী রসাত্মক বস্তুর উপস্থাপক বলিয়াই জীবের কর্ম্মনিয়ামক। সাহিত্যের প্রকৃতিগত ধর্ম্মাত্মক লক্ষণ, উহার শিবাশিব ধর্ম্মিত্ব এবং দায়িত্ব উহাতেই দাঁড়াইয়া যায়; অপিচ এ দৃষ্টিস্থান হইতে বুঝিতেও বিলম্ব হয় না যে, 'শিব'আদর্শ শিল্পসাহিত্যের স্বধর্ম্মের ক্ষেত্রেও কেন অপরিহার্য্য হইতেছে।

আবার, এ সমস্ত লেখক ত পরের মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া গ্রন্থ রচনা করেন! এক্ষেত্রে পাঠকের দিক্ হইতে একটি কৌতুককর প্রশ্নও উঠিতে পারে।—লেখকের নিজের মনস্তত্ত্ব কি? সর্ব্বাগ্রে, তিনি কেন সৃষ্টির অপর সহস্রবিষয় ছাড়িয়া ঈদৃশ একটা বিষয়ই গ্রহণ করিলেন? উহাতে তাঁহার কেন এত সহানুভূতি এবং আনন্দ হইল যে, আনন্দবশে তিনি 'দিনকে রাত' করিয়া এইরূপ একটি 'সত্যবাদী' গ্রন্থের আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত বুনিয়া যাইতে পারিলেন? তাঁহার এইরূপ 'ইচ্ছা'ই বা কেন হইল? কবিরাজ ব্যক্তিটার নিজের মনস্তত্ত্ব টুকুন কি? ইহা প্রত্যেক পাঠকের (সতর্ক বা অতর্কিত) জিজ্ঞাস্য থাকে, এবং লেখকের কোন প্রত্যুত্তর না পাইলেও প্রত্যেকেই আপন মনে উহার একটা সমাধান করিয়া লয়। এ প্রশ্নের উত্তর প্রত্যেক গ্রন্থ শেষ করিয়া উহার মর্ম্মস্থান হইতেই আমাদের হৃদয় সহজে গ্রহণ করে। বলা বাহুল্য যে, উহা হইতে ঈদৃশ লেখকের প্রতি কোনরূপ শ্রদ্ধা-উদ্রেকের কিছুমাত্র সাহায্য হয় না। লেখকের একটা 'উদ্দেশ্য' যেমন আছে, তেমন একটা ভাবগত পক্ষপাতও যে আছে, ব্যক্ত না থাকিলেও উহা বুঝিতে বুদ্ধিমান্ মাত্রের কিছুমাত্র ক্লেশ হয় না। বিষয়নির্ব্বাচনের ঝোঁক ধরিয়াই ত শিল্পীর অধ্যাত্ম

ব্যক্তিত্বটুকু অনেক সময়ে ধরা যায়। তিনি জগতের অনন্ত বিষয় হইতে, ব্রহ্মাণ্ড-বিষয়োদরীর মহাকুক্ষি হইতে কেবল এই একটা বিশেষজাতীয় বিষয়ই গ্রহণ করেন কেন? উহাতেই বা তাঁহার রসানুভূতি কেন ঘটিল এবং পাঠকের সহানুভূতিও তিনি সেদিকেই জাগাইতে চাহেন কেন? লেখকের নিজের একটা সহানুভূতি, প্রীতি এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নিজের একটা 'মতলবী ঝোঁক' ও ত আছে! গ্রন্থের মর্ম্মমধ্যে সংসার ও সমাজের দিকে লেখকের একটা 'ইহা বোঝ' গোছের ইচ্ছা যেমন আছে, তেমন সঙ্গে সঙ্গে, অপরিহার্য্যভাবে, একটা "অতএব, ইহা কর" গোছের ইচ্ছাও আছে। তিনি কেবল একটা 'ভূতত্ত্ব বিবরণ' বা 'মাধবকরের রোগ-নিদান' লিখিয়াই ত ক্ষান্ত হন নাই, মানুষকে একটা রসানন্দসম্মিত পথ দেখাইতে এবং সে পথে তাহাকে চালাইতেও চাহিয়াছেন। এইরূপে 'পথ' দেখাইবার গুপ্ত উদ্দেশ্যটুকুন 'ফাঁশ' হইয়াছে মনে করিয়াই ত মানুষ ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের স্থলবিশেষের নিন্দা করে। শিল্পসমালোচকের প্রধান কার্য্য গ্রন্থের নাড়ীবিজ্ঞান। অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নাড়ী না পাওয়া গেলেও অনেকসময় গ্রন্থের হৃদয়মর্ম্মে হৃদয় দিয়াই এ নাড়ী ধরিতে হয় এবং প্রকৃতিস্থ পাঠক মাত্রেই হয়ত অতর্কিতে উহাই করিয়া বসে। এ নাড়ীবিজ্ঞান ব্যতীত শিল্পের অন্য সমস্ত বিচারই কাণা। গ্রন্থব্যক্তির বায়ুপিত্তশ্লেষ্মার বিচার ব্যতীত, উহার সত্যশিবসুন্দর রসধাতুর সমতা এবং বিশ্বের 'ঋত'তন্ত্রে উহার যোগসূত্র অথবা প্রস্থানের ধারণা ব্যতীত শিল্পের কোন বিচার প্রকৃত প্রস্তাবে বিড়ম্বনা। আর যাহাই করুক, সুস্থ মনুষ্যের হৃদয় সহজাতভাবেই গ্রন্থব্যক্তির এই নাড়ীতন্ত্রের বিজ্ঞানী হইয়া আছে, এবং শিব আদর্শের ক্ষেত্রে মনুষ্যের সহজজ্ঞানের বিচারও কদাচিৎ ভ্রান্ত হইতে দেখা যাইবে। এ সকল গ্রন্থ যে তাহাদের সৌখ্যরসান্বিত এবং পুলকরোমাঞ্চিত ব্যভিচার পথেই উপায়প্রয়োগে মানুষকে চালাইতে চায়, মুখে 'তফাৎ যাও, তফাৎ যাও' প্রভৃতিরূপ চেঁচাইতে থাকিলেও গুপ্ত অভিপ্রায়ে এবং মর্ম্ম গতিকে সেদিকেই পাঠককে ঈষারা করে, জীবের হৃদয় নিঃসন্দেহে তাহা

ধরিয়া বসে। সমগ্র গ্রন্থটীর ধর্ম্ম ও মনস্তত্ত্ব এই মর্ম্মস্থানে পরিস্ফুট। গ্রন্থমর্ম্মে বৈজ্ঞানিক গবেষণা অথবা ঐতিহাসিক তত্ত্ববাদের কপট অজুহাত যে অব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহা ধরিতেও পাঠকের 'আত্মাপুরুষ' ইতস্ততঃ করে না। পাপানন্দী গ্রন্থ লিখিয়া মনুষ্যের শ্রদ্ধার প্রত্যাশা করা, সম্ভবজনীয় কবি অথবা লেখক হওয়ার দাবী করা! মানুষ এত বেকুব নয়! মানুষের স্নেহেন্দ্রিয় স্নায়ুসৌখ্যে আপাতমুগ্ধ হইয়া আনন্দিত হইতে থাকিলেও তাহার অন্তরাত্মা শান্ত অবস্থায় উহার বিদ্রোহী না হইয়া পারিবে না। কুসঙ্গীর প্রতি অথবা কুপথের ঈষারামন্ত্রীর প্রতি মানুষ কদাপি প্রকৃত শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারে কি?

এস্থলে আর একটি কথা—লেখক ত বাহিরের সত্য প্রকাশ করিতেছেন না, আপনার সত্যই যে প্রকাশ করিতেছেন; প্রত্যেক গ্রন্থ যে লেখকের নিজের একটা সূক্ষ্ম Confession এবং পাঠকও যে উহাই মনে করে; বাহিরের কদর্য্যতা নহে আপন মনের, হয়ত অতর্কিত সহানুভূতির, অধিকারভুক্ত কদর্য্য সম্বিদংশে অন্তর্দৃষ্টি চালাইয়া তিনি যে 'নিজের রহস্য'টাই ফর্‌শা করিতেছেন! এ ক্ষেত্রে সংসারের লোককে বেকুব মনে না করিলেই হয়ত তাঁহার লেখনীর মধ্যে কিঞ্চিৎ সংযম ও সরম-ভরম আসিত। যৌনতত্ত্বিকগণের গ্রন্থ শেষ করিয়া মনে হয় তাঁহারা বলিতে চাহেন যে, মানুষ 'পশু' ব্যতীত আর কিছুই নহে—বুদ্ধিশালী পশু; অতএব পশুভাবে ও পশ্বাচারে অবিচল থাকাই তাহার কর্ত্তব্য। মানুষের এমন Libel, এমন একটা মিথ্যা শেকায়েত! মতলবী দৃষ্টান্তের কুচক্রপথে কু-অবস্থায় ও কুসংসর্গে ফেলিয়া, পাঠকের চোখেও ধূলা দিয়া, মানুষকে কেবল পশু বলিয়া প্রমাণিত করিতে ও পশু-পথেপরিচালিত করিতে এমন নিঃসঙ্কোচ চেষ্টা! মনুষ্যের অন্তরাত্মার উপর এমন অত্যাচার! তদন্ত করিয়া দেখুন—এমন সকল কুগ্রন্থের অধ্যাত্ম প্রভাব কত কত অভাগ্যের জীবনে কেমন ভয়াবহ বিষবৃক্ষ রূপেই দাঁড়াইয়া গিয়াছে! সদ্‌গ্রন্থের সুফল যদি জীবনে ঘটিতে পারে, কুগ্রন্থের কুফল ত আছেই! ফলতঃ কুসঙ্গী—শিল্পগ্রন্থের মত এমন কুসঙ্গী জগতে আর

হইতে পারে না। উহারা কুপথকে কল্পনা-সরস প্রণালীতেই বাৎলাইয়া দেয়; কল্পনাশক্তিহীন ও চিন্তালস ব্যক্তিগণ যে পথ হয়ত সহজে খুঁজিয়াই পাইত না, আবিষ্কারকৌশলে নির্ব্বিঘ্ন ও নিষ্কণ্টক স্বরূপে উহাকেই চেনাইয়া দেয়; উহাকে ভাবুকতার রসান্বিত করিয়া পাঠকের চিত্তে চিরতরে, অক্ষুণ্ণ অক্ষরে মুদ্রিত করিয়া দেয়। কুশিল্পের পরিচালনী শক্তি কত অধিক, আত্মদর্শী পাঠকমাত্রেই উহার সাক্ষ্য দিতে পারেন। কুশিল্পের দুর্বিনীত ভাবুকতার 'সুড়্সুড়ি' অথবা প্রভুতায় পড়িয়া অনেকে প্রথমজীবনে চরিত্রের সবল ভিত্তিমূল এমনভাবে খোয়াইয়া বসে যে জীবনসংগ্রামে তাহাদের সকল পরাজয়ের গুপ্ত হেতু, তাহাদের বক্রমেরুদণ্ডের প্রধান রহস্যস্থান জীবনের প্রবল 'গ্রন্থসঙ্গী'টার দিকে খোঁজ করিলেই যেন পাওয়া যায়। চিন্তাশীল প্রত্যেক পাঠকের অভিজ্ঞতাই বলিয়া দিবে, এক একটী গ্রন্থসঙ্গী তাহার অন্তর্জীবনে, ভাল কিংবা মন্দ দিকে, কেমন অভাবনীয়রূপেই কাজ করিয়াছে।

এ কি হইল! এ যে একেবারে ললিতশিল্পের ক্ষেত্রেই প্রকারান্তরে ধর্ম্মগোঁড়ামী এবং নীতিবিভীষিকাই আসিয়া পড়িল! তবে কি শিল্পীকে ওই 'পচা' নীতিবাদের দ্বারা শৃঙ্খলিত করিতে হইবে? 'কবিপ্রতিভা'কেও নিষ্কণ্টক করা যাইবে না? সাহিত্যের রাজ্যে কি আবার বিষয়-অবিষয় আছে? সকল বিষয়ই কি সাহিত্যের আমলে আসে না? এ সকল প্রশ্নও অনেক বালকের মুখে শোনা যাইবে। 'ধর্ম্ম' এবং 'নীতি' অপেক্ষা এমন ভুকুত এবং বিভীষিকাময় পদার্থও নব্য-সাহিত্যিকের অভিধানে আর একটী নাই। এক্ষেত্রে অনেক বৃদ্ধও 'স্বাধীনতা'র 'ধুয়া'মন্ত্রে এবং গলাবাজীতে মাতিয়া যাইতে পারেন; আপনাকে নিত্যতরুণ ও সবুজ দেখাইবার রঙ্গতালে নাচিতে গিয়া প্রকৃত এবং অপরিহার্য্যকেও ভুলিয়া বসিতে পারেন; কাঁচা হইবার এবং জীবনে পুনঃপুনঃ 'কেঁচে গণ্ডূষ' করিবার মিথ্যাভাবুকতা ও শস্তা

৯২। শিল্পসাহিত্যের আমল মানুষের 'মনুষ্যত্ব' গতিকে—'মানব ধর্ম্ম' এবং 'জগৎ নীতি'র অধৃষ্যতা হেতুতেই— 'সীমাবদ্ধ' হইতেছে।

অহমিকার বশীভূত হইয়া একেবারে সত্যভোলা এবং বিশ্বভোলা হইয়াও নাচানাচি করিতে পারেন। তা' বলিয়া সত্য ত আর পরাজয় মানিবে না! যেমন জড় জগতের, তেমন অন্তর্জগতের এবঞ্চ অধ্যাত্মজগতের সত্যও অপরাজেয় এবং অধৃষ্য। প্রসঙ্গসূত্রে এইমাত্র বলিব যে, তর্কস্থলে স্বর্গমর্ত্ত্য-পাতালে সাহিত্যের অধিকারপক্ষে কোন সীমাবাধা নাই সত্য, কিন্তু ফলে সাহিত্যের সৃষ্টিক্ষেত্র এবং কবির কল্পনাভূমি ও কর্ম্মক্ষেত্র সাহিত্যকর্ত্তা কবির সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা-প্রকৃতি হইতেই ত সীমাবদ্ধ হইতেছে! মানবের সাহিত্য জগৎপ্রকৃতি এবং মানবপ্রকৃতি হইতেই সীমান্বিত হইতেছে। পূর্ব্বে দেখিয়াছি, সৌন্দর্য্যমাত্রেই এবং সত্যমাত্রেই সাহিত্যের বিষয় হইতে পারিতেছে না। প্রথমতঃ মানুষ সামাজিক জীব বলিয়া এবং সাহিত্য-শিল্প 'সামাজিক মনুষ্যের মানসী সৃষ্টি' বলিয়া অথবা মনুষ্যের 'মানসী প্রতিরূপা বাচনী বা চাক্ষুষী সৃষ্টি' বলিয়াই উহার ভূমি নিঃসীম হইতে পারিতেছে না। আবার, কবি স্বয়ং সামাজিক জীব, সমাজের শিবতন্ত্র-সাহায্যে জীবন রক্ষা করেন এবং সমাজে গ্রন্থ চালাইয়া স্থিতিতন্ত্রের সামাজিককেই লক্ষ্য করেন, অধিকন্তু সামাজিকের শুভ, সৌখ্য ও তৃপ্ত্যর্থেই স্বনামে, নিজের স্বত্বস্বার্থের গ্রন্থ প্রকাশ করেন। অতএব তাঁহার শিল্পকার্য্য মানবিক সমাজশাস্ত্রের বহির্ভূত নহে—পরন্তু সমাজদুর্গ হইতেই তাঁহার স্বেচ্ছাচারে প্রধান বাধা। এ'ক্ষেত্রে অহংতন্ত্রী ঔদ্ধত্য বা 'আমার ইচ্ছা'র আমল নাই। তুমি হয়ত বলিবে, কবি সাংপ্রদায়িক সমাজসংস্কারের সাধু উদ্দেশ্যে, সমাজবিশেষের বর্ত্তমান মতি এবং অভিরুচি শাসনার্থেই গ্রন্থ প্রচার করিতেছেন। যদি 'সংস্কার' উদ্দেশ্যেই হইল—তবে তাহা ত শিল্প হইল না! অথবা Art for Art's sake হইল না! অতএব শিল্পের ছদ্মবেশী তোমার ওই সংস্কারশাস্ত্রের পৃষ্ঠে আবার কোন বিশেষ সমাজশাস্ত্রের 'প্রতিক্রিয়া'রূপী কশাঘাত পড়িলে তাহাতে রুষ্ট অথবা দুঃখিত হওয়া কেন? দেখা যাইবে, অনেক 'আর্ট'বাদী কবি সমাজকে শিল্পের অর্থে ও ভাবে স্বয়ং

আক্রমণই করেন, অথচ সমাজ কোনরূপে 'প্রতি আক্রমণ' করিলেই আর্টের নাম করিয়া পরম স্বার্থাভিমানে আপনাকে যেন অযথা উৎপীড়িত এবং নির্য্যাতিত দেখাইয়াই আব্দার করিতে থাকেন ! অতএব, তর্কস্থলে স্বীকার করিলাম "হে কবি তুমি আর্টক্ষেত্রে স্বাধীন এবং তোমার পথ নিষ্কণ্টক" ; কিন্তু, তুমি Art রচনা করিতে পারিলে ত ! তুমি যদি Art এর অছিলায় একটা 'মতলবী বিধিশাস্ত্র' বা 'সংস্কার শাস্ত্র'ই রচনা কর ! তুমি যদি আপনার মনোধর্ম্ম গতিকেই উহা না করিয়া পার না, উহা যদি তোমার পক্ষে একটা (Psychological necessity,) অত্যাজ্য 'মনোধর্ম্ম'ই হয়, তখন এই 'সত্যবাদী আর্ট', 'বৈজ্ঞানিক আর্ট' বা 'আত্মনিষ্ঠ শিল্পকলা'র আদর্শ সাহিত্যক্ষেত্রে একএকটা 'আকাশকুসুম' কথা নহে কি ?

অতএব বুঝিতে চাই যে সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে সত্য এবং শিব-নীতির সামঞ্জস্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করাই হইল Primary law of all Art ; এ'স্থলেই, এক কথায়, 'সাহিত্যের স্বধর্ম্ম' ! সাহিত্যের অনন্যতন্ত্র ও অপরিহার্য্য এই 'স্বধর্ম্ম' বিস্মৃত হইয়া ইয়োরোপে 'কেবল সত্য' অথবা 'কেবল সৌন্দর্য্য'কে আদর্শ খাড়া করিয়া, কত কুমত প্রচারিত হইয়াছে, কত কুমতলবী, মনুষ্যত্বদ্রোহী এবং বিশ্ববিদ্রোহী গ্রন্থ রচিত হইয়াছে এবং হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই ! ইয়োরোপের সমালোচনাক্ষেত্রে কেন্দ্রবিস্মৃত কুবিচার এবং ভ্রান্তবিচারেরও সীমা-পরিসীমা নাই। কাজের কথা বলিতে গেলে, শিল্পের প্রধান মাহাত্ম্যই হইল 'শিব'কে পশ্চাতে রাখা—গুপ্ত রাখা—'আনাকারেনীন' ও শকুন্তলার শিল্পিদ্বয় যেমন করিয়াছেন। সৌন্দর্য্য ব্যতীত কোনরূপ নৈতিক বা শিবতন্ত্রিক উদ্দেশ্য (Purpose) শিল্পের মধ্যে দাঁড়া তুলিলেই শিল্পের প্রাণহানি ঘটে। ইংলণ্ডের একজন উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যদার্শনিক হ্যাজলিট একস্থলে বলিয়াছিলেন—The greatest Art is to conceal Art. কথাটার অর্থ এ'দিকে আর একটু অগ্রসর

৯১। শিল্পের অন্তরাত্মায় শিব থাকিলেও প্রয়োগতঃ উহার গোপনই শ্রেষ্ঠ Art-এর রীতি।

করিয়া দিয়াই বলিতে পারি, 'শ্রেষ্ঠ শিল্পী'র মাহাত্ম্য হইতেছে যেমন নিজের কলাকৌশলের গোপন, তেমন শিল্পের এই শিবতন্ত্রিক অভিসন্ধি টুকুরও গোপন।

সাহিত্যের যে সকল কু-আদর্শ এবং কু-দৃষ্টান্ত আধুনিকতার প্রত্যক্ষ সম্পর্কে দাঁড়াইয়া আমাদের দৃষ্টিতে ধূলিনিক্ষেপ করিতেছে, তাহার বিরুদ্ধেই আমাদিগকে এইরূপে সতর্ক হইতে হয়। তা' না হইলে, সাহিত্য-ক্ষেত্রের কোন শিল্প-ফসলের স্থায়িত্ব অথবা নশ্বরতার প্রশ্নসমস্যা লইয়া ভাবিত হইবার জন্য আমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। সকল কুগ্রন্থ সত্যশুভশঙ্কর মহাকালের ধীরোদাত্ত তাণ্ডবনৃত্যের চরণাঘাতেই চূর্ণনিচূর্ণ হইয়া, একদা অদৃশ্য হইয়া যাইবে; বিশ্বনীতির ধূমাবতীই উহাদিগকে নিড়াইয়া, উড়াইয়া ও নির্দ্দয়ভাবে ঝাঁটাইয়া নর্দ্দামাবাসী করিয়া দিবেন। তবে, বলিতে হয় যে, উহাদের কেহ কেহ পাপকে এমন সুমিষ্ট এবং লোভনীয় আকারে মূর্ত্তি প্রদান করিয়াছে যে, মনুষ্যের পাপী আত্মা ওই সকল কুবন্ধুকে হয়ত নর্দ্দামাতেই গোপনসংসর্গের গুপ্তানন্দে লুকাইয়া এবং বাঁচাইয়া রাখিবে। সাহিত্যে এরূপ একাধিক নর্দ্দামাবাসী এবং দিবালোকভীত কুসঙ্গীই ত অন্ধকারের গুপ্তগর্ত্তে দীর্ঘজীবী হইয়া বাঁচিয়া আছে!

১৪। ব্যাভিচারী আদি-রসের ক্ষেত্রে প্রাচীন সাহিত্যের সংযম।

প্রথম যৌবনে, আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে নব পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা একটা বিষম আদর্শসঙ্কটেই পড়িয়া যাই। ইয়োরোপীয় নবেলের আধুনিক ভাববিস্তার, উহার ঐ সত্যবাদ, উহার একান্ত সৌন্দর্য্যবাদ, উহার দিগ্‌দিগন্তব্যাপী ক্ষেত্র ও প্রসার এবং প্রচুর ফসল দেখিয়া দেশের প্রাচীনগণের প্রতি (সকল দেশের প্রাচীন-গণের প্রতিই) আমাদের মনে একটা অশ্রদ্ধাই বদ্ধমূল হইয়াছিল। তাঁহাদের সাহিত্যিক রসবুদ্ধি, তাঁহাদের ভাববৃত্তির প্রসার, তাঁহাদের সহানুভূতির বিস্তার এত সীমাবদ্ধ এবং পরিমিত ছিল কেন? ইদানীং একশত বৎসরেই ইয়োরোপীয় সাহিত্য যৌনক্ষেত্রে যেরূপ শক্তিপ্রসার

দেখাইল, মানুষের সাহিত্য বিগত দু'হাজার বৎসরেই যেন তাহা পারিয়া উঠে নাই! 'প্রেমের' কথাটাই ধরুন। প্রাচীন সমাজে কি স্ত্রী-পুরুষ ছিল না, ব্যভিচার কিংবা উপপতি-উপপত্নী ছিল না, কবিগণের Sex Instinct এবং Sex Psychologyর বুদ্ধিটুকু একেবারেই ছিল না? তবু তাঁহারা কেন ঐ ক্ষেত্রে সাহিত্যচেষ্টা বিস্তারিত করেন নাই? ইহার কারণ কি? ইহা নিশ্চিত যে প্রাচীন সাহিত্যে দাম্পত্য আমলের বাহিরে বিন্দুমাত্রও কামানন্দ নাই। যে প্রেম বা যে কাম পরিণয়ে পরিণামিত হইবে না, প্রাচীনেরা (সকল দেশের প্রাচীন সাহিত্যিক) যেন জোটবন্দী হইয়াই তাহা পরিত্যাগ করিলেন! প্রেমরসিক, বলিতে গেলে, প্রবল যৌন-ভাব রসিক কালিদাস, দেশধর্ম্ম বর্ণনা করিতে গিয়া, উজ্জয়িনীর কামি-জীবনের কেবল সঙ্কেত মাত্র করিয়া গেলেন—

বারমুখ্যা সহায়াঃ।

বদ্ধারামা বহিরুপবনং কামিনো নির্ব্বিশন্তি॥

এই 'কামী'গুলার জীবনের উপরে ঘনিষ্ঠভাবে আলোকপাত করিতে অথবা 'অণুবীক্ষণ' চালাইতেও গেলেন না কেন? আমাদের বঙ্কিমই বা এমন একটা বেকুবী কেন করিলেন? রোহিণী-গোবিন্দলালের ব্যভিচার-কথা লইয়া আর একটু সূক্ষ্মঘনিষ্ঠ বর্ণনার একটা অধ্যায় জুড়িয়া দিলে, কিছু Sex Psychology করিলে কি অন্যায় ছিল? তিনি উহার প্রতি একেবারে ঘৃণা দেখাইয়াই 'ঢাকা' দিতে গেলেন কেন? উহা হইতে কত জ্ঞান লাভ হইত। বাঙ্গালী পাঠক কতবড় একটা বিজ্ঞান-প্রপত্তি হইতে বঞ্চিত হইল। যেখানেই ব্যভিচারী প্রেম বা কাম আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার ঈষারা মাত্র করিয়াই প্রাচীনগণ 'চাপা' দিতে চাহিতেছেন কেন? তৎকালে 'অশ্লীল' সাহিত্যের বিষয়ে কোনও কড়াক্কড় আইনও ত ছিল না! যে স্থলে কোন শিল্পীর আদিরস-প্রীতি নাছোড়বান্দা হইয়া পড়িয়াছে সেখানে, তাঁহাদের কেহ কেহ বরং ভগবানের সঙ্গেই, কেহ কেহ বা ভগবচ্চরণের ছায়ায় আনিয়াই উহাকে আস্কারা দিতেছেন কেন? বাঙ্গালীর 'বিদ্যাসুন্দর'কে,

তান্ত্রিক আদর্শের 'বিন্দু'সাধনার গ্রন্থরূপে নির্দ্দেশ করা চলে; তথাপি উহাকেও অন্নদাচরণের ছায়ায় জুড়িয়া না দিয়া পারা যায় নাই। সন্ন্যাসী জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' রচনা করিয়াছেন; উহাতেও কামবিলাসকে "যদি হরিস্মরণে সরসং মনো, যদি বিলাসকলাসু কুতূহলং" বলিয়া ভূমিকা পূর্ব্বক গোবিন্দচরণেই নিবেদন করিতে হইয়াছে। ভগবানের সহিত প্রেমানন্দকে, মিলনানন্দকে ভক্ত সাধকগণ 'পরম আদিরস' রূপে ধারণা করেন। যাহারা গোঁড়া কামিনীকাঞ্চন-পরিত্যাগী 'সাধু', শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায় তাঁহাদের কত প্রিয় তাহা ভারতবর্ষের লোক মাত্রেই বুঝিতে পারিবে। বিদেশের অনেক ভক্তও ভাগবত প্রেমানন্দকে, মানবাত্মার চূড়ান্ত রসানন্দরূপে আদিরসের উপমাতেই ধারণা করিতে চাহিয়াছেন। আমাদের মধ্যে যাঁহারা ভগবৎ প্রেমের "ও' রসে রসিক" হইতে পারেন না, তাঁহারা এ'ক্ষেত্রে নিজ নিজ রুচিমতে যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন। কিন্তু, মনে রাখিতে হইবে, এ স্থলেই প্রাচীন সাহিত্যিকের একটা শিষ্টাচার—সর্ব্ববাদিসম্মত শিষ্টাচার। তাঁহারা পরিণয়সম্পর্কের বাহিরে, কোনরূপ সাংসারিক ক্ষেত্রেই ব্যভিচারী প্রেমের বাড়াবাড়ি করিতে চাহেন নাই। উহাকে অন্ততঃ কদর্য্য এবং (Art ক্ষেত্রেই) সকল সাহিত্যরসের সংহারী বলিয়া একটা জাগ্রদ্বুদ্ধি বা অন্তঃসংজ্ঞা না থাকিলে, প্রাচীন সাহিত্যিকগণ 'আদিরস'প্রয়োগে এরূপ ত্যাগবুদ্ধি কখনও দেখাইতে পারিতেন কি ?

মানুষের যৌন দুর্ব্বলতা অথবা মানুষের কোন অধঃপতনের কাহিনী বিবৃত করিতে প্রাচীন শিল্পীগণ কোন সুখোৎসাহ দেখান নাই। যাহাতে প্রমাণিত হয় যে মানুষ মানসিক শক্তিতে ক্ষমতাশালী হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে পশুযোনি হইতে বিভিন্ন নহে, প্রাচীন সাহিত্য কখনও তাদৃশ বিষয়কে 'সাহিত্যের প্রমাণ বিষয়' বলিয়া গ্রহণ করে নাই গ্রীক সাহিত্যে এস্কাইলাস কিংবা সফোক্লিস স্ত্রী-পুরুষের প্রেমকেই ত কোন ট্রাজিডীর উপজীব্য রূপে গ্রহণ করেন নাই। স্ত্রী-পুরুষ দেহের ক্ষুধাবশেই পরস্পর আকৃষ্ট হইবে, জন্তুধর্ম্মের বাধ্য হইয়া কামবৃত্তির তর্পনার্থে আত্মভোলা

হইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত দিবে; অতএব উহা সাহিত্যক্ষেত্রে জীবের কোন মহাধর্ম্ম ও মহাভাবের পরিপোষক কিংবা উদাত্ত ত্যাগ আদর্শের সমর্থক হইতে পারে না—ইহাই যেন ছিল তাঁহাদের অতর্কিত ধারণা। প্রাচীন গ্রীক জাতির নাট্যসাহিত্যে ঈদৃশ 'প্রেম'Motiveএর অভাবটি সাহিত্য-সেবী মাত্রের চিন্তার বিষয়। হোমরের 'ইলীয়াদ' মধ্যে, এরূপ প্রেম বা কামই একটা জাতির অদৃষ্টাকাশে যে সর্ব্ববিনাশী কল্পাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল, তাহার জাজ্বল্যমান প্রমূর্ত্তিই যেন গ্রীক কবিগণকে সে দিকে দৃষ্টি করিতে নিবারিত করিয়াছে! যুরিপাইডিস্ হইতেই উহার ব্যতিক্রম।

ইয়োরোপের মধ্যযুগে দান্তে-পিত্রার্কের মধ্যে ও 'ট্রুবেদর'গণের মধ্যে আসিয়াই 'প্রেম' যেন সাহিত্যে গ্রহণযোগ্য একটা 'ভাব'রূপে পদবী ও দীপ্তি লাভ করিয়াছে। দান্তের হস্তে উহা ত মানুষের পক্ষে অমৃতজীবনের সদরদ্বার রূপেই দাঁড়াইয়াছে! তার পর, আধুনিক যুগে, ইয়োরোপের নব প্রবুদ্ধ জাতিনিবহের মধ্যে, তাহাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার যোগসূত্রে যৌনপ্রেম যে জীবনের একটা 'মহাশক্তি'রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করার যো নাই। এ সকল জাতির আধুনিক সাহিত্যেই 'নবেল' নামক পদার্থটির জন্ম—যাহাতে যৌন-প্রেম অপিচ কামই প্রবলতম 'রস'। উহা হইতেই স্ত্রীপুরুষরূপী বিপরীত যোনির মধ্যে পরস্পর একটা 'টান' বা 'যৌন ক্ষুধা'ই বিপুল সারস্বত ব্যাপারের জননী হইয়াছে; অধুনা সরস্বতীর অপর তাবৎ কালোয়াতী ও কাব্য-কবিতা-নাটককে সাহিত্যের আসরে একরূপ কোনঠেঁসা করিয়াছে বলিলেও চলে। আংগ্লো-সাক্সন ও টিউটন জাতিসমূহের সাহিত্য মধ্যে আসিয়া এই যৌনক্ষুধা যেন একটা 'দেবতা'-রূপেই প্রতিষ্ঠিত! উহার নাম দিতে পারি Deification of Love অথবা Apotheosis of Desire. চক্ষুঃপ্রীতি (Love at first Sight) নামক পদার্থ টাকে (যাহা একদিন পরেই পাত্রান্তরে আসক্ত হইতে পারে ও যাহার বশে, ঐ সকল সমাজের আদমসুমারি মতে, দেশবিশেষে শতকরা নব্বইটি বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইতেই দেখা যায়, সে জিনিষটাকেই) এ সকল

Fiction বা নবেল গ্রন্থ নায়কনায়িকার জীবনের সর্ব্ব-মহেশ্বর দেবতারূপে ঘোষণা ও পূজা করিতেছে। 'এ কি দেখিলাম! কাহাকে দেখিলাম! ইহাকে চাই-ই! ইহাকে না হইলে এ জীবনটী কেবল একটা অর্থহীন কাকলি এবং বালুকঙ্করময় নিষ্ফল মরুস্থলী!' এরূপ একটা ভাবুকতার পরিপোষণ এবং পূজাতেই ইয়োরোপীয় সাহিত্যে দিনদিন শতশত, সহস্রসহস্র মস্তিষ্কপুষ্প নিবেদিত হইতেছে।

ইহা অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, 'প্রেম-দেবতার পূজা' আধুনিক সমাজের একটা অপরিহার্য্য ধর্ম্ম। সমাজের অধিকাংশের ইহা একটা Necessity বলিয়া এবং ঈদৃশ নবেল অধিকাংশের পক্ষে একটা উপাদেয় খাদ্য বলিয়াই তাহার এত 'বাজার পড়তা'। আধুনিকের জীবন অতিরিক্ত মাত্রায় জড়তন্ত্রী ও জড়রসিক হইয়া পড়িয়াছে। উহা আত্মতন্ত্র ও আত্মবশ আনন্দের পথ ভুলিয়া গিয়া বহু পরিমাণে পরতন্ত্র হইয়াছে; জীবনের 'সুখ' বিষয়েও নিদারুণ ভাবে পরাধীন ও পরমুখাপেক্ষী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জীবনের সঙ্গী কিংবা সঙ্গিনী নির্ব্বাচনের উপরেই আধুনিক জীবনের, বিশেষতঃ গৃহস্থজীবনের সুখ-দুঃখ বহুপরিমাণে নির্ভর করে। যৌনতন্ত্রী 'সুখ' ও যৌননির্ব্বাচনের দাবীদাওয়া এবং অভাব-অভিযোগের প্রাবল্য হইতেই এরূপ নবেলের শ্রীবৃদ্ধি। সমাজে সর্ব্বত্র যৌনপারতন্ত্র্য ও সকল দিকেই জীবনের অধ্যাত্মকেন্দ্রবিস্মৃত স্বেচ্ছাচার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের সাহিত্যেও মন্মথদেবতার ভক্তিপূজা অতিরিক্ত হইয়া পড়িতেছে। প্রাচীন সাহিত্যিক যাহা স্বপ্নেও কদাপি ভাবিতে পারেন নাই, স্ত্রী-পুরুষের তাদৃশ গুহ্যগোপনীয় কামকেলি এবং ব্যভিচারের বৃত্তান্ত পর্য্যন্ত এ'সূত্রেই অভিনন্দিত হইয়া চলিয়াছে!

আধুনিক যুগধর্ম্ম বিষয়ে কোনরূপ গবেষণা করা আমাদের আমল নহে। বুঝিতে হইবে এ ক্ষেত্রে প্রাচীন সাহিত্যিকের শিষ্টাচার। উহার বশে এতদ্দেশের ভারতচন্দ্রও বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে একটা 'গান্ধর্ব্ব' গোছের পরিণয় ঘটাইয়াই গোপনীয় বিষয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

তবু বলিতে হইবে, বিদ্যাসুন্দরের স্থলবিশেষ কামবর্ণনার আমলেই অত্যধিক জড়তাধর্ম্মে কুৎসিত হইয়া গেছে। কেন? স্বামি-স্ত্রী সম্বন্ধের আমলও যে উক্ত বর্ণনাকে সমর্থন করিতে পারিতেছে না তাহার কারণ কোথায়? প্রধান কারণ, অবশ্য ভারতচন্দ্রের ভণ্ডতা—Sincerity এবং Seriousness এর অভাব। তিনি ত প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বামিস্ত্রী-সম্বন্ধের কামবিলাসও বর্ণনা করিতে যা'ন নাই! তিনি বর্দ্ধমান-রাজের এবং তাঁহার কন্যার কতকটা কুৎসা বর্ণনা করিয়া পাঠককে আমোদ দান করিতে এবং স্বয়ং একটা পরিতুষ্টি লাভ করিতেই যেন গিয়াছেন। এ ব্যাপারটি তাঁহার রচনার ভাবে এবং চতুরতার ভঙ্গীতে প্রতিপদে প্রকাশ পাইয়েছে! উহাতেই রসের ক্ষেত্রে বিদ্যাসুন্দরের কথিত অংশকে দারুণ ভণ্ডতাগ্রস্ত, কুৎসিত এবং কাহিল করিয়া দিয়াছে।

এস্থলে শিল্পক্ষেত্রের একটা প্রধান তত্ত্বেরই সম্মুখীন হইলাম—এই High Seriousness। ম্যাথু আর্ণল্ড একস্থলে উহার উল্লেখমাত্র করিয়াছেন—উহা তাঁহার গভীর শিল্পিদৃষ্টির পরিচয় দেয়। বুঝিতে হইবে এই High seriousness of Art। কবি যে পাঠককে বঞ্চনা করিতেছেন না, নিজের সত্যপ্রজ্ঞার বাহিরে একটা মায়াজাল রচনা করিয়া পাঠককে ছলনা করিতেছেন না, এই বিশ্বাসবুদ্ধি পাঠকের আদৌ সুস্থির থাকা চাই। উহার অভাবে কবির সকল ভাষাযন্ত্র এবং শিল্পরচনার তন্ত্রমন্ত্র-কৌশল একেবারে নিষ্ফল হইয়া শিল্পীকে কেবল একটা 'ভাঁড়' বলিয়া সপ্রমাণ করে, এবং পাঠককেও ভণ্ডবঞ্চিতের আসনে পরম অন্তর্বেদনায় সচেতন করিয়া তোলে। এরূপ Sincerity ও Seriousness এর অভাব গতিকে সাহিত্যজগতের অনেকানেক কাব্যকবিতা অন্তরাত্মায় খণ্ডিত এবং পণ্ড হইয়া গিয়াছে। আত্মখণ্ডিত Satire এর আদর্শ এবং কপটতা ও বৈহাসিক রীতির গতিকে, 'বিদ্যাসুন্দরের ন্যায়, বায়রণের

৯১। Seriousness বা Sincerity র অভাবে রসের আত্মহত্যা ; বায়রণ ও শেক্‌স্‌পীয়রের দৃষ্টান্ত।

বিখ্যাত কাব্য Don Juanও আপন রসাত্মায় আত্মঘাতী এবং পণ্ড হইয়া গিয়াছে। বায়রণ যেই 'রীতি' অবলম্বনে উক্ত কাব্যের প্রেমদৃশ্যাদি বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে মনে হইতে থাকে যে উহা কেবল একটা Satire! উক্ত কাব্যের উচ্চউচ্ছ্বাসিনী রসসিদ্ধি এরূপে আত্মহত্যা করিয়াছে। রসের আত্মহত্যা! বায়রণের ভাবোদ্দীপনী বর্ণনায় পাঠকের হৃদয় যখনই সমুদ্দীপ্ত হইয়া তন্ময় হইতে গেল, অমনি পরমুহূর্ত্তে দেখা গেল যে, সমস্তই কবির কেবল ভণ্ডামী ও ছলনা— তিনি Serious নহেন; তিনি নায়কের প্রতি আমাদের হাস্য উদ্রেক করিতেই চেষ্টা করিতেছেন! এ দিকেই Don Juan ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের বড় ভাই। শিল্পরসের ক্ষেত্রে ইহা ত একটা নিদারুণ দুর্ঘটনা! কবিকে ভণ্ড বলিয়া পাঠকের ধারণা হইলে, আদিরস নিদারুণ অশ্লীল, অভদ্র ও indecent হইয়াই সকল 'শিব' আদর্শের সংহার করে—নিজেও মরে।

অন্যদিকে, শেক্স্পীয়রের 'এণ্টনী ও ক্লিওপেত্রা' নাটকের প্রেমিক এণ্টনী—আত্মভোলা, বিশ্বভোলা, সর্ব্বস্বদানী এণ্টনী! তাহাকে কাম-বিলাসী অথবা ব্যভিচারবিলাসী যাহাই বল,—প্রেমের ক্ষেত্রে এই Sincerity ও Seriousness গতিকেই এণ্টনী একটা প্রচণ্ডসুন্দর ট্রাজিক চরিত্র রূপে আমাদের অন্তরাত্মার বন্ধুতা লাভ করিয়েছে। কামবিলাসিনী ক্লিওপেত্রাও তাহার সর্ব্বস্বদানী প্রেমনিষ্ঠা গতিকেই আমাদের সহানুভূতি লাভ করিতেছে। শেক্স্পীয়রের শিল্পিহস্ত এ নাটকের যুগলসম্মেলনে যে শক্তি প্রদর্শন করিয়াছে, কবি কোলরীজের সঙ্গে সায় দিয়াই বলিতে পারি যে, উহা "most wonderful and astonishing." যৌন আকর্ষণের মহাশক্তিময়ী, অচিন্ত্য লীলারূপিণী এই ক্লিওপেত্রা! পুরুষের উপর নারীর অপার প্রভুতা, অধিকন্তু অজ্ঞতা ও ভাবুকতায় সম্মিলিত মাহাত্ম্যময়ী এই নারীশক্তি—নিত্যকাল পুরুষের 'কিছু-বোঝা', 'কিছুটা-অবোঝা' এই শক্তি। ক্ষুদ্রতা ও মহত্ত্ব, চঞ্চলতা ও নিষ্ঠা, বিষ এবং অমৃতের তত্ত্বময়ী মহাসুন্দরী ক্লিওপেত্রা—শেক্স্পীয়রের অপরূপ সৃষ্টি! যে

শক্তিতে সৃষ্টির নিত্যরমণী নিত্যকালের পুরুষকে পুষ্পশৃঙ্খলে—তাহার "Strong coil of grace" দ্বারা—বাঁধিয়া রাখিয়াছে, পুরুষ যাহাকে বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না, ছাড়িয়াও ছাড়াইতে পারে না, অথচ যাহা সংসারশক্তি (রুষিয়ার টলষ্টয় বহুস্থানে যাহার সঙ্কেত করিয়াছেন ও সুইডেনের নাট্যকার ষ্ট্রীণ্ডবার্গ্ স্বকীয় জীবনে এবং প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াই যাহাকে বহু নাটকে ধরিতে, বুঝিতে এবং বুঝাইতে চাহিয়াছেন) তাহাই ত শেক্স্পীয়রের ক্লিওপেত্রার মধ্যে অনুপম প্রমূর্ত্তি লাভ করিয়াছে! নিদারুণ ভীরু অথচ অপরিমেয় বলশালিনী,—পদে পদে মৃত্যুভীত অথচ সময় উপস্থিত হইলে যে এই বলিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারে—

"I am fire and air, my other elements
I give to baser life."

সেই ত ক্লিওপেত্রা! শেক্স্পীয়রের যে শক্তি একদিকে হ্যামলেট্ ও ফল্‌ষ্টাপ্ রচনা করিয়াছে, তাহাই ত অন্যদিকে, আপনার অলৌকিক প্রাচুর্য্যলীলায় ক্লিওপেত্রা গড়িয়াছে! নাটকটী শেক্স্পীয়রের ওথেলো কিংবা রোমিও-জুলিয়েতের ন্যায় স্থায়ী ভাবে কারুণ্যকর ট্রাজিডী নহে। কেন? আমাদের অন্তরাত্মাই যেন বুঝিতে পারে যে, উহার কোথাও একটা ছিদ্র আছে; উহা আমাদের নিত্য অমৃতপিপাসী আত্মার সমুৎকৃষ্ট আহার্য্য যেন যোগাইতে পারিতেছে না! এণ্টনী ও ক্লিওপেত্রার মৃত্যুটাই যেন আমরা অন্তরে অন্তরে কামনা করি এবং মৃত্যুতে আমাদের কোন গভীর শোকসহানুভূতিও জাগরিত করে না। উহার কারণ কোথায়? আমাদের অন্তরের 'শিব' আদর্শকে কোথাও খণ্ডিত করিতেছে বলিয়াই যেন এ নাটক শেক্স্পীয়রের শ্রেষ্ঠ ট্রাজিডী চতুষ্টয়ের সমান আসন লাভ করিতে পারিতেছে না! এণ্টনী ও ক্লিওপেত্রার অদৃষ্ট শিবলোকে, স্থায়ী ভাবের কারুণ্যে মানবহৃদয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না— ওথেলো-দেস্‌দিমনার ন্যায় আমাদের হৃদয়কে দুরদৃষ্টের প্রতি দয়ার্দ্র সহানুভূতি অথবা ভীতিময় অনুশোচনার দীর্ঘনিশ্বাসে গভীর এবং স্থির ভাবে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

জীবনের কূটতত্ত্বে আনন্দযোগী কবি হয়ত সচেতন বিচারবুদ্ধির একেবারে অতর্কিতে, কেবল নিজের সহজাত ভাবুকতা ও সত্যপ্রাণতার কৌলীন্যেই কিরূপে কাব্যের অন্তঃপ্রকৃতিতে অনাকুল সত্য ও শিবতত্ত্বে সচেতন এবং সাবধান থাকেন, তাহার দৃষ্টান্ত শেক্স্‌পীয়রের 'রোমিও-জুলিয়েত'। ইংলণ্ডের এলিজাবেথ যুগের কবি শেক্স্‌পীয়র যে সচেতন ভাবে 'একতত্ত্ব'বাদী, কোনরূপ অধ্যাত্মবাদী কিংবা কোনরূপ 'তত্ত্ব'সাধক ছিলেন না, তাহা আর বলিয়া দিতে হয় না। তবু, মনুষ্যজীবনে প্রেমই যে সর্ব্ববলীয়ান্ তত্ত্ব, তিনি যেন উহা মনে প্রাণে অনুভব করিতেন। তিনি যেন বুঝিতেন—God is Heaven ; Heaven is Love. এ কথা রোমিও-জুলিয়েত কাব্যের অন্তরাত্মাই সপ্রমাণ করিবে। বুদ্ধ বুঝিয়াছিলেন—

নহি বেরেণ বেরাণি সম্মন্তীধ কুদাচন।
অবেরেণ হি সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো ॥

বুদ্ধের সময়ে ভারতের দুইটী প্রসিদ্ধ রাজ্যের মধ্যে প্রাণান্তিক বৈরভাব চলিতেছিল ; বহু চেষ্টাতেও বুদ্ধ উহাকে নিরস্ত করিতে পারেন নাই। পরিশেষে 'বৈর'সংঘর্ষেই একটী রাজ্য একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া কালপ্রবাহে চিরতরে বিলীন হইয়া গেল। বুদ্ধের উক্ত শ্লোকোক্তি একটী পরমসত্যের অভিজ্ঞতাই যে বহন করিতেছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হয় না। কিন্তু কবি শেক্স্‌পীয়র নিজের অন্তরাত্মার 'বোধি'শক্তিতেই মনুষ্যজীবনের পরম 'ঋতদর্শী'! কেবল 'অবৈর'তত্ত্ব দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। কেবল Negative বা 'নেতি-নেতি', রীতির তত্ত্বনির্দ্দেশ নহে—প্রেমতত্ত্বের Positive নিষ্ঠাশক্তি ও সামর্থ্যের মহাবার্ত্তাই রোমিও জুলিয়েত। উক্ত কাব্য কেবলমাত্র দুইটী যুবক-যুবতীর 'প্রেমকাহিনী' এবং উহার শোচনীয় পরিণামের একটা 'ইতিবৃত্ত' কথাই যদি হইত, তা হইলে উচ্চসাহিত্য ক্ষেত্রে উহার সবিশেষ কিছু মাহাত্ম্য হয়ত থাকিত না ; উহা হইত কেবল আধুনিকসম্মত Realism বা Naturalismএর একটা দৃষ্টান্ত। কিন্তু শেক্স্‌পীয়র 'হুবহু জীবনচিত্র' দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—দিয়াছেন জীবনার্থের একটা

শাশ্বতসমুজ্জ্বল Message—প্রেমতত্ত্বের ভাবপ্রমূর্ত্ত মহাবার্ত্তা। রোমিও-জুলিয়েতের রসাত্মায় যে তত্ত্ব দাঁড়াইয়াছে, তাহা কেবল প্রেমের 'আত্ম-প্রতিষ্ঠা' নহে—অরিতার উপরে প্রেমের বিজয়দর্পী 'প্রতিশোধ'! অরিতা এবং সর্ব্ববিধ বৈরভাবের বক্ষে প্রেমকর্ত্তৃক আত্মোৎসর্গ করিয়াই বৈজয়ন্তী উত্তোলন! সংসার তন্ত্রে এরূপে প্রেমই বিজয়ী। অপ্রেম ও শত্রুতা অপেক্ষা বৃহত্তর ভুল যে জীবনতন্ত্রে নাই, বিশ্বনীতির বিরুদ্ধে উহা যে মহাবিদ্রোহ, অরিতার অপরিহার্য্য নিয়তিই যে 'আত্মহত্যা' এ কাব্যে শেক্‌স্‌পীয়র সে মহাতত্ত্বকেই ত 'প্রমূর্ত্তি' দান করিয়াছেন! এ কাব্যের অন্তরাত্মায় এক দিকে, আপাতদৃষ্টিতে, একটা মহা Tragedy; অন্যদিকে প্রত্যক্ষ পরাজয়ের অন্তরালেই প্রেমতত্ত্বের গুপ্ত বিজয়গাথা। কবি কিরূপে, আপনার জন্মসিদ্ধ প্রকৃতি-যোগের সামর্থ্যে, শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হইতেও গভীরতর ঘনদৃষ্টির ও দীর্ঘদৃষ্টির গুহায় প্রবেশ করিয়া সত্যের আনন্দরসোজ্জ্বল মহাসৃষ্টি করিতে পারেন, সাহিত্যের 'শিব'তত্ত্ব কিরূপে 'নীতিশাস্ত্র' না হইয়াও মহারসে রসাল হইতে এবং মনুষ্যচিত্তে পরম ক্রিয়াশক্তিশালী হইতে পারে, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই 'রোমিও জুলিয়েত'। শেক্‌স্‌পীয়রের সকল নাটকই ত এরূপে মর্ম্মে মর্ম্মে 'ধর্ম্ম' ও 'শিব'তত্ত্বের অব্যভিচারী অথবা পরিপোষক থাকিয়া, অন্য দিকে পরম সত্যসুন্দর রসনিষ্পত্তি রূপে দাঁড়াইয়াই মনকে মুগ্ধ করিতেছে! উহাদের মধ্যে যেই দার্শনিকতা বা ধর্ম্মবত্তা আছে তাহা কণ্টকহীন, দন্তহীন ও অমায়িক বলিয়াই 'শিল্পত্ব'কে সংহার করে নাই। কালিদাসের মধ্যেও তাই—সকল প্রকৃত কবির মধ্যেও তাই। অবশ্য, ইহা আর বলিয়া দিতে হয় না যে, যদি 'প্রেম'তত্ত্বের Idealism ধরিতে চাও, আমাদের কালিদাস-ভবভূতির প্রেম বা 'ভারতীয় আদর্শ'সিদ্ধ প্রেমের Ideal স্বরূপটী পাশ্চাত্য নবেলের Deified Cupid ত নহেই, পরন্তু এতদ্দেশের প্রেমের প্রকৃত নাম বিশ্বের 'ঋত' প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি, অন্যকথায়, 'ধর্ম্ম'। প্রেম কোন্ অবস্থার উপনীত হইয়া 'ধর্ম্মস্বরূপতা' লাভ করে, জীবন ক্ষেত্রে একটা সর্ব্বস্বদানী সাধনার সিদ্ধিরূপে এবং মহাশক্তি

রূপেই উদ্বর্ত্তিত হইয়া দাঁড়ায়, কুমারসম্ভবের 'হরপার্ব্বতীর পরিণয়' উহারই 'প্রমাণ'। এ দেশের ঋষিযুষ্ট গার্হস্থধর্ম্ম এবং আর্যতন্ত্রের 'বিবাহ'বিধি শিববিবাহের আদর্শকেই সম্মুখে রাখিয়াছে। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্য ভারতীর আদর্শের 'প্রেম' এবং 'পরিণয়' আদর্শকেই রসাত্মক প্রমূর্ত্তি দান করিতে চাহিয়াছে। কামের বিনশন করিয়া বা কামতত্ত্বকে গৌণ করিয়া একটা মনস্বিতা ও চারিত্রতপস্যার সাধনারূপেই পার্ব্বতীর 'প্রেম' যখন 'ধর্ম্ম'স্বরূপতা লাভ করিতে পারিল, তখনই শিবের পার্ব্বতীপরিণয় সম্ভবপর হইল। 'শিবশক্তির মিলন-সাধনা'রূপী এই কাব্য-সিম্বোলটির অর্থবত্তা মনুষ্যের সংসার ও সমাজতন্ত্রে কত গভীর—কত দূরগামী!

ধর্ম্মেনাপি পদং সর্ব্বে কারিতে পার্ব্বতীং প্রতি।
পূর্ব্বাপরাধভীতস্য কামস্যোচ্ছ্বসিতং মনঃ॥

ইহা ত একালের Idealism নহে—ন্যূনাধিক দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বগত ভারতের কালিদাস কবিরই স্পষ্ট কথা! ভারতের 'সতী'গণও এরূপ 'ধর্ম্ম'রূপী প্রেমের আদর্শ বশেই স্বামীর 'সহমৃতা' হইতে পারিতেন—Deified Cupid এর বশবর্ত্তী হইয়া নহে।

এরূপ Seriousness এর অভাব ও রসহত্যার একটী দৃষ্টান্ত আমাদের বঙ্গসাহিত্যেই দারুণ বেদনাদায়ক হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে। জীবন প্রভাতের 'অনন্ত জীবন' ও 'অনন্ত মরণ' হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রৌঢ়জীবনের 'সাজাহান' প্রভৃতি বহু বহু কবিতা আত্মার অমরত্ব ও জন্মান্তর তত্ত্বে বিশ্বাসকেই ভিত্তি করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমরা জানিতাম উহা কবির একটা অন্তঃপ্রজ্ঞা বা 'সংশয়াতীত আত্মপ্রত্যয়'. কস্মিন্‌কালে কবির নিকট হইতে উহার কোন প্রমাণ তলব করিব বলিয়া স্বপ্নেও ভাবি নাই। তিনি সংপ্রতি সাময়িক পত্রের বেয়াড়া কুতূহলী কোন 'প্রতিনিধিকে' নাকি বলিয়া ফেলিয়াছেন—"I never believed in that Fairy Tale." এই স্বীকারোক্তি হইতে, একটী মাত্র কথা হইতে তাঁহার অসংখ্য কবিতা নিজেদের বুকে অকস্মাৎ আত্মহত্যার ছুরী বসাইয়া দিয়াছে! কবি যেন এতকাল কেবল একটা রোমাণ্টিক 'কারদানী' ও 'চালবাজী'তে পাঠকের

রসবোধের অপিচ সত্যপ্রজ্ঞার সমক্ষেও একটা ছলনাজাল বিস্তার করিয়াই বেড়াইয়াছেন; পাঠকের 'সত্যসুন্দর' পিপাসী আত্মাকে কেবল বঞ্চনা করিয়াই আসিয়াছেন!

আমাদের কোন রবিভক্ত বন্ধু বলিতেছেন—"এ স্থলেই কবির একটা দুর্ব্বলতা, একটা আত্মবঞ্চনা, একটা নিদারুণ গোঁড়ামী—Fanaticism. কবি রবীন্দ্রনাথও ধর্ম্ম এবং সমাজ ক্ষেত্রে কোনদিকে কম Fanatic নহেন। তিনি ইয়োরোপীয় সমাজের খ্রীষ্টান সম্প্রদায়বিশেষকে খুসী করিবার জন্য এবং 'হাততালি'র লোভেই নিজের আত্মার উপরেও আত্মজ কবিতাগুলির উপরে এই অত্যাচারটি করিলেন! কবির তপোবনে অনধিকারপ্রবেশী 'প্রতিনিধি'প্রবরকে "অর্দ্ধচন্দ্র দানে নিঃসারিত" করিয়া তাঁহার পক্ষে নিরিবিলিতে বসাটই বরং উচিত ছিল।" কি জানি! তবে, জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিলে কবি একশ্রেণীর 'ইয়োরোপীয় গোঁড়া'র নিকট কিঞ্চিৎ 'হেয়' হইতেন সন্দেহ নাই। এমন 'সমালোচক'ও দেখিতেছি যাঁহারা তাত্ত্বিক ভাবেই প্রশ্ন তুলিয়াছেন—"শেকস্পীয়র প্রেতাত্মায় (ghosts) বিশ্বাস করিতেন কি"? 'হাঁ' বলিলে যেন আর রক্ষা নাই! একেবারে 'দুর্ব্বল মস্তিস্ক' বলিয়াই ডিক্রীনিষ্পত্তি ও শ্রদ্ধার সিংহাসন হইতে চিরকালের জন্য খারিজ! মৃত্যুর পরেও যে মানবাত্মা থাকে, এ কথা অনেক গোঁড়া খ্রীষ্টানও বিশ্বাস করেন। কিন্তু, 'কি ভাবে থাকে?' এ প্রশ্ন তুলিতেই অনেকে নারাজ! এদিকে চিত্তের 'জিজ্ঞাসা'দ্বারটি চিরকালের জন্যই রুদ্ধ থাকিবে! প্রেতাত্মার অস্তিত্ব কেবল 'বিশ্বাসসিদ্ধ' পদার্থও ত নহে! এতদ্দেশের অনেকের নিকট উহা 'আত্ম প্রত্যক্ষ' স্বরূপেই দাঁড়াইয়াছে; জন্মান্তর ও সেরূপেই দাঁড়াইয়াছে—ইয়োরোপ-আমেরিকার অনেক প্রসিদ্ধ 'বৈজ্ঞানিক' পণ্ডিতের সমক্ষেও ত তেমনি দাঁড়াইয়াছে! অতএব এ দিকে, অন্ততঃ সাহিত্য ক্ষেত্রে, কবিগণের আত্মপ্রত্যয়ের 'তপোবন' টুকু 'শুদ্ধান্ত' ও অলঙ্ঘ্য স্বরূপে পরিগণিত হওয়াই বাঞ্ছনীয় নহে কি?

যা হোক, এই Seriousnessএর দিক্ হইতেই দেখা যাইবে, প্রাচীনগণ কেন কামানন্দকে শিল্পক্ষেত্রে গ্রহণ করেন নাই। শিল্পের ক্ষেত্রে যত 'রস'

আছে তন্মধ্যে 'আদি রস' এত স্নায়ুধর্ম্মী এবং স্থূলকর্ম্মী যে নিঃস্বার্থ মানসিক তত্ব ছাড়াইয়া উঠিয়া উহা সহজেই 'জড়তা' লাভ করে এবং কামে পরিণত হইয়া যায়। পাঠকের মনোলোকের আনন্দদাতা না হইয়া, বরং তাহার স্নায়ুমণ্ডলীর একটা উত্তেজনা ঘটাইয়াই 'সৌখ্য' দান করিতে চায়। সাহিত্যে অন্য কোন 'পাপ' এরূপ বেয়াড়া নহে। শেক্‌সপীয়র ঘনিষ্ঠ দৃষ্টিতে 'তৃতীয় রিচার্ড' অথবা আয়াগোর শয়তানী দুরাত্মতা অঙ্কিত করিতে পারিয়াছেন, ম্যাক্‌বেথের দুরাকাঙ্খাপূর্ণ, দানবিক নৃশংসতাও প্রমূর্ত্ত করিয়াছেন। পাঠক প্রতিপদে বিরক্তি ও ঘৃণা অনুভব পূর্ব্বক তাঁহার উদ্দিষ্ট রসে 'রসিক' হইয়াই শেষ পর্য্যন্ত চলিতে পারিয়াছে। কিন্তু প্রেমিক রোমিও-জুলিয়েতের মিলনকে বাসরক্ষেত্রে আর একটু অগ্রসর করিলেই উহা শিল্পরসের সংহারী হইয়া পাঠকের স্নায়ু উত্তেজনা পূর্ব্বক তাহাকে 'কামী' করিয়া তুলিত। এজন্যই যেন শেক্সপীয়র, পরম শিল্পিচৈতন্যে নায়কনায়িকার কামবিলাসের পথে সহজে দাঁড়ী টানিয়াছেন। বাড়াবাড়ি করিলে, 'আদিরস' বিষম বেয়াড়া হইয়া, সোজাসুজি জড়রসিকতায় পরিণত হইয়াই অনর্থ ঘটায়। তাই, জীবনের কেন্দ্রজ্ঞানে অতন্দ্রিত প্রাচীন শিল্পিগণ যেন অতর্কিতেই উহার রাশ টানিতেন। আর, আধুনিক কামকলাশিল্প (sex Psychology) প্রাচীনগণের এই পরিত্যক্ত পদার্থকেই পরম সৌরভ-রসময় সুখাদ্যবোধে পরিবেশন করিতেছে! 'সত্ত্বোদ্রেক' লক্ষ্যের বিপক্ষে এবং 'প্রকাশানন্দ চিন্ময়' রসাদর্শের বিদ্রোহে দাঁড়াইয়া জীবপ্রকৃতির কেবল পশু-অংশটির 'রসবন্ধু' হইতেই চাহিতেছে!

অতএব এক্ষেত্রে অনাবিল ও অনাকুল নেত্রে শিল্প মাত্রকে নিজের ক্ষমতা ও জীবনাদৃষ্টের দুর্লক্ষ্য নিয়তি এবং সীমাটুকুন চিনিয়া লওয়াই ত অপরিহার্য্য! শিল্পসাহিত্যে 'পাপ'মাত্রকে 'বিষয়' রূপে অবলম্বন করা কতবড় কঠিন ব্যাপার তাহা প্রাচীন সাহিত্যিক বুঝিতেন। Seriousness রক্ষা করিতে গেলে উহা পাঠককে পাপানন্দী এবং পাপের সহরঙ্গী

করিয়াই রসের উদ্দীপনাকে কলুষাচ্ছন্ন করিতে পারে ; আবার, শিল্পী পাপের প্রতি পরিব্যক্তভাবে ঘৃণা দেখাইতে গেলেও, উহাই 'ধর্ম্মধ্বজিতা' অথবা 'নীতিবাদ'রূপে কণ্টকিত হইয়া সকল শিল্পত্বের হানি করিতে পারে। এ কারণে প্রাচীনগণ কত সাবধানে পাপচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন! বাল্মীকি ত একেবারে 'রাক্ষস' ঘোষণা পূর্ব্বক রাবণকে যেন মানবজাতির বাহিরে রাখিয়াছেন, বলিলেই হয় ; ফলে, কাব্যের 'প্রতিনায়ক'কে যেন মনুষ্যকোটির বাহিরেই ঠেলিয়া দিয়াছেন! মিল্টন শয়তানকে serious শিল্পাদর্শে অঙ্কিত করিতে গিয়া বং ঈশ্বরদ্রোহের পথপ্রদর্শক হইয়াছেন বলিয়াই ত সাহিত্যরসিকের নিন্দা অর্জ্জন করিয়া গেলেন! শয়তানের প্রতি পরিস্ফুট ঘৃণা না দেখাইবার দরুণ, মিল্টন শয়তানীর প্রতি সহানুভূতির স্ফোটনিষ্পত্তি এবং ফলিত প্রতীতি হইতে পাঠকের চিত্তকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। আমাদের 'পৌরাণিক'গণও ত পাপীকে 'অসুর' 'দানব' ইত্যাদি নাম দিয়া যেন মনুষ্য হইতে বিজাতীয়গুণবিশিষ্ট করিয়াই ছাড়িয়াছেন! উহারা 'শাপভ্রষ্ট ভক্ত' অথবা 'ভক্তির শক্রতাধর্ম্মী অবতার' ইত্যাদি অজুহাত সৃষ্টি করিয়া একটা কিনারা করিতে চাহিয়াছেন ; ইহজন্মের পাপকে পূর্ব্বজন্মের ভ্রষ্টাচার পুণ্যের ফলসূত্রে গ্রথিত করিয়া, জন্মান্তরবাদ সাহায্যে উহার ব্যাখ্যা করিতে এবং মানুষকে কিঞ্চিৎ আশ্বাস দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ সমস্তের গতিকেই ত পুরাণগুলি সাহিত্যের অধিকার হইতে এবং সাহিত্যের সার্ব্বজনীন সহানুভূতির ভূমি হইতে দূরঙ্গত হইতে বাধ্য হইয়াছে! কিন্তু, কংস প্রভৃতি পাপীর চরিত্রকে উক্তরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করার মধ্যে, সাহিত্যক্ষেত্রে, পৌরাণিকগণের অন্তরে যে (Poetic Justice) রসাদর্শ কার্য্য করিয়াছিল তাহাই আমাদিগকে বুঝিতে হয়। গ্রীক কবিগণও পাপকে এবং পাপীর 'পরিণাম'কেও দেবদ্রোহের একট শাস্তি অথচ Fate রূপে উপস্থাপিত করিয়াই ত ট্রাজিডী রচনা করিয়াছেন! সাহিত্যে পাপকে গ্রহণ করিলেই, শিল্পের রসনীতির খাতিরে,

৯৬। শিল্পক্ষেত্রে পাপ-কাহিনী প্রয়োগ করিতে গিয়া পৌরাণিকগণের বৈয়র্থ্য ও বিপত্তি।

যেমন সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের ঘৃণা উদ্রেক করিতে হয়, তেমন জাগতিক 'ঋত' বা বিশ্বনীতির খাতিরেও একটা 'ট্রাজিডী'ই যেন রচনা করিতে হয়। সমাজের ছোট আদালতের ছোট পাপগুলিই কমেডিতে বেশীকম সরাসরি ভাবে বিচারিত হইয়া থাকে; গুরুপাতককে শিল্পের নিগূঢ় Poetic justiceএর 'শিব'বুদ্ধির বাধ্য হইয়াই গুরুতর শাস্তি এবং ট্রাজিডীর আমলে আনয়ন ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। এদিক্ হইতে অপরিহার্য্য হইয়াই, হয়ত, সাহিত্যজগতে ট্রাজিডী ও কমেডীর সৃষ্টি ঘটিয়াছে এবং পাপালোচনার রসনীতি-সঙ্গত শিষ্টপ্রণালীও সমর্থিত এবং অভিনন্দিত হইয়াছে।

কামের ক্ষেত্রে Fateবাদ আনিয়াও ত অনেকে সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই! কাম এত দুর্নীত, দুঃশীল এবং বেয়াড়া যে শিল্পসাহিত্যে কোনমতেই যেন রাশ মানে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকারতঃ একটা 'বিষবৃক্ষ' রচনা করিয়াছেন; গ্রন্থের উপসংহারে পাঠককে বিষবৃক্ষের সংসর্গফল হইতে সতর্ক করিয়া একটা 'অনুরোধ লিপি'ও জুড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু তিনি ত গ্রন্থে কুন্দনন্দিনীর 'বিষবৃক্ষ'কে একরূপ দৈবঘটিত ও অদৃষ্টশক্তির সৃষ্টিরূপেই উপস্থিত করিয়াছিলেন! কি বিষম ভুলই না করিয়াছেন! তিনি কুন্দনন্দিনীকে এমন কোমল-কমনীয়া, এমন সহজেই নমনীয়া এবং আমাদের 'স্নেহ-সহানুভূতির যোগ্য'স্বরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন যে, বিষবৃক্ষগ্রন্থের অস্তিত্বের সাধু কামনা একেবারে ব্যর্থ হইয়াছে, বলিতে হইবে। Responsible বা 'জবাবদায়ী' পাপই প্রকৃতপ্রস্তাবে শিল্পসাহিত্যের 'বিষয়' হইতে পারে। বেচারা কুন্দনন্দিনীকে এত ভালমানুষ এবং অদৃষ্টশক্তির বিরুদ্ধে এত দুর্ব্বল ও ধীরললিত রূপে খাড়া করিয়া এবং উহার সাহায্যেই বিষ-বৃক্ষের 'ট্রাজিডী' রচনা করিয়া, প্রত্যেক পাঠকের অন্তরে বিষবৃক্ষের অঙ্কুরোৎপত্তির সাপক্ষ্যে বঙ্কিম একটা পরম দয়াসহানুভূতি-সমর্থিত 'অজুহাত' সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন বলিলেই ঠিক কথা বলা হয়।

৯৭। শিল্পের ক্ষেত্রে কামেন্দ্রিয়ের 'পাপ'কে উপজীব্য করার সীমা।

প্রত্যেক পাঠকেই ত পাপের সাপক্ষ্যে একটা 'অজাতিতপূর্ব্ব' প্রবল অজুহাত পাইয়াছে ! উহার ফলে বরং বাঙ্গালার ঘরেঘরেই শিল্পীর অনভীষ্ট ওই 'বিষবৃক্ষ' অঙ্কুরিত হইবার সুবিধাপথ পাইয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ কেহ কেহ করিয়াছেন উহাকে একেবারে ভিত্তিহীন বলা যায় না। তবে, এ ব্যাপারটা যেন বঙ্কিমচন্দ্র নিজের সূক্ষ্ম শিল্পীদৃষ্টিতেই পরে পরে স্বয়ং টের পাইয়াছিলেন ; সমাজানভিজ্ঞা ও পবিত্রস্বভাবা কপালকুণ্ডলার জীবনে গ্রীক আদর্শের যেই Fate কথঞ্চিৎ সঙ্গতি লাভ করিয়াছিল, 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে আসিয়া যে তাহা শিল্পের রসনীতির তরফে একেবারে বেমানান হইয়াছে তাহাই যেন বুঝিয়াছিলেন ! তাই যেন শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র পাপক্ষেত্রে এইরূপ 'অদৃষ্ট'বাদ আর মাড়ান নাই ; তাই বঙ্কিমের পরবর্ত্তী 'বিষবৃক্ষ' অর্থাৎ 'কৃষ্ণকান্তের উইল' আর ব্যভিচারী নায়কনায়িকাকে 'অদৃষ্ট'-পরিচালিত করিতে চাহে নাই ! স্বাধীনগতি এবং স্বদায়দায়ী 'পাপী'রূপেই গোবিন্দলালকে খাড়া করিয়া 'প্রায়শ্চিত্ত' করাইয়াছে ; কুলটা-বৃত্তি শৈবলিনীকেও তাহার কু-চিন্তার জন্যই 'প্রায়শ্চিত্ত' করিতে হইয়াছে।

কামের গতি ও নিয়তিকে নিদারুণভাবে 'অদৃষ্ট'পরিচালিত করিয়াও পরম শিল্পিমাহাত্ম্য অর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন, বলিতে পারি, প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের একজন কবি—গ্রীকদেশের শ্রেষ্ঠ নাট্যকবি—সফোক্লিস তিনি ব্যভিচারী 'কামুক' মাত্রকেই যেন 'মাতৃজার' রূপে চিনিয়াছিলেন এবং ওইরূপে ঈডিপসের প্রমূর্ত্তি অবলম্বনে উহারই পরিণাম প্রদর্শন করিয়াছেন ; উহার এমন 'ট্রাজিক পরিণাম' দেখাইয়াছেন যে, পাঠক প্রতিপদে রোমহর্ষণপথে চলিতে থাকে এবং পরিশেষে ব্যভিচারের ভীষণ পরিণামে ভয়াতুর এবং অনুশোচনার গুরুভারাক্রান্ত হইয়াই 'ঈডিপস্' নাটক শেষ করে ! এক্ষেত্রে 'ঈডিপস্' নাট্যসাহিত্যের একটা এভারেষ্টের মতই অসমমাহাত্ম্যে এবং ট্রাজিডীর নাট্যশিল্পীমাত্রের সুদূরপূজ্য আদর্শরূপে দাঁড়াইয়া গিয়াছে ! তবে, দেখিতে হইবে, সফোক্লিসও ব্যভিচারবিলাসের হৃদয়মর্ম্মে 'অনুবীক্ষণ' চালাইতে চেষ্টা করেন নাই।

কামেন্দ্রিয়ের স্নায়বিক ঝোঁক গতিকেই পাপক্ষেত্রে কোনরূপ 'সূক্ষ্ম 'সত্যবাদী' বা 'বিজ্ঞানী' আদর্শের শিল্প যে দাঁড়াইতে পারে না, উহা যে শিল্পসাহিত্যের 'চিন্ময় রসনীতি'র দিক্ হইতেই 'অসম্ভব' হইয়া আছে, তাহাই আমাদিগকে বুঝিতে হইতেছে। শিল্পে 'অদৃষ্ট'-পরিচালিত ম্যাক্‌বেথের জন্য স্থান আছে, কিন্তু অদৃষ্টচালিত কামবিলাসীর জন্য একেবারে অবকাশ নাই। বুঝিতে হইবে, সাহিত্য সবিশেষে Reponsible পাপ এবং স্বাতন্ত্র্যতন্ত্রী 'পাপের' আলোচনাভূমি বলিয়াই এদিকে তাহার 'ক্ষেত্র' সঙ্কীর্ণ হইতে বাধ্য হইতেছে। শিল্পে পাপবিষয় গ্রহণ করিতে হইলেই, সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের ঘৃণা অথবা 'ভয়ানক'ভাব উদ্রেক করা ব্যতীত রসশিল্পীর উপায়ান্তর নাই। সঙ্কট এই যে, ঐরূপ করিতে গেলেই শিল্প অতি সহজে এবং অতর্কিতে ধর্ম্ম অথবা নীতির ক্ষেত্রে 'অনধিকার প্রবেশ' করে; আবার, না করিলেও, রসের 'শিব'তত্ত্বের ও 'ঋত'তত্ত্বের বিলঙ্ঘনা ঘটিয়াই শিল্পরসের প্রাণসংহার করে।

এই 'ঋত' বা 'বিশ্বনীতি' কি, তাহা ভারতের অদ্বৈতবাদী ও বেদ-পন্থীর দৃষ্টিস্থান হইতে ব্যতীত প্রকৃতপ্রস্তাবে হৃদয়ঙ্গম করার যো নাই। কারণ ভারতীয় দৃষ্টিতেই বিশ্বনীতি জীবের 'আত্মনীতি'—বিশ্ব আত্মারই অন্তর্গত। নীতির তরফে কোন 'বিদ্রোহ' বলিতে যেমন বিশ্ববিদ্রোহ, তেমন আত্মবিদ্রোহও বুঝায়—ফলতঃ আত্মহত্যাই বুঝায়। ভারতের দৃষ্টিতে জড়জগৎ ও অধ্যাত্মজগৎ উভয় একই পরম 'আত্মা'র বিবর্ত্তবিকাশ; সৃষ্টিতন্ত্রে 'আত্মা' হইতেই জড়ত্ব নামিয়া আসিতেছে; আবার, জড়তার পথেও আত্মতত্ত্বই ঊর্দ্ধগামী এবং চরম 'তৎ'বস্তুতে 'প্রয়াণী' হইতেছে। মধ্যপথের এই 'গতির' নামই জগৎসৃষ্টি বা 'ভুব'ব্যাপার। মনুষ্যের জীবনগতির লক্ষ্য এবং সচেতনভাবে সেই লক্ষ্য'সাধনার' অর্থই হইতেছে উক্ত অনধিগত বা অপ্রাপ্ত আত্মস্বরূপে জীবের 'প্রয়াণ' অপিচ ওই প্রয়াণ-পথের নামটাই জীবের 'ধর্ম্মপন্থা'। অতএব ভারতীয় দৃষ্টিতে নীতি বা ধর্ম্ম কোন বহিরাগত Commandment মাত্র নহে; উহা জীবতত্ত্বেরই অপরিহার্য্য ও 'সনাতন' ধর্ম্মনীতি—

Law—ঋত। যাহা আমার জীবনের 'ঋত', তাহা মোটামোটি ভাবে আমার সাহিত্যেরও ঋত—সাহিত্যেরও 'স্বধর্ম্ম'—সাহিত্যেরও রসনীতি।

সাহিত্যের এই অনতিক্রম্য 'স্বধর্ম্ম' বা 'রস'নীতি কি তাহাকে ভারতীয় অদ্বৈতবুদ্ধির দৃষ্টিস্থান হইতে সর্ব্বসামঞ্জস্যে, জীবনার্থের ও জগদর্থের 'ঐক্য'সমতায় বুঝিবার জন্যই আমরা সাহিত্যরসের 'শিব'-তত্ত্বের ক্ষেত্রে, আপাতদৃষ্টিতে বিস্তারিত একটা 'আলোচনা' করিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছি। পরন্তু এ'স্থলেই, সাহিত্যসেবীর সমক্ষে সাহিত্যের রসক্ষেত্রের সর্ব্বাপেক্ষা উৎপীড়ক সমস্যা . অতএব উহার সম্যক্ সমাধান ব্যতীত একালে শিল্পিত্ব কিংবা পাঠকত্বও প্রকৃতপ্রস্তাবে দাঁড়ায় না বলিয়াই এরূপ আলোচনা অপরিহার্য্য হইয়াছে। (১)

(১) ভারতীয় 'ধর্ম্ম' বা 'নীতি'শাস্ত্রের হৃদয় না বুঝিয়া অনেক বিদেশী এবং 'পি, এচ ডি' উপাধিধারী দার্শনিক ব্যক্তিও বিভ্রান্ত হইয়াছেন। "তোমাদের অদ্বৈতবাদের ছায়ায় 'পাপপুণ্য' বা 'ধর্ম্মাধর্ম্ম' নীতি দাঁড়াইতে পারে না।" ইহা যেমন ভারতীয় আদর্শে সহানুভূতিহীন ব্যক্তিগণের একটা সাধারণ 'মামুলি কথা'! অথচ মনীষী এমার্সন স্পষ্টভাবে দৃষ্টি করিয়া এবং পূজাবুদ্ধিতে বিমুগ্ধ হইয়াই ত লিখিয়াছিলেন "জগতের কোন জাতি কি হিন্দুর ন্যায় এমন সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শী নীতিশাস্ত্র রচনা করিতে পারিয়াছে?" আর, এখন তাঁহার স্বজাতি ও স্বদেশিগণ একেবারে বিপরীত কথাই বলিতেছেন। যেমন বলিয়াছি, ভারতবর্ষ বর্ত্তমানের রাষ্ট্রীয় দুরবস্থা গতিকে কোন দিকেই নিজের প্রতিষ্ঠা সিদ্ধি করিতে পারিতেছে না। নরহত্যার ক্ষমতা দেখাইয়া নিজের মাহাত্ম্য সপ্রমাণ করার শক্তি ভারতের নাই . সেই শক্তি বর্ত্তমানের অদৃষ্টদেবতা তাহা হইতে কাড়িয়া লইয়াছেন। উহার সঙ্গে সঙ্গে সংসারক্ষেত্রে ভারতের সকল মাহাত্ম্যই প্রকৃতপ্রস্তাবে গিয়াছে। অথচ প্রাচীনতম কাল হইতে যত বৈদেশিক ভ্রমণকারী এতদ্দেশে আসিয়াছেন, যাঁহারা উহার 'খবর' কালিকলমে রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ত, যেন একবাক্যে, ভারতের সাধারণ মানবজীবনের Rightness দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন! বিদেশী বিচারকের তাদৃশ বিস্ময়বিমুগ্ধ সাক্ষ্যবিচার সমগ্র মনুষ্যজগতের অপর কোন প্রাচীন কিংবা আধুনিক 'জাতিসঙ্ঘ' নিজের ইতিহাসের পুঁজি হইতে দেখাইতে পারে কি? উহা মানবত্বের ইতিহাসে একেবারে অতুলনীয় ও অভাবনীয় নহে কি? প্রাচীন ভারতের সমাজজীবনের এই

অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের 'ধর্ম্ম' ও 'নীতি' আদর্শ বিষয়ে স্থূল কথা।

একাধারে ভারতের হৃদয় ও মস্তিষ্ক স্বরূপ ওই 'বৈদিকদর্শন'! উহার 'দৃষ্টি'স্থানে দাঁড়াইয়া জাবের 'যৌন প্রবৃত্তি' হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার

আধ্যাত্মিক বিশিষ্টতা ও গৌরবপ্রতিপত্তির কারণ টুকু কোথায়? এখনও, বর্ত্তমানের এই অধঃপতিত এবং অত্যাচার-নিহত অবস্থাতেও, যাঁহারা সমদৃষ্টিতে ভারতের জনপদে ভ্রমণ করেন তাঁহারাও একবাক্যে এতদ্দেশের সাধারণ মনুষ্যজীবনের—বিশেষতঃ হিন্দুজীবনের—Rightness দেখিয়া বিস্ময়প্রকাশ না করিয়া পারিতেছেন না। এই 'জাতি'র ন্যায় এমন শিষ্ট, সংযত, শান্ত, অপ্রমত্ত ও non criminal জনসঙ্ঘ অন্য কোন ভূ-বিভাগেই চোখে পড়িবে না। অথচ, বিদেশিগণ এত অহংকৃত যে, উহার প্রধান 'কারণ' টুকু কদাপি বুঝিতে চাহিবেন না! কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, ইহা রাষ্ট্রীয় অধীনতা' অথবা 'ভীরুতা'র ফল। কিন্তু পৃথিবীতে আরও পরাধীন দেশ ত আছে! স্বাধীন ও 'সুসভ্য' দেশ সমূহের 'সাধারণ' জনমণ্ডলীই বা, তাহাদের স্বাধীনতার ফলে, চারিত্রোন্নতি সোপানে কি পরিমাণ সম্প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে? উহাদের জনচরিত্র কি পরিমাণ নৈতিক অভ্যুন্নতি ও দৃঢ়তা লাভ করিয়াছে? এ অহঙ্কার অবশ্য ইয়োরোপীয়তার লক্ষণ এবং হীক্রদীক্ষিত গোঁড়ামীর ফল—যে আদর্শে খ্রীষ্টানীর বাহিরে 'সভ্যতা' নাই; পোষাকপরিচ্ছদ, দালানকোঠা ও বাহ্য সুখসুবিধা লইয়াই মানুষের 'মাহাত্ম্য' এবং তাহার 'সভ্যতা'; যে আদর্শে সে দিনকার যীশুখ্রীষ্টই অতীত, বর্ত্তমান এবং অনন্ত ভবিষ্যতের মনুষ্যজাতির একমাত্র বিধিনিযুক্ত 'পরিত্রাতা'। অহমিকাতন্ত্রী শিক্ষাবশেই ইয়োরোপীয়গণ সহজে মনে করেন যে, ভারতবাসীর মত এতবড় মহামানবসংঘের হৃদয়টি জীবনের মূল বিষয়ে 'ভুল' করিয়াই চলিতেছে। এই মহাদেশের 'হৃদয়'কে, ভারতের সকল ধর্ম্মবুদ্ধি বা নৈতিক সুস্থিতির নৈদানিক' কারণটাকে কোনমতেই তাঁহারা দেখিতে বা মানিতে চাহিবেন না! জগতের অন্য 'ধর্ম্ম', অন্য সকল দেশের সমাজ, জাতি এবং পরিবার জীবনের আদর্শ' এত করিয়াও জনসাধারণের জীবনমধ্যে যেই Rightness এর আবহাওয়া প্রবর্ত্তিত করিতে পারে নাই, পরন্তু প্রাকৃত মানুষকে humanise করিতে একেবারে নিষ্ফল হইয়াছে বলিলেই চলে, তাহা এত সহজে অপিচ সহজাত ভাবে এই অধিনায়কবিহীন এবং দুর্দ্দশাপীড়িত ভারতের জনসঙ্ঘের মধ্যে কি করিয়া সমাপন্ন হইয়া গিয়াছে? 'ধর্ম্ম-বিনীত' জীবন এবং কার্য্যকরী 'পবিত্রতা'ই যদি মনুষ্যের মাহাত্ম্য-নিরূপণের মাপকাঠি হয়, তা হইলে নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, ভারতবর্ষই প্রকৃত খ্রীষ্টপন্থী, ইয়োরোপ-আমেরিকা কদাপি নহে। মনুষ্যের 'প্রাকৃত'ভাব, এবং 'পশুসাধারণ প্রবৃত্তি'র একরূপ 'বিনীতি' রাষ্ট্রীয় হিসাবে 'অধঃপতিত' ভারতের এই বিপুল জনসঙ্ঘের জীবনে কি করিয়া আসিল? 'ধর্ম্ম' আদর্শের মধ্যেই, ভারতের ঋষিপুষ্ট

ধর্ম্ম, সমাজ ও পরিবার প্রভৃতি যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের অন্তরাত্মা ও 'স্বধর্ম্ম' বিচারের আদর্শপদ্ধতি আমরা পাদটীকায় এরূপে সঙ্কেত করিয়া

'বর্ণাশ্রম' তন্ত্রের ও 'ধর্ম্মতন্ত্রীয় সমাজ' আদর্শের মধ্যেই যদি ইহার কিছুমাত্র কার্য্যকরী প্রেরণা এবং সমর্থনা না থাকে, দেশের জন'সাধারণের' ধর্ম্মহৃদয়ে এবং 'সংসার'জীবনের মধ্যে তাহা কি করিয়া এমন 'কার্য্যকর' ভাবে এবং পরিব্যাপ্ত ভাবেই আগন্তুক হইল ?

বিদেশিগণ এতদ্দেশের অদ্বৈতবাদ-নিয়ন্ত্রিত 'বর্ণাশ্রম'তন্ত্র বুঝিতে পারেন না বলিয়াই মনে করেন যে, অদ্বৈত আদর্শে 'সমাজনীতি'র আমল নাই। তাঁহারা বুঝিতে চাহেন না যে, যাহাদের আদর্শে 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' বা 'ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় সত্ত্বা নাই' তাহাদের এই 'দৃষ্টি' এবং 'সিদ্ধান্ত' সৃষ্টির 'আদি'তত্ত্ব স্থানে বা 'চরমতত্ত্ব'স্থানে দাঁড়াইয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে। একথা কদাপি ভুলিলে চলিবে না যে, সৃষ্টির মধ্যে, ভবগণ্ডীর ভিতরে আসিলেই 'দ্বৈত ব্যবহার'—সৃষ্টির 'প্রকৃতি' এবং জীবের ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির সীমা ও প্রকৃতিবশেই এই 'ব্যবহার'। এক্ষেত্রে, জীবের 'অগ্রবুদ্ধি'তে 'এক' যেমন সত্য, তেমন ব্যাবহারিক বুদ্ধিতে 'বহুত্ব'ও সত্য। জীব যে পর্য্যন্ত এই বহুত্ববুদ্ধি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, উহাকে ডিঙ্গাইয়া সর্ব্বকারণের 'কারণ'বস্তুতে, 'এক'তত্ত্বসাগরে একীভূত হইতে না পারে, ব্রহ্মাত্মভূত World-consciousness সিদ্ধি করিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত তাহাকে দ্বৈতব্যবহার এবং দ্বৈতবুদ্ধি মানিয়াই চলিতে হয়। অপিচ, এই 'মায়া'-প্রমূর্ত্ত জগতেও সেই অমূর্ত্ত এবং সচ্চিদানন্দ 'এক'বস্তুই ত সর্ব্বত্র ওতপ্রোত আছেন—তিনিই 'মায়াধীশ্বর' ও বিশ্বপ্রপঞ্চের সর্ব্ব উপাদানের ভিত্তি, তিনিই ত জগতের সকল 'ধর্ম্মগতির' হেতু, তিনিই ত 'ধর্ম্মেশ্বর' ও জীবহৃদয়ের সকল 'দৈবী সম্পত্তি'র কারণ। অতএব জীবের জীবনে সেই 'আত্মগতির লক্ষ্যে' ও ধর্ম্মপথে ব্যতীত চলিবার অন্য 'পন্থা' নাই। অতএব চিন্ময়গতি বা Spiritual উন্নতির লক্ষ্যে, এই জড়তার নিগ্রহ ও Restraint পথে চলাই ভারতের 'ধর্ম্ম'আদর্শ। এই Restraint আদর্শে সংসার ও সমাজজীবনকে, স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করা ও 'কার্য্যকর' ভাবে সংযমিত করাই ভারতের 'ধর্ম্ম'আদর্শের সুফল। ফলতঃ এই Restraint বর্ণাশ্রমতন্ত্রের সকল সামাজিক আচারব্যবহারে, দৈনন্দিন শিক্ষাদীক্ষায় ও "প্রভাত হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত" জীবের প্রত্যেক চালচলনে এমনভাবে সুপ্রযুক্ত হইয়াছে যে, এই মহাজাতির সমস্ত গুণ এবং দোষের কারণও জড়তার এই Restraint তরফেই খুঁজিতে হইবে। উহার ফলেই, উচ্চশ্রেণীর সামাজিকের কথা দূরে থাকুক, জনসাধারণের মধ্যেও এরূপ Rightness হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বেও ছিল, এখনও এ জাতি হইতে একেবারে অন্তর্হিত নাই; পরন্তু, জগতের অন্যতাবৎ 'ধর্ম্ম'প্রতিষ্ঠান হইতে সমধিক ভাবে এবং সফলতর ভাবেই

আসিলাম। অতএব, বিস্পষ্ট ভাবেই বলিব, যখন স্ত্রীপুরুষের 'ধর্ম্ম-বিবাহের সম্বন্ধ'ই চরমদৃষ্টিতে মহন্মন্ত হইতে পারিতেছে না, তখন স্ত্রীপুরুষের কোন

'আছে'। এরূপে অদ্বৈতপথিকের পক্ষে অলঙ্ঘ্য ও অপরিহার্য্য এই 'সামাজিক ধর্ম্ম'নীতি ভারতে পরম কার্য্যকর ভাবে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এইরূপে বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের উপাসক (শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর ও গাণপত্য) সম্প্রদায় মাত্রের স্বীকৃত অন্তিমলক্ষ্য অদ্বৈতসিদ্ধি বা চরমের 'ব্রহ্ম প্রাপ্তি', অপর দিকে সহস্র বিভিন্নতা সত্ত্বেও এই 'লক্ষ্য' বিষয়েই উহারা 'বেদপন্থী'।

যে পর্য্যন্ত ওই 'মোক্ষ' 'মুক্তি' 'নির্ব্বাণ' 'প্রজ্ঞান' 'আত্মপ্রাপ্তি' বা 'ব্রাহ্মীস্থিতি' ঘটে নাই, সে পর্য্যন্ত সকলেই সামাজিক ব্যবহারে, উপাসনা পথে এবং স্বীকারে 'দ্বৈত'বাদী। পরন্তু, সকল দ্বৈতব্যবহারে ও 'ভেদপ্রপঞ্চ'ময় সংসার এবং সমাজধর্ম্মের পথে চূড়ান্তের সেই Super-Consciousness ও Super-moral অদ্বৈতব্রহ্মতত্ত্বে 'ধৃতি' স্থির রাখাই ভারতীয় বেদপন্থীর 'ধর্ম্ম'কর্ষণা; অতএব তাহার ব্যবহারজীবনের 'ধর্ম্ম' বা 'সমাজনীতি'র আদর্শও দ্বৈতপন্থী না হইয়া পারে না। এই Pure Reason ও Practical Reason। চূড়ান্ত 'অদ্বৈত'সত্যের সঙ্গে একটা রফারফি (Compromise) স্থির রাখিয়াই 'বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম'বাদ অনুচিন্তিত হইয়াছে; জীবের পরিবার ও সমাজজীবনে পরম কার্য্যকর ভাবেই' ধর্ম্মাচারসাধনা প্রযুক্ত হইয়াছে; জগদতীত অদ্বৈতসিদ্ধির সঙ্গে লক্ষ্যসঙ্গতি রাখিয়াই 'দ্বৈতপদ্ধতির' উপাসনা বা 'ব্যক্তি'গুণধর ও 'প্রীতিপবিত্রতা'ময়, 'দয়াময়', মুক্তিদাতা ইত্যাদি ব্যাবহারিক ভাবযুক্ত ঈশ্বরোপাসনা চলিতেছে। ফলতঃ ভারতের 'ব্রহ্ম'কে ব্যবহারিক বুদ্ধিজনিত 'আল্লা' 'গড্' বা 'ঈশ্বর' অনুবাদে বুঝিতে যাওয়াটাই বিদেশীর পক্ষে সকল দিকে, সকল ভ্রান্তির গোড়া।

এই আদর্শে সৃষ্টির কোটিমধ্যে ও সমাজের গণ্ডীমধ্যে সকল দ্বৈতমূলক ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি অদ্বৈতপন্থী মানিয়া চলিয়াছে; মানিয়া চলিলেও চূড়ান্তের সেই Absolute লক্ষ্য হারায় নাই; প্রতিপদে উহার তত্ত্বেই সচেতন আছে। প্রত্যেক হিন্দুর এস্থলেই প্রাথমিক দীক্ষা—Initial Culture. অদ্বৈতপন্থীর সমক্ষে সৃষ্টি অনাদি 'অদৃষ্ট'-গত সংসার কর্ম্মবাসনা'র চক্রে পরিঘূর্ণিত, বাসনাও আত্মতত্ত্ব হইতে স্খলন এবং উহাতে পুনঃ'প্রয়াণ' করিবার জন্যই অতর্কিত এবং বিক্ষিপ্ত 'তৃষ্ণা' হইতে অভিন্ন। ফলতঃ অদ্বৈতবাদীর science এই যে, যেমন জীবের অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে, তেমন জড়জগতেও 'কর্ম্ম'ই সকল জগদ্গতির কারণ। আমাদের জড়বিজ্ঞানেও Force এর নাম 'কর্ম্ম'। জীবনপ্রকৃতির বাধ্য হইয়া জীবমাত্রের মধ্যে, নিশ্বাস এবং প্রশ্বাসবৃত্তির মতই, একটা ঊর্দ্ধগতি এবং অধোগতির টানাটানি, একটা 'কিংকর্ত্তব্য'বিজ্ঞানবিহীন ঝোঁক, একটা

কামজ বন্ধন, বহুবিবাহ অথবা ব্যভিচারমিলন মাত্রেই কোন অধ্যাত্মবাদীর দৃষ্টিসমক্ষে জুগুপ্সিত না হইয়া পারে কি? এ' দৃষ্টিস্থানে দাঁড়াইয়া চিন্তা করুন, মনুষ্যের 'সমাজধর্ম্ম নীতি' বা তাহার সাহিত্যের কোন

প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির দোটানা, একটা দেবাসুরের দ্বন্দ্ব! জীবনবৈজ্ঞানিকের নিকটে 'ঊর্দ্ধপ্রবৃত্তি'র নামটাই ধর্ম্ম, 'অধোবৃত্তি'র নামই পাপ। অতএব 'ধর্ম্মই সৃষ্টির অন্ধকারে অন্ধ জীবনযাত্রীর একমাত্র 'অদ্বৈত বন্ধু'। জীবনতত্ত্বে এই ধর্ম্মনীতির নামই সংযম—Intellectualityর উদ্দেশ্যে Physicalএর সংযম; Moral উদ্দেশ্যে Intellectualএর সংযম; আবার, Spiritual উদ্দেশ্যে Moralএর সংযম। এই জন্য 'সৃষ্ট জীব'মাত্রকেই নিজের জন্মগত পাপাত্মক ওই 'মূল প্রবৃত্তি' বিষয়ে সবিতর্ক ভাবে মনে রাখিতে হয় "পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ"। অথচ, যুগপৎ নিজকে অমর ও শাশ্বতের এবং Super-moral তত্ত্বের অধিকারী এবং 'শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত' স্বরূপ বলিয়াও সচেতন থাকিতে হয়। অদ্বৈতবাদিকেই উপাসনার সময় বলিতে হয়—

> আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং পরমাত্মস্বরূপকম্।
> স্থাবরং জঙ্গমং চৈব প্রণমামি জগন্ময়ম্॥
> অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
> সমস্ত জগদাধার মূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥

সঙ্গে সঙ্গে 'চূড়ান্তের লক্ষ্য'ও মনে রাখিতে হয় যে, ওই 'ব্রহ্ম' আমার নিজেরই অনধিগত স্বরূপ—Unrealised self—'সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্য মুক্ত স্বভাববান্।" সুতরাং জীবের পক্ষে 'পুণ্য'গতি, 'ধর্ম্ম'গতি এবং সংযম মাত্রেই ঐ অদ্বৈতলক্ষী গতি এবং 'পাপ'বৃত্তি মাত্রেই অদ্বৈত হইতে দূরত্বকারী গতিরূপে ধরিয়াই সকল ধর্ম্মশাসন ও সমাজশাসনের Restraint প্রযুক্ত হইতেছে! জন্মাদৃষ্ট গতিকেই সকল জীব একটানা ভাবে অদ্বৈতলক্ষ্যে চলিতে পারে না, অনেকে একেবারেই পারে না—হয়ত কোটিকের মধ্যে গুটিকে মাত্র কথঞ্চিৎ পারে। আদিকাল হইতে কত কত জীব দুরাকাঙ্ক্ষার বশে একান্তবেগে চলিতে গিয়া দগ্ধপক্ষ হইয়াই ফিরিয়াছে! এতদ্দেশের শাস্ত্রাদিতে তাহারও ইতিহাস আছে। কিন্তু কি করিতে হইবে? মানুষকে ত জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যে সচেতন রাখিতেই হইবে! এস্থলেই জগতের যাবতীয় জীবন দার্শনিকের সঙ্গে এবং ধর্ম্ম ও সমাজতন্ত্রের সঙ্গে ভারতীয় ঋষির পার্থক্যের সূত্রপাত!। সর্ব্বত্র জড়তার, প্রাকৃতের, পশুত্বের ও (জন্মান্ধ জীবের) স্বেচ্ছাচারের Restraint ই আদর্শ। সর্ব্বত্রে চূড়ান্তের "সেই শান্তং শিবং অদ্বৈতম্" লক্ষ্যকে স্থির রাখিয়াই ভারতের

পদ্ধতি এই 'অধ্যাত্মনীতি'র বা 'বিশ্বনীতি'র ব্যভিচারী হইয়া কদাপি 'সত্যশুভসুন্দর' রূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে কি? মনুষ্যের সমাজের

তত্ত্বদর্শী জীবের পক্ষে "সংসার ধর্ম্ম"—পুণ্যলক্ষিত এবং পুণ্যশাসিত 'জৈবধর্ম্ম'—ও ধীরগতি জীবনসাধনার প্রণালী সমর্থন করিয়াছেন। উহা হইতেই বর্ণাশ্রমের অধিকার' তত্ত্ব অপিচ জীবনের সকল বিভাগকে অখণ্ডভাবে দেখিয়াই আর্য্যঋষির 'ধর্ম্ম শাস্ত্র'। অবশ্য, এই আদর্শে চিন্ময়বৃত্তির বিরোধী কোন 'সংসারধর্ম্ম'ই ত একদিকে 'পাপ' না হইয়া পারে না; অন্ততঃ পাপ-পুণ্য বিমিশ্র না হইয়াই পারে না। কিন্তু জীবের পক্ষে সংসার দুরতিক্রম (অনতিক্রম নহে) জানিয়াই ঋষিগণ তাহার 'সংসার ধর্ম্ম"কে 'অধিকার'বাদেই সমর্থন করিয়াছেন। সমাজনীতির উচ্চতম moral আদর্শেও ত my will এবং God's will এর মধ্যে একটা struggle ও টানাটানি থাকে। যখন God's will be doneই স্থির প্রতিষ্ঠ হইয়া যাইবে উহাই Super-moral বা জীবনের ধর্ম্মতত্ত্বে অদ্বৈত অবস্থা। জীবমাত্রকে সেই পদবী লাভ করিবার জন্ম 'সাধনা' করিতে হইবে—সমগ্র জীবনকে চরম অদ্বৈততত্ত্বেরই গৌণ বা মুখ্য 'সাধনা' রূপে পরিণত করিতে হইবে—এস্থলেই হইল বর্ণাশ্রমের 'জীবন নীতি'। 'অধ্যাত্ম অধিকার' স্থান হইতেই সর্ব্বত্র ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, পরিবারনীতি ও চারিত্রনীতির উচ্চউচ্চতর আদর্শ এবং জীবের প্রাকৃতধর্ম্ম বা পশুধর্ম্মের 'সংযম' আদর্শটুকু সমর্থিত। মানুষ এককালে, তীব্রসম্বেগে অদ্বৈতে প্রয়াণী হইতে পারে না বলিয়াই অপারকের সাপেক্ষ অধিকারী ভেদ সমর্থিত। উহার গতিকে ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে 'প্রাকৃত ধর্ম্ম'বাদী বা সকলের জন্ম একধর্ম্ম'-বাদী অপর সকল ধর্ম্ম মতের সঙ্গে আর্য্যধর্ম্মের পার্থক্য ও বিশিষ্টতা অপিচ ভারতের 'বিশেষ বাণী'। বুঝিতে হইবে, ঐ সমস্ত বিষয়ে নিজের 'অধ্যাত্ম'বাদের দিক হইতে ভারতের একটা আত্মসঙ্গত ও অটল যুক্তি আছে। উহা বুঝিয়া লওয়া প্রত্যেক ভারতীয়ের দায়িত্ব; অবশ্য, বুঝিয়া অনুসরণ 'করা-নাকরা' প্রত্যেক জীবের 'স্বত্ব'। কিন্তু প্রকৃতকথা না বুঝিয়াই ভারতীয় 'ধর্ম্ম' আদর্শের (স্বদেশী-বিদেশী) বিচারকগণ প্রতিনিয়ত চলিতেছেন। স্বদেশের হৃদয় ও সভ্যতার আদর্শ না বুঝিয়া এদেশের অনেক আধুনিকতন্ত্রী ভাবুক মনুষ্যমাত্রকে 'অমৃতধর্ম্মী' এবং 'অমৃতপুত্র' বলিয়া ব্যাখ্যা পূর্ব্বক অহংকারবশে সমাজতন্ত্রে এবং উপাসনার ক্ষেত্রেও সর্ব্বত্র 'সাম্য ও স্বাধীনতাবাদ' এবং ধর্ম্মের ক্ষেত্রেও 'জীবমাত্রের সমান অধিকার' প্রভৃতি বুলি খ্যাপনে 'সংস্কার' করিতে চেষ্টা করেন। বর্ত্তমান অবস্থায় এই মহাজাতির মধ্যে বিরুদ্ধ সমালোচনার যোগ্য অনেক কিছুই আছে। কোন বৃহৎ জাতি বা সমাজ বিষয়ে 'নিয়ত বিধি' মাত্রেই বেশীকম অযুক্ত না হইয়া পারে না। কিন্তু, মনে রাখিতে হয়, ঐ 'অমৃত'বাদ ভারতীয়

বা তাহার সাহিত্যের 'ভালমন্দ' আদর্শ বিষয়ে আবার কোন পৃথক্ মাপকাঠি ত হইতে পারে না! এক 'সচ্চিদানন্দ আত্মা'ই জগতের ও জীবনের 'নিদান' এবং অস্তিত্বের (গৌণ অথবা মুখ্য) লক্ষ্য। জগতের

ঋষিরই বাণী। ব্রহ্মজ্ঞান জীবমাত্রের 'স্বধর্ম'; মনুষ্য মাত্রেই একদিকে 'অমৃতপুত্র' ও 'অমৃতের অধিকারী' ও ব্রাহ্মীস্থিতির অধিকারী—এমন সব কথা ঘোষণা করিয়া এবং পরম অদ্বৈতবাদী ও 'এক'বাদী হইয়াও ঋষিগণ কেন যে আবার সমাজে ও অধ্যাত্মজীবনে 'ভেদতন্ত্র' সমর্থন করিলেন, মনুষ্যের জন্মগত অথবা অদৃষ্টগত প্রবৃত্তিনিবৃত্তির অনুপাত পার্থক্যের উপরে এতটা জোর দিয়া জীবের প্রাকৃত প্রবৃত্তির 'সংযম' আদর্শের উপরেই বর্ণাশ্রমধর্মাচারের ভেদতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিলেন, কোন বিরুদ্ধ সমালোচক তাহার 'হেতু' যথেষ্ট মতে কদাপি চিন্তা করেন বলিয়া মনে হয় না। অধিকাংশই কেবল নিশ্চিন্তনির্ভীক অজ্ঞতা এবং অহমিকার 'সমালোচন'।

পূর্ব্বেও বলিয়াছি যে, অধুনা ভারতীয় সাহিত্যসেবীর পক্ষে সর্ব্ববৃহৎ কর্ত্তব্য যদি কিছু থাকে, তাহা হইতেছে—স্বদেশের ধর্ম্মতন্ত্রী সমাজ এবং সভ্যতার 'আত্মা' পরিচয়! তদ্ব্যতীত বর্ত্তমান যুগে তাঁহার দাঁড়াইবার জন্য পদভিত্তি টুকুই থাকিবে না! যাহাকে এ সকল ক্ষেত্রে 'প্রাকৃত আদর্শ' বলিতে পারি, ভারতবর্ষ বহুপূর্ব্বে তাহা ছাড়াইয়া উঠিয়া, নিজের অভিজ্ঞতানির্ভরেই ছাড়াইয়া উঠিয়া, একটা বিশেষতন্ত্রে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। সাধারণের আপাতদৃষ্টিতে ভারতের অনেক কিছুই বেয়াড়া বলিয়া না ঠেকিয়া পারে না। জীবনের 'লক্ষ্য'জিজ্ঞাসুর সমক্ষে সর্ব্বপ্রধান প্রশ্নসমস্যা এই যে—আত্মা না দেহ? যদি আত্মাই জীবনতন্ত্রের মূল লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে ভারতের এই 'বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম তন্ত্র' ও 'অধ্যাত্ম সাধনা' অপেক্ষা যোগ্যতর এবং মহত্তর প্রতিষ্ঠান মানবত্বের ক্ষেত্রে আর হইতে পারে না; তা হইলে পৃথিবীর অপর তাবৎ ধর্ম্ম ও সমাজতন্ত্রকে কেবল 'শিশুতন্ত্র' বলিলেও ভুল হইবে না। কারণ, উহারা 'মূলেই ভুল' করিতেছে। আর যদি, আত্মাই না থাকে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের মত এমন 'ব্যাকুব'ও চন্দ্রসূর্য্যের নীচে আর সম্ভবপর হয় না। মনে রাখিতে হইবে, ভারতের এই 'অধ্যাত্মসাধনা' এবং তদনুগত জীবননীতির মধ্যেই ভারতীয় ধর্ম্ম এবং সমাজের যাবতীয় অপ্রাকৃত লক্ষণ এবং সমস্ত বিশেষধর্ম্মের 'হেতু'। বিদেশিগণ কিংবা প্রাকৃতবাদী বিচারকগণ উহা কোন মতেই বুঝিতে চাহেন না; অতএব ভারতের সমাজ ও ধর্ম্মের নিন্দায় এবং বিরুদ্ধ সমালোচনায় বৈদেশিক সাহিত্য 'পূর্ণ'। 'আত্মপরিজ্ঞান' ব্যতীত এদেশের লোকের পক্ষে পাশ্চাত্যসাহিত্য পাঠ এবং আত্মাদরনির্ভরে দাঁড়ানটাই কঠিন। উহাকে সুতরাং তাহার প্রাথমিক Culture এবং 'বাল্যশিক্ষা'রূপেই মানিয়া লইতে হইবে।

চরম লক্ষ্য যদি 'সচ্চিদানন্দ আত্মা' হয়, তখন মনুষ্যত্বের বা মনুষ্যের সহিত্য-ধর্ম্ম-সমাজের যাবতীয় ভাবুকতাকর্ম্মের চূড়ান্ত লক্ষ্যটিও

আত্মসঙ্গত আদর্শেই ভারতের সাধারণ 'দীক্ষাপ্রাপ্ত' লোক পর্য্যন্ত একদিকে যেমন মূর্ত্তিপূজা করে, অধ্যাত্ম ইষ্টসাধনার উদ্দেশ্যেই উহা করে, সঙ্গে সঙ্গে অমূর্ত্ত 'আত্মা'কেও চরম লক্ষ্যরূপে উদ্দিষ্ট করিতে ভুলে না—মূর্ত্তিকে ঘৃণাও করে! প্রত্যেকেই জানে যে উপাসনা-ক্ষেত্রে—

'উত্তমোব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্ত মধ্যমঃ।
জপতপোঽধমোভাবো বাহ্যপূজাধমাধমঃ॥

এই 'আত্মা' বা 'ব্রহ্মাদর্শ' অন্য ধর্ম্মে ত নাই। আবার, ভারতের চতুর্থাশ্রমীরা যেমন বলে 'কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ' তেমন সংসারীরাও পাল্টা জবাবে বলে যে—

বনেষু দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং
গৃহেষু পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্॥

ভারতীয় আদর্শের 'গোঁড়া'গণও বলে যে, জীবনের চরম লক্ষ্যসাধনার বিষয়ে পৃথিবীর অন্য কোন 'ধর্ম্ম'ই ভারতীয় ধর্ম্মতন্ত্রের ন্যায় এতদূর সজাগ নহে। 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' লক্ষ্যেই, পবিত্রতা ও Saintlinessএর আদর্শকে জীবের সামাজিক জীবনে অথবা 'একাকী মনুষ্যের অধ্যাত্ম জীবনে' প্রয়োগপূর্ব্বক জীবনের মুক্তিমুখী গতি 'ধীরললিত'ভাবে নিয়ন্ত্রিত করাই হইল 'বর্ণাশ্রমের অধ্যাত্ম নীতিশাস্ত্র'। এক কথায়, 'চিৎ'লক্ষ্যে জড়তার সংযমই পুণ্য—উহাই জীবত্বের 'শিব'।

অপর সকল ধর্ম্ম সাক্ষাৎভাবে এতদূর 'মূলদর্শী' না হইতে পারে, মনুষ্যের 'নীতি'শাস্ত্রের Realismও এতদূর লক্ষ্য না করিতে পারে। পরন্তু, 'ধর্ম্ম' নামধারী এমন পদার্থও মিলিতেছে যাহা আপাতদৃষ্টিতে কেবল দলবন্ধন এবং ইহলোকের মঙ্গলই 'দয়ালু' ঈশ্বরের উপাসনায় মুখ্যভাবে লক্ষ্য করিতেছে! কিন্তু, জীবনে প্রকৃত কার্য্যকরিতার ক্ষেত্রে এই 'অধ্যাত্মগতি' এবং উহার সমর্থনার ক্ষেত্রে জগতের (Ethics) 'নীতিশাস্ত্র' নামধারী কোন পদার্থেরই ত বিরোধ নাই! নীতিশাস্ত্রের গতি অধ্যাত্মধর্ম্মের মূল লক্ষ্যের কদাপি বিরোধী হইতে পারে না। অতএব Ethicsএর উপরেই ভারতীয় 'ধর্ম্ম সাধনা'র প্রাথমিক সূত্রপাত। উহার ফল যেমন 'পুণ্য গতি', তেমন, পূর্ণগতি হইলেই উহা অধ্যাত্মক্ষেত্রে ফলতঃ 'সংযম

'আত্মা' ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে কি? যেমন বলিয়াছি, একেত্রে অপরিহার্য্য ও চূড়ান্ত প্রশ্নই হইতেছে - "জড় না আত্মা?" যাহাতে মনুষ্যকে তাহার জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হইতে বিপথগামী বা অন্ধ

গতি' এবং উর্দ্ধগতি বা ব্রহ্মমুখী গতির পরম 'সহায়'। যেরূপেই হউক, মনে অথবা কার্য্যে যখনই 'কামী' হও, যখন ক্রোধী হও, লোভী, মোহী অথবা অহঙ্কারী হও, জীবের সম্পর্কে, উদ্ভিদের সম্পর্কে অথবা যে-কোন সম্পর্কেই হোক, যখনি 'রিপু'র বশবর্ত্তী হও, তখনি ওই উর্দ্ধগতির ও অধ্যাত্মগতির এবং ব্রহ্মগতির বিদ্রোহী হও। অতএব সৃষ্টি ক্ষেত্র হইতে ব্যক্তিধর্ম্মী 'ঈশ্বর' (Persona God) পর্য্যন্ত গতির এবং ঈশ্বরপ্রাপ্তির পক্ষে 'নীতি'ই সুপ্রশস্ত রাজবীথী। তারপরেই অ[illegible] বা Super-moral—সে বিষয়ে 'ইঙ্গিত' করা ব্যতীত এস্থলে উপায়ান্তর নাই।

এস্থলেই জগতের ধর্ম্মগতি অপিচ 'নীতি' তত্ত্বে এবং অধ্যাত্মপথে সচ্চিদানন্দের 'প্রাপ্তি'তত্ত্বে ভারতের সত্যদৃষ্টি! সমগ্র জগৎ সজাগ 'সাধনা' পথেই হোক অথবা অনিচ্ছাতে সৃষ্টিগতির বশবর্ত্তী হইয়াই হোক, একদিন এই 'প্রাপ্তি'তে পৌঁছিবে—এখনও, হাজার ভ্রান্তি এবং বিপথিক ঘোরাঘুরির মধ্যেও অতর্কিতে, সেই সুদূর লক্ষ্যেই বিশ্বজগৎ চলিতেছে; ব্রহ্ম সকলকেই চরমের 'ঐক্য' স্থানে টানিতেছেন। এস্থলেই হইল, ভারতের দৃষ্টিতে, ব্রহ্মের 'চরম মুক্তিদাতা'র লক্ষণ। উন্নত সাধকগণ তাঁহাদের 'সাধন'পথে কেবল কালের সূত্রেই আমাদের অগ্রবর্ত্তী—হয়ত অগণ্য কোটি বৎসর অগ্রগামী—হইয়াই চলিতেছেন। যাহার অর্থ, ফলে 'অনন্ত'কাল! কিন্তু বিশ্বের সমস্তই এই চরম 'ঐক্য'প্রাপ্তি বা মুক্তির অধিকারী—সৃষ্টিচক্রের 'আবর্ত্তন' ধর্ম্মই উহার অধিকারী। ইহা যেমন বিশুদ্ধ 'জ্ঞান'বাদীর সিদ্ধান্ত, তেমন 'ভুক্তি'মুক্তিবাদী শাক্ত ও 'ভাবমূর্ত্তি'-পূজক বৈষ্ণব 'ভক্ত' এবং 'উপাসক'গণের সিদ্ধান্ত। আবার এ দেশে যাহারা 'আত্মা' মানে না, পরলোক বা জন্মান্তর মানা দূরে থাকুক 'ব্রহ্ম' কিংবা 'ভগবান্'ও মানে না, তাহারাও এই 'বিশ্বনিয়তি' এবং 'বিশ্বনীতি'কে মান্য করিয়া চলাকেই 'ধর্ম্ম'রূপে ধরিয়াছে; তাহারাও 'বিনয় পিটক' অথবা 'অঙ্গ' 'উপাঙ্গ' রচনা করিয়াছে। কার্য্যকরিতার ক্ষেত্রে এই 'বিনয়' এবং 'ধর্ম্মে' কিছুমাত্র প্রভেদ নাই বলিয়াই ঋষিশিষ্য মনে করেন। এইজন্য হিন্দুর কোনও 'ধর্ম্ম' নামধারী পদার্থের সঙ্গেই বিবাদ নাই; এজন্যই সে ধর্ম্মপ্রচারের ক্ষেত্রেও Militant নহে। 'স্ব-স্বধর্ম্মের পথে চলিলে, সমগ্র জগৎ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যে পথে চলিতেছে সেই 'ঋত' বা 'ধর্ম্ম' বা 'বিনীতি' মানিলেই, হিন্দুর চক্ষে তুমি 'ধার্ম্মিক' হইয়া গেলে;

জগতের 'গতি'তত্ত্বে এবং অধ্যাত্মতত্ত্বে 'সত্যদৃষ্টি' হইতেই ভারতীয় 'ঋত' বা 'ধর্ম্ম'ও 'শিব' আদর্শ।

করে, তাহাই ত পাপ! যেমন, অন্নময় লোকে, তেমন মনোলোকেও একই প্রকৃতির 'পাপ' বা 'পুণ্য'। সাহিত্যক্ষেত্রেও 'কাম' মাত্রই যেমন পাপ', তেমন বহুকাম ব্যক্তি পাপিতর ; ব্যভিচারী ব্যক্তি পাপিতম। কাম

পূর্ব্বে দেখিয়াছি, ভারতবর্ষে নামিয়া তাহার 'অবতার পুরুষ'ও এজন্য একটা নূতন কথা, অপর ধর্ম্মতন্ত্রের সম্পূর্ণ অচিন্তিত এবং অভাবিত তত্ত্বকথাই বলিয়াছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

বলিতে হয় যে, ধর্ম্মের ক্ষেত্রে এই 'অধ্যাত্মবাদ'—এই Spiritual ও Super-moral আদর্শের পরিদৃষ্টি এবং উহার সমর্থনার অস্তিত্বটুকুই একদিকে ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দুর্ভাগ্য—উচ্চতম আদর্শবিজ্ঞানই দুর্ভাগ্য। সমাজের মাথার উপরে ব্রহ্মণ্য এবং তদুপরি আবার 'ব্রহ্ম সন্ন্যাসের আদর্শ' পূজ্যমান থাকাতে এতদ্দেশের সমক্ষে কোন ন্যূনতর আদর্শপদবীর মাহাত্ম্যই দাঁড়াইতে পারে না। অধিকারভেদ প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও, অভিমানী জীব নিজের 'ন্যূনাধিকার' টুকু স্বীকার করিতে বা জীবনতন্ত্রে উহাকে মানিয়া লইতেও যেন পারিতেছে না। অনেক ক্ষত্রিয়াত্ম বা বৈশ্যাত্ম ও শূদ্রাত্মব্যক্তি জীবনে 'নিজের পথ'টুকু চিনিয়া লইতে চায় না। ফলতঃ, আত্মদৃষ্টিবিহীন দুরাকাঙ্ক্ষা এবং অধ্যাত্মক্ষেত্রেই ভেক-ভেক্ষি-ছলনা অপিচ আত্মবঞ্চনাই বাড়িয়া চলিতে বাধ্য হইতেছে; জীবনের 'শক্তি'র অসদ্ব্যবহার ও মিথ্যাচার ঘটিয়াই সমাজকে অধঃপাতে টানিতেছে। যে কারণেই হোক, ইয়োরোপ-আমেরিকার ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণ স্ব স্ব গুণকর্ম্মে সমাযুক্ত আছেন বলিয়াই তাঁহাদের সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধি।

জিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে বুঝিতে হয়, ওই উচ্চতম অদ্বৈতলক্ষ্য ও 'অধ্যাত্ম'তার সমক্ষে, বিশ্বের 'ধর্ম্ম'গতি বা 'বিশ্বনীতি'র সমক্ষে 'সংসার'বাদ এবং সাংসারিক সম্বন্ধ মাত্রেই ন্যূনাধিক 'হেয়' না হইয়া পারে না—স্বামি-স্ত্রীর যৌনসম্বন্ধ পর্য্যন্ত 'হেয়'। যাহাতে চিন্ময় অদ্বৈতংস্থী জীবন ও বিশ্বনীতিগ ও বিশ্বগত 'ব্রাহ্মীস্থিতি'র তত্ত্ব হইতে মনুষ্যের আত্মাকে চুল পরিমাণে এবং ক্ষণকালের জন্যও পরিভ্রষ্ট করে, কিংবা উহাকে বিস্মারিত করে, তাহা ত বেদপন্থীর দৃষ্টিতে কখনও নিখুঁত হইতে পারে না! অতএব, মানুষের পক্ষে দুষ্পরিহার্য্য বলিয়াই যৌনসম্বন্ধ অধিকারবাদের ছায়াতেই অদ্বৈতবাদীর ধর্ম্মশাস্ত্রে স্বীকৃত এবং সমর্থিত হইয়াছে, উহাকে 'ধর্ম্ম'আচারের আমলে আনিয়াই কথঞ্চিৎ সমর্থন করা হইয়াছে। বলিতে

'বিশ্বনীতি'র দিক্ হইতে ভারতে সাংসারিক 'শিব'-আদর্শ ও সাঙ্গীতিক 'শিব' আদর্শের সমন্বয়।

কিংবা ব্যভিচারকে, কোন 'দুর্নীতি'কে সাহিত্যের উপজীব্য 'রস'-রূপে উপস্থাপন করা ফলতঃ শিল্পের ক্ষেত্রে একটা 'মূল'তত্ত্ব-বিদ্রোহী বেরসিক কার্য্য ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। শিল্পী যখন কামানন্দ কিংবা ব্যভিচারকে শিল্পের মূল উপজীবিকা রূপে গ্রহণ করেন, তখন একটা কুৎসিত, 'অনাত্ম' কর্ম্মই করেন; তারপর, যখন কামেন্দ্রিয়ের মোহমধুময়ী উদ্দীপনাই তাঁহার শিল্পকৃতির 'উদ্দেশ্য' বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে, তখন জড়বাদীর পথে একটা কদর্য্য আমোদেরই সহায় হন; আবার যখন অহংকারে উহাকেই 'সৌন্দর্য্য' বলিয়া ঘোষণা করেন, তখন জঘন্যতার গহ্বরে আরও অধোগামী হন কিনা তাহাই বিবেচনার বিষয়। কোন 'অপকর্ম্ম' ভুলে হইতে পারে বলিয়া ক্ষমা করা যায়; কিন্তু 'অপধর্ম্মের প্রচার' পূর্ব্বক সহস্রকে অন্ধ এবং বিপথগামী করা, সহস্রের হৃদয়রক্তে একেবারে কালকূট সংক্রামিত করা!

হইবে, উহা অপরিহার্য্যের সঙ্গে ঋষির একটা 'রফারফি'—বর্ণাশ্রম তন্ত্র এই 'রফারফি'রই ফল। অন্যান্য দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র এক্ষেত্রে 'ঈশ্বরের ইচ্ছা' বা Nature প্রভৃতির উপন্যাস করিয়াই উহার সমর্থন করেন। ভারতীয় দৃষ্টিস্থান সেরূপ নহে। ভারতীয় অর্থাদর্শন বলিবে, উহা জীবের 'প্রকৃতি', সুতরাং কঠোর বিচারের বহির্ভূত; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্টভাবেই স্মরণ করাইয়া দিবে যে—"নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"। পরন্তু এই 'যৌন প্রেম'কে 'ধর্ম্ম'স্বরূপে পরিণত করিয়া, উহাকে মানবজীবনের একটা 'পরিচালনী শক্তি'রূপে কার্য্যকরী করাই অদ্বৈতসাধকের সংসারজীবনের 'আদর্শ'রূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এরূপ স্থলেই অদ্বৈতবাদীর সামাজিক 'ধর্ম্ম' বা আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম বা Moralityর মর্ম্মার্থ মোটামোটি বুঝিতে পারা যায়। এ দৃষ্টিস্থানেই Vedantic Ethics অপিচ ভারতের Literary Aestheticsও দাঁড়াইতেছে।

শেষকথা, ভারতীয় সাহিত্যসেবী মাত্রকে, আধুনিক কালে দাঁড়াইতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে বুঝিতে হইবে, যে এতদ্দেশের 'ধর্ম্ম'ই পৃথিবীতে একমাত্র Monist ধর্ম্ম (Religion)। অদ্বৈতলক্ষ্যের গতিকেই ধর্ম্মসাধনা বিষয়ে এবং সমাজজীবনে কার্য্যকরিতার বিষয়ে বেদপন্থীর অনেক শাস্ত্রসিদ্ধান্ত আপাততঃ জীবের 'প্রাকৃত' ভাব এবং নৈসর্গিক ধর্ম্মের 'বিপরীত' বলিয়া দেখাইতেছে; কিন্তু, ঐ সমস্ত বহু চিন্তা, পরীক্ষা এবং অভিজ্ঞতার ফলেই ঘটিয়াছে। বুঝিতে হইবে, ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে 'অদ্বৈত'উপলব্ধির সাপক্ষ্যে ভারতের একটা আত্মসামঞ্জস্যময় 'বিশিষ্টতা' আছে। ঐ সমস্ত সিদ্ধান্ত 'ভ্রান্ত' হইতে

আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্যে 'কাম'আদর্শের সম্পর্কজাত Realism, Naturalism, Consistent Naturalism বা Art for Art's sake প্রভৃতি আদর্শের গ্রন্থ সম্মুখীন হইলে আমাদিগকে 'অদ্বৈত'আদর্শের এই 'মাপকাঠি'টুকুই হাতে রাখিতে হয়। কবির কথায়, সাহিত্যশিল্পের যে 'রসানন্দ' তাহা ত "Emotion recollected in tranquillity !" 'অধ্যাত্ম'বাদীর আদর্শগত 'ঋত' বা 'বিশ্বনীতি'র এই Absolute Standard, এই চূড়ান্ত মাপকাঠি! উহাকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, জীবের ধর্ম্মে, সমাজে, সাহিত্যে যে ক্ষেত্রেই প্রয়োগ কর না কেন, কদাপি 'দিশাহারা' হওয়ার সম্ভাবনা নাই। অধ্যাত্মবাদীর আদর্শে জীবের যাহা 'স্বধর্ম্ম', তাহার শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাহাই 'স্বধর্ম্ম'। উহার বিপরীত চলাই 'আত্ম'হত্যা—'রস'হত্যা।

আবার, সমাজের শিষ্টাচারবিরোধী স্ত্রীপুরুষের 'সংযোগ' মাত্রই ত মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার 'প্রতিষ্ঠানে' নিন্দিত হইয়া আসিয়েছে! সামাজিক 'ভব্যতা'র দিক্ হইতে উহার মধ্যে একটা 'চুরি' আছে বলিয়াও যে উহা নিন্দনীয়, তাহা দেখিয়া আসিয়াছি। অথচ, এদিকেই ইয়োরোপের একদল লেখক 'ব্যভিচার'কে কেবল 'সামাজিক Convention' বলিয়া এবং 'স্বাধীন স্ত্রীপুরুষের গুপ্ত'মিলনে কোন 'আপত্তি' নাই বলিয়া 'প্রচার' করিতে ব্রতী হইয়াছেন! ফলতঃ

পারে; কিন্তু কেবল পরের অনুকরণে বা হেলায়খেলায় 'সংস্কার'যোগ্য যেমন নহে, তেমন, কেবল উপরিচর খেয়ালে আলোচনার বিষয়ও নহে। অন্ততঃ সাহিত্যক্ষেত্রে এ দৃষ্টিস্থান লাভ না করিলে ভারতীয় সাহিত্যসেবী স্বদেশের 'আত্মা' পরিচয় লাভ করিতে পারিবেন না, পরন্তু সাহিত্যক্ষেত্রেও 'দাসের বুদ্ধি'তে বিজাতীয়, অস্বচ্ছ এবং নিম্নপদবীর আদর্শ আঁকড়াইয়া অথবা বৈদেশিক ভাবুকতার আত্মানিক্রশিকড় বিস্তার করিয়াই তাঁহাকে দাঁড়াইতে হইবে; আধুনিকের অনাত্ম-গোঁড়ামির 'বানচালে' ও খুঁটিহীন খণ্ডদৃষ্টির খেয়ালে এবং সত্যবিস্মৃতির স্রোতের তালেই তাঁহাকে ভাসিয়া চলিতে হইবে। বিশ্বসাহিত্যের 'ভাবুকতা'ক্ষেত্রে অথবা জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি এবং বিকাশের ক্ষেত্রেও স্বদেশের আদর্শদর্শন এবং আদর্শপরিজ্ঞানের মত এমন বৃহৎফল সত্যবস্তু আর দ্বিতীয়টি নাই।

যেখানেই Art for Art's sake প্রভৃতির অতিরিক্ত ঘোষণা আছে, সেখানেই এই 'সামাজিক মামুলি' বাদের অজুহাত বিলি করিবার জন্য একটা কাকুতি গুপ্ত আছে বলিয়াই নির্ভয়ে ধরিয়া লইতে পারা যায়। মানুষ সাহিত্যকে নিজের পাপপ্রবৃত্তির সহায় রূপে পরিণত করিতে চাহিতেছে! এক্ষেত্রে ভারতবর্ষের 'চক্ষে ধূলা' দেওয়া সম্ভবপর নহে। স্বাধীন স্ত্রীপুরুষের গুপ্ত মিলনও পাপ; ভাবের ঘরে চুরি বলিয়াই উহা মনুষ্যত্বের সর্ব্ববিনাশী মহাপাতক। যদি 'স্বাধীন' স্ত্রীপুরুষের মিলনই হইবে, তবে সমাজের ক্ষেত্রে আবার ভয়সঙ্কোচ ও ঢাকাঢাকি কেন? তুমি তোমার প্রিয়জনকে নিজের সাংসারিক ও সামাজিক যশঃপ্রতিপত্তির অংশভোগী করিতে অস্বীকৃত কিংবা অপারগ কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলেই আত্মদানের কার্পণ্য, অর্দ্ধদানের নীচতা ও আত্মার ঘরেই 'বাটপাড়ি'টুকু উজ্জ্বল হইয়া উঠে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে 'চোর' সকল ক্ষেত্রেই এত ঘৃণিত, বাণীমন্দিরে তাহার জীবনীর আলোচনা এত পরিমলবাহী এবং উল্লাসকর হইয়া উঠিতেছে!

ফলতঃ Art for Art's sake শুনিলেই মনে হয়, বক্তা Art এর আদর্শ বিষয়ে কিছুই যেন স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাহেন না। উহাতে বরং প্রকারান্তরে যেন এ'কথাই দাঁড়াইতেছে যে, তাঁহার এই Art 'has no right to exist'; বক্তার নিজের 'মনের কথা' টুকু খুলিয়া বলিতেই যেন একটা লজ্জা আছে! সাহিত্যের এ সকল আদর্শ কেবল জীবের ধর্ম্মবুদ্ধির সমক্ষে 'ইহজগৎ'কেই যে চূড়ান্ত লক্ষ্যরূপে উপস্থিত করিতেছে এমন নহে, পরন্তু সাহিত্য ও শিল্পের দ্বারা নিজের পাপাভীষ্টের মোসাহেবিটুকুও করাইয়া লইতে চাহিতেছে। নচেৎ সত্যশিবসুন্দরের ভাবগত রসাদর্শ হইতে স্বতন্ত্র একটা নামকরণের দরকারই ত ছিল না। বরং ইংরেজী কথাতেই বিশেষিত করিয়া বলিতে পারি যে—Realism নহে, Realityই সকল শিল্প-সাহিত্যের লক্ষ্য। Realism প্রভৃতি প্রণালী প্রত্যক্ষসিদ্ধ জড়তাকে এবং ইহসংসারকেই চূড়ান্ত চিন্ত্যরূপে উপস্থিত করে; ঐ সমস্ত বিশ্বনীতির

বিদ্রোহী, সত্য ও অমৃতের ব্যভিচারী; অতএব সাহিত্যশিল্পের স্বধর্ম্মেরও ব্যভিচারী। (১)

বর্ত্তমান কালে সরস্বতীর মন্দিরেই সত্যশিবসুন্দরের শত্রু অনেক। কেবল সাহিত্যাদর্শের Theoryর বাধ্য হইয়া নহে, কিংবা আত্মমতংবী 'কায়দার ঝোঁকে' পড়িয়াও নহে, অনেক আধুনিক লেখকের প্রাণটাই, যেন আন্তরিক ধর্ম্মে, জীবনাদর্শে 'শিবসুন্দর' তত্ত্বের বিদ্রোহকেই 'স্বধর্ম্ম' এবং পরম কর্ত্তব্যরূপে অবলম্বন করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে বার্ণার্ড শ'য়ের কথা উল্লেখ করিয়াছি; তিনি সাহঙ্কারে আপনাকে Immoral Writer বলিয়াই পরিচয় দেন। মানুষের সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম ও Moralityর প্রতি বেপরোয়া সাহসে এবং প্রকাশ্যভাবে তিনি বিদ্রূপবাণ বৃষ্টি করিতেছেন; জড়বাদিতা ও জড়তন্ত্রের 'সুখ'

(১) পূর্ব্বেও বলিয়াছি যে, ভারতবর্ষীয় এই অধ্যাত্মবাদ এবং 'অখণ্ডদর্শন'ই অষ্টাদশ শতাব্দীর জর্ম্মন দার্শনিকগণের মধ্য দিয়া মোটামোটি 'জর্ম্মন আইডিয়ালিজম' রূপে সমগ্র ইয়োরোপের আধুনিক দর্শনক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। উহাই ইংলণ্ডে আসিয়া ব্লেক, ওয়ার্ডসোয়ার্থ, শেলী প্রভৃতি কবি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাউনীং টেনিসনের সকল বিশিষ্টতার মূলে রহিয়াছে; অধুনা ইয়োরোপের প্রধান কবিমাত্রের মধ্যেই কিছু-না কিছু প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সাহিত্যে 'আইডিয়ালিজম' বলিয়া কথাটি এই অদ্বৈতবাদের একটা ধারা ব্যতীত আর কিছুই নহে; খ্রীষ্টানগণ উহাকে Pantheism নাম দিয়া নিন্দা করিতে চেষ্টা করিলেও, আমরা দেখিতেছি, তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ভারতীয় আর্যদৃষ্টির এই 'অদ্বৈত ঝোঁক'ই ইয়োরোপের সকল চিন্তাশীল দার্শনিক ও সাহিত্যসেবীর মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। উহাকেই এখন সকল সভ্যসাহিত্যের পরম তৃষ্ণাবিষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। তারপর, Spiritualism বলিয়া যে ব্যাপারটি নানা আকৃতিতে আধুনিক ইয়োরোপ ও আমেরিকার অন্বেষ্টব্য বিষয়রূপে প্রবল হইয়া চলিয়াছে, তাহা ত নানাদিকে ভারতীয় 'অধ্যাত্মবাদী ঋষি'রই সিদ্ধান্ত-সম্মত। বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীতে উহাই হয়ত মনুষ্যের প্রাণান্তিক অনুসন্ধানের বিষয়রূপে দাঁড়াইবে। উহার ফল পাকিলে সে সকল দেশের সাহিত্য, ধর্ম্ম, সমাজ ও পরিবার প্রভৃতির আদর্শে যে একটা সর্ব্বাভিভাবী বিপ্লব সংঘটিত হইতে পারে, তাহা বলাই বাহুল্য।

ব্যতীত জীবনের অপর সর্ব্ববিধ ভাবগত লক্ষ্য অথবা 'উচ্চ আদর্শ'কেই তিনি কুঞ্চিত নাসিকায় অগ্রাহ্য করিতেছেন! বার্ণার্ড শ' নীজ্জের (Nietzsche) শিষ্য; গুরুশিষ্য উভয়েই মানুষের 'ধর্ম্ম'ও 'কর্ত্তব্য' বস্তুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন! দয়া ও সদাশয়তা প্রভৃতি নাকি রোগজীর্ণ ভীরুতার লক্ষণ; মহাপুরুষ (Superman) মাত্রেই এ সমস্ত দুর্ব্বলতাকে পদদলিত করিয়াই নাকি অম্লান মুখে, স্বার্থসিদ্ধির পথে চলিতে থাকিবেন; আত্মোৎসর্গ ও আত্মত্যাগ প্রভৃতি বেকুবের কুপরামর্শ—এসমস্ত ইঁহাদেরই কথা। "Compassion is the greatest stumbling block"—ইহা নীজ্জেরই 'বাণী'। নিজের চরিত্রে অথবা সাহিত্যিক চরিত্রাঙ্কনে ধর্ম্মঘৃণা, জগদ্ঘৃণা অথবা জগদ্বিদ্বেষ প্রকাশ করাকেই যে প্রধান লক্ষ্যরূপে ধরিয়াছেন তাদৃশ লেখকেরও ইয়োরোপে অভাব নাই। 'ধর্ম্মের জয়'এর পরিবর্ত্তে 'অধর্ম্মের জয়' অথবা মিথ্যার সর্ব্ববিজয়া মহাশক্তির বার্ত্তা প্রচার করিয়াই বিস্তারিত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তেমন শক্তিশালী লেখকেরও অভাব নাই। অবশ্য ফরাসীক্ষেত্রেই এতাদৃশ স্বাধীনতা এবং অহমিকা-মুখর মৌলিকতার আস্পর্দ্ধা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কোন সমালোচক বলিয়াছেন, মৌলিকতার পূজারী সুসভ্য প্যারী নগরীতে প্রায় প্রত্যেক পাঁচ বৎসরেই নাকি সাহিত্যের এক একটা নূতন আদর্শ (পানা শেওলার মত?) দল বাঁধিয়া গজাইয়া উঠে এবং জঞ্জাল বাঁধিয়া দাঁড়ায় এবং অচিরেই বিলীন হইয়া যায়!

৯৮। আপন চরিত্রের মূল প্রকৃতির বশে ও নিরঙ্কুশ ভাবে আত্মমত প্রকাশের সাহসে 'শিবসুন্দর' তত্ত্ব-বিদ্বেষী এবং জগদ্বিদ্বেষী লেখকগণ—বার্ণার্ড শ, বদ্লেয়র, বায়রণ, বয়ার, নুট হান্‌সম্, অস্কার্ ওয়াইল্‌ড প্রভৃতি।

জগদ্ঘৃণা এবং নরবিদ্বেষকেই যেন মূল 'উপজীব্য'রূপে ধরিয়াছিলেন একজন শক্তিশালী বাণীশিল্পী—বদ্লেয়র। বদলেয়রের কবিতা 'অশুভ'-বাদে এবং জগতের 'পাপতত্ত্ব' দর্শনেই পরিপূর্ণ। এই অপূর্ণ জগতে পূর্ণতার কোন আদর্শ দেখাইয়া নহে, জগতেরএই অন্ধকারমধ্যে সুদূর অথবা সমাগত কোন জ্যোতির সংবাদ দিয়া নহে, কেবল মানবজীবনের

ঘৃণ্যতা ও নিজের জগদ্বিদ্বেষ দেখাইয়া! কোন 'আশার বাণী' অথবা ধর্ম্মের কোন 'উচ্চ আদর্শ'সংবাদ বদ্‌লেয়রের মধ্যে নাই; বরঞ্চ সর্ব্ব-প্রকার পুণ্যের অন্তর্মর্ম্মে পাপ ও জঘন্যতা দেখিয়া অপিচ পাপের মর্ম্মস্থিত পুণ্যলক্ষণে সঙ্কেতাঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াই বদ্‌লেয়র সন্তুষ্ট। জগতে পরিভ্রমণ করিতে করিতে উহার পরিদর্শক বলিতেছে—

৯৯। বদ্‌লেয়র ও জীবন-বিদ্বেষ।

> O bitter knowledge that the wanderers gain !
> The world says, own own age is little and vain ;
> For ever, yesterday, to-day, to-morrow
> T'is horror's Oasis in the sands of Sorrow.

কবি সংসারকে দেখিতেছেন একটা প্রজ্বলিত নরককুণ্ড! তাঁহার এই সংসারে সর্ব্বপ্রথম মায়ের অভিশাপ মাথায় করিয়াই নাকি সন্তানটির জন্ম; উহার পর জীবনময় তাবৎ আত্মীয়জন ও সামাজিক সম্বন্ধের 'বন্ধুবান্ধব'গণ কেবল হতভাগ্য জীবটির প্রতি দুর্ব্বিষহ শাস্তিসন্ধান ও জ্বালাযন্ত্রনা সরবরাহের জন্য মূর্ত্তিমান্ যমকিঙ্কর রূপেই দাঁড়াইয়া যায়! 'সহধর্ম্মিণী' ত স্বয়ং বস্ত্রাভরণ-ভূষিতা, মনোরমা কালসর্পিণী! অল্প কথায়, জগতের যাবতীয় ভালমন্দ 'সম্বন্ধ' কেবল জীবকে নব নব যন্ত্রনায় নিষ্পেষণের জন্য নব নব যন্ত্রোপকরণ ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে। কবরস্থান এবং বিগলিত কবরকুক্ষিনিবাসী কৃমিকীটপুঞ্জই বদ্‌লেয়রের প্রেমকবিতার 'রস'বিষয় যোগাইতেছে; মনুষ্যহৃদয়ের পাপ-তাপ-দুঃখ ও দুর্বৃত্ততাই তাঁহাকে কবিকর্ম্মের অনুপ্রাণনা এবং প্রেরণা দিতেছে। বদ্‌লেয়রের Love and Corpse কবিতাটি জগৎতন্ত্রের হৃদয়নিহিত গুপ্ত ক্ষতস্থানটুকুই অনাবৃত করিতেছে অনুপম ভাষায় ও মনোরম ছন্দে। এই বদ্‌লেয়র হইতে আধুনিক সাহিত্যে Decadent School of Poetryর জন্ম; ভার্লেন প্রভৃতি তাঁহারই শিষ্য। হুগো বদ্‌লেয়রের Seven old men ও Five little old women কবিতা পড়িয়া নাকি ডাকিয়া উঠিয়াছিলেন "He has created a new

shudder !" বদ্‌লেয়রের পরবর্ত্তিতাসূত্রেই 'লোমহর্ষণ সাহিত্য'সৃষ্টির নূতন একটা ধারা সাহিত্যসংসারে চলিয়া আসিতেছে।

কোন কারণ বিনা এবং কোন উন্নততর আদর্শ স্থাপনার উদ্দেশ্য বিনা মানুষের প্রেম, আনন্দ ও সৌন্দর্য্য প্রভৃতি আদর্শের উপরে, মানুষের ধর্ম্ম, পুণ্য, এবং অমৃত আদর্শের উপরে এমন উগ্র ও তীব্র বিদ্বেষবিষ অন্য কোন কবিই উদ্গার করিতে জানেন নাই—

Angel of Gaity, have you tasted grief ?
Angel of Kindness, have you tasted Hate ?
Angel of Health, did you ever know Pain ?
Angel of Beauty, do you wrinkles know ?

প্রশ্নের 'চাল' হইতেই বুঝিতে পারি, উত্তরটুকু কি হইবে। 'পাপের ফুল' কাব্যের [illegible]টাই দেখাইয়া দিতেছে যে, এমন 'নিষ্কাম' ভাবের জীবন-বিদ্বেষী ও [illegible]বিদ্বেষী কবি আর জন্মে নাই।

আবার, সাহিত্যজগতে বদ্‌লেয়র Lover of the artificial বলিয়াই বিখ্যাত। তাঁহার দৃষ্টিতে স্বভাবই (Nature) মনুষ্যের মহা শত্রু ! তিনি কৃত্রিমতার পূজারী। "Powder, Rouge and cosmetic"—এ সমস্তের মধ্যেই নাকি সৌন্দর্য্যের যেটুকু 'রহস্য' ! এতদ্দেশের রস-দার্শনিকগণ 'বীভৎস'কেও একটা 'স্থায়ী ভাব' বলিয়া চিনিয়াছেন। মালতীমাধবের 'শ্মশান'দৃশ্যে এবং বেণীসংহারের 'বসাগন্ধা ও রুধির প্রিয়'র মধ্যে ন্যূনাধিক বহিস্তন্ত্র একটা 'বীভৎস রস'সৃষ্টির চেষ্টা আছে। কিন্তু অধ্যাত্মক্ষেত্রেই, বদ্‌লেয়রের ন্যায় এমন বিভীষিকাময় বীভৎসের এবং এমন লোমহর্ষণ জুগুপ্সিতভাবের সৃষ্টি ! কবি হায়েনের প্রেমকবিতার মধ্যে স্থানে স্থানে 'বদ্‌লেয়রী' গন্ধ আছে। প্রেমের প্রতিদান না পাইয়া বিজাতীয় ক্রোধে ও বিষাক্ত ব্যঙ্গবুদ্ধির বশে হায়েন কবি তাঁহার 'প্রিয়তমা'কে কবরের 'কৃমিকীটের চুম্বনযোগ্য'রূপে বর্ণনা করিয়াই সুখী হইয়াছেন ! নায়িকা তাঁহার সঙ্গে নৃত্য করিতে স্বীকৃত [illegible]নাই, তাই তিনি মনের দুঃখে মরিয়া, ভূত হইয়া রাত্রিতে

কুৎসিত অস্থিকঙ্কালময় দেহে নাচিতে নাচিতে ভীতবিস্মিত সুভাগিনীকে বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতেছেন; উদগ্র দন্তবিকাশ-বিহসিত কঙ্কালের মুখেই বিরুদ্ধা নায়িকার সেই সুন্দর কপোলে চুম্বন মুদ্রিত করিতেছেন। কি হৃদয়বিদারী প্রেমাভিসার! ভর্ত্তৃহরির বৈরাগ্যশতকের সঙ্গে বদ্‌লেয়রের প্রেমকবিতা গুলির আপাতদৃষ্টিতে সাধর্ম্ম্য আছে। কিন্তু ভর্ত্তৃহরি মানবাত্মার অমৃতত্বে বিশ্বাসী; তিনি সেই 'অমৃত'রসে মাতাল হইয়াই ইহজগতের ইন্দ্রিয়সম্পত্তির এবং মাত্রাস্পর্শের উপরে বৈরাগ্য অনুভব পূর্ব্বক জড়তাকে একেবারে উড়াইয়া দিতেছেন। চরমপন্থী অধ্যাত্মবাদীর ন্যায় সংসারতন্ত্রের এমন প্রচণ্ড বিদ্রোহী এবং Revolutionist আর কেহই ত হইতে পারেন না! বলিতে হইবে না যে, বদ্‌লেয়রের সেরূপ কোন অধ্যাত্মবিশ্বাস নাই। প্রেমকবিতার ক্ষেত্রেও বদ্‌লেয়র কেবল বিরূপ ভাবুকতা ও অকপট বিদ্বেষের দীপ্তিজ্বালায় শাণিত ছুরির মতই ঝক্ ঝক্ করিতেছেন! 'পাপের ফুল' কেবল তীব্রতীক্ষ্ণ বিষগন্ধ এবং দুর্গন্ধ বিস্তার করিয়াই চিত্তাকর্ষক হইতেছে—'বরাহক্রান্তা'র পুষ্পের মতই আপাতলালিত্য ও সৌন্দর্য্যের বক্ষঃস্থল হইতে একটা উৎকট দুর্গন্ধ! প্রতিদান-বিমুখী প্রিয়তমার ওই সৌন্দর্য্য, তাহার অধর ও কপোলের ওই লালিত্য একদিন গলিত শবাকার লাভ করিয়া 'কিলিবিলি'ময় কৃমিকীটের রসাক্ত চুম্বন ভোগ করিতে থাকুক—এরূপ সচ্চিন্তা এবং স্বাধীন চিন্তা লইয়াই তাঁহার প্রেমকবিতার রসতন্ত্র।

বলিতে হয় যে, বদ্‌লেয়রের কবিতা একটা 'অশুভ' কটাক্ষলক্ষণে সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে থাকিলেও, একটা নূতন ধরণের রোমহর্ষণ উঠাতে থাকিলেও, উহাকে বাস্তবিক পক্ষে পাপের সাহায্যকারী কিংবা প্রকৃত 'অমঙ্গল্য' বস্তুরূপে নির্দ্দেশ করা হয়ত চলে না; তবে, তাঁহাকে প্রেমাস্পদ কবিরূপে আলিঙ্গন করাও চলে না। "Flowers of Evil" কাব্যের নাম হইতেই বুঝিতে পারি যে, উহার কবি সাহিত্য-জগতের চিরাগত শ্রেষ্ঠ কবিগণের সমজাতি নহেন। উহা নিজের

অন্তরাত্মার একটা সবিশেষ জরজীর্ণ ও দূষিতপিত্ত-জর্জ্জর প্রতিভা। জীবনবিদ্বেষ ও জগতের প্রতি বিতৃষ্ণাই এ জরপিত্তের প্রধান লক্ষণ— তবু কিন্তু 'প্রতিভা'। এই প্রতিভা-উদ্যানের পুষ্পসম্ভারও কেবল 'শ্মশানের ফুল'—রূপরসগন্ধে সময় সময় চিত্তাকর্ষক হইলেও, পবিত্র নহে। এ ফুল গৃহে আনা যায় না; দেবতাকে কিংবা প্রিয়জনকে 'উপহার' দেওয়াও চলে না। উহা একদিকে অতুলনীয় বাক্যশক্তিতে এবং উপস্থাপনার মাহাত্ম্যেই চিত্তকে আকৃষ্ট করে; অন্যদিকে, উহার সংস্পর্শে পাঠকের অন্তরাত্মা নিজকে অশুচি বলিয়াই অনুভব করিতে থাকে এবং পুণ্যস্নানের জন্যই লালায়িত হইয়া উঠে।

বলা বাহুল্য, আধুনিক সাহিত্যে বদ্‌লেয়রের সমান দরের 'শ্মশানের ফুল' রচনাপটু প্রতিভা না থাকিলেও সমজাতীয় মালীর অভাব নাই। প্রকৃত কবিপ্রতিভা—অথচ অস্পৃশ্য!

১০০। বায়রণ ও ধর্ম্ম-বিদ্বেষ।

আবার, মানুষের যাহা কিছু 'ভাল' সে সমস্তকে উল্টাইয়া দিয়া, যাহাতে তাহার প্রাণের বল ও জীবনের অন্ধকারপথে যাহা অন্ধজীবের নির্ভর যষ্টি তাহাকে কাড়িয়া লইয়া আনন্দলাভ করা, মানুষকে ফাঁকি দিয়া ভাবুকতার খোশামোদ পথে 'তেপান্তরের মাঠে' লইয়া গিয়া গভীর রাত্রিতে গা ঢাকা দেওয়া এবং আড়ালে আড়ালে করতালি দিয়া দুর্দ্দান্তভাবে হাস্য করিতে থাকা, মানুষকে ধ্রুব-দর্শনের জন্য ভাবুকতার মানমন্দিরে তুলিয়া তাহার অজানিতে ভিত্তিমূলে ডিনেমাইট বসাইয়া সমস্ত উড়াইয়া দিয়া পরম অহমিকার কৌতুকে আস্ফালন করা—এ সমস্ত লইয়াই যেন কেইন্ ও ম্যান্‌ফ্রেড্ ও Deformed Transformed প্রভৃতির কবি বায়রণ। এত বড় কবি, এত বড় হৃদয়জীবী প্রতিভা, তবু ভিতরে ভিতরে ইহাই যেন বায়রণের হৃদয়ের প্রধান ঝোঁক্। এই দুর্দ্দময়তা—সাহিত্যে জাজ্বল্যমান এই অশুভবুদ্ধি—মূর্ত্তিমান্ এই 'অশিব' বাদ! বায়রণের এ সমস্ত নাটকের বুকে যাঁহারা কাণ পাতিয়া শুনিয়াছেন, এরূপ নিদারুণ

ধর্ম্ম-বিদ্বেষ ও জীবন-বিদ্বেষের দুর্গন্ধ এবং মনুষ্যের অমৃতাশা ও অধ্যাত্ম আকাঙ্ক্ষার হত্যাজনিত নিদারুণ একটা পূতিগন্ধই তাঁহারা লাভ করিবেন। সমস্তের 'ধ্বংস' অথচ উহার স্থলে কিছুমাত্রের 'প্রতিষ্ঠা' নাই। ছিন্নমস্তা রীতির এই রসসিদ্ধি—মানুষকে ফাঁসিকাঠে ঝুলাইয়া দিয়া কৌতুকানন্দ উপভোগ করার একটা প্রবৃত্তি! খ্রীষ্টধর্ম্মের 'স্বর্গ'রাজ, 'আদিম পাপ' ও মনুষ্যের 'স্বর্গ ভ্রংশ' প্রভৃতি আদর্শ বিশ্বাস করিতে না পারিয়াই যে বায়রণ এরূপ গ্রন্থগুলি দুর্দ্দম প্রতিবাদ-স্বরূপে লিখিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ হয় না। কিন্তু, কেবল ত খ্রীষ্টানীর বিদ্বেষ নহে, খ্রীষ্টানীকে ভাঙ্গিয়া, সর্ব্বপ্রকার বিশ্বাস ও নির্ভরের ধ্বংস-সাধন-পূর্ব্বক বিঘোর মহাসমুদ্রে মনুষ্যকে ভাসাইয়া নির্ম্মমভাবে কৌতুক করার ঝোঁকটাই সঙ্গে সঙ্গে, বায়রণের নির্ঘৃণ ব্যঙ্গ্যকৌতুক (Satiric) রীতির ফলস্বরূপে প্রকাশ পাইতেছে।

শেলীও ত অখ্রীষ্টান ছিলেন; প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্মের বিদ্বেষী এবং স্বকীয় সমাজের অনেক প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসকামী ছিলেন। তথাপি, তিনি ছিলেন সংস্কারকামী এবং তাঁহার একটা প্রতিষ্ঠাপনার লক্ষ্যও ছিল। প্লাতোর Eternal Ideas of Beauty and Loveই যে জগৎ-চালয়িত্রী মহাশক্তি, ইহা শেলীর বিশ্বাস ছিল; এবং কোন প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসকর্ম্মে কেবল অহমিকার কৌতুকই তাঁহার মধ্যে মুখ্য ছিল না। শেলীর Necessity of Atheism ও Revolt of Islam প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক খ্রীষ্টানগণের চিত্তে আঘাত দিয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রমীথেযুসে সত্যনিষ্ঠা ও জগতন্ত্রে ন্যায়প্রতিষ্ঠার আদর্শই জয়ী হইয়াছে—এমন কি, Cenciতেও উহাই ত বিজয়ী। নিজের Perfectionism আদর্শই শেলীকে বায়রণের দুর্দ্দমতা হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

বায়রণ কোনদিকে 'হেতু যুক্তি'চিন্তায় কৃতী অথবা গভীরগাহী দার্শনিক ছিলেন না; অথচ ধ্বংসের কার্য্যে তাঁহার অপরিসীম উৎসাহ ও আনন্দ। সঙ্গে সঙ্গে কবিপ্রতিভার অসামান্য পরিকল্পনাশক্তি ও প্রয়োগের

কৌশলটাও বায়রণের ছিল। কিন্তু এক দৌড়ে কেবল ধ্বংস করিয়াই লোকটি যেন হাঁফাইয়া পড়িতেন; কোনরূপ 'গড়িবার শক্তি' কিংবা ঝোঁকও বায়রণের মোটেই ছিল না। ফরাসী বিপ্লবের ধ্বংসশক্তির ও অহমিকার মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ এই বায়রণ! ভল্‌টেয়ারের ন্যায় অপরিসীম বিদ্রূপ করার শক্তি বায়রণের আছে; তাঁহার Theismটুকুরই কেবল অভাব। ফরাসী বিপ্লবের সকল উন্মত্ততার তলে তলে সকল "Red Fool Fury'র আড়ালেও একটি 'প্রতিষ্ঠা'র লক্ষ্যই কার্য্য করিয়াছে—আপাতদৃষ্টিতে যাহাই প্রতীয়মান হউক। তাই, এতাদৃশ একটা ভীষণ 'বিপ্লব' হইতেই মানবজাতির অদৃষ্টে, মানুষের রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্ম্মে, এবং সাহিত্যেও এত নবসৃষ্টির গোড়াপত্তন ঘটিতে পারিয়াছে।

সাহিত্য সাম্প্রদায়িক কোন সঙ্কীর্ণ ভাব মানে না; শিল্পক্ষেত্রে আদর্শবিশেষের ধ্বংসকেও বহিষ্কৃত করে না। কিন্তু ধ্বংসকার্য্যেও অকপট 'শিব'বুদ্ধি ও High Seriousness চাই। মানুষের সর্ব্বস্ব বিনাশ করিয়া কেবল হৃদয়হীন রসিকতা ও ঘাতকী অহমিকা এবং কৌতুক-কোলাহলের জন্য বাণীমন্দিরে কোন স্থান নাই। যে কবি নিজের কিছু একটা নির্ভরভিত্ত পাইয়াছেন তিনিই উহার মাহাত্ম্য-প্রচারের পক্ষপাতে অপরের ভিত্তিমূলে হস্তার্পণ করিতে পারেন। জগদ্‌ব্যাপারের সেরূপ কোন 'মর্ম্মার্থ' যে কবি স্বয়ং দেখিতে পান নাই, সরস্বতীর মন্দিরে তাঁহার মুখ খোলার স্বত্বই নাই। কেবল 'ধর্ম্ম'ধ্বংস উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করিলেই তিনি হইবেন আততায়ী এবং দুর্ব্বৃত্ত।

কেবল সাহিত্যে কেন, সমাজে, ধর্ম্মে, দর্শনে, সমালোচনায় সর্ব্বত্র দোষদর্শী ও ধ্বংসকর্ত্তা অপেক্ষা 'আদর্শের স্রষ্টা'র গৌরবই যে সমধিক তাহা কি আর বলিতে হয়? বায়রণের প্রবল ভাবুকতাময়ী প্রতিভার মধ্যে নির্লক্ষ্য ব্যঙ্গকৌতুক ও ধ্বংসবুদ্ধিই মুখ্য ছিল; উহাতেই যেন কবিকে শেলী-কীট্‌স্-ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থ অপেক্ষা নিম্নের আসনে টানিতেছে। তবে বায়রণ মহাপ্রাণ পুরুষ এবং সাহিত্যে অনুপ্রাণনী-শক্তিতে

অতুলনীয় তাঁহার বাণীপ্রতিভা। পাত্রী আদর্শের খ্রীষ্টানীকে তাঁহার রচনা যতই আঘাত করুক না কেন, আমরা দেখিতেছি, 'মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচার'-বুদ্ধিই তাহাকে সাম্প্রদায়িক সমাজ এবং ধর্মক্ষেত্রে এরূপ একটা 'দোমুখো কাটারি' চালাইতে প্রেরিত করে। এ'কালের Revolutionist's Hand Book প্রণেতা বার্ণার্ড্ শ'এর ন্যায় কেবল গণ্ডচক্রান্তকৌশলী লেখকের সঙ্গে অথবা যাঁহারা সাহিত্যে আপন অন্তরাত্মার বিষাক্ত প্রবৃত্তির বশেই মানুষের উচ্চ আদর্শের ধ্বংশ এবং ধর্মঘাতনার কশাইখানা খুলিয়াছেন বলিয়াই ধারণা হয় তেমন লেখকদের একসূত্রে প্রতিভাপুত্র বায়রণ ও শেলী প্রভৃতির নাম উচ্চারণ করাও 'পাঠক'রূপে পরিগণিত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন, নাট্যলেখক বার্ণার্ড্ শ এবং তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে কেবল সমাজের সাময়িক ও উপরিচর-রোগ-কবিরাজীর একটা ঝোঁকই ত মুখ্য হইয়াছে! শ'এর পরিণত মনের রচনা Superman ও Back to Methusaleh—উহাদের মর্ম্মও কেবল একটা 'সুপ্রজনন'বাদ ও 'সুখস্বাস্থ্যময় দীর্ঘজীবন'বাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাঁহার সকল গ্রন্থই নিরেট 'সাময়িক' ধর্ম্ম ও দেশকালের সঙ্কীর্ণতার মোহরমুদ্রিত কেবল এক একটি 'তারিখী' পদার্থ। মানবাত্মার কোন চিরস্থায়ী কিংবা মহনীয় 'ধর্ম্ম'ধারণা যাহাদের হৃদয়কে কদাপি উদ্দীপ্ত করে না, কেবল অস্থতনী সমাজসমস্যাই যাহাদের সমক্ষে মুখ্য হইয়া আছে, তাহাদিগকে 'উচ্চশ্রেণীর শিল্পী'-আখ্যায় পরিচিহ্নিত করিতে আমাদের 'হৃদয়'ই যেন বিবাদী হইয়া দাঁড়ায়। অস্থচন ও চিরন্তনের পার্থক্যবুদ্ধিতে যাঁহার প্রাণ সচেতন নহে, শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে উচ্চশ্রেণীর 'কবি' কিংবা 'পাঠক' হইবার পক্ষেও তাঁহার কিছুমাত্র যোগ্যতা নাই। আমাদের কালিদাসও ত কাহারও অপেক্ষা ন্যূন 'ভাবুক' নহেন এবং তিনি দোষদর্শীও কম ছিলেন না। 'দোষজ্ঞ', দ্রষ্টা এবং সঙ্গে সঙ্গে 'স্রষ্টা' ছিলেন বলিয়াই কালিদাস জীবনতন্ত্রে ভারতীয় বর্ণাশ্রমী কর্ষণার 'আদর্শ'কে পরম ব্যক্তমূর্ত্তিধর প্রতিমারূপে রঘুবংশকাব্যে খাড়া করিয়া গিয়াছেন। কবি কেবল সমাজের দোষ-

দার্শনিক কিংবা Sentimental 'বক্তৃতাবাগীশ' মাত্র হইলে রঘু-কুমার-শকুন্তলার জন্মই ঘটিত না। ব্যবহারিক ধর্ম্মে, সমাজে কিংবা রাষ্ট্রতন্ত্রে সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা ও চরমপন্থী 'গোঁড়ামী'ই (orthodoxy) যে ন্যূনাধিক ভ্রান্ত, সকল 'স্বপক্ষ'কথার বিপরীত পাল্লায় যে এক একটা 'বিপক্ষ'কথা আছে, এ' সকল ক্ষেত্রে কোনপ্রকার 'নিয়তবিধি' (Categorical Imperative) যে হইতে পারে না, সর্ব্বপ্রকার সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠানই যে কোন-না-কোন দিকে Irrational এবং Apologetic হইতে বাধ্য, সত্যদৃষ্টির প্রতিভাশালী কবিমাত্রেই সহজাত বুদ্ধিতে সেদিকে সচেতন থাকেন। সত্যে 'সম্যক্ দৃষ্টি' এবং বিশ্বে সহানুভূতি-যোগের ভাবকেন্দ্রটুকু না পাইয়া কোন 'সৃজনী প্রতিভা'ই কি মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে? অতএব, উচ্চশ্রেণীর কবিগণ কেবল 'বিরুদ্ধ সমালোচনা' অথবা ধ্বংসকে মুখর না করিয়া, ঐ সকল ক্ষেত্রেও (অন্বয়ী অথবা ব্যতীরেকী ভাবে) আদর্শেরই 'সৃষ্টি' করিয়া যান; অমরত্বকামী শিল্পী মাত্রেই দেশের কিংবা কালধর্ম্মের ক্ষণবিধ্বংসী চোরাবালি ছড়াইয়া জগতের হৃদয়গত, নিত্যকালীয় সত্য ও তত্ত্ব-(Positive) বস্তুকে মুখ্য করিয়াই তদুপরি শিল্পের স্থায়ী ভাবের প্রমূর্ত্তি মন্দির পত্তন করেন। দোষদর্শন একদিকে ত আছেই! প্রত্যেক আদর্শ-স্থাপনার পশ্চাতে উহার বিপরীত আদর্শের 'বিনিক্ষেপ' এবং 'বিনিকার' বুদ্ধি কার্য্য করিয়াই শিল্পের প্রমূর্ত্তিকে সন্নদ্ধ এবং সার্থক করিয়া তোলে।

আর এক রকমের গ্রন্থ রচিত হইতেছে যাহাদের কোন অশিব উদ্দেশ্য মুখর নহে; আপাততঃ একটা 'সত্যবাদিতা'ই (Realism) যাহাদের লক্ষ্য। উহাদের মধ্যে কোনরূপ মতামতের আস্ফালন যেমন নাই, তেমন কোনরূপ পরাক্রমী দুর্নীতিও নাই বলিয়া উহারা নিন্দিত হইতেছে না। একটা উলঙ্গ ভাব উহাদের মধ্যে আছে; অথচ আদম ও ঈভার মত একটা নৈসর্গিক

১০১। নুট হান্‌সনের Growth of the Soil ও Hunger নবেলের দর্শনান্ধ 'সত্য'বাদ।

এবং 'বুনো রকমের উলঙ্গতা' বলিয়াই উহা বেদনাদায়ক হইতেছে না। নুট্ হান্‌সমের Growth of the Soil উপন্যাস মনুষ্যের এরূপ একটা উলঙ্গ এবং নৈসর্গিক জীবনকাহিনীই উদ্দেশ্য করিয়াছে—বনের পশু-পক্ষীর মত, নিসর্গের গাছপালার মত, সর্ব্বপ্রকার আধ্যাত্মিক ক্ষুধা-তৃষ্ণার 'কামড়ি' বিষয়ে একেবারে অচেতন ভাবেই একটা জীবন-যাপন! পরস্পর অপরিচিত পূর্ব্ব দু'টি স্ত্রী-পুরুষ কেমন করিয়া সহজে 'জুড়ি মিলিয়া' গেল, কেমন করিয়া গহন জঙ্গলে লাঙ্গল চালাইয়া নিসর্গের পশুপক্ষীর শত্রুতাসঙ্গে যুদ্ধ করিয়া, জয়ী হইয়া, ঘর বাঁধিয়া, সংসার পাতিয়া বসিল; পুত্রকন্যার জন্মদান করিয়া একটা বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার গড়িয়া তুলিল; ধনধান্যে শ্রীসম্পন্ন ও সুখসমৃদ্ধিমান্ হইয়া দাঁড়াইল, তাহারই একটা কাহিনী। মহৎ বলিতে বা মহিমান্বিত বলিতে পারা যায় তেমন কোন ব্যাপারই নহে। তবে, উহা মনুষ্য-প্রকৃতির অশিক্ষিত সহজধর্ম্মের মাহাত্ম্যপরিচয়োজ্জ্বল একটা 'জীবন-কাহিনী'—এদিকে বরং একটা Ideal Realismএরই দৃষ্টান্ত। এই যে একজোড়া মানুষ, উহারা অবশ্য মনুষ্যজাতির কালক্রমোত্তীর্ণ সামাজিক সভ্যতার গর্ভজাত এবং উহারই স্তন্যপরিপুষ্ট 'আধুনিক' মানুষ। মনুষ্যের কালোপচিত ধর্ম্ম এবং সামাজিক ও পারিবারিক উচ্চ আদর্শের ছায়া হইতে কিঞ্চিৎ দূরদেশে, অপেক্ষাকৃত বিজনপ্রদেশে কিরূপে মানুষ আত্মপ্রকৃতির সাহজিক ধর্ম্মেই ঋদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে, একেবারে নিরেট 'পশু' না হইয়াও পারে, এ গ্রন্থ যেন তাহারই একটা প্রমাণব্যাপার। Growth of the Soil নামটির অন্তরাল হইতে গ্রন্থকারের এই অভিসন্ধি এবং প্রতিজ্ঞা যেন উঁকি দিতেছে! পুরুষটা সাহসী, বলিষ্ঠ, কর্ম্মঠ এবং অনাবশ্যক স্থলে রূঢ় অথবা ক্রূরও নহে; আপনার সহজ প্রকৃতিতেই সদ্ভাবাপন্ন; অপ্রয়োজন কোন হিংসা অথবা পাপবুদ্ধিও তাহার নাই; আপনার শক্তিই তাহাকে ক্ষমাশন্ন করিয়াছে। স্ত্রীলোকটাও কর্ম্মিষ্ঠা, দৈনন্দিন জীবিকার্জ্জনের শ্রমকর্ম্মে পুরুষটার সহকর্ম্মিণী এবং শ্রমবিনোদিনী। তাহার

'কেজো-বুদ্ধি' পদার্থের 'কেজো দিক্'টাই সর্ব্বাগ্রে দেখে—অনাবশ্যক কোন ভাবুকতা কিংবা অকেজো মনস্বিতার কোন অন্তর্যন্ত্রণা তাহার মধ্যে নাই; কামাদির ক্ষুধা বিষয়ে কিঞ্চিৎ চঞ্চলচিত্তা এবং কোনমতে 'প্রলোভনের অতীত' নহে; তবে, একেবারে গা ভাসাইয়াও দেয় না; কিঞ্চিৎ কুতূহলী এবং এই 'কুতূহল'টাই তাহাকে (অহল্যার 'দেবরাজ-কুতূহলাৎ' এর মত) পুরুষান্তরে দৃষ্টি করিতে খোঁচাইয়া থাকে; মনুষ্যসমাজের দাম্পত্য অথবা 'একব্রত্য' আদর্শের মাহাত্ম্য বিষয়ে, কিংবা 'সতীধর্ম্ম' নামক আদর্শটার বিষয়েও স্ত্রীলোকটী কিঞ্চিৎ 'স্থূলচর্ম্মী'; তবে, একেবারে 'জানোয়ারধর্ম্মী'ও নহে। মনুষ্যসমাজের 'ধর্ম্মানুশাসন' এ'গ্রন্থের পাত্রগণের উপরে সতর্ক ভাবে কোন প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারে নাই।

ইহাই মোটামোটি Growth of the Soil এর 'মনুষ্যজীবন'। গ্রন্থকার আঁকিতে চাহিয়াছেন নিরেট 'মাটীর পুত্র' মনুষ্যের একটা 'জীবন'। ধর্ম্মভাব বলিয়া, পবিত্রতা বলিয়া, জীবনের চরম 'জিজ্ঞাসা' স্থলে কোন সবিতর্ক ভাবনা কিংবা 'ভাগবত জীবন' বলিয়া কোন আদর্শের চিন্তারেখা অথবা মনস্বিতার কোনপ্রকার খোঁচ: ইহাদের মনোলোকে কদাপি উঁকি অথবা ফাঁকি দেয় না—কেবল সুখে, স্বাস্থ্যে, (এবং আধুনিক মনুষ্যের কলকারখানা প্রভৃতি সুবিধার আবশ্যক মতে ফলভাগী হইয়া) সমৃদ্ধিতে জীবন অতিবাহন। বলিতে পারি, ইহা ত ঠিক Growth of the Soil নহে! ইহাও একপ্রকার Idealism, যদিও অদ্ভুতসুন্দরের কোন লক্ষণ ইহার ত্রিসীমায় নাই। পরন্তু, এই যে 'জীবন' ইহা যেমন 'নৈসর্গিক' নহে, তেমন আধুনিক কালের ধর্ম্ম, সমাজ, পরিবার, রাষ্ট্র, সাহিত্য কিংবা শিল্পের 'সমস্ত' উপচীয়মান সুফল এবং সুবিধা হইতে একেবারে স্বাধীনও নহে; কেবল উহাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক হইতে কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়াই, উহাদের ছায়াপুষ্ট এবং ছায়া-রক্ষিত একটা 'মনুষ্য জীবন'। আধুনিক ইয়োরোপীয় সভ্যতার ছায়ায়, নগরপ্রতিষ্ঠান হইতে দূরবর্ত্তী জাঙ্গল প্রদেশেও এরূপ

মনুষ্যজীবন উপচিত হওয়া খুব সম্ভবপর ; দক্ষিণ সমুদ্রের কোন 'নির্জ্জন' দ্বীপে ঘটিতে পারিলেই, হয়ত, প্রকৃত Realistic আদর্শের একটা Growth of the Soil দাঁড়াইতে পারিত ; গ্রন্থটার নামকরণ সার্থক হইত। যাহা হউক, বর্ত্তমান আকারে, গ্রন্থটার Realistic রীতি সত্ত্বেও, উহার Idealistic সিদ্ধান্তটুকুই সুস্পষ্ট।

কিন্তু, নুট হান্‌সন, তাঁহার এই 'সত্যবাদ' আদর্শে, Hunger বলিয়া যে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এমন ভয়াবহ গ্রন্থ কোন মনুষ্যের লেখনীতে আসিয়াছে কিনা সন্দেহ। সৌন্দর্য্যের পূজারী গ্যাঠে (Goethe) নাকি অত্যন্ত কুৎসিত ও কদাকার চেহারা সহ্য করিতেই পারিতেন না ; তাই হুগোর Hunchback of Notredame পড়িয়া ডাকিয়া উঠিয়াছিলেন—"মানুষের সৌন্দর্য্যবুদ্ধির উপরে এমন ভীষণ অত্যাচার! মানুষকে এত কুৎসিত দেখাইবার জন্ম কোন লেখকের স্বত্ব নাই! It is the most abominable book in the world !" আমরা বলিতে পারি, প্রকৃত প্রস্তাবে Abominable নামযোগ্য কোন গ্রন্থ রচিত হইয়া থাকিলে তাহা নুট হান্‌সনের এই Hunger. মানুষের অন্তরাত্মার উপরে এমন নিদারুণ একটা উৎপীড়ন, তাহার স্নায়ুতন্ত্রকে এমন বর্ব্বর ভাবে নিষ্পেষণ অপর কোন গ্রন্থ করিতে পারে নাই। গ্রন্থটার একমাত্র 'পাত্র' একজন লেখক, তিনি (সে দেশের নিয়মে) সাহিত্যসেবাকেই জীবিকার 'একমাত্র উপায়'রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রন্থকার বলিতে চাহেন, তিনি লেখেনও ভাল ; ফলে তিনি একটা genius ; কিন্তু 'কলম পেশা' হইতে নাকি নিজের 'দৈনিক রুটি'র পয়সাটা কোনমতেই সংগ্রহ করিতে পারেন না। দিনের পর দিন লেখকটার অর্দ্ধাশন'ক্লিষ্ট ও অনশনপিষ্ট জীবনের ঐ ক্ষুধাযন্ত্রণার নির্দ্দয়নির্ম্মম, দফাওয়ারী একটা বিবরণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া 'তিন শত পৃষ্ঠা'ব্যাপী গ্রন্থ! জঠরজ্বালার হাহাকার, ভগবানের প্রতি রহিয়া রহিয়া অভিসম্পাত ও ভগবানের অস্তিত্বের প্রতিই অবিশ্বাস বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক হৃদয়ভেদী প্রলাপোক্তি! এ সমস্তই Hunger গ্রন্থটার উপজীব্য এবং উদ্দীপন। সাহিত্যে নাস্তিক্যমর্ম্মী 'সত্যবাদ'

কতদূর গড়াইতে পারে—নিরুদ্দেশ্য, নির্ভীক, নিরেট জড়তন্ত্রীয় সত্য—তাহার দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থে। অন্য কোনরূপ Art নাই—সাহিত্যের 'সৌন্দর্য্য' বা 'রস' বলিতে যাহা বুঝায় তাহার লেশমাত্র গ্রন্থটির গর্ভোদরে কুত্রাপি মিলিবে না। এমন একটি কথা কিংবা একটা শব্দ নাই, এমন একটি অবস্থার ধারণা কিংবা সংঘটনা নাই যাহা চিত্তে সাহিত্যের 'রস'ধর্ম্মে মুদ্রিত হইতে পারে, যাহাতে বুঝিতে পারি যে গ্রন্থকার তাঁহার এই যাতনাচিত্রের কোন Relief, তাঁহার উত্থাপিত 'জীবনসমস্যার' কোন উপশম, উহার কোনরূপ Solution কিংবা কোন প্রকার Poetic justice গ্রন্থমর্ম্মে লক্ষ্য করিয়াছেন। কেবল সাহস করিয়া এরূপ একটি 'বিষয়' গ্রহণ, আর নিদারুণ ক্ষুধাযন্ত্রণার একটা ধারাবাহিক লিষ্টি। মানুষের মনোবুদ্ধির সম্পূর্ণ বহিঃসীমার এমন একটি গ্রন্থ, এমন 'অনাত্ম' ও 'অমানুষিক' একটি গ্রন্থ, এমন রোমহর্ষণ, 'অ-সাহিত্য' গ্রন্থ আমাদের চোখে ঠেকে নাই। অথচ অনেককে উহার 'সুখ্যাৎ' করিতে শুনিয়াছি; অনেকে নাকি উহার উপরে অশ্রু বিসর্জ্জনও করেন। স্বীকার করিব, আমাদের চোখেও অশ্রু আসিয়াছে, কিন্তু লেখকের কোন কৃতিত্বগতিকে নহে। তবে, উহা কোন্ অধিকারের অশ্রু? মানুষকে আস্ত তক্তাচাপা দিলে অথবা তাহার বুকে সূচ বিঁধাইতে থাকিলেও ত চোখে অশ্রু আসিতে পারে! উহা ত সাহিত্য-অধিকারের অশ্রু নহে—'করুণ' রস নহে! সাহিত্যের করুণ রসের মধ্যে একটা 'আনন্দ' আছে, পাঠক কাঁদিয়াই সে 'আনন্দ'টুকু পায় বলিয়া ট্রাজিক গ্রন্থ পাঠ করে। এ'গ্রন্থে ভাবুকতা কিংবা রসভাবের কোন চমৎকারিতা নাই; আছে মানবাত্মার উপর আস্ত নির্দ্দয়তার কেবল একটা উৎপীড়ন। পরিশেষে, গ্রন্থ'নায়ক' সেই geniousটী নাকি উদরের জ্বালা আর সহিতে না পারিয়া একেবারে জাহাজের খালাসী হইয়া গেল; সরস্বতীর শ্রীচরণে চিরকালের জন্য বিদায়নমস্কার পৌঁছাইয়া দিয়া, গতর খাটাইয়া, দু'মুঠা খাইয়া বাঁচিল! মনুষ্যত্বের এমন

যেমন 'পরাজয় কাহিনী', সারস্বত জীবনের এমন পক্ষপাতী কলঙ্ককাহিনী আর কেহ রটায় নাই। নুট হানসুন Growth of the Soil গ্রন্থে নিসর্গ ও ইতর প্রাণীর উপরে জীবিকা-উপার্জ্জনকামী 'গতর খাটা' মনুষ্যের 'বিজয়'কাহিনীটাই লিখিয়াছেন, এ গ্রন্থে সেই বুদ্ধিজীবী এবং বুদ্ধিবলেই পৃথিবীর রাজত্বজয়ী মানুষের একটা জঘন্য পরাজয় এবং শেকায়েতের বার্ত্তাই গাহিয়াছেন। এস্থলেই আধুনিক 'আর্ট' আদর্শের প্রজ্বলন্ত 'প্রকৃত'বাদ বা Realism। অনেক মানুষ দুর্ভিক্ষে মরে, অনেক 'কলমপেশা' ব্যক্তিও না খাইয়া মরিয়াছে। সে সব জীবনের 'কাহিনী' কোন মানুষ এ'কাল যাবৎ সাহিত্যে আঁকিতে চায় নাই। গ্রন্থকার লেখকটীর জীবনের 'সত্য' কতদূর দেখিতে পারিয়াছেন, তাহার দুর্ভাগ্যের কারণকার্য্য-বিজ্ঞান কতদূর আয়ত্ত করিয়াছেন যে, তিনি সারস্বতজীবনের এতাদৃশ একটা 'সত্য'সমাচার মানুষকে দিবেন? লেখকটীর ঐ দুরদৃষ্টের কোন ঘনিষ্ঠ হেতু নাই কি? বহিদৃ ষ্টিতে যাহা প্রতীয়মান, তাহাই কি কেবল 'সত্য'? এবং এ'ক্ষেত্রে কেবল সহানুভূতিবিহীন পাঠকসমাজই দায়ী? সমসাময়িক সমাজের 'উপস্থিত জনমত' একেবারে বিরূপ এবং বিরোধী থাকা সত্ত্বেও, সারস্বত প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ (সকল দেশে) তদ্বিরুদ্ধে 'সংগ্রাম' করিয়াই ত চিরদিন বিজয়ী হইয়া, আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া আসিতেছেন! সমসাময়িক কালের সহিত এরূপ যুদ্ধ এবং বিজয়ের মধ্যেই ত সারস্বতী 'প্রতিভা'র একটা প্রধান মাহাত্ম্যপরিচয়! মানবাত্মার এমনতর অবসাদক এবং প্রতিভাজীবনের এমন প্রতিষেধক একটি 'গ্রন্থ', এমন দুশ্চারিত্র ও ভীরুতার কুপরামর্শমন্ত্রী একটি গ্রন্থ ত আর হইতে পারে না! Hungerএর গ্রন্থকার নিজের মতলব মতে কতকগুলি ঘটনা সাজাইয়াই বলিতে চাহেন যে তিনি ঐ লেখকটীর দুরদৃষ্টের সমগ্র 'সত্য' ও কার্য্যকারণ-পরম্পরা দেখিয়াছেন! কোন জীবনের সমগ্র সত্য না বুঝিয়া, কেবল জীবনের অংশবিশেষের ফটোগ্রাফ দিতে, একটা Criticism of Life করিতে এবং মানুষকে নিজের মতলব

মতে বুঝাইতে ও 'মন্ত্রনা দিতে' উপস্থিত! জীবনের Destiny না বুঝিয়াই জীবন বিষয়ে Realism! এ গ্রন্থ সাহিত্যের সত্য এবং রসাদর্শকে একেবারে পদদলিত করিতেছে। সাহিত্যে মনুষ্যের জীবনবস্তুর উপস্থাপক শিল্পী বা কবিকে 'সব জান্তা' বলিয়া আমরা ধরিতে বাধ্য; সাহিত্যে আমরা স্রষ্টা কবির একটা স্বতঃসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্রমর্ম্ম 'সৃষ্ট জগতের'ই সম্মুখীন হই; অতএব, তাঁহার গ্রন্থমধ্যে জগতের ও জীবনমর্ম্মের স্বতন্ত্র নিয়তির ফল এবং উহার ঘনিষ্ঠ তত্ত্বদর্শন আমরা দেখিতে চাই। যে জীবনের Destinyর সমগ্রটা তুমি দেখিয়াছ বলিতে পার না, উহাকে কোন দিকে দেখাইতেছ না, জীবনাদৃষ্টের কার্য্যকারণতত্ত্ব বোঝ না, বুঝাইতে পার না, তখন কেবল একটা খণ্ডাংশ ধরিয়া এরূপে, কেবল নিজের মতলব মতে বাহ্যদৃষ্টিতে, কোন জীবনের একটা বিফলতার 'ট্রাজিডী' রচনা করিয়া মানুষকে নিরাশার পরামর্শ দান করিতে তোমার কোন স্বত্বই নাই। যে জীবনের সমগ্র 'অর্থ' বোঝ নাই, শিল্প সাহিত্যের পন্থায় তাহার দুরদৃষ্ট-নিয়তি অঙ্কিত করিয়া মানুষকে বিভ্রান্ত করিতে কিংবা চালাইতে যাওয়া একটা 'সাহিত্যিক দুর্ব্বৃত্ততা' বলিয়াই আমরা নির্দ্দেশ করিব। এস্থলেই আবার বুঝিতে পারি, কেন সাহিত্য হইবে কেবল 'গ্রন্থকারের মনোগত সত্য-আদর্শের প্রমূর্ত্তিরূপা সৃষ্টি'; প্রমূর্ত্তিও কেন কেবল সার্ব্ব-জনীন ও চিরন্তন সত্যকেই মর্ম্মতঃ উদ্দেশ্য করিবে। উহাই প্রকৃত প্রস্তাবে শিল্পনামের যোগ্য এবং উহার প্রতিই 'সমালোচনা'র আমল। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে তাদৃশ 'সত্যমর্ম্মবিহীন কোন বিশেষ ঘটনা বা ইতিবৃত্তান্তের প্রতি যেমন সাহিত্যের আমল নাই, তেমন উহা সাহিত্যিক 'বিচারবিবেচনা'র অধিকারেও আসে না। "ইহা প্রকৃত ঘটনার বিবরণ" বলিয়া মুখবন্ধ করিলে সে গ্রন্থ তৎক্ষণাৎ আর্ট্ সমালোচনার আমল হইতেই খারিজ হইয়া যায়।

কোন বন্ধু বলিতেছিলেন, এই Hunger নাকি স্বয়ং নুট্ হান্‌সনের 'আত্মজীবন কাহিনী'। তা হইলে ত ইহার মত এমন একটি অসত্যসন্ধ

ও অসত্যপ্রস্তু গ্রন্থ আর হইতে পারে না! নুট হান্‌সমকে একজন 'জীবনযুদ্ধে বিজয়ী' লেখক বলিয়াই ত ধরিতে পারি। এত দূরদেশের লোক তিনি, অথচ বঙ্গদেশে পর্য্যন্ত তাঁহার নাম বিস্তারিত হইয়াছে এবং তিনি 'নোবল প্রাইজ' লাভের যোগ্য বলিয়াও বিবেচিত হইয়াছেন। বন্ধুবরের কথা যদি সত্য হয়, তা হইলে ত Hunger গ্রন্থ একটা নিদারুণ মিথ্যার উপরেই নিজের রসার্থ এবং সত্যবাদের এমারত রচনা করিয়াছে! লেখক নিজের জীবনকুরুক্ষেত্রে সকল সাময়িক উত্থানপতন ও সকল যমযন্ত্রণার মধ্য দিয়া স্বয়ং যেই বিজয়ে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, আপনার সত্যজীবনের বিজয়োত্তরী চরম ঋদ্ধির সেই 'পথ'টুকু যদি সত্যসন্ধভাবে অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়া দিতে পারিতেন, তা হইলে উহাই ত অমৃতরসোজ্জ্বল সাহিত্যসিদ্ধিরূপে দাঁড়াইয়া যাইত এবং চিরকাল মানবের হৃদয়গ্রাহী হইতে পারিত।

বলিতে চাই যে এরূপ 'নিরর্থক' একটা যাতনার ছবি দেখাইয়া আমাদের মস্তিষ্কে ও শিরাউপশিরায় আস্ত স্নায়বিক পীড়া উৎপাদন, ইহা আর্ট্ নহে—'বর্ব্বরতা'; ইহাও একপ্রকারের Vivisection—জীবিত মনুষ্যের অঙ্গব্যবচ্ছেদ। মনে করুণ, কোন 'সত্যবাদী' লেখক, তাঁহার সুবিধামত নির্জ্জন স্থানে, কোন সুস্থ, সবল ও শান্ত প্রকৃতির একটি 'শিশু' অথবা একটি 'সুন্দরী বালিকা' জমায়েত করিল। প্রথমতঃ, তাহার একটি হাত কাটিয়া ফেলিল; তারপর, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম-ভাবে, সেই হতভাগ্যের ছটফটি যাতনার ও চেষ্টাচরিত্রের এবং হাহাকারের অবিকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে লাগিল। তারপর, আবার একটি পা কাটিয়া রাখিল এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ 'সত্যবাদী' বিবরণ সাহিত্যরসিকের বা সাহিত্য-বণিকের চিত্তবিনোদনার্থে 'নোট' করিয়া চলিল। পরিশেষে, উহার বুকে একটি 'রাজাসের ছুরী' আমূল বসাইয়া দিয়া শিল্পতন্ত্রের Plot মধ্যে করুণরসের একেবারে climax তুলিল—তবুও কিন্তু পাত্রটি মরিবে না। এইরূপে 'তিন দিবা ও তিনরাত্রি'ব্যাপী, পরম সত্যসন্ধ, অমূল্য বিবরণ।

পাঠক-বিশেষের চক্ষে এ ব্যাপার গ্রন্থলেখককে একেবারে রিয়ালিজম্ আদর্শের চূড়াশীর্ষে, অসন্দিগ্ধ অমরতায় নির্ব্বিঘ্নে তুলিয়া ধরিতে হয়ত বাকি রাখিবে না; আমরা কিন্তু বলিব যে, উহা সাহিত্যকোটির 'রসিকতা' হইবে না, হইবে কেবল একটা 'বর্ব্বরতা'। সেইরূপ, স্ত্রীপুরুষ দু'জনকে মুখামুখি করিয়া, পরস্পরকে কেবল নিরেট কামজ্বালা ও কামেন্দ্রিয় ক্ষুধার খাদ্যখাদকরূপে ধরিয়া, উহাদের ক্রিয়াব্যবহার ও বাক্যব্যবহারের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা দ্বারা পাঠকের দেহেন্দ্রিয়ে একটা স্নায়বিক বিক্রিয়ার উৎপাদন করা, ভাষার সাহায্যে পাঠকের পশু-প্রবৃত্তির পরিপোষণে সাহায্য করা, ইহাও 'আর্ট্' নহে—বর্ব্বরতা। 'সত্যবাদী' আর্ট্‌ক্ষেত্রের Sex-analysis ও Sex-psychology প্রভৃতি এবং Vivisection ফলতঃ অভিন্ন ব্যাপার।

এক্ষেত্রে একেবারে চূড়ান্ত করিয়াই ছাড়িয়াছেন, বলিতে পারি, নরোয়ের অপর এক লেখক বয়ার (Bojer)—যিনি Power of a Lie লিখিয়াছেন। সাহিত্যে 'শিব'আদর্শপন্থী কবিগণ এতকাল দেখাইয়া আসিয়াছেন 'ধর্ম্মের জয়'; ইনি মৌলিকতার চূড়ান্তে গিয়া গাহিয়াছেন "অধর্ম্মের জয়"। লক্ষ্য করিবেন, গ্রন্থের নামটী Power of Lies নহে অর্থাৎ উহা একটী মাত্র দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিতেছে; সাহিত্য-কোটিতে অরিষ্টোটলের অনুমতে কোন Universal Truth উপস্থিত করিতেছে না। অতএব উহাও কেবল একটা Realism বা Naturalism রীতিরই গ্রন্থ। একটা চুক্তির বিষয়ে দুইটি ব্যক্তির একজন সত্যকে, অপরে মিথ্যাকে অবলম্বন করিল। যে মিথ্যাকে ধরিল সেই জয়ী হইল, এবং সংসারে উত্তরোত্তর সুখসৌভাগ্যে সমৃদ্ধ হইয়া ও সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াই চলিল। যে সত্যকে ছাড়ে নাই, লেখক দেখাইয়াছেন, সে ব্যক্তি 'সত্য'টুকু 'সমর্থন' করিতে গিয়াই জালজুয়াচুরী করিল, জেলে গেল, সর্ব্বস্ব হারাইল, তাহার স্ত্রীপুত্র গেল, তাহার সংসার ছারখার হইল। লেখক অনেক মাথা ঘামাইয়া একটা

১০২। বয়ারের (Bojer) Power of a Lie প্রভৃতি গ্রন্থে 'অধর্ম্মের জয়' বাদ।

গোঁজামিল দেওয়া ঘটনার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং নিজের মতলবমতে উহার 'পোষক প্রমাণ' উপস্থিত করিয়া এই ভীষণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন! সেরূপ, এ'কালের আর একজন নামস্থ ফরাসী-বেলজী লেখক (অনেকের মতে একজন 'Light-giver') মৈতরলিক্ 'সতীধর্ম্ম'কে একেবারে 'নাবহাল' করিয়াই লিখিয়াছেন তাঁহার Mauna Vauna। অবস্থাবিশেষে যে দাম্পত্য-পবিত্রতার আদর্শকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারা যায়, লেখক নিজের মাথাটাকে 'হাতুড়িপেটা' করিয়াই অনেক কষ্টে তাদৃশ একটা সম্ভবপর ঘটনা বানাইতে গিয়াছেন। অবশ্য, এ সকল লেখক উপস্থিত করিতেছেন আপাততঃ এক-একটি বিশেষ ঘটনা—A Particular Incident. কিন্তু সাহিত্যে ত Particular ধর্ম্মের স্থান নাই! এ সকল গ্রন্থের বিশেষঘটনার ফলিতার্থ হইতে পাঠক জীবনবিষয়ে এক একটা সামান্য ও Universal তত্ত্বই ত গ্রন্থের 'সিদ্ধান্ত'রূপে খাড়া করিবে, উহাকেই গ্রন্থের মর্ম্মস্বরূপে গ্রহণ করিবে এবং ঐরূপ করিলে উহা ত 'ন্যায্য'ই হইবে! অতএব এ দুটি গ্রন্থের মর্ম্মও ন্যায়ানুগত ভাবে দাঁড়াইতেছে "অসত্যের জয়"—"অধর্ম্মের জয়"!

বয়ারের Great Hunger নবেলের মধ্যেও তাঁহার Power of a Lieর মত একটা সত্যবিদ্বেষী দুর্ম্মতিই যেন কার্য্য করিতেছে! বয়ার বলিতে চাহেন যে, মানুষ 'ঈশ্বর' নামক একটা তত্ত্বের 'সৃষ্টি' করিতেছে নিজের অপরিতৃপ্ত মহাক্ষুধার বশে! উহাতে 'ঈশ্বর' বস্তুটা দাঁড়াইয়াছে কেবল জীবনমরুমধ্যে 'তৃষ্ণা'রোগাক্রান্ত জীবনেত্রের একটা মিথ্যা উপন্যাস ও মরীচিকার মায়িক সৃষ্টি। কিন্তু মানুষ যে 'তৎ' ছিল, সেই 'তৎ'কে জীবনের সকল জ্ঞানকর্ম্ম ও ভাবের পথে খোঁজ করাই যে ঐ জন্য জীবের পক্ষে অপরিহার্য্য, এ স্থলেই যে বিশ্বসৃষ্টির 'রহস্য', জগতের সত্যদার্শনিক ঋষির সেই তত্ত্ববার্ত্তার একেবারে কাছাকাছি আসিয়াই বয়ার উহার 'পাশ কাটিয়া' গিয়াছেন! বলিতে পারি—Man seeks his unrealised Self. চরমের এই 'অপ্রাপ্ত' পদার্থটার

নামই ত বৈদিক ঋষির 'আত্মন্'। যে পর্য্যন্ত এই পরমাত্মপ্রাপ্তি ঘটিবে না, সে পর্য্যন্ত এই সংসারচক্রের 'ক্ষুধা'ভ্রমি টুকুও ক্ষান্ত হইবে না। জীবের 'মহাক্ষুধা'টুকুর কেবল একটা জড়তন্ত্র ও বহিস্তন্ত্র'প্রকাশ' দেখাইয়াই বন্ধার সন্তুষ্ট !

এ সকল দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিতে পারিব যে, সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রে Realism বা Naturalismএর জন্য কিংবা কোন Particular দৃষ্টান্তের জন্য কোন প্রকার স্থান আছে কিনা ? শ্রেষ্ঠশ্রেণীর শিল্পগ্রন্থ রচনা করা কত কঠিন ! বিশেষতঃ শিল্পে 'ভাবের যথোচিত আকৃতি' বা মাইথোপীয়া সজ্ঘটন করা কত কঠিন ! কাব্যের প্রত্যেক পদবাক্য, উহার প্রত্যেক অবস্থা ও ঘটনাবস্তু সচেতন শিল্পীর একটা রসার্থ এবং নিগূঢ় মর্ম্মার্থ বহন করিতেছে বলিয়াই আমরা গ্রহণ করিব— গ্রহণ করিতে বাধ্য। অতএব নিজের গ্রন্থের প্রত্যেক ভাব ও বস্তু-বিষয়ের ধ্বনি এবং ব্যঞ্জিতার্থবিষয়ে শিল্পীকে সতর্ক হওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। সাহিত্যে প্রত্যেক বিশেষ অবস্থা ও ঘটনার এরূপ একটা সামান্যার্থ ও সামান্য ধ্বনি থাকিবে অ িচ, মনুষ্যের মনস্তত্ত্ব অনুসারে, না থাকিয়া পারে না ; এজন্যই শিল্পীকে ঘটনা ও অবস্থানির্ব্বাচনে এবং কথার বাঁধুনীতে পর্য্যন্ত সতর্ক ও সাবধান হইতে হয়। যেমন, 'চোখের বালি' 'নষ্টনীড়' অথবা 'ঘরে বাহিরে'র ঘটনাসংবিধান হইতে একটা ফলিতার্থ এ'রূপ দাঁড়ায় যে, কোন শ্রেয়ঃকামী দম্পতী আপনাদের গৃহগণ্ডীমধ্যে দ্বিতীয় কোন গুণী, সুরূপ কিংবা কোনদিকে 'চিত্তাকর্ষক' স্ত্রী অথবা পুরুষকে প্রবেশ করিতে দিবে না ; নিজের কোন 'ভাই'কে বা অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও বিশ্বাস করিতে নাই ; পৃথিবীর কাহাকেও বিশ্বাস করিতে নাই। অথচ, স্বাধীনতা-প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ সজ্ঞানে এরূপ 'পারিবারিক আদর্শ' পোষণ করেন বলিয়া ত কোনমতে ধারণা করিতে পারি না ! প্রত্যুত, 'রবীন্দ্রনাথের রচনা' বলিয়া অগ্রে জানা না থাকিলে, এ সকল গ্রন্থের ঘটনার্থ ও মতিগতি উহাদিগকে 'মডেল ভগিনী'র লেখকের মত 'রক্ষণশীল' দলভুক্ত কোন ব্যক্তির 'রচনা' বলিয়াই একটা

ধারণা জন্মাইতে পারিবে। তিনটি গ্রন্থেই হিন্দুপরিবারের শুদ্ধান্তমন্দিরে আধুনিক আদর্শের 'স্বাধীনতা'র নূতন আবহাওয়া ঢুকাইয়া একই রকম দুর্ঘটনার উপন্যাস করিতে যাওয়াতে, বিশেষতঃ একটা অসামান্ত পাপাগুনকে অসতর্ক ভাবে নাড়াচাড়া করিতে যাওয়াতেই ত কবির উদ্দেশ্য ও তাঁহার শিল্পের মর্ম্মার্থ যেদিকে সেদিকে বেয়াড়া হইয়া, দগ্ধিয়া যাইতেছে; শিল্পের 'রস', 'অর্থ' 'মর্ম্ম' ও 'শরীরস্থান' সমস্তকে—কবির অনিচ্ছাসত্ত্বেও—ছাইভস্মে পরিণত করিতেছে!

কেন জানিনা, সময় সময় রবীন্দ্রনাথের অনেক 'সিম্বোল', উহাদের ভাবগতিতে, যেন কবির মর্ম্মার্থের সঙ্গে একেবারে বেয়াড়া হইয়াই দাঁড়ায়! প্রাচীন ভারতের 'সন্ন্যাস' আদর্শকে 'ন্যক্কার' করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'র যুগে লিখিলেন দুইটি কবিতা—'আকাশের চাঁদ' ও 'পরশ পাথর'। এখন বোধ করি 'আকাশের চাঁদ'টাকে একেবারে বরখাস্ত করিয়াছেন। কিন্তু 'পরশ পাথর' 'এক' বলিতে গিয়াই যেন, কবির ইচ্ছার বিপরীতে, 'আর' বলিতেছে! কবি ত কোমর বাঁধিয়া প্রমাণ করিতে গেলেন যে 'পরশ পাথর' একটা "খ্যাপার খেয়াল"; উহার কোন অস্তিত্বই নাই; উহার আশায় মানুষ অনর্থক বহুমূল্য জীবনের অপব্যয় করে। কিন্তু কবিতাটির দেহ মধ্যে, কেবল অতর্কিত ভাবের টানে নহে, পরশপাথরের জাজ্বল্যমান অস্তিত্বটুকুই ত অবিসংবাদিতভাবে তিনি সপ্রমাণ করিয়া বসিয়াছেন! কবির সাক্ষ্য মতেই "লোহা ত হয়েছে সোনা"! যদি 'লোহা' 'সোনা' হইতে পারে, তবে ওই পরশপাথরের পিরীতে অথবা উহার 'ফিরিয়া খোঁজ' করিতে কেবল ঐ একটি সন্ন্যাসী ব্যক্তির "বাকী অর্দ্ধ ভগ্নপ্রাণ দান" করা 'খ্যাপার খেয়াল' ত নহেই, পরন্তু সহস্র লোকের 'পূর্ণ প্রাণ' সে খোঁজে একেবারে উৎসর্গ করাটাই, ভাবুকতার ক্ষেত্রে, সমুচিত বিবেচিত হইবে না কি? সহস্র কেন, ঐরূপ লক্ষ লক্ষ জীবন ব্যয় নিবেদন করিলেও সমাজশক্তির হিসাবের খাতায় উহা ত 'অপব্যয়' হইবে না! উহাতে এই ধারণা হয় যে, কবি কেবল

সাম্প্রদায়িক ঝোঁক এবং প্রাচীনতা-বিদ্বেষের খেয়ালেই—হৃদয়ের কোন রসযোগ ও ভাবোদ্দীপনা ব্যতীত—এ'ক্ষেত্রে কলম ধরিয়াছেন; লিখিতে লিখিতেই ভাবের বিভিন্নমুখী উদ্দীপনা লাভ করিয়া, অবশ্য, একটি মনোরম 'বর্ণনী কবিতা'র জন্মদান করিয়াছেন; কিন্তু, কবিতাটীর 'অন্তরাত্মা' কবির আদিম মর্ম্মসঙ্কল্প ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। হৃদয়ের ভাবযোগ বিনা কেবল 'বোধায়নী' রীতিতে এবং পরের আক্রমণবুদ্ধিতে কবিতা লিখিতে বসিলেই হয়ত এরূপ দুর্ঘটনা না ঘটিয়া পারে না। কবির প্রৌঢ় বয়সের 'তাজমহল' বিষয়ক (অনভিজ্ঞের দৃষ্টিতে) সুন্দর কবিতাটির মধ্যেও ঈদৃশ একটি দুর্ঘটনা আছে। কবিতাটির প্রথমাংশে "ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া" রূপে প্রেমের একটা অমৃত-মহীয়ান্ ভাবমূর্ত্তি খাড়া করিয়া, কবি পরমুহূর্ত্তে একেবারে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন! "মিথ্যা কথা! কে কহিবে ভোল নাই!" যেন একটা নির্দ্দয়নির্ম্মম, সাম্প্রদায়িক বিবাদবুদ্ধি ও দার্শনিকতার ক[illegible] 'ক্রকচ' যন্ত্রেই কবিতাটাকে দ্বিখণ্ড করিলেন! উদ্দীপিত ভাব[illegible]র একেবারে সমাধি সমাধান করিলেন! এমন একটা নিদারুণ কটূ[illegible] চীৎকার এবং নির্দ্দয়ভাবে রসহত্যার প্রবৃত্তিও কবি হয়ত আর কুত্রাপি দেখাইতে পারেন নাই। যদি 'ভোলাটাই ভাল' বলা কবির প্রয়োজন, তবে এতক্ষণ ঐ 'ভজকট' করার কোন্ দরকার ছিল! এ অবস্থায় কবিতাটিতে দাঁড়াইয়া গিয়াছে কেবল দু'টি পরস্পরবিরুদ্ধ ভাবুকতার একটা 'মেষের লড়াই'!

কবির বিষয়নির্ব্বাচন বিশেষতঃ প্রমূর্ত্তি বা মাইথোপিয়ার সংঘটনা যে সাহিত্যক্ষেত্রে কত বড় ব্যাপার উহাতে সামান্য অনাবিষ্টতা হইতে যে সমস্ত শিল্পের ভাবার্থ কেমন বেয়াড়া হইয়া ও স্বয়ং কবির উদ্দেশ্য-টুকুরই বিরুদ্ধভাব-ব্যঞ্জক হইয়া পড়িতে পারে, তাহা আমরা এরূপে অনেক বড় বড় লেখকের গ্রন্থমর্ম্ম-গত স্থায়িভাব ও রসসমাধানের বৈয়র্থ্য হইতেই ধারণা করিতে পারি। এ সকল ক্ষেত্রে কবিকে নিত্য সচেতন থাকিতে হয় যে Poetry aims at the Universal; কবি

কোন একটী Particular দৃষ্টান্তের সাহায্যে গ্রন্থের রসসমাধান করিলেও পাঠক উহা হইতে একটি Universal সত্যের ব্যঞ্জনাই কবির অভিপ্রেত বলিয়া গ্রহণ করিবে; চিরকাল করিয়া থাকে। কেবল Particularএর জন্য, Realism বা Naturalismএর জন্যও ইতিহাসে স্থান থাকিতে পারে, কাব্যে নাই। আমার গ্রন্থের এই সিম্বোল বা ভাবপ্রমূর্ত্তির ব্যঞ্জিতার্থ কি দাঁড়াইবে—এ প্রশ্নে কবিকে নিরতভাবে জাগ্রৎ থাকিতেই হইবে। কবির উচ্চারিত কথাটির মর্ম্মনির্য্যাস কতদিকে গড়াইতে পারে, তাঁহার উপস্থাপনার উচ্ছ্বাস কতদিকে মানুষের মনকে 'গ্রহণ' করিতে পারে, সে দিকে সচেতন না থাকিয়া কেবল একগুঁয়ে ভাবে বা 'আমার ইচ্ছার' ভাবে চলিয়া গেলেই বলিতে হয় যে কবির হৃদয়টি 'তালকাণা'. সবিশেষ বিবেচনা করিতে হয় যে, 'পাষণ্ড ও শয়তান' আয়াগো কিংবা 'নৃশংস ম্যাক্‌বেথ' প্রভৃতির জীবন যদি Tragic না হইত, মোটা কথায়, তাহারা যদি পাপের শাস্তি না পাইত, তাহা হইলে আমরা মনে করিতেই বাধ্য হইতাম যে শেক্সপীয়র 'আয়াগোতন্ত্র' ও 'ম্যাক্‌বেথ-তন্ত্র' প্রচার করিতেই ব্রতী হইয়াছেন—ঐ সমস্ত এত চিত্তাকর্ষক বা (সাহিত্যের Art আদর্শে) এমন 'সুন্দর' চিত্র হইয়াছে যে সেইরূপ মনে না করিলেই আমাদের রসবোধে ভুল হইত। পাপীর 'মাহাত্ম্য' অথবা 'বিজয়' অঙ্কিত দেখিলেই কবিকে সত্যদ্বেষী ও ধর্ম্মবিদ্বেষী ব্যক্তিরূপে আমাদের হৃদয় ধারণা করিবে। এ স্থলেই ত পাপের চিত্রকর কবির প্রধান সমস্যা! আবার এস্থলে দাঁড়াইয়াই বুঝিতে পারি কেন সাহিত্যক্ষেত্রে "কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা।" প্রকৃত উচ্চশ্রেণীর কবি এবং কাব্যঘটনা পৃথিবীতে কেন এত কম! অন্যদিকে 'সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত', ও 'ঐতিহাসিক কাব্য', 'ঐতিহাসিক নাটক' প্রভৃতি পরিচয়কথার মধ্যেও (কবির দিক্ হইতে) যে একটা Apology আছে, কবি যে তাঁহার 'মাইথোপীয়া'র সকল ধ্বনি ও ব্যঞ্জনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন না, সে বিষয়েও সুতরাং সত্যজিজ্ঞাসু পাঠকমাত্রকে সচেতন থাকিতে হয়।

সাহিত্যের শিবতত্ত্বে বার্ণার্ড্ শ' প্রভৃতির বিদ্রোহের কথাটি 'সাহিত্যের আকৃতি' অধ্যায়ে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি।

১০৩। জড়বাদীর 'শিব' আদর্শ ও এইচ, জে, ওয়েলস্।

অবশ্য, ইঁহাদের হইতে নানাদিকে বিভিন্ন-তন্ত্রের লেখক এইচ, জি, ওয়েলস্। ইনি জড়বাদী. মানবের কোন 'নিত্য'তত্ত্বের বিষয়ে সংশয়ী; অথচ, মানবাদৃষ্টে ভবিষ্যৎ একটা উন্নতির 'স্বপ্ন' তিনি দেখিতেছেন এবং সেরূপ 'ভবিষ্যৎ'কে একেবারে সমাগত এবং সম্প্রাপ্ত পদার্থরূপে ধরিয়া তদুপরেই তাঁহার কথাগ্রন্থগুলির বিষয়ভিত্তি স্থির করিয়াছেন। ওয়েলস্ একজন সোসিয়ালিষ্ট্। ধনের পার্থক্য এবং বর্ত্তমান ধন-বিভাগই যে মনুষ্যের সকল দুঃখের 'মূল' ইহা, অপর 'সোসিয়ালিষ্ট্'-গণের ন্যায়, তাঁহারও একটা 'হুজ্জত'। অদ্য হইতে দুইশত বৎসর অগ্রবর্ত্তী যে 'দ্বাবিংশ শতাব্দী', উহাকেই তিনি মনুষ্য-সমাজের 'মোক্ষ-যুগ' ধরিয়াছেন এবং তাঁহার বহু রচনার ভূমি ও আবহাওয়া সে যুগেই প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া চলিয়াছেন। আমাদের এই বর্ত্তমান 'বিংশ শতাব্দী'কে বরাবর Old Condition of things এবং "The age that has passed away" রূপেই সর্ব্বত্র একটা নির্দ্দেশ! তিনি দেখাইতেছেন যে, কেবল জড়বিজ্ঞানের উন্নতি ও ধনবিধানের পরিবর্ত্তন হইতে এই 'নবযুগ' দুনিয়ামধ্যে আসিয়াছে; মানুষের পল্লীবসতি ও সমস্ত ছোটখাট নগরগুলির ধ্বংস হইয়া কেবল একএকটী মহানগরীই বসতিকেন্দ্ররূপে দাঁড়াইয়াছে; উহাতে ৮০।৯০ তালা করিয়া এক একটী বাড়ী; এরোপ্লেনে ঘণ্টায় শতসহস্র মাইল যাতায়াত; একএকটি দেশের বাকী সমস্ত জনপদভূমি কেবল 'Labour Organization' সোসাইটীগুলির অধিকৃত সম্পত্তি—ইত্যাদি। কিন্তু, এত 'উন্নতি' ঘটিয়াছে সত্য, তথাপি মানুষের আদিম পশুধর্ম্ম, দুর্ব্বৃত্ততা ও দুরাত্মতা প্রভৃতি প্রকৃতিগত দোষ সেকালের মতই বর্ত্তিয়া আছে! লেখকের 'দৃষ্টি' ও কায়দার মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে, উহা তাঁহার নিজস্ব। ওয়েলসের মধ্যে একটা 'আশার বাণী,' Optimism ও

সহৃদয়তা আছে যাহাতে তাঁহাকে সাহিত্যক্ষেত্রে একজন সুহৃৎ ও প্রিয়হৃদ্ ব্যক্তি রূপেই বার্ণার্ড্‌শ' প্রভৃতি অহমিকাসর্ব্বস্ব ও ঐহিকতামত্ত বিষাত্মা লেখক হইতে বিশেষিত করিতেছে। কিন্তু মানবাদৃষ্টে এই যে 'নবযুগ' আসিয়াছে, দুনিয়ার পৃষ্ঠে এই যে 'মহা পরিবর্ত্তন' ঘটিয়াছে, তাহার 'কারণ' এবং গতিযুক্তির পথটুকুন খুঁজিতে গেলেই দেখিব যে, ওয়েল্‌স্ কেবল একজন সুখস্বপ্ন-রসিক জড়বাদী ব্যতীত আর কিছুই নহেন। মনুষ্যের অধ্যাত্মক্ষেত্রের কোন উন্নতি, তাহার 'ধর্ম্ম'গত কোন উদ্বর্ত্তন বা বিবর্ত্তন অনাগত দ্বাবিংশ শতাব্দীর এই 'উন্নতি'স্বপ্নের মূলে নাই; উহার কোন প্রকার 'ভরসা'ও লেখকের কল্পনাকে কোন দিকে উদ্দীপ্ত করিতেছে না।

"In the Days of the Comet" বলিতেছে, একটা ধূমকেতুর 'সবুজ ধোঁয়া' (Greenish Vapour) পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াই তিনটি ঘণ্টার মধ্যে মনুষ্যজাতির চরিত্রমনপ্রাণে পরস্পর 'অহিংসা'-বুদ্ধি ও ভ্রাতৃভাবের একটা অভিনব অধ্যাত্ম পরিবর্ত্তন আনিয়াছে। এই 'ধূমকেতু' হয়ত একটা কাল্পনিক 'সিম্বোল'। তাঁহার Food of the Godsএর মধ্যেও এরূপ সিম্বোল; Tales of Time and Space-এর মধ্যেও অনেক স্থলে তাহাই। মোটের উপরে, ওয়েল্‌সের অধিকাংশ 'শিল্প'রচনা কেবল একটা উত্তমাশার আশীর্ব্বাণী ও Good Willএর 'স্বপ্ন'। কিন্তু, এই 'স্বপ্ন' সর্ব্বত্র জড়বাদকে ভিত্তি করিয়াই দাঁড়াইয়াছে।

সাহিত্যশিল্পের দিক্ হইতে ওয়েল্‌সের শিল্পরচনার কোন সবিশেষ মাহাত্ম্য কিংবা স্থায়ী পদবী আছে কিনা, সন্দেহস্থল। তাঁহার এক একটি শিল্পগ্রন্থের আলম্বন বিষয়, উহার গতি ও সমাধান যেন এরোপ্লেনে বসিয়া একনিশ্বাসেই পরিকল্পিত; উহাকে যেন বিদ্যুৎপরিচালিত রেলগাড়ীতে বসিয়াই 'একমেটে' করা হইয়াছে এবং সেই 'একমেটে' অবস্থাতেই উহা বৈদ্যুতিক যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার সমস্ত রচনার মধ্যে একটা অভাবনীয় হঠাৎকৃতি, হঠকারিতা এবং তাড়াতাড়ির প্রমাণ পাই; ভাব কিংবা চিন্তা কোথাও ভাষার রীতিতে

ও ধৃতিশক্তিতে জমাট বাঁধিতে পারিতেছে না। এতাদৃশ বিপুল সৃষ্টিশক্তি অথচ এমন জলীয় 'রীতি'র দ্বিতীয় একটি দৃষ্টান্ত সাহিত্যজগতে কদাচিৎ দেখিতে পাইব। রচনা এতই স্থূলমর্ম্মী ও জলধর্ম্মী যে বিশত্রিশটি পৃষ্ঠার মধ্যে এমন একটি শব্দ, এমন একটি স্মরণযোগ্য কথা কিংবা পদবাক্যের এমন কোন উদিত-উর্জ্জিত ভাবসঙ্কেত নাই যাহাতে চিত্তকে দৃঢ়বদ্ধ করিতে পারে। ইহা ত সাহিত্যের 'কায়দা' নহে। রোমান রোল্যা, অস্কার ওয়াইল্ড্ বা রবীন্দ্রনাথের কথাগুলির মধ্যে ভাষার যেমন একটা ঘনজমাট শক্তি আছে তাহা ওয়েল্‌সের নহে। গ্যেঠে যাহাকে Pouring water from a bucket বলিয়াছেন, সাহিত্যে ওয়েল্‌সের প্রকাশ'রীতি' অনুধাবন করিলে তাহাই মনে পড়ে। অথচ, এরূপ জলীয়তা সত্ত্বেও ওয়েল্‌সের গ্রন্থগুলি এমন একজন চিন্তাশীল ও তীক্ষ্ণ মনীষাসম্পন্ন এবং কল্পনাশক্তিশালী লেখকের রচনা বলিয়াই একটা ধারণা বদ্ধমূল করিতে থাকে, যাঁহার চিন্তায় বৈশিষ্ট্য এবং অভাবনীয় দীপ্তি ও গতি আছে। তাঁহার মধ্যে মানবোন্নতির যেই 'স্বপ্ন' আছে, ঘনিষ্ঠ দৃষ্টিতেই মনে হয়, উহা কেবল জড়তামত্ত মস্তিষ্কের একটা কুস্বপ্ন; এ 'উন্নতি' কেবল মানুষের বহিস্তন্ত্রী সুবিধার উন্নতি, অনাত্মতা ও জড়বাদের বাহ্য উন্নতি—ভিতরে ফাঁপা। যাহা এক মুহূর্ত্তে জলবুদ্বুদের ন্যায় ফাটিয়াই মহাশূন্যে মিলাইয়া যাইতে পারে সেরূপ অনিত্য ও অনাত্ম উন্নতির বাতুল একটা দুঃস্বপ্ন। আনাতোল ফ্রান্সের 'পেঙ্গুইন দ্বীপ' উপন্যাসের মধ্যে, শেষদিকে, এ'রূপ একটা 'ভিতর ফাঁপা' সভ্যতার চরিত্রই চিত্রিত হইয়াছে; জড়তন্ত্রী সভ্যতার আত্মধর্ম্মেই অকস্মাৎ 'ছাতি ফাটা'র একটা কাহিনী উক্ত জড়বাদী পণ্ডিতব্যক্তির লেখনী-মুখেই আত্মপ্রকাশ করিয়া গিয়াছে!

এ'সূত্রে ইংলণ্ডের অপর এক শক্তিশালী লেখক অস্কার ওয়াইল্ড্, যিনি 'আর্ট্'কেই জীবনের 'সর্ব্বেসর্ব্বা'রূপে উপন্যস্ত করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার এই আর্টের অর্থও প্রকৃত প্রস্তাবে 'শিবরহিত সৌন্দর্য্যকলা'। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসীর Encyclopædistগণ, বিশেষতঃ

ভল্টেয়ার (তিনি অবশ্য Theist ছিলেন) অপরিসীম বিদ্রূপাস্ত্রে সাম্প্রদায়িক খ্রীষ্টধর্ম্মের গোঁড়ামিকে বিধ্বস্ত করেন। পাত্রী আদর্শের খ্রীষ্টধর্ম্ম অধ্যাত্ম আদর্শকে চাপা দিয়া কতক-গুলি Factএর উপরে এবং 'ঐতিহাসিক' প্রমাণের (Historical evidence) উপরেই আত্মনির্ভর করিতেছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা হইতে, বিশেষতঃ ডার্ব্বিনের 'অভিব্যক্তি' বাদের নানামুখী প্রতিপত্তি হইতে Historical Christianity, অনেকের সমক্ষেই, সমূলে নড়িয়া উঠিয়াছে। (১) উহার গতিকেই যেন ম্যাথু আর্ণল্ড একস্থলে হতাশ্বাসে বলিয়া উঠিয়াছেন, "আমাদের ধর্ম্ম Factএর উপরে নির্ভর করিয়াছিল; ইদানীং Fact খোয়াইয়া গিয়াছে; অতএব ধর্ম্মও আমাদিগকে Fail করিতেছে। এখন 'আর্ট'ই আমাদের জীবনের একমাত্র নির্ভর যষ্টি!"

১০৪। শিব-রহিত সৌন্দর্য্য আদর্শ—অস্কার ওয়াইল্ড।

ইহা যে একটা নিতান্ত শূন্যশক্তি এবং ফাঁপা উক্তি ও হতাশার বেয়াড়া উক্তি তাহাই বুঝিতে হয়। সত্যাসত্য যাহাই হউক মানবজীবনের লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিতেছিল এই 'রেলিজন' বা ধর্ম্ম; ধর্ম্মকে উদ্বর্ত্তিত ও অভিব্যক্ত করাই ছিল মনুষ্যের জীবনতন্ত্রের প্রধান 'লক্ষ্য'। ধর্ম্মই

(১) প্রত্যক্ষবাদী বৈজ্ঞানিকের 'পরীক্ষা পাত্রে' পড়িয়া কেতাবের সাক্ষ্যনির্ভর অথবা 'ঐতিহাসিক প্রমাণ' ও ঘটনানির্ভর 'ধর্ম্ম'গুলির ক্ষতি হইলেও দার্শনিক তত্ত্ববাদের উপরে নির্ভরকারী Pantheism বা Monism আদর্শের ধর্ম্ম (Religion) গুলির বরং যে উপকারই হইতেছে তাহাই বুঝিতে হয়। ডার্ব্বিনের Evolution Theory বা বৈজ্ঞানিকগণের Life Force প্রভৃতি আধুনিক সিদ্ধান্ত শক্তিবাদী বেদপন্থীর নেত্রে সর্ব্বজড়বিকাশিনী চিন্ময়ী 'মায়া'র প্রতিষ্ঠা পথেই বরং সহায়তা করিতেছে। আমাদের মতে পল ও জনের খ্রীষ্টানী আদর্শের মধ্যেও আধুনিক কালের সর্ব্বপ্রকার 'বৈজ্ঞানিক ঝোঁক' গ্রহণ করার শক্তিও কম নহে। ইদানীং তত্ত্ববাদের ভিত্তি ছাড়িয়া কেবল Materialistic প্রমাণ এবং fact-বা ইতিবৃত্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কোন 'ধর্ম্ম'ই আর যেন চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকটে মাহাত্ম্য রক্ষা করিতে পারিতেছে না।

আপাততঃ জড়তাময়ী প্রকৃতিমাতার গর্ভনিবাসী জীবের হৃদয়ে আপনার অমরযোনিতা ও 'অমৃত-পুত্র'তার 'প্রমাণ'। জীবনে এবং জগত্তন্ত্রে সত্য, প্রেম, আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের লীলাবিকাশই যেমন, অনেকের নিকটে, ভগবানের প্রধান 'প্রমাণ' হইয়াছে, তেমন, দার্শনিকতার ক্ষেত্রেও জীবন তন্ত্রে ধর্ম্মবস্তুর অস্তিত্ব এবং উহার মর্ম্ম-বিকাশের মধ্যেই অনেকে ভগবানের প্রত্যক্ষ স্পর্শ ও প্রাণান্তরীণ বোধি লাভ করিতেছেন। এরূপ 'বোধিসত্ত্ব' ব্যক্তির হৃদয় অবশ্য সর্ব্বসময়েই ধর্ম্মবুদ্ধিতে অনড় ও অচলপ্রতিষ্ঠ হইয়াই আছে; তবে, অপর যাহার পক্ষে ওই সাম্প্রদায়িক 'রেলিজন' বস্তু অপ্রতিষ্ঠ হইয়া গিয়াছে, তাহাকে ত যেরূপেই হোক, যে পথেই হোক, আপন জীবনের খুঁটি এবং অধ্যাত্ম লক্ষ্য বিষয়ে কোন একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেই হইবে! "স্বয়ং প্রয়োজন আর্ট" নামক পদার্থটি কখনও মানবজীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যবস্তু হইতে পারে না। জগতের ধর্ম্মেশ্বর কোন Godই যদি না থাকে, জীবনের জড়াতিরিক্ত কোন মহৎ উদ্দেশ্যই না থাকে, তা হইলে বুদ্ধিক্ষেত্রের (Intellectual) উন্নতিরই বা প্রয়োজন কি? Intellectual সুখের জন্য Artএরই বা আবশ্যকতা কি? আর্ট-ক্ষেত্রের কোন 'মানসিক' সুখই ত দেহতন্ত্রের 'স্নায়বিক' সুখের তীব্রতার সমকক্ষ হইতে পারে না! এ সূত্রে সংস্কৃত সাহিত্যে একটা কথাই ত আছে—

কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রং কাব্যং গীতেন হন্যতে।
স্ত্রিয়া চ হন্যতে গীতং হতং সর্ব্বং বুভুক্ষয়া॥

জীবনের ক্ষেত্রে 'অধঃ-ঊর্দ্ধ'গতিরূপ কোন 'ধর্ম্ম'পার্থক্য স্থিরীকৃত না হইলে কেবল "Eat, drink and be merry" আদর্শকেই ত সর্ব্বতোভদ্ররূপে মানিতে হয়! সে স্থলে ব্যবহারিক ভাবের'নীচ-মহৎ' ভেদ বা 'সামাজিক সোয়াস্তি বাদ' প্রভৃতি কথাও কেবল একটা লোকভুলানো মিষ্ট উক্তির কপটতা অথবা কেবল 'বেকুবের আত্মবঞ্চনা' ব্যতীত আর কি হইতে পারে? ঐ সমস্ত কেবল একটা 'সুবিধাবাদ' ব্যতীত আর কি হইতে পারে? তদানীন্তন বিলাতী সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের ধর্ম্মবুদ্ধির ঐরূপ বিকেন্দ্র এবং কূপদস্থ অবস্থায় ম্যাথু আর্ণল্ড ও ক্লাফ্ প্রভৃতি সহৃদয় কবি নিদারুণ

অন্তর্বেদনায় যে একটা 'হাহুতাশ' করিতেছিলেন, সে সূত্রে, আর্ট্‌কেই নরজীবনের 'স্বয়ং প্রয়োজন আদর্শ'রূপে খাড়া করিতে চাহিয়াছেন ওয়াল্টার পেটার্‌ ও তাঁহার শিষ্য অস্কার ওয়াইল্ড্‌। "জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত 'সুখ' চুরি করিয়া ও জীবের সুখসম্ভাবনার উপরে বাটোয়ারী করিয়াই কালগর্ভে বিলীন হইতেছে ; এ অবস্থায়, যতদূর পারা যায়, সচেতন ভাবে ও সুদৃঢ় মুষ্টিতে সুখকে চাপিয়া ধরাই হইল মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য—আর্ট্‌ও সুতরাং তাহাই লক্ষ্য করিবে"। ইহা পেটার মহোদয়েরই 'মত'। অতএব এক্ষেত্রে ধর্ম্মাদর্শসঞ্জাত 'উচ্চনীচ' বলিয়া কোন আদর্শবাদ কেবল ভুয়া কথা ; ফলে, ইন্দ্রিয়পরিতুষ্টি এবং সে দিকে যোগ্যতাই হইল তাঁহাদের 'আর্ট্‌' পদার্থটির প্রধান লক্ষ্য।

মানুষের 'অবিদ্যা'র সর্ব্বপ্রধান ঝোঁক এই যে, জীবনে ধর্ম্ম বা Morality নামক তত্ত্বকে কি করিয়া বিপ্রতিষ্ঠ করিতে এবং অস্বীকার করিতে পারা যায়। উহা না পারিলে প্রবৃত্তিমার্গী জীবের যেন 'সোয়াস্তি' নাই! এই দুষ্প্রবৃত্তি এবং আত্মাভিমানের ছিদ্রপথেই সংসারে 'কুবিজ্ঞান' প্রতিষ্ঠা লাভ করে ; মনুষ্যসমাজে সত্যবিদ্রোহী বিতণ্ডাবুদ্ধি ও কপটতার প্রসার ঘটে ; ধর্ম্মদ্রোহিতা এবং উহার সমর্থক 'কুগ্রন্থ'ও অভিনন্দিত হইতে থাকে। মানুষ একেই ত দেহের স্বার্থাভিমান বশে ধর্ম্ম ও সমাজনীতির বিদ্রোহী হইয়া আছে! স্মরণাতীত যুগ হইতে সমাগত ধর্ম্ম ও সমাজতন্ত্রের শিক্ষাফলেই দয়া, মমতা, সাধুতা, শিষ্টাচার (Gentlemanliness) পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম, পতিভক্তি, সমাজভক্তি প্রভৃতি স্বার্থাভিমান বিঘাতী 'ধর্ম্ম'ভাব এবং মনুষ্যের আদিম প্রকৃতিগত পশুত্বের Restraintরূপী একটা নৈতিক আদর্শ নরসমাজে সমাপন্ন অথবা উদ্বর্ত্তিত হইয়াছে। উহাদের বিরুদ্ধবাদে Rovolutionist হওয়া আর মানুষকে তাহার পশুধর্ম্মের খোশামোদ পথে আদিম অসভ্যতায় ফিরাইয়া লইতে চেষ্টা করা ফলতঃ একই কথা। ঈদৃশ Revolutionist হওয়ার মধ্যে কিছুমাত্র চিন্তাশীলতা অথবা 'মৌলিকত্ব' নাই ; কেবল একটা দুরাত্ম অহমিকা ও নির্লজ্জ সাহস। সমাজের দুর্ব্বত্তমাত্রের

চিত্ত মধ্যে ঈদৃশ 'মৌলিকতা' গিজগিজ করিতেছে। বিচেতন ও আত্মবিস্মৃত জনসাধারণ এই সাহসিকতায় মুগ্ধ হয়; পশ্চাচারের সমর্থনা পাইয়া উৎসাহিত হয়। সাহিত্যক্ষেত্রেও ধর্ম্মদ্রোহিতা ও যথেচ্ছাচারের সমর্থন করিতে পারিলে ইদানীং অর্থপ্রতিপত্তি সম্ভবপর হইতেছে। অতএব পাপবৃত্তির সহানুভূতি লাভের লোভেই লেখকগণ 'শিব'বিদ্রোহ এবং ইন্দ্রিয়ার্থ প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পাঠকের কুবন্ধু রূপেই দাঁড়াইয়া যাইতেছেন। জীবের অসৎপ্রবৃত্তি যতদিন আছে, কদর্থ-বিলাসও ততদিন আছে; 'শিব'দ্রোহী সাহিত্যও ততকাল গজাইতে থাকিবে। সচেতন পাঠকের পক্ষে এক্ষেত্রে সম্যক্‌দৃষ্টি লাভ করাই একমাত্র 'ঔষধ'। বুঝিতে হইবে এক্ষেত্রে, হয়ত অতর্কিতেই, সময় সময় "কবয়োপ্যত্র মোহিতাঃ"; "আর্ট্ করিতেছি" অছিলায় আত্মবঞ্চনা এবং জগৎবঞ্চনা!

অস্কার ওয়াইল্ড্ পুরাপু'রি ফরাসী রীতির 'সৌন্দর্য্য'বাদী লেখক—যাহাকে প্রতিভাবান্ বলা যায় এমন উচ্চদরের লেখক। তথাপি, তাঁহার সৌন্দর্য্যানুভূতি কেবল 'অন্নময় লোকে' এবং জড়তন্ত্রে ও স্নায়ুতন্ত্রেই বিস্তৃত ছিল; এই 'সৌন্দর্য্য'বাদীর শিল্পাদর্শও সুতরাং কেবল 'Pleasure' রূপেই দাঁড়াইয়াছিল। এরূপ সৌন্দর্য্যানুভূতি কত সহজে Perverse হইতে পারে, কেবল দিশাহারা ইন্দ্রিয়তুষ্টিরূপে পরিণত হইতে পারে! অস্কার ওয়াইল্ড একেবারে শ্রেষ্ঠশ্রেণীর একজন বাক্যশিল্পী। কেবল মনস্বিতা ও বুদ্ধির জোরেই সাহিত্যক্ষেত্রে ভাব-প্রকাশের এমন আলোকোজ্জ্বল বর্ণতুলি ও এমন প্রিয়মধুর দৃষ্টি'রীতি' অন্য কাহারও পুঁজিতে মিলিবে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশের ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার জুড়ি নাই। এমন চাতুর্য্য ও বুদ্ধিপ্রাখর্য্যময়ী লেখনী সাহিত্যসংসারে অতি অল্পই মিলিবে। তথাপি, উহার প্রধান 'বিশেষণ'টুকু কি? উহা কেবল delightful—সৌখ্যদায়ক; উৎকর্ষ স্থলেও কেবল হৃদয়হীন ও Intellectual একটা 'সুখ'—কোন অধ্যাত্ম গভীরতা উহার মধ্যে নাই। আমরা দেখিতে পারি, নিজের অন্তর্জীবনে যে 'সৌখ্য'রীতি তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন উহাতেই তাঁহাকে প্রকৃত

কবিত্বশক্তির ফলভাগী হইতে বাধা দিয়াছে ; কবিলোকে তাঁহাকে কোন দিকে আত্মনিষ্ঠা ও স্থির দীপ্তি লাভ করিতে কিংবা কবিশক্তির কোন মৌলিক রসধর্ম্মে তাঁহাকে স্থিরনিষ্ঠ হইতেও দেয় নাই। এজন্য তাঁহার কাব্যকবিতাগুলির মধ্যেও ভাবরসের কিছুমাত্র ঘনিষ্ঠতা কিংবা আত্মনিষ্ঠার গভীরতা নাই ; এক্ষেত্রে তিনি কেবল পররসিক ও পরধর্ম্মজীবী থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন ; আত্মকেন্দ্র চিনিতে বা উহাতে সুখাসীন ও সুস্থির হইতে জানেন নাই। কিন্তু, স্বীকার করিতেই হইবে যে তাঁহার গদ্য রচনা উহার বোধায়নী রীতিতেই অপরূপ ভাবে সৌখ্যকর এবং বর্ণচাতুর্য্যে অনুপম ভাবেই সমুজ্জ্বল।

অনাত্ম দৃষ্টিধর্ম্মই যে তাঁহার প্রতিভাকে মৌলিক প্রতিপত্তি ও গভীরতা লাভ করিতে দিল না তাহাই বুঝিতে হয়। এই প্রতিভাকমল জগতের ঋতনিষ্ঠা ও আত্মনিষ্ঠার বৃন্তহারা এবং মৃণালচ্যুত হইয়া জীবন-সলিলে কেবল যেন স্রোতের বহিরঙ্গ তালেই ভাসিতেছে ; উপরিচর লীলা-লালসায় ঢলঢল ভাবেই ভাসিতেছে! জর্ম্মণ রোমান্টিকগণও (যেমন নোফালিস) কদাপি জগতের আত্মাকে বিস্মৃত হন নাই—জর্ম্মণ রোমান্টিকতার অভ্যন্তরে একটা গুপ্ত অধ্যাত্ম আদর্শই কার্য্য করিতেছিল। কিন্তু পেটার্ ও অস্কার্ ওয়াইল্ড্ প্রভৃতির 'সুন্দর' সকল দিকে, জগতের শাশ্বত ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা ও ঋতের প্রপত্তিহীন এবং জগৎনিদান সত্যশিবসুন্দরের বিবেকবুদ্ধিবিহীন 'সুন্দর' ; জীবের বিজ্ঞান-ভূমি ও অধ্যাত্মভূমির সৌন্দর্য্যকে ভুলিয়া কেবল অন্নময় ও মনোময়ভূমির একটা সৌষ্ঠব বুদ্ধি! ওইরূপ সৌন্দর্য্যবাদের ফল কি, তাঁহাদের রচনা মধ্যেই উহার প্রমাণ—কেবল জড়সৌন্দর্য্য, অনাত্ম Intellectual সৌন্দর্য্য—বহিস্তন্ত্র সৌন্দর্য্য। ধর্ম্মসুন্দর অথবা অধ্যাত্মসুন্দরকে ধামা চাপা দিয়া কেবল জড়সুন্দর অথবা মনগড়া ভাবের একটা Sentimental প্রপত্তি। উহার গতিকেই (ইংরেজ সমালোচকগণও কেহ কেহ উহা বুঝিয়াছেন) অস্কার্ ওয়াইল্ড্ অনেক সময় কেবল Insincere এবং 'Poser' ; তাঁহার সকল ভাবপ্রকাশ ও ভাবুকতার ভঙ্গী যেন কেবল একটা

কায়দাবাগিশী ও লোকদেখানো ভঙ্গী ; কেবল চৈঁয়ালিনবীশের, Lover of Paradoxএর ভঙ্গী। পুনরপি বলিতেছি, এত বড় বাক্যপ্রতিভাশালী একজন লেখক সাহিত্যজগতে কমই মিলিবে—অথচ প্রকৃত রসের তরফে একেবারে ফাঁপা ; ফুটবলের মত উড়ন্ত, চলন্ত ও শব্দায়মান এই বাক্যশক্তি ; প্রকৃত রসাত্মকতা, প্রকৃত গভীরতা, প্রকৃত প্রাণাকর্ষণী প্রাণপ্রেরণা কিংবা প্রাতিভদৃষ্টির কোন দিব্যপ্রজ্ঞা যেন তাঁহাতে পাই না। যে স্থলে কবির প্রকৃত ভাবতন্ময়তা ঘটে নাই, অথবা কবির 'কাব্য' যখন আত্মতত্ত্ব হইতে সহজ ও অপরিহার্য্য হইয়া আসে নাই, তখন কেবল পরের অনুচিকির্ষা অথবা উপরিচরী বুদ্ধির চালে চলিতে গেলে কবির যে দশা হয়, উহার প্রমাণ যেমন অস্কারের মধ্যে, তেমন আধুনিক Cultureযুগের সকল কবির মধ্যেই ন্যূনাধিক মিলিবে। উহার প্রধান ফলই ত অভিনয়ের ঢং এবং কপটতাব সেন্টিমেণ্টাল একটা 'ভরং'—Pose ও Insincerity !

সাহিত্যজগৎ অস্কার্ ওয়াইল্ডকে কখনও 'ছাই চাপা' দিতে পারিবে না, কারণ, উহার মধ্যে বাক্যপ্রতিভার দ্রুতি ও দীপ্তি শক্তি—আগ্নেয়ী ও তৈজসী শক্তি। উহার প্রচলনী এবং হাঁকডাক দিন দিন হয়ত বাড়িয়াই চলিবে, অচেতন ব্যক্তিকে হয়ত মুগ্ধও করিবে। উহাব মধ্যে যে আকর্ষণী আছে তাহা Intellectualismএর আকর্ষণী, সাহিত্যে 'আকৃতি'র বা Formএর আকর্ষণী ; সুতরাং নিরেট জড়তন্ত্র হইতে উহা উচ্চ দরের আকর্ষণী। Formকে তিনি 'আত্মা' অপেক্ষাও বড় মনে করিতেন ! এ সমস্তের দরুন সাহিত্যক্ষেত্রে অস্কার্ ওয়াইল্ড একটা গম্ভীর সমস্যাময় প্রতিভা। ধর্ম্ম, নীতি অথবা আত্মা বলিয়া কোন তত্ত্বে নির্ভর না করিলেও, উহা জড়তাকে মনোময় ক্ষেত্রে লইয়া আসিয়া কেবল (Intellectual) 'বোধায়ন' ভাবে ও Sentimental ভাবুকতায় ধারণা করে বলিয়াই উহার প্রধান আকর্ষণী। অস্কার্ ওয়াইল্ডের গদ্যও অন্ততঃ একদিকে, ইংরেজী রোমান্টিক গদ্যের চূড়ান্ত শক্তি প্রমাণিত করিতেছে। তবে এ'ক্ষেত্রেও, অনেক রোমান্টিক লেখকের ন্যায়,

তাঁহার সামর্থ্য কেবল মনুষ্যমনের ও মানবজীবনের নিম্নতর কোঠাতেই পরিসমাপ্ত। কেবল চাতুর্য্য ও বিরোধাভাসময় চমৎকারী বাক্যের লিপিকৌশল ব্যতীত শিল্পক্ষেত্রে কোন মহনীয় ধর্ম্ম-ধারণা, কোন উচ্চগভীর ভাবুকতার পরিপোষণা তন্মধ্যে অত্যল্পই পাইতেছি। মানুষের 'সচ্চিদানন্দ শিব' স্বরূপকে তিনি কোনদিকে জাগাইতে পারেন না; কেবল মানবজীবনের নীচের তালাতেই তিনি সকল বাক্য-কারদানী প্রকাশ করিতেছেন। এজন্য শিল্পসমালোচনার তরফেও কেবল Artএর বহিরঙ্গ স্বরূপ ও প্রণালী বিষয়েই অস্কার্ ওয়াইল্ডের প্রায় সমস্ত প্রসঙ্গচেষ্টা পর্য্যবসিত; সে ক্ষেত্রেও কেবল Paradoxপ্রীতি এবং বাক্যরচনার চটকদার ভাবভঙ্গী ব্যতীত তন্মধ্যে কোন অধ্যাত্ম গভীরতাই উপলব্ধি করিতে পারি না।

পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি, সাহিত্যের শিল্পী কিংবা সন্দর্ভকারের প্রতিও প্রধান প্রশ্ন এই যে, জগৎ ও জীবনের আন্তরিক সত্য, মানুষের পরম তত্ত্ব ও চূড়ান্ত ক্ষুধা তুমি কি পরিমাণে বুঝিয়াছ? ঐ ক্ষুধার অন্ন কি পরিমাণে যোগাইতে পারিয়াছ? মানুষের অমরতত্ত্ব, দিব্য শরীর ও দিব্য নিয়তির কোন খবর যদি না পাইয়া থাক, না বুঝিয়া থাক, তবে মাহাত্ম্যহীন তোমার লেখনী! তোমার কৃতিত্বের পক্ষে সংসারে অমর হইবার জন্য প্রকৃত কোন দাবী নাই। যে শিল্পীর লিপি-কৌশল উচ্চাঙ্গের ভাবুকতা ও উচ্চাঙ্গের অধ্যাত্মজীবন-ধারণায় পটুত্ব দেখাইতে পারে না, সে দিকে ভাষার সাক্ষাৎশক্তির অতীতক্ষেত্রেও রসধারণার সামর্থ্য দেখাইতে পারে না, অপর সকল দিকে সহস্র চমৎকারিতা দেখাইলেও, চূড়ান্ত বিচারক্ষেত্রে তাহার ওজনই বা কত?

অস্কার্ ওয়াইল্ডের গদ্য হুগোর মত প্রাণবেদনাময় ও পেশল গদ্য নহে; গ্যাঠের ন্যায় জ্ঞানঘন ও শান্তগভীর, নিস্তরঙ্গ গদ্যও নহে। তবে, রবীন্দ্রনাথ ও মৈতরলিঙ্ক্ প্রভৃতি স্বল্প কতিপয় গদ্যসাধক ব্যতীত এমন রঙ্গিল ও লালিত্যময় গদ্যও আধুনিক সাহিত্যে অধিক দেখিব না। অস্কার্ ওয়াইল্ডের বাক্যপ্রতিভা বিষয়েও প্রধান নির্দ্দেশ এই যে,

রোমান্টিক শ্রেণীর বাক্যশিল্পিগণের ন্যায় উহা কেবল বুদ্ধিতন্ত্রীয় পরিমার্জ্জনা ও বাহ্য চাকচিক্যের চমৎকারময় গল্প; অবান্তর বিষয়ে উহার বিপুল বর্ণপ্রাচুর্য্য, মূল বিষয়ে কেবল বেয়াড়া আভাস—'রসাভাস'! শিল্পদার্শনিকতার ক্ষেত্রে অস্কারের শ্রেষ্ঠকৃতি Intention. উহাও আর্টের 'আত্মা' এবং চূড়ান্ততত্ত্ব বিষয়ে হয়ত সবিশেষ গভীরগাহী নহে; কেবল চাতুর্য্যচমৎকারী বাক্যের দর্পজ্বালা এবং ঝলঝলা দেখাইয়াই উহা চিত্তাকর্ষক হইতেছে। সাহিত্যজগতের অনেক বড় কবি বা শিল্পীর প্রসঙ্গচেষ্টার মধ্যেও জগতের এবং মানবজীবনের 'সত্য' কিংবা 'রহস্য' বিষয়ে নানা প্রশ্ন উঠিয়াছে, সমাধানও খুঁজিয়াছে; কিন্তু অস্কার্ ওয়াইল্ডের গল্প মধ্যে কেবল 'আর্ট'এর আদর্শনিরূপণটুকুই প্রগল্‌ভতর এবং তাঁহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তিও কেবল 'সুখ'—একেবারে অনাত্ম 'সুখ'বাদ। আর্টের বিষয়েই তাঁহার একটি নিতান্ত বেয়াড়া কথা এই যে, Form বা আকৃতিই নাকি উহাতে 'মুখ্য'। (১) এই ছোট একটি কথা হইতেই অস্কারকে এবং তাঁহার সকল শিল্পসাধনার মূল 'জাতি'টাকে চিনিতে পারি। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, এতদ্দেশেও এরূপ 'মত'বাদী একটা 'দল' ছিল যাহারা বলিতেন, "কাব্যস্য আত্মা রীতিঃ"। শিল্পক্ষেত্রে ইনি একজন Epicurian—কেবল 'সুখ'বাদী; মনুষ্যত্বের প্রধান গুণলক্ষণ যে 'ধর্ম্ম' তাহার অস্বীকারী এবং কেবল Beautyবাদী। শিল্পীর সমক্ষে 'আকৃতি' আগে না 'আত্মা' আগে? ভাবই মুখ্য, না ভাষা? শিল্পক্ষেত্রে সৃষ্টিমাত্রের মধ্যেই একটা 'গতি' আছে; এই গতি উদ্দেশ্য হইতে কার্য্যে; সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে; আত্মা হইতেই সূক্ষ্ম শরীরে ও স্থূল শরীরে। যাঁহারা এ আলোচনায় আমাদের সঙ্গে মনোযোগ দিয়াছেন তাঁহারাই দেখিবেন যে, কাব্য যখন রসাত্মক 'বাক্য', তখন 'রস'ই ত কাব্যের 'আত্মা'; এবং 'বাক্য'

(১) Intentions ২০০—২০১ পৃষ্ঠা দেখুন।

বলিতেও শব্দ কিংবা অর্থের যাবতীয় 'প্রবৃত্তি', রীতি এবং অলঙ্কার প্রভৃতিও তন্মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে ; ছন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া জাতি-দ্রব্য-গুণ ও ক্রিয়াময় সর্ব্বপ্রকার 'পদার্থ'ই ত আসিতেছে ; আকৃতি বা Form'ও আসিতেছে ! অতএব এক্ষেত্রে চরম কথা কি ? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের গতিকে কোন সাহিত্যসেবীর পক্ষে এখন আর আদর্শবিষয়ে অচেতন কিংবা তটস্থ হইয়া চলিবার জন্য, নিজের মনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলিবার কিংবা আত্মবঞ্চনার জন্যও অবকাশ নাই। কেবল শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে কেন, ধর্ম্মে, সমাজে, পরিবারে এবং ব্যক্তিগত জীবনে সভ্যমানুষের পক্ষে সচেতন ভাবে আদর্শধারণা ও জীবনযাপনা এমন অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে এখন আর কোনদিকে 'ঢিলামি' করার সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানকর্ম্মে আদর্শ চৈতন্য শিথিল হইলে, বর্ত্তমান কালের পরিবেষ ধর্ম্মেই পদে পদে নানা ভুল ভ্রান্তি ঘটিয়া তোমাকে আত্মধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট করিবে—আত্মহত্যার পথেই লইয়া যাইবে। অধুনা প্রত্যেককে বুঝিয়া লইতে হইবে—আমি জড়বাদী না অধ্যাত্মবাদী ? এ'কালে সাহিত্যের যত আদর্শ 'উন্নতি'তন্ত্রে অথবা 'রক্ষা'মন্ত্রে আত্মখ্যাপন করিতেছে (Art for Art's sake বা Beauty's sake প্রভৃতি) প্রত্যেকের তলেতলেই 'স্বতঃসিদ্ধ' বা 'স্বীকার্য্য'রূপে একটা না একটা 'জীবনাদর্শ' গুপ্ত আছে। আপনার আদর্শকে স্থিরনিশ্চয়ে ধরিতে না পারিলে সাহিত্যসেবক দিশাহারা ও আত্মহারা হইয়াই আধুনিক সাহিত্যের অনর্থারণ্যে ঘুরিবেন। অতএব এক্ষেত্রে সাহিত্য-সেবকের চরম 'ধৃতি' বা ধর্ত্তব্য কি ? সৌন্দর্য্যের উর্ব্বশী না লক্ষ্মী ? যে সভ্যতা কেবল ইহজগৎকেই জীবনের 'এককেন্দ্র' বলিয়া গ্রহণ করে, আন্তর্জ্জগতিক Spirit কেন্দ্রকে চিনে না, তাহার যেমন 'জীবনজ্ঞান' হয় নাই, 'মনুষ্যত্ব বিজ্ঞান'ই লাভ হয় নাই, তাহা যেমন কদাপি প্রকৃত 'সভ্যতা' নহে ; যে সামাজিক বা সমাজধর্ম্ম কেবল ইহজীবনের 'সুখ'কেই মনুষ্যের চরম লক্ষ্যরূপে ধরিয়া চলে, মনুষ্যের অমৃততত্ত্ব ও অমরজীবন যে স্বীকার করে না, সে যেমন 'চণ্ডাল' ও

'অস্পৃশ্য' ; তেমন, যে সাহিত্য কেবল ঐহিকতা, ইহজগৎ ও ইহজীবনকেই নিজের রসতত্ত্বের মুখ্য ভিত্তিরূপে বরণ করিয়া মনুষ্যের মনোজীবন, বিজ্ঞানাত্মা কিংবা অধ্যাত্মস্বরূপকে গৌণ করিয়াছে অথবা উহাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতেছে হাজার সৌখ্য যন্দর অথবা চাতুর্য্যমনোহর হইলেও তাহা কদাপি উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য নহে। উহা জগত্তন্ত্রে একটা বিকেন্দ্র, বিহ্বল এবং বিপথিক সৃষ্টি ; চূড়ান্ত বিচারে উহা কোনদিকেই মূল্যবান্ নহে।

এ বিষয়ে আর আলোচনা বাড়াইয়া কোন ফল নাই ; আলোচনার কোন শেষও সম্ভবতঃ নাই। সেই 'সচ্চিদানন্দ' তৎ বা নিত্যবস্তুই যে অনন্তবৈচিত্র্যময় জগৎপ্রবাহের 'এক' কারণ তাহা ভুলিয়া, 'আদর্শ'বিচারকগণ কেহ বা সত্যকে, কেহ সৌন্দর্য্যকে কেহ বা শিবকে

১০৫। 'সচ্চিদানন্দ রস'ই চরম বিচারের মাপকাঠি।

একান্তভাবে ধরিয়াই সাহিত্যের তত্ত্বচিন্তার ক্ষেত্রে অশেষ একদেশী দৃষ্টি ও গোঁড়ামীর হেতু হইয়াছেন। এ বিষয়ে সমালোচনাও (অবান্তরভাবে) মানুষের ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে (আপাতদৃষ্টিতে অনধিকার) প্রবেশ করিতে থাকিবে ; না করিলে আদর্শনিরূপণে উহার পক্ষে উপায়ান্তর নাই। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা গতিকে দেশে দেশে লেখকগণের প্রবৃত্তি মাফিকও উদ্দেশ্যগতিক গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হইতেছে এবং হইতে থাকিবে। যিনি সাহিত্যের 'সত্যশিবসুন্দর রস' আদর্শ বুঝিয়া এবং মানিয়া লইতে পারিয়াছেন তাঁহার হৃদয় অনায়াসে আধুনিক কালের এই গ্রন্থারণ্যে পথ চিনিয়া লইতে পারিবে। Art for Art's sake খ্যাপনে যাহারা শিল্পকে মনুষ্যত্ব আদর্শ হইতে স্বাধীন করিতে চাহেন—মানুষের এ যাবৎ কালোপচিত ধর্ম্ম, সমাজ বা পরিবার প্রভৃতির আদর্শসম্পর্ক ছাড়াইয়া কেবল নিজের মতলব মতে চলিতে চাহেন—তাঁহাদিগকে যেমন চিনিতে পারিবে ; আবার যাঁহারা ঐরূপ কথায় শিল্পকে কেবল কোন বিশেষ বৃত্তান্তঘটনার বা প্রাকৃতের Imitation মাত্র বলিতে চাহেন তাঁহাদিগকেও পরিচিহ্নিত করিয়া এবং বুঝিয়া উঠিতে পারিবে ; পুনশ্চ, যাঁহাদের নিকট সাহিত্যশিল্প

কেবল 'বিজ্ঞান'অধিকারের 'বস্তু সংগ্রহ' মাত্র তাঁহাদিগকে চিনিতেও ভুল হইবে না। তাঁহার পক্ষে তথাকথিত ক্লাসিক আদর্শের অচঞ্চল শান্তিচর্য্যা ও 'আকৃতি'পক্ষপাত বুঝিতে, অথবা রোমান্টিকের বর্ণনাবিলাস, ছন্দপ্রাচুর্য্য এবং রসাভাসের দোষগুণ সম্যক্‌দৃষ্টিতে পরিচিহ্ন করিতেও কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না। এইরূপে 'চেনা' ও 'বোঝা' লইয়াই ত সাহিত্যক্ষেত্রে মানুষের 'রুচি'! 'রুচিগঠন' ব্যতীত এ'কালের সাহিত্যক্ষেত্রে 'প্রবেশ-নিষেধ' বলিলেই যথার্থ হয়; এবং ইদানীং সাহিত্যপ্রবেশে লেখক অপেক্ষাও বরং পাঠকের 'যোগ্যতা' উপার্জ্জনটাই অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ফরাসী জাতির মস্তিষ্ক হইতে মানুষের ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্যের আদর্শ বিষয়ে অনেক নূতন তত্ত্ব প্রসূত হইয়াছে। এ জাতি যে কালে কালে মানুষের জ্ঞানপন্থাকে নানাদিকে (ভালমন্দ উভয়দিকে) প্রসারিত করিয়াছে, এবং সেরূপ প্রসারসাধনের জন্যই মনুষ্যজাতির শ্রদ্ধার পাত্র তাহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে কোনপ্রকার 'রাজত্ব' বা 'প্রভুত্ব'বাদের জন্য স্থান নাই। সাহিত্য-আদর্শের সমালোচনাকে মানুষের মনোবিজ্ঞানের অঙ্গ বিশেষরূপে ধরিয়াই আমরা একালে ঐ Art for Art's sake, Realism ও Naturalism প্রভৃতি অভিনব আদর্শের ফল, বল ও মূল্য চিন্তা করিয়া আসিয়াছি। শ্রীমৎ রোমা'ন রোঁল্যা আধুনিক ফরাসী জাতির একজন চিন্তাশীল লেখক; তাঁহার 'জন খ্রীষ্টপার' গ্রন্থ আধুনিক ইয়োরোপীয় সভ্যতার 'হৃদয় বেদ'রূপেই পরিগণিত হইতে পারে। আধুনিক সভ্যতার দোষগুণ, (উহার প্রাণবল এবং হৃদ্‌রোগ উভয়টাই) উক্ত গ্রন্থে (হয়ত অতর্কিতে) তিনি ধারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়াই অনেকে মনে করিবেন। ঐ গ্রন্থে তিনি একস্থানে স্বজাতির মূল প্রতিভা ও বিশেষত্ব বিষয়ে একটা শ্রদ্ধাত্মক ধারণা প্রকাশ করিয়াই বলিয়াছেন যে ফরাসীর মনস্তত্ত্বে Understandingটাই মুখ্য—

১০৬। সাহিত্যিক 'রস'-বস্তুর প্রধান 'প্রয়োজন' এবং 'শিব'আদর্শের চূড়ান্ত লক্ষ্য—মানবাত্মার স্বাধীনতা প্রাপ্তি বা মুক্তি। উহার বিরুদ্ধবাদী লেখকগণ।

"The Free Latin Spirit whose first law is understanding, to understand as far as possible of life and mind at the risk of cheapening moral codes." আবার—

"Long live the gallic salt that revives the world".

অধিকাংশ লেখকের 'মনোগতি' বিচারেই যদি জাতিবিশেষের মুখর এবং প্রবল মনোধর্ম্ম (Mentatity) নিরূপণ করিতে হয়, তবে বলিব যে রোমা'ন রোঁল্যার উক্তি মোটামোটি যথার্থ—ফরাসী বুদ্ধির প্রধান ধর্ম্ম Understanding. উক্তগুণেই ফরাসী জাতি আধুনিক ইয়োরোপের দর্শন শাস্ত্রের জনক হইয়াছেন, বিজ্ঞানকেও সবিশেষ অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। Understanding ত সাহিত্যশক্তি নহে—বিজ্ঞানশক্তি। ঐ শক্তিতেই ফরাসী জাতি সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন নূতন অনেক 'মত' (Theory) দিতে পারিয়াছেন সত্য, কিন্তু স্থায়ী অথবা সমুন্নত সাহিত্যের আসরে ইংরেজ অপেক্ষা মহত্তর উপায়ন উপস্থিত করিতে পারেন নাই। আবার, Understanding বৃদ্ধি করাও ত Science এর ধর্ম্ম উহার Realism ও Naturalism প্রভৃতি প্রণালীর প্রধান কার্য্য! সাহিত্যের কোন কবি তাঁহার কাব্যের 'মতলবী' বস্তু-উপস্থাপনার প্রণালীতে, জীবনের কোন 'সত্য'কে স্বয়ং নূতন ভাবে উপলব্ধি বা Understand করিতেছেন বলিয়া মনে করিতে যেমন পারি না, তেমন, কোন পাঠকেও, কবির তাদৃশ 'উপস্থাপনা'র দ্বারে, মানবজীবনের কোন 'সত্য'কে (বিজ্ঞানের ন্যায় অসন্দিগ্ধ ও নিব্যূঢ় ভাবে) বুঝিতেছেন বলিয়াও ত ধারণা হয় না! দেখিতে হয় যে, কবি তাঁহার 'সত্য'টুকু আগেই 'দেখিয়াছেন', কাব্যের 'মতলবী' প্রমূর্ত্তিপথে উহা পাঠককে 'দিতেছেন', এইমাত্র। পাঠকও উক্ত উপস্থাপনা হইতে কবির 'মর্ম্মার্থ'টাই ত বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন! এস্থলে (কাব্যের 'সত্য'সংকেত এবং কবির বিষয়-'উপস্থাপনা') উভয়ত্র 'বৈজ্ঞানিক রীতি'র (Scientific Method) অনুযায়ী কোন সত্যের Presentation অথবা Understanding ব্যাপার সমাধা হইতেছে কি? আবার, স্বয়ং সাহিত্যস্রষ্টা কবিগণই

আপনাপন জীবনের কঠোর সত্যবর্ত্মে তাঁহাদের নিজের Understanding টুকুর দ্বারা সবিশেষ সুবিধা করিবার পরিচয় ত দেন না। মানবজীবনের দুইজন সর্ব্ববাদিসম্মত, গভীর সত্যবেত্তা ব্যক্তি হইতেছেন শেক্সপীয়র ও স্কট্—তাঁহারাই ত স্ব স্ব জীবনপথে সবিশেষ Undeceived হইয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাই! ফলতঃ, সাহিত্যের প্রণালী অথবা উদ্দেশ্যে Understandingটা কোন দিকে মুখ্য নহে। দেখিয়া আসিয়াছি যে, সাহিত্যে আত্মযোগী কবির 'প্রাতিভদৃষ্টি'ই সত্যের দর্শনে এবং বাক্যপথে উহার ভাবসুন্দর প্রমূর্ত্তি-সংঘটনে তাঁহার প্রধান সহায়। সাহিত্যে 'কবিকল্পনা' নামক বস্তুটী জীবের অন্তরাত্মার জড়াতিশায়ী, অনন্ত শক্তিমত্তা, আত্মার পরম স্বাধীনতা এবং মুক্তিতত্ত্ব সপ্রমাণ করিয়া, মানুষকে তাহার জ্ঞান ও ভাবতত্ত্বের দিব্যধর্ম্মের সংবাদ দিয়াই মানুষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ও বরিষ্ঠ 'প্রয়োজন' সাধন করে। মানবাত্মা বিশ্বব্যাপী শক্তি-প্রসারময়, অমর পদার্থ—পরম আনন্দময় তত্ত্ব। সে বিশ্বাত্মার ঔরস-জাত—বিশ্বাত্মাই ত সে! অথচ ক্ষুদ্র ও বিনশ্বর জৈবদেহের এবং সঙ্কীর্ণ মনুষ্যমনের কারাপঞ্জরে প্রত্যেকের এই 'আত্মা' আবদ্ধ আছে। কবিকল্পন মানুষকে দেহমনের বন্ধনবিলঙ্ঘী এবং জগৎ-সীমাতিশায়ী আত্মতত্ত্বের রসাস্বাদ দান করে। মর্ত্ত্যবাসী মনুষ্যের সমক্ষে অপ্রবুদ্ধ ও হৃতবিস্মৃত আত্মতত্ত্বের খবর দিয়া এবং তাহার সেই 'সচ্চিদানন্দ' স্বরূপটীর স্মৃতিসমাচার জাগাইয়া দিয়া কাব্যের রসায়ন পথে (অস্ফুটভাবে হইলেও) মানুষকে স্বধর্ম্মে 'প্রবুদ্ধ' করে বলিয়াই কাব্য মানুষের অন্তরাত্মার সর্ব্বপ্রধান সুহৃৎ; অখণ্ড ও শাশ্বত আত্মসত্তার পদ-পথ দেখাইয়া দেয় বলিয়াই কাব্য মানুষের সর্ব্বপ্রধান 'গুরু'। এজন্য পরকল্পনা বা Imaginationটাই কবিত্বের সর্ব্ববরেণ্য শক্তি এবং আত্মার 'আনন্দ-রসায়ন'ই উহার শ্লাঘ্যতম 'ধর্ম্ম'। নচেৎ, ইতিহাসবিজ্ঞানের ন্যায় কেবল ভূয়োদর্শনকেই (Observation) মুখ্য করিলে কিংবা কেবল মানুষের Understandingটুকু বর্দ্ধিত করিলে, কাব্যসাহিত্যের কিংবা কোনপ্রকার শিল্পের কিছুমাত্র মাহাত্ম্য দাঁড়াইত না।

ফরাসী রিয়ালিষ্ট্ ও নেচরেলিষ্ট্ লেখকগণ মানবজীবনকে নিজেরা বুঝিবার জন্যই যে "at the risk of cheapening moral codes" এত সমস্ত অশ্লীল ও অসাধু গ্রন্থের এবং পরিকল্পনার মাহাত্ম্যহীন সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা ত কোনমতে মনে করিতে পারি না! এদিকে বরং মানুষকে নিম্ন শ্রেণীর শস্তা আমোদে খুশী করিয়া নিম্নদরের সহানুভূতি ও প্রতিপত্তি উপার্জ্জন করিতে এবং 'বাজারবিক্রী' বাড়াইতে চাহিয়াছেন বলিলেই হয়ত প্রকৃত কথা বলা হয়। শ্রেষ্ঠশ্রেণীর 'কাব্য' মানুষের চিৎজীবন ও চিদানন্দ বর্দ্ধিত করিয়াই পূজা লাভ করে; এরূপ 'আনন্দ' ভবতত্ত্বে দুর্ল্লভ বলিয়াই উহাদের 'পূজা'। মানবাত্মা স্বয়ং সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব বলিয়াই সাহিত্যের নিঃস্বার্থ ও অনাবিল চিদানন্দ উহার সর্ব্বোত্তম খাদ্য। ফরাসী রিয়ালিষ্ট্ ও নেচরেলিষ্ট্ কথালেখকগণ সরস্বতীর পবিত্র সদাব্রতে জড়তন্ত্রীয় কামানন্দ এবং স্নায়ুতন্ত্রীয় আমোদরস পরিবেষণ করিয়া বরং মানুষের সাহিত্যরুচি ও আনন্দবুদ্ধি আবিল করিয়া দিয়াছে; মানবাত্মার দিব্যদৃষ্টি অন্ধ করিতেই সাহায্য করিয়াছে।

আনাতোল ফ্রান্সেও আধুনিক ফ্রান্সের একজন প্রসিদ্ধ লেখক ও 'পণ্ডিত' ব্যক্তি বলিয়াই ধারণা হয়—যদিও রোমাঁ রোঁল্যা (প্রকৃত সূক্ষ্মদৃষ্টিতে) তাঁহাকে কেবল একজন Dilettante বলিয়া, কেবল পল্লবগ্রাহী ও পণ্ডিতমানী ব্যক্তি বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন। জীবনী পাঠে দেখিতেছি, তাঁহার ভক্তবৃন্দ এবং ভৃত্যবর্গ আনাতোলকে সাহিত্যের একজন 'অমরযোনি' (Immortal) বলিয়া ঘোষণা পূর্ব্বক একটা বহুস্ফীত স্তুতিবন্দনাই তাঁহার কর্ণে অবিরাম-অবিশ্রাম বৃষ্টি করিয়া গিয়াছে। কিন্তু বলিতে হয় যে, সাহিত্যের 'অমরত্ব' কথাটাও একটা 'ধর্ম্ম' অধিকারের 'সংজ্ঞা'। কবির কৃতিত্বের মধ্যে জীবহৃদয়ের উচ্চ উন্নয়নী ধর্ম্মশক্তির বলবত্তা (Moral force) লইয়াই উহার মুখ্য 'অর্থ'। বলিতে কি, এই শক্তিধর লেখকের মধ্যে একটা শূন্যগর্ভ জ্ঞানদম্ভ ও 'ইয়ারী রীতি'র তারল্যই আমাদের হৃদয়মনকে প্রতিনিয়ত আঘাত করিতেছে। তাঁহার

১০৭। 'শিব'সুন্দরের বিপক্ষবাদী আনাতোল ফ্রান্সে।

মতে মানুষের ধর্ম্মশাস্ত্র, সমাজ বা নীতিশাস্ত্র প্রভৃতির নাকি কিছুমাত্র সত্যভিত্তি নাই। (vide his Art vie Literature) যদি উহাই তাঁহার বিশ্বাস ও সিদ্ধান্ত হয়, তবে আনাতোল ফ্রান্সেও (জোলার Naturalism এর বিরুদ্ধে যাহাই বলুন বা অন্য যাহাই রচনা করুন) ফলে, 'রিয়ালিষ্ট্' রীতিতে মানুষের ইন্দ্রিয়তুষ্টির জন্যই যে তাঁহার Red Lilyর জন্মদান করিয়াছেন তাহাতে ত সন্দেহ হয় না! তাঁহার নায়িকা (Lily) বলিয়াছেন, "ব্যভিচারকেই একটা আর্ট্ বা 'ললিত বিদ্যা'রূপে তাঁহারা খাঁড়া করিতে চাহেন!" অতএব ব্যভিচারী কামকে সুগন্ধসুন্দর এবং মুগ্ধমধুর মূর্ত্তিতে উপস্থিত করাই ত Red Lilyলেখকের লক্ষ্য ছিল!

ইংরেজীতে যাহাকে Railery বা জবরদস্ত কথায় Olympian Irony বলে—মুরব্বি গোছের ব্যঙ্গকৌতুকময় একটা বিদূষক রীতি—তাহাই যে 'জন্ম প্রকৃতি' আনাতোল ফ্রান্সের ভাবভঙ্গী ও কণ্ঠস্বরে বিমিশ্র করিয়া দিয়াছিলেন উহা চিনিতে বিলম্ব হয় না। সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি অবশ্য 'প্রেম' এবং 'সৌন্দর্য্য' বস্তুর প্রেমিক; কিন্তু মানবজীবনের কোন শাশ্বত নিদান বা সমুন্নত নিয়তি বিষয়ে তাঁহার কোনরূপ বিশ্বাসই ছিল না। তাঁহার 'প্রেম' বা 'রূপ'তন্ত্র কেবল একজন মেজাজী ও ভোগতন্ত্রী ব্যক্তির বিশেষত্ব ব্যতীত অপর কিছুই নহে। এই জগৎ ও জীবন অপরিহার্য্য ভাবে জীবের স্কন্ধে চাপিয়াছে; যতদূর পারা যায় এই অপরিহার্য্যের 'সদ্ব্যবহার' করিয়া অপিচ বেপরোয়া এবং 'ড্যামকেয়ার'ভাবে 'সুবিধা' টুকুন ভোগ করিয়া চলাই নাকি 'পণ্ডিত ব্যক্তি'র কর্ত্তব্য! জীবনের তত্ত্ববিষয়ে এতাদৃশ একটা সিদ্ধান্তধারণা এবং তদনুগত ভাবে জীবনচর্য্যার আদর্শটুকুই তাঁহার সকল 'আর্ট্ সাধনা'র তলে তলে উহাদের স্থায়িভাব-রূপে দাঁড়াইয়া আছে—ওয়াল্টার পেটারের মধ্যেও যে-জাতীয় একটা দার্শনিকতার আভাস পাই। ইয়োরাপে বর্ত্তমান যুগে ঈদৃশ বিচিকিৎস বা 'অবিশ্বাসী' ব্যক্তির ত কোনদিকে সংখ্যাভাব নাই! তাঁহাদের নিকটেই আনাতোল ফ্রান্সে হৃদয়মনের অতিমাত্র সুবন্ধু এবং একেবারে

বিজ্ঞানসিন্ধু রূপেই দাঁড়াইয়া যাইতেছেন। আপাততঃ 'প্রেমের আত্মবঞ্চনা' দেখাইবার জন্য আনাতোল ফ্রান্সে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ Thais লিখিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথও আংশিক ভাবে যে উদ্দেশ্যে তাঁহার 'নষ্টনীড়' কথার অসৌভাগ্য ও অশোভন বিষয়টী গ্রহণ করিয়াছিলেন। আনাতোল ফ্রান্সে বাক্যরীতির রসবত্তায় কিংবা লিপিচাতুর্য্যে কোনদিকে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী না হইয়াও, আর্টের মিতাচার, সরলতা ও স্ফুট রসসিদ্ধির ওজনে এবং বিষয়মাহাত্ম্যে তাঁহার Thais কথায় 'তৃতীয়'বিশ্বাসী রবিকবি অপেক্ষাও মহত্তর সাফল্যে উপনীত হইয়াছেন বলিয়াই ধারণা হইতে থাকে। কিন্তু যাঁহারা আনাতোল ফ্রান্সের Temptation of St. Anthoryর সমসূত্রে Thais কথা পাঠ করিবেন, তাঁহারাই দেখিবেন যে, প্রেমের কোন মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য ত লেখক Thais রচনায় শ্রমস্বীকার করেন নাই, করিয়াছেন মানুষের অধ্যাত্ম আদর্শ এবং ধর্ম্মবুদ্ধির নিদারুণ বৈয়র্থ্য, শূন্ততা এবং বিফলতা দেখাইবার জন্য। মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধির ব্যর্থতা এবং অনর্থতা দেখাইবার জন্যই এই 'অমর-যোনি' লেখকটীর নিদারুণ মাথাব্যথা! তাঁহার সমস্ত রচনার আবহাওয়ার মধ্যেই জীবনতন্ত্রের প্রতি একটা মুরব্বি-ভাবের বক্রদৃষ্টি এবং ঘৃণাবুদ্ধি সহৃদয়গম্য হইয়া আছে। এই অশোভন পদার্থটাকে তাঁহার জন্ম প্রকৃতিগত, মেজাজী লক্ষণরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারি। যেহেতু, উহা তাঁহার 'স্বভাব', সুতরাং হাজার শিক্ষাদীক্ষা বা বিচারপরীক্ষা কিংবা জ্ঞানগবেষণাতেও উহাকে নাড়িতে পারে নাই। এস্থলেই "অতীত্য হি গুণান্ সর্ব্বান্ স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে।"

আনাতোল ফ্রান্সের একজন পণ্ডিত ও Scholar বলিয়া খ্যাতি যে অপ্রযুক্ত নহে তাহা বুঝিতে পারি। কিন্তু ভারতীয়ের দৃষ্টি দেখিবে ঐ প্রকৃতিগত মর্জ্জিটুকুর গতিকেই তিনি ব্যঙ্গকৌতুকী ও সঙ্গে সঙ্গে জীবন ও জগতের মূল বিষয়ে সংশয়ী, পূরাপূরি 'বৈনাশিক' এবং জড়বাদী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। জগৎ বিষয়ে ফরাসীদেশের কোন বড়

বৈজ্ঞানিকের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াই তিনি এরূপে নিজের 'সায়' জানাইতেছেন—

"Science says Heat, Light, Electricity, Magnetism, Chemical affinity and Movement are diverse appearances of the same unknown Reality. Illusion, eternal illusion alone reveals the hidden God. Nature only appears to us as a vast Phantasmagoria and Chemistry is only the Science of Metamorphoses. There are no longer gases, solids or fluids; there is only the smile of the eternal Maya".

ভারতীয় অদ্বৈতবাদীর "বিকারী, পরিণামী ও সাবয়ব" মায়া বা 'শক্তি'তত্ত্বের ইহাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ উপস্থাপনা আর পাইব না। ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিকপ্রবরও ভারতীয় "মায়া" সংজ্ঞাটুকু যে ব্যবহার না করিয়া পারেন নাই, তাহাই লক্ষ্য করিতে হয়। এই 'শক্তি'র একত্ব এবং শ্রীমৎ শঙ্করের সেই "ন হি অনেকাকারাঃ শক্তয়ঃ শক্যাঃ কল্পয়িতুম্" প্রভৃতি কথার মর্ম্মও এস্থলে বৈজ্ঞানিকের নিকটেই ত পাইতেছি! আনাতোল্ আবার বলিতেছেন—

"Chemistry giving its hand to Physiology has recognised that organic matter, is not distinct in its principle from inert matter or rather that there is no inert matter and that life and movement are every where." আবার—

"Philosophical physiology congratulates itself upon having reduced animal and vegetable life to the same type by demonstrating that in plants there are the faculties of motion, respiration and sleep."

এ সকল কথায় যে লোক সায় জানাইতে পারে, 'মায়া'পর্দ্দার পশ্চাতের Hidden Godটীর বার্ত্তা পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে পারে, সর্ব্ববস্তু যে প্রাণতত্ত্বের প্রকাশ তাহা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে, "সর্ব্বঃ প্রাণ এজতি" পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে, সে যে কেবল 'তৎ সৎ' বস্তু বা তাহার সকল অনিত্য

'Illusion'এর ভিত্তিভূত সেই নিত্য, অদ্বৈত এবং "অবিকারী, অপরিণামী ও নিরবয়ব তত্ত্ব" বিষয়ে 'অবিশ্বাসী' থাকিয়াই যাইতেছে, উহাকে একটা জন্মগত 'মর্জ্জিৎ বিশেষত্ব' ব্যতীত আর কি বলিতে পারি ? ঐ ত গেল কেবল জড়তার Plane সম্বন্ধে; আত্মার সমক্ষে জড়তার Solidity, Fluidity বা দূরতা প্রভৃতি গুণও যে 'অসৎ' বস্তু তাহা ত এদেশের আত্মসিদ্ধগণের প্রত্যক্ষ সত্য! অধ্যাত্ম 'গুহা'পথিক ও অপরোক্ষবিজ্ঞানী ঋষির সেই 'সচ্চিদানন্দ' বা 'অস্তি-ভাতি-প্রিয়ং' তত্ত্বস্তুর পর্দ্দা পর্য্যন্ত ছুঁইয়া এবং তাঁহাদের 'অমৃত'সমুদ্রের একেবারে কাছাকাছি আসিয়াই ত সেই জিজ্ঞাসুব্যক্তি অন্ধদুর্ভাগ্যে জড়বাদী হইয়া এবং ব্যঙ্গকৌতুকী অহমিকায় মুখ ফিরাইয়া চলিয়াছে। Red Lily, Temptation of Anthony ও Thais প্রভৃতি রচয়িতার মর্ম্মস্থান হইতে কেবল নির্ব্বিশেষ জড়তন্ত্র ও অধ্যাত্মতার বিদ্বেষই ফুটিয়া ফুটিয়া পড়িতেছে! একালে এরূপ অবিশ্বাস বা বিচিকিৎসা কেবল মনোজীবনে এবং দার্শনিক স্থানেই শেষ হয় না। উহার সংসর্গ ও শিষ্যতা এ যুগের অনেক কবি এবং লেখককেও আত্মবিস্মৃত করিয়া কেবল জড়তা, ঐহিকতা, পার্থিবতা অপিচ দুনিয়াদারীর 'চিহ্নিত ভক্ত'রূপেই খাড়া করিয়াছে; মানবজীবনের নিত্যসত্য সমস্যাসমূহের দিকে ইচ্ছাকৃত ভাবেই দর্শনান্ধ করিয়া অনেককে কেবল দৈহিক রূপতন্ত্র ও ভোগবিলাসিতার অহমিকামুখর 'পূজারী' রূপেই পরিণত করিয়াছে; পদে পদে নিদারুণ মৃত্যুভীরুতায় সন্ত্রস্ত থাকিলেও মৃত্যুর প্রতি একটা 'লোকদেখানো' ও কপট প্রভুত্বভাব অভিনয় করিয়া, সেণ্টিমেণ্টাল প্রীতি-ভালবাসা ও 'ইয়ারকি' দেখাইয়া, মৃত্যুকে 'ভেঙ্‌চাইয়া' একটা মিথ্যা ভাবুকতা ও আত্মবঞ্চনার চেষ্টা করিতেও অনেককে প্রেরিত করিয়াছে; কেবল ইহবিলাস এবং দেহবিলাসকেই পরম সত্য বলিয়া উচ্চ গলায় 'চেঁচামেচি' করিতেও অনেককে চেতাইয়াছে! এসমস্তের নিদারুণ ফল, অবশ্য, দুঃখবাদ, অশুভবাদ, নৈরাশ্য বা Pessimism. এ সমস্ত হইতেই বুঝিতে পারি যে, ইহাদের দৃষ্টিস্থান এবং মনোবুদ্ধি জীবনক্ষেত্রে কত বড় একটা সত্যদ্রোহী পদার্থ। ইহারা যতই বিদ্রোহীর ভাবে, এবং Never

mind বলিয়া আস্ফালনে, বাহ্বাস্ফোট ও নাচানাচি করুন না কেন, সূক্ষ্মদর্শী পাঠকের বুঝিতে বাকি থাকে না যে, ইহাদের ন্যায় এমন সত্যভীরু, কপট অথবা আত্মবঞ্চক কুবন্ধু আর হইতে পারে না; ইহাদের অন্তরে, সকল বিদ্রোহস্ফীত উচ্চকণ্ঠ ও আড়ম্বর বিলাসের পশ্চাতে একটা গভীর হতাশার সত্যরাগিণীই গীত হইতেছে। এ সমস্তের নামই Satanic Element in Literature! ইয়োরোপের 'অষ্টাদশ শতাব্দী' হইতে শ্রেয়ঃকামী ব্যক্তিকে আদৌ সাহিত্যের এই 'শয়তান'কে, লুসিফার, Corsair অথবা বেদুইনকে যেমন চিনিয়া লইতে হইতেছে, তেমন রোমান্টিকতার এবং আইডিয়ালিজমের মুখোশ-পরা জড়বাদ এবং নাস্তিক্যকে না চিনিলেও অধুনা সাহিত্যসেবকের পক্ষে কদাপি সোয়াস্তি নাই। এতদ্দেশে সাহিত্যের যেই 'রস'বস্তু 'পরমানন্দ স্বরূপের অংশ' বলিয়াই পরিচিন্তিত হইয়াছিল, যাহাকে এদেশের সাহিত্যদার্শনিকগণ 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর' রূপে ও যে 'রস-পরিব্যক্তি'কে "ভগ্নাবরণা চিৎ" অপিচ 'প্রশান্তি' (Repose) রূপে চিনিয়াছেন এবং কাব্যকেও "সংসার বিষবৃক্ষের রসবৎ ফল"রূপে দেখিয়াছেন, তাহা কোথায়, আর এ সমস্ত আদর্শের স্নায়ুসুখতন্ত্রীও জঘন্তবন্ধী কামকলা ও ব্যভিচারকলা এবং সত্যান্ধ জড়বাদ, ঐহিকমত্তা, পার্থিবতা ও ভোগবিলাসতন্ত্রই বা কোথায়? এদিকে অন্ততঃ সত্যদর্শী ও জীবনের প্রকৃত সমস্যাদর্শী ঋষিশিষ্যের দৃষ্টিতে ধূলা দেওয়ার সম্ভাবনা নাই।

প্রকৃত সত্যযোগী কবির অন্তর্দৃষ্টি সমক্ষে তাঁহার আদর্শ ক্ষেত্রে 'সত্যশিব সুন্দর' সর্ব্বত্র অপরিহার্য্য এবং অবিচ্ছেদ্যভাবেই সংবদ্ধ না থাকিয়া পারে না। তাঁহার জগৎ 'সৎ-চিৎ-আনন্দ' তত্ত্বের পরিপ্রকাশ; তাঁহার হৃদয় সৎ-চিৎ-আনন্দের বিজ্ঞানী; তাঁহার জীবনও সুতরাং সত্য-শিবসুন্দরের অনুধ্যানী। প্রকৃত সত্য'সাধক' মনুষ্যের জীবনচর্য্যার মধ্যেও জ্ঞান-কর্ম্ম-সৌন্দর্য্যের সঙ্গীতি সমতানে এবং সমতালেই চলে; মুহূর্ত্তের জন্যও পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। জগতের 'তালকাণা', মনোবুদ্ধি এবং জীবনের মধ্যে ব্যতীত Morbid Aestheticsএর

কোন সম্ভাবনা অন্যত্র নাই। সম্যক্‌দর্শীর সমক্ষে মনুষ্যত্বের বা মানুষের সাহিত্যিক ভাবুকতার কোন সৌন্দর্য্যই ত জাগতিক ঋত বা ধর্ম্মের সম্পর্করহিত পদার্থ নহে, হইতে পারে না। তাঁহারা বলিবেন, Beauty is also a moral thing; বলিবেন, Man's world is a moral world. বাল্মীকির সীতাদেবীর ভাষাতেই তাঁহারা বলিবেন, "ধর্ম্মসারমিদং জগৎ"—

ধর্ম্মাদর্থং প্রভবতে ধর্ম্মাদ্ধি লভতে সুখম্।
ধর্ম্মেন ধার্য্যতে লোকো ধর্ম্মসারমিদং জগৎ॥

বুঝিতে হইবে, বেদের শাশ্বত ধর্ম্মদ্রষ্টা ঋষির বিখ্যাত 'ঋত'সূক্তের অনুপদেই মনুর 'ধর্ম্ম'সংজ্ঞা এবং বাল্মীকি কবির সুপ্রসিদ্ধ সত্যপ্রশস্তি বা ধর্ম্মপ্রশস্তি।

জগন্নিদান সচ্চিদানন্দ বিবর্ত্তিতভাবে জগতের উপাদানরূপী হইয়া আমাদের ইন্দ্রিয়পথে 'জড়তা'রূপে প্রতিভাত হইতেছেন। সাহিত্যের লক্ষ্য, এই জড়তাকে সচ্চিদানন্দ-ভাবিত করিতে হইবে। এই সচ্চিদানন্দভাবনা যেমন জীবনতন্ত্রে সচেতন জীবমাত্রের সাধনা, তেমন সাহিত্যতন্ত্রেও কবিমাত্রের সাধনা। আবার, সাহিত্যক্ষেত্রে ফলতঃ 'জড়তা' বলিয়া কোন বস্তু নাই; সাহিত্য মনুষ্যের 'মানসী ছবি'র জগৎ। জাগতিক কোন সত্য মনুষ্যের মনের ভিতর দিয়া আসিতে গেলেই ত আর Real থাকে না—Ideal হইয়া যায়! অতএব বুঝিতে হইবে, মনোজগতেই আবার জড়াভিমুখ ও চিন্মুখ ভাবাধিক্য লইয়াই সাহিত্যের উচ্চনীচ জাতিভেদ দাঁড়াইতেছে। জগতের কোন সত্যপদার্থের কোন অনুভূতি, মনুষ্যমনের কোন অভিজ্ঞতা যে পর্য্যন্ত কবির মনে আসিয়া ভাবনাজন্ম লাভ না করে, ভাবুকতার চিন্ময়ী প্রকৃতি ও 'রস'বত্তা লাভ না করে, সে পর্য্যন্ত সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহার কোন মূল্যই নাই। কবির ভাবুকতা হইতে মাধুর্য্য, দীপ্তি বা

১০৮। 'সত্যবাদী', 'প্রাকৃত'বাদী' ও 'আর্ট্‌'-বাদি'গণের লক্ষ্য ও প্রণালী ভ্রম। সাহিত্যে এ'সমস্ত সংজ্ঞাশব্দের অর্থ।

প্রসাদগুণ লাভে ঊর্জ্জস্বী হইয়াই কোন 'সত্য' সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে পারে। কাব্যের সত্য মাত্রেই দ্বিজন্মা—হৃদয়ে ভাবজন্মতা লাভ না করিলে সত্য কদাপি 'প্রাণী' হইয়া উঠে না। বিজ্ঞান সত্যকে উপস্থিত করে দর্পণের ন্যায়; কাব্য উহাকে মানবহৃদয়ের ও মানব-জীবনের অন্তরঙ্গ সম্পর্কে আনিয়াই জীবের বুদ্ধীন্দ্রিয় ও ভাববৃত্তির (Emotion) সমক্ষে প্রমূর্ত্ত করে; উক্ত পথেই তাহার অন্তঃপ্রসুপ্ত রসানন্দের বোধিকে প্রবুদ্ধ করে।

সাহিত্যে Realism এর দাবী যখনি 'সৌন্দর্য্য' হইতে প্রবল ও মুখর হইয়া উঠে, তখন জোলা ও ফ্লোবেয়ারের রচনাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যশিল্পরূপে ভ্রম জন্মাইতে থাকে, কাব্যের 'আর্ট্'আদর্শও সম্পূর্ণ উল্‌টিয়া যায়; তখন দার্শনিক তত্ত্ববিচার ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানগবেষণা অথবা ঐতিহাসিক সত্যানুসন্ধানই কাব্যের মূল লক্ষণরূপে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে; তখন পোপের Essay of Criticism অথবা Essay of manকেই শ্রেষ্ঠ কাব্যশিল্প বলিয়া লোকের রুচি আগ্রহে বরণ করে; তখন সাউদে অথবা যোগীন্দ্রনাথ বসুর ঐতিহাসিক তপঃখেদও 'মহাকাব্য' বলিয়া দাবী উপস্থিত করে।

দেহ এবং আত্মা লইয়াই মনুষ্য বলিয়া উভয়ের 'ধর্ম্ম'ক্ষেত্রেই সাহিত্যিক সত্য ও সৌন্দর্য্যের জন্য অবকাশ আছে। যেমন দেশকালের বিপুলতা ও নিসর্গের সিন্ধুশৈল-আকাশের নানাদিক্-প্রসারী সৌন্দর্য্য লইয়া, তেমন মনুষ্য-চরিত্রের মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রসার, মহত্ত্ব ও উচ্চতা লইয়া অপিচ মনুষ্যের আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের ধর্ম্মমাহাত্ম্য অবলম্বন করিয়াও কাব্যের রসোদ্দীপনা সুন্দর, ঊর্জ্জিতসুন্দর বা মহাসুন্দর হইতে পারে। সচ্চিদানন্দের দৈবী সম্পত্তি বা 'ধর্ম্ম' হইতেই 'মনুষ্যত্ব' আদর্শ দাঁড়াইয়াছে বলিয়া, মনুষ্য একটা ধর্ম্মজীবী পদার্থ বলিয়া মনুষ্যের অধ্যাত্মক্ষেত্রে 'সুন্দর' বলিতে ধর্ম্মসুন্দর পদার্থই বুঝায়; উহা চিত্তকে অচিন্ত্য 'চমৎকার' বা বিস্ফার দান করে বলিয়াই সাহিত্যক্ষেত্রে উচ্চজাতীয় রসনিষ্পত্তির

হেতু। বাহ্যভাবে ও বহিরিন্দ্রিয়-প্রতীত জড়তার ক্ষেত্রে প্রাকৃতসুন্দর বা Realistic সুন্দর রূপে চিত্তাকর্ষক হওয়া এক কথা, আর মানসলোকে অভাবনীয় নৈতিক মহিমার দৃষ্টান্তবিন্যাসে চিত্তকে বিস্ফারিত করিয়া উহাকে ভাবোদ্দীপ্ত, মুগ্ধ, বিস্মিত ও স্তম্ভিত করা বা চমৎকারাবিষ্ট করা অন্য কথা। আমাদের বহির্দৃষ্টিসমক্ষে অনন্ত আকাশ—এই উর্ব্বী পৃথিবী যাহার উদরে একটি বালুকা-কণা অপেক্ষাও নগণ্য সেই আকাশ—বিপুল জলকল্লোলময় ওই মহাসিন্ধু, স্থিরতরঙ্গময় ওই হিমাচল শ্রেণী, এ সমস্ত যেমন বহিরঙ্গ ক্ষেত্রের মহাসুন্দর, তেমন সুতকর্ত্তব্যবোধে আত্মোৎসর্গকারী ভীষ্ম, রাজকর্ত্তব্যবোধে আত্মসুখোৎসর্গী রাম, ভ্রাতৃপ্রেমে সংসারসুখভোলা লক্ষ্মণ, প্রেমের জন্য আত্মবলিদানী ভিলিয়াদ্ ও কোয়েজাই মোদো বা জেনোনি প্রভৃতিও মনুষ্যের ধর্ম্মলোকের 'মহাসুন্দর'। পশুসাধারণ সত্যের বা পাশবধর্ম্মের Realism কিংবা Naturalism আদর্শের মাপকাঠিতে মনুষ্যত্বকোটির 'ধর্ম্ম'সুন্দরের কোন পরিমাপই ত হয় না! মানবজীবনের ধর্ম্মগুহার গহনগভীর সত্য ও অধ্যাত্ম সমস্যাসমূহে যে কবির দৃষ্টি সজাগ হয় নাই, মানবতার ক্ষেত্রেও জড়তা ও অধ্যাত্মধর্ম্মের সঙ্কটস্থলে মনুষ্যজীবনের 'নৌকাডুবী' এবং সর্ব্বনাশের বহর তিনি কি করিয়া ধারণা করিবেন? এই ধারণার মধ্যেই ত উচ্চশ্রেণীর দ্রষ্টা ও স্রষ্টা কবিগণের সবিশেষ মাহাত্ম্যস্থান! মনুষ্যের সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক দুরদৃষ্ট এবং মনুষ্যের ভিতরবাহিরের ধর্ম্ম ও কর্ম্মসঙ্কটের অধ্যাত্ম Tragedy যাহার ধারণায় আসে না অথবা ঐরূপ ক্ষেত্রে মানুষের বিজয়মাহাত্ম্যও যাহার হৃদয়কে ভাবোদ্দীপ্ত এবং আন্দোলিত করে না সে কবির মধ্যে কেবল বহিরঙ্গ সুরবিলাস ও (প্রাচীন সাহিত্যদার্শনিকের ভাষায়) কেবল "অক্ষরডম্বর" ছন্দ ও তানবিলাস এবং সেন্টিমেণ্টাল ভাবুকতায় ভঙ্গীবৈচিত্র্যই উদগ্র হইয়া দাঁড়াইবে বিচিত্র কি? এ যুগের অনেক শ্রেষ্ঠ কবির মধ্যে তাহাই ত ঘটিতেছে! কাব্যের রসনিষ্পত্তির মাহাত্ম্য কেবল উপরিঘেঁষা সত্যবাদ বা বর্ণনা-চাকচক্য হইতেও হয় না; হৃদয়ের বিস্ফার-সমাধানে শক্তিশালী

স্থায়িভাব বা Passion এর উপরেই উহার ভিত্তিপাত ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। যে সকল লেখক ধর্ম্মসুন্দরের উর্জ্জিতভাব-যোগে হৃদয়কে উল্লাসিত করিতে পারেন না, কেবল মাটীঘেঁষা বৃত্তান্তবর্ণনা এবং প্রাকৃত সত্যের ধারণাই তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক; অনেকের আত্মতত্ত্ব এবং স্বকীয় চরিত্রের অদৃষ্টই তাদৃশ উচ্চাদের পরিকল্পনা ও ধর্ম্ম-সুন্দরের ধারণা পথে পাদক্ষেপ করিতেও তাঁহাদিগকে দেয় না; মনুষ্যের পশুসাধারণ প্রকৃতি বা প্রাকৃতধর্ম্ম ব্যতিরিক্ত কোন প্রকার উচ্চসমুল্লাসী ভাবুকতাই যেন তাঁহাদের সহানুভূতির পক্ষে একেবারে অতিগত এবং স্বপ্নাতীত পদার্থ! সেদিকে তাহাদের কল্পনাশক্তিটাই পঙ্গু। প্রাচীনকালে অবশ্য ধর্ম্মবিদ্বেষী কোন ব্যক্তি সাহিত্যসমাজে লেখনী ধারণ করিতেও সাহস করিত না; করিয়া থাকিলেও তাঁহাদের লেখনী-চেষ্টা মহাকালের নির্ম্মম বুড়ীর সম্মার্জ্জনী-সমক্ষে সবিশেষ দাঁড়াইতে পারে নাই। কথা হইতেছে, জগৎ বা জীবন বিষয়ে উচ্চাঙ্গীয় কোন সত্যের অনুধ্যানী হইতে না পারুক, প্রকৃত যিনি কবি তাঁহার হৃদয় পাপানন্দী অথবা কদর্য্যানন্দী হইবে কেন? জীবনযাত্রী জীবের একেবারে কুসঙ্গী, কুমন্ত্রী ও কুবন্ধু হইবে কেন?

আর্ট্ বিষয়ে ইয়োরোপীয় সাহিত্যক্ষেত্রের কবি বা লেখক নামধারী বহু ব্যক্তির এরূপ স্বাধীন চিন্তা ও নানামুখী ভ্রান্ত চিন্তা হইতে আধুনিক সাহিত্যজগতের অনেক অনভিজ্ঞ ও অকপটচিত্ত পাঠক এবং সাহিত্য-সেবীর দৃষ্টিতে আদর্শবিষয়ে ধাঁধা লাগাইতে পারে—তাহাই ঘটিতেছে। সাহিত্যের অমর কবিগণ আমাদের হইতে এবং পরস্পর হইতেও অনেক দূরে দূরেই থাকেন; তাঁহারা স্থির নক্ষত্রের ন্যায় একাকী ও সুদূর এবং সাধারণের করাবমর্ষের ন্যূনাধিক অগম্য ভাবেই দেদীপ্যমান। খদ্যোৎগণই দল বাঁধিয়া, উড়িয়া চরিয়া, চারিদিকে এবং কাছে কাছে ঝিকিমিকি করিয়া আমাদের দৃষ্টিতে ধাঁধা লাগাইতেছে; যে যত অল্পশক্তি এবং স্বল্পায়ুঃ তাহার ঝিকিমিকি টুকুই তত বেশী। উহাতেই অচেতন এবং অনভিজ্ঞ ব্যক্তির সংশয় হইতে পারে—তবে কি জীবনের

এবং সাহিত্যের উচ্চ আদর্শ কেবল বেকুবির ফাঁকা কথা? সংসার কেবল জড়তার তাণ্ডবস্থলী? কেবল 'নারীত্বের দাবী' এবং 'পুরুষত্বের দাবী' চুকাইয়া যাওয়াই পুরুষরমণীর চূড়ান্ত কর্ত্তব্য? উহার গতিকে সাহিত্যে রুচিগঠন ও সমালোচনা এবং 'সহৃদয়'তার আদর্শনিরূপণ প্রভৃতি ব্যাপার ইদানীং এত প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাহিত্যে 'সহৃদয়', 'অধিকারী', 'প্রমাতা' বা প্রকৃত 'রসিক' কে, প্রাচীন সাহিত্যদার্শনিকগণ তাহা আদৌ নিরূপণ না করিয়া অগ্রসরই হন নাই। 'সহৃদয়ত্ব'কে অভিনবগুপ্ত সার্থক কথায় এরূপে ধারণা করিয়াছেন—"যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাৎ বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয়তন্ময়ীভাবনা-যোগ্যতা, তে হৃদয়সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ।" যেমন 'ব্রহ্মজ্ঞান' জীবমাত্রের নিত্যসিদ্ধ বস্তু, তেমনি অনাদিসিদ্ধ 'বাসনা' বা জীবত্বের সহজাত সংস্কার বশেই 'রসবোধি' মনুষ্যমাত্রের স্বসিদ্ধ পদার্থ; তবে, উহা আগন্তুক মলিনতায় আপন্ন হইতে পারে, এজন্য মনোমুকুর বিশদীভূত করিয়া সহৃদয় হওয়া লইয়াই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রধান কথা। তাদৃশ সম্যক্-দৃষ্টিশালী সহৃদয় মাত্রেই বলিবেন যে, কবিগণ যেই 'সাধনা' করিতেছেন, বাক্যপথে উচ্চতম 'মনুষ্যত্ব'আদর্শের কোঠায় ভাবসুন্দরের যেই চিন্ময়মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতেছেন, মনুষ্যাত্মার সমক্ষে জ্ঞানকর্ম্ম-সৌন্দর্য্যের এবং অনন্ত-সুন্দরের অনুভূতিসাধনার যেইরূপে পথ দেখাইয়া চলিয়াছেন, যে জন্য মনুষ্যজাতির চূড়ান্ত লক্ষ্যযাত্রী আলোক-গুরুগণের ও ধর্ম্মগুরুগণের সঙ্গেই কবিগণের প্রায়সমান পদবী, উহার সত্যতা ও পূজ্যতা বিষয়ে বিপুল পৃথিবীবাসী মনুষ্যজাতির কৃতজ্ঞ অন্তরাত্মা আদিকাল হইতে একেবারে ভুল করিয়া আসে নাই। বৈদিক ঋষিগণের প্রধান দাবী ছিল, তাঁহারা 'কবি'—তাঁহারা অগম্যের নির্ব্বচন ও মননের সহায়তা পথে জীবের ভাবগুরু এবং মনোবাক্যাতীতের মন্ত্রদ্রষ্টা; মনুষ্যজাতির চূড়ান্ত কুলীনগণের সঙ্গেই কবিগণের সমান আসন।

মনুষ্যের পক্ষে কেবল পাশব ধর্ম্ম নহে, মহাত্মতা ও ধর্ম্মগত মহত্ত্বই সর্ব্বাপেক্ষা 'প্রকৃত' এবং 'সত্য'। মনুষ্যানুভূতির 'সৌন্দর্য্য' মাত্রেই যে

প্রকৃত প্রস্তাবে এক একটা Moral thing বা ধর্ম্মানুজীবী ভাব তাহাই হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। জীব যে পরের প্রেমে বা সমাজপ্রেমের বশে আত্মদান করে, জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে সর্ব্বসুখ উৎসর্গ করে, উহা দেহের ধর্ম্মকে ছাড়াইয়া তাহার উচ্চ-উচ্চতর গুহাজীবী আত্মপ্রকৃতির স্বধর্ম্মে এবং দিব্যধর্ম্মেই করে; জীবাত্মার 'ভাগবত ধর্ম্ম' ও দৈবীসম্পত্তির বাধ্য হইয়াই উহা করে। আত্মরক্ষা ও স্বার্থসমীক্ষা হইতেই জীবের সমস্ত পাপ ও অধর্ম্মবৃত্তির জন্ম এবং ঐ সমস্ত জীবের জড়তাক্ষেত্রের এবং জড়দেহের বৃত্তি। সৎ-চিৎ-আনন্দ ন্যূনাধিক সর্ব্বদেহীর আত্মসিদ্ধতত্ত্ব; কোথাও উহা উজ্জ্বল, কোথাও অবিশদ বা তমসাচ্ছন্ন; এ স্থলেই সৃষ্টির জীবপর্য্যায়ে অনন্ত বৈচিত্র্য। যে জীব তাহার তৈজস ও প্রাজ্ঞ প্রকৃতিতে স্থিতিলাভ করিতে পারিয়াছে, সেই প্রকৃত মনুষ্যত্বে ও মনুষ্যধর্ম্মে স্বস্থিতি পাইয়াছে, মনুষ্যত্ব ক্ষেত্রে আত্মপ্রকৃতির Realistic স্থিতিকে লাভ করিয়াছে। উহাই চূড়ান্তে গিয়া 'ব্রাহ্মীস্থিতি' রূপে দাঁড়াইয়া যায়। আত্মপ্রকৃতির অধিকারের এই তেতালা বাড়ী যে জীব চেনে না, বুঝে না, স্বীকার করে না, সেই প্রকৃত অন্ধ। মনুষ্যত্বের পক্ষে মহাত্মতা এবং ধর্ম্মাত্মতাই Realism ও Naturalism বলিলেই প্রকৃত কথা বলা হয়।

মনুষ্যত্বের ক্ষেত্রে 'সৌন্দর্য্য' হইতেছে মানবের ধর্ম্ম-আদর্শের প্রজ্ঞা ও বোধিসঞ্জাত ভাব এবং কর্ম্মের অভিব্যক্তিগত সৌন্দর্য্য। উহাই মনুষ্যের সাহিত্যে, মনুষ্যের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্ব্বসম্বন্ধ-বত্তায় প্রসারিত ও শতসহস্রধা প্রকটিত হইয়া এবং কালানুক্রমে আত্ম-প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। সচ্চিদানন্দের 'স্বভাব'ই সৌন্দর্য্যবুদ্ধিরূপে মনুষ্যের ইহপরকালের স্থিতি-আদর্শকে বা অসংস্থিত আশা ও আকাঙ্ক্ষার বেদনা এবং ক্ষুধাকে প্রভাবিত এবং পরিচালিত করিয়া চলিয়াছে; নিত্যকাল উচ্চশ্রেণীর কবিগণের কাব্যকবিতানাটকের মধ্যে "সহৃদয় সংবেদ্য" রসাত্মারূপে পরিব্যক্ত হইয়া আসিতেছে। মানুষের "সুখদুঃখং ভবো ভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ", মানুষের ভাগবতী নিয়তি, অমৃতপ্রকৃতি ও

স্বধর্মবোধিই মর্ত্ত্যকবির কাব্যমধ্যে নরজীবনের কর্ম্মগতি ও ধর্ম্মাধর্ম্মের পরিবর্ণনা পথে এবং সত্যশিব-সুন্দরের লীলানুযায়িনী 'রসাত্মকতা'র পথেই প্রকটিত হইতেছে। এজন্য, আর্টের ক্ষেত্রে 'সুন্দর' বলিতে যেমন জড়তাপুরীর অধিবাসী ও দেহধারী মনুষ্যের প্রাকৃতিক দেহের ধর্ম্মধারণা বুঝায়, তেমন তাহার অধ্যাত্ম-ক্ষেত্রীয় ধর্ম্মসৌন্দর্য্যের ধারণাও বুঝায়—জীবের পূর্ণপ্রকৃতি ও অধ্যাত্মস্থিতির ক্ষেত্রে অচিন্ত্যের, ভবিতব্যের এবং সম্ভাব্যের ধর্ম্মধারণাও বুঝায়। রসের এই ধর্ম্মাত্মতা এবং কাব্যে প্রকটিত কবি-উদ্দেশ্যের ভাবাত্মা ও ধ্যানাত্মার 'প্রকৃতি' লইয়াই শিল্পসৌন্দর্য্যের 'জাতি' নিরূপণ।

অন্তর্দৃষ্টিশালী কবি শেলী যেন পরম বোধিসত্ত্বভাবে সন্দীপ্ত হইয়াই বলিয়া ফেলিয়াছেন, "The Secret of all Morals is Love." এই কথাটার মধ্যে কেবল জীবের ধর্ম্মরহস্য নহে, কাব্যরসের 'আত্মা'টিও ধরা পড়িয়াছে। চিৎসুন্দরের বিষয়ে আমাদের সকল কথা কেবল এই একটি কথার টীকা রূপে ধরিয়া চলিলেও ভ্রান্তিসম্ভাবনা নাই। কাব্যের সৌন্দর্য্যসিদ্ধির 'শক্তি' কোন শাস্ত্রশাসন উপন্যস্ত করিয়া ত নহে—কল্পনাপথে মনুষ্যের অমৃত আত্মার 'আত্মবোধ' জাগাইয়া। কাব্যের সৌন্দর্য্যপরিকল্পনাই জীবের অন্তর্লোকে একটা 'ধর্ম্মপ্রাণ' মহাশক্তিরূপে দাঁড়াইয়া যায়—Reason অথবা বিচারবুদ্ধির পথে যাহা কদাপি সম্ভবপর নয়। আত্মার হ্লাদিনী বৃত্তির স্বধর্ম্ম-সহায়তার পথেই কবিপ্রতিভা "কান্তাসম্মিত" প্রণালীতে মানবাত্মাকে আপনার সত্যশিবসুন্দর স্বরূপবোধে জাগরিত করে—এ স্থলেই ত কবিশক্তির মাহাত্ম্য! বলিয়া আসিয়াছি, প্রেমেই সৃষ্টিতন্ত্রে সচ্চিদানন্দের মুখ্য প্রকাশ রহস্য। 'আনন্দ'ই প্রেমরূপে প্রকটিত হইতেছে, জগৎ ও জীবনের সর্ব্বধর্ম্মের ভিত্তিরূপে দাঁড়াইতেছে; আবার, প্রেমই আনন্দস্বরূপ হইয়া চরমের আভিমুখ্যে প্রয়াণী হইতেছে। সাহিত্যেও প্রেমই কবির সকল উচ্চ পরিকল্পনার প্রাণ; উহাই কবি-আত্মার 'আদিরসা' শক্তি—আত্মাশক্তি। এজন্য এতদ্দেশের অনেক প্রাচীন আলঙ্কারিক

'শৃঙ্গারতিলক' ও 'শৃঙ্গারপ্রকাশ' প্রভৃতি বহু গ্রন্থে 'শৃঙ্গার'কেই সর্ব্বরসের সাররূপে ধরিয়া একেবারে একদেশদর্শী ও 'চরম পন্থী' আকারেই দাঁড়াইয়া গিয়াছিলেন। 'আদিরস'ই যে কাব্যের নবরসে বিকাশ লাভ করিয়া, মনুষ্যের প্রেমানন্দী বুদ্ধিকে জাগাইয়া সকল 'রসনিষ্পত্তি' সমাধা করে, উহা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াই যেন শেলী আকস্মিক ভাবে বলিয়া উঠিয়াছেন "সকল ধর্ম্মের (Ethics) প্রাণরহস্য প্রেমে।" অবশ্য, এই 'প্রেম' কথাটার অর্থবত্তা ও উহার মহাসত্তার অধিকার কতদূর এবং উহার শক্তির আমলই বা কত, তাহা ঐ সকল প্রাচীন কবি বা আলঙ্কারিক-গণ, এমন কি, শেলীও কার্য্যক্ষেত্রে সম্যক্ ধারণা করিতে পারেন নাই। এজন্য আধুনিক কামকলাবিশ্লেষণী নবেলরীতির ন্যায়, সংস্কৃতসাহিত্যের একদল কবি এবং আলঙ্কারিকের মধ্যেও কেবল জড়রসিক কামের বাহুল্যময় বর্ণনবিলাসিতাই সকল সহৃদয়কে 'উত্যক্ত' করিতে থাকে।

অতএব 'সচ্চিদানন্দ শিব'স্বরূপের বিষাণগীতির সমতানে এবং জগৎতন্ত্রে প্রত্যক্ষীভূত শিবতাণ্ডবের সহিত সমানতালে যেমন জীবনকে তেমন সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করাই 'শিব'; দুঃখের, নীচতার, কাপুরুষতার উপর মনুষ্যত্বের বিজয়ের নাম 'শিব'; রোগ-শোক-তাপ, বিপদ্ ও মৃত্যুর উপরে সুস্থির, সুস্থচিত্ত, অশোক এবং জীবনানন্দময় জীববীর্য্যের উদয়ের নাম 'শিব'। এজন্যই জীবের 'দৈবীসম্পত্তি'গুলির মধ্যে প্রধান ও প্রথম গুণটির নাম 'অভয়'। নৈরাশ্য, নীচাশা, স্বার্থলিপ্সা ও জড়পিপাসার উপর জীবাত্মার মহাধর্ম্মের অভ্যুদয়ের নাম 'শিব'। সংসারজীবনের কদর্য্য সত্য, মনুষ্যাত্মার কদর্য্য কুৎসা ও জীবের পশুধর্ম্ম বর্ণনায় আমোদরসে স্বভাবসুসিদ্ধ অক্ষমতার অপর নামই 'শিবনিষ্ঠা'। জাতি-জীবনের বা ব্যক্তিজীবনের অমৃত নিয়তি, উহার পুণ্য পরিণতি এবং জড়তালঙ্ঘিনী উদয়গতি নিত্যম্লান মনে জাগরিত রাখিয়া লেখনী পরিচালনাই 'শিবভক্তি'। জীবনে জড়তার বিরুদ্ধে অতন্দ্রিত ভাবে

১০৯। সাহিত্যে 'শিব' অপরিহার্য্য তত্ত্ব এবং উহার তৌলেই চূড়ান্ত শ্রেষ্ঠতার পরিমাপ; তাদৃশ সমুন্নত আদর্শের কবিগণ।

যুদ্ধ করিয়া, আত্মার সেই অমল সচ্চিদানন্দ স্বরূপের দিকে চলিয়া মানবকে সেই পুণ্যানিয়তি-লক্ষ্যে উদ্বর্ত্তন-পথে সাহায্য করার নামই 'শিব'সেবা। এইরূপ শিবঙ্করী লেখনী সাহিত্যভূমে আসিয়া সৌন্দর্য্য-বিধায়িনী শিল্পশক্তি লাভ করিলেই প্রকৃত কবিলেখনী হইবার যোগ্যতা লাভ করে; মানবসাহিত্যে অমরপদবী লাভের জন্যও যোগ্য হইতে পারে। বলিতে পারি, এই শিবসুন্দরের ভাবনাই সাহিত্যক্ষেত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রস; চরমে গিয়া উহার নামই "শান্তং শিবমদ্বৈতম্"; যেই 'শিব' (পঞ্চদশীর ভাষায়) "সর্ব্বসম্বন্ধবত্বেন সম্পূর্ণঃ শিবসংজ্ঞিতঃ।"

শিবরঙ্গিণী এবং শিবকামিনী সৌন্দর্য্যশক্তিই সংসারের উর্ব্বশী কর্ম্মশক্তি ও সর্ব্ববরীয়সী ধর্ম্মশক্তি। এই সৌন্দর্য্যশক্তির নামই লক্ষ্মী, উহা সচ্চিদানন্দের হৃদয়নিবাসিনী ও বিশ্বসংঘটনী অন্তরঙ্গা শক্তি। বিশ্বসৃষ্টির লক্ষ্মীকে সাহিত্যের বাক্যতন্ত্রে আনিয়া ঐহিক নিত্যতা দান করিয়াই 'সরস্বতী'; সাহিত্যে আসিয়া উহাই কবিপ্রতিভার রঞ্জনী ও রসনী শক্তি, যাহার করুণায় সাহিত্যের ভাবলোকে অসাধ্যও সাধিত হয়, অসম্ভবও সম্ভবপর হইতে পারে। কবিকল্পনা যত উদগ্র, উদ্দীপ্ত এবং উপপ্লাবি-ভাবে, লোকোত্তর চমৎকারতন্ত্রে এবং অসামান্য শব্দমন্ত্রে এই 'সৌন্দর্য্য'-শক্তির প্রয়োগ করিতে পারিবে ততই উহা কল্পলোকে সর্ব্বজয়ী হইবে। এজন্য কবিপ্রতিভার নাম দিতে পারি—সর্ব্বজয়া। কবিপ্রতিভা শিবদ্রোহী হইলে, সৌন্দর্য্যের এই আনন্দিনী শক্তিতেই আপাততঃ ধর্ম্মকে অধর্ম্ম এবং অধর্ম্মকে ধর্ম্মরূপে দেখাইতে পারে; পাপকে পুণ্য এবং পুণ্যকে পাপ বলিয়াও আপাততঃ প্রবোধ জন্মাইতে পারে। সে জন্যই কবিকে শিবসুন্দরের আদর্শে নিত্যনিয়ত সচেতন থাকিতে হয়। যে কবির কণ্ঠ জগতের ব্রহ্মতালের সঙ্গে ও শিবতাণ্ডবের সঙ্গতে বাঁধা আছে, তিনিই শ্রেষ্ঠশ্রেণীর কালোয়াৎ; তিনিই ত নিজকে 'বাণীমন্দিরের পুরোহিত' বলিয়া মনে করিবেন! অতএব অকপট প্রাণস্থানে কোন কবির এরূপ 'মনে করা'র মধ্যেও তাঁহার বরেণ্যতার একটা প্রমাণ এবং অধ্যাত্মযোগ্যতা স্বতঃসিদ্ধ হইয়া আছে বলিয়াই

মানিয়া লইতে পারি। শক্তিমান্ ব্যতীত এতাদৃশ 'অভিমান'ও অন্ত তাতে জাগে না। মিল্টন, ওয়ার্ডসোয়ার্থ, টেনীসন ও গ্যাঠে যে আপনাদিগকে বাণীমন্দিরের 'পূজারী' বলিয়া মনে করিতেন, সেরূপ 'মনে করা'র মধ্যেই যেমন তাঁহাদের প্রতিভার 'জাতি'পরিচয় আছে, তেমন উহা হইতেই তাঁহাদের কবিকৃত্যের 'উত্তর দিক্' সর্ব্ব অবস্থায় সুস্থির থাকিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের প্রতিভায় চমৎকারকারী রসধারায় হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়াছে, প্রতিভার নিদ্রাজাগরণের অবস্থাভেদে কবিত্বনদীতেও জোয়ার-ভাটা আসিয়াছে; কিন্তু কদাপি তাঁহাদের 'দিক্‌ভুল' হয় নাই। সেজন্যই ওয়ার্ডসোয়ার্থ "Uttered nothing base" এবং মিল্টনেরও "Soul was a star that dwelt apart." মানবজীবনের গভীরতম ক্ষুধার তৃপ্তিসমাধানেই মিল্টনের হৃদয় যেন মহানসের ন্যায় দিবারাত্র জ্বলিতেছে; সেই মহাচুল্লীর হব্যই ত মিল্টনের কাব্যসমূহ। কবি মিল্টন যেন প্রাচীন হীব্রু প্রফেটের মহাকর্ত্তব্যে ও দায়িত্বে নিত্যসচেতন ছিলেন এবং ঈশ্বরাদিষ্ট ব্যক্তি বলিয়াই ত নিজকে চিনিয়াছিলেন। তেমনি, ব্রাউনীং, বিশেষতঃ টেনীসনের সকল রচনাতে একটা সমুচ্চ ধর্ম্মলক্ষ্যই তাঁহাদের সৌন্দর্য্যতন্ত্রের পরম সহচর ও সহায়ক ভাবে স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। জীবহৃদয়ের উচ্চমহৎ ভাব, বীর্য্যবত্তা, ন্যায়নিষ্ঠা, মহানুভবতা ও প্রেমের আত্মত্যাগ প্রভৃতি শিবসুন্দরী ভাবজাতিই মহনীয় 'রসাত্মা'র অভিব্যঞ্জক হইয়া তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ কবিতাকে 'প্রাণী' করিয়া তুলিতেছে।

ব্যাসবাল্মীকি ত আপনাদিগকে দেবানুগৃহীত এবং সচ্চিদানন্দের সাম-গায়ক 'ঋষি' বলিয়াই মনে করিতেন। রামায়ণ-মহাভারতে এজন্য কবিপ্রতিভায় বাণীগঙ্গা ভারতের প্রত্যেক নরনারীর দ্বারে মহাভাবিনী এবং লোকপাবনী রসধারা বিলাইয়া গিয়াছে—এই ধারার একদিকে অভ্রভেদী, ধ্যানী উচ্চতার শীতলশীর্ষ হিমালয়, অন্যদিকে সংসারের কর্ম্মরঙ্গী ও ভাব-তরঙ্গী মহাসমুদ্র। তাঁহাদের কবিকর্ম্মের "প্রতি সুর, প্রতি তান" আপনাদের তাদৃশ মহন্মন্যতার প্রভাবেই সমুদ্দীপ্ত এবং

সমুল্লসিত হইয়াছিল। তাঁহারা কেবল 'আপন মনে গান' করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না, মনুষ্যকে উচ্চ কণ্ঠে জগতের মহাশিবের মহোৎসবে সচেতন করিয়া, তাহাকে জীবতন্ত্রে সমুচ্চভাব ও কর্ম্মানন্দের রসদীক্ষা দান করিয়াই এ ক্ষেত্রে কবিপ্রতিভা নিজের মাহাত্ম্য উপার্জ্জন করিয়াছে। তাঁহারা মানবের ভাবজগতে "জয়জয়ন্তী" উষার প্রথম উদয়সাক্ষী; উৎকণ্ঠ উল্লাসে ভারতের ও জগতের ঘরে ঘরে 'প্রথম আলোকদ্রষ্টা' বেদর্ষিগণের 'সত্য-জ্ঞান আনন্দ' তত্ত্বের 'প্রভাতী'গায়ক উৎক্রোশপক্ষী! জগতের কবিসমাজে আদিম জন্মকৌলিন্য ও মহীয়ান্ কর্ম্মকৌলিন্য তাঁহাদেরই। তারপর, কবির নামকীর্ত্তি একেবারে তুচ্ছ করিয়া যিনি বাল্মীকির নাম দিয়া নিজকে একবার মুছিয়া গিয়াছেন, যোগবাশিষ্ঠের সেই নৈষ্টিক কবিপাদের পক্ষেও এ কথা ত পূরাপূরিই খাটে! মানবহৃদয়ের জড়তা-লিপ্সা, ইন্দ্রিয়-দাসত্ব, নীচতা, শঠতা, ক্ষুদ্রতা বা জঘন্যতাকে সুন্দর ও লোভনীয় করিয়া দেখাইতে, সাহিত্যক্ষেত্রের কোনরূপ অপকর্ম্মে হস্তকে কলঙ্কিত করিতে আপনাদের মহোদার অন্তরাত্মাই তাঁহাদিগকে দেয় নাই। যে সৌন্দর্য্য জীবের দিব্যতা, দেবশক্তি ও দেবাত্মাকে বিশদীভূত করিয়া তাহার অমৃতত্ব ও অমরতাকে স্বয়ংপ্রভু করিয়া দেয়, কাব্যে সে সৌন্দর্য্য ও রসাত্মকতাই ছিল তাঁহাদের লক্ষ্য।

পরন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে মহাসুন্দরের মহিমা উপলব্ধি করিতে শিক্ষা করা ও 'সহৃদয়' হওয়াকে একটা পরম Culture রূপেই নির্দ্দেশ করা যায়। যেমন, 'প্যারাডাইস লষ্ট' ও 'ডিভাইন কমেডী' কাব্যের অন্তর্মর্ম্মে, উহাদের ঘটনা, অবস্থা এবং আবহাওয়ার মধ্যে যে একটা নিয়তসিদ্ধ স্থায়িভাব আছে, উভয় কাব্যে অদ্ভুতরসাত্মক এমন একটা নিত্যপ্রতীতি আছে এবং অনন্ত আকাশকে রঙ্গভূমি করিয়া সীমাহীন আয়তন ও দূরত্বার একটা মাহাত্ম্যবুদ্ধি এমন সুস্থিরতা লাভ করিয়াছে যে তাহার তুলনা নাই। উভয় কাব্যে স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে, মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গে এবং লোক হইতে লোকান্তরে অনায়াসসিদ্ধ গতাগতির মধ্যে বিমুক্ত মানবাত্মার পলকে পলকে জড়ভাবন্ধ অতিক্রম পূর্ব্বক দূর দূরান্তরে শক্তিপ্রসারকারী এমন একটা

মহিমার ও বোধিসত্ত্বতার প্রমাণসিদ্ধি আছে, যাহা সর্ব্বতোভাবে অতুলনীয়! এক যোগবাশিষ্ঠ ব্যতীত জীবাত্মার অধ্যাত্মমহিমার এমন উদাত্তকাহিনী সাহিত্যজগতে নাই। এই কাব্যদ্বয়ের Form হইতেই হয়ত এই স্থায়ি-ভাবটুকু উপচিত হইয়াছে এবং জীবচিত্তের পার্থিবভাববিলম্বিনী বিমুক্তি ও দৃপ্ততার একটা আবহাওয়া সংসিদ্ধ হইয়া আছে। কাব্যদ্বয়ের পাঠক-মাত্রেই যে আত্মার এই মহাযান পন্থা ও দিব্য মহিমার বুদ্ধিতে আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত আবিষ্ট থাকে, অপরূপ স্বাধীনতার অববোধেই নিয়ত উৎফুল্ল ও উচ্ছ্সিত থাকে, এই Intense এবং ঘনগভীর মাহাত্ম্যবোধির মধ্যেই উভয় কাব্যের মহাপ্রাণতা ও পরমাদ্ভুতরসা সৌন্দর্য্যসিদ্ধি। এই কাব্যদ্বয়ের দোষগুলি (Defects) হয়ত সর্ব্বজনপ্রত্যক্ষ; কিন্তু উহাদের আত্মার অতুলনীয় এই নিত্যগুণ ও মহদ্‌গুণটি জগৎপ্রাণ বায়ুদেবতার মত সহজ ও সর্ব্বব্যাপী বলিয়াই হয়ত অনেকের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। (১) যেমন যোগবাশিষ্ঠের ঋষির তেমন মিল্‌টন ও দান্তের মহান্‌ এবং "মহতোমহীয়ান্‌" আত্মার আনন্দদীপ্তিই তাঁহাদের কাব্যের প্রাণীভূত হইয়া উহাদের রসধ্বনি সুসিদ্ধ করিতেছে।

(১) এই কাব্যদ্বয়কে কেবল সাম্প্রদায়িক খ্রীষ্টানীয় গোঁড়ামীসঞ্জাত একএকটা 'ধর্ম্মকাব্য'রূপে গ্রহণ করাটাই হয়ত বিধর্ম্মী পাঠকের কিংবা আধুনিক ভাবুকের পক্ষে সর্ব্বপ্রধান ভাবসঙ্কট। যেমন, মিল্‌টনের কাব্যটীর 'শয়তান', 'স্বর্গভ্রংশ' ও সৃষ্টিমধ্যে 'পাপ' এবং 'মৃত্যু'র অস্তিত্বের ব্যাখ্যা ও মীমাংসা প্রভৃতি তত্ত্বকথা অখ্রীষ্টান ব্যক্তির এবং 'রোমাণ্টিক সাহিত্য'ভক্তের চিত্তমধ্যে প্রথমেই একটা নিদারুণ বৈরূপ্য এবং বিরসভাবই জাগাইতে পারে,। কিন্তু ঐ সমস্ত যে 'মানবত্ব' এবং 'সৃষ্টি'র ক্ষেত্রে মনুষ্যের সমক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা জাজ্বল্যমান কয়েকটী সমস্যার 'সমাধান' চেষ্টায় পরিকল্পিত একএকটী Symbol, সেইরূপে বুঝিতে পারিলে (অধিকন্তু ঐ সকল দুরূহ বিষয়ে পাঠকের নিজের Position এবং সিদ্ধান্তের তুল্যমূল্য 'বাজাইয়া' নিতে গেলেই) পাঠকের সমক্ষে 'ডিভাইন কমেডী' বা 'প্যারাডাইস লষ্ট্' কাব্যের শক্তিপরিজ্ঞানে ও রসবোধে প্রধান বাধাটুকু অপসৃত হইয়া যাইবে। ঐ সকল বিষয়ে 'পাঠকের সিদ্ধান্ত'টুকু কি তাহা খোলাখুলি বুঝিতে গেলেই তিনি দেখিবেন যে, মিল্‌টন অথবা দান্তের 'খ্রীষ্টানী সমাধান'

জীবনসমস্যায় অদ্বৈততত্ত্বিকের সমাধান যে একবার পাইয়াছে ও গ্রহণ করিয়াছে তাহার আর দিক্‌ভ্রম হইতে পারে না। সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্র, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য প্রভৃতি যত সূক্ষ্মতন্ত্রী অথবা স্থূলতন্ত্রী শিল্পই হউক, উহাদের কোন শ্রেষ্ঠ 'কৃতি' কি বিশ্বের মহাশিবের এই 'উত্তর দিক্' ভুলিয়া শ্রেষ্ঠতার শিখরে উপনীত হইতে পারে? এই শিবোত্তর দিকেই মনুষ্যত্বের মালভূমি। প্রকৃত কবি কি কদাপি অধ্যাত্মনীতির বা জগৎনীতির বিদ্রোহী হইতে পারেন? ভাবুকতার ক্ষেত্রেও 'ভাগবত ভাব' ও 'দৈবীসম্পত্তি' বিস্মৃত হইতে পারেন? ইহা স্থির জানিতে হইবে যে, যাহা উচ্চশ্রেণীর শিল্প তাহা কদাপি আমাদের অন্তরাত্মাকে ক্ষুদ্র, নীচ ও শাশ্বত সত্য হইতে বিমুখ অথবা নিখিলের শিবতত্ত্ব হইতে অধোমুখ করে না। সকল শিল্প-তত্ত্বের আদিম গোমুখী অথবা চরমলক্ষ্যের নামই হইতেছে রস—যাহা জগতের চরম সচ্চিদানন্দের ছায়াবহ। জগৎতন্ত্রের ও সকল শিল্পতন্ত্রের এই শিবোত্তর দিক্ ও চরম লক্ষ্যস্থান স্থির থাকিলে আর সবিশেষ গতিভ্রান্তির সম্ভাবনা কোথায়? তার পর, সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে 'দৈবীসম্পত্তি'র ও 'আসুর সম্পত্তি'র পার্থক্য আছে, ভাবুকতার তরফেই যে আবার 'দেবাসুর'তত্ত্বের ভেদ আছে, তোমার স্থিতপ্রজ্ঞ হৃদয়ই তোমাকে উহা দেখাইয়া দিবে। এই দেবাসুর তত্ত্বের পার্থক্য! জীবন ও জগতের বিষয়ে পৃথিবীর অপর তাবৎ আদর্শের অন্তস্তত্ত্বের সঙ্গে ভারতীয় ঋষিতন্ত্রের পার্থক্য ঐ কথাটুকুর মধ্যেই সংক্ষিপ্ত আছে। 'দেবাসুর'

১১০। সাহিত্যশিল্পের মধ্যে 'দেবাসুর' জাতিভেদ এবং শ্রেষ্ঠশিল্পের ব্রহ্মতাল, সঙ্গতি ও 'বিশ্বসঙ্গতি'।

হইতে উহার সবিশেষ কোন পার্থক্যই নাই; অন্ততঃ, এক্ষেত্রে সবিশেষ 'যুক্তাযুক্তির' কোন প্রবল কারণই নাই। কবিকে স্বকীয় সমাজের হৃদয়ঙ্গমা 'প্রমূর্ত্তি' সাহায্যেই ত কাব্যের রসধ্বনি সিদ্ধি করিতে হয়! এই কাব্যদ্বয় কেবল মুহূর্ত্তমাত্রজীবী ভাব বা 'গীতি কবি'র কোন সবিশেষ খেয়াল বা Mood লইয়া ত দাঁড়ায় নাই—মানবজীবনের সর্ব্বাপেক্ষা নিদারুণ এবং দুরন্ত প্রশ্নজ্বালাই উহাদের রসসমাধানের প্রবল সঞ্চারিভাব রূপে কার্য্য করিতেছে!

এই সংজ্ঞাশব্দটীর মধ্যে ধর্ম্ম সমাজ পরিবার, রাষ্ট্র বা সাহিত্যতন্ত্রের বিষয়ে বৈদিক ঋষিবিজ্ঞানের চূড়ান্ত সমাচার টুকুই পাইতে পারি।

দেবাসুর বলিতে সাম্প্রদায়িক কোন 'ধর্ম্ম'আদর্শের 'পুণ্যবান্' বা 'পাপী' গোষ্ঠের কোন বিভিন্নতা বুঝায় না। এই জগৎপ্রবাহ সচ্চিদানন্দ হইতে আসিতেছে ও উঁহাকেই সকল গতিচক্রের চরম লক্ষ্যরূপে ধরিয়া স্বভাবতঃ চলিয়াছে; সে লক্ষ্যে চলাই জীবজীবনে 'ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সাধনা'— ইহা ঋষিগণ বিশ্বাস করিতেন। এ জন্য ইহজীবনের সকল ক্রিয়াকে, সকল জ্ঞান, ভাব ও কর্ম্মব্যাপারকে চরমের সেই 'সচ্চিদানন্দ' লক্ষ্যে সাক্ষাৎ অথবা পরোক্ষভাবে পরিচালিত করিতেই সর্ব্বত্র আদর্শ রাখিতেন। উঁহাই সর্ব্ব অবস্থায় তাঁহাদের শাশ্বত আদর্শ ও স্থির লক্ষ্য; উঁহাই তাঁহাদের 'সত্য', উঁহাই তাঁহাদের 'ধর্ম্ম'। এই দৃষ্টিস্থান এবং 'বিজ্ঞান'যুক্তির মধ্যেই 'কেতাবী ধর্ম্ম' বা Commandmentবাদীর সঙ্গে শ্রুতির ঋষিতন্ত্রের যৎকিঞ্চিৎ যাহা পার্থক্য; 'ফল' বিষয়ে হয়ত সবিশেষ কোন বিবাদই নাই। আমরা দেখিয়াছি, এই ধর্ম্মের মূল প্রণালীও ছিল 'সংযম'। যাহারা 'শাশ্বত সত্য'ও 'সার্ব্বজনীন' এবং 'সনাতন ধর্ম্ম'তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁহারা দেশকালে আগন্তুক সর্ব্ববিধ সাংসারিক অবস্থায়, আহার বিহার ও সকল 'ধর্ম্মাচারের' ব্যবস্থায় সেই জগদতীত 'নিত্য লক্ষ্য'কে স্মৃতি-পথে রাখিয়াই চলিতে চাহিবেন, তাহা বিচিত্র কি? 'অসুর' তত্ত্বের তফাৎ কোথায়? অসুরগণ দেবজাতি হইতে বিদ্যাবুদ্ধিতে, জ্ঞানবিজ্ঞানে বা কর্ম্মশক্তিতে ন্যূন ছিলেন না; বরং সকল দিকে প্রতিদ্বন্দ্বী থাকাই দেখা যায়। তাঁহাদের মধ্যে, ফলে, সাধু, সচ্চরিত্র, বিজ্ঞানী ও পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তির অভাব ছিল না; কিন্তু তাঁহারা ছিলেন নিত্যতত্ত্বে সংশয়ী বা আস্থাহীন। প্রকৃত প্রস্তাবে, জীবের যে আত্মা আছে, উহা যে ত্রিকালাতীত ও মরণাতীত, নিত্যবস্তু এবং 'সচ্চিদানন্দ পরমাত্মতত্ত্ব'ই যে জীবনের লক্ষ্য, এই সত্যে তাঁহারা সংশয়ী বা অচেতন ছিলেন। বিশ্বাসী ও সংশয়ী—এস্থলেই দেবাসুর তত্ত্বের প্রধান পার্থক্য? কিন্তু হৃদয়-মূলের এই যৎসামান্য পার্থক্যই

ফলে ধর্ম, সমাজ, পরিবার ও সাহিত্য প্রভৃতির অন্তঃপ্রকৃতিতে উভয়ের যাবতীয় আদর্শবিরোধের নিদান।

যাঁহারা নিত্যতত্ত্বে সংশয়ী, তাঁহারা 'ইহ'কেই ত মুখ্য করিবেন! ইহকাল, ইহজীবন, ইহদেহ, ইহজাতি, ইহপরিবার, ইহসমাজ, ইহরাষ্ট্র, ইহসুখ, ঐহিকস্বাধীনতা, ঐহিকবিমুক্তি অসুরের সকল আদর্শে 'ইহতা'ই মুখ্য। অতএব অসুর আধ্যাত্মিক না হইয়া আভূতত্ত্বিক হইতেই বাধ্য ছিলেন।

বুঝিতে হইবে এই 'দেবাসুর' জগৎব্যাপারের নিত্যতত্ত্ব; এবং দৈবীসম্পত্তি ও আসুর সম্পত্তির মধ্যে স্বভাব-বিরোধ। উহা চরমপন্থী ভাবে কর্ম্মজগতে প্রকাশিত হইলেই পাপপুণ্যের দুরন্ত ভেদে ও উভয়ের নিরন্তর স্বার্থসংগ্রাম রূপেই প্রকটিত হইতে থাকে; জগত্তন্ত্রেও কখন দেবতা, কখন বা অসুরতন্ত্রের জয়ই প্রত্যক্ষ হইতে থাকে; কিন্তু দেবতন্ত্রই পরিণামজয়ী। (১)

(১) মানবের 'দৈবীসম্পত্তি'গুলির বিষয় ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। (৫২৩ পৃষ্ঠা দেখুন)। মূল 'আসুর সম্পত্তি'ও গীতাতেই অতুলনীয় সূক্ষ্মদৃষ্টিতে পরিগণিত হইয়াছে, যথা—

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥ ১৬।১৪
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥ ১৬।৭
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥ ১৬।৮
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥ ১৬।১১
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥ ১৬।১৩
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥ ১৬।১৪

সাহিত্যের আদর্শেও এই 'দেবাসুর'পার্থক্য ও 'দেবাসুর'সংগ্রাম। তুমি বিশ্বাস কর কিনা, সচ্চিদানন্দই যেমন জীবনের, তেমন জীবনের সকল কর্ম্মের চূড়ান্ত লক্ষ্য? বিশ্বাস কর কি না, এই জগৎ ও জগৎরূপী শক্তির চক্রগতি Spirit হইতে আসিতেছে; Spirit কেন্দ্র হইতেই প্রসারিত হইয়াছে; Spirit লক্ষ্যেই পুনরাবর্ত্তন করিতেছে; এবং জীবের পক্ষে Spirit লক্ষ্যে চলাই বিশ্বতন্ত্রের সমতানে ও সমতালে চলা? এ স্থলেই জীবনের বা সাহিত্যের যাবতীয় আদর্শভেদের গোড়া? মানবজীবনের যাহা লক্ষ্য, মনুষ্যের যাহা স্বধর্ম্ম, তাহা হইতে মানবের সাহিত্যআদর্শ কোন দিকে খণ্ডিত অথবা স্বতন্ত্র হইতে পারে না।

ব্যবহার ক্ষেত্রে প্রত্যেক মনুষ্যেরই এস্থলে, হয়ত অতর্কিতে, ভ্রম-সম্ভাবনা আছে। অতএব, নিতান্ত সোজা কথা হইলেও, বলিতে হয় যে, এ ভ্রমের হস্ত হইতে মুক্ত থাকিবার একমাত্র উপায়, পাঠকের পক্ষে আদর্শচৈতন্যের সংসিদ্ধি এবং সচেতনভাবে জিজ্ঞাসা পরিচালন। প্রথম কথা, আকৃতি-প্রকৃতিতে ইহা কাব্য কি না? তার পর, এই যে কাব্য ইহার সমক্ষে, ইহার প্রকটিত অর্থে অথবা ব্যঞ্জিতার্থে, গৌণ কিংবা মুখ্যভাবে, সচ্চিদানন্দ বা সত্যশিবসুন্দর তত্ত্ব আছেন কি? অন্ততঃ, এ কাব্য উঁহার অদ্রোহী কি? আবার, এই কাব্যে কোন তত্ত্বটা উদগ্র হইয়াছে! সুন্দর, সত্য না শিব? সুন্দরের স্থলে আমাদের হৃদয়দর্পণে শিব কিংবা সত্যকে মুখ্য করিলে উহা ত

অনেকে চিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥ ১৬।১৬

সাহিত্যের পাত্রগণের (character) মধ্য দিয়া যেমন আসুর তত্ত্বে সহানুভূতি উপন্যস্ত হইতে পারে, সাহিত্যের রসাত্মা বা মর্ম্মমধ্যে যেমন আসুর ধর্ম্মের প্রচার প্রবল হইতে পারে, তেমন কবি বা শিল্পীর আত্মচরিত্রেও আসুর ধর্ম্মই সর্ব্বথা মুখ্য থাকিয়া ঐ সমস্ত সমাধা করিতে পারে। ঈদৃশ কুসাহিত্যের প্রধান নামই দেওয়া যায়—'আসুরিক সাহিত্য'।

আদৌ সাহিত্যকোটি হইতেই পরিভ্রষ্ট হইয়াছে! পুনশ্চ, কেবল মাটীঘেঁষা জীবনকথা বা সত্যবৃত্তান্তই উহার অবলম্বন কি? মনুষ্যের অন্নময় ভূমি বা বিশ্বপুরী ছাড়াইয়া উহা তাহার 'মানস'গুহায়, 'তৈজস' ভূমিতে আপনার 'ধ্বনি'কে পৌঁছাইতে পারিতেছে কি? উহা জীবের 'প্রজ্ঞা'লোকে—নৈতিক বা আধ্যাত্মিক লোকেও—নিজের অর্থ অথবা ব্যঞ্জনাকে লইয়া যাইতে পারিয়াছে কি? তা না হইলে, উহা ত উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য হইবে না! একালে এরূপ প্রশ্নের সতর্ক প্রয়োগ ও নিজের মগ্নচৈতন্যের উদ্বোধন ব্যতীত কদাপি প্রকৃত পাঠক কিংবা সমালোচক হওয়া যায় না।

মানবজাতির সকল শ্রেষ্ঠকবির প্রতিভামূলে এবং তাঁহাদের অন্তরাত্মার বোধিমূলে এই সত্যশিবসুন্দর নিত্য আছেন। ইহা নিশ্চয় যে যেমন সাহিত্যের এই 'সচ্চিদানন্দ 'রস'তত্ত্বকে মাথায় রাখিয়া, তেমন জীবের চিরন্তন এবং মুখ্য ভাববৃত্তিগুলিকে উপজীব্য করিয়া এবং মনুষ্যজীবনের প্রধান ও বলবান্ দশা এবং অবস্থাগুলিকে অবলম্বন করিয়া যে গ্রন্থ পরিকল্পিত হয়, মনুষ্যমাত্রেই যে সমস্ত সম্বন্ধে পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে কিংবা পারস্পর ভাবে সংগ্রথিত আছে তাহা লইয়া যে কাব্য বিরচিত হয়, সে কাব্য সত্যবস্তুর দিক্ হইতে কখনও পুরাতন হইতে জানে না। তদ্‌ব্যতীত জাতির বা সমাজের কিংবা দেশবিশেষের কোন সংকীর্ণ ধর্ম্ম কিংবা রীতিনীতি অবলম্বন করিয়া, মনুষ্যের বা স্ত্রীপুরুষের বাহ্য সম্বন্ধ, স্বত্ব অথবা দাবীতন্ত্রের কোন সংকীর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া যে কাব্য দাঁড়াইতে চায়, হাজার প্রতিভার প্রমাণ থাকিলেও তাহা চিরন্তন ও সার্ব্বভৌম মানবের হৃদয় প্রকৃত প্রস্তাবে দখল করিতেই পারে না। উহা একটা সাময়িক ও সীমা-সংকীর্ণ অপিচ 'তারিখী' পদার্থ; সময় অথবা সুযোগের পরিবর্ত্তনেই উহা অপ্রতিষ্ঠ হইয়া পড়িবে; অন্ততঃ এদিকে সেই কবিকে একদিন না একদিন বিষয়নির্ব্বাচনের দুরদৃষ্টফল ভোগ করিতেই হইবে। যে সকল কবি একদা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াও পরে পরে উহা হারাইয়াছেন,

কারণ অনুসন্ধান করিতে বসিলে হয়ত একরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর দুর্ভোগ অনেকের কপালেতেই প্রত্যক্ষ করিব। কবিরাজের প্রতি পাঠকবর্গের অতর্কিত প্রার্থনা এই যে, জীবনে ও জগতে তুমি এমন কোন মহাসত্য দর্শন করিয়া, মহাভাবে উহার ভাবুক হইয়াছ কি, যাহা সাধারণ্যে দর্শন কিংবা অনুভব করে না? তবে, উহাই আমাকে দাও; উহাতেই তোমার গৌরব। সকলের 'হৃদয়'ই জানে যে, ওই 'দেওয়া'র প্রণালী অপরিহার্য্য ভাবে Realismও নহে; Naturalismএর ফলও নহে; কেবল 'ফটোগ্রাফ'ও নহে। সাহিত্যের বাণীজগৎ সচ্চিদানন্দ-সংযোগী কবির রসানন্দসৃষ্টি; তাঁহার আত্মগত সেই অনির্ব্বচনীয় রসের 'অভিব্যক্তি'; উহা কবির সত্যানুভূতির আনন্দজনিত এবং সেই আনন্দ-প্রকাশের উদ্দেশ্যসৃজিত স্বতন্ত্র একটি জগৎ। কাব্য হইতেছে শিবসুন্দরের নিত্যসত্যের আনন্দমূর্ত্তি; Realism নহে, অথণ্ড ও শাশ্বত Realityই নিত্যসাহিত্যের ভিত্তি।

তাই, বিশ্বের ঋতসত্যে ও শিবানন্দরসে সমুৎসুকী এবং প্রকাশ-পিপাসী 'প্রাণ' লাভ করা জীবতন্ত্রে একটা পরম সৌভাগ্যপদবী। কাব্যকবিতা প্রাণ হইতেই আসে। অতএব, কেবল শাস্ত্রপাঠ করিয়া, বা উচ্চ আদর্শের জ্ঞানলাভ করিয়াই উচ্চশ্রেণীর শিল্প কল্পনা করিতে কিংবা শ্রেষ্ঠ কবি হইতে পারা যায় না। শ্রেষ্ঠতায় উন্নীত হইবার ইচ্ছা কারই বা না থাকে? সত্য এবং সৌন্দর্য্যের দৃষ্টি এবং প্রাতিভ শক্তি লাভ করার পরেও তাই আবার কবির পক্ষে 'প্রকৃতিস্থ থাকা' বলিয়া একটা কথা আছে; কবিত্বের পশ্চাতেই আবার স্বতন্ত্র সৌভাগ্যযোগ এবং সাধনাযোগের অপরিহার্য্যতা আছে। তাই কাব্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে আদৌ একটা বড় কথা এই যে—

> নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা।
> কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা॥

এই 'শক্তি'র অর্থই Genius এবং Genius বলিতে কর্ত্তৃত্বের হিসাবে বুঝাইতেছে দুর্লভের দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। এদিকে আরও অগ্রসর হইয়,

এ'টুকুও বলিতে পারা যায় যে, জগতে শিবসুন্দর তত্ত্বের প্রকৃতিস্থ কবিত্বশক্তি লাভ করা উক্তরূপ সুদুর্লভের মধ্যেও আবার 'পরম দুর্লভ'। সাহিত্যসংসারে সর্বত্র দেখিতেছি, অনেক বড় কবি, এবং প্রকৃত শক্তিশালী কবি আদৌ বিশ্বতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গতিশীল হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াও, কেবল আধুনিক সাহিত্যের অপরিহার্য্য বাজারী হাওয়ায় পড়িয়া এবং কু-পরিবেশ ও কু-আদর্শের সংসর্গে আত্মবিস্মৃত ও বিশ্ববিস্মৃত হইয়াই স্থলবিশেষে একেবারে হেয় হইয়া পড়িতে পারেন। বর্ত্তমানে এ'রূপ কুসঙ্গের বিষয়েই শ্রেয়ঃকামী সাহিত্যসাধক এবং পাঠকমাত্রকে নিয়তভাবে সতর্ক এবং সচেতন থাকিতে হইতেছে। শিল্পের চূড়ান্ত মাহাত্ম্যের ক্ষেত্রে সংসর্গদোষেই শিবতাল-ভঙ্গের অনেক দৃষ্টান্ত আধুনিক সাহিত্যে অজস্র মিলিতেছে। কত কত শক্তিশালী প্রতিভার ফলই, কবিত্বশক্তি, সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, চাতুর্য্য কিংবা রসিকতার পুঞ্জীকৃত মাহাত্ম্যপূর্ণ গ্রন্থই ভগ্নমেরুদণ্ড জীবের ন্যায় সহৃদয়সমাজে জুগুপ্সিত, নিঃসার এবং অচল হইয়া গিয়াছে!

সকল শ্রেষ্ঠ এবং অমরশিল্পীর অন্তস্তলে দৃষ্টি করিলেই দেখিব যে, যাঁহাদের রচনা যুগযুগান্তজীবী হইয়াছে তাঁহাদের মূল বিষয়ে কোন ভুল নাই; তাঁহাদের শিল্পের আকৃতি এবং প্রকৃতির মধ্যে সত্য-জ্ঞান-আনন্দতত্ত্বের সামঞ্জস্যটুকু, শত ঘোরাঘুরির মধ্যেও, নিষ্কলুষ ভাবেই সুস্থির আছে; তাঁহাদের সত্যসৌন্দর্য্যের সমাধান কুত্রাপি "সর্ব্বসম্বন্ধ-বন্ধেন সম্পূর্ণঃ শিবসংজ্ঞিত" তত্ত্বটাকে 'তাচ্ছিল্য' কিংবা অতিক্রম করে নাই। শিবরহিত যজ্ঞ করিয়া কোন দক্ষই মহাকালের বীরভদ্র সমক্ষে অক্ষত শরীরে থাকিতে পারেন নাই। সাহিত্যের সকল শ্রেষ্ঠ শিল্প সত্যশিবসুন্দরের সঙ্গতি-সিদ্ধি রূপ মহার্ঘ গুণেই পূজনীয় হইয়া কালস্রোতের অভিঘাত-মধ্যে অবিচলিত ভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

তুমি আজ নিজের মতলবে শিববিদ্রোহী শিল্প রচনা করিতে পার, কিন্তু মনে রাখিও, উহা বিশ্বের 'সচ্চিদানন্দ আত্মা'-রূপী চরমশিল্পীর বিদ্রোহী—জগতের শাশ্বত সঙ্গীতের বিদ্রোহী; উহা ব্রহ্মতালের সমক্ষে

একটা বেতাল পদার্থ। উহাকে অবিদ্যা বা শয়তান আপাততঃ বাড়াইতে পারে; কিন্তু বিশ্বতালের বিদ্রোহী হইয়া উহা কতক্ষণ টিকিবে? এই শিবস্থানেই শিল্পের বিশ্বসঙ্গতি। মানবাত্মার দৈবী সম্পত্তির উদ্বোধনা ব্যতীত প্রকৃত কবিত্ব নাই। শিল্পী আলম্বনবস্তু বিষয়ে যতই অদেশে, কুদেশে অথবা বিদেশে ভ্রমণ করুন না কেন, তাঁহাকে রসভাবের 'উত্তরগতি' স্থির রাখিয়াই চলিতে হইবে; উত্তরের সেই চিন্ময় 'শিবপুর'কে ঘনিষ্ঠ অথবা 'সুদূর লক্ষ্য'রূপে ধারণা রাখিতেই হইবে। যাহা তাহা অবলম্বন কর, যাহা তাহা বর্ণনা কর, মনুষ্যের জীবনাকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দর্শনী কিংবা কর্ম্মপ্রবর্ত্তনাময়ী বাণীপ্রতিভার বৈদ্যুতী রেখা আঁকিয়া যাও, কিন্তু কখনও ভুলিও না যে, মাথার উপরে সূর্য্য আছেন, যেই সচ্চিদানন্দ সূর্য্যের সাবিত্রলীলা এই বিশ্ব সংসার। এ স্থলে কোন সাংপ্রদায়িক ধর্ম্মধ্বজা নহে, ইহা জগতের সত্যবেদ—তত্ত্ববিজ্ঞানের চরম সত্য দর্শন; সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ভাবেই জীবন ও জগতের শাশ্বত ধর্ম্ম ও লক্ষ্যের উদ্দেশ। এ জগতের প্রত্যেক অণুপরমাণুতে, শক্তিপ্রকাশের বিভিন্ন মুখে, ভাবে ভাষায় এবং বাক্যে, জ্ঞানে কর্ম্মে এবং ভাবে, ঘরে এবং বাহিরে ওতপ্রোত ঐ সূর্য্য! এই সূর্য্যবিবেক এবং সূর্য্যসিদ্ধান্তই হইতেছে মনুষ্যের জীবনতরণীর, তাহার সমাজ, ধর্ম্ম বা সাহিত্যের চরম কাণ্ডারী। এই সূর্য্য প্রত্যেক জীবের অভ্যন্তরে 'দ্বিতীয় আত্মা'—পরম আত্মা—সাক্ষী। উহাই "The still voice within"। অথচ, এই কূটস্থ ও সাক্ষী সূর্য্য হইতেই জীবের তাবৎ ভাগবত ভাব, তাহার যাবতীয় ধর্ম্মভাব বা দৈবী সম্পত্তি আসিতেছে! রসতন্ত্রের এ স্থানেই চরম রহস্য: এই সাক্ষী ও নীরব কাণ্ডারীর বিপরীত চলাই হইল—রসহত্যা, আত্মহত্যা। অতএব যেমন জীবনের, তেমন সাহিত্যশিল্পেরও কোন 'কর্ত্তব্য' বা 'লক্ষ্য' নির্দ্দেশ করিতে হইলে উহা ইন্দ্রিয়-উপাসনা নহে—ইন্দ্রিয়ের সংযম—ইন্দ্রিয়ের বিজয়; উহাতেই চিন্ময় রসস্বরূপের অভ্যুদয়। সকল 'উপাসনা', সকল কর্ম্মগতির ভিতর দিয়াই জীবকে নিয়ত স্থির রাখিতে হয় সূর্য্যধার ও সূর্য্যগতি—

চূড়ান্তের এই সূর্য্য-লক্ষ্য! সাহিত্যের রসতত্ত্বেও সূর্য্যগতির এই সুষুম্নাপথ! সাহিত্যরসের ক্ষেত্রেও চূড়ান্তের এই সচ্চিদানন্দ সূর্য্যকে ভোলার নামই অবিদ্যা—অন্ধতা—পাপ—মৃত্যু। সূর্য্যরসের স্বরূপ বোধে ওই 'অবিদ্যা'টুকুর বশেই যেমন জীবাত্মার, তেমন শিল্পীর আত্মবিস্মৃতি—বিশ্ববিস্মৃতি—উন্মার্গগতি—অধঃপাত—বিনিপাত!

যে সকল বাক্যশক্তিশালী শিল্পী সাহঙ্কারে, মনুষ্যের ভোগাসক্তি এবং জড়তামুখী প্রবৃত্তির ধর্ম্মকে যৌন-লালসার বিশ্লেষণ অছিলায় অথবা চাতুর্য্যময় এবং মাধুর্য্যসমুজ্জ্বল বর্ণনা পথে সাহিত্যক্ষেত্রে সমর্থন করিতেছেন তাঁহাদের শক্তিমত্তায় আমরা স্তম্ভিত হইতে পারি, তাঁহাদের সংসর্গেও ক্ষণিক আমোদ লাভ করিতে পারি, কিন্তু আমাদের 'অমৃত পুত্র' অন্তরাত্মা কখনও শ্রদ্ধা বলিয়া পদার্থটি তাঁহাদের প্রতি কেন যে অনুভব করিতে পারে না তাহাই চিন্তা করিতে হইবে; উহাতেই এ সকল শিল্পচেষ্টার 'জাতি'টুকু অন্তরের সেই নিস্তব্ধ সাক্ষী পুরুষের আলোকেই সমুজ্জ্বল হইবে। চণ্ডাল জাতীয় শিল্প! আপাতদৃষ্টিতে পরম রূপবতী অথচ চণ্ডালপ্রকৃতির শিল্পসুন্দরী! যাহার সংসর্গে আচ্ছন্ন হইয়া, যাহার জড়োল্লাসময়ী লাবণ্যলীলায় চিদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উচ্চবর্ণের জীবাত্মাও একেবারে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। জীবের নিদারুণ বিপদের কথা এই যে, যেই কবিগণ জীবনরণাঙ্গনে ঘনলিপ্ত ও আত্মতত্ত্ববিস্মৃত জনসাধারণের নিকটে চরম সত্যশিবসুন্দরের পরম বার্ত্তা প্রচার করিবেন, তাঁহারাই এখন আপনাদের পরমার্থ বিস্মৃত হইয়াছেন—বেরসিক এবং বদ্‌রসিক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। অথবা যাহারা কোনমতেই 'কবি' নামের যোগ্য নহে, যাহারা মনুষ্যের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে অস্পৃশ্য পাত্র তাহারাই সরস্বতীর 'পাস' জাল করিয়া ভদ্রলোকের অন্তঃপুরচর ও জীবনসহচর হইতেছে। মানবসাহিত্যের ইতিহাস শিক্ষা দিতেছে, মহৎসাহিত্যের মহত্ত্ব কোথায়?—যে পর্য্যন্ত উহা জীবনার্থ দর্শন করে, জীবের তেতালা আত্মগৃহের খবর রাখে এবং দৈবীসম্পত্তির উদ্দীপনা পথে জীবের শিবস্বরূপকে জাগাইয়া দিয়া তাহার চরম 'রসায়ন'

সমাধা করে। জীবনের বিষয়ে উহাই প্রকৃত সত্যবাদিতা, প্রকৃত Realism. নচেৎ কেবল মনুষ্যত্বের নিম্নতলের কথা, কেবল জড়ত্বের 'বয়ান' বা মানসিকতার সমর্থনা, অথবা Mere representation of the outer crust of life—এসমস্ত মনুষ্যত্বের 'কুৎসা' ব্যতীত অপর কিছুই নহে। উহা কদাপি শিল্পনামের যোগ্য নহে; অন্ততঃ উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য নহে। সাহিত্য ত 'স্বয়ংপ্রয়োজন' নহে; 'তৎপ্রয়োজন'—আত্মার জন্যই সাহিত্য। যাজ্ঞবল্ক্যের বাক্যপ্রণালী অনুসরণ-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিতে পারি, "নবা অরে সাহিত্য-কামায় সাহিত্যং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় সাহিত্যং প্রিয়ং ভবতি।" এই 'আত্মা' এবং উহার অর্থব্যাপ্তি লইয়াই সমস্ত। আমাদের প্রত্যেকের 'আত্মা' ত আমাদের অজানিতেই এককালীন বিশ্বগত এবং বিশ্বাতীত বস্তু! অতএব সাহিত্যের সেবা করা, উহার কর্ত্তা বা ভোক্তা হওয়া উভয়তঃই 'সচ্চিদানন্দ শিব' স্বরূপ আত্মার স্বাধিকার প্রবর্ত্তন রূপে চিনিতে পারিলেই সাহিত্যসেবীর জীবন প্রকৃত সত্যসঙ্গতি ও বিশ্বসঙ্গতি লাভ করিতে পারে। সাহিত্যসেবাও শিল্পীর পক্ষে ভাবুকতার পথে, ভাবমুখ্য জ্ঞান ও কর্ম্মের পথে, স্বধর্ম্ম ও দৈবীসম্পত্তির 'প্রপত্তি' পথে 'পরমাত্মা' প্রাপ্তির সাধনা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সাধারণ মানবত্বের মধ্যে পশু ও দেবতা, দেব ও অসুর উভয়ই আছে। তাই উচ্চ শ্রেণীর জীবমাত্রেই পশুশাসক, পশুশিক্ষক এবং পশুপতি। নিজের নিম্নতলের জড়তাবিলাসী ইন্দ্রিয়গ্রামই ত পশু! পাশুপত ধর্ম্ম হইতেই জীবপর্য্যায়ে প্রকৃত মনুষ্যত্বের আরম্ভ। সুতরাং 'মনুষ্যত্ব' দাঁড়াইতেছে একটা ধর্ম্মপ্রাণ পদার্থ; দেহধারী দ্বিপদ হইতে শিবপদ পর্য্যন্তই যাহার অধিকারভূমি। পাশুপত অস্ত্রলাভ ব্যতীত দুনিয়ার কোন্ ক্ষেত্রেই বা সমর্থ ও বিজয়ী হওয়া যায়? যেমন চাতুর্ব্বর্ণ্যধর্ম্মা জীবের, যেমন অধ্যাত্ম অভ্যুদয়কামী ও 'পরপার'যাত্রী ব্রাহ্মণধর্ম্মীর, যেমন সংসারের ঐশ্বর্য্য-বিজয়কামী ক্ষত্রিয়ধর্ম্মীর, যেমন অর্থশক্তিপ্রয়াসী বৈশ্যধর্ম্মীর, যেমন পরতন্ত্র ও আনুগত্যজীবী শূদ্রধর্ম্মী

ব্যক্তির—পাশুপত অস্ত্রে কার না দরকার? পাশুপত ব্যতীত সংসারের কুরুক্ষেত্র জয় করা দূরে থাকুক, 'মনুষ্যত্বই' দাঁড়াইতে পারে না। (১)

যে কবি বা যে শিল্পী অন্তরাত্মার পাশুপত সিদ্ধি চিনিয়াছেন, তিনিই আত্মপ্রকৃতিতে সংস্থিত হইতে এবং সাহিত্যে সত্যনিষ্ঠ ও রসায়নবরিষ্ঠ

(১) এসূত্রে ভারতীয় কর্ষণাজিজ্ঞাসুর উদ্দেশে মন্তব্য এই যে, এজন্যই বেদপন্থী প্রাচীন ভারত সর্ব্বমনুষ্যকে চতুরাশ্রমের ক্রমান্বিত উন্নতি সাধনার পথেই অনন্তত্বে চালাইতে চাহিয়াছে। দেখিতে হইবে যে, প্রত্যেক মনুষ্যকে আদৌ ব্রহ্মচর্য্যাপথে দীক্ষিত করিয়া, তাহার সমস্ত জীবনকে অধ্যাত্মতার উত্তরমুখী গতিতত্ত্বে এবং চরমের আত্মপ্রাপ্তিতত্ত্বে সচেতন করিয়াই সংসারে পাঠাইতে চাহিয়াছে; পৃথিবীর সর্ব্বমানবের জীবন যাহাতে সহজে পরম 'অভয়'পথে এবং স্বধর্ম্মগত স্বাধিকার-পথে চূড়ান্তের অনন্ত জীবনে পরিশিষ্ট হইতে পারে তাহারই লক্ষ্য রাখিয়াছে। এস্থলেই ত ভারতের বর্ণাশ্রমী কর্ষণা বা প্রত্যেক জীবের স্বাধিকারগত 'সাধনা'র একটা চতুষ্পাঠী! সর্ব্বমানবকে কর্ম্মসকল ভাবে অমৃতত্বের অধিকারী করিতে গিয়া ভারতের সমাজ আদর্শ এইরূপে সামাজিকতা এবং চূড়ান্তের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও ব্রহ্মসন্ন্যাস মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ঘটাইতেই চাহিয়াছে; প্রত্যেকের জন্য চরমের অদ্বৈতপ্রাপ্তি এবং জীবনের প্রশান্তি, বিশ্বসাম্য এবং স্বাধীনতার স্বরাজকেই লক্ষ্য করিয়াছে। জীবন ও জগতের রহস্য যে বুঝিয়াছে, সে নৈষ্টিক হইয়াছে এবং 'আত্ম চিন্তা' করিয়াছে সে 'অধিকারবাদী' না হইয়াই পারিবে না।

এস্থলে বেদান্তের সিদ্ধান্ত বিষয় যুক্তিতর্কের দিক্ হইতে দুইটি প্রবল আপত্তি এবং বিদেশী বা বিধর্ম্মী ব্যক্তিগণের দুইটি প্রধান 'বিমতি'র কথাও উল্লেখ করিতে হয়। শ্রীযুক্ত ম্যাক্ ডোনাল্ড্ সাহেব সংস্কৃতসাহিত্যে সুপণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া বিখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। সাহিত্যর ইতিহাস ও শব্দতত্ত্বের অধিকার ছাড়াইয়া উঠিয়া তিনি সংপ্রতি Immortality নামক সংগ্রহগ্রন্থে Immortality in Indian thought প্রসঙ্গে বৈদিক 'মুক্তি' আদর্শ বিষয়ে নিজের সিদ্ধান্তটুকু জগৎকে দান করিয়া বলিতেছেন যে, হিন্দুধর্ম্মের 'মুক্তি' একটা "Unconscious State": যথা—

"We meet with an entity which after undergoing a moralised, beginningless and almost unending series of reincarnations, finally at the end of its last incarnation, becomes merged in the Worldsoul and remain, thus united, in a state of unconsciousness." এ কেমন হইল! আমাদের চিৎ বা চৈতন্য বস্তু কি Unconscious পদার্থ! যাঁহাকে জগৎস্রষ্টা

সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। শিল্পক্ষেত্রে যাঁহারা মানবত্বের এবং মনুষ্যজাতির কুৎসায় রত আছেন, তাঁহাদের রচনা যে কদাপি মনুষ্যের অনাবিল আত্মীয়তা এবং স্থায়ী প্রীতি লাভে সমর্থ হয় না, উহার প্রধান রহস্যই এস্থলে—বিশ্বনীতি বা সৃষ্টির নিয়ম্‌টি যে উহার বিপরীত।

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বা Worldsoul বলা হইতেছে তিনি কি Unconscious পদার্থ যে তাঁহার সহিত যুক্ত হইলে বা তাঁহাতে merged হইলে কোন জীব (Entity) Unconscious হইয়া পড়িবে? আমাদের এই লৌকিক বুদ্ধিভূমি হইতেই ত তর্কযুক্তি-পথে বুঝিতে পারি যে যাঁহাকে 'ব্রহ্ম'বস্তু বলিতেছি তিনি ত এককালীন সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বানুভূ। বিশ্বজগতের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর কথাই ধরা যা'ক—এ পৃথিবীতে যত সমস্ত চেতন ও বিচেতন পদার্থ আছে, তিনি ত সকলের ব্যক্তিত্বকে, সকল অহংকে এবং সকলের সর্ব্ব অনুভবকে স্বয়ং এককালীন অনুভব করিতেছেন! সেখানে দেশকালের সীমাসংকীর্ণতা নাই—সমস্তই Now এবং Here. যিনি এককালীন 'সর্ব্ব' অথচ 'এক', যিনি সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ এবং সহস্রপাদ অথচ 'এক', যেই অখণ্ড মহাচৈতন্য আমাদের এই Relative জ্ঞানের এবং 'ত্রিপুটী'র অতীত, যাঁহার মধ্যে বিশ্বের সমস্ত জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতার একদা-ও-একত্র অবস্থিতি (যে জন্য পঞ্চদশী বলিতেছেন "অদ্বৈতে ত্রিপুটী নাস্তি ভূমানন্দো হত উচ্যতে") বেদের সেই 'ব্রহ্ম' কি একটা Unconscious বস্তু? আমার অহংকারী ও ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র এই বুদ্ধির ধারণাতীত বলিয়াই 'ব্রহ্ম'প্রাপ্তি একটা গাছপাথরের অবস্থা হইবে!

সেরূপ, মাদ্রাজের ম্যাকেঞ্জী সাহেবও এক গ্রন্থ লিখিয়াছেন—The Ethics of the Hindus. উহা একটা বৈজ্ঞানিক আদর্শের গ্রন্থ মনে করিয়া খুলিয়া দেখি, বইটা Religious quest of India seriesএর অন্তর্গত; অতএব একটা 'পাদ্রী' আদর্শের গ্রন্থ। হিন্দুর Religious quest ব্যাপার যে একটা নিস্ফল ও ব্যর্থ ব্যাপার, খ্রীষ্টানী ধর্ম্মকে যে বিনা তর্কবিচারে মনুষ্যমাত্রকে গ্রহণ করিতে হয়, সে আদর্শই সুতরাং উহাতে মুখ্য হইয়াছে—কোন বিজ্ঞানপিপাসা নহে। ম্যাকেঞ্জী লিখিতেছেন—"In the doctrine of the Atman social morality has no such eternal significance". অবার অন্যত্র—

"Let the case be stated bluntly. Those ideas which bulk so largely into Vedanta and which find expressions in other systems of Philosophy, when logically applied, leave no room for ethics." p. 206.

বুঝিতে হইবে, আদর্শের ক্ষেত্রে ইহা Romanticism নহে, Idealism ও নহে, Moralism বা Religiosityও নহে; মনুষ্যত্বের পক্ষে বরং ইহাই প্রকৃত Realism; সচ্চিদানন্দ শিবাত্মা মনুষ্যের শাশ্বত Reality. অতএব যে কবি মনুষ্যের দেবাংশ, তাহার ধর্ম্ম বা পুণ্য-

"Even in the Bhagabatgita the idea remains that he who finds deliverance, realises his true being not in social activity pursued with a purified will but in an ecstatic union with God in which the ethical is transcended." p. 258.

ম্যাকেঞ্জী সাহেবের ওই social morality of eternal significance কেমন বস্তু সে প্রশ্ন তুলিব না। বুঝিতে হইবে উপরে বেদান্তের বিরুদ্ধে তৎসদৃশ ব্যক্তি এবং পাদ্রীগণের 'বাঁধা গৎ' টুকুই পাওয়া যাইতেছে। তবে, তাঁহার ঐ God টুকু কোন্ বস্তু যাহার সঙ্গে যুক্ত হওয়া বা Unitive State হওয়ার ফলে (তাঁহার মতে) জীবাত্মার এতবড় একটা 'দোষ' ঘটিয়া যাইতেছে। তাঁহার এই God স্বয়ং Ethical being না non-Ethical being? যদি ঈশ্বরের মধ্যে Eternal Social relations থাকে, তবে তাঁহার সঙ্গে Union হওয়ার পরে, কোন জীবের তাহা না থাকার কারণ কি? ঈশ্বর কি এতবড় একটা ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ ও দোষাশ্রিত পদার্থ যে তাঁহার সংসর্গেই ম্যাকেঞ্জী সাহেবের বোধগম্য এতবড় একটা সংকীর্ণতা জীবকে আশ্রয় করিবে? তবে ঈশ্বর যদি কেবল Father in Heaven হইয়া, স্বর্গপুরীর একদেশ আশ্রয় করিয়া কোথাও বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে উহা সম্ভবপর বটে। কিন্তু বেদান্তের ঈশ্বর ত Both Immanent and Transcendent; তিনিই ত জগতের ধর্ম্মরাজ।

তারপর, ঈশ্বরের সঙ্গে 'যুক্ত' হইলে, আমি ত 'ঈশ্বরের ইচ্ছা' মতেই চলিব, আমার নিজের 'ইচ্ছা' ত থাকিবে না! উহাকে ম্যাকেঞ্জী সাহেব কোন্ অবস্থা বলিয়া মোহর-মুদ্রিত করিবেন? তখন সে অবস্থা Ethical না non-Ethical? জগতের দার্শনিকগণ সকলেই ত বলিতেছেন যে Ethical একটা টানাটানির অবস্থা—'ভালমন্দ' বিচার লইয়া একটা Struggleএর অবস্থা। এ সূত্রে খ্রীষ্টানের Universal Prayerটাই গ্রহণ করিব। উহা প্রাচ্য ঋষির কথা এবং উহাকে যে পাশ্চাত্ত্য বুদ্ধি যথাযথ অর্থে গ্রহণ করিতে পারে না, ম্যাকেঞ্জী সাহেবের দৃষ্টান্তই তাহার প্রমাণ। 'Thy will be done in earth as well as in Heaven কথাটার অর্থ কি? পৃথিবীর কোন জীব যদি ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ বা my willটুকু সমর্পণ করিয়াই 'যুক্ত' হয়, অন্য কথায় তাহার

বুদ্ধি, তাহার ক্ষুধা-পিপাসা, তাহার স্বভাবসিদ্ধ এবং আত্মার স্বধর্ম্মসঙ্গত কৃতজ্ঞতা, কৃতার্থতা অথবা কমনীয় আত্মবিস্মৃতি এবং আত্মোৎসর্গের ছবি সমাবিষ্কৃত করিয়া আমাদের প্রীতি-সহানুভূতি অথবা ভক্তি সঞ্চার করিতে পারেন, তিনি যে মনুষ্যের পশুধর্ম্মদর্শনের নিপুণ দার্শনিক

পক্ষে কেবল Thy Will টুকুই থাকে, তাহাই ত প্রকৃত Ecstatic union with God! সাহেব দর্শনের (Ecstasy) 'আনন্দ' কথাটাতেই যেন অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন! তিনি উহাকে কোন্ 'অবস্থা' বলিবেন? Father Farrarএর Life of Jesus পাঠে দেখিতেছি, যীশুখ্রীষ্ট যখন শেষবার ইহুদীগণের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে গেলেন, মানবের হিতে প্রাণদান করিবার জন্য, Vicarious punishment (Atonement?) গ্রহণ করিবার জন্য এবং আত্মবলি দিবার জন্যই গেলেন, তখন তিনি ত তাঁহার 'পিতার ইচ্ছা' মতেই আত্মবলিদান করিতে গেলেন! তাঁহার স্বতন্ত্র আমিত্ববুদ্ধি ত ছিল না; উহা ম্যাকেঞ্জী সাহেবের Eternal social relationsএর মাপকাঠিতে আত্মহত্যা নহে কি? আত্মহত্যা পাপ না পুণ্য? খ্রীষ্টের এই আত্মহত্যাকে ম্যাকেঞ্জী কোন্ Ethicsএর দ্বারা বিচার করিবেন?

এসূত্রে, অন্যদিক্ হইতে, ভারতের আধুনিক যুগের পরম ব্রহ্মবাদী ঋষি রামকৃষ্ণ পরমহংসের একটা প্রত্যুত্তরই উল্লেখ করিব। রামকৃষ্ণের জীবনীতে অজস্র মিলিতেছে যে, তিনিও তাঁহার 'মায়ের ইচ্ছা'র মধ্যেই 'নিজের ইচ্ছা'কে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। কোন তার্কিক যুবক প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন—"যদি আপনি কোন অন্যায় কাজ করিয়া বসেন?" এই নিরক্ষর ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বলেন "ওরে, মা বেতালে পা ফেলতে দেন্ না রে।"

আমাদের এই ব্রহ্মমুক্তি বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি বিষয়ে ম্যাক্‌ডানাল্ড বা ম্যাকেঞ্জী-প্রমুখ পণ্ডিতগণের সকল সমালোচনার মধ্যে একটা 'অর্থ'ই মুখ্য হইতেছে। সেই অর্থটুকু এই যে, "আমি আমার এই Relative জ্ঞানে আছি, এবং এই 'ব্যাবহারিক জ্ঞান' লইয়া থাকিতেই ভালবাসি। জগৎকারণ বা জগতের অশেষ বহুত্বের 'এক' কারণ বলিয়া কোন বস্তু আমার অপেক্ষা উচ্চতর কোন জ্ঞানস্থানে বা Morality স্থানে আছেন কিনা, তাহা (তর্কযুক্তিতেও) বুঝিতে বা অনুমান করিতে কিংবা সে বিষয়ে মাথা ঘামাইতেও চাই না।" ব্যস! এস্থলেই অধ্যাত্মবিজ্ঞানের শেষ!

দার্শনিক বিচার করিতে ইঁহারা বসিবেন, অথচ দার্শনিক সংজ্ঞাশব্দকে লৌকিক অর্থেই গ্রহণ করিবেন! ইহা কোন্ শ্রেণীর 'বিচার'? ইহাতে আর যাহা হউক প্রাচীন

অপেক্ষা, পাশব লালসার সমর্থ চিত্রকর অপেক্ষা কিংবা মনুষ্যের জন্তুধর্ম্মী তনুরুচি এবং দেহবিলাসিতার প্রচারকারী সুনিপুণ ভাস্কর অপেক্ষাও আমাদের অধিকতর শ্রদ্ধাভাজন হইবেন, তাহা সৃষ্টির চরমগতি-সঙ্গত এবং সত্যসম্মত নহে কি? অন্যদিকে, উচ্চ আদর্শসেবার ক্ষেত্রেও, মনুষ্যের স্বধর্ম্মসিদ্ধ ওই সত্যস্বরূপকে যিনি মনুষ্যের ঘরোয়া, পরিচিত, সুবিদিত অথবা অভ্যস্তের সীমার উচ্চতর ক্ষেত্রে দর্শন এবং নিরূপণ-পূর্ব্বক মহনীয় ভাবুকতাবর্ণে সমঙ্কিত করিতে পারেন, মনুষ্যের হৃদয়কে শিল্পরসের পথে উচ্চতর গুহাক্ষেত্রে উন্নীত করিতে ও আত্মসংপ্রাপ্তিমার্গে উৎসাহিত করিতে পারেন, তিনি একদিকে যেমন উচ্চশ্রেণীর কবি ও কাব্যস্রষ্টা, তেমনি মনুষ্যত্বের পরম সত্যদ্রষ্টা। তিনি যুগপৎ কবি এবং ঋষি; তিনিই প্রকৃত Realist. সাহিত্যে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ শিল্প-কৃতিসমূহ জীবন এবং জগতের এই 'সচ্চিদানন্দ শিব'তত্ত্বের সঙ্গে জীবাত্মার পরম একতা সপ্রমাণ করিয়া, সমন্বয় এবং চরম সঙ্গতির সঙ্গীত রচনা করিয়াই মনুষ্যের অধ্যাত্মবন্ধু হইতেছে এবং তাহার ভাবরাজ্যের প্রীতিসিংহাসনাভিষিক্ত সম্রাট্‌পদবী লাভ করিতেছে।

•

ঋষির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাটুকুই বাড়িয়া যাইতেছে। বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, যাঁহারা স্মরণাতীতকালে, মানুষের তত্ত্ববুদ্ধির প্রাতঃকালে তাঁহাদের ঐ 'অপৌরুষেয় বিদ্যা'টুকু লাভ করিয়াছিলেন (অথবা নিজের বুদ্ধিকৌশলেই উহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন) তাঁহাদের সেই 'বুদ্ধি'র তীক্ষ্ণতা অথবা মনীষার বহর কি-পরিমাণ ছিল; যাহাতে একালের এক একটি জবরদস্ত বিশ্ববিদ্বান্ আমরা, দশবিশ বৎসর অনুশীলন করিয়াও, তাহার 'ওর' পাইতেছি না, নানাদিকে 'নাকানি চুবানি' খাইয়া হাফোষে পৈত্রিক প্রাণটুকুই যাইবার উপক্রম করিতেছে! প্রত্যহই ত মনে হয় যে "গতকল্য সম্যক্ বুঝিতে পারি নাই—আজই বুঝিতেছি!" এ যে অশেষের বিদ্যা এবং অশেষের পাঠ!

আমরা বিচারবিতর্কের কুক্কুটযুদ্ধে মত্ত আছি; আর অপরোক্ষবিজ্ঞানী ঋষি যেন অন্তরাল হইতে সাদর এবং সদয় হাস্যেই বলিতেছেন—"ওহে বাপু, অদ্বৈতবিজ্ঞান এত সুলভে মাথায় ধরিবেনা; Personal God লইয়াই চিরং সুখমাস্তাম্!"

এই সঙ্গীতের গতি—সঙ্গতির অতন্দ্রিত যতি!
আত্মবশে বিশ্বলোক চলিয়াছে সবে 'এক'পথি।
স্থষ্টি-স্থিতি-সংহারের ধাতা
বিশ্বের অন্তিম পরিত্রাতা।
স্থষ্টিগতি বিশ্বলোকে টানিতেছে চরম সঙ্গতে
সংচিৎ-আনন্দ লক্ষ্যে—চরমের আত্মপ্রাপ্তি পথে।
জগতে 'পথিক' যারা অগ্রগামী, রাখি তাল-যতি,
জীবন মথিয়া করে ভাব-পথে একেরি আরতি;
স্থষ্টিপথ উজলিয়া ধায়—
চলে, আর নিত্যানন্দে গায়!
সংযমের হাল ধরি বিশ্ব করি জড়তার হোম
স্থিররতি, আত্মগতি পশিতেছে চরমের ওঁ। (১)

---

(১) লেখকের 'সাগরমন্থন' কাব্যের অন্তিম শ্লোক।

সাহিত্যের সাধনা (১)

বস্তু সংক্ষেপ।

সাহিত্যরূপী অধ্যাত্মরাজ্যের প্রসার—উহাতে মানবাত্মার কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব অধিকার—উহাতে মানবাত্মার স্বাধীনতা ও স্বরাজ—ভাবুকতার পুণ্যফল—নরসমাজে সাহিত্যের মাহাত্ম্য—মনুষ্যত্ব এবং জাতীয় জীবন গঠনে সাহিত্যের মাহাত্ম্য—ইতিহাসে সাহিত্যকর্ম্মী জাতিসমূহ—কালস্রোতে, মনুষ্যের সর্ব্বনাশক্ষেত্রে সারস্বতগণের কার্য্যই যৎকিঞ্চিৎ রক্ষা পাইতেছে—সাহিত্য উন্নত মানসিকক্ষেত্রের পদার্থ হইলেও উহাতে উচ্চনীচ জাতিভেদ—সাহিত্যিক জীবনের প্রধান সমস্যা—অধ্যাত্ম কেন্দ্রের অভাব—অথচ সাহিত্যসেবী কখনও জড়বাদী হইতে পারেন না—সারস্বত জীবনে 'অধ্যাত্ম কেন্দ্র'—সাহিত্যে 'প্রতিভাতত্ত্ব'—উহার প্রধান গুণোপাদান সরলতা—প্রধান ক্রিয়াসাধন সরলতা—সরল দৃষ্টি এবং আনন্দ দৃষ্টি—ভারতীয় 'ধর্ম্ম' আদর্শের সহিত উহার সাধর্ম্ম্য এবং সামঞ্জস্য—সাহিত্যের "অমৃতস্য পুত্রাঃ"—'অমৃত' পন্থার আনুষ্ঠানিক—এই অনুষ্ঠান পথেই মৌলিকতা সিদ্ধি—সারস্বত ক্ষেত্রের যমনিয়মাদি—সাহিত্যে মনঃসংযমের দৃষ্টান্ত ফল—সারস্বত প্রতিভার স্বত্ব এবং দায়িত্ব—সাহিত্যে 'সৌন্দর্য্য'বাদিগণের সাধারণ ভ্রম—সাহিত্যক্ষেত্রে 'শীলভদ্র' এবং 'পূজারী'—সাহিত্য-সেবী কথার সাধক বলিয়া কথার দায়িত্বজ্ঞান অপরিহার্য্য—তাঁহার পক্ষে শব্দশক্তি জ্ঞান লাভ অপরিহার্য্য—আত্মানুগত্য এবং অকপট বাক্যভঙ্গী অপরিহার্য্য—তাঁহার শব্দপ্রেম-সাধনা—বঙ্গসাহিত্যে শব্দ এবং ক্রিয়া-সমস্যা—সাহিত্যে শব্দশক্তি সাধন সমস্যা—সাহিত্যে ভাব এবং বস্তুর আদর্শসমস্যা—প্রাচীন 'ক্লাসিক' বা 'সমুৎকর্ষ' আদর্শ—আধুনিক ইয়োরোপীয় সমাজ এবং সাহিত্যের আধুনিক আদর্শ—উহার বিশ্বব্যাপী প্রসার—বঙ্গসাহিত্যে উহার প্রাদুর্ভাব—সাহিত্যসেবীর একমাত্র অধ্যাত্ম কর্ত্তব্য স্ব-প্রবৃত্তির অনুসরণ—স্বকীয় সত্যরূপী ধর্ম্মকে বরণ—এবং উহার ফলাফলকেও 'অপরিহার্য্য' বলিয়া গ্রহণ—সাহিত্যে 'আত্মসত্য'বাদী এবং অকপট শিল্প

(১) এই অধ্যায়ের মূল অংশ ১৯১৭ সালে, ঢাকা নগরীতে, সর্ব্ববঙ্গ সাহিত্যসম্মিলনের একাদশ অধিবেশনের সাহিত্যশাখার সভাপতির অভিভাষণ স্বরূপে লেখক কর্ত্তৃক উপস্থাপিত হয়। উহাকে কোন কোন দিকে সংশোধিত এবং পরিবর্দ্ধিত আকারেই বর্ত্তমান গ্রন্থের ব্যক্তব্যভুক্ত করা হইয়াছে।

রচনার স্থান—আধুনিক সাহিত্যে পাঠকের নূতন দাবী; কবিজীবনের ছায়ায় কাব্যরস ভোগ—জীবনের জ্ঞান কর্ম্ম-কাণ্ড ও রসকাণ্ডের মধ্যে আন্তরিক সামঞ্জস্যসাধন ব্যতীত সাহিত্যে স্থায়ী মাহাত্ম্যপ্রাপ্তি অসম্ভব—মহৎ সাহিত্যের মূলে মহতী প্রবৃত্তি এবং মহত্তমা চরিত্রভিত্তি—কবির আত্মমূল্য এবং স্বধর্ম্মমূল্য সৃষ্টি—সাহিত্যসেবীর 'ঐক্যতান' সাধনা—বিশ্ব সাহিত্যের ঐক্যতানলয়ী সঙ্গীতপদ্মাসনে বিশ্বদেবতা!

১। সাহিত্যের অধ্যাত্ম রাজ্য ও উহার প্রসার।

কিছুকাল হইতে আমোদের দৃষ্টি সাহিত্যের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার ফলে আমরা যদি কোন মহার্ঘ জিনিষ লাভ করিয়া থাকি, উহা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমোদের সচেতন কর্ম্মপ্রবণতা এবং আস্বাদনের বৃদ্ধি। ইহার পশ্চাতে অবশ্য দেশের বর্ত্তমান সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার একটা প্রবল বিসংবাদ আছে। বর্ত্তমানে আমাদের জীবনের কর্ম্মভূমি নানাদিকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার দ্বারাই এত সীমাবদ্ধ যে, জগতের অপরাপর সভ্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত মনুষ্যের ন্যায় আমরা জীবনকে আত্মার স্বাভাবিক আবেগ অনুসরণ পূর্ব্বক উহার প্রকৃতিসিদ্ধ নিয়তির দিকে অবাধে চালাইতে পারিতেছি না। বিংশ শতাব্দীর মনুষ্যজীবনের ক্ষেত্রে আমরা নানাদিকে ক্ষুদ্র; আমরা কে কোন্ দিকে, কি পরিমাণে যোগ্য এবং কি হইতে পারিতাম, তদ্বিষয়ে পরীক্ষার অবসরও পাওয়া যায় নাই। তবে নিমেষের মধ্যেই দেশকাল সীমাবিলঙ্ঘী চিত্ত-বিহঙ্গীকে আমরা মানব-জন্ম স্বত্বেই ত লাভ করিয়াছি! উহা মনুষ্যমাত্রের দুর্লভ পিতৃধন এবং পিতৃকরুণার নিদর্শন; উহাকে পিঞ্জরবদ্ধ করিতে পারে এমন সাধ্য কাহারও নাই। বিশ্ব-প্রকৃতির কারাবদ্ধ মনুষ্য জড়তার উৎপীড়নে এবং বন্ধনবিঘ্নে উদ্বিগ্ন হইয়া নিজের অন্তঃপুরে একবার প্রবেশ করিলেই বুঝিতে পারে, সে কত বড়! সে ত দুর্ব্বল 'দরিদ্র' কাঙ্গাল নহে; সে যে আত্মার মাহাত্ম্যেই সম্পূর্ণ! সে যে অনন্তের আত্মজ পুত্র! মনুষ্য-মাত্রের সাধারণ অহমিকা এবং আত্মম্ভরিতার মধ্যেও এই মহাত্মতার লক্ষণই গুপ্ত রহিয়াছে।

ইহা প্রত্যেক মনুষ্যের আন্তর রাজ্যের কথা এবং এই অন্তরের রাজ্যই সাহিত্যের রাজ্য। বিশ্বজগৎ মনুষ্যের মনের ভিতর আসিয়া যেই ভাবরূপ ধারণ করে, সাহিত্য উহা লইয়াই ব্যাপৃত আছে। তাই সাহিত্যের ভূমিও মনুষ্যের ভাবনাশক্তি এবং চিত্ত-প্রসারের সহিত সমব্যাপী; তাই সাহিত্যও 'মানসোত্থ' এবং 'মনোময়' হইয়া, এবং মনুষ্যের অন্তরাত্মার সমানধর্ম্মে তেজস্বী হইয়াই দেশকালের সীমা-বন্ধন স্বীকার করিতে চাহে না। সুতরাং, সাহিত্য আধ্যাত্মিক সৃষ্টি; এবং আত্মবান্ জীবমাত্রেই এই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া স্বয়ং কর্ত্তা অথবা ভোক্তা হইবার অধিকার রাখে।

২। উহাতে মানবাত্মার কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্বা-ধিকার।

এই সাহিত্যের ক্ষেত্রে আসিয়াই মানুষ প্রকৃত প্রস্তাবে আপনার কর্ত্তৃত্বশক্তির বিষয়ে আত্মবোধ লাভ করে; আপনাকে একরূপ দ্রষ্টা এবং স্রষ্টা জানিয়া অন্তরঙ্গ ভাবে নিজকে পরমকর্ত্তার প্রেরিত এবং ছায়াবহ বলিয়াই অনুভব করে। এ'রাজ্যে আসিয়াই মনুষ্যের অন্তরাত্মা অনুভব করে—'আমিত যৎসামান্য নহি! এই সাহিত্যলোকে ঘটনা এবং অবস্থা যে আমার দাসী। আমার ইঙ্গিতেই যে জীবনের দুরধিগম্য রহস্যময়ী অদৃষ্টনিয়তি এ জগতে পরিচালিত হইতেছে! আমি যে এক নিমেষে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল তোলপাড় করিতে পারি! এ জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় আমারই করায়ত্ত! আমি যে কটাক্ষেই নব নব সংসার সৃষ্টিপূর্ব্বক উহার মধ্যে জীবনের নব নব অদৃষ্টতন্তু বয়ন করিতে পারি!' সাহিত্যের ভোক্তার সমক্ষেও দেশকালের সীমাবন্ধন সরিয়া যায়। ফিন্‌লণ্ডের কবি নবজীলণ্ডের পাঠকের জন্য আনন্দের ডালি সাজাইয়া আহ্বান করিতেছেন; কলম্বিয়ার মানুষ ওসাকার মনুষ্যহৃদয়ের স্পর্শ অনুভব করিয়া পুলকিত হইতেছে; একই 'মানব'হৃদয়ের স্বর্ণ-পাত্রে সদানন্দময় হৃদয়রস অকপট ভাবে বিতরণ করিয়া সাহিত্যের সদাব্রত বসিয়া গিয়াছে। আর আনন্দ! সাহিত্যরাজ্যে প্রবেশ

করিয়া দুঃখও ত আনন্দের রূপ ধারণ করে—আনন্দরূপং অমৃতং যদ্বিভাতি।

সাহিত্যের এই আত্মাধীন এবং জড়তার বাধাবিহীন লীলারাজ্যে প্রবেশ করিয়া মানবাত্মা "ব্রহ্মানন্দ সহোদর" রস-ভাবে রমিত হইতেছে।

৩। উহাতে মানবাত্মার স্বাধীনতা ও স্বরাজ।

এই স্বত্ব এবং কর্তৃত্ব আমাদের প্রত্যেকের ভোগায়তনের মধ্যেই পৈত্রিক ধনরূপে নিহিত আছে। সাহিত্যের মধ্যে মানুষ এই আত্মাধীনতা—এই স্বাধীনতা লাভ করে বলিয়াই সাহিত্য মানবাত্মার এত প্রিয়। মহাকাশবিহারী আত্মাপক্ষী দেশকালের কারাগৃহে, প্রকৃতির প্রপঞ্চপঞ্জরে বাঁধা পড়িয়াছে; একটুকু নড়িতে-চড়িতেই চারিদিক্ হইতে জড়তার রুক্ষকঠোর কারাপ্রাচীর তাহার গায়ে লাগিয়া জানাইয়া দিতেছে যে সে 'বদ্ধ'। সৃষ্টির অদৃষ্টনিয়তি প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার পদতলে কণ্টকবিদ্ধ করিয়া বলিয়া দিতেছে—আপনাকে উদ্গতি দান করিতে তাহার কিছুমাত্র সামর্থ্য নাই। অগ্রপশ্চাতে, ঊর্দ্ধে কিংবা অধো-দেশে দৃষ্টি পরিচালিত করিতে গিয়াই সে অন্ধকার দেখিতেছে। নিজের মহাজীবনের পূর্ব্বস্মৃতি, পূর্ব্বপরিচিত সুধাসমুদ্রের অতর্কিত সংস্কার তাহার প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিল। এমতাবস্থায় যাহা-কিছু যে-কোন-প্রকারে তাহার হৃদয়তটে অনন্তের, চূড়ান্তের, স্বাধীনতার বা নির্জ্জরতার বার্ত্তা আনিয়া দিতে পারে, যেই দীপ প্রায় নিবিয়া আসিয়াছে তাহাতে বিন্দুমাত্র তৈলসেক করিতে পারে, আভাসে অথবা ইঙ্গিতে যেরূপেই হোক তাহার আত্মগৃহের (বা পিতৃগৃহের) ম্রিয়মাণ স্মৃতিটুকু জাগাইয়া তুলিতে পারে মানুষের অন্তরাত্মা পরমানন্দে উহাকেই পরমপ্রাপ্তিরূপে বরণ করে। যে মরণমহাসিন্ধুর তরঙ্গতলে হাবুডুবু খাইয়াই মরিতেছে সে যে ভাসমান খড়কুটাটুকু পর্য্যন্ত পরমবন্ধু ভাবিয়া আঁকড়াইয়া ধরিবে, তাহা বিচিত্র কি? সংসারে মানবাত্মারও সেই দশা। এই কারণে, যাহাতে জড়তা অতিক্রম করিতে পারে অথবা ক্ষুদ্রতাকে ভুলাইতে পারে, যে-কোনরূপ কল্পনা, জল্পনা বা বিভাবনা, অথবা বৃহতের, মহতের, অর্হতের

যে-কোনরূপ প্রসঙ্গমাত্রই মানবাত্মার এত প্রিয় আহার। জড়তার বন্ধন হইতে, ক্ষণকালের জন্য হইলেও, মানুষের মনের মুক্তি-দাতা বলিয়াই সাহিত্য মানবাত্মার এত প্রিয়। অনাবিল ভাবে এবং স্বার্থ-জড়তার নিঃসম্পর্ক ভাবে এই 'স্বাধীনতা'র রসানুভূতি উদ্দীপ্ত করে বলিয়াই, সকল সাহিত্যের মধ্যে আবার নিরবচ্ছিন্ন কাল্পনিকতার সাহিত্যই মানুষের নিকটে এত মধুর। এ জন্যই কাল্পনিক (Imaginative) সাহিত্য-কর্ত্তা কবিগণ মানবসমাজে এত আদর এবং গৌরবের আসন লাভ করিয়া আসিতেছেন; মনুষ্যসমাজের অপর সমস্ত বিভাগের কৃতিগণ হইতেই সমধিক পূজ্যতর পদবী অধিকার পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া আছেন। উহা উচিত হইতেছে কিনা, তাহা এস্থলে বিচার্য্য নহে। কিন্তু উহা যে সত্য, সর্ব্বদেশের এবং সর্ব্বকালের মানবহৃদয় অনবচ্ছিন্ন ভাবে তাহারই সাক্ষ্য দান করিতেছে। সংসারের শক্তিবীর, ঐশ্বর্য্যবীর, দানবীর বা কর্ম্মবীরগণ অপেক্ষাও, আপাতদৃষ্টিতে একেবারে শূন্যগর্ভ বচনবাগীশগণেই যেন অধিক সম্মান আদায় করিতেছেন। কেবল তাহাই কি? পৃথিবীর মনুষ্যমহলা বাছাই করিয়া সাহিত্য যাঁহাদিগকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপন মহলে স্থান দেন, সর্ব্বধ্বংসী কালের প্রবাহে কেবল তাঁহাদের নামটাই যেন কোনমতে রক্ষা পায়। রামযুধিষ্ঠিরের ব্যাসবাল্মীকি মিলিয়াছিল, ওডিসিয়সের এবং হেক্‌টার অকিলিসের জন্য হোমার ছিল বলিয়াই (তাঁহাদের সমতুল্য হয়ত কোটি কোটি রাজামহারাজ কিংবা ধর্ম্মকর্ম্মবীর কালস্রোতে মুছিয়া গিয়াছে) কেবল তাঁহারাই ঐহিক অমরত্ব লাভ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। নিজের মহোদাত্ত বিক্রমকাহিনীকে রক্ষা ও অমরত্ব দান করিবার জন্য হোমার মিলিল না ভাবিয়া পৃথ্বীবিজয়ী আলেক্‌জাণ্ডরকেও একদিন মনোদুঃখে অশ্রুপাত করিতে হইয়াছে।

এই সাহিত্য অধ্যাত্মরাজ্য এবং উহা মানবাত্মার স্বরাজ। এ রাজ্যের কর্ত্তা এবং ভোক্তা উভয়েই অধ্যাত্মক্ষেত্রে স্থায়ী পুণ্যফল উপার্জ্জন করেন। বাণীপন্থীর স্বরূপ, তাঁহার জীবনের লক্ষ্য, উহার স্বত্ব এবং দায়িত্ব চিন্তা করাই বর্ত্তমানকালে এতদ্দেশীয় 'পূজারী'মাত্রের আসন্ন

এবং প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। চিন্তা করুন, আমরা অন্ত বঙ্গদেশের এক কোণে, এইস্থানে সাহিত্য-সেবায় দাঁড়াইয়া, পুণ্যক্ষেত্রেই উপার্জ্জনশীল হইয়া, বিশাল মনুষ্যজগতের নির্জ্জর অন্তরাত্মার লোকেই নিজের হৃদয়স্পন্দন সঞ্চারিত করিয়া দাঁড়াইয়াছি; এই ব্যাপার আমাদের প্রত্যেকের অধ্যাত্মলোকে অনপনের পুণ্যরেখা অঙ্কিত করিয়া যাইতেছে; অতীতযুগের শতসহস্র মহাপ্রাণ বাণীসেবকের উপার্জ্জনফলে আমরা অংশভাগী এবং ভোক্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছি। কোন সাহিত্যসেবী নিজকে স্বল্পপ্রাণ অথবা নগণ্য মনে করার কারণ নাই। ক্ষুদ্রতাজ্ঞান আমাদের আত্মার দান নহে; উহা জড়তার ধর্ম্ম এবং জড়তার কারাগর্ভ মধ্যেই এই আগন্তুক মর্ত্ত্যজীবনে আমাদের সঙ্গ লইয়াছে। সাহিত্যসেবীকে মনে রাখিতে হয়, তাঁহার সাহিত্যসেবা আত্মজীবনের পরমার্থসাধনা হইতে অভিন্ন; উহা তাঁহার চূড়ান্ত পুণ্যসাধনা এবং তপস্যার কার্য্য; ভাব মাত্রেই দেবতার ভোগ; অন্তরাত্মার ক্ষেত্রে ভাবের ঘরে যিনি যাহা করিবেন উহার কোন অংশেরই ধ্বংস নাই। সৃষ্টি-তন্ত্রে জড়তা মানবত্বের উদ্দেশে, এবং মানবত্ব পুনর্ব্বার এই ভাব-তত্ত্বজীবী অধ্যাত্মতা এবঞ্চ দেবত্বের লক্ষ্যেই পরিচালিত বলিয়া, আমাদের অন্তর্দেহে ভাবের যেই রেজেষ্টারী আছে, যেই গুপ্তচিত্রফলক আছে, উহাতে কোন ভাবই বাদ পড়ে না। সৃষ্টিতন্ত্রে ভাব অমর; ভাবনার মূর্ত্তি অন্তর্লোকের চিরস্থায়ী পদার্থ। যেমনই হোক, সাহিত্যসেবী মাত্রেই অন্তর্দৃষ্টি পরিচালিত করিয়া এই সত্য আশ্বাস লাভ করিতে পারেন যে, তিনি জীবনে জড়তান্ত্রিক হইতে উন্নততর অধ্যাত্মসোপানে দাঁড়াইয়াছেন। অজ্ঞাতনামা অথবা অকৃতী সেবক বলিয়া নিজকে অকিঞ্চন মনে করাও ঠিক নহে। ভাবের ঘরে এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে বেশীকম বা যৎকিঞ্চিৎ যিনি যাহাই করিবেন, এইটুকু নিশ্চিত জানিবেন যে জীবনের পুণ্যকর্ম্মের চরম হিসাবনিকাশের খাতায় উহা জমার ঘরেই দাঁড়াইয়া যাইবে; ক্ষতির অঙ্ক কোন মতেই বৃদ্ধি করিবে না।

৪। ভাবুকতার পুণ্যফল।

আমাদের এই সাহিত্যকে মনুষ্য তাহার স্থান বা কর্ম্মক্ষেত্রের সমস্ত ক্রিয়াচেষ্টার মধ্যেই অগ্রগণ্য পূজাপদবী ছাড়িয়া দিয়াছে।

৫। মানব সমাজে সাহিত্যের মাহাত্ম্য।

বর্ত্তমান কালের মনুষ্য-সমাজে সাহিত্যের মাহাত্ম্য আর প্রমাণ করিতে হয় না। শুনিতে পাওয়া যায়, মিলটনের প্যারাডাইস লষ্ট্ কাব্যের অধ্যয়ন শেষ করিয়া কোন প্রত্যক্ষবাদী নাকি ব্যঙ্গ্য ভরে প্রশ্ন করিয়াছিলেন "What does it prove?" মনুষ্যসমাজের স্বতঃসিদ্ধ সত্যানুভব এখন এরূপ প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা করে না। সাহিত্যের সাধকগণ জানেন, সাহিত্যকে সর্ব্ব উন্নতির নিদান জানিয়াই মানবজাতির হৃদয় চিরকাল অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছে। (১) কতকগুলি কথাই কি করিয়া এত বড় একটা পদবী লাভ করিতে পারে, সাধারণের দৃষ্টিবিভ্রম জন্মাইবার পক্ষে এস্থলেই হয়ত প্রধান হেতু। মুদ্রাযন্ত্র, রেলোয়ে, টেলিগ্রাফ বা বারুদ-ডিনেমাইটের দৃষ্টবিক্রম সম্বন্ধে সাহিত্য কোন প্রচণ্ডপরাক্রম প্রত্যক্ষপ্রমাণ, উপস্থিত করিতে পারে না। কিন্তু, চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে, মনুষ্যত্বের প্রধান গুণোপাদান গুলিই মানুষ সাহিত্য হইতে

(১) ইংরেজ বালকের পক্ষে কোন্ শিক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন উহার অনুসন্ধানকল্পে ইংলণ্ডের Board of Education একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। উক্ত কমিটির রিপোর্ট—The Teaching of English in England (London, H.M. Stationer's office) নামে প্রকাশিত হইয়াছে। Sir Henry Newbolt, Mr. John Baile ও Sir Arthur quiller Couch কমিটির সদস্য ছিলেন। কমিটির শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা নহে, কিন্তু সাহিত্যশিক্ষাই বালকের হৃদয়, মন ও চরিত্রের গঠনে উপযোগী—"We make no comparison, we state what appears to us to be an incontrovertible primary fact, that for English children, no form of knowledge can take precedence of the English Language and Literature and that the two are so intrinsically connected as to form the basis for a National Education." সকল দেশের বালকের পক্ষেই মাতৃভাষা ও সাহিত্যশিক্ষাই তাহার হৃদয়মন চরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশের প্রধান ভিত্তিভূমিরূপেই নির্দ্দেশ করিতে পারি।

শিক্ষাপথে পাইতেছে। মনুষ্যচিত্তের জ্ঞান-ভাব-ইচ্ছার অন্তর্ভুক্ত সকল বিভাগের সকল শস্য বাণীচরণাশ্রিত ভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত হইলেই তবে প্রকৃত 'উপার্জ্জন' বলিয়া গণ্য হইতে পারে; সরস্বতীর গোলাজাত করিতে না পারিলে মানুষের কোন জ্ঞানই প্রকৃত প্রাপ্তিরূপে, বর্ত্তমান-ভবিষ্যতের পুত্রপৌত্রাদি-ক্রমে ভোগদখল-ক্ষম সম্পত্তিরূপে গণনার যোগ্য হয় না। পুনশ্চ, ওই উপার্জ্জনকে সাহিত্যের ভাব-রসে রসাল এবং হৃদয়গ্রাহী করিয়া উপস্থিত করিতে পারিলেই উহা মনুষ্যের অন্তরাত্মার উপাদেয় ভোজ্য হইয়া তাহার চরিত্রের একাংশ হইতে, এবং জীবনক্ষেত্রে তাহার সারাংশ বৃদ্ধি করিতে পারে। রসের পথে প্রাপ্তিই স্থির প্রাপ্তি। সাহিত্য এইরূপে রসের পথেই মনুষ্যের জ্ঞানকর্ম্মকে "হৃদ্য, মেধ্য এবং বৃষ্য" করিয়া, মনুষ্যজীবনের নিত্য নূতন রসায়ন করিয়া, মনুষ্যের গতি এবং স্থিতির মধ্যে, being এবং becomingএর মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটনা করিতেছে। সাহিত্যের কবিরাজগণ অকারণে জগতের অর্ঘ্যলাভ করিতেছেন না।

আবার, সাহিত্য জাতিগঠনের এবং জাতীয় জীবনেরও প্রধান অবলম্বন; জাতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা, রক্ষণ, ধারণ, এবং পরিপোষণের মূল শক্তি সাহিত্যের হস্তেই আছে। উহার হেতু খুঁজিতে হইলেও আমাদিগকে মনুষ্যের প্রধান মাহাত্ম্যটী, সৃষ্টিতন্ত্রে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতার মূল কারণটীর দিকেই দৃষ্টিপাত করিতে হয়।

৬। মনুষ্যত্ব এবং জাতীয়-জীবনের ক্ষেত্রে সাহিত্যের মাহাত্ম্য।

সৃষ্টিতন্ত্রে মানব-মাহাত্ম্যের প্রধান কারণ তাহার বাক্‌শক্তির মধ্যেই আছে। মানুষ বাগ্দেবীর অমৃতপ্রসাদ লাভ করিয়াছে; সৃষ্টিমধ্যে বাণীর বরপুত্র হইয়া বেদের জন্মদান পূর্ব্বক উহাকে রক্ষা করিতে এবং পুত্রপৌত্রাদিক্রমে অর্জ্জন-বর্দ্ধনে ওই প্রসাদ ভোগ করিতে পারিতেছে। বেদ বলিতে, শ্রুতি বলিতে মনুষ্যের প্রাচীন বাঙ্ময়ভাণ্ডার, মনুষ্যকর্ত্তৃক লিপি আবিষ্কারের পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানভাণ্ডারকেই বুঝিব। 'বাঙ্ময়' বলিতেও প্রাচীনকালে ব্যাপক অর্থে সাহিত্যই বুঝাইত। সরস্বতী এই বেদ-মাতা। সুতরাং

সমগ্র জীবজগতে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্বের মূলেই রহিয়াছেন বেদ-জননী সরস্বতী। অপর জীবজন্তুগণ সারস্বতী কৃপা লাভ করে নাই বলিয়া, পূর্ব্বপুরুষীয় কিংবা স্বোপার্জ্জিত বেদবিত্তের গ্রহণ রক্ষণ পরিপোষণ কিংবা উহার পরিবেষণ করিতে পারিতেছে না বলিয়াই মনুষ্য আজ জীবজগতের সম্রাট্। এই হেতুবাদ অনুসরণ করিয়া আসিলেই দেখিব যে, একের উপর অপর ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বও বেদাধিকারের শক্তিতারতম্যের মধ্যেই যেমন নিহিত আছে, তেমনি জাতিতে জাতিতে শক্তির তারতম্যও—এক জাতির উপরে অপর জাতির শ্রেষ্ঠতার কারণটিও—সারস্বত শক্তির পার্থক্যের উপরেই প্রাধ্যান্যতঃ নির্ভর করিতেছে। নরসমাজে 'সমুন্নত জাতি' বলিতে, একরূপ সাক্ষাৎভাবে, সমুন্নত সাহিত্যকর্ম্মী এবং সাহিত্যসেবী জাতিই বুঝাইতেছে।

সুতরাং সাহিত্যসেবককে মনে রাখিতে হইবে, তিনি নিজের পরমার্থের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সমাজের এবং সমগ্র নরজাতির চরমার্থের সাধক। তাঁহার একটিমাত্র কথাই অবলম্বদণ্ডে পরিণত হইয়া সমগ্র সমাজের স্থিতিগতির কেন্দ্র বিচলিত করিতে পারে; সমগ্র জাতির পুণ্য-পাপের মুখ্য কারণ হইতে পারে। ইয়োরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্র-নৈতিক ভাবদার্শনিকগণের 'সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতা' রূপ তিনটি কথাই মহাশক্তির ত্রিশূল হইয়া নরসমাজের প্রাচীন আদর্শপ্রতিমা ধ্বংস করিয়াছে; সমস্ত ইয়োরোপে নানাদিকে অভিনব জীবনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের প্রচলন-পূর্ব্বক 'নব্য ইয়োরোপে'র জন্মদান করিয়া উহাকে পৃথিবীজয়ে উৎসাহিত করিয়াছে। পৌরাণিক ঋষিকবিগণের "অবতার" এবং "জন্মান্তর" এবং 'জাতি' রূপ তিনটি কথাই পশ্চাতে বিপুল পরিচালিত সারস্বত শক্তির অনুবল সংগ্রহ-পূর্ব্বক ভারতবর্ষকে পৃথিবীর যাবতীয় নরসঙ্ঘ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া উহার তিনকালের অদৃষ্টকে শাসন করিতেছে। এরূপে খ্রীষ্টধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, মহম্মদী বা মুশাহী ধর্ম্ম প্রভৃতি একদিকে এক একটি 'কথা' মাত্র; অন্য দিকে মনুষ্য-অদৃষ্টের প্রবলপরিচালনী সারস্বত

শক্তির সূচীমুখ ব্যতীত অপর কিছু কি? সারস্বত মহাশক্তি এই পথে সূচীমুখে প্রবেশপূর্ব্বক এক একটা বৃহৎ সমাজ ও জাতির হৃদয়জীবন এবং ইহপরকালের অদৃষ্টকে আপন উদ্দেশ্যবশে পরিপাক করিয়াই, পরিশেষে 'ফাল' মুখে বাহির হইতেছেন! খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, মহম্মদ প্রভৃতিও সবিশেষ বাণীসাধক। সারস্বত পথেই প্রবল উদ্দেশ্য ও আদর্শ সাধনার শক্তিরথ পরিচালিত করিতে পারিয়াই তাঁহারা মানবজগতে মহাশক্তি রূপে দিগ্বিজয়ী হইয়া কোটি কোটি মনুষ্যকে স্বকীয় আদর্শরসে রসিত এবং বর্ণিত করিতে পারিতেছেন।

৭। ইতিহাসে সাহিত্য-কর্ম্মী জাতিসমূহ।

মিশর, অস্থুরিয়া, বাবিলন ও কার্থেজ এবং মধ্য এশিয়ার ঐশ্বর্য্যশালী ও প্রবল জড়তাপরাক্রমী জাতিগুলি কালস্রোতে ধ্বংস হইতে গিয়া, ইতিহাসের এবং পৃথিবীর বক্ষঃ হইতে একরূপ নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গেল কেন? উহারা সাহিত্যকর্ম্মী এবং সাহিত্যসেবী জাতি ছিল না বলিয়া। অন্যদিকে, প্রাচীন ভারত, চীন এবং গ্রীস-রোম সারস্বতী কৃপার অমৃতটুকুর গতিকেই অতীতের উন্নতসমুজ্জ্বল আলোকস্তম্ভরূপে কালসমুদ্রের সকল যাত্রিকের নয়নানন্দ হইয়া রহিয়াছে!

৮। কালস্রোতের সর্ব্বনাশ ক্ষেত্রে বাণীপন্থিগণ।

বাণীসাধকগণেই মনুষ্যকে কালগ্রাসের সর্ব্বনাশ হইতে যৎকিঞ্চিৎ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। অতএব নিজকে 'কেবল কথার বেপারী' বলিয়া জীবনে সমাজে বা জগৎতন্ত্রে কোনরূপে অকর্ম্মা বা অপরের তুলনায় হীনকর্ম্মা বলিয়া কোনপ্রকার লাঘববুদ্ধি সাহিত্যসেবীকে যেন কদাচিৎ ভ্রমেও স্পর্শ না করে। আমি জীবনের অধ্যাত্মপথে কিংবা বিশ্বসেবায় কোন ব্যবসায়ী হইতে কোন অংশেই লঘু নহি—আত্মমাহাত্ম্য-বুদ্ধির এইরূপ স্থিরসমুন্নত প্রতীরে দাঁড়াইয়াই তাঁহাকে প্রতিনিয়ত সুরনদী সরস্বতীর অপূর্ব্ব-অধিকৃত অমের অতলে জাল ফেলিতে হইবে; মনুষ্যহৃদয়ের অগম্য গুহায় রূপপিপাসায় বিগাহী হইতে হইবে; অজ্ঞাততত্ত্বের মহাকাশ-বক্ষে অজানিত সুধা-পিপাসায় পক্ষী হইয়া

উঠিতে হইবে। সকলেই সুধালাভ করেন বলিয়া এমন মিথ্যা আশ্বাস দিতে পারিব না। তবে, অন্ততঃ সমুন্নত মনোজীবনে এবং মননক্ষেত্রেই ক্রিয়াম্বিত থাকিবেন বলিয়া, সকল দেশের জীবনযাত্রিগণের স্থিরসিদ্ধান্তিত চরম অধ্যাত্ম লক্ষ্য যাহা সেই লক্ষ্যের পথে অস্খলিত ভাবেই আগুয়ান থাকিবেন, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

তবে, তামসিকতা এবং জড়তাধর্ম্মের তুলনায় সাহিত্য উন্নততর সত্যের ক্ষেত্র হইলেও, উহার মধ্যেই আবার অনন্ত জাতিভেদ আছে।

৯। সাহিত্য উন্নত 'ক্ষেত্র' হইলেও উহাতে অনন্ত জাতিভেদ।

সাহিত্যিকগণের গুণকর্ম্মভেদে সাহিত্যক্ষেত্রে মুনিঋষি হইতে আরম্ভ করিয়া পাষণ্ড, গুণ্ডা এবং চণ্ডাল পর্য্যন্ত যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। এই ভেদ কোথাও প্রকৃতিগত কোথাও বা সংসর্গজাত। আমরা অদ্য সাহিত্যসেবীর এই জাতিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে দাঁড়াই নাই; নিরপেক্ষ দৃষ্টি এবং সূক্ষ্ম প্রত্যগনুভব অভ্যস্ত হইলে পাঠকমাত্রেই উহার দৃষ্টান্ত লাভে কুতূহল চরিতার্থ করিতে পারিবেন। আমরা বাণীপন্থীর প্রকৃত স্বরূপ কি, এবং কি ভাবে তাঁহার ব্রত-উদ্‌যাপন করিতে হয় উহা দর্শন করিয়াই চরিতার্থ হইতে চেষ্টা করিতেছি।

কেবল কৃতকার্য্যতার সুফল বা সফলতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াও চলিব না। কেননা, সাহিত্যে সফলতা কাহাকে বলা যাইতে পারে, উহা একটা অত্যন্ত বিবাদ-বিসংবাদের ক্ষেত্র।

১০। সাহিত্যিক জীবনের সমস্যা।

সফলতা সকলের ভাগ্যেও ঘটে না; বিশেষতঃ, সফলতা বলিতে সাধারণে যাহা বুঝে, অবস্থা-গতিকে তাহা নানা অবান্তর কারণে সাহিত্যিকের জীবনে বিলম্বিত অথবা একেবারে নিবারিত হইতেও পারে। আমরা বলিয়াছি, সাহিত্য-সেবা মাত্রেই ন্যূনাধিক তপস্যার কার্য্য বলিয়া সাহিত্যসাধনা অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে একেবারে বিফলে যায় না। কিন্তু, মানুষের পক্ষে ঐটুকুই যথেষ্ট বলিয়া যিনি সন্তোষ লাভ করিতে পারিবেন না, সাহিত্যিক জীবনে তাঁহার

যাতনার কারণ অনেক আছে। আমরা জানি, ভাবুকতার চাষ করিতে গেলে সংসারবুদ্ধি এবং বাণিজ্যবুদ্ধি শিথিল হইয়া যায়; উহার দরুন দুনিয়াদারীর ক্ষেত্রে ভাবুক ব্যক্তির কদাচিৎ হার বই জিৎ হয় না। সরস্বতীর সেবকগণ সংসারলক্ষ্মীর কৃপালাভে বঞ্চিত হ'ন, ইহা আবহমান কালের কিংবদন্তী এবং উহার পনের আনা সত্য। ভাবুকের প্রকৃতি এবং চালচরিত্র হইতেই এইরূপ নিয়তি অপরিহার্য্য হইয়া আছে। অতএব সংসারে 'হার' ত হইয়াই আছে, সে অবস্থায় সাহিত্যেও 'হার' হইয়—এবং ইহাও পোনের আনা লোকের পক্ষেই সত্য—সাহিত্যসেবীকে একেবারে 'ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট' হইতে হয়। জগতের অধিকাংশ সাহিত্যসেবকের জীবনে উহাই ঘটিয়া আসিতেছে এবং দেশবিদেশের সাহিত্য-ইতিহাসে ইহার শত শত দৃষ্টান্ত আছে। এমনও ঘটিয়াছে যে, অনেকে শত শত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং হয়ত সমসাময়িক 'করতালি'ও যথেষ্ট পাইয়াছেন, অথচ সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহাদের নামটি উল্লেখ করিবার জন্যও অবকাশ নাই। ইঁহাদের সকলেরই যে সারস্বতী নিষ্ঠা বা ঐকান্তিকতার অভাব ছিল, অথবা সকলেই যে কেবল দৃষ্টতঃ সরস্বতীর পদচ্ছায়ায় বসিয়া লক্ষ্মীর অনুগ্রহটাই উদ্দেশ্য করিয়াছিলেন সুতরাং উভয় কুলে নগণ্য হইয়াছেন, তাহাও নহে। অনেকে হয়ত সমুচিত শক্তি এবং প্রতিভার অভাবে, কেহ বা প্রতিভা সত্ত্বেও সমাজের ছন্দানুবর্ত্তনের বাধ্য হইয়া অথবা সাধারণের রুচিবিরোধের বশে 'আত্মহারা' হইয়া স্থায়ী সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। হাজার হাজার সাহিত্যসেবীর ভিতর হইতে, এক একটি শতাব্দীর মধ্যে কেবল যেই দুই-চারি জন মাত্র উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও এখন আবার বাছাই আরম্ভ হইয়াছে! কাব্য-সাহিত্যের বিষয়ে ত কথাই নাই, কেননা, কাব্যের ক্ষেত্রে "মন্দ নহে" বলিয়া এমন কোন আদর্শই নাই; কাব্যকে "ভাল" হইতে হইবে; নচেৎ উহা অকিঞ্চিৎকর, এমন কি, উল্লেখযোগ্য বলিয়াও বিবেচিত হয় না। সুতরাং কবিজীবনের

বিফলতা আরও দারুণ এবং ভয়াবহ। সমস্ত জীবন সাহিত্যসেবা করিয়াও, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একেবারে বিস্মৃতির অতলস্পর্শে তলাইয়া যাওয়া—ইহা সাহিত্যক্ষেত্রের নিত্যনৈমিত্তিক দুর্ঘটনা। যাঁহারা সাহিত্যিক নহেন, প্রকৃতপ্রস্তাবে সাহিত্যবণিক্—মাতৃসেবার অছিলা ধরিয়া কেবল বিমাতার উপাসক—সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহাদের অদৃষ্টের কথা ধরিতেছি না; তাঁহারাও হয়ত অধিক আশা রাখেন না। কিন্তু যাঁহারা খাঁটি সাহিত্যসেবী, অন্তরের অহেতুকী প্রেরণার বশেই সরল প্রাণ-মনে সরস্বতীর পূজারী, কোন সাধ্যাতীত বিপাকে তাঁহাদের মধ্য হইতেই অসংখ্য ব্যক্তির সাধনা সাহিত্যসংসারে প্রত্যক্ষতঃ যেন ব্যর্থই হইয়া যায়; মন্দিরপ্রাঙ্গণে অনেকের ডাক পড়িলেও, দুই একজন মাত্র অভ্যন্তরে প্রবেশের সৌভাগ্য লাভ করিয়া পূজার অধিকারী হইতে পারেন। তবু ত বাণীমন্দির-যাত্রীর বিরাম নাই! অনির্ব্বাণ আন্তরিক কাকুতির বাধ্য হইয়া, 'আমারই আহ্বান পড়িয়াছে' এইরূপ জ্বলন্ত বিশ্বাসে সাংসারিক দুঃখদৈন্যবাধাবিপত্তিকে তুচ্ছ করিয়া, অগ্নিশিখাপ্রেমিক পতঙ্গের মতই শত শত সাহিত্যিক বাণীচরণের উদ্দেশে আত্মবিসর্জ্জন করিতেছেন! এই দুর্ঘটনা, মানুষের শক্তির এই দুর্ব্যয় কোন মতে সাহিত্যক্ষেত্রে পরিহার করা চলে না। পূর্ব্ব হইতে তাঁহাদিগকে কোনরূপ পরামর্শ দিয়া নিবৃত্ত করা কাহারও সাধ্য নহে; তাঁহাদের নিজের পক্ষেও আপনার ক্ষমতাবোধ সাধ্যায়ত্ত নহে—কেননা শক্তির পরিচালনা ও পরীক্ষার পূর্ব্বে স্বয়ং অধিকারী কিনা অনেকেই বুঝিতে পারে না। অনেকেই প্রাণের টানে অপরিহার্য্য বলিয়াই সাহিত্যসেবক। সংসারের লোক ইহাদিগকে প্রায়ই বাতুল, গোঁয়ার, বেকুব বলিয়া কটাক্ষ করিতে ছাড়ে না; তবে সফল হইতে দেখিলে, বাহবা দিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। সুতরাং মানবজাতির মধ্যে এই একটা দল—যাহারা নিরাশ্রয় অথচ অনম্যমেরুদণ্ডী জীব, অকিঞ্চন অথচ অপরূপ গোঁয়ার্ত্তমীর বশে আপনাদের মেজাজী ভাবেই খুসী; দুনিয়াদারীর ক্ষেত্রে নানাদিকে বিকল অথচ মনানন্দে বিভোর। সংসার তাহাদের এই

আনন্দ কখনও সম্পূর্ণ কাড়িয়া লইতে পারিল না। ইহাদের অভ্যন্তরে ইতর স্বার্থসংস্রবের বহির্ভূত একটা অসাধারণ পদার্থ যে আছে, তাহা সকলেই সন্দেহ করেন। এই সমস্ত গৌরাব-গোবিন্দ এবং বাক্যবাগীশকে সংসার কখনও পথে আনিয়া নিয়মশৃঙ্খলায় আবদ্ধ করিতে পারিল না। কবি, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, উপন্যাসলেখক, সন্দর্ভকার—যাহাদের মধ্যে প্রতিভার আগুন কিঞ্চিৎমাত্রও আছে তাহাদের সকলেই—ন্যূনাধিক একশ্রেণীর জীব। ইহাদের নিকট সোণামোহর অপেক্ষা কথাই বরং অধিক মূল্যবান্। ইহাদিগকে যদি পসন্দ করিতে দেওয়া হয় "ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের মহামান্য সম্রাট্ হই'তে চাও, না দীনদরিদ্র ও অবমানিত শেকস্‌পীয়র হইতে চাও"—ইহারা প্রাণমনে শেকস্‌পীয়র হইতেই ঝুঁকিবে। এস্থলেই উহাদের সনাক্ত করার পক্ষে প্রধান পরিচিহ্ন। "আমি প্রকৃত সারস্বত কিনা" তাহার আত্মগত নির্দ্ধারণ এবং আত্ম-বিচারের পক্ষেও উহাই মাপকাঠি।

সংসারে এই একটা দল আছেন যাঁহারা অপর সমস্তের কথাই ভাবেন, মানবজাতির জীবন-গঠনে এবং তাহার ভাগ্য-পরিচালনেও সাহায্য করেন, কেবল নিজের জীবনের সাংসারিক যোগ্যতা ও সচ্ছলতার কথাটাই অনেক সময় চিন্তা করেন না। নিজের জীবন-পরিচালনে

১০। অধ্যাত্মকেন্দ্রের অভাব।

তাঁহাদের কোন সচেতন উদ্দেশ্যপদ্ধতি কিংবা শাস্ত্র নাই, তাঁহারা 'স্বভাবে'র দ্বারাই পরিচালিত। তাঁহাদের জীবনযাপনের পদ্ধতি ও জীবনের সাধনলক্ষ্যই যখন হইতেছে 'স্বাতন্ত্র্য', তখন এক মাত্র আত্ম-প্রত্যয়ের দিক্ হইতে ব্যতীত তাঁহাদের সমক্ষে কোন নিয়মশৃঙ্খলার কথাই ত বল দেখাইতে পারে না! সুতরাং সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে, এবং স্থূলভাবে বলিতে গেলে, ইঁহাদের কোন 'ধর্ম্ম' নাই—ধর্ম্ম বলিতে প্রচলিত রকমের নিয়মমার্গী এবং সাম্প্রদায়িক আদর্শের কোন 'ধর্ম্ম' নাই। যাহাতে দলভুক্ত হইয়া এবং একটা সাধারণ মতবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া জাগ্রদ্ভাবে, ঐহিক বা পারলৌকিক মঙ্গল উদ্দেশ্যে উপাসনা কিংবা

জীবনপরিচালনা করিতে হয়, ইঁহারা তেমন কোন আদর্শের বশীভূত নহেন। অনেকেই জন্মানুবন্ধে এবং গতানুগতিকভাবে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান বা বৌদ্ধ। ইহার দরুণ কেহ কেহ যে একটা অভাব বোধ করেন না, এমন কথা বলিব না। কিন্তু হাজার বৎসরের জীর্ণপুরাতন সামাজিক অবস্থার কুক্ষিজাত আদর্শ ও মতবাদের সঙ্গে অনেকেই নিজের আন্তর তত্ত্বের সামঞ্জস্য করিতে পারেন না; এই কারণে আধুনিক কালে, সকল দেশের বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিগণের মধ্যে আপন জন্মধর্ম্মের প্রচলিত আদর্শ ন্যূনাধিক বিপ্রতিষ্ঠ হইতেছে। যা'হোক, এক্ষেত্রেই যে সাহিত্যিক এবং শিল্পীর জীবনে প্রধান সমস্যা এবং সঙ্কটের স্থল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। জীবনের সকল জ্ঞানভাবক্রিয়ার গৌণ বা মুখ্য লক্ষ্য স্বরূপে জীবনমধ্যস্থ অথবা জীবনাতীত কোন কেন্দ্রবিন্দুর দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ করিতে না পারিলে, সংসারের সকল কর্ম্মে সকল সুখদুঃখে, সকল অবস্থায় ঐ কেন্দ্রবিন্দুর অভিমুখেই চলিতেছি এইরূপ জ্ঞানে সচেতন থাকিতে না পারিলে, জীবনে মনুষ্যের প্রধান বল এবং অবলম্বনটুকুই থাকে না; দুনিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে নিরস্ত্র, নির্লক্ষ্য, নিরালম্ব এবং হতমান সাহিত্যসেবীর পক্ষে ত কথাই নাই।

১১। অথচ সাহিত্যসেবী কখনও জড়বাদী হইতে পারে না।

অথচ সাহিত্যসেবী ত কদাপি প্রকৃত প্রস্তাবে জড়বাদী হইতে পারেন না! তিনি ভাবজগতের অধিবাসী। বিশ্বজগতের এই ভূতগ্রাম কোন ভূতভাবনের ভাব হইতে সৃষ্ট; ভাবই জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান্ পদার্থ; তিনি স্বয়ং বিশ্বভাবুকের অংশ এবং তাঁহার দয়ানিযুক্ত হইয়া অথবা নিজের অন্তঃকরণতত্ত্বে 'কাহারও' দ্বারা প্রেষিত এবং 'প্রেরিত' হইয়াই সংসারের ভাবনাকেন্দ্রে নিজের শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন। তাঁহার 'প্রয়োগ' যথাযথ না হইয়া বিফল হইতে পারে, কিন্তু ভাবই যে জগতের উপাদান ও জগৎপরিচালনার প্রধান শক্তি এবং সংসারের Fulcrum ও পরিচালন-কেন্দ্র, এই বিশ্বাস প্রত্যেক ভাবুক বা কবির মগ্নচৈতন্য মধ্যে সুপ্ত আছে, এই বিশ্বাস না থাকিলে তিনি

প্রকৃত সাহিত্যসেবী নহেন। স্বয়ং প্রকৃত প্রস্তাবে ভাবজীবী, ব্যবহারে অধ্যাত্মবাদী এবং অধ্যাত্মক্ষেত্রে ক্রিয়ান্বিত হইয়াও এবং এইরূপে শ্রেষ্ঠ-শ্রেণীর মনস্বী ও মননজীবী মনুসন্তান হইয়াও, আত্মধর্ম্মের প্রধান স্বত্ব এবং স্বত্বতার সুফল হইতে কোন বাণীপন্থী কেন বঞ্চিত হন? তাঁহার বাণীসেবা এবং ভাবজীবন এই দুনিয়ার হিসাবে নিষ্ফল হয় হউক, কি করিয়া উহা হইতে পরিপূর্ণ অধ্যাত্ম ফল চয়ন করা যায়? কি করিয়া সমস্ত সাহিত্যকার্য্য এবং সাহিত্যসাধনাকে অধ্যাত্মলোকের কেন্দ্রানুযায়ী এবং ফলভাগী করিয়া পরিচালিত করা যায়? সমস্ত ভাবক্রিয়া এবং শক্তির প্রবাহধারা কি করিয়া জীবনাতীত চরমবিন্দুর অভিমুখী এবং শাশ্বতফলপ্রসূ করা যায়? এই প্রশ্নের কার্য্যকরী মীমাংসায় উপনীত না হইতে পারিলে এ'কালে অধিকাংশ সাহিত্যসেবীর জীবন কদাপি নিদারুণ নিরাশ্বাস এবং চরমের দেউলিয়া দশা হইতে রক্ষা পাইবে না।

১২। বাণীপন্থীর জীবনে অধ্যাত্মকেন্দ্র।

মনে রাখিবেন, আমরা কোনরূপ নীতিশাস্ত্র বা ধর্ম্ম-উপদেশের উপস্থাপন করিতেছি না। যাহা সাহিত্যিকজীবনের পক্ষে অপরিহার্য্য ইহা তাহারই নির্দ্দেশ। প্রকৃত সাহিত্যসেবী হইতে হইলে, অন্ততঃ পোনের আনা সাহিত্য-সেবীকে তাঁহাদের কর্ম্মজীবনের 'নির্ঘাত' নিষ্ফলতার আপশোষ এবং অবশ্যম্ভাবী দীর্ঘনিশ্বাস হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, এই অধ্যাত্মকেন্দ্র স্থির রাখা অপরিহার্য্য। আত্মবিকাশ এবং আত্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই কার্য্যতৎপর হইয়াছি, সাংসারিক ফলাফলের দ্বারা কিছুই আসে যায় না, এইরূপ অন্তর্বুদ্ধির ভিত্তিমূলে স্থির হইতে না পারিলে সাহিত্যিকের জীবন যেমন জগৎতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গত হইতে পারেনা, তেমনই হৃদয়ের সুখ-তৃপ্তি এবং আভ্যন্তরীণ পরিতুষ্টির বিষয়েও সফল হয়না। যিনি সাহিত্যক্ষেত্রে কোন উচ্চ আশা পোষণ করেন তাঁহাকে সাংসারিক স্বার্থ এবং টাকাকড়ির বিষয়ে যেমন নিস্পৃহ হওয়া চাই, তেমনি খ্যাতিপ্রতিপত্তির বিষয়েও নিরাশ হওয়া চাই।

অন্যথা তাঁহার পক্ষে চরমের দীর্ঘনিশ্বাস অনিবার্য্য ; তাঁহার জীবনও নিষ্কলঙ্ক হইয়া আত্মতন্ত্রের একটা স্বাধীন সাধনারূপে কখনও পরিণত হইতে পারিবে না। কদাচিৎ কোন কোন সাহিত্যিককে অসন্তুষ্টচিত্ত, মনুষ্যদ্বেষী, নিদারুণ অহঙ্কার বিষে জর্জ্জর এবং খলকর্ম্মা হইতেও দেখা যায় ; ইতর সাধারণের ন্যায় নানা চরিত্রকার্পণ্যও তাঁহাকে স্পর্শ করে। উহা কেবল সংসারের বিষস্পর্শের বিরুদ্ধে আপনার কৌলীন্যবুদ্ধি ও হৃদয়ে উচ্চ আদর্শের রক্ষা-কবচের অভাব হইতেই ঘটিয়া থাকে।

যিনি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, সাংসারিক স্বার্থ ও যশঃপ্রতিপত্তি বিষয়ে তিনি প্রোক্তরূপে নিস্পৃহ এবং যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট থাকিতে না জানিলে, তিনি যে সাহিত্যসেবা গ্রহণ করিয়া খুব সম্ভব 'ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট' হইবার পথেই চলিয়াছেন। সরস্বতী সাহিত্যের দেবতা, তিনি শুভ্রমূর্ত্তি এবং সাধক-হৃদয়ের শুভ্রশতদলবাসিনী। সরস্বতীর অধিষ্ঠান-কমলের এই অপস্পর্শা শুভ্রতার ধর্ম্ম প্রত্যেক বাণীসেবককেই আদৌ ধারণা করিতে হয়। হৃদয়ের কদর্য্যতা বা জড়-লিপ্সার বাতাসে সারস্বতী প্রতিভার প্রফুল্ল শুভ্রকমল শুখাইতে আরম্ভ করে ; দেবতার অধিষ্ঠানপদবী লাভ করার যোগ্যতা হারাইয়া ফেলে। সাহিত্যসেবীর জীবনের আবহাওয়া এবং অবস্থাগতিকে তাঁহার বিভুদত্ত সারস্বত শক্তি এবং প্রাতিভাদৃষ্টির হ্রাসবৃদ্ধি হয় ; সময় সময় প্রতিভার একেবারে বিলোপ ঘটে ; অনেককে জন্মলব্ধ শক্তি হইতে একেবারে বঞ্চিত হইয়া শুষ্ককাষ্ঠে পরিণত হইতেও দেখা যায়। এমনও দেখা যায় যে, কবি ভগবানের অমৃতপ্রসাদ লাভ করিয়াও স্বকীয় জীবনের পরিবেষ ধর্ম্মে এবং আপনার আন্তরিক হলাহলে উহাকে দিন দিন বিষাক্ত করিয়াই চলিয়াছেন ; তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ অগাধ অমৃতের উৎস একেবারে শুষ্ক হইতেও বিলম্ব নাই ; মুহূর্ত্তেই স্বর্গমর্ত্ত্যচরী এবং গহনবিগাহিনী কল্পনাদেবীর যেই করুণারস একদিন অযাচিত ধারা-প্রবাহে উৎসারিত হইয়া কবির হৃদয়মন এবং জীবনকে অপার্থিব মাহাত্ম্যে উদ্ভাসিত এবং ধন্য করিয়া বিশ্বের

জন্য উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে উছলিয়া পড়িত, এখন তিনি উহার সতৃষ্ণ অনুসাধক এবং কাঙ্গালী হইয়া কাঁদিতে থাকিলেও একটি কণাও মিলে না! কোন অজানিত কারণে, যেন জীবনদেবতার দুগ্রহ-দারুণ অভিশাপেই জীবনপরিব্যাপী পরমানন্দের উৎসমুখ রুদ্ধ হইয়া যায়। ইহা ভাবুকজীবনের প্রত্যক্ষীকৃত সত্য। জীবনবিধাতার অনুগ্রহ জন্মস্বত্বে লাভ করিয়াও, অনেকে যে যাবজ্জীবন উহাকে রক্ষা করিতে পারেন না, উহা কেবল অধ্যাত্মক্ষেত্রীয় অধঃপাত, হৃদয়-কমলের প্রসন্নতার ক্ষয় ও আলোকবিগ্রাহিণী দিব্যপ্রজ্ঞার হানি হইতেই ঘটিয়া থাকে। উহার তারতম্যে সাধকের পক্ষে সাহিত্যসিদ্ধির ফলেও তারতম্য ঘটে।

সাহিত্যসাধক হৃদয়কে নিয়ত অনাবিল এবং মননলোকে অনাকুল ও একনিষ্ঠ রাখিতে অতন্দ্রিত হইবেন। রসময়ের গুহাযাত্রীর জীবনে দিনেকের জন্যও নিশ্চিন্ত নিদ্রার অবসর নাই; দিবারাত্র তাঁহাকে জড়তাস্রোতের বিপরীত মুখে হাল ধরিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। তাঁহার পক্ষে অপর কোন ধর্ম্ম—কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নাই; তিনি বাণীপন্থী এবং সর্ব্বশুক্লা বাণীর প্রণবেশ্বরই তাঁহার হৃদয়েশ্বর। আত্ম-জীবনের জ্ঞানকাণ্ড এবং কর্ম্মকাণ্ড একতারায় সঙ্গৎ করিয়া, আত্মার রসতন্ময়তা, রসেরই ধ্যানধারণা ও তদর্থে 'বাগর্থের প্রতিপত্তি' সাধনকেই নিজের পরমার্থ জানিয়া তাঁহাকে সমস্তজীবন জাগ্রদ্ভাবে একাভিমুখে, বাণীহৃদয়স্থ রসস্বরূপের অভিমুখেই, চলিতে হইবে। সরস্বতীই তাঁহার ইষ্টদেবতা এবং গুরু; বাণীপাদাব্জ সাধনার পথেই তিনি ইহপরকালের মধুপুরে উপস্থিত হইবেন; সারস্বতীকৃপা এবং সারস্বত রসানন্দই তাহার ইহপরকালের ধর্ম্ম এবং কর্ম্মের লক্ষ্য; তাঁহার ভগবান্ বাণীপথে চরমের অমৃত ও শাশ্বত তত্ত্বরূপেই, তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইবেন। এরূপ জ্ঞান এবং কর্ম্মতন্ত্রই সাহিত্যিকের কর্ম্মজীবনকে অধ্যাত্ম ধর্ম্মগ্রহ করিতে এবং তাঁহার জীবনের সকল জ্ঞানভাবকর্ম্মকে পরমার্থে সুসঙ্গত করিতে পারে। আমাদের দেশে ধর্ম্মসাধকের যাহা মূল মন্ত্র, সাহিত্যসেবকের পক্ষেও তাহাই—"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি

তাদৃশী।" এই সূত্র মনুষ্যের সকল সাধনবিভাগেই খাটে। এইরূপে, জীবনে সাহিত্যসাধনাকে আত্মধর্ম্মসাধনার নামান্তর করিতে না পারিলে, জ্ঞান ও কর্ম্ম, আশা এবং অনুভব একাগ্র ও একার্থক না হইলে, সাধক এ'দিকে নির্ব্বিকল্প হইতে না পারিলে যেমন তাঁহার অধ্যাত্মশক্তির বিভ্রান্ত অপব্যয় নিবারণ করা যায় না, তেমন সাহিত্যে তাঁহার আত্ম-প্রাপ্তি বা সিদ্ধিলাভও অব্যাহত হয় না। যে সাধক ইহা মানিতে পারেন না বা বিশ্বাস করেন না তাঁহার পক্ষে সাহিত্যসেবক হইতে যাওয়া বিড়ম্বনা।

সাহিত্যে 'প্রতিভা' কি, তাহা সংজ্ঞাবদ্ধ করা কঠিন। অভিনব গুপ্তের গুরু ভট্ট লোল্যট নাকি একটা সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—"প্রজ্ঞা নব নবোন্মেষশালিনী প্রতিভেত্যুচ্যতে"। তবে, এই 'প্রতিভা' বলিতে যে অনির্ব্বচনীয় পদার্থের সঙ্কেত হয় তাহাকে 'বিভক্ত'ভাবে দর্শন করিতে গেলে বলা যায় যে, জীবের অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা বা জীবের জ্ঞাননেত্রের বিশদীভূত অথচ দূরদূরান্তগামী দৃষ্টিশক্তির সঙ্গে সঙ্গে, আপনাকে প্রসারিত করিবার জন্য প্রবল প্রাণানন্দ ও আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য বিভাবনা শক্তির অসাধারণ আবেগ এবং তীক্ষ্ণতায় অনির্ব্বচনীয় একটা সমষ্টির নামই 'প্রতিভা'। উহা আত্মার নির্ম্মল ভাবানন্দরঙ্গিণী ও প্রকাশানন্দময়ী একটা অখণ্ড শক্তি। মনুষ্যবিশেষে অকারণদৃষ্ট অপরূপ দীপনী, রসনী এবং প্রকাশনী শক্তির অপরিজ্ঞাত কারণটিকেই সাহিত্যদার্শনিক মোটামোটি 'প্রতিভা' সংজ্ঞা দিয়াছে। কি কারণে ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে এই অপরূপার সংঘটনা হয়, তাহার খোঁজ করিতে গিয়া মনুষ্যের দর্শনবিজ্ঞান হয়রান হইয়া গিয়াছে। তবে ইহা নিশ্চিত যে, আদিকাল হইতে মনুষ্যসমাজে এবং মনুষ্যের অদৃষ্টে এ যাবৎ যখন যেই উন্নতি বা পূর্ব্বাবস্থার ব্যতিক্রমমূলক যে কোন উদ্গতি, পরিবর্ত্তন বা বিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহার অধিকাংশ এই 'অপরূপা'কর্ত্তৃক আবিষ্ট জীবগণ হইতেই ঘটিয়াছে।

১৩। সাহিত্যে প্রতিভা-তত্ত্ব।

প্রতিভাবান্ ব্যক্তির অন্তঃকরণের বা প্রজ্ঞাচক্ষুর এই নির্ম্মলতাকেই, উহার বহিঃক্রিয়া বিবেচনায়, আমরা বাহিরের দিক্ হইতে বলি—সরলতা।

১৪। প্রতিভার প্রধান গুণোপাদান ও প্রধান ক্রিয়া সাধন "সরলতা"।

সাহিত্যের সাধক বা যে কোন বিভাগের প্রতিভাশালী শিল্পীর প্রধান গুণোপাদান যেমন সরলতা, তেমন তাঁহার প্রধান ক্রিয়া-সাধনটিও হইতেছে—সরলতা। সরলতাই সর্ব্বসংযোগের সাধনপথ।

কল্পনায়, বিচারণায়, আচারে, ব্যবহারে সৃষ্টি কিংবা দর্শনের কার্য্যে ঋজুতা, অকৈতব এবং অবৈক্লব্যই প্রতিভার প্রধান সাধন। যেমন সাহিত্যসেবকের, তেমন পাঠক বা সাহিত্যপ্রেমিকের পক্ষেও উহাই প্রধান সাধন। সকল দেশের সকল প্রতিভাশালী বাণীপন্থীর মধ্যে এই একটা বিশেষ গুণ লক্ষ্য করিবেন যে, তাঁহারা আর যাহাই হউন, তাঁহারা লৌকিক জীবনেও, সকল দোষে, গুণে, পুণ্যে এবঞ্চ পাপেও 'সরল'। তাঁহারা যেন সাহিত্যসেবার যোগ্যতা লাভ করিবার পূর্ব্বেই এ'গুণটি আয়ত্ত করিয়াছিলেন অথবা জন্মসূত্রেই উহাকে লাভ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ইহা নিশ্চিত জানিবেন যে, জীবনে সরলতার সাধনা ব্যতীত যেমন অন্তঃকরণতত্ত্ব নির্ম্মল হয় না, তেমন সারস্বত সাধনার ক্ষেত্র এবং সরস্বতীর পাদপীঠটুকুও সুপরিষ্কৃত হয় না। নিরেট দুনিয়াদার এবং কুটীল হৃদয়ের জন্য সাহিত্য কোনরূপ 'ক্ষেত্র' নহে—উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতালের অসামঞ্জস্য আছে।

সুতরাং অন্তরে ও বাহিরে এই 'সরলতা'র উপরেই সাহিত্যসাধককে সর্ব্বপ্রথম 'অধিকারী' হইয়া দাঁড়াইতে হয়। উহার পরেই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কথা—জগতের সম্বন্ধে, পদার্থমাত্রের সম্পর্কে

১৫। সাহিত্যে সরল দৃষ্টি ও আনন্দ দৃষ্টি।

আনন্দদৃষ্টি এবং সহানুভূতির আনন্দযোগ! হৃদয়কে আনন্দধর্ম্মী এবং জীবনকে আনন্দকর্ম্মী করিতে না পারিলে এই আনন্দযোগ সিদ্ধি হয় না। উহা ব্যতীত দর্শনে কিংবা সৃজনে, গ্রহণে কিংবা প্রকাশে কোনদিকে প্রাণে উৎসাহ কিংবা উল্লাসও জন্মে না; বিশ্বজগৎ কেবল বিশুষ্ক জ্ঞানকর্ম্মভাবের বিরস

প্রবাহগতি বলিয়াই প্রতীত হইতে থাকে। দুনিয়ার সাড়ে পোনের আনা লোক আপনাদের জীবন এবং জগৎসংসারকে এ'ভাবেই অনুভব করিয়া যাইতেছে। এস্থলেই প্রতিভাতত্ত্বে ঈশ্বরানুগ্রহের লক্ষণ। অ'রসিক' ব্যক্তিকে উহার যাত্রাপথ কথার দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে পারি না। কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে, সর্ব্বাদৌ মনঃপ্রাণের আর্জ্জব বা 'সরলতা' সিদ্ধি করিতে না পারিলে, জীবনের অধিকাংশ সময় চিত্ত উন্নততর ক্ষেত্রে রতিশীল এবং আরতিশীল হইতে না পারিলে, ওই 'অনুগ্রহ'লাভ অসম্ভব। সুতরাং আমাদের সাধ্যের মধ্যে কেবল এই 'সরলতা'।

হৃদয় সরলতা সিদ্ধি করিতে পারিলে, উহা ক্রমে সজ্জিত বীণাতারের মতই ভাবের স্পর্শানুভবে অথবা বহির্জগতের সংশ্রবেই স্পন্দিত এবং ঝঙ্কারিত হইতে থাকে; বিশ্বের সমস্ত পদার্থকে রসের দৃষ্টিতে গ্রহণ করিয়া আনন্দস্বরূপের মূর্ত্ত বিগ্রহরূপে উপভোগ করে। কবি বা সাহিত্যসেবকের হৃদয় উহা হইতেই আপাতদৃষ্টিতে, নিরেট জড়বস্তু এবং বিজ্ঞানদর্শনের তত্ত্বগুলি পর্য্যন্ত প্রাণের আনন্দপুরীতে গ্রহণপূর্ব্বক বাক্যার্থের রসময় বিগ্রহে অবতারিত করিতে সমর্থ হয়; উহা হইতেই শিল্পরচনার মধ্যে আন্তরিকতা এবং অধ্যাত্মশক্তি অনুস্যুত হইতে পারে। মনুষ্যের জীবনমধ্যে এই সরলতা নিজেই আত্মপুরস্কার বহন করে। উহাতে অন্তর-বাহির মধুময় করিয়া, হ্লাদিনী বৃত্তিকে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বিষয়গামী করিয়া, চিত্তকে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর তত্ত্বগামী করিয়া পরিশেষে কবির অন্তরাত্মাকে অনন্তের সংস্পর্শে সমাহিত করে। উহা স্বয়ং একটা পুণ্য আচারে পরিণত হইয়া ভাব-সাধকের সমস্ত জীবনে এমন কি তাঁহার দেহদর্পণেও অলৌকিক ছটা বিস্তার করে; তাঁহার দৃষ্টির সমস্ত বক্রতা দূর করিয়া এবং সমক্ষ হইতে নিত্যবিলম্বিত অপবিদ্যার যবনিকা অপসারিত করিয়া উহার প্রত্যক্ষ-দর্শনের শক্তি বিকশিত করিতে পারে; তাঁহার হৃদয় বিশ্ব-তালে নাচিতে থাকে; পরমের 'বিশ্ববিকাশকারী' শাশ্বতসঙ্গীত যেন শ্রুতিগম্য হইয়া

জীবনে এবং প্রত্যক্ষ জগতেই অনন্তরসভাবময় এবং অনন্তচ্ছন্দোমুখর রাগিণীলয়ে বাজিতে থাকে! এরূপ সাধকই প্রকৃত কবিহৃদয় এবং কবিদৃষ্টির মালিক হইতে পারেন। এরূপেই সাহিত্যিকের বাণীসাধনা সহজস্রোতে পরমার্থ-সাধনায় পরিণতি লাভ করিয়া বিশ্বজীবনের সঙ্গে সমতা এবং আপন জীবনের চরম সার্থকতায় উপনীত হইতে পারে।

১৬। ভারতীয় 'ধর্ম্ম'-আদর্শের সহিত উহার সামঞ্জস্য।

চিত্তকে নির্ম্মল করিয়া আত্মাকে সমুন্নত ভাবযোগী এবং আনন্দযোগী করিতে পারিলে উহা কেন ধর্ম্মসাধনার নামান্তর হইবে, তাহা অন্ততঃ ভারতবর্ষে বিশদ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে না। আমাদের জাতিগত স্বানুভূতির সমক্ষে ধর্ম্মসাধনা নিদানতঃ কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সমুন্নতভাবের আন্তরিক সাধনা ব্যতীত আর কিছুই নহে— ঐরূপে বিশ্বজগতের চরমতাবুকের আত্মতালের সঙ্গে সঙ্গতি এবং সম্মিলন-সাধনা। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকার মনু 'ধর্ম্ম' বলিতে জড়তামুখী চিত্তবৃত্তির সংযমমূলক এবং মানবাত্মার স্বধর্ম্মাভিমুখী গতিসাধক কেবল দশসংখ্যক ভাবের সাধনাই প্রাধান্যতঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদের যোগশাস্ত্র উক্ত 'সংযম' পথে জীবের বহির্ম্মুখী চিত্তবৃত্তির নিরোধকেই দ্রষ্টা বা বিশ্বাত্মার সহিত 'যোগ' বলিয়া অভিন্নভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছে। মনুষ্যের অভ্যন্তরে যেই 'দ্রষ্টা' আছেন, তিনি বিশ্বদ্রষ্টার অংশভূত অথবা তাহা হইতে অভিন্ন বলিয়া ভারতের সকল আস্তিক্যবাদী দার্শনিক, তথা দেশদেশান্তরের সকল অধ্যাত্মসাধক, ফকির, যোগী, 'মিষ্টিক' বা পথিক মাত্রেই ত কোন না কোন প্রকারে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন! আপনার ভিতর দিয়া ব্যতীত 'সত্য'পদে দ্বিতীয় 'যাত্রা'পথ নাই। আদৌ 'এক'কে পাইয়া তাঁহার মধ্যেই 'সর্ব্ব'কে পাইতে হইবে—কেন না 'সর্ব্ব' একের মধ্যেই আছে; তদ্ভিন্ন 'সর্ব্ব'সাধনার পথে কদাপি যে একে উপনীত হওয়া যাইবেনা, জীব যে বিশ্বারণ্যে আত্মহারা হইয়া যাইবে, তাহাও সকল অধ্যাত্মপথিকের একান্ত সাক্ষ্যরূপেই নির্দ্দেশ করা যায়। জড়তায় অভিবর্দ্ধনপথে, উন্নত

এবং উন্নততর ভাবযোগসাধনপূর্ব্বক, ক্রমে জড়তা ও সংসারমুখী চিত্তবৃত্তির নিরোধ সমাধা করিতে পারিলেই যে দ্রষ্টা আপন স্বরূপে প্রয়াণ করিতে এবং বিশ্বের 'বিষম'প্রবাহের 'অদ্বয়' কারণতত্ত্বে স্থিতি লাভ করিতে পারেন, এই বিষয়ে—অশেষবিশেষ প্রণালীভেদের মধ্যেও—জগতের সকল. 'অধ্যাত্ম'পথিক বা 'মৌষ্টিক' একমত বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারি।

স্তরাং, যুক্তিবিচারের সাহায্যে বুঝিতে হইলে, এ'টুকুন বুঝিতে বিলম্ব হয়না যে সাহিত্যসেবী ভাবের সাধক বলিয়া স্বভাবেই নিরোধপথে এবং জড়তাসেবী হইতে ন্যূনাধিক উচ্চতর অধ্যাত্মলোকে যাতায়াত করিতে বাধ্য। চিত্তের প্রাথমিক নিরোধ বা উপস্থিত জড়তাতিশায়ী মনঃ'সংযম' এবং মনোজীবন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বলিয়াই তিনি 'সারস্বত'।

১৭। সারস্বতের 'যোগ' আদর্শ।

বলিতে হইবেনা যে, এই কারণে আমাদের যোগশাস্ত্র ঋষি বা যোগীর অবস্থাকে কবিত্বলাভের 'উত্তর' অবস্থা বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন। ভাবুক সাহিত্যিক, শিল্পী বা কবিমাত্রেই স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বানুরোধে জড়তা-অতিরেকী অধ্যাত্মপথে চলিতেছেন। তিনিও যে—হয়ত সম্পূর্ণ অজানিতে এবং অতর্কিতে—একজন গুহাপথিক, উন্নত ভাবুকতামাত্রেই যে একটা যোগের কার্য্য তাহা অন্তর্দৃষ্টিশালী সাহিত্যসেবকমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। অতএব, এইস্থানে দাঁড়াইয়া অঙ্গুলিনির্দ্দেশেই দেখাইতে পারি যে, সাহিত্যিক তাঁহার এই স্বতঃসিদ্ধ ভাবুকতা এবং ভাবানন্দের বীজকে উন্নততর মনন ও জীবনভূমিতে একাগ্রতায় প্রতিরোপিত করিতে পারিলেই, উহা পরিপূর্ণ অধ্যাত্মমহীরুহে পরিণত হইয়া সমুন্নত পরমার্থ-ফল প্রসব করিতে পারে।

ইহা বুঝিতে হয় যে প্রজ্ঞাদৃষ্টির সারল্যসাধনাই জীবের জীবনে জগতের 'ঋত'তন্ত্র ও ধর্ম্মস্বরূপতার প্রত্যগনুভব লইয়া আসে ও হৃদয়ে ঋতপ্রেম জাগাইয়া দেয়; অথবা ঐ দু'টি তাহার 'প্রজ্ঞা' উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে এবং সহচরভাবেই জাগরিত হয়। বুঝিতে

হয় যে, জীবের আনন্দমাত্রেই আত্মার ব্যাপ্তিশীল ও আত্মদানী পদার্থ; জগতে আনন্দের মূল রহিয়াছে প্রেমে বা আত্মদানে; সৌন্দর্য্যে প্রেম জাগায়; আবার প্রেমও প্রিয় বস্তুকে 'সুন্দর' করিয়া অনুভব করে, প্রেমকে এরূপে বুঝিতে পারিলে প্রেম, আনন্দ, রস ও সৌন্দর্য্যকে চরমে একাত্মক কথা ও একমর্ম্মী বস্তুরূপে বুঝিতে পারা যায়।

সাহিত্যের 'রস'বস্তুর প্রধান রহস্যও যে (বশিষ্ঠের কথায়) তুরীয় স্থানে, আত্মপ্রত্যক্ষ এই রসের প্রকটীভাব যে প্রেমে, এবং 'আদি রস' বলিতে যে জীবের প্রেমতত্ত্বকেই প্রাধান্যত বুঝায়, আবার, মনুষ্যের সকল 'ধর্ম্ম'আদর্শই যে 'প্রেম'মূলক সে তত্ত্ব না বুঝিলেও কাব্যরস ও কবিকর্ম্মের স্বরূপ এবং কবিধর্ম্মের মাহাত্ম্যও প্রকৃত প্রস্তাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে না। উচ্চশ্রেণীর অধ্যাত্মধর্ম্ম ব্যতীত উচ্চশ্রেণীর কবিপ্রতিভা দাঁড়াইতেই পারে না জড়তা বা জড়োপাসনা কবিত্বের বিপরীত তত্ত্ব ও বিধর্ম্মী পদার্থ। বিশ্বাত্মার প্রতি (সুতরাং বিশ্বের সর্ব্বের প্রতি) আত্মবুদ্ধি এবং স্বত্বদাত্রী প্রেমবুদ্ধি—ইহাই সর্ব্বরসিকত্ব ও সর্ব্বাত্মবুদ্ধ কবিপ্রতিভার পরিচয়লক্ষণ। অতএব আপনাকে এবং আত্মানন্দকে বিলি করিবার জন্য একটা সাহজিক ও দুরতিক্রম প্রবৃত্তিই জীবনতন্ত্রে কবিপ্রতিভার স্বধর্ম্ম—উহা বিশ্বসৃষ্টিপথে আত্মদাতা বিশ্ব-কবির স্বধর্ম্মেরই ছায়াবহ। আবার, যে জীব পরের প্রতি অপিচ বিশ্বভুবনের প্রতি প্রেমপথে যতই অগ্রসর হইয়াছে, সে পরিমাণেই ত বিশ্বাত্মার দিকে অগ্রসর হইয়াছেত! প্রেমের অন্য নাম 'আত্মবিলি'। এজন্য সকল দেশের সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই সাক্ষাৎভাবে বা প্রকারান্তরে বলিতেছে "দানাৎ পরতরং নহি"; আমাদের 'দানসাগর'গ্রন্থও চূড়ান্ত কথায় বলিতেছেন—সকল দানের মধ্যেই "ব্রহ্মদানং বিশিষ্যতে"। এই ব্রহ্মদানের অর্থ 'ভাবদান'। কবিগণ এইরূপে অনন্ত আত্মদানের ভিখারী ও অনন্ত দাতা। প্রেম ও আত্মদান জীবাত্মার পরম স্বধর্ম্ম বলিয়া স্বার্থ পরতার নামই অপ্রেম; উহার অপর নামই অধর্ম্ম এবং জীবনতন্ত্রে উহার ফলই দুঃখ—উহাই অধর্ম্মের শাস্তি। সুখের রহস্য ধর্ম্মে, ধর্ম্মের রহস্য

প্রেমে, এবং প্রেমের আগম রহস্য পরমাত্মতত্ত্বে। অতএব প্রজ্ঞাজাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই কবি আত্মধর্ম্মে স্বস্থিতি লাভ করেন ; উহাই তাঁহার হৃদয়, মন ও জীবনকে বিশ্বতালের সঙ্গে সঙ্গত করিয়া পরমার্থে উপনীত করে।

আবার, প্রজ্ঞাদৃষ্টির নির্ম্মলতাসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ পাইতে থাকিবে যে জীবনমাত্রের মূলেই রহিয়াছে 'আনন্দ' ; অনু হইতে ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশমূলে 'সচ্চিদানন্দ'তত্ত্বই আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। জগৎ যে আছে, জীব যে আছে, জীব যে জন্মাইতেছে, বাঁচিয়া থাকিতে চাহিতেছে, সমস্তের মূল ধর্ম্মকারণ 'আনন্দ'। এই 'আনন্দ'মূলেই জীবের 'ভাব'নামক বৃত্তি এবং উক্ত বৃত্তিসূত্রেই জীব "আনন্দরূপমমৃতম্" এর অভয়পদে বাঁধা আছে। জীবনমাত্রেই পূর্ণানন্দভ্রষ্ট ; অতএব দুঃখ, দুর্ব্বলতা ও দুর্ব্বিপাকে এবং হতাশ্বাসে জীব ক্ষুদ্রায়মান এবং সঙ্কীর্ণ হইলেও আত্মপ্রকৃতি প্রত্যেক জীবের চিত্তেই এমন এক একটা 'কুঠরী' সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন যাহার দ্বার টিপিলেই একটা ভাবগত আনন্দ ও অমৃতের উৎস বহমান হইতে থাকে ; উহাই জীবমাত্রের, বিশেষতঃ উচ্চজীব মনুষ্যের হৃদয়মধ্যে গুপ্ত অমৃতের উৎস, এবং তাহার 'অমৃত পুত্র'তার পরম প্রমাণ ; উহাই জীবের 'আশা' এবং দিব্য সুখস্বপ্নের ভাণ্ডাগার। উহার নাম দিতে পারি— জীবহৃদয়ের আদর্শগত (Idealistic) আনন্দমন্দির, তাহার নন্দপুরী, সকল ভাবুকতার সংগুপ্ত ধর্ম্মমন্দির।

যে জীব যতই 'মহাপ্রাণ' (আবার সাংসারিক হিসাবে যতই 'দুর্ভাগ্য') তাহার অন্তরের এই ভাবগত নন্দপুরী দুরবস্থার চাপে ততই ঘনরসে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। সাহিত্য প্রত্যেক 'রসিক' ব্যক্তির অন্তরে এরূপ এক একটা আনন্দমন্দির রচনা করে বা সুপরিস্ফুট করে। জড়তার দুরদৃষ্টক্লিষ্ট ও সংসার কারাবদ্ধ জীব—দুনিয়ার যুদ্ধক্লান্ত ও হতাশ্বাস জীব অন্তরের এই ভাবগত আনন্দপুরীর ছায়াসংশ্রবেই সঞ্জীবিত থাকে ; উহাই তাহার রক্ষাপুরী—সংসারের যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার অভয়দুর্গ। প্রকৃত ভাবসাধক কবির অন্তরিন্দ্রিয়-সমক্ষে এই সংসারজীবনেই সেই গুপ্ত

বিরজাপুরীর ভাণ্ডাগার খুলিয়া যায়। 'ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা'ই কবিজীবনে বিশোকা এবং জ্যোতিষ্মতী হইয়া সংসারবক্ষেই সর্ব্বত্র অজ্ঞাত গুপ্ত অমৃতপুরীর রুদ্ধদ্বার উদ্‌ঘাটিত করে।

সাহিত্যজগতের একাধিক কবি এই চূড়ান্ত অমৃতের অন্ততঃ 'রসাভাস' আস্বাদন করিয়া গিয়াছেন। যৌনপ্রেম এবং অত্যন্ত সাধারণ 'রূপতৃষ্ণা' হইতেই সাধনাক্রমে এই পরমার্থ-ফল চয়ন করিয়াছিলেন, কথিত আছে, আমাদের বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস—বিশেষতঃ চণ্ডীদাস। শিহ্লনের কথা বিল্বমঙ্গল উপাখ্যানের ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর নিকট সুপরিচিত। হাফেজ জামী ও রুমী প্রভৃতি সুফী কবিগণ 'তৎ'বস্তুর প্রতি 'সখ্য'প্রেম হইতে এই তত্ত্বে উপনীত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবগণের পঞ্চপ্রেম-সাধনাও বিশেষভাবে জড়তাতিশায়ী ভাবুকতা এবং কবিগুণ-সাধনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইংলণ্ডের রসেটি ও কীট্‌স রসের পিপাসা হইতেই অনন্ত রসময়ের তত্ত্বে, শেলী, ব্রাউনীং এবং কভেন্টি্ প্যাটমোর মানবিক প্রেম হইতেই অনন্ত প্রেমময়ের তত্ত্বের (অন্ততঃ Intellectual ভূমিতে) এই 'আভাস' লাভ করিয়াছিলেন। আমাদের 'ঘরের মধ্যে'ও উহার দৃষ্টান্তাভাব নাই। নিসর্গের সৌন্দর্য্যতৃষ্ণা হইতে এবং মনুষ্যহৃদয়ের ভাবুকতাকে সঙ্গীতকবির নেত্রে উপভোগ করিতে করিতে রবীন্দ্রনাথ যে তত্ত্বে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা হইতে ইতোমধ্যেই অনেকে তাঁহাকে 'ঋষিকবি' বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্লেটো বা প্লোটিনস হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কালের ফিক্‌টে এবং হেগেল, বা নারদ-বাদরায়ণ-শাণ্ডিল্য হইতে জীব গোস্বামী প্রভৃতির নাম করিবনা—তাঁহারা স্বমতবাদী দার্শনিক, অনেকে ধর্ম্মক্ষেত্রের গোঁড়া আদর্শসাধক। ব্রাউনীং কেবল মনুষ্যত্বে প্রীতিমান্ হইয়া, সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যের অন্তশ্চরিত্রে কেবল সহানুভূতি-পথে ধ্যানী এবং ধারণাশীল হইয়াই পরিশেষে অখণ্ড চিদানন্দসাগরের আভাস পাইয়াছিলেন। ব্রাউনীং-হৃদয়ের পৌরুষ-বলিষ্ঠ এবং আত্মনিষ্ঠ শান্তরস

১৮। সাহিত্যের "অমৃতস্য পুত্রাঃ।"

তাঁহার লেখনীমুখে সংক্রামিত হইয়া পাঠকের হৃদয়কে আবিষ্ট করিতেছে। মনুষ্যচরিত্রেই অনন্যপরায়ণ প্রেম-সহানুভূতি হইতে যে চূড়ান্ত অধ্যাত্মফল চয়ন করিতে পারা যায় উহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যেমন ব্রাউণীং, তেমনি নিসর্গপ্রকৃতির অন্তর্যোগ-সাধনা হইতে—নিসর্গের ভিন্ন ভিন্ন রূপ এবং অবস্থার সঙ্গে আন্তরিক সহানুভূতি এবং ধ্যান সাধনার পথেই—যে পরান্ত অধ্যাত্মরসের তত্ত্বসাগরে আত্মহারা হইতে পারা যায় তাহার দৃষ্টান্ত ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থ। জগতের সকল কবিগণের মধ্যে কেবল এই একজন কবিই জোর করিয়া বলিতে পারেন—

"I love not man the less but Nature more."

এইদিকে দুই শ্রেণীর কবিসাধক আছেন—

মানুষেরে কেহ অতি ভালবাসি'
মজে অবিরল মানুষ-রসে ;
প্রকৃতির হিয়া গন্ধ-পিয়াসী
চিত্তে তাহার কেহ বা পশে—
নরের হৃদয়-কোলাহল-পুরে
আকুলচিত্ত, ডুবায়ে কানে
নিসর্গ-হিয়া স্তব্ধ পাথারে
শোনে নিখিলের জীবন গানে।

প্রকৃতির শান্ত-নিস্তব্ধ চিত্তসাগরে অন্তর্যোগী হইয়া ডুব দিতে জানিলেই বুঝিতে পারা যায়, যেন চিন্ময় আনন্দসাগরের নিস্তব্ধতা হইতেই সৃষ্টি-তরঙ্গ উপজাত হইয়া বিশ্বজগৎরূপে নানা-মুখে নানারূপে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে! জীবজগৎ জ্ঞানভাব এবং ইচ্ছাশক্তির নানামুখী তরঙ্গঝঞ্ঝার কোলাহলেই মুখরিত। এই কোলাহলের মধ্যে যাঁহাদের চিত্ত ধ্যানস্থির হইতে পারে না, তাঁহারা নিসর্গের মধ্যেই আদিম জীবনোচ্ছ্বাসের আদ্যাশক্তির পরিচয় লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারেন। ধন্য হইবেন বলিব, কারণ উহার যাহা ফল তাহা পাকিলেই, মনুষ্যের চূড়ান্ত

১৯। 'অমৃত' পথের আনুষ্ঠানিক।

নৈতিক অভ্যুন্নতি এবং ধর্ম্মক্ষেত্রীয় অধ্যাত্মতার পরান্ত ফলের সঙ্গে অভিন্ন হইয়া যায়। এই পথের 'যাত্রী' হইতে হইলে কিরূপে আনুষ্ঠানিক হইতে হয়, ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থ তাঁহার কাব্যের পাত্রমুখে জগতের উপকারার্থে তাহা বাক্যবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—

> Never did I, in quest of right and wrong
> Tamper with conscience from a private aim ;
> Nor was in any Public hope the dupe
> Of selfish Passion ; nor did ever yield
> Wilfully to mean cares or low pursuits !

বলা বাহুল্য, ইহা কার্য্যতঃ এবং ফলতঃ কেবল সাহিত্য-সাধনা নহে—জীবন-সাধনা ; এবং এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার অর্থও হিন্দু-দর্শনের 'পরমার্থ' ব্যতীত আর কিছুই নহে। ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থ না হইলে, অন্যের পক্ষে কথাগুলি অহঙ্কারের মতই ঠেকিত ! * এই সাধক ক্রমে কোথায় উপনীত হইয়াছিলেন তাহার আভাসও রাখিয়া গিয়াছেন ; কথাগুলি ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যের সর্ব্বোচ্চশিখর-রূপেই ভারতীয় পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে—

> That serene and blessed mood
> In which the breath of this corporeal frame,
> And even the motion of our blood
> Almost suspended, we are laid asleep
> In body, and become a living soul ;
> While with an eye made quiet by the Power
> Of harmony and the deep power of joy
> We see into the life of things—(Tintern Abbey).

* ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থ অল্প বয়সে বা প্রথম যৌবনে কি অন্যায় করিয়াছিলেন তাহার খবর দিয়া এক ইংরেজ এক খণ্ড গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। আমরা উহাকে যথেষ্ট প্রামাণিক মনে করিতে পারি নাই। প্রামাণিক বলিয়া ধরিলেও প্রথম জীবনের ওই সামান্য ও আকস্মিক অতিরিক্ততা কবির সুদীর্ঘ শান্তজীবনের তুলনায় গৌণ এবং গণ্য বলিয়াই গ্রহণ করিব। উহা কবির জীবনে 'ধর্ম্ম'স্বরূপতা লাভ করে নাই।

কবি এই পথে পরিশেষে ভারতীয় অধ্যাত্মসাধকের—সর্ব্বকালের অধ্যাত্মসাধকের চরমক্ষেত্রে—

শান্তেঽনন্তমহিম্নি নির্ম্মলচিদানন্দে তরঙ্গাবলি-
নির্ম্মুক্তেঽমৃত-সাগরাম্ভসি

(প্রবোধ চন্দ্রোদয়)

নিমগ্ন হইয়াছিলেন। তিনি যে রসের আস্বাদ লাভ করিয়াছিলেন ভারতবর্ষের সাহিত্যদার্শনিক সে রসকে লক্ষ্য করিয়াই ত বলিয়াছেন—'ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ'। আবার কেহ বলিয়াছেন—

"পুণ্যবন্তঃ প্রমিণ্বন্তি যোগিনো রসসন্ততিম্"

সাহিত্যসাধককে লক্ষ্য করিয়া এই ওয়ার্ড্সোয়ার্থ্ পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন—

Excite no morbid passions, no disquietitude
No vengeance and no hatred.

ওয়ার্ড্সোয়ার্থের ন্যায় চলিতে জানিলেই সাহিত্যসাধক ক্রমে আপনার সর্ব্বোচ্চ তত্ত্বকে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিজত্বকে ও আপনার সর্ব্বোন্নত 'প্রকাশ'কে লাভ করিতে পারেন। বলিতে পারি, সাহিত্যক্ষেত্রে উহাই প্রকৃত Originality বা 'মৌলিকতা'-সিদ্ধির পথ। নিজের প্রকৃতির মূলতত্ত্বে স্থির প্রতিষ্ঠা লাভ না করিতে পারিলে, সাহিত্য-সংসারে নিত্যঋণী এবং পরবশ হওয়া ব্যতীত যেমন উপায়ান্তর নাই, তেমন পরিশেষে মহাকালের দরবারে একেবারে দেউলিয়া হইয়া পড়াও অবশ্যম্ভাবী। সাহিত্যে জীবিতেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রকেই ইহা স্থির জানিতে হইবে যে, ওয়ার্ড্সোয়ার্থের প্রদর্শিত পথে চলিতে পারিলেই প্রকৃত আত্মদৃষ্টি, অধিকন্তু নিজত্বসিদ্ধ ও অনন্যসাধারণ নবদৃষ্টি লাভ করিয়া স্বাধীন সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারা যায়। উহার দৃষ্টান্তও অন্যত্র খুঁজিতে হয় না—স্বয়ং

২০। ওই অনুষ্ঠান পথেই 'মৌলিকতা'-সিদ্ধি।

ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থ্‌। ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের কবিদৃষ্টি কিংবা সৃষ্টির শক্তি কোন প্রকারে বহুমুখী কিংবা বিপুল বিস্তারিত ছিল বলিয়া অথবা অনন্ত-সামান্যভাবে তেজস্বিনী ছিল বলিয়া কোনমতেই ধারণা করিতে পারি না। তবু দেখিতেছি, এই কবি আত্মপথে চলিয়াই সাহিত্যক্ষেত্রে নিসর্গ-কবিতার যে নূতনতন্ত্র এবং নবসুর আনিয়াছিলেন তাহাই সাহিত্যজগতে অনন্যসাধারণ এবং অপূর্ব্ব হইয়া আছে; তিনি উহাতেই শ্রেষ্ঠ কবিশ্রেণীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আছেন।

২১। সাহিত্যক্ষেত্রের যম-নিয়ম প্রভৃতি।

সারস্বতী প্রতিভা সাধারণ-জীবনের জড়তাক্ষেত্র এবং মনুষ্যের অন্নময় ভূমির নিম্নগা বৃত্তি ছাড়াইয়া, মনোময় লোকেই সমুন্নত ভাবুকতা, সত্যদৃষ্টি অথবা মহাপ্রাণ উচ্ছ্বাসের উপর স্বানুভব স্থির করিয়া (রেখার-পর-রেখাক্রমে অথবা বৃহৎ তুলিকাসঞ্চালনে) মনুষ্যের চিত্তপটে সুস্থির রসমূর্ত্তির সৃষ্টি করিতেছে। সকল শ্রেষ্ঠ রচনা কেবল এইরূপে, সারস্বতক্ষেত্রীয় বিশিষ্টপ্রকার যম-নিয়ম, আসন-প্রাণায়াম এবং ধ্যান-ধারণা-সমাধির প্রণালীতেই রচিত হইতে পারে। সকল শ্রেষ্ঠ কবিই কোন না কোনমতে আত্মতত্ত্বে স্থিরনিষ্ঠ সাধক। কেবল ব্যক্তিগত রুচি এবং আলম্বন-উদ্দীপনের প্রকৃতিভেদে, এবং সাধনার প্রকারভেদেই এস্থলে সাহিত্যক্ষেত্রে অনন্তচ্ছন্দোমুখর প্রকাশ ঘটিয়া যাইতেছে; যেরূপে একই আদ্যাশক্তির লীলা হইতে অনন্তচ্ছন্দোবাহিনী বিশ্বধারা ছুটিয়া চলিয়াছে!

২২। সারস্বতক্ষেত্রে মনঃসংযমের ফল।

এরূপ অভ্যাসযোগের দৃষ্টান্ত সাহিত্যক্ষেত্রে অনেক আছে। প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্রক্ষুদ্র ভাববস্তু অথবা অবস্থাবিশেষ ধরিয়া, অধ্যাত্মতত্ত্বের সঙ্কেত এবং অপরূপ রসাভাস প্রদান করা মৈতরলিঙ্কের এবং পরিণত-বয়সের রবীন্দ্র-নাথের বিশেষত্ব। পাঠকের চিত্তকে ভাবনিবিষ্ট করিয়া অব্যাকুলভাবে সমাহিত রাখিবার 'ধাৎ' তাঁহাদের নহে; অন্তরাত্মাকে কিছু ধরাইয়া দিবার কোন ঝোঁক তাঁহাদের নাই। ভাবের

জগতে মধুলুব্ধ ভৃঙ্গের মত এই যে নিত্যচঞ্চল অথচ অচলভাবের একটা দৃষ্টিরীতি উহা তাঁহাদের জীবনে সহজে সুসিদ্ধ হয় নাই। বাহির হইতে যাহাই প্রতিভাত হউক, মনোদৃষ্টির সমাহিত নিষ্ঠা ব্যতীত, জীবনের সকল বহিস্তন্ত্র ব্যবসায়ের অন্তরালে অপরূপ সাহিত্যিক যম-নিয়ম এবং বিবিক্তসেবী মনোজীবন ব্যতীত দুজনের কাহারও পক্ষে এই সুপ্রতিষ্ঠা ঘটিতে পারে নাই। এই সিদ্ধির পশ্চাতে, আপনার অন্তঃপুরীতে অসামান্য বিবিক্ত সেবা, হৃদয়ের অসামান্য আবেগ ও "তন্ময়ীভাবনা-যোগ্যতা" এবং অসাধারণ ভাবনিষ্ঠা নিঃসন্দেহে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। অন্তর্দৃষ্টির দ্রুতি এবং লঘুলীলা হইতে যে কবিতার জন্ম হয়, উহাতে হৃদয় দ্রুতসঞ্চারশীল ভাব-চ্ছন্দের ব্যায়ামানন্দে মুগ্ধ হইতে থাকে। আমাদের রবীন্দ্রনাথের কবিতা হইতে এইরূপ আনন্দই লাভ করি। শৈলীর মধ্যে ওই দ্রুতিই দিব্যোন্মাদবশে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে স্বর্গপাতাল পারাপার করিয়া উড্ডীয়মান এবং লীলায়িত হইতেছে! অন্যদিকে, অন্তর্দৃষ্টির দীপ্তি এবং স্থিরসংবেশ হইতে যে কবিতা জন্মে, উহাতে পাঠকের হৃদয় ভাবে তদ্গত হইয়া অতলের শান্তরসে সন্নিবেশ-লাভপূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইতে থাকে। ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের কবিতায় এ 'রস' লাভ করি। ম্যাথু আর্ণল্ড্‌ কবির এই নিবেশ শক্তিকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—নির্ব্বিশেষ এবং নিরাভরণ প্রবেশশক্তি—Bare sheer penetrative power. আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্ম্মা এ সকল কবির কোন বিশেষত্বই সারস্বতক্ষেত্রে নিঃসঙ্গজীবনের দীর্ঘ-বিবিক্ত এবং জড়তাবিস্মৃত সাধনা ব্যতীত স্থিরতা লাভ করিতে পারে নাই। তাঁহাদের কাব্যকৃতিত্বের সমস্ত গুণ বা দোষ এইরূপে অন্তর্জীবনের মহত্তত্ত্ব হইতে, অধ্যাত্মলোকের ভাবস্থৈর্য্য এবং মন ও বুদ্ধির স্বধর্ম্ম হইতে সংক্রামিত হইয়াই কবিতায় উপজাত হইতেছে। এমার্শন একস্থলে বলিয়াছেন, প্রতিভার অর্থ, অসামান্য তপঃখেদ বরণ করিবার অপরিসীম শক্তি। সাহিত্যিকের পক্ষে এ' কথার যদি কোন অর্থ থাকে, তবে উহা সাহিত্য-চর্য্যার পূর্ব্বোক্তরূপ মনঃসংযম ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে।

প্রসঙ্গক্রমে এমন একটি বিষয়ের সম্মুখীন হইয়াছি এস্থলে যাহার বিস্তারিত আলোচনা অসম্ভব; অথচ উল্লেখ না করিলে সারস্বত ধর্ম্মের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিবে। যিনি সারস্বতী প্রতিভা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে সর্ব্বসময় মনে রাখিতে হয় যে, তিনি সৌভাগ্যক্রমে মানবজগতের জয়োত্তমা জৃম্ভণী এবং পরিচালনী শক্তির অধিকারী হইয়াছেন; মনুসন্ততির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৌলিন্যে এবং বন্দ্যবংশে জন্মলাভ করিয়াছেন। তিনি সাত্ত্বিক বলিয়াই, জগতের আর্য্যসমাজে তাঁহার যেমন স্বত্ব তেমন দায়িত্বও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; তিনি Archangel বলিয়াই কর্ম্মদোষে অনন্ত নিরয়গামী হইবার জন্য তাঁহার পক্ষে সমধিক সম্ভাবনা। তিনি কর্ম্মগুণে যেমন সামাজিকগণের উত্তমাঙ্গে হয়ত অবিসংবাদিতভাবে পদরজঃ স্থাপন করিতে পারেন, তেমন কর্ম্মফলেই এমন কঠোর দণ্ডযোগ্য হইতে পারেন যে, মনুষ্যের দণ্ডবিধির সংহিতা যাহা কোনকালে কল্পনাও করিতে পারে না। সুতরাং, মানবসমাজের দিকে এই সম্বন্ধ-বুদ্ধি এবং দায়িত্ব-বুদ্ধিতে প্রত্যেক প্রতিভাশালী কবিকেই নিয়ত সচেতন থাকা আবশ্যক—যেমন পরের, তেমন নিজের মঙ্গলের জন্যও আবশ্যক। সরস্বতীর প্রিয়পুত্রকেই মনে রাখিতে হয় যে, তিনি জন্মস্বত্বে দেবযোনি হইলেও, মাটীর শরীর পরিগ্রহ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে এবং মনুষ্যমধ্যে বিচরণ করিতেছেন। কিঞ্চিৎ মাত্র বিমনস্ক হইলে, এই দেহটিই তাঁহাকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া, সাহিত্যের ক্ষেত্রেই অতর্কিত খানাখন্দকে এবং জঘন্য কূপগহ্বরে নিপাতিত করিতে পারে; হস্তের সুধাভাণ্ড পলকেই বিষভাণ্ডে পরিণত হইয়া নিজের এবং পরের মহামৃত্যু সংঘটন করিতে পারে। তাঁহার প্রতিভা 'মোহিনী' বলিয়াই বিপদ্। এই মোহিনীকে লক্ষ্য করিয়াই জগতের 'দ্রষ্টা'রা বলিতে পারেন—তাহার এক হাতে সুধা, অন্য হস্তে গরল!

২৩। সারস্বতী প্রতিভার স্বত্ব এবং দায়িত্ব।

"আদিম বসন্ত প্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে
ডান হাতে সুধাপাত্র বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে!"

সাহিত্যসেবীকে সকল সময়েই ধারণা রাখিতে হয় যে তিনি সামাজিক জীব; নিজের অন্তরে যাহাই পোষণ করুন—ভাবনার দায়িত্বও কিন্তু কম নহে—লিপিবদ্ধ করিয়া সমাজে প্রকাশ করিতে গেলেই উহা পরমুহূর্ত্ত হইতে আপন দোষে-গুণে, স্বত্বে এবং দায়িত্বে মানব-সমাজের অদৃষ্টে বসিয়া, হয়ত অনন্তকালের জন্য উহার জীবনপাত্রে আপনার সুধাবিষ পরিবেশন করিয়াই চলিবে। উহাকে প্রত্যাহার করিবার কোন ক্ষমতাও যে তাঁহার থাকিবে না! ভাবনার শক্তি এবং দায়িত্বও এত অধিক হইতে পারে যে, মনুষ্যের একটি গুপ্ত চিন্তাই —হয়ত তাঁহার মৃত্যুর শত বৎসর পরে—অধ্যাত্মজগতে নিদারুণ ভাবে ক্রিয়ামুখী হইয়া মানবসমাজ তোলপাড় করিতে পারে! 'মানুষকে কেয়ার করিনা' এমন কোন ভাব ভ্রমেও মনে আসিলে, কিংবা কাহারও মুখে শুনিলে, উহা একটা দারুণ অবিনয়াপরাধী আত্মম্ভরিতা এবং সয়তানী কথা বলিয়াই স্থির করিবেন। উহার অন্তরালে কোথাও না কোথাও—খ্রীষ্টানী আদর্শে—মনুষ্যের নিত্যজীবন, এবং পুণ্য-নিহন্তার কুশ্রী "বাঁকা শিং এবং পুচ্ছ" লুকাইয়া আছে বলিয়াই বিশ্বাস করিবেন; সকল অবিনয় এবং আত্মম্ভরিতার মধ্যেই থাকে।

২৪ সাহিত্যে 'সৌন্দর্য্য'-বাদিগণের সাধারণ ভ্রম।

সাহিত্যিক কোন সম্প্রদায়িক শাস্ত্রবন্ধনের বাধ্য নহেন; তিনি কেবল High priest of Beauty; তাঁহার আদর্শ 'Art for Art's sake' ইত্যাদি কথা গ্যেঠে-শীলারের যুগ হইতে ইয়োরোপীয় শিল্পশাস্ত্রে একশ্রেণীর লেখক কর্ত্তৃক বিঘোষণা লাভ করিয়া একটা কোলাহল তুলিয়াছে। কথাগুলির মর্ম্মগত অর্থ ও অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া সাধারণকে চিরকাল ভ্রান্ত হইতে দেখা যায়। অনেক সত্যদর্শীর দৃষ্টিও অতর্কিত পাপবুদ্ধির খোসামোদ অথবা খেয়ালের বশেই 'ঝাপ্‌সা' হইয়া যায়। 'সত্যসুন্দর' সর্ব্বপ্রকার শিল্পের অবিসংবাদিত প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু মনুষ্যমাত্রেই সামাজিক অপিচ 'অধ্যাত্ম' জীব বলিয়া, তাহার সকল কর্ম্মক্ষেত্রের বহির্ভাগে একটী নিত্যদায়িত্বের অতর্কিত ও অবি-

সংবাদিত 'বৃহৎ বন্ধনী' আছে। উহার নামই শিব, যা শিল্পের আসরে শ্রেয় এবং প্রেয়ের সামঞ্জস্য। (১) যে কবি এই সামঞ্জস্যপথে প্রতিভাকে সর্ব্বমঙ্গলার পূজাপাত্রে নিবেদন করিতে পারেন না, তিনি যতই শক্তিশালী বা মিষ্টরসাল রচনা করুন না কেন, মহাকালের পুরীকক্ষে, নিত্যমনুষ্যের শুদ্ধানন্দপিপাসী অন্তরাত্মার সমক্ষে, উহা কোনমতেই স্থায়ী মাহাত্ম্যপদবী রক্ষা করিতে পারিবে না। পুণ্যদ্রোহী বা অসুরধর্ম্মী রচনা আপাততঃ অমরাপুরী অধিকারপূর্ব্বক ইন্দ্রাণীকে দাস্যে নিযুক্ত করিতে দেখা গেলেও উহা একদিন না একদিন, হয়ত নির্ব্বিরোধে, আত্মপ্রকৃতির পক্ষাঘাতেই ভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে। অতর্কিত অবস্থায় এই বৃহৎ বন্ধনীর দায়িত্ব সাহিত্যসেবীর মনে জাগরূক না থাকিতে পারে, জড়ধর্ম্ম এবং দেহধর্ম্মের গতিকে তন্দ্রাগ্রস্ত হইয়া মনুষ্যমাত্রেই শীলবন্ধনীর অত্যাচারী হইয়া পড়িতে পারে। সাহিত্যে কত কত মহাপ্রতাপশালী প্রতিভার কর্ম্মকৃতি কেবল এই অত্যাচারের গতিকে শ্রীহীন হইয়া, কোথাও বা একেবারে হেয় হইয়াই গণনীয় পদবী হারাইতেছে; কত কত মহাশক্তিধর জোলা এবং রেনল্ড্‌কে—কত অনামিক সাহিত্যসেবীকে, উহার গতিকেই ন্যূনাধিক তিরস্কার এবং বহিষ্কার ভোগ করিতে হইতেছে! সত্যসুন্দরের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও, সাহিত্যের সোনাকে পুনর্ব্বার এই শীলভদ্রের তুলাদণ্ডে পরিমাপিত হইয়াই গৌরব প্রমাণ করিতে হয়। বলিতে কি, সাধক পূর্ব্বোক্তরূপে স্বধর্ম্মে স্থিতধীঃ হইতে পারিলেই, তাঁহার প্রতিভা অমরযোনি কিনা বুঝিতে পারা যায়। স্বয়ং সুধাধর্ম্মী হইলেই কবির ক্রিয়াকর্ম্ম এবং তাঁহার মতিগতি জগতের শিবতত্ত্বের ব্যভিচারী হইতে কিংবা বিশ্বতন্ত্রের সহিত বেতালা হইতে পারে না। অসাধারণ নির্ম্মাণকৌশল, সূক্ষ্মদর্শন এবং হৃদয়গ্রাহিতা দেখাইয়াও, কত কত গ্রন্থ চরমের বিচারস্থলে, কেবল দুঃশীলতার

(১) 'সাহিত্যের প্রকৃতি' অধ্যায়ে এ সমস্ত মতবাদ বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

গতিকেই সহৃদয় ব্যক্তির হেয় এবং সাহিত্য-ইতিহাসের অনুল্লেখ্য হইয়া গিয়াছে। এক্ষেত্রে কাহাকেও 'চোখে আঙ্গুল' দিয়া দেখাইয়া দিতে হয় না; প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিমাত্রের হৃদয়টিই যেন অতর্কিতে জগত্তন্ত্রের সহিত 'তাল কাণা' রচনার প্রতি অশ্রদ্ধ এবং বিরূপ হইয়া যায়। মনুষ্যমাত্রেই যে অমৃত-পুত্র, তাহার সুধাশ্রদ্ধা যে কোন অবস্থাতেই একেবারে বিলুপ্ত হইতে পারে না, এই ঘটনা তাহারও একটি প্রমাণ।

জর্ম্মণ সাহিত্যদার্শনিকগণের পর হইতে বিশ্বসাহিত্যের হৃদয় উত্তরোত্তর এই 'সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্য' অমৃতের লক্ষ্যেই জাগ্রৎ থাকিয়া, এবং উহার জন্য নিত্যপিপাসায় লোলুপ হইয়াই চলিতেছে। কবি শীলার স্বয়ং কথায় এবং কার্য্যে, প্রকারান্তরে, সাহিত্যের ওই 'শীলভদ্র' এবং 'জয়মঙ্গলা-মন্দিরের পূজারী' আদর্শকেই সাধন করিয়া গিয়াছেন।

২৫। সাহিত্যজীবনে "শীলভদ্র" এবং "পূজারী।"

আমরা সাহিত্যসেবিগণ কথার সাধক; সুতরাং কথার মাহাত্ম্যটি, উহার অন্তর্নিহিত শক্তি এবং দায়িত্বটি আদৌ হৃদয়ঙ্গম করিয়াই সাহিত্য-সেবী হইব। কথা এক-একটা মহাভাবের—মহাশক্তির বিগ্রহ। কথার মতন কথা হইলে বিশ্বজগৎ তোলপাড় করিতে পারে। এক একটা কথাই শতসহস্র বৎসর নরসমাজে ক্রিয়ান্বিত হইয়া যেমন তাহাকে আনন্দের এবং পুণ্যের পথে প্রেরণা দান করিতে পারে, জগতের "আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য-সুখ-প্রীতি-বিবর্দ্ধন" হইতে পারে, অন্যদিকে জগৎকে চিরকাল নরকপথে প্রলুব্ধ করিয়া জগতের 'দুঃখশোকাময়প্রদ' হইতে পারে এবং বক্তাকেও চিরকাল কুপ্রবৃত্তির সাহায্যকারী এবং অধ্যাত্মক্ষেত্রে নরহত্যাকারীর অপরাধে অভিযুক্ত রাখিতে পারে। কথা মনুষ্যের বিজ্ঞানাত্মার আহার। যেই কথার সূত্রে মনুষ্যের যাবতীয় উন্নতি ও নরসমাজের ইহ-পরকালের সকল সম্বন্ধবন্ধন ঘটিয়াছে, আমরা সেই কথার সাধক। নিজের দায়িত্বজ্ঞানে সম্যক্ জাগরিত থাকিয়া,

২৬। সাহিত্যসেবী কথার সাধক বলিয়া 'কথার দায়িত্ব' জ্ঞান।

নিজকে শতসহস্র বৎসরের চিরজীবী জানিয়াই সাহিত্যসেবীকে লেখনী ধারণ করিতে হয়। গ্যেঠে একস্থলে বলিয়াছিলেন, অন্ততঃ ৫০ লক্ষ মনুষ্যের মাতৃভাষা না হইলে কোন ভাষায় লেখনী ধারণ করাও কর্ত্তব্য নহে। গ্যেঠের সময় হইতে সাহিত্যের আমল এখন আরও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। এখন সাহিত্যসেবীকে মনে রাখিতে হয় "আমি জগতের অধিবাসী—সমগ্র ধরণী আমার কথায় কর্ণপাত করিতেছে।" এইরূপ দৃষ্টিস্থান এবং সঙ্কল্পস্থানের ধারণা জাগরূক রাখিলেই বর্ত্তমান কালে প্রকৃত সাহিত্যসেবী হইতে পারা যায়। উহা হইতেই রচনার মধ্যে বর্ত্তমানসম্মত মাহাত্ম্য সঞ্চারিত হইতে, উহার ভাববস্তু এবং ভঙ্গীর মধ্যে অসঙ্কীর্ণতা এবং সার্ব্বজনীন প্রকৃতি সুসিদ্ধ হইতে পারে। সাহিত্য কখনও লেখকের অধ্যাত্ম-চরিত্র এবং দৃষ্টিস্থানের প্রভাব এড়াইতে পারে না; অধিকন্তু, অনেক স্থলে রচনার প্রকৃতি হইতে লেখকের প্রকৃতি এবং উহার ব্যাপ্তিসীমাও পরিমাপিত হয়।

এইরূপ 'কথা' কহিতে যেমন জীবনসাধনার, যেমন ভাবসাধনার আবশ্যক, তেমন মাতৃভাষার শব্দশক্তিজ্ঞানের আবশ্যকতা তদপেক্ষা বেশী ব্যতীত কম নহে। কারণ শব্দ লইয়াই সাহিত্য। রঘুবংশের প্রথম শ্লোকটি সকল সাহিত্যসেবীর আদিম সঙ্কল্প, দায়িত্বজ্ঞান এবং কাকুতিটাই জানাইয়া গিয়াছে। "হে ভগবন্, আমার কথা যেন নিরর্থক না হয়, অথবা কদর্থক হইবার সম্ভাবনাও যেন তাহার মধ্যে না থাকে।" শব্দার্থের সম্বন্ধজ্ঞান-সিদ্ধিই সাহিত্যের মূলভিত্তি—উহা হইতে সাহিত্যের সামাজিক সম্বন্ধেরও সূত্রপাত। অথচ অনুসন্ধান করিলেই কি দেখিব? অনেক স্থলে অপর সহস্রদিকে অনন্যসম্ভব যোগ্যতা দেখাইয়াও কত কত সাহিত্যসেবী এই প্রাথমিক সম্বন্ধেই ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে! চমৎকারী বা অন্যের মনোযোগযোগ্য কথা বলা দূরে থাকুক, ভাবরাজ্যে অধিকার দূরে থাকুক, তাঁহাদের কথা যেন পদেপদে নিজের অর্থহত্যা এবং আত্মহত্যা করিয়াই চলিয়াছে! যাহাকে বলে, একেবারে

২৭। তাঁহার পক্ষে শব্দ-শক্তি-জ্ঞানলাভ অপরিহার্য্য।

গোড়াতেই গলদ। সাহিত্যের বিপত্তিস্থানগুলি পরীক্ষা করিতে কুতূহলী হইয়া সভ্যজগতের মৃত অথবা বিস্মৃত সাহিত্য-রচনাগুলি ঘাঁটিতে বসিলেই দেখিবেন, নিষ্ফলতার কারণ অনেকস্থলে আদৌ লেখকের পরিপূর্ণ শব্দার্থজ্ঞানেরই অভাব। উহার পর আর একটি সঙ্কটস্থান—অনেক লেখক নিজের কথাটি, নিজের প্রতি অনুগত থাকিয়াই যেন বলিতে পারেন নাই। ইংরাজীতে যাহার নাম Want of style.

এ ক্ষেত্রে কপটতাই সাহিত্যসেবীর অতিপাতক। আবার, কাহারও পক্ষে যেন অলঙ্কারই মহাভার! স্থানে অস্থানে সোজা কথার উপর অলঙ্কার চড়াইতে গিয়াই কেহ নিদারুণ ভাবে ক্লিষ্ট হইয়া তলাইয়া গিয়াছেন; কেহ বা পরের সোণা কাণে পরিতে গিয়াই সকল সদ্ধর্ম্ম হারাইয়া বসিয়াছেন। অব্যাকুল শব্দশক্তি এবং নিজস্ব বাক্য-ভঙ্গীর মতন এত প্রাথমিক বিষয়ে বাহুল্য করার জন্য ইহা স্থান নহে। লেখক কথার সাহায্যেই আত্মপরিচয় করেন বলিয়া, কথার আকাঙ্ক্ষা, ভঙ্গী এবং যোগ্যতার ধারণা হইতেই পাঠকের চিত্তপটে লেখকের ধর্ম্মচ্ছবি ও তাঁহার চিত্তগত অর্থের ছবি মুদ্রিত এবং বর্ণিত হইয়া যায়। ঐ ছবিটার উপরেই লেখকের ব্যক্তিত্ব। এইজন্য ব্যুফঁ (Buffon) বলিয়াছিলেন The style is the man; হেরল্ড্ মুনরো আরও অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন "The style is the soul," পাঠকচিত্তে আত্মমুদ্রণের ক্ষমতা এবং এই ব্যক্তিচ্ছবির বিশিষ্টতার মধ্যেই ত প্রকারান্তরে লেখকের সর্ব্বস্ব নির্ভর করিতেছে!

২৮। আপনারই অনুগত এবং অকপট ভাবের বাক্য-ভঙ্গী অপরিহার্য্য।

কথা এবং ভাব নিত্যসহযোগী বলিয়া, সাহিত্যকর্ম্মীর জীবনে স্বানুভব এবং ভাবে অধিকার না থাকিলে যেমন নিজস্ব কথা যোগায় না, তেমন শব্দশক্তিতে সজাগ অধিকার না থাকিলেও নিজস্ব ভাব আসে না। শব্দের দুইটী শক্তি—অভিধাশক্তির পরিচয় 'শব্দকোষ' যোগাইতেছে বটে; কিন্তু, ব্যঞ্জনা সাহিত্যিকের অন্তর্দেবতার প্রসাদের উপরেই অহরহঃ নির্ভর করিয়া

২৯। শব্দ প্রেম সাধনা।

থাকে। রীতির ক্ষেত্রে এই ব্যঞ্জনার মাহাত্ম্য ধরিয়াই নিত্যকাল প্রতিভার পরিমাপ হইয়া আসিতেছে। তবে, আদৌ অভিধা সুসিদ্ধ না হইলে, ব্যঞ্জনার ভিত্তি কুত্রাপি সম্ভবপর নহে বলিয়া, সাহিত্যের প্রবেশক মাত্রকে সর্ব্বপ্রথম অভিধানের ভজনা করিতে হয়। অভিধানের ভজনা! কথাটা আপাততঃ অনেকের হাস্য-বিকাশ করিতে পারে। কিন্তু, উৎসাহিত হউন, সম্মুখে আরও হাসির কথা আছে। আমরা শব্দকোষ গ্রন্থকে সরস্বতীর একটা ছন্দোবিহীন মহাকাব্যরূপেই উপভোগ করি। লোকে যেমন কেবল আমোদের উদ্দেশ্যে নাটক নভেল পাঠ করে, ঐরূপ আমোদের কাছাকাছি একটা 'রস' প্রকৃত সাহিত্যসেবিমাত্রেই অভিধান গ্রন্থ হইতে প্রায়ই আদায় করেন। প্রথম দর্শনেই শব্দকোষ দূর হইতে দুর্ম্মনী চেহারা দেখাইয়া বিদায় করিতে চায়। চোখের সম্মুখে 'মটর কড়াই মিশিয়া কাঁকরে' স্তূপে স্তূপে সারি সারি দাঁড়াইয়া! কতকগুলি সূত্রসম্বন্ধ বিহীন শব্দের হিজিবিজি ভাণ্ডার! কিন্তু কাছাকাছি ঘেঁষিয়া দৃষ্টিপাত কর, উহার প্রত্যেক অণুকণাই দৃষ্টিভাবী! চোখে পড়া মাত্র হাসিয়া-ভাসিয়া নাচিয়া-কাঁদিয়া মনে কি চিত্রবিচিত্র ছবি আঁকিতে থাকে! কত রূপ, কত রস, কত গন্ধ! কত নব নব ভঙ্গী, ইঙ্গিত এবং কটাক্ষের ছন্দ! এক একটা শব্দের পশ্চাতে কতকালের কত অবস্থার, কত দেশদেশান্তরের, যুগযুগান্তরের ইতিহাস! সম্মুখীন হওয়ামাত্র উহারা কি অপরূপ ভাবে কর্তৃত্ব এবং ক্রিয়াকর্ম্ম যোগাইয়া মনে ভাব-মূর্ত্তির সৃষ্টি করিতে থাকে! কোন্ কবি কোন্ শব্দের ভিতর হইতে কি ভাবে রস বাহির করিয়াছেন—কে কোন্ দিক্ হইতে শব্দের অন্তরমৃত পান করিয়াছেন? কোনও শব্দের মধ্যে মনুষ্যের সর্ব্বপ্রাচীন ইতিবৃত্ত, একেবারে প্রাগৈতিহাসিক যুগের, মনুষ্যহৃদয়ের বর্ণগন্ধ এবং ছবিটাই মুদ্রিত আছে; ভাষাবিজ্ঞান উহা হইতে অযুত বৎসর পূর্ব্বকার মনুষ্যসমাজের রেখাচিত্র উদ্ভাবিত করিয়া ফেলিয়াছে। বাঙ্গালা অভিধানগ্রন্থের কয়েকটী শব্দের মধ্যে কিরূপে প্রাগ্‌বৈদিক যুগের সমাজ, পরিবার এবং দাম্পত্য আদর্শের প্রোথিত

কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে! এক একটী বিন্দুর মধ্যেই কত বৃহৎ, বিপুল, বিচিত্র মূর্ত্তি এবং প্রকাণ্ড শক্তি অনবধানে সুপ্ত আছে; সামান্য ক্রিয়াযোগে উহা একেবারে শূন্যের মধ্যেই 'সোণার কাঠি' চালাইয়া নব নব ভাবজগতের সৃষ্টি করিতে পারে! শব্দমাত্রেই কি একটা ম্যাজিক নহে?—চিত্তজগতের সোণার কাঠি? স্পর্শমাত্রেই হৃদয়মন্দিরের গহনসুপ্তা অপরিজ্ঞাতভাবিনী রাজকন্যাকে জাগাইয়া তুলিয়া সমস্ত উলট পালট করিয়া দিতেছে! সাহিত্যলোকের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কি, ঐ সোণার কাঠির দ্বারাই সমাধা হইতেছে না? মানুষের কত বড় অধিকার! পূর্ব্বপুরুষ হইতে সমুন্নত ভাষারূপে কি অনিঃশেষ্য, অপরিমেয়, অমূল্য সুধা আমরা লাভ করিয়াছি! বলিতে কি, সাহিত্যসেবী হইতে চাও, আদৌ শব্দপ্রেমিক এবং শব্দযোগী হও; উহা ব্যতীত ভাবকে কখনও 'শ্রেষ্ঠ প্রকাশ' দিতে পারিবে না। কীট্‌স্ বলিয়া গিয়াছেন, I looked upon fine phrases with the eye of a lover. কীট্‌স্ একজন প্রথম শ্রেণীর শব্দশিল্পী ও কবি ছিলেন।

সাহিত্যে সকল নিষ্ফলতার নিম্নতলে শব্দক্ষেত্রের ন্যূনাধিক অনুর্ব্বরতা এবং ভাবকর্ষণীর বর্ব্বরতাই প্রত্যক্ষ করিবেন। শব্দপ্রেম-প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের ঘরের দিকে, বঙ্গসাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপূর্ব্বক কয়েকটি কথা না বলিয়া পারা যায় না। সাহিত্য-শাখার সভাপতিরূপে এই বিষয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করিতে আমরা বাধ্য আছি, এমনতর অনুজ্ঞা জারী করিতেও অনেকে কুণ্ঠিত হন নাই। দেশে দুইটা দল—কেহ আর্য্যশব্দের, কেহ বা দেশী শব্দের গোঁড়া। বাঙ্গালী সংস্কৃত ভাষা এবং আর্য্যরীতি-প্রেমিক হিন্দু, উর্দ্দুপ্রেমিক মুসলমান, পালি-প্রেমিক বৌদ্ধ এবং যুনানী-প্রেমিক খ্রীষ্টান বলিয়া, সর্ব্বোপরি আমরা একটী চলনশীল আধুনিক জাতি হইতে চাহিতেছি বলিয়া এই বিবাদ সম্ভবপর এবং স্বাভাবিক হইয়াছে। বাঙ্গালাভাষার শব্দসম্পত্তি এখনো সম্পূর্ণ সংগৃহীত হয় নাই, উহা ঘটিতে হয়ত আরও অর্দ্ধ শতাব্দীর আবশ্যক।

৩০। বাঙ্গালার শব্দ-সমস্যা।

হইবে। আবার, তন্মধ্যে বাঙ্গালা ক্রিয়াপদ, বাগ্দেবীর প্রধান শক্তিটাই এত দুর্ব্বল যে, বাহির হইতে কিছু একটা "হওয়া করার" সাহায্য ব্যতীত উহাকে কোন মতেই কাজে লাগাইতে পারা যাইতেছে না। আমাদের লিখিত ও কথিত ভাষার ক্রিয়াসমস্যাও বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাস হইতে আরম্ভ করিয়া মধুসূদন প্রভৃতির মধ্য দিয়া উত্তরোত্তর নিদারুণ বিচিকিৎস আকারেই আমাদের সমক্ষে উপস্থিত! পূর্ব্ববর্ত্তী বাণী-সাধকগণের 'হীরার ধার' এই সমস্যাশৃঙ্গে পড়িয়াই 'খান খান' হইয়া ভাঙ্গিয়াছে; আধুনিক বঙ্গের সাহিত্যক্ষেত্রে পূর্ণচেতন বাক্যশিল্পী মধুসূদনের বুদ্ধি-চেষ্টা 'মাইকেলী ক্রিয়া' রূপে গণনা লাভ করিয়া তলাইয়া যাইতেছে। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইহার কোন কূলকিনারা দেখিতেছেন না। সংস্কৃতের প্রকৃতি হইতেই এই দুর্ব্বলতা বঙ্গভাষাকে উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইয়া বসিয়াছে; উহার গতিকেই বাঙ্গালা ক্রিয়া সমগ্র বাক্যের পশ্চাতে একেবারে পুচ্ছের ন্যায় নিযুক্ত হইতে বাধ্য হয়। তবে, সংস্কৃত ক্রিয়ামাত্রের দুইটী ইচ্ছামুখী জিহ্বা আছে; পদের মধ্যেও উচ্চারণের অনতিক্রম্য 'গুরু লঘু' ভেদ আছে; এই সমস্ত কারণে সংস্কৃত ক্রিয়া বিবক্ষাবশে পরিচালিত হইতে এবং অপরূপ 'মিষ্ঠা' সাহায্যে মহাশক্তিরূপে পরিণত হইতে পারে। বাঙ্গালার ক্রিয়াকে সে স্বাধীনতা বা সে শক্তি কোন মতেই দিতে পারা গেল না। ক্রিয়া বিভক্তির দৈর্ঘ্য লইয়াও লেখা এবং কথার মধ্যে হুলুস্থূল বিবাদ! অনেকে ক্রিয়া বিভক্তিকে ছাঁটিয়াই গোল মিটাইবার জন্য পরামর্শ দিতেছেন; চীনাদের টিকি কাটার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াই এই 'আপদ্' চুকাইতে চাহেন। কেহ কেহ দল বাঁধিয়াই বাঙ্গালা ক্রিয়ার পুচ্ছশাতন আরম্ভ করিয়াছেন। উহা পারা গেলে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া বাঁচিতাম। কিন্তু, যাঁহার একটু কাণ আছে, গদ্যচ্ছন্দের শক্তিজ্ঞান আছে, তিনিই বুঝিতেছেন যে, সঙ্কীর্ণপুচ্ছ ক্রিয়াপদ 'আটপৌরে' ব্যবহারে চলিলেও, মৃদুদ্রুতগতিতে অথবা "আধচরণে আধচলনি"তে মানাইলেও, 'পোষাকী'র বেলায় একেবারে তালকাণা এবং অচল হইয়া যাইতেছে। সভা-মজলিসে

যাতায়াত করিতে হইলে, প্লুতগতিতে, তরঙ্গগতিতে, কদমচালে কিংবা লক্করীচালে চলিতে হইলে ওই আপদ্‌টাই যে বাঙ্গালা বাক্যের প্রধান শক্তি! কোনরূপ জবরদস্তি, দলাদলি বা যোগসাজোসি করিয়া বাঙ্গালা ক্রিয়ার এই অদৃষ্ট হইতে মুক্তি পাইব বলিয়া কোনমতেই আশ্বস্ত হইতে পারি না। এই অদৃষ্ট নতশিরে মানিয়া লইয়া, পোষাকী এবং আটপৌরে প্রকৃতির এই 'দোমুখী' গতি বজায় রাখিয়া চলাই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি। মোটের উপর, বাদী-প্রতিবাদীর অনেকেই যে প্রকৃত ভাষাশিল্পী ও সাহিত্যসেবীর আদর্শে সচেতন থাকিয়া এই বিবাদ করিতেছেন, তাহা কোন মতে মনে করিতে পারি না। কেহ কেবল আর্য্যামি, হিঁদুয়ানী বা 'বামনাই'র আদর্শে, কেহ প্রচণ্ড সাহেবিয়ানা, আবার কেহ কেহ বা মুসলমানী, অহিন্দু, প্রতিহিন্দু বা ব্রাহ্মের মেজাজেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামিয়া কসরৎ আরম্ভ করিয়াছেন। তবে এ সমস্ত খুবই স্বাভাবিক; সকলে আর খাঁটি সাহিত্যের আদর্শে চলিতে পারেন না; অনেকে স্পষ্ট-বিঘোষিত সাম্প্রদায়িক উদ্দীপনার বশেই লেখনী ব্যবহার করিতেছেন। সম্প্রদায়সম্পর্কের গুপ্তজাল হইতে সরস্বতীর চালচলনকে পৃথক্ করিয়া দৃষ্টি করাও অনেকের পক্ষেই কঠিন। সাহিত্যের ইতিহাসে এইরূপ বিবাদ নূতন নহে। ইংলণ্ডে স্পেন্সর ও সেক্‌সপীয়র যুগে এবং লে'হাণ্টের সময়ে, ফরাসীদেশেও যেমন রঁস্যার্দের (Ronsard) তেমন ভিক্টর হুগোর যুগেও ঈদৃশ হুজুগ দুই-দুইবার দেখা গিয়াছে; এবং, বলিতে হয়, প্রতিবারেই (ইতিহাসের চক্ষে) উন্নতিপক্ষের দলই ন্যূনাধিক জয় লাভ করিয়াছে। সাহিত্যজগতে শব্দের জন্মগত কোন জাতিভেদ কিংবা মাহাত্ম্যভেদ নাই; বাক্যপঙ্‌ক্তিতে উপস্থিত যোগ্যতা লইয়াই উহার আসল পদবী, এবং অর্থসামর্থ্যের পরিমাপেই যোগ্যতার পরিচয়। এই 'পরিচয়' দেখাইবে কবিগণের আবিষ্কারপটীয়সী প্রতিভা। মনে রাখিতে হইবে, শব্দশক্তির ক্ষেত্রে সৃজন বলিয়া কোন ব্যাপার নাই—আবিষ্কার। এক্ষেত্রে কেবল পরিবর্ত্তনবাদী অথবা রক্ষাবাদীর গোঁড়ামীতে

যেমন কুলাইবে না, তেমনি কেবল অহম্মুখ প্রমাণকর্ত্তৃত্ব অথবা 'হাম বড়া' ভাবের প্রভুত্বেও কাজ দেখিবে না। বঙ্গভারতীর শক্তিপ্রবৃত্তির বিপরীত পথে এই সাহিত্যের মধ্যে একটিমাত্র শব্দকে চালাইয়া দিবার জন্য আমাদের রাজরাজেশ্বর সম্রাটেরও ক্ষমতা নাই। প্রকৃত সাহিত্যসেবী জাতীয় বাক্‌প্রকৃতির নির্দ্দেশনা অনুসরণ করিয়াই চলিবেন। তবে, যিনিই কোন অপরিচিত বা অভিনব ভাবতত্ত্বের প্রদেশে ভাষার সাক্ষাৎশক্তিকে প্রসারিত করিতে যান, অথবা শব্দাভিধানের নব নব শক্তিমত্তা আবিষ্কার করিয়া যিনি 'জাতীয় ভাষা'র মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত করেন, তাঁহার অনেক ভুল হওয়া এবং উহার জন্য তিরস্কার ভোগ করাও সম্ভবপর। পরবর্ত্তিগণ ইংরেজী ভাষাক্ষেত্রে স্পেন্সর ও শেক্সপীয়রের সকল অভিনবতাই অনুমোদন করে নাই; পরকালের ইংরেজী ভাষা তাঁহাদের অনেক-কিছুই গ্রহণ করে নাই। তবু তাঁহারাই ত ইংরেজী ভাষা এবং সাহিত্যতরণীর কলম্বস; তাঁহারাই ত ইংরেজের জন্য সারস্বত শক্তির নব নব মহাদেশ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন! শিক্ষানবীশের পক্ষে সর্ব্ব সময় বিবাদক্ষেত্র পরিহারপূর্ব্বক চলাই যুক্তি হইতে পারে। গতানুগত ভাবে চলিবার জন্যই ধাৎ হইলে, অথবা প্রতিভাবহ্নির মধ্যে কোনরূপ উদ্দীপ্ততা বা দুর্দ্দান্ততা না থাকিলে, যেমন মাহাত্ম্যলাভের সম্ভাবনা হইতে নিস্তার ঘটে, তেমনি কেলেঙ্কারের হস্ত হইতেও মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু কলম্বসধর্ম্মিগণকে কোনমতেই ত 'ভাল ছেলে' করিয়া ঘরের সীমায় আবদ্ধ রাখা গেল না! ইতিহাস সাক্ষী, ঐ দুর্ঘটনাটির মধ্যেই দেশের সৌভাগ্য। এই দিকে বঙ্গভাষার ক্ষেত্রে সামান্যমাত্র কাজ আরম্ভ হইয়াছে বই নহে। বলিতে পারি, বঙ্গীয় সাধুভাষার শব্দকোষের বিস্তার এখন যাবৎ বাঙ্গালীর জীবনের সহিত সমব্যাপক হয় নাই। প্রাত্যাহিক জীবনের মধ্যে আছে, ঘনিষ্ঠ ও হৃদয়ঙ্গম ভাবরূপে বর্ত্তমান আছে, অথচ প্রচলিত 'সাধু' আদর্শের ভাষায় উহার কোন স্বীকারিত সংজ্ঞা-শব্দ নাই—এমনতর বস্তুব্যাপার আমাদের অদৃষ্টে এখনও বিরল নহে। কোনরূপ শুচিবায়ুর গতিকে

আমাদের ভাষার এই কার্পণ্য ঘটিয়া থাকিলে, তবে, সময় আসিয়াছে, উহাকে অচিরেই নিরস্ত করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের ভাষারুচির কেবল শুচিবায়ুই ত এই দৈন্তের কারণ নহে—বঙ্গভাষার কায়া-কাঠামের গঠনমধ্যেই অনেকদিকে দুর্ব্বলতা আছে; উহার দরুণ বঙ্গভাষা শেক্সপীয়র-জাতীয় নব নব দেশচারী ভাবুকতা ও নব নব উল্লেখশালিনী বাক্যপ্রতিভার প্রতীক্ষা করিতেছে। বঙ্গ ভাষার সমস্ত Idiom, ইহার প্রসিদ্ধপ্রয়োগ বা রূঢ়িপ্রয়োগগুলিও এখন পর্য্যন্ত পরিমাপিত এবং সংগৃহীত হয় নাই; অথচ এসমস্ত রূঢ়ির মধ্যেই বাঙ্গালীর মাতৃভাষার প্রধান বিশেষত্ব এবং শক্তি। সংস্কৃত শব্দাভিধানে সে শক্তি মিলিবে না। বলিতে কি, সংস্কৃতভাষা স্বয়ং, বোধ করি উহা 'সংস্কৃত' হইয়াছিল বলিয়া এবং কালক্রমে কেবল 'মজিলিশি ভাষা' রূপে দাঁড়াইয়া ছিল বলিয়াই, উক্ত Idiom বিষয়ে খুব প্রতিপত্তিশালী বলিয়া মনে হয় না; হয়ত সংস্কৃতের উপসর্গ ও প্রত্যয় বা অব্যয়গুলিতে অনেক অভাব পূরণ করিয়াছিল। যেরূপেই হোক, ভারতের বর্ত্তমান 'জাতীয়ভাষা'সমূহের মধ্যে বাঙ্গালীর ভাষার যাহা বিশেষত্ব, বাঙ্গালী-জীবনের ও বাঙ্গালীর মতিগতির যাহা পরিচিহ্ন-লক্ষণ, তাহাকে প্রকাশ করিতে গেলে সংস্কৃত অভিধানগ্রন্থ হইতে কোন সাহায্য মিলিবে না। বাঙ্গালীকে 'জাতীয় সাহিত্য' গঠন করিতে হইলে 'জাতীয় ভাষা'র উপর নির্ভর ব্যতীত অন্য উপায় নাই; বঙ্গের সাহিত্যভাষা যাহাতে একেবারে গ্রাম্য অথবা প্রাদেশিক না হয়, অথচ উহার সাহায্যে সর্ব্বশ্রেণীর বাঙ্গালীর সমস্ত ভাবচেষ্টা যাহাতে সোজাসুজি প্রকাশ পাইতে পারে; উহার সাহিত্যও যাহাতে একেবারে আলাপী কথা-কাওয়াজের লিপি-চেষ্টা না হইয়া ভদ্রশ্রেণীস্থ হইতে পারে, সকল সাহিত্যসেবীকে সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়াই চলিতে হয়। ইহা বলা একেবারে বাহুল্য যে, সকল জীবনশালী সাহিত্যের সচেতন লেখক মাত্রেই উক্ত আদর্শে চলিয়া থাকেন।

যেমন সাহিত্যে কোন লেখকের নিষ্ফলতার প্রথম হেতু রূপে

নির্দ্দেশ পারি, তেমন মানুষে মানুষে অমর্ষ এবং বিবাদবিসংবাদের প্রধান কারণ রূপেও উল্লেখ করিতে পারি একটি অভাব—শব্দশক্তি-জ্ঞান ও উহার প্রয়োগে নৈপুণ্যের অভাব। মানুষের আবাল্য শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য প্রকৃত প্রস্তাবে ভাষাশিক্ষা, ভাবের প্রকাশযোগ্য শব্দ এবং উহার প্রয়োগশিক্ষা। অথচ এ স্থলেই মানুষের নিয়ত ভ্রম এবং প্রধান কার্পণ্য। শ্রেষ্ঠ কবি ও লেখকের সকল বিশিষ্ঠতার মূলেই গূঢ়ার্থ এবং অব্যর্থ শব্দপ্রয়োগ। কবিগণ অগম্য লোকে প্রবেশ পূর্ব্বক দুরধিগত সত্য ও ভাবকে বাণীমুষ্টিতে আয়ত্ত করিয়া আমাদের সমক্ষে আনিয়া দিতেছেন—এই শক্তি ব্যতীত মানুষের সকল দর্শন, বিজ্ঞান ও কাব্যের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইত। সুতরাং শব্দরীতি-শিক্ষা মানুষের সকল শিক্ষার গোড়ার কথা; অথচ এ'ক্ষেত্রেই অধিকাংশ মানুষের ব্যর্থতা! আবার, এমন লোকও আছেন, যাঁহারা হয়ত এক শ্রেণীর 'বড় লোক' বা কেবল 'কাজের লোক'। যাঁরা জীবনে কখনও ভাবযোগ ও শব্দসাধনার জন্য মাথা ঘামান নাই; প্রত্যক্ষের বাহিরে যাঁহাদের কেবল 'শূন্য'; যাঁরা ভুলেও পরলোকের বা জীবের অদৃষ্টের কোন রহস্য চিন্তা করিয়া চিত্তের শক্তিব্যয় করেন নাই; যাহাদের কিছুমাত্র আন্তরিক বা আত্মিক জীবন নাই—কেবল বাহিরের বৈঠকখানাতেই বাস করিয়া চলিয়াছেন; যাঁহাদের নিকট সুখদুঃখও কেবল আফিসের জামা পরিয়াই যাতয়াত করে, মনে কদাপি দাগ ফেলে না। ঈদৃশ ব্যক্তির জন্য 'সারস্বত সাধনা' নহে। যাঁহারা যেন কেবল ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া, অথবা অর্দ্ধঘুমে-অর্দ্ধ-চৈতন্যে যেমন জীবনপথে তেমন জ্ঞানপথেও চলিতেছেন, মাতৃভাষার শব্দশক্তিকে সচেতন ভাবে আয়ত্ত করেন নাই, তাঁরা যেমন নিজের মনকে সার্থক ভাবে প্রকাশ করিতে পারেন না, তেমন পরের মনকেও বুঝেন না।

৩৩। সাহিত্যে শব্দশক্তি সাধনা।

শব্দশক্তির সদ্‌ব্যবহার, যাহা গ্রীক ও লাটিন সাহিত্য হইতে শিখিয়া ফরাসী লেখকগণ সাহিত্যজগৎকে দেখাইয়াছে, বিশ্বসাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। ফেনিলন্ যাহাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন "Vivid, Down-

right, Fresh, Pointed" শব্দগুলি, Amyot হইতে আরম্ভ করিয়া La Fontaine প্রভৃতি সেই শক্তিসাধনার পথেই ফরাসী ভাষাকে অগম্যাস্থ করিয়া গিয়াছেন। শব্দের 'শক্তি' বিষয়ে La Fontaineএর একটি কথা মনে গাঁথিয়া যায়—

"The word though rather unrefined
Has yet an energy we ill can spare !

ফরাসীসাহিত্যে Amyot, Malherbe, Buffon, Andrechenier, Ronsard, La Rochefecaud, La Bryuire, La Fontaine প্রভৃতি শক্তিশালী লেখককেই শব্দের সার্থক ব্যবহার বিষয়ে এত ব্যস্ত দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনে হয় উহাতেই তাঁহাদিগকে সাহিত্যজগতের শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর শব্দশক্তিসাধকরূপে এবং ফরাসীভাষাকেও মনুষ্যবাণীর গৌরবোত্তম পদবীতে উত্তোলিত করিয়া গিয়াছে। ফরাসী লেখকগণ তাঁহাদের ভাষার শক্তিগৌরবে গর্ব্বিত; উহার পবিত্রতা রক্ষার্থেও উৎসাহিত—সার্থক তাঁহাদের গর্ব্ব এবং উৎসাহ !

পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি, যাঁহারা নিজের 'জাতীয় ভাষা'কে উন্নত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যে কোন নূতন শব্দসম্ভার একেবারে 'সৃষ্টি' করিয়া গিয়াছেন এমন নহে; স্বদেশের বাণীভাণ্ডার মধ্যে অন্যের অপরিদৃষ্ট শব্দশক্তির মহিমা কেবল আবিষ্কার করিয়াছেন, এই মাত্র। এ ক্ষেত্রে মণ্টেনের উক্তিটাই স্মরণ রাখিতে হয়—

"The handling and utterance of fine wits is that which sets off language, not so much by innovating as by putting it to more vigorous and various services and by straining, bending and adapting it to them."

সুতরাং ইহা নির্ভয়ে বলিতে পারি যে, প্রকৃত শব্দশিল্পী নূতন শব্দ খুব কমই 'সৃষ্টি' করেন—করিতে অনিচ্ছুক। তবে তাঁহারা অনন্যসাধারণ সূক্ষ্মদৃষ্টি লইয়া মাতৃভাষারণ্যে ভ্রমণ করেন, মাতৃভাষার প্রাণপ্রকৃতি ও প্রতিভাতত্ত্ব আবিষ্কার করেন এবং সে প্রকৃতি অবলম্বনেই শব্দপ্রকৃতির

নব নব হরণপূরণ ও সংকলনের প্রণালীতে জাতীয় সরস্বতীর উদ্যানকে অচিন্তিত শব্দপুষ্পসম্ভারে পরিপূর্ণ রাখিয়া যান। তাঁহাদের আবিষ্করণী দৃষ্টিই পূজনীয়—পরিচিতের অন্তরেই অভিনবের আবিষ্কার।

পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং আবার বলিব, শব্দ মাত্রেই এক একটা Myth, এক একটা স্বতন্ত্র জীব; প্রত্যেকের মধ্যেই একটা নিজস্ব প্রাণ ও জীবনী আছে। শব্দ কিরূপে Mythology সৃষ্টি করিয়াছে, এবং ফিরিয়া উহার দ্বারাই পরিপুষ্ট হইয়াছে, আর্য্যভাষা-বিজ্ঞানের এক বিস্তারিত অধ্যায় উহা দর্শাইতে নিযুক্ত আছে। ভাষার 'নাম'বাচক শব্দেরই কত শক্তি! উহা হইতে কত প্রকার বিশেষ্যবিশেষণের ও ক্রিয়া-বিশেষণের উৎপত্তি! শব্দের এই 'হৃদয় মন ও জীবন'প্রিয় কোন লেখকের উৎপত্তি এবং প্রকৃত শব্দশিল্পী কোন কবির জন্মগ্রহণই ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে একটা পরম সৌভাগ্যসূচক ঘটনা। যে ভাষা উচ্চাঙ্গের ভাবুকতা ধারণা করার সামর্থ্য লাভ করিয়াছে, যে ভাষায় উচ্চ-শ্রেণীর ভাবুক ব্যক্তি জন্মধারণ করিয়া মানবদৃষ্টির সমক্ষে অনন্ত মুখে আভাসিত জগতের রহস্যতত্ত্বকে নির্ব্বচনীয় অথবা শব্দশক্তিতে অভিব্যঞ্জিত করিতে পারেন, সে ভাষাই কোন মহাজাতির প্রকৃত মাতৃকা রূপে কাল-স্রোতে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারে। ইতিহাস বলিতেছে, বহু 'জাতীয় ভাষা' ও সাহিত্য ঈদৃশ একটিমাত্র লেখকের জন্মফলেই সচেতন হইয়া মাহাত্ম্যসাধনার পথে অনেক অগ্রগামী হইয়া গিয়াছে।

শব্দশিল্পী জাতীয় ভাষার প্রচলিত শব্দপ্রকৃতির মধ্যে কিরূপে এই 'নবশক্তি' আবিষ্কার করেন, সে বিষয়ে জগতের একজন শ্রেষ্ঠ ভাষাশিল্পী রঁস্যার্দের উক্তিই পরম 'প্রমাণ' রূপে উপস্থিত করিব। উহা যে ভাষার নব নব অর্থশক্তি এবং অলঙ্কারশক্তির আবিষ্কার পক্ষে একটা পরম সার্থক প্রণালী তদ্বিষয়ে আমাদের অণুমাত্র সন্দেহ নাই—

"You must frequent the company of workmen of every trade, of the calling of the sea, of the art of venery and falconry and particularly of artisans who employ fire,

goldsmiths, metal founders, blacksmiths and metalworkers and you will get from them many and excellent and vivid figures of speech and the right names used in crafts and this will enrich your work and perfect it and render it the more pleasing."

রঁস্যার্দ্যে যে শব্দশিল্পীর সম্বন্ধে একটা পরম কর্ম্মযুক্তির পথ কার্য্যকর ভাবে দেখাইয়া দিলেন, তাহাতে সন্দেহ হয় কি? এ দিকে সাধক মাত্রকে ত শিল্পীদের বিভিন্ন পরিভাষা হইতেই সাহিত্যবাণীর শক্তি, সত্যযুক্তি এবং অলঙ্কারের রহস্য শিক্ষা করিতে হয়! সাহিত্যশিল্পী এইরূপে মাতৃভাষার দূরদূরান্তর গলিঘুঁজিতে পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া নব নব ভাববত্তা ও অর্থশক্তির ব্যক্তিত্বশালী শব্দ আবিষ্কার করিবেন; শব্দের অধুনাবিলুপ্ত কিংবা গর্ত্তসুপ্ত শক্তিকেও উদ্ধার করিয়া আনিবেন; শব্দের রসাত্মা স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া তাহাকে বিস্তারিত করিতে, অর্থান্তরে উপন্যস্ত করিতে, নানা সম্ভবপর দিক্ হইতে উহার অর্থকে দোহন করিতে চেষ্টা করিবেন; তখন, তাঁহার মুখে শোনা মাত্র, আমরা অপরিচিত অথবা দূরপরিচিত শব্দচরিত্রেও অচিন্তিত অর্থশক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াই চিত্তপ্রসার ও চমৎকার লাভ করিব। শব্দ ত ভাবের রূপক! সাহিত্যজগতের সকল প্রতিভাবান্ কবি বা লেখকের প্রধান লক্ষণ এই যে, যেমন তাঁহাদের ভাবের পুঁজি তেমন তাঁহাদের শব্দের পুঁজি এবং উহাকে নিজের মতলব মতে কাজে লাগাইবার শক্তিটুকুও অসাধারণ। ইহার নামও হয়ত মোটা কথায় Style. Vivid, downright, fresh and pointed কথা বলিতে পারা সাহিত্যজগতে একটি মহাশক্তি। মাতৃভাষার ক্ষেত্রে এই শক্তি লাভ করিতে হইলে প্রাধান্যতঃ মেলায়, মজলিসে এবং বাজারে 'আড়ি পাতা'র অভ্যাসটুকু চাই। সাধারণ লোকের মুখেই সরস্বতী সহজসৌন্দর্য্যে লীলা করিতেছেন। চলিত ভাষাই সকল ভাষাশক্তির মূলাধার; উহার উপরেই সকল সভ্যজাতির

বিপুল সাহিত্যহর্ম্ম্য দাঁড়াইয়াছে। তবে চলিতভাষা অনেকশঃ চঞ্চল ও অনেক সময়েই 'চোরাবালি' ব্যতীত আর কিছুই নহে; চঞ্চলতার লীলা মধ্যেই নিয়মের অচল অটল সংঘাতশিলার স্থির প্রতিপত্তিকে পরিচিহ্ন করিয়া ধরা লইয়াই শব্দশিল্পীর মাহাত্ম্য। ভাষায় 'সামান্য'শব্দের তত বল নাই; বিশেষ শব্দেরই বিশিষ্ট শক্তি। এজন্য প্রকৃত সাহিত্যসেবীকে বিশেষবিদ্ এবং সর্ব্বভাষী হইতে হয়। দুঃখের বিষয়, এতদ্দেশে আমরা শিল্পপরিভাষার কোন স্বতন্ত্র কোষগ্রন্থ এখন পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কিন্তু বুঝিতে হইবে, বঙ্গদেশের অশিক্ষিত জনসাধারণই অন্ততঃ এক দিকে এই বঙ্গভাষার প্রকৃত দ্রষ্টা ও স্রষ্টা; প্রতিভাবান্ শব্দশিল্পী উহার রহস্য বুঝিয়াই সাহিত্য-সরস্বতীর পুঁজি বাড়াইয়া চলিলেন; যেমন মাধুর্য্যের, তেমনি উহার ওজঃ এবং প্রসাদ গুণের পুঁজিও বাড়াইতে লক্ষ রাখিবেন। কোন ভাষার প্রকৃত মাধুর্য্যগুণের রহস্যকে চলিত ভাষার সহজসিদ্ধ পদবিন্যাসের মধ্যেই খুঁজিতে হয়। মায়ের কোলে বসিয়া 'মেয়েলী ছড়া'য় যে ভাষা কপচাইয়া আসিয়াছেন, অন্তর্দৃষ্টিশালী শব্দশিল্পী উহার মধ্য হইতেই মাতৃভাষার চিরন্তন মাধুর্য্যের ধমনীধারা আবিষ্কার করিয়া বসেন।

বলিয়া আসিয়াছি যে সাহিত্যে 'প্রতিভা' নামক বস্তুটী জন্মসিদ্ধ এবং উহা কোন মতে শিক্ষণীয় নহে; সাহিত্যসেবীর পক্ষে প্রধান শিক্ষাস্থল ভাষা, যাহা হইতে তাঁহার 'রীতি'। এক্ষেত্রেই লক্ষ্য করিতে হয় যে, অনেক লেখক তাঁহাদের 'মনের কথা'টা যেন কদাপি প্রকাশ করিতেই চাহেন না—নিজের মর্জ্জি গতিকেই হয় ত উহা পারেন না; কেহ কেহ যেন কেবল অলঙ্কারের উপর অলঙ্কার চড়াইয়া নিজের মনোভাবকে বরং গোপন করিতেই চেষ্টা করেন; কেবল অবান্তর বিষয়ের উপর জোর দিয়াই চলিতে থাকেন; প্রসঙ্গ কিংবা কবিতার একটা মনগড়া ও যতসম্ভব সুদূর 'শিরোনামা' দিয়া উদ্দেশ্য হইতে শত হস্ত দূরে দূরেই বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিয়া চলিতে থাকেন! রচনায় এ সমস্ত চরিত্রই প্রকৃত প্রস্তাবে 'রীতি'বিচারের আমলে আসে।

অনেকের রীতিসুন্দরী যাহা বলিতে চাহেন তাহার হয়ত কিছুমাত্র কদর নাই, কেবল বলিবার কায়দা, মুখচোখের ভঙ্গীবিলাস, হাতনাড়া এবং নথনাড়ার জোরেই আবিষ্ট রাখিতে চেষ্টা করেন! এই 'রীতি' ক্ষেত্রে সুতরাং (বাগ্মী বার্কের ভাষায়) যেমন Sunlight ও Moonlight এর পার্থক্য আছে, যেমন ঋজুতা ও কপটতার তফাৎ আছে, তেমন, মনস্তত্ত্বের দিক্ হইতেও, একটা জাতিগত তফাৎ আছে—বিচারবুদ্ধি বা Reason হইতে জাত 'রীতি' ও প্রাণ (Soul) হইতে জাত 'রীতি'। উভয়ের মধ্যে আকাশপাতালের ভেদ—বৈজ্ঞানিক 'ধাৎ' ও কবির ধাতের ভেদ। শব্দের, vivid, downright, fresh ও pointed শক্তির আবিষ্কার প্রাণই করিতে পারে; এবং এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞবর সেনেকার কথাটাই মনে আসে—"A fit word is better than a fine word." এরূপ প্রকাশরীতি সুতরাং 'মুন্শীয়ানা' বা 'পণ্ডিতী' রীতি ত নহেই, কথার পাকচক্রী বা মধুচক্রী ভঙ্গীও নহে। উহা Direct appeal এর পথ এবং শব্দশক্তির 'শরবৎ'রীতি—যাহাতে ভাষা 'হৃদয়গ্রাহী' হইয়া, সরলভেদী ও লক্ষ্যভেদী শরের মতই প্রাণতন্ময় হইয়া যায়। কি করিয়া তাহা হয়, তাহারও কেহ পথ দেখাইতে পারে না। বলিতে পারি, কবির প্রাণ ভাবে যখন তন্ময়তা লাভ করে, তখন সেই ভাবাবিষ্ট অবস্থার গর্ভ হইতেই কবির ভাষা অতর্কিতে আত্মবত্তা এবং প্রাণসিদ্ধি করিয়া ছুটিয়া আসে। উহাই প্রকৃত কবির এবং শ্রেষ্ঠ কবিতার শব্দশক্তি ও ভাব-রীতি। এই অনির্ব্বচনীয় শরশক্তির মধ্যেই শ্রেষ্ঠ কবিবাণীর মহিমা, যাহাতে পাঠকের আত্মা "তদ্ভাবভাবিত" হইয়াই "শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ।"

এইরূপ 'রীতি'র আত্মার নামই গদ্যের ক্ষেত্রে 'প্রাণ', কাব্যের ক্ষেত্রে 'রস'। প্রাণহীন গদ্য ও রসহীন কাব্য উভয়েই বহিশ্চর লেখক ও কবির কেবল বহির্ব্বাটীর ব্যাপার। অতএব রীতির প্রাণবত্তার ক্ষেত্রেও লেখক বা কবিমাত্রের প্রতি প্রধান কথা—"আত্মানং বিদ্ধি", "আত্মানং প্রাপ্নুহি।" এই মন্ত্র জীবের সকল ক্ষেত্রেই পরিব্যাপক মহার্থ লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। যেমন প্রাতিভদৃষ্টি ও প্রাণবত্তা লাভ করিতে হইলে

তোমায় নিজকে জানা ও নিজত্বকে পাওয়া চাই, তেমন ভাষা ও প্রকাশরীতির তরফেও নিজত্বকে পাইতে না পারিলে সাহিত্যে প্রকৃত মাহাত্ম্যই দাঁড়ায় না। নিজকে পাইতে হইবে পরের অনুকরণে নহে, বিষয়ের সঙ্গে সম্মুখ সংসর্গের ও প্রাণের যোগপথে এবং আত্মপ্রকৃতির অনুসরণে। আপাতদৃষ্টিতে ইহা একটা 'অহমিকা' বলিয়াই দেখাইবে। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে অহংতার পথই সর্ব্বতাসিদ্ধির পথ। যাহার অহংতা সুসিদ্ধ হয় নাই, সাহিত্যের অমৃতরাজ্যে তাহার প্রবেশ নাই। সাহিত্যে সকল মৌলিকতার মূল বিধিমন্ত্রই নির্দ্দেশ করিতে পারি—

আত্মনিষ্ঠ, আত্মপ্রিয় হও আত্মবল !

কবিগণের অহংতা এত প্রবল যে, 'কথার বেপারী' কবিগণ শব্দের রসে এবং তৎসঙ্গে ভাবযোগ-আবিষ্কারের আনন্দবশে এমন আত্মহারা হইয়া পড়িতে পারেন যে উহা অত্যন্ত কৌতুককর হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহারা ভাবের সঙ্গে শব্দধ্বনির সুযোগী একটি কথা মাত্র আবিষ্কার করিয়া আত্মশ্লাঘায় যেন নিজকে একেবারে সমগ্র পৃথিবীর অনভিষিক্ত সম্রাটের মতই মনে করিয়া বসেন! "তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যোহি যস্য প্রিয়ো জনঃ" আবিষ্কার মাত্র ভবভূতি অকস্মাৎ উল্লম্ফনে আপনাকে আহত করেন বলিয়া যে কিংবদন্তী আছে, উহা একেবারে কল্পনা না হইতেও পারে। ভবভূতিকে জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত প্রত্যুত্তর পাইতাম যে, ওইরূপ ভাবসংযোগী কোন শব্দমন্ত্র হাতে পাইয়া যে কবি মনের আনন্দে "উঠেছে মাথা মোর মেঘের মাঝখানে" বলিয়া আস্ফালন না করে, সমগ্র পৃথিবীর সম্রাট্-সমতুল্য চিত্তদর্পে উদ্দীপ্ত হইয়া না উঠে, সে কদাপি 'কবি' নহে। ইহা একটা বেয়াড়া অহমিকা সন্দেহ কি? কিন্তু অকিঞ্চন কবিগণের এই নিরীহ অহমিকা হইতেই ত মানবের জ্ঞান ও ভাব-সম্পত্তি চিরকাল অজ্ঞাত এবং অগম্যের গহনগর্ভে মনুষ্যচিত্তের অধিকার-বৈজয়ন্তী অগ্রসর করিয়া চলিয়াছে! 'অগ্রসর, অগ্রসর!' ইহাই আলোকের সেনাপতিগণের মুখ্য মন্ত্র। অনেক কবি হয়ত স্বজাতির

হস্তে কয়েকটি কথা মাত্র রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু মহাকাল উঁহাদের কদর ওজন করিয়া শেষ করিতে পারে নাই।

এদিকে শ্রীযুক্ত হেরল্ড্ মুনরো সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বাক্যশিল্পী অপিচ ভাবশিল্পীর গুণসমুচ্চয় যে ভাবে সমাহরণ ও নির্ব্বাচন করিয়াছেন তাহাই মহার্থবোধে উদ্ধৃত করিতেছি—

"Accurate observation, close enquiry, a respect for detail, selection, condensation, rejection of the unnecessary, choice of image, phrase or rhythm, æsthetic honesty, literary candour, local truth, Psychological accuracy, prudent management of Rhyme, economy of epithet, love of the true substantive, pleasure in the right verb, imaginative curiosity, the joy of the new philosophical discovery, the adventure of the new Metaphysical speculation, the humility or courageous ardour of religious doubt, and finally toleration of all these qualities and attributes when examplified in his contemporaries."

সাহিত্যে উচ্চশ্রেণীর শিল্পীমাত্রেই মাতৃভাষার অর্ণবজলের গভীর-গাহী ডুবারী, শব্দসমুদ্রে আত্মপ্রকাশের উল্লাসে বিলাসে ডুবিয়া ভাসিয়া পরম বলদৃপ্ত ও উৎসাহমত্ত সন্তরণকারী। শব্দের সুর ও ছন্দের প্রতি, শব্দের সাক্ষাৎসঙ্কেত ও ধ্বনির প্রতি অসাধারণ প্রেম শ্রেষ্ঠ কবিমাত্রের প্রধান ধর্ম্ম। শব্দ হইতে উহার ঘনিষ্ঠ ও চূড়ান্ত মধুটুকুন নিষ্কাশিত করা ব্যতীত কবিগণের তৃপ্তি নাই। ইহা ভাবুক ব্যক্তিরও প্রকৃতি। শব্দ ব্যতীত ভাব নাই, ভাব ব্যতীত শব্দও আসে না—সুতরাং শব্দ ও ভাব কবিত্বের এ-পিঠ ও-পিঠ। শব্দের বুকের মধ্যে লুকাইয়া আছে উহার মধুরূপী ছন্দ ও ভাব। ঐরূপ মধুময় একটি মাত্র শব্দ আবিষ্কার করিতে পারিলে কবির যাহা আনন্দ, কলম্বসের আমেরিকা-আবিষ্কারের আনন্দ হইতে বলবত্তায় উহা কোন দিকে কম নহে।

বাস্তবিক শব্দের হৃদয়ে, এবং উহার অর্থশক্তির মধ্যেই ত ভাবের এক একটি 'নূতন মহাদ্বীপ'! এই মহাদ্বীপ কতকাল বর্ত্তমান আছে, শব্দব্রহ্মরূপী 'সর্ব্বজ্ঞ' বা বিশ্বজ্ঞাতার মর্ম্মমধ্যে, আমার মাতৃভাষার হৃদয়ার্ণবে নিত্যকাল আছে, আর আমি এতকাল তাহা টের পাই নাই! জগতে যাহা হইয়াছে, হইবে, শত শত কবি পরকালে আসিয়া যাহা আবিষ্কার করিয়া যাইবে, তাহা ত 'আছে'! আমার মাতৃভাষার নিত্য আত্মার শক্তিভাণ্ডারে নিত্যকাল আছে! হতভাগ্য আমি, তাহা দেখিয়াও হয়ত দেখিতেছি না—এরূপ আকুলতার সহিতই কবি শব্দসিন্ধুর ডুবারী হইবেন; দেখিবেন শব্দের পশ্চাতেই ভাব আছে; বিশ্বের সকল ভাবুকের ভবিষ্যৎ ভাব ও চিন্তা, দেশ-কালের অতীত ক্ষেত্রেই বিশ্বজ্ঞাতা ভাষার শব্দশক্তির নিত্যভাণ্ডারগত করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। সকল মৌলিকতাগর্ব্বী কবির সকল ভাবচিন্তা ও শব্দ আমারই অজানিত সম্পত্তি, আমারই অনুপলব্ধ পরম আত্মার শাশ্বত-কালের পুরাতন!

প্রসঙ্গাধীন আমরা সাহিত্যের আর একটি সমস্যার সম্মুখীন হইলাম। সাহিত্যসেবার আদর্শ কি? সাহিত্যের বিষয়বস্তু কি হইবে? এ সকল প্রশ্ন বর্ত্তমান কালে বঙ্গদেশেও মুখর হইয়া উঠিয়াছে। বলিতে কি, এ সম্বন্ধে কোন সর্ব্বসম্মত পাকাপাকি আদর্শ বা 'বাঁধাগৎ' নির্দ্দেশ করা কাহারও সাধ্য নহে। তবে স্থায়ী সাহিত্যের উৎকর্ষলক্ষণ বিষয়ে সকলের মধ্যে এই একটি কথা দাঁড়াইয়াছে যে—উৎকৃষ্ট ভাবকে শ্রেষ্ঠতম আকার দান। অপূর্ব্ব, অশ্রুত বা অপরিজ্ঞাত সত্যকে দর্শনপূর্ব্বক ভাষাপথে উহাকে অনবদ্য এবং সমুৎকৃষ্টরূপে সামাজিকের রসানুভবগম্য করিয়াই সকল সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কৃতিসমূহ অমরত্ব অর্জ্জন করিতেছে।

৩২। সাহিত্যে ভাব এবং বস্তুর আদর্শ-সমস্যা।

এই আদর্শের সমীপবর্ত্তী হইতে হইলে লেখকমাত্রকে নিয়তভাবে সজাগ থাকিতে হয় যে, মনোভাবকে তাদৃশ সমুৎকর্ষ-আদর্শের পরিমাপসঙ্গত

করিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছি কি? নচেৎ সমস্ত চেষ্টাই স্থায়ী সাহিত্যের হিসাবে একবারে পণ্ড হইয়া যাইবে; ঐ সমস্ত কালস্রোতে রক্ষা পাইবে না; ভবিষ্যবংশীয়েরাও উহাকে আদর করিয়া বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য অগ্রসর হইবে না। উৎকর্ষবিষয়ে এইরূপে মোটামোটি কথা বলিয়া কোনমতে অব্যাহতি পাওয়া গেলেও, সাহিত্যের বস্তু কিংবা আকারের আদর্শ বিষয়ে কিছুতেই সহজে 'নির্ভাবনা' হওয়া যায় না। কেবল কি উচ্চ ভূমি, মহৎ বস্তু, উন্নতভাব, এবং শাস্ত্র-নির্দ্ধারিত কাঠাম বা আকৃতি অবলম্বন করিয়াই চলিব? সাধারণ জীবন, প্রাকৃত ভাব, সমাজস্থ নিম্ন-শ্রেণীর সংশ্রব পরিহার করিব? প্রাচীন সাহিত্যে, বিশেষতঃ এ দেশে প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রিগণ সাহিত্যের বস্তু এবং আকৃতিবিষয়ে অনতিক্রম্য 'বাঁধা গৎ' প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কাব্যের নায়ক "প্রখ্যাতবংশো রাজর্ষি র্ধীরোদাত্তঃ প্রতাপবান্" হইবে, কাব্যকেও 'এই-এইরূপে' গঠিত হওয়া চাই, ইত্যাদি মতে শাস্ত্রশাসন চালাইতে গিয়াছিলেন। উহাতেই সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক অপকার ঘটিয়াছে। সাহিত্যজগতে এখন আর এ সকল শাস্ত্র পদবী রক্ষা করিতে পারিতেছে না।

৩২। প্রাচীন Classic বা সমুৎকর্ষ-আদর্শ।

রিনেশাঁসের (Renaisance) বিশেষতঃ ফরাসী-বিপ্লবের পর হইতে ইয়োরোপে জনসাধারণের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রে 'বিষয়-বস্তুর কৌলিন্য' আদর্শকে নানাদিকে নিগ্রহ করিয়াই প্রকৃতবাদ ও প্রাকৃতবাদের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। উহার গতিকে সাহিত্যের পূর্ব্ব-প্রচলিত 'রীতি,' 'আকৃতি' এবং 'উৎকর্ষের আদর্শ' যেন দিগ্‌বাজী খাইয়া একেবারে উল্টিয়া দাঁড়াইয়াছে। মানুষের ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতিকে পশ্চাৎ করিয়া, এমন কি প্রকাশ্যভাবে একেবারে পদদলিত করিয়াই, সে দেশের অনেক সাহিত্যিক যেন "মত্তকরিসম" চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

৩৩। আধুনিক ইয়ুরোপীয় সমাজ ও সাহিত্যে আধুনিক আদর্শ।

কতদিক্ হইতে কতভাবে ঘোষণা হইতেছে, সাহিত্যের আদর্শ কেবল 'ভাল লাগা।' সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম ও নীতিনিয়মকে, এমন কি ব্যাকরণ এবং ন্যায়যুক্তিকে তাচ্ছীল্য করিয়া কিংবা উড়াইয়া দিয়াও 'মিষ্টি' লাগিলেই হইল! অন্যদিকে, কবিপ্রতিভার পক্ষিরাজ ঘোড়াকে একেবারে মাটিতে নামাইয়া আনিয়া মাঠে ময়দানে চরান' হইতেছে; গৃহ-প্রাঙ্গণের অহরহঃ জনপদনিষ্পিষ্ট খড়কুটায় এবং সাঁচের কানাচের আবর্জ্জনায় আনন্দিত হইবার জন্যও তাহাকে অভ্যস্ত করান' হইতেছে। এ প্রণালীতে আধুনিক সাহিত্যে একটী নব পদ্ধতির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে—প্রকৃত প্রস্তাবে উহার নামই 'নবেল'। মানুষকে একেবারে অনাবৃত এবং উলঙ্গ করিয়া, অনুবীক্ষণ-সাহায্যে তাহার নগ্ন, বন্য প্রকৃতি এবং জঘন্য স্থানগুলি পর্য্যন্ত চুনিয়া চুনিয়া পরখপূর্ব্বক আনন্দ লাভ করিতে, তাহার পাপ বা রোগস্থান এবং হৃদয়ের সুগুপ্ত ক্ষতস্থানগুলিতে পর্য্যন্ত ফিরিয়া ঘুরিয়া মাক্ষিকবৃত্তি করিতেই নবেল-লেখকগণের অসাধারণ শক্তিব্যয়, অভাবনীয় ধৈর্য্য, অপরিসীম উল্লাস! সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'প্রাকৃত' বলিয়া কোন ঘৃণাবাচক কথা আর নাই। এ সমস্ত আধুনিক সাহিত্যের প্রবল লক্ষণ। সমাজে সাধারণ শক্তির এবং রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও গণতন্ত্রের অভ্যুদয় হইতে, সবিশেষ সাধারণী শিক্ষার বিস্তার এবং মুদ্রাযন্ত্র, রেলোয়ে প্রভৃতি যুগশক্তির প্রসার হইতেই সাহিত্যের এই 'আধুনিক লক্ষণ' দিগ্‌বিজয়ী হইতেছে; সুধীগণের পূর্ব্বপূজিত শালীন্য এবং কৌলিন্যের গৌরবান্বিত আদর্শও নানাদিকে বিপ্রতিষ্ঠ হইয়া এবং বিগড়িয়া যাইতেছে। এই অর্ব্বাচীনকে এখন অস্বীকার করার যো নাই, এবং অস্বীকার করিয়াও ফল নাই।

৩৪। উহার বিশ্বব্যাপী প্রসার।

আমাদের ঘরের দিকে দৃষ্টি করিলেই দেখিব যে, এই বঙ্গদেশের এবং বঙ্গসাহিত্যের মধ্যেই গত দশ বৎসরে মহা পরিবর্ত্তন আসিয়াছে! বঙ্গভাষার ন্যায় বঙ্গসাহিত্যও এখন আর কেবল 'হিন্দু' কিংবা 'ব্রাহ্মণ্য' লক্ষণাক্রান্ত নহে। নানাসমাজের, নানাধর্ম্মের নানাসাহিত্যের

রীতিপদ্ধতি নানা উদ্দেশ্যে এবং অভিসন্ধিতে পরিচালিত হইয়া দেশের মধ্যে মহাবন্যার স্রোতোমুখে প্রবেশ করিতেছে। সাহিত্যসেবিগণের স্বাধীন প্রবৃত্তিমুখে, অনুকরণের বিকারে অথবা মৌলিকতার অহঙ্কারে প্রচণ্ডভাবে এবং ঘোর রবে প্রেরিত হইয়া অনেক নীতি-ধর্ম্ম-সমাজ-দ্রোহী, আত্মদ্রোহী এবং বিশ্বদ্রোহী রচনাও আত্মপ্রকাশ করিতেছে। দেশের হৃদয় এইদিকে নিজের শেষ পর্য্যন্ত না গিয়া ক্ষান্ত হইবে না। সাহিত্যের দিব্যলোকবাহিনী গঙ্গানদী এখন মর্ত্ত্যলোকে—নিম্নবঙ্গের সমতল ভূমে নামিয়া আসিয়া প্রত্যেক বাঙ্গালীর দ্বারদেশে আপনাকে বিলাইয়া চলিয়াছেন; একহস্তে জীবনদান করিয়া অন্যহস্তে জীবন গ্রহণ করিতেছেন; একহস্তে দেশদেশান্তরের আবর্জ্জনা বহিয়া আনিয়া, অন্য হস্তে এদেশের আবর্জ্জনাও বহিয়া চলিয়াছেন।

৩৫। বঙ্গ-সাহিত্যে উহার প্রভাব।

ইহার বিরুদ্ধবাদী হইয়া ফল নাই; সাহিত্যের সমুন্নত আদর্শ খর্ব্ব হইতেছে বলিয়াও দুঃখিত হইবার কারণ নাই। চিরনীরব মহাকাল স্বয়ং সাহিত্যের রক্ষক এবং চিকিৎসক; যুগশেষে সকল অমঙ্গল আবর্জ্জনায় উপরে অতর্কিতে সম্মার্জ্জনী প্রয়োগ করিয়া দুগ্ধস্নান-সমাধানপূর্ব্বক সর্ব্বশুক্লা সরস্বতীর শাশ্বতমূর্ত্তিকে তিনি খালাস করিয়া লইবেন। শিবাকাঙ্ক্ষীর পক্ষে এখন কেবল সম্যগ্‌দৃষ্টির সাহায্যে আপন তত্ত্বে স্থির থাকিয়া চলিতে পারাই প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। পাঠককেও উপস্থিত মতে সম্যগ্‌দর্শী হইয়া এবং সমুদ্ধভাবেই চলিতে হইবে। তবে এই অবস্থায় লেখকের, বা স্বয়ং সাহিত্যসেবকের সবিশেষ কর্ত্তব্য কি? আমাদের কথাগুলির দিকে এতক্ষণ মনোযোগ দিয়া থাকিলে ইহার সদুত্তর করা কিছুমাত্র কঠিন নহে। সাহিত্যসেবী চিরকাল আপন হৃদয়ে অনুভূত, আত্মদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষীকৃত এবং (পারেন ত) আপন জীবনে অনুজীবিত পদার্থই বিষয়রূপে অবলম্বন করিবেন। বাহির হইতে তাঁহার

৩৬। সাহিত্যসেবীর একমাত্র কর্ত্তব্য স্বপ্রবৃত্তির অনুসরণ।

অন্য কোন শাস্ত্রশাসন নাই। তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে অকপট হইয়া আপন অন্তরাত্মরূপী প্রভুর ইঙ্গিতের দিকে কান রাখিয়াই চলিতে হইবে; অন্তর্দ্দর্শী হইয়া, আপন চরিত্রের আন্তরিক প্রবৃত্তি অনুসরণ করিয়াই তাঁহাকে অবশ্য অবশ্য চলিতে হইবে। সুতরাং এক্ষেত্রে আত্মপ্রবৃত্তি 'ভাল-মন্দ' 'শিব' 'অশিব' যাহাই হউক, তাঁহাকে উহার বাধ্য থাকিয়াই বিষয়-নির্ব্বাচনপূর্ব্বক, ওই নির্ব্বাচনের সমস্ত অদৃষ্টই মানিয়া লইতে হইবে। উহার ফলে হয়ত, সংসারের হেয় ও অবজ্ঞেয় কিংবা উপাদেয় হইবেন, সে ক্ষেত্রে অন্য কাহাকেও দায়ী না করিয়া সকল বিকল্পই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই হইল সাহিত্যজীবনের পরিচালনতত্ত্ব—সারস্বত সাধনার মর্ম্ম।

বলিতে পারি, এ সম্বন্ধেই একটি মন্ত্রকথা প্রচলিত আছে—Art for Art's sake; কোন কোন কবিও উহা উচ্চারণ করিয়াছেন। কিন্তু উহার অর্থ বুঝিতে যে পাঠকসাধারণ নিয়ত ভুল করেন, তাহাই 'সাহিত্যে শিব'প্রসঙ্গে দেখিয়াছি। ফলতঃ উহা কবিগণের ঘরের কথা—যে ধর্ম্মবশে তাঁহাদের প্রাণের কারখানায় সাহিত্যশিল্পের 'সৃষ্টি' ঘটিয়া থাকে, সামাজিকগণের কর্ণে তাহারই ঘোষণা; উহার মধ্যে পাঠকের সমক্ষে সাহিত্যবিচারের কোন আদর্শ আক্ষিপ্ত করার কিছুমাত্র অভিসন্ধি নাই। আত্মপ্রাণে 'অপরিহার্য্য' বলিয়া, আত্ম-প্রকাশের রসপ্রেরণা দুর্নিবার বলিয়াই কবিগণ রসসাহিত্যের সৃষ্টি করেন, প্রকৃতপ্রস্তাবে আপনাকে খালাস করেন ব্যতীত অপর কিছুই নহে। কথাটার মধ্যে আছে, প্রকৃতপ্রস্তাবে কবির দিক্ হইতে শিল্পসাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্বের প্রণালী-নির্দ্দেশ।

সুতরাং, খোলাখুলি নির্দ্দেশ করিতে হয় যে, আমি যদি অন্তরে পাপিষ্ঠ প্রকৃতির মানুষই হই, তবেও, প্রকৃত সারস্বত হইতে হইলে, আমাকে আপন তত্ত্বের অনুগত থাকিয়া পাপিষ্ঠ-শিল্পই সৃষ্টি করিতে হইবে; এবং উহার গতিকে যদি সমাজের শাস্তি পাইতে হয় তাহাও বরণ করিতে হইবে। সমাজও উহার শাস্তি অবশ্যই দিবে—

দেওয়াই উচিত। কিন্তু সাহিত্যসেবীকে তথাপি কপটাচার বা মিথ্যাচার হইতে হইবে না। জোর করিয়া নিজের প্রাণকে পরকীয় ভাবদাসত্ব, কোনরূপ পারতন্ত্র্য কিংবা 'সাধুবুলি' গ্রহণ করাইতে গেলে সরস্বতী সেক্ষণেই বিদায় লইবেন। ইহারই নাম সাহিত্যিকের 'স্বধর্ম্ম' অনুসরণ—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

৩৭। নিজের সত্যরূপী ধর্ম্মকে এবং তাহার ফলাফলকে অপরিহার্য্য বলিয়া গ্রহণ।

আসল কথা, সাহিত্যে মহৎ ভাবের ভাবুক হইয়া মহৎ বিষয়বস্তু অবলম্বন করা, কিংবা উহাকে মনুষ্যের মহনীয় ভাষায় প্রকাশ করা— কিছুই জোর করিয়া কিংবা অভিসন্ধি করিয়া সিদ্ধ হয় না। দান্তে, মিলটন, শেক্সপীয়র, গ্যেঠে, হুগো, শীলার, হেবেল বা স্কট প্রভৃতি— যাঁহারাই সাহিত্যে ভাববস্তুর গৌরব অথবা শিল্পকৃতিত্বের মাহাত্ম্যে অমর হইবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, সেরূপ সৌভাগ্য নিজের 'আত্মা'পুরুষ অনুকূল না হইলে কদাপি ঘটিতে পারে না। সাহিত্যে ১ম শ্রেণীর সৃষ্টিপ্রতিভা লাভ করিয়াও অনেকে তৃতীয় শ্রেণীর গ্রন্থ রাখিয়া যান। আমরা যাহাকে সাহিত্যে 'মঙ্গল্য-আদর্শের চূড়ান্ত মাহাত্ম্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, বলিতে কি, আধুনিক ফরাসী সাহিত্যের অনেক প্রতিভাশালী শিল্পীর তাহা নাই। মনুষ্যের অধ্যাত্মকৌলিন্য, ধর্ম্মগত মাহাত্ম্য, বিশ্বনীতি বা সমাজনীতি বলিয়া কোন বস্তু তাঁহাদের নিকটে সবিশেষ কোন আমল পায় নাই। তাঁহারা খুঁজিয়াছিলেন কেবল 'সৌন্দর্য্য' বা 'ভাল লাগা'—উহাতেই আত্মপ্রকৃতির অদৃষ্টনিয়তি তাঁহাদিগকে গৌরবের চূড়ান্ত পদবী হইতে নামাইয়া রাখিয়াছে বলিয়া পদে পদে প্রতীতি হইতে থাকে। তবু, তাঁহারা 'মিথ্যাচার' ছিলেন না, তাই হয়ত, অবান্তর ভাবুকতা ও গুণযোগ্যতার তরফেই সরস্বতীর প্রচুর দয়ামৃত-লাভে বঞ্চিত হন নাই। উচ্চ সাহিত্যের রসনীতি অথবা জীবত্বের ধর্ম্মভূমির দিকে তাঁহাদের অচৈতন্য কিংবা বৈরভাব দেখিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে গেলে,

আজ ফরাসী সাহিত্যের গৌরব অনেক দিকেই ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে।

সুতরাং সাহিত্যসেবীর স্বধর্ম্ম, যেমন সরলতাকে বরণ, তেমনি আপনার সত্যানুসরণ। দেশের, কালের সকল অবস্থায়, পরের হুজুগে মত্ত না হইয়া সাহিত্যিকের ইহাই 'সাধন'। উহাতে যে স্থানে লইয়া যায়, তাহাই তোমার জীবনদেবতার বিধান বলিয়া মানিয়া লও। সাহিত্যিক প্রতিভার প্রধান মাহাত্ম্য—স্বাতন্ত্র্যে; চলিতে পারিলে উহাই অমরাপুরীর পথ। স্রোতে গা ঢালিয়া না দিয়া, সাধারণের রুচিদাসত্ব ও সমসাময়িক বাজারহাওয়া পরিহারপূর্ব্বক অনুপমভাবে তটস্থ ও আত্মস্থ থাকিয়াই সাহিত্যের কৃতিগণ আত্মমাহাত্ম্য সাধন করেন। সাহিত্যে এই আত্মনিষ্ঠা সুসমাহিত হইলেই উহার নাম হয় মৌলিকতা। Be faithful to yourself. আত্মদ্রোহী ব্যক্তি সাহিত্যের Outlaw—ললাটের লিপিতেই বিচার-সীমা হইতে নির্ব্বাসিত। সাহিত্যে ব্যবস্থাপত্র ধরিয়া, কি কোনরূপ ষড়যন্ত্র করিয়া কোন মহৎ কার্য্য সমাধা হয় নাই। সাহিত্যসেবীর পক্ষে আপনার জীবনতত্ত্বের অনুসরণেই বিষয়বস্তুর আবিষ্কার, বরণ এবং সমাধান অপরিহার্য্য হওয়া চাই। উহারই নাম স্বাধীনতা। "বিদ্বাংস্তত্র ন শোচতে"; "ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।" এইরূপ বিদ্বান্ এবং ধীর ব্যক্তির, এইরূপ আত্মসংস্থ এবং স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির কার্য্যই সাহিত্যে উপেক্ষা লাভ করে না। 'আত্মানং বিদ্ধি'; 'আত্মানমনুসর'। উহাতে তোমার শিল্পরচনা যদি আপন চরিত্রধর্ম্মে বিগর্হিত হইয়া যায়, তবুত প্রাণহীন অথবা ফাঁকা হইবে না! জোলা ও রেনল্ড্ বৃক্ষ হইতে যে ফল পাওয়া গিয়াছে, উহার আস্বাদ সহৃদয় ব্যক্তির রসনায় তিক্ত, মিষ্ট, কষায়, বিদাহী কিংবা সর্ব্বনাশী যাহা বলিতে হয় বল—তবু তাঁহারা সাহিত্যের Outlaw নহেন; তাঁহারা আপন জীবনের অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা-তত্ত্বে স্থির থাকিয়াই অকপটভাবে শিল্পরচনা করিয়া গিয়াছেন।

এই আদর্শে অকপট শিল্পরচনামাত্রই সাহিত্যে আহ্বান লাভ করে; সকল প্রকার সত্যদর্শনের জন্যই সাহিত্যে স্থান আছে, যদিও রচনার সমুচ্চ আকাঙ্ক্ষা, 'শ্রুতিফল' এবং চরম রসায়নী ঋদ্ধি দেখিয়াই চরমবিচার নিষ্পন্ন হয়। মনুষ্যজীবনের চিত্রশিল্পী হইয়া, মানবচরিত্রকে ভূয়োদর্শন এবং অধ্যয়ন করিয়া, ভাষায় তাহার অবিকল প্রতিকৃতি তুলিতে পার—সাহিত্য তোমাকেও সাদরে আহ্বান করিবে? জীবনের কেবল ফটোগ্রাফ, প্রকৃত জীবনের পাপতাপ জঘন্যতা অথবা দুঃখের ছবিও সাহিত্য তুচ্ছ করে না, সারস্বত পুরীর রাজকীয় মাহাত্ম্যে চিন্ময়ীর অধিকারে আসিয়া অত্যন্ত সাধারণ জীবনবস্তু পর্য্যন্ত অপরূপ মহিমা এবং ভাবাত্মিকতা লাভ করে; সুতরাং সাহিত্য একেবারে নিরেট, নিরাভরণ, নীরস সত্যকেও অবহেলা না করিয়া পারে। 'অশ্বারোহী ছুটিয়া চলিয়াছে' বা 'কর্ণফুলী বরকলের জলপ্রপাতে নিম্নভূমে ঝরিয়া পড়িতেছে'—শব্দশক্তির সাহায্যে কোনমতে উহার ফটোগ্রাফ লইতে পারিলে, কথার আকারে-ইঙ্গিতে-ভঙ্গীতে ভাবুকের মনে কোন মতে উহার সংবিৎ জাগাইয়া তুলিতে পারিলে, তুমিও একজন কারিকর; সাহিত্য তোমাকেও সম্মানের আসন উজাইয়া দিবে। বলিতে কি, ইংরাজী সাহিত্যের দুইজন কবি, ব্রাউণীং ও সাদে, দুইটি কবিতায় এরূপ সম্মান অর্জ্জন করিয়াছেন। বাণীর রাজ্যে আনিয়া বিশ্বজগতের পদার্থ-ছবি যে-কোনমতে ধরিয়া রাখিতে পার—অন্য মনুষ্যের মননসই ও রসবোধ-গম্য করিয়া ভাবিত করিতে পার, তবেই সাহিত্যের গণনীয় কিছু উপার্জ্জন করিলে। সূক্ষ্ম সত্যদর্শনের সহিত প্রবল পরিকল্পনা এবং প্রচণ্ড ভাবুকতার ও রসবত্তার সমাযোগকে সাহিত্য চিরকাল মহার্ঘ আসন দিয়া থাকে সত্য, কিন্তু নক্সার শক্তিকেও একেবারে উপেক্ষা করে না। এই কারণে আধুনিক কালের অনেক ভাব-দরিদ্র এবং চিন্তা-দুর্ব্বল নাটক-নবেল-গল্পও কেবল নক্সার সামর্থ্যেই সমসাময়িক সাহিত্যের দরবারে আসন পাইতেছে। আমরা বঙ্গসাহিত্যে মহার্ঘতার ক্ষেত্রে

৩৮। সাহিত্যে অকপট শিল্পরচনার স্থান।

বিস্তারিতভাবে সবিশেষ গণনীয় কিছু করিতেছি বলিতে পারি না। কিন্তু বঙ্গসাহিত্য কাব্য ও কবিতা ব্যতীত অন্ততঃ এই নক্সার ক্ষেত্রেই ইদানীং কিঞ্চিৎ স্বাধীন উপার্জ্জন করিতেছে বলিয়া বিচারক মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। সাহিত্যের প্রথম প্রবেশ-দ্বারটির নাম 'সত্য' বলিয়া, সত্যের সদরদরজা দিয়াই প্রবেশপূর্ব্বক, শিল্প-পদার্থকে সুন্দর এবং শিবঙ্কররূপে বা শিবের অশক্রুরূপে আকার দান করিয়াই মাহাত্ম্য অর্জ্জন করিতে হয়। সারস্বততন্ত্রের 'উচ্চ-আদর্শ'বাদীরা সকলের জানা কথায় এইরূপ অনুরোধ করিতে পারেন :—

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ
ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ং চ নানৃতং ব্রূয়াৎ
এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥

যুগে যুগে এই উচ্চ-আদর্শে সনাতন সাহিত্যের বাছাই কার্য্যটিও হইয়া আসিতেছে। সনাতন-ধর্ম্মীর সংখ্যা সকলদেশে নিতান্ত স্বল্প হইলেও, মানবজগতের হৃদয় অভ্রান্তভাবে মহত্তের মাহাত্ম্য এবং মহার্ঘতা বুঝিতে পারে বলিয়াই বলে যে—"হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ।"

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই দুর্লভতার লক্ষণ এবং উহার সর্ব্বাতিরেকী মাহাত্ম্যের দিকে প্রত্যেক সচেতন সাহিত্যসেবীর আত্মদৃষ্টি সজাগ রাখিতে হয়। বঙ্গসাহিত্যে আমরা কি করিয়াছি এবং করিতেছি, এই আদর্শে তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতেও বিলম্ব হইবে না।

৩৯। আধুনিক সাহিত্যে বাঙ্গালীর সাধনা-যোগ।

ইংরেজীর প্রভুতায় বঙ্গসাহিত্যে ইযুরোপের প্রাচীন ক্লাসিক আদর্শের মহাকাব্যের (Heroic Epic) সকল লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে; তাঁহারা ঐ আদর্শকে বঙ্গসাহিত্যে অবতারিত করিয়া উহার সকল সৌন্দর্য্য ও মাহাত্ম্য বাঙ্গালী পাঠকের দ্বারস্থ করিয়াছেন; আপনারাও জাতীয় সাহিত্যে অমরতা

অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। উহার পর নবীনচন্দ্রের মধ্যে ইয়োরোপের 'রোমাণ্টিক' আদর্শের 'ঐতিহাসিক মহাকাব্য' এবং এতদ্দেশের পৌরাণিক কাব্যলক্ষণ ন্যূনাধিক সামঞ্জস্যলাভে প্রকটিত হইয়াছে—সেদিকেও চূড়ান্ততা লাভ করিয়াছে। নবীনচন্দ্রও উভয় আদর্শের সঙ্গমে নিজের কাব্যসরস্বতীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বতন্ত্র মাহাত্ম্য-সাধনে অমর হইয়াছেন। পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে উক্ত রোমাণ্টিক আদর্শের গীতিকবিতা ও ছোট গল্প, 'সিম্বোলিক' আদর্শের কবিতা এবং নাট্যগাথাও চূড়ান্ততা লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছে বলিলেও চলে। অন্যত্র বলিয়াছি, এদিকে গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া ইয়োরোপে রোমাণ্টিকতার যত রকম 'রীতি' উঠিয়াছে, স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া স্থায়ী হইয়াছে কিংবা মিলাইয়া গিয়াছে তৎসমস্তই রবীন্দ্রনাথ কোন-না-কোন দিকে অতুলনীয় ভাবে বাঙ্গালায় অবতারিত করিয়া যাইতেছেন। আধুনিক রোমাণ্টিকতার কোন গলিঘুঁজিই আজ সচেতন বাঙ্গালী পাঠকের অপরিচিত নহে। অতএব ইহার পর বাঙ্গালার কবিসরস্বতীকে মৌলিক পন্থার অনুধাবনে নিজের শক্তি কিংবা মাহাত্ম্য প্রসারিত করিতে হইলে ভাবুকতার নবমার্গ অবলম্বন ব্যতীত গত্যন্তর নাই। এ পর্য্যন্ত যাহা হইয়াছে, তাহা যে বেশী ভাগে নব ইয়োরোপের প্রভুতা এবং শিষ্যতাপথেই সমুপার্জ্জিত হইল তাহাই ঘনিষ্ঠ ভাবে আধুনিক বঙ্গের সচেতন শিল্পী মাত্রকে বুঝিয়া লইতে হয়। মধুসূদন, হেম, নবীন বা রবীন্দ্রনাথ যেই মাহাত্ম্য সিদ্ধি করিয়া গিয়াছেন, যে বিশিষ্টতা উপার্জ্জন করিয়াছেন তাহা বঙ্গসরস্বতীকে আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের দরবারে সার্ব্বজনীন মাহাত্ম্যে অথচ ন্যূনাধিক স্বাতন্ত্র্যগুণেই স্থির করিয়া গিয়াছে। বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে এই সুপ্রতিষ্ঠা উপার্জ্জন করা সর্ব্বাপেক্ষা আসন্ন ছিল; আধুনিক সভ্যসাহিত্যের দরবারে এই পদবী লাভ করা একেবারে অপরিহার্য্য ছিল। এখন কোন বিদেশী 'সহৃদয়' ব্যক্তি কুতূহলী হইয়া বঙ্গসাহিত্য ঘাঁটিলেই দেখিবেন, এই সাহিত্য প্রাচীন কি আধুনিক আদর্শের মাহাত্ম্যসাধনায় সভ্য ইয়োরোপের কোন প্রদেশের সাহিত্য হইতে হয়ত পশ্চাৎপদ নহে।

কেবল কাব্য কবিতায় নহে, আধুনিক গল্প বা Fictionএর ক্ষেত্রেও কেবল বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ নহেন, তাঁহাদের পরবর্ত্তী শরচ্চন্দ্র, অনুরূপা ও নিরুপমা প্রভৃতি লেখকগণ আধুনিকতার সঙ্গে স্বদেশী বিশিষ্টতা সমাযুক্ত করিয়া অন্ততঃ ইয়োরোপীয় আধুনিক 'নবেলিষ্ট'গণের সমকক্ষতা সিদ্ধি করিয়া যাইতেছেন। বঙ্গ সাহিত্যের এসকল মাহাত্ম্য পর্য্যাপ্ত হইয়াছে। তবে এ সমস্ত সিদ্ধি যে অধিকাংশ কেবল Realism ও Naturalismএর ক্ষেত্রেই ন্যূনাধিক সমাপন্ন হইল, সাহিত্যশিল্পের উচ্চতর পরিকল্পনা ভূমি কিংবা জীবন ও জগত্তন্ত্রের উচ্চতর ও ঘনিষ্ঠতর প্রশ্নসমস্যার কোন সার্থক ধারণা অথবা শিল্পক্ষেত্রে রসতন্ত্রের মহীয়ান্ কোন সমাধান যে এ সমস্ত নবেলের মধ্যে নাই, আধুনিক কোন জাতির নবেল ব্যাপারের মধ্যেই হয়ত সবিশেষ নাই, তাহাও বুঝিয়া যাইতে হয়।

বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্রে ইঁহাদের যাহা উপার্জ্জন তাহা কোন্ দিকে বা কি পরিমাণে সাময়িক, কোন্ দিকেই বা শাশ্বত-সাহিত্যপদবী লাভ করিয়াছে তাহার চরম বিচার মহাকালের হস্তে। উহা সত্বেও প্রত্যেক সাহিত্যসেবীকে নিজের দিক্ হইতে সে বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত স্থানে দাঁড়াইতে হয়; উহার সাহায্যেই নিজের কর্ম্মগতি স্থির করিতে হয়; তদ্ব্যতীত প্রকৃত সাহিত্যসেবী হওয়া যায় না। পূর্ব্ববর্ত্তী কিংবা সমসাময়িকগণ কি করিয়া গিয়াছেন, উহার কোন অংশ নিত্য, কোন অংশ সাময়িক বা নৈমিত্তিক, আমার নিজত্ব কি, আমি কি করিতে পারি এরূপ জিজ্ঞাসা ও আত্মপথের নির্দ্ধারণই হইতেছে জাতীয় সাহিত্যের প্রত্যেক সচেতন সাহিত্যকর্ম্মীর মর্ম্মস্থানের ব্যাপার। এস্থলেই সাহিত্যসমালোচনা বা সাহিত্যের আদর্শদর্শনের যোগ। সাহিত্যের কর্ম্মভূমিতে প্রত্যেক সাহিত্যসেবককে যেমন 'পূর্ব্বাপর' জ্ঞানলাভ করিতে হয় তেমন আত্মশক্তির যোগ এবং নিজত্বকেও অনুসন্ধান করিতে হয়। কোন জাতীয় সাহিত্যে যাঁহারা বিশিষ্টকর্ম্মা হইয়াছেন, কিংবা কর্ম্মমাহাত্ম্যে মানবের বিরাট্ সাহিত্যেই গৌরবস্থান লাভ

করিয়াছেন তাঁহারা ত কোন না কোন দিকে একটা 'নিজত্ব'ও উহার বিশিষ্টতার নির্ভরেই দাঁড়াইয়াছেন!

আধুনিককালে এপর্য্যন্ত আমরা যাহা করিয়াছি তাহাতে হয়ত 'ভারতীয় সভ্যতা' বা 'ভারতীয় কর্ষণা' নামবিশিষ্ট বস্তুটার সম্বন্ধ তত প্রবল হইতে পারে নাই ; জগতের 'তত্ত্ব' বিষয়ে কিংবা জীবনতত্ত্বে অদ্বৈত-বাদী ভারতের যে বিশিষ্ট সমাপত্তি আছে, যাহাকে মনুষ্যজাতির কর্ণে ভারতবর্ষের অতুলনীয় 'সমাচার'রূপে নির্দ্দেশ করিতে পারি, এযুগের বাঙ্গালী কবি, লেখক বা পণ্ডিতগণ সে বিষয়ে যে পরিপূর্ণ জাগ্রদ্‌ভাব লাভ করিতে পারেন নাই তাহা প্রথম দৃষ্টিতেই প্রতীয়মান হইতেছে। তবে, সে বিশিষ্টতার স্পষ্ট উপলব্ধিই এখন ভারতীয়মাত্রের পক্ষে পরম কর্ত্তব্যরূপে ফুটিয়া উঠিতেছে। এযাবৎ বঙ্গ সাহিত্যে যাহা সমাপন্ন হইয়াছে, উহার পরসূত্রে হয়ত ভারতীয় বিশিষ্টতার সঙ্গে ইয়োরোপীয়তার সমাযোগই একটা প্রবল প্রস্থানরূপে ক্রিয়াপর হইবে ; অন্ততঃ গল্পসাহিত্যে তাহার অস্পষ্ট সূচনা দেখা যাইতেছে। কোন সমালোচক সে পথ দেখাইতে পারেন না। প্রতিভাসুন্দরী সরস্বতীই সে পথ জানেন—তিনিই সাহিত্যের "পথ্যাস্বস্তি" এবং পথ্যাস্বস্তিই সাহিত্যের "উদীচীং দিশমজানাৎ"। কিন্তু, সাহিত্যে সর্ব্বসময়ে সাধকগণের আত্ম-প্রকৃতিতে স্থিতিসংসিদ্ধি এবং স্বাবলম্বনই ত সরস্বতীর সকল দয়ার মূলাধার! সকল প্রস্থানের পক্ষে প্রধান পথই কবির আত্মসিদ্ধপথ—

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্॥"

ইয়োরোপীয় সভ্যতা ও ইয়োরোপীয় সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করুন—আধুনিক সভ্যতার প্রধান লক্ষণ মনুষ্যসংঘের মধ্যে পরস্পর গুরুশিষ্যসম্বন্ধ, ঋণসম্বন্ধ এবং আদানপ্রদানের বৃদ্ধি। উহার গতিকে ইয়োরোপের এক প্রান্তে কোন নগণ্য মনুষ্যের দৃষ্টিতেও যদি সত্যের অথবা উহার সাধনা বিষয়ে কোন নূতন প্রণালীর আভাস দেখা দেয়, তবে উহা এক বৎসরের মধ্যেই সমস্ত ইয়োরোপের চিন্তাশীলব্যক্তিগণের সাধারণ সম্পত্তি হইয়া যায় ; শত শত ব্যক্তি ওই আভাসটাকেই অনুসরণ

করিয়া সত্যের পূর্ণদৃষ্টিলাভের পথ প্রশস্ত করিতে লাগিয়া যায়। সাহিত্যে, শিল্পে, বিজ্ঞান-দর্শনে ও ইতিহাসের ক্ষুদ্রতম সত্যানুধ্যান বিষয়ে পর্য্যন্ত আধুনিক ইয়োরোপ এইরূপে সংঘসম্বদ্ধ এবং সামাজিকতার সৌভ্রাত্রফল চয়ন করিতেছে। এ ক্ষেত্রে জাতিভেদ বা স্বাদেশিকতার বা ধর্ম্মতন্ত্রী সাম্প্রদায়িক ভাবের গর্ব্ব, সর্ব্বরূপ সংকীর্ণতা অন্তর্হিত। অপরূপ ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের আদর্শনিষ্ঠা হইতে ইয়োরোপ সত্যানুসন্ধানে এই সৌভ্রাত্রফল চয়ন করিতে পারিতেছে। 'বিশ্বসাহিত্য' 'বিশ্বধর্ম্ম' 'বিশ্বসমাজ' বলিয়া একটা সুদূর আদর্শ ই এখন ইয়োরোপীয় জাতিসমূহের হৃদয়কে সাহিত্যশিল্প ও বিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রে একযোগী করিতে চেষ্টা করিতেছে। ইহার মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধের সাম্প্রদায়িকতা, জাতীয় ক্ষুদ্রতা, রাষ্ট্রীয় সঙ্কীর্ণতা বা বিষয়বাণিজ্যের স্বার্থপরতা ইয়োরোপীয় জাতিসমূহকে পরস্পরের বিষয়ে বা পৃথিবীর অন্য জাতির বিষয়ে যে খণ্ডিত করিতেছে না তাহা নহে, কিন্তু এই দুর্ঘটনা ত দেহধারী (সুতরাং স্বার্থানুবন্ধী) জীবের পক্ষে দুনিবার, পরন্তু অপরিহার্য্য, উহাতে বরং প্রত্যেক খণ্ডকেই সমুদয়ের মধ্যে অপরূপ জাতিগত ব্যক্তিত্ব দান করিয়া প্রত্যেকটির নিজ নিজ জীবন এবং মেরুদণ্ড রক্ষা বিষয়ে সাহায্য করিতেছে ; সহস্র দোষ সত্ত্বেও আধুনিক 'নেশন' আদর্শ আপনার মাহাত্ম্য প্রমাণিত করিতেছে। এই আদর্শে ইয়োরোপের প্রত্যেক খণ্ড জাতির সভ্যতা ও সাহিত্য আদৌ 'জাতীয়' হইয়াই পরে 'ইয়োরোপীয়' হইতে চাহিতেছে ; এবং ইয়োরোপীয়তার পথেই 'বিশ্ব'তার দিকে অগ্রসর হইতেছে।

ভারতবর্ষের অদ্বৈততন্ত্রী জীবনাদর্শ ও সভ্যতার মধ্যে যে একটা বিশিষ্টতা আছে, তাহাতেই হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী ও সিংহল পর্য্যন্ত, পঞ্জাব ও কাশ্মীর হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডের বেদপন্থী নরজাতিকে দেশ-জাতি-সম্প্রদায় প্রভৃতির শতপথ ও অশেষ পার্থক্য সত্ত্বেও একধর্ম্মী, এককর্ম্মী ও একবর্ণী করিতেছে ; প্রত্যেক প্রদেশজুষ্ট জাতির সভ্যতা ও সাহিত্য প্রাচীনকাল হইতে ঐরূপে 'দেশীয়' হইয়াও 'ভারতীয়' থাকিয়া আসিয়াছে। ইদানীং বিশ্ব দরবারে দাঁড়াইয়া

সর্ব্বাগ্রে ভারতবাসীকে এই 'দেশীয়তা' ও ভারতীয়তার স্বধর্ম্মেই সমৃদ্ধ হইতে হইবে; উক্ত ভূমি হইতেই তাহাকে সার্ব্বজনীনতার দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। আদৌ National না হইয়া Universal হইবার কোন সাধ্যপথ জীবের সমক্ষে নাই।

সারস্বত জীবনের শাশ্বত ধর্ম্ম এবং উহার দাবী এবং সাধকের কর্ত্তব্যবিষয়ে যাহা আমাদের ধারণা এই আলোচনায় উহার দিক্‌নির্দ্দেশমাত্র করিলাম। সাহিত্যসেবার দায়িত্বও এত বেশী যে আধুনিক জগৎ সাহিত্য এবং উহার সেবকের দিকে এক নূতন 'দাবী' রাখিয়া দৃষ্টি করিতেছে বলিয়াই মনে হয়। কাব্য, কবিতা, নাটক, গল্প কিংবা সন্দর্ভ—নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানের কথা ছাড়াইয়া, যে-যে ক্ষেত্রেই লেখকের নিজের হৃদয়ের সহিত পাঠকের সংস্পর্শ ঘটিয়া থাকে সে-সে ক্ষেত্রেই পাঠকের একটা নূতন দাবী অনুভবগম্য হইতেছে। পাঠক গ্রন্থচরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে কবির হৃদয় এবং জীবনচরিত্রের সহবাসও উপভোগ করে; সুতরাং সত্যকার কবিজীবনের দিকে তাহার দৃষ্টি জিজ্ঞাসু হইয়া এবং অনুভববৃত্তি সজাগ হইয়া উঠে।

৪০। আধুনিক সাহিত্যে পাঠকের নূতন দাবী।

এই জন্য আধুনিক সাহিত্যে কবির জীবনীগ্রন্থ এবং জীবন-পর্য্যালোচনাও সাহিত্যের রসানুভবের পক্ষে একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ এবং প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইতেছে; কবিজীবনীর প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। পাঠককুল কেবল কাব্যকে জানিয়াই তৃপ্ত হয় না, কবিকেও জানিতে চায়। এই ব্যাপার সাহিত্যজগতে অনেকানেক কবির মাহাত্ম্যবিষয়ে এবং তাঁহাদের কাব্যের রসবোধ ও প্রতিষ্ঠার বিষয়েও নিদারুণ হইয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারি, বায়রণের পরাক্রমশালী প্রতিভা এবং তাঁহার সমুজ্জ্বল রচনাবলীর অন্তরস্থ যে সকল 'দোষ' অসতর্ক পাঠককে হয়ত কোন মতেই ক্লিষ্ট করে না, সমালোচকগণ তাঁহার জীবনীগ্রন্থের অভিজ্ঞতাসাহায্যে সজাগ হইয়া, তাঁহার কাব্যগ্রন্থাবলী

৪১। কবিজীবনের ছায়ায় কাব্য-রসসম্ভোগ।

হইতে ঐ সমস্ত দোষ-কল তন্ন তন্ন করিয়া বাহিরে আনিয়া দেখাইতেছেন। বায়রণকে জানি বলিয়া তাঁহার ছন্দের ধ্বনি, কথার ভঙ্গী, তাঁহার কাব্যের অবলম্বিত বস্তু-বিষয় ও উহাদের গতি এবং আবহাওয়ার মধ্যেও প্রতিপত্রেই যেন স্বয়ং বায়রণ আপন দোষে ও গুণে বসিয়া আছেন বলিয়াই মনে হইতে থাকে; এবং এই অনুভবও যথার্থ বলিয়াই বিশ্বাস করি। সাহিত্যে বিশেষতঃ কাব্যসাহিত্যে—যে স্থলে কবির হৃদয় স্বয়ং ভাবরসে পরিস্পন্দিত হইয়াই পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ-পূর্ব্বক উহাকে অনুরসিত করে সে স্থলেই—ঐরূপে নানাপথে কবির আত্মপ্রকাশ না ঘটিয়া পারে না, অন্ততঃ সে মুহূর্ত্তের চরিত্রপ্রকাশ। কিন্তু কবির আস্ত জীবনের অন্তর্ধর্ম্মের সঙ্গে উহার নৈকট্য-সম্বন্ধ এবং সামঞ্জস্য না থাকিলে সে 'মুহূর্ত্ত'টিও সম্ভবপর হয় কি? অতএব এস্থলেই বর্ত্তমানকালের, সকল কালের কবিসমক্ষে এবং সাহিত্যসেবীর সমক্ষে যুগধর্ম্মোচিত নূতন দাবী—কেবল কাব্য লিখিলে চলিবে না, কবির জীবনটিকেও কাব্যের অনুকূলে রচনা করিতে হইবে; অথবা আদৌ জীবন রচনা করিয়া তদনুরূপেই কাব্য লিখিতে হইবে; অন্যথা, দুটিতে কাটাকাটি করিয়া নিদারুণ ভাবে রসভঙ্গ করা অপরিহার্য্য হইবে। এই 'দাবী' অস্বীকার করার যো নাই; এবং ভবিষ্যতের সাহিত্যে উহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া চলিবে বলিয়াই মনে করিতেছি।

এই আলোচনার মূলসূত্রে যদি আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে দেখিবেন যে, ভিত্তিমূলে প্রকৃত 'সারস্বত জীবন' গঠন করিতে না পারিলে সাধকের জীবনের জ্ঞানকর্ম্মকাণ্ড এবং রসকাণ্ডের মধ্যে সমযোগী সূত্রবন্ধন এবং সামঞ্জস্য না ঘটিলে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রকৃত প্রস্তাবে কোনরূপ উৎকর্ষের বা স্থায়ী মাহাত্ম্য-লাভের সম্ভাবনা নাই। ফল কথা এই যে, সাহিত্যরচনার মূলেই লেখকের প্রবৃত্তি; প্রবৃত্তির মূলেই আবার লেখকের অধ্যাত্মচরিত্র। তুমি যাহাই চিন্তা কর, কল্পনার অতীন্দ্রিয়ক্ষেত্রে

৪২। জীবনের জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ড এবং রসকাণ্ডের মধ্যে আন্তরিক সামঞ্জস্য ব্যতীত সাহিত্যে স্থায়ী মাহাত্ম্যলাভ অসম্ভব।

বা সাধারণ জীবনের সমতলভূমে বুদ্ধিকে সমাহিত করিয়া যাহাই অনুধাবন বা উপার্জ্জন কর, সমস্তকে ভাষায় প্রকাশ করিতে হইবে; এই ভাষা তোমার হৃদয় হইতে নিঃসারিত না হইলে, উহার কিছুমাত্র জীবনীশক্তি থাকিবে না, উহা বরং মরা মানুষের স্পর্শের মতই ভীতিবিরক্তির সঞ্চার করিবে।

৪৩। মহৎ সাহিত্যের মূলে মহতী প্রবৃত্তি এবং মহৎ চরিত্র ভিত্তি।

ভাষাকে হৃদয়গুণে অনুপ্রাণিত করিতে হইলে তোমার কবি-হৃদয় এবং কবি-চরিত্রের মধ্যে মৌলিক সামঞ্জস্য এবং সমতান সংঘটিত হওয়া চাই। অন্তশ্চরিত্রের সৌষ্ঠব সম্পাদন না করিয়া, চরিত্রে প্রীতি, পবিত্রতা, মধুরতা, ঔদার্য্য এবং অভ্যুন্নতি সাধন না করিয়া উপরি-উপরি ভাবে ঐ সমস্তে অভিলাষপূর্ব্বক রস-সৃষ্টি করিতে গেলে—তুমি যতই কেন সতর্ক ও সাবধান ব্যক্তি হওনা—আড়েঠারে তোমার হৃদয়ের অসারতা এবং কলুষছায়া আপতিত হইয়াই সমস্ত কবিকর্ম্ম অতর্কিতে কলুষিত করিয়া দিবে। ইহা নীতি-বিজ্ঞানের বা ধর্ম্মগোঁড়ামির ধামাধরা 'কচকচি' মাত্র নহে। দুর্হৃদয় ব্যক্তি যতই বুদ্ধিজীবী এবং প্রতিভার অধিকারী হউক না কেন, অন্তর্দর্শী ব্যক্তির প্রত্যগনুভব-সমক্ষে (যাঁহার প্রকৃত অন্তরঙ্গীয় দৃষ্টি আছে তাঁহার নিকটে) কখনও মাহাত্ম্য রক্ষা করিতে পারিবে না। সহৃদয় পাঠকমাত্রের অন্তরাত্মা এইরূপ শিল্পরচনার স্পর্শলাভ করিয়াই উদ্বেজিত হইয়া উঠিবে; উহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে বলিয়া অনুভব করিবে। রসরচনা মাত্রেই যেমন শিল্পীর বুদ্ধিগুহা হইতেই আবির্ভূত হয়, তেমনি তাঁহার অন্তশ্চরিত্র হইতেই সূক্ষ্ম বর্ণধর্ম্ম এবং অধ্যাত্ম প্রকৃতিটাও পাইয়া থাকে। ফলমাত্রেই বৃক্ষটির অন্তর্ধর্ম্মে ধর্ষিত না হইয়া পারে না; প্রকৃত রসিকব্যক্তির রসনাসমক্ষেও ঐ ধর্ম্মকে কোনমতে গোপন করিতে পারে না।

এই 'অন্তর্ধর্ম্মের' এমন শক্তি যে, উহা অপরিহার্য্য হইয়া, লেখকের সকল বুদ্ধি-চেষ্টা এবং সতর্কতাকেও অতিক্রম করিয়া তাঁহার রচনায়

মধ্যে সংক্রামিত হয়; তাঁহার styleকেও পরিবর্ণিত করে। এদিক্ হইতে দেখিলে, শিল্পরচনা মাত্রেই লেখকের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত একএকটা সূক্ষ্ম Confession। স্বাধীনভাবে দৃষ্টি পরিচালন

৪৪। কবির আত্মমূল্য এবং স্বধর্ম্মমূল্য সৃষ্টি।

করিয়া এই সূক্ষ্ম পদার্থকে হয়ত অনেকেই প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন না; কিন্তু কবির একটি উত্তম জীবনী পাঠপূর্ব্বক তাঁহার রচনার দিকে চক্ষু ফিরাইলেই, অধ্যাত্মতত্ত্বের এক অবিজ্ঞাত, অভিনব প্রকোষ্ঠে যেন প্রতিপদে আলোকপাত হইতেছে বলিয়া অনুভব হইতে থাকিবে। কবি যদি স্বয়ং শিথিলচরিত্র, জড়তাপিপাসী অথবা মাংসবিলাসী হন, তাহা হইলে—তিনি যতই সাবধানী মনুষ্য হউন না কেন—তাঁহার ধর্ম্মভাবের গ্রন্থমধ্যে, তাঁহার পরমার্থচিন্তার বস্তু-বিষয়, প্রণালী এবং রচনারীতির মধ্যেও উক্ত দোষ নানা ছিদ্রপথে গলিয়া পড়িবেই পড়িবে; সূক্ষ্মদৃষ্টি কোনমতেই এড়াইতে পারিবে না। কবিকর্ম্ম হৃদয়ের ব্যাপার বলিয়া এবং প্রকৃত কাব্যরচনার ব্যাপারে প্রাণের সরলতা নামক পদার্থটি ন্যূনাধিক অপরিহার্য্য বলিয়াই এ তত্ত্ব অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে। কবি যদি দুর্দ্দম অহংভাবুক, আত্মাভিমানী এবং অহংমদমত্ত হন, তাঁহার চৈতন্যমধ্যে যদি কেবল সংসারে নিজের শ্রেষ্ঠতা, পরের দোষদর্শিতা এবং অসহিষ্ণুতার ভাবই প্রবল থাকে, তাহা হইলে তাঁহার আকারে-ইঙ্গিতে-ভাষিতে উহার ছায়া যেমন কোনমতে সামাজিকের অনুভব এড়াইতে পারিবে না, তাঁহার ভাবুকতা-বরিষ্ঠ শিল্পচেষ্টার মধ্যেও উহার বিষ-জল রেখা এবং আভাস প্রকাশিত না হইয়া পারিবে না। সাংসারিক এবং সামাজিক ব্যবহারেও, ঠিক যে মুহূর্ত্তে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সাবধান হওয়া আবশ্যক আছে কিংবা তাঁহা হইতে সামাজিকগণ বিনয় নম্রতা অথবা সৌজন্য আশা করিতেছে, সে মুহূর্ত্তেই তাঁহার অন্তরের 'স্বধর্ম্ম'টি নিদারুণভাবে ভদ্রতার বস্ত্রাবরণ হইতে অকস্মাৎ বিকট শৃঙ্গ উত্থিত করিয়া সকলকে হাঁকাইয়া দিবে। ধর্ম্মের অকপট গুহ্যতত্ত্ব রচনা করিয়া যখন তিনি স্বয়ং ভদ্রসাজ হইয়া পরমার্থ আলোচনা

করিতেছেন, তখনি হয়ত এই অন্তর্দ্বন্দ্বটি তাঁহার কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীতে এবং হাবভাবে নানাদিকে উঁকি মারিয়া শ্রোতৃবর্গকে কণ্টকবিদ্ধ করিতেছে, দুর্জ্ঞেয় এবং অকারণ একটা বেদনা জন্মাইয়াই তাঁহার সকল সাধু উদ্দেশ্য বিফল করিয়া দিতেছে! তিনি কবি বলিয়াই, সাধারণ লোকের পক্ষে হয়ত অসম্ভব এই ব্যাপারটি তাঁহার অদৃষ্টে সম্পূর্ণ সম্ভবপর হইবে। অন্যায়ের প্রতি, পাপের প্রতি তাঁহার সহজ আক্রোশ এবং ধিক্কারের মধ্যে, তাঁহার হাস্য-রসিকতার মধ্যেও জানিতে বাকি থাকিবে না যে, তিনি ন্যায়ধর্ম্মের বা সত্যের মমতায় উত্তেজিত হইয়াছেন, না কেবল আপন হৃদয়ের অপরিপাচ্য বিষ উদ্গারপূর্ব্বক আপনাকে খালাস করিতেছেন। কবির পক্ষে অন্তরাত্মাকে ঢাকিবার, ভাবের ঘরে চুরি করিবার কোন উপায় নাই। লোভ, মোহ, পাপাভিমানের এবং পাপচরিত্র উদ্ঘাটনের পুণ্যসঙ্কল্পিত মহাসঙ্গীতের মর্ম্মতল হইতে কবির আপন পাপানন্দই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া অপ্রত্যাশিত ভাবে পাঠকের দৃষ্টিবদ্ধ হইয়া যাইবে, এবং স্বয়ং কবির মর্ম্মচরিত্রগত পাপিষ্ঠতার ছবিটাই অতর্কিতে মুখ্য হইয়া সমস্ত মহাভারত অশুদ্ধ করিয়া দিবে।

কবির জীবনসাধনা এবং কবিত্বের রসসাধনা সমযোগী হইতে না পারিলে এ সঙ্কট এড়াইবার অন্য উপায় নাই। ইহা সাহিত্য-সেবকমাত্রের সঙ্কটস্থান—সাহিত্যসেবা সংসারে দুর্ব্বল বা বিফল হইবার মূলেও ইহাই প্রধান কারণ। আমরা সকলেই ন্যূনাধিক দুর্ব্বলপ্রাণ; বহির্জীবন এবং অন্তর্জীবনের মধ্যে বেশীকম বিরোধ লইয়াই সংসারপথে চলিয়াছি।

৪৫। সাহিত্যসেবীর ঐকতান সাধনা।

সাহিত্যিক সাধনার আলোচনাক্ষেত্রে এই সর্ব্ববিধ্বংসী অথচ কবিত্বের পক্ষে ন্যূনাধিকসাধারণ অধ্যাত্মসমস্যার দিকে সকলের আত্মবুদ্ধি সচেতন করাই কর্ত্তব্য বোধ করিয়া সাহিত্যসেবার গোড়ায় দাবীটাকে এরূপে উপস্থিত করিলাম। যেমন উপক্রমে তেমন উপসংহারেও বুঝিতে হয় যে, সাহিত্যসেবীর জীবন, চরিত্র এবং কবিত্ব পরস্পর ঐক্যতান হইয়া

তামলয়বদ্ধ চরমার্থ চেষ্টা ও সঙ্গীতের আকারে পরিণত না হইলে, সকল চেষ্টাই সকল দিকে—যেমন ইহকালের সাহিত্যপক্ষে তেমন নিত্যকালের অধ্যাত্মপক্ষে—বিফল হইয়া পড়া অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং নিয়ত ভাবে মনে রাখিতে হয় যে, আমরা সকলে জীবনপথে অতর্কিতে 'মহতী বিনষ্টি'র অতল গুহাসম্মুখেই যাতায়াত করিতেছি! সাহিত্যসেবকমাত্রকেই আপনাকে অনন্তের সন্তান এবং অনন্তজীবী বলিয়া ধারণা জাগরূক রাখিয়াই কায়মনঃপ্রাণে ঐক্যরসলক্ষ্য সাধনায় জীবন নির্বাহ করিতে হইবে। কেবল ঐক্যলক্ষ্যে সচেতনভাবে ক্রিয়াপর হইয়া চলিতে পারিলেই এই মৃত্যুসঙ্কট উত্তীর্ণ হওয়া যায়। তাঁহাকে সাহিত্যসেবা-পথে স্বভাবের অনুসরণপূর্ব্বক যুগপৎ সারস্বত ক্ষেত্রের শাশ্বতী ঋদ্ধির লক্ষ্যে এবং অনন্ত জীবনের আহার্য্যসংগ্রহে ব্যাপৃত থাকিয়াই সংসারে অগ্রসর হইতে হইবে। এই স্বল্প জীবনের সাংসারিক ফলাফলকে নিত্যজীবনের তুলনায় তুচ্ছ ভাবিয়া প্রতি পদে চলিতে না পারিলে তিনি কদাপি 'অমৃত'কে লাভ করিতে পারিবেন না। বিশ্বভুবনের সাহিত্যরঙ্গস্থলীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই দেখিতেছি, সকল অমর সাহিত্যশিল্পীর হৃদয় সজ্ঞানে বা অতর্কিতভাবে, সকল ভুলভ্রান্তির মধ্যে, পরম 'একপদ'লক্ষ্য ঐক্যতানগীতিই গান করিতেছে, পরম রসার্থময় সুরতানলয়ে শাশ্বত সত্যপুরীর অভিমুখেই উত্থিত হইতেছে—

> ওই শোন উঠে ছন্দে নানান
>
> কবিজনরের আরতির সুর!
>
> লক্ষ ধারায় ঐক্যের তান—
>
> নয়ালের কান শুনিছে মধুর!
>
> মর্ত্ত্যজীবন-জাল উত্তরিয়া
>
> নিত্যপুরীর পন্থা ধরি'
>
> সুখদুঃখের সীমা লঙ্ঘিয়া
>
> আরতির ধূপগীতি আচরি'

সঙ্গীত সেই উজল বর্ণে
অনন্ত পদে উধাও পণে
চরণে তাঁহার ছাজায় পর্ণে
শুক্লকমল হেন বিকশে ! (১)

সমাপ্ত

(১) লেখকের 'শুক্লকমল' কাব্যের অন্তিম শ্লোক।

নির্ঘণ্ট

কাব্যের বস্তুতত্ত্ব—ঐ

নির্ঘণ্ট